নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

নবম খণ্ড, ১২৯৮।

২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত

কলিকাতা,

৬/১ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, জোড়াসাঁকো,

"কলিকাতা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" যন্ত্রে সম্পাদকের আদেশে শ্রীচণ্ডীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

নবম খণ্ড নব্যভারতের সূচী।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

নব্যভারত

নবমখণ্ড।

লীলা-চাতুর্য্য।

নববর্ষের প্রারম্ভে সর্ব্বাগ্রে বিধাতাকে প্রণাম করিতেছি। তিনিই নেতা, তিনিই বল, তিনিই বুদ্ধি, তিনিই রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহার কৃপাতেই আছি, তাঁহার কৃপা হইলেই যাইব। তিনি আমাদিগের সকল অবস্থার একমাত্র রক্ষক। তিনি আমাদিগের উপর করুণা বর্ষণ করুন।

তৎপর আমাদিগের বন্ধু, গ্রাহক এবং লেথকদিগকে প্রণাম করিতেছি। এই কঠোর সংসার-পরীক্ষায় তাঁহাদিগের যত্ন, উৎসাহ, সাহায্য, এবং সহানুভূতি বিনা কথনই আমরা তিষ্ঠিতে পারিতাম না। সকলে আজ আমাদের ক্রটী ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রসন্ন চিত্তে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

তৎপর, যাঁহারা আমাদিগের প্রতি বিরক্ত, যাঁহারা আমাদিগের উন্নতিতে কাতর, যাঁহারা আমাদের অনিষ্ট সাধনে ব্রতী, তাঁহাদিগকেও প্রণাম করিতেছি। ভবের মেলা, ভবের খেলা দুদিনের,—আজ আছে, কাল নাই। ইহার জন্য দ্বেষ বিদ্বেষ কেন? আমরা খুব নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা আমাদের উপকারী ভাই। তাঁহারা না থাকিলে আমাদের দোষ ক্রটী আমরা বুঝিতে পারিতাম না। আজ নববর্ষারম্ভে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাদিগের চরণেও প্রণাম করিতেছি। সম্পদ, বিপদ ও সুখ দুঃখের তীব্র উত্তেজনায় আমরা বুঝিয়াছি, এ জগতে বন্ধুও কেহ নাই, শত্রুও কেহ নাই; অথবা বন্ধু যিনি, সময়ে তিনিই শত্রু; আবার শত্রু যিনি, তিনিই বন্ধু। যার যখন সে কাজ, সেই কাজই তিনি সাধন করেন। প্রয়োজনানুসারে কেহ বন্ধু, আবার কেহ শত্রু। বন্ধুরও কাজ আছে, শত্রুরও কাজ আছে। দুইয়ের মধ্যে কে অধিক উপকারী, আমরা জানি না। আমরা এই মাত্র জানি, বিধাতার ইচ্ছাতেই এ দুয়ের উদ্ভব, সুতরাং এ দুইই উপকারী। আমরা লীলাময় হরির লীলা না বুঝিয়া, অনেক সময়ে বৃথা বন্ধুসম্মিলনে উল্লসিত হই, নৃত্য করি,—না বুঝিয়া সময়ান্তরে শত্রুর ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া হাহাকার করি, নিরাশয় অবসন্ন হই। বিধাতার লীলা-প্রহেলিকার অন্তর-স্তম্ভ ভেদ করে, কার সাধ্য?

সোজা কথায়, বন্ধু কে? না, যে আমায় ভালবাসে, আদর করে, প্রশংসা করে, আমার মঙ্গল চায়, সুখে সুখ এবং আমার দুঃখে দুঃখ জ্ঞান করে। সোজা কথায়,

শত্রু কে? না, যে আমাকে ঘৃণা করে, যে আমার নিন্দা করে, যে অনিষ্ট সাধনে তৎপর, যে আমার সুখে দুঃখী, এবং দুঃখে সুখী। এই দুটী কথার দার্শনিক তত্ত্বে ভাসাভাসা চিন্তায় পরস্পর বিরোধীভাব সংলগ্ন আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে আর সে ভাব থাকে না। কেন, বলিতেছি।

যে ব্যক্তি আদর করে, প্রশংসা করে, ভালবাসে, সে আমার নিকট বড়ই মিষ্ট। মনুষ্যের মধ্যে যত অপকৃষ্ট বৃত্তি বা রিপু আছে, তাহার মধ্যে অন্যের প্রশংসা বা ভালবাসা-লালসা তন্মধ্যে একটী প্রধান। অন্যের প্রশংসা বা অন্যের ভালবাসা লইবার জন্য এই জগৎ পাগল। মানুষ মানুষের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করে, ভালবাসার খাতিরে; মানুষ মানুষের উপকার করে, অন্যের প্রশংসা লাভের জন্য। ভালবাসা ও প্রশংসা-লালসা যদি বিলুপ্ত হইত, মানুষ ঠিক প্রাণের টানে মানুষের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করিতে এবং অন্যের উপকার করিতে পারিত কি না, সন্দেহ। ভালবাসা ও প্রশংসার লালসা মানুষকে এতদূর অধঃপাতে লইয়া গিয়াছে যে, এই দুই বস্তু হারাইবার ভয়ে মানুষ সৎ হইতে অসতে, ধর্ম্ম হইতে অধর্ম্মে, পুণ্য হইতে পাপপথে পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত হইতেছে। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সংসর্গে নরক—এটী প্রাচীন কথা। মানুষ, চতুর্দ্দিকের পরিবেষ্টিত মানব-মত-সমষ্টির হস্ত হইতে সুরক্ষিত থাকিয়া, বীরের ন্যায়, অতি অল্পকাজ করিতে পারে। অনেক লোকই সংসর্গের তাড়নায় কুপথে ধাইতেছে। থিওডোর পার্কার বা ম্যাট্‌সিনি, খ্রীষ্ট বা চৈতন্যের কথা স্বতন্ত্র; ইঁহারা জগতের মঙ্গলের জন্য মান সম্ভ্রম, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; ইঁহাদের স্বর্গীয় কথা দূরে থাকুক,—বহুলোক ভালবাসা ও প্রশংসার খাতিরে বিধাতার প্রদর্শিত সত্য ও ন্যায়ের পথ অম্লান চিত্তে পরিত্যাগ করিতেছে। দৃষ্টান্ত দেখ;—পতিতা রমণীকে সাহায্য করিলে সমাজের লোকেরা বিরক্ত হন, সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে না; তাহারা চির-কলঙ্কের পথে যাইতেছে। খ্রীষ্ট, পতিতা রমণীকে "Go and sin no more." বলিয়া আশ্রয় দিয়া সকলের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতেন—"I am for the sinners." "আমি পাপীদের জন্যই।" এই স্বর্গীয় আদর্শে নবজীবন প্রাপ্ত হওয়াতেই আমরা (Mary Magdalene) মেরী মেক্‌ডেলিনের ন্যায় মহিলাকে দেখিতেছি। কিন্তু এ জগতে খ্রীষ্টের ন্যায় মহাপুরুষ অতি বিরল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রেলের মেসেঞ্জার নামক পত্রিকায় পড়িতেছিলাম, ব্রাড্‌ল সাহেবকে বাল্যকালে পেকার (Mr. Packer) সাহেব ঘৃণা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি নাস্তিকতার পথে গিয়াছিলেন। মুক্তি ফৌজের জেনেরেল বুথ (General Booth) সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, "General Booth picks up from the dust of the streets, the broken wrecks of humanity and tells them—"never mind the past, there is yet hope for you, you are yet capable of worthy deeds." "জেনেরেল বুথ রাস্তার ধূলি হইতে মানবশক্তির ভগ্নাবশেষ তুলিয়া বলেন, "অতীত বিষয় ভাবিও না, এখনও তোমার

আশা আছে, এখনও তুমি মহৎ কাজ করিতে সমর্থ।” দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া প্রয়োজন নাই। মহৎ লোকেরা জগতের হিতের জন্য ভালবাসা ও প্রশংসাকে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের পক্ষে সে সকল কথা খাটে না। আমরা সংসর্গের দাসানুদাস,—আমরা লোকের ভালবাসার আশায়, প্রশংসার খাতিরে অনেক মহৎ কার্য্য হইতে বিরত থাকি। এই গেল মিত্রদের দিক। অন্য দিকে, শত্রুদের ঘৃণা বা নিন্দার ভয়ে,বা তাহরা আমাদের অনিষ্ট সাধন করিবে, এই ভয়ে আমরা অনেক সময়ে ভাল কার্য্য হইতে বিরত থাকি। ইহার আর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। শত্রু আমার কুযশ গাইবে, বুকে ছুরী মারিবে বা শত্রু হাসিবে, ইত্যাদি কথা ভাবিয়া কত সময়ে আমরা সৎকাজ হইতে বিরত থাকি। তবেই দেখা গেল, শত্রু মিত্র উভয়ই ভাল কাজ হইতে মানুষকে বিরত রাখিতে সমপারদর্শী। এই কথায় কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, বন্ধু যেমন বন্ধুর উপকার করেন, শত্রু তেমন করেন না। “শত্রু তেমন করেন না”—এ কথা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু শত্রু কিছুই করেন না; একথা বলা যায় না। বিপদ সম্পদ, দুঃখ সুখ,—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, ঠিক্ বলা যায় না। বিধাতার রাজ্যে সুখও ভাল, দুঃখও ভাল, সম্পদও ভাল, বিপদও ভাল। বন্ধুরা সম্পদের হেতু, সুখের প্রস্রবন, তাঁহারা উপকারী, সন্দেহ নাই; শত্রুরা বিপদের পথ-প্রদর্শক, দুঃখের হেতু, সুতরাং তাহারাও উপকারী; কেননা বিপদ বা দুঃখ-সংগ্রাম ভিন্ন এ পৃথিবীতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মে না। আলোক আর আঁধার—এ দুইয়ের মধ্যেই বিধাতার হস্ত।

বাস্তবিক যতই বয়স বাড়িতেছে, বুঝিতেছি, এ পৃথিবীতে বন্ধুও ভাল, শত্রুও ভাল; অথবা বন্ধুর প্রশংসা বা ভালবাসার যদি প্রয়োজন থাকে, শত্রুর নিন্দা ও কুব্যবহারেরও প্রয়োজন আছে। একটা ভাল, আর একটা পরিত্যাজ্য, এ কথা আর বলিতে পারিতেছি না। জীবন-সঙ্কটের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, বন্ধু পর হইয়াছেন, শত্রু আপন হইয়াছেন। বন্ধু ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, শত্রু বুকে ছুরী মারিয়া লোকাতীত পথ প্রদর্শন করিয়াছে। অথবা বন্ধুত্ব বা শত্রুত্ব—এ কেবল মতের খেলা, ভোজের বাজি ভিন্ন এ পৃথিবীতে আর কিছুই নয়; বিভিন্ন মতের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ দুইটী সৃষ্ট। মতে মিলিলে লোক হয় আপন, অথবা মিত্র;—মতে না মিলিলে লোক হয় পর, অথবা শত্রু। সময়ান্তরে, মতে না মিলিলে মিত্র হন শত্রু, আর হয় ত শত্রু হন মিত্র। পৃথিবীর সমাজ সমষ্টি, ধর্ম্মসম্প্রদায়সমষ্টি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে এই কথারই জীবন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রশংসা নামক জিনিষটা আর কিছুই নয়, কেবল মত-পরিপোষক রূপ একটা মধুর সম্ভাষণ; নিন্দা—এ জগতে আর কিছুই নয়, মত-বৈষম্য ঘোষণার একটা অস্ত্র। যাঁহারা এই মর্ত্ত্যলোকে বাস করিয়াও মিত্র বা শত্রু, প্রশংসা বা নিন্দা, অনুরাগ, বা বিরাগ, আসক্তি বা বিরক্তি—এ সকলের অতীত হইতে পারেন, তাঁহারাই সাধু, অথবা তাঁহারাই দেবতা। আর সকল লোক মৃত, অসার,

—পরগাছা, পাষাণের জল। তাহাদের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু স্থায়িত্ব নাই।

আমাদের জীবন এই শেষ শ্রেণীর। আমরা আছি, কিন্তু পরগাছার ন্যায় আছি, আমাদের নিজের অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব নাই। আমরা লোকের ভালবাসার কাঙ্গাল, অনুরাগে জাগি বিরাগে মরি,—আমরা প্রশংসায় নাচি, নিন্দায় অবসন্ন হই; মিত্রের আলিঙ্গনে উল্লাসে নৃত্য করি, শত্রুর তিক্ত ব্যবহারে ঘোর নিরাশায় সমাচ্ছন্ন হই। জানি না, বুঝি না যে, ইহারা দুইই অপকারী, এবং দুইই উপকারী। এ জগতে দুয়েরই প্রয়োজন আছে। আমাদের হীন দশা ভাবিলে প্রাণ মন অস্থির হয়।

আমরা কাহার জন্য বা কিসের জন্য আছি, জানি না। এক দিন বন্ধুদের ভালবাসায় ভুলিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, আমরা বুঝি তাঁহাদেরই সেবার জন্য আছি। এখন তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। এখন পরীক্ষায় পড়িয়া ভাবিতেছি, আমরা সেবার জন্য আছি বটে, কিন্তু কার সেবার জন্য, জানি না। কেবল এই জানি, খাটিতে জন্ম, খাটিয়া মরিব;—যাহার প্রয়োজন, এ খাটুনির ফল গ্রহণ করুক। ফল সম্বন্ধে এখন নিরপেক্ষ হইতে সাধ। হিন্দুও বুঝি না, খ্রীষ্টানও বুঝি না, মুসলমানও বুঝি না, ব্রাহ্মও বুঝি না—আমরা সম্প্রদায়গত ভেদাভেদের উপর স্তরে দাঁড়াইয়া, ক্ষীণ কণ্ঠে এই কথা শত্রু মিত্র সকলকে বলিতেছি, ভাই! আমরা তোমাদের সকলের। তোমাদের সকলকে প্রণাম করিতেছি, আশীর্ব্বাদ কর। আর যদি আমাদের সেবা গ্রহণের প্রয়োজন থাকে, গ্রহণ কর, নচেৎ করিও না। ভালবাসা বা ঘৃণা, প্রশংসা বা নিন্দা, এ উভয়ই এ দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ভাই, এ সকল পরিত্যাগ করিয়া এখন একবার স্থির চিত্তে শান্তিপুরে বসিয়া দেখ—ভবের বাজারে কে কার, কে কদিনের? কেহ কাহারও কোন কাজে বাধা না দিয়া, সকলে যে প্রাণের ভাই, ইহা স্মরণে রাখিয়া, ভালবাসা, বিরাগ, প্রশংসা বা নিন্দার উর্দ্ধে উঠিয়া বিশ্বেশ্বরের মহিমা প্রচার করি, এবং তাঁহারই সেবায় জীবন পাত করিয়া মানব জীবনকে সার্থক করি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪৩)

ক্ষেত্রবিলাস।

জগন্নাথের রথযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে শ্রীচৈতন্য কাশী মিশ্র, পড়িছাপাত্র ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া গুণ্ডিচামন্দিরে মার্জ্জনা করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। রথযাত্রার সময় যে মন্দিরে যাইয়া জগন্নাথ অবস্থিতি করেন, তাহার নাম গুণ্ডিচা মন্দির। ইহা শ্রীমন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে, ইন্দ্রদ্যুম্ন দীর্ঘিকার তীরে অবস্থিত। ভট্টাচার্য্যাদি এই এক নূতন লীলা হইবে মনে ভাবিয়া গৌরের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন ও তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে এক শত কলসী, শত সম্মার্জ্জনী

আনিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র দলের সমস্ত ভক্তগণকে ডাকিয়া স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করতঃ সকলকে মাল্যচন্দনে সুশোভিত করিলেন ও প্রত্যেকের হস্তে কলসী ও সম্মার্জ্জনী দিয়া হরিধ্বনি করিয়া মহোৎসাহে গুণ্ডিচা মার্জিতে চলিলেন। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ—মহানন্দে মন্দির ঝাড়িয়া ও ধুইয়া নির্ম্মল করিলেন। ধূলা-ঝাড়া, কাঁকর বাছা ও ঝুল ঝাড়ার ধুমই বা কত। ঘর ধুইবার সময় এক বঙ্গীয় যুবক জল আনিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণে ঢালিয়া কিঞ্চিৎ পান করিলে গৌর কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া স্বরূপকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখতো তোমার গৌড়িয়ার রীতি, সে আমার পাদোদক খাইয়া আমাকে পাতকী করিতে চাহে।' স্বরূপ সেই যুবককে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিলে গৌর তাহাকে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলেন। প্রক্ষালনের পর শ্রীচৈতন্যের ইঙ্গিতে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল ও গৌর নাচিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে তিনি বেহুঁষ হইয়া গেলে দলের মধ্যে এক বিশাল ভাবতরঙ্গ উছলিয়া উঠিল। অদ্বৈতাচার্য্যের গোপাল নামে একটী বালক পুত্রও নাচিতেছিল। নাচিতে নাচিতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলে আচার্য্য তাহার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। তাহাতে নৃত্যকীর্ত্তন থামিয়া গেল। তখন ভক্তগণ নানা উপায়ে গোপালের চৈতন্য সম্পাদন করিতে না পারিয়া বালকের মৃত্যু হইয়াছে জ্ঞানে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আনন্দাশ্রুর পরিবর্ত্তে অদ্বৈতের গণ্ড দিয়া শোকাশ্রু পড়িতে লাগিল। চৈতন্যদেব তখন উচ্চৈস্বরে 'গোপাল উঠ' বলিয়া ডাকা মাত্র বালক উঠিয়া বসিল। সকল লোক বিস্মিত হইয়া গেল। তখন দলবদ্ধ হইয়া গৌরচন্দ্র ইন্দ্রদ্যুম্নের জলে নামিয়া কতক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া স্নানান্তে নিকটবর্ত্তী উপবনে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে বাণীনাথ পাঁচ শত জনের উপযুক্ত নানাবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সকলকে ভোজন করিতে আহ্বান করিলেন। উদ্যান গৃহের পিঁড়ার উপর শ্রীচৈতন্য, পরমানন্দ পুরী, সার্ব্বভৌম, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, আচার্য্য রত্ন প্রভৃতি সারি গাঁথিয়া ভোজনে বসিলেন, তাহার তলে, তাহার তলে এইরূপ ক্রমে সেই বিশাল ভক্তগোষ্ঠি বসিয়া গেল। শ্রীচৈতন্য হরিদাস, হরিদাস বলিয়া ডাকিলে হরিদাস দূর হইতে বলিলেন, আপনি ভক্ত সঙ্গে ভোজন করুন, আমি নীচ অন্ত্যজ, আমি এ সঙ্গে বসিব না। গোবিন্দ আমাকে প্রসাদ দিবে। শ্রীচৈতন্য তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া আর কিছু বলিলেন না। তখন স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোপীনাথ আচার্য্য, বাণীনাথ, শঙ্কর ও দামোদর এই কজন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ হরিধ্বনি দিয়া, প্রেমালাপ ও আমোদ কৌতুক করিতে ২ ভোজন করিতে লাগিলেন। গোপীনাথ শ্যালক, সার্ব্বভৌম ভগিনীপতি। গোপীনাথ বলিলেন 'কি ভট্চায্! তোমার সাবেক চালচলন কোথায় গেল? আচ্ছা বল দেখি, সে ভাল ছিল কি, এ পরমানন্দ ভাল?' ভট্টাচার্য্য গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন' 'আর আমাকে লজ্জা দিও না। তোমার প্রসাদেই তো আমার এ সম্পদ্ হইয়াছে। অদ্বৈত নিত্যানন্দকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, 'আরে! এ অবধূতটার সঙ্গে খাইয়া আমার জাত গেল

দেখ্‌ছি! প্রভুর কি! উনিতো সন্ন্যাসী, উহাঁর অন্ন স্পর্শে দোষ নাই।' এইরূপ মহানন্দে সেদিনকার বনভোজন সমাপ্ত হইল।

রথযাত্রার দিন গৌরচন্দ্র প্রাতঃস্নান করিয়া ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া জগন্নাথের বিজয়োৎসব দর্শন করিলেন। বলিষ্ঠদয়িতাগণ জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে হাতাহাতি করিয়া মন্দিরের বাহিরে আনিয়া বিগ্রহগুলির কটিদেশে পট্টডোরি বাঁধিয়া সুসজ্জিত অত্যুচ্চ তিনখানি রথোপরে আরোহণ করাইল। চারিদিকে বাদ্য কোলাহল হইতে লাগিল। লোক সকল আনন্দোৎসাহে 'জয় জগন্নাথ। মহাপ্রভু'! মণিমা! বলিতে লাগিল। রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্রে পরিবৃত থাকিয়া রথযাত্রার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন এবং আপনি সুবর্ণ সম্মার্জ্জনী ও চন্দনাক্ত জলের পাত্র হাতে লইয়া রথের আগে আগে পথ পরিস্কার করিয়া চলিলেন। স্বয়ং ভূপতি হইয়া তুচ্ছ সেবায় রত হইলেন। গৌড়গণ রথ টানিতে লাগিল। মহা ধুমধামের সহিত রথ গুণ্ডিচাভিমুখে চলিতে লাগিল। এদিকে শ্রীচৈতন্য পুরী, ভারতী ও ভক্তবৃন্দকে স্বহস্তে মাল্য চন্দন পরাইয়া কীর্ত্তনের জন্য চারিটী দল বাঁধিয়া দিলেন। এক এক দলে একজন মূল গায়ক, পাঁচজন দোয়াড়, একজন প্রধান নর্ত্তক ও ২খানি করিয়া মৃদঙ্গ নিযুক্ত থাকিল। প্রথম সম্প্রদায়ে স্বরূপ মূল গায়ক, দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত ও গোবিন্দানন্দ গায়ক, এবং অদ্বৈত নর্ত্তক নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় দল শ্রীবাস প্রমুখ; গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান, শুভানন্দ, ও শ্রীরাম পণ্ডিত গায়ক ও নিত্যানন্দ নর্ত্তক হইলেন। তৃতীয় দলে মুকুন্দ গায়ক; বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত ও বল্লভ সেন গায়ক ও হরিদাস ঠাকুর নর্ত্তক হইলেন। চতুর্থ দলে গোবিন্দ ঘোষ মূল গায়ক, অন্য হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ গায়ক এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিত নর্ত্তক। ইহা ছাড়া কুলীন গ্রামের সত্যরাজ রামানন্দের এক দল, অদ্বৈত পুত্র অচ্যুতানন্দের আর এক দল এবং শ্রীখণ্ডের নরহরি, রঘুনন্দনের তৃতীয় দলও গাইতে লাগিল। রথাগ্রে চারি সম্প্রদায়, দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায় ও রথের পশ্চাতে এক সম্প্রদায় মহোল্লাসে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং এই সাত স্থানেই চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাতে সাত সম্প্রদায়ের ভক্তগণই মনে করিতে লাগিলেন, 'প্রভু বুঝি আমাদের দলের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছেন'। প্রতাপ রুদ্র কীর্ত্তনের প্রেমোল্লাস দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। কাশীমিশ্র ও সার্ব্বভৌম রাজাকে বলিলেন 'মহারাজ! আপনার ভাগ্যের সীমা নাই।" এইরূপে রথ কতক্ষণ চলিলে শ্রীচৈতন্য, স্বরূপ প্রভৃতি প্রধান২ দশজন গায়ককে সম্প্রদায় সমূহ হইতে পৃথক করিয়া লইয়া তাহাদের সঙ্গে আপনি "সেই তো পরাণনাথকে পাইনু; যাঁর লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু" এই ধুয়া ধরিয়া গাইতে লাগিলেন। এবং উর্দ্ধমুখে প্রেমপূর্ণ নেত্রে 'জয়তি জন নিবাসঃ' ইত্যাদি শ্লোকাবৃত্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। নাচিতে, গাইতে, স্তব পাঠ করিতে২ গৌরের মহাভাবের উদয় হইল। স্বেদ, কম্প, পুলকাশ্রুতে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া জজ, গগ,

গদ্‌গদভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। রথ ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। হঠাৎ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্য শ্লোক পড়িলেন;—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈত্রক্ষপা, স্তে চোন্মীল্লিত মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলা, সা চৈবাস্মি তথাপি সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ, রেবা রোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠাতে।"

"এই শ্লোক সামান্য নায়ক নায়িকা সম্বন্ধীয় আদিরসের হইলেও, স্বরূপ ব্যতীত মহাপ্রভুর মনের গভীরভাব উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর কেহই বুঝিতে পারিল না। স্বরূপ বুঝিলেন যে, জগন্নাথের রথযাত্রার রাজকীয় সমারোহ দর্শনে প্রভুর মনে শ্রীবৃন্দাবনের অকৃত্রিম সরলতাপূর্ণ গোপীদিগের শুদ্ধ মাধুর্য্যপ্রেমের সহিত মথুরার রাজপাঠের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বৈভব ভাবের অসৌসাদৃশ্য যুগপৎ উদিত হইয়া হৃদয়ে ব্যথা দিতেছে। গৌরের তাৎকালিকের রথাগ্রে নর্ত্তনের ভাব শ্রীরূপ গোস্বামী এই কয়টী কথায় সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। 'যিনি প্রভূত প্রেমতরঙ্গে ভাসমান হইয়া নীলাচলপতির রথাগ্রে মহোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িতেন, এবং যাহাকে বেষ্টন করিয়া বৈষ্ণবগণ 'মহানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করিত, সেই চৈতন্যদেব আর কি আমার নয়নগোচর হইবেন।''

এই সকল ভাবাবেশে বিভোর হইয়া শ্রীচৈতন্য বারম্বার ভূমিতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দাদি তাঁহার দেহ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। একবার এইরূপ পড়িয়া গেলে ও নিত্যানন্দাদি কীর্ত্তনানন্দে একটু অন্যমনস্ক থাকিলে রাজা প্রতাপরুদ্র সম্ভ্রমে যাইয়া দুইহস্তে বেষ্টন করিয়া মহাপ্রভুকে তুলিয়া নিজের বহুদিনের মনোসাধ পরিপূর্ণ করিলেন। গৌরচন্দ্রও বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া রাজাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ছি ছি ধিক্ আমাকে! আমার আজ বিষয়ীস্পর্শ হইল?' রাজা ভয় পাইয়া দূরে গেলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "যে ভয় নাই, আপনি হাড়ীর ন্যায় হীনভাবে রথাগ্রে যে ঝাঁট দিতে দিতে যাইতেছেন, ইহাতে প্রভু আপনার উপর পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণ বিষয়ী সংস্পর্শে ভোগবিলাসী না হইয়া পড়ে, কেবল এই উদ্দেশে তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য ঐরূপ বলিলেন।'' রাজা তাহাতে আশ্বস্ত হইলেন। এইসব গোলযোগে রথ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। গৌড়গণ বিধিমত বলপ্রয়োগ ও বেষ্টন করিয়াও চালাইতে পারিল না। কথিত আছে, মহাপ্রভু রথের পশ্চাতে যাইয়া মাথাদিয়া ঠেলিবামাত্র রথ হড় হড় করিয়া চলিতে লাগিল ও অবিলম্বে বলগণ্ডি নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। এইস্থান শ্রীমন্দির ও গুণ্ডিচার প্রায় মধ্যপথে অবস্থিত, ইহার একপার্শ্বে জগন্নাথ বল্লভ নামক সুপ্রশস্ত রাজকীয় পুষ্পোদ্যান ও বামপার্শ্বে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের নিবাসভূমি। এই স্থানের নিকটে জগন্নাথের মাসীরবাড়ী; মাসীর খুদের পিটে না খাইয়া জগন্নাথ গুণ্ডিচায় যান না। বলগণ্ডিতে রথ দাঁড়াইলে পূর্ব্বাপর নিয়মানুসারে বহুবিধ ভোগপ্রদত্ত হইতে লাগিল। রাজার, রাণীর, অমাত্যবর্গের, উৎকলবাসীদিগের এবং সামান্য যাত্রিকদিগের অবস্থোচিত পৃথক্ পৃথক্ ভোগদ্রব্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উৎসর্গ করা হইতে লাগিল। গৌর স্বদলে এতক্ষণ রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন

করিতে ছিলেন ; ভোগদিবার জন্য লোকের অতিশয় ভিড় হওয়ায় উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্যানগৃহের পিঁড়ায় ভাবাবেশে শুইয়া পড়িলেন। পরিশ্রমজন্য শরীরদিয়া দর বিগলিতধারে ঘর্ম্ম পড়িতেছিল। পুষ্পোদ্যানের শীতলবায় সেবায় তিনি সুখানুভব করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও কেহ বৃক্ষতলে, কেহ দূর্ব্বাদলের উপরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপদেশানুসারে মহারাজ প্রতাপরুদ্র সুযোগ বুঝিয়া দীনহীন বৈষ্ণবের বেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং ভক্তগণের অনুমতি লইয়া সাহসে ভর করিয়া শ্রীচৈতন্য যেখানে চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিলেন, সেইখানে যাইয়া তাঁহার পদযুগল ধরিয়া পাদসম্বাহন করিতে এবং সুমিষ্টস্বরে ভাগবতীয় রাসলীলার শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তখন ভাবে বিভোর ; শ্লোক শুনিয়া বড়ই সুখানুভব করিতে লাগিলেন। 'রাজা তবকথামৃতং' শ্লোকটী আবৃত্তি করিবামাত্র তিনি মহানন্দ লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং তুমি আমাকে যে অমূল্যধন দিলে, আমার কি আছে যে তাহার প্রতিদান দিব ? এই আলিঙ্গন লও' বলিয়া নৃপতিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ;—

"তবকথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতঃ কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃনন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।"

ভা। ৩১। ৯।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন 'হে প্রিয়! তোমার কথামৃত সন্তপ্তজনের জীবন, ব্রহ্মজ্ঞদিগের ভোগ্য, শ্রবণমঙ্গল, শান্তিপ্রদ এবং পাপনাশক ; যাঁহারা উহা পান করাইতে পারেন, তাঁহারাই ভূরিদ অর্থাৎ প্রকৃত দাতা।'

প্রতাপরুদ্র বহুদিনের অভীপ্সিত আলিঙ্গন লাভ করিয়া হর্ষে প্রেমে গদগদ হইলেন, তাঁহার চক্ষুঃদিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। মহাপ্রভু ভাবোন্মত্ত, বারম্বার ভূরিদা! ভূরিদা! বলিতে লাগিলেন ; কিন্তু প্রতাপরুদ্রকে চিনিতে পারিলেন না। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে যে আচম্বিতে এখানে আসিয়া আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইলে ? ছদ্মবেশী রাজা উত্তর দিলেন, 'আমি তোমার দাসের দাস হইতে চাই।' কথিত আছে, প্রভু ঐশ্বর্য্য দেখাইলে রাজা কৃতার্থ হইয়া বিদায় হইলেন এবং ভক্তগণকে বন্দনা করিয়া উদ্যানের বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে রাজাজ্ঞায় বাণীন বলগণ্ডি ভোগের নানাপ্রকার ফল মিষ্টান্নাদি বহুতর প্রসাদ আনিয়া উদ্য করিয়া ফেলিলেন। মহাপ্রভু মধ্যা পনান্তে ভক্তগণ সহ আনন্দে প্রসাদ করিলেন। তাঁহাদের ভোজন বহুতর প্রসাদ উদ্বৃত্ত হইল দেখি গরিব, দুঃখী, অন্ধ, আতুরদিগকে ভোজ করাইতে অনুমতি দিলেন। প্রায় হাজার লোক হরিধ্বনি দিয়া ভোজন করিল দেখিয়া প্রভু বড় প্রীত হইলেন এবং তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন।

অপরাহ্ণ সময়ে গুণ্ডিচা মন্দিরে রথ আসিলে বিগ্রহদিগকে পট্টডুরি দিয়া মন্দিরে অবতরণ করান হইলে। শ্রীচৈতন্য দলসহ পূর্ব্ববৎ রথের আগে আগে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে গুণ্ডিচায় আসিলেন।

এবং যে নয়দিন জগন্নাথ গুণ্ডিচায় থাকিলেন, তিনিও সেই নয় দিন ভক্তগণ সঙ্গে সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ নীলাচলের রাজা, রাজসেবায় থাকিতে ভাল না লাগিলে বৎসরান্তে একবার রথে চড়িয়া বনবিহারে বহির্গত হয়েন। ইহারই নাম রথমহোৎসব। এই বনবিহারের ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা স্মৃতিপথে উদিত হইলে শ্রীচৈতন্যের প্রেমানন্দ উথলিয়া উঠিল। এই নয়দিন তিনি কেবলই বৃন্দাবন ভাবে ডুবিয়া থাকিলেন। যাহা হউক, নৃত্য কীর্ত্তন সমাধান্তে সে দিনকার মত তিনি আইটোটায় যাইয়া সবান্ধবে বিশ্রাম করিলেন। এই নবদিনে বৈষ্ণবদলের মধ্যে মহামহোৎসব লাগিয়াগেল। মুখ্য মুখ্য নয়জন ভক্ত প্রভুকে এক একদিন করিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান ও জলকেলি, তৎপরে সবান্ধবে নানাউদ্যানে ও বনে ভ্রমণ, মধ্যাহ্নে আইটোটা পল্লিতে বন্ধুদিগের গৃহে নিমন্ত্রণ ভোজনে, সায়াহ্নে গুণ্ডিচা মন্দিরে নৃত্য, সংকীর্ত্তনে এবং রজনীতে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে একত্রে শয়ন ও কৌতুকে এই কয়দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কোন দিন ইন্দ্রদ্যুম্নে, কোন দিন বা নরেন্দ্র নামক বৃহৎ দীর্ঘীতে জলকেলি হইতে লাগিল। সকলে মিলিয়া বৃহৎ এক মণ্ডলাকারে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মণ্ডলাকারে পরস্পরের প্রতি জল ফেলা-ফেলি, কখন বা জলমণ্ডুকদিগের ডাকের সহিত করবাদ্য ও কখন দুই দুইজনে জলযুদ্ধ, এইরূপ বাল্যক্রীড়া হইতে লাগিল। অদ্বৈতে নিত্যানন্দে, বিদ্যানিধি স্বরূপে, মুরারি গুপ্তে মুকুন্দ দত্তে, শ্রীবাস পণ্ডিত গদাধরে, রাঘব পণ্ডিত বক্রেশ্বরে এবং সার্ব্বভৌম রামানন্দে জলযুদ্ধ হইল। গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সকলে শিশুর ন্যায় খেলা করিতে ও বিবাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য ঈষৎ হাসিয়া গোপীনাথকে বলিলেন, 'দেখ! আর সকলের যা'হোক, সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ মহাগম্ভীর পণ্ডিত ও পদস্থ লোক হইয়া বালকের ন্যায় চঞ্চলতা করিতেছেন, তুমি উঁহাদের নিষেধ করনা কেন? গোপীনাথ উত্তর করিলেন, 'তোমার কৃপা একবিন্দু উচ্ছ্বসিত হইলে মেরুমন্দার প্রভৃতি পর্ব্বত ডুবিয়া যায়, তা এ দুই খণ্ড শৈলের কি কথা?' আর সার্ব্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'শুক্নো তর্কের খইল খেয়ে মরছিলেন, এখন লীলামৃত পেয়েছেন, তাই পেট্‌ভরে খাচ্ছেন।' তখন গৌর অদ্বৈতকে ডাকিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে উঠিলেন। আচার্য্য গৌরকে পৃষ্ঠে করিয়া সাঁতার দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভক্তগণ বলিলেন, প্রভু শেষশায়ী লীলা করিতেছেন।

জলক্রীড়ান্তে শ্রীচৈতন্য সেদিন পুরীভারতীকে লইয়া অদ্বৈতের বাঁসায় নিমন্ত্রণ খাইলেন। ভক্তগণ প্রসাদ ভোজন করিলেন। সন্ধ্যায় গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল এবং কীর্ত্তনান্তে গৌরচন্দ্র এক একদিন এক এক ভক্তকে নাচাইতে লাগিলেন। যেদিনে নিজে গান করিয়াছিলেন ও বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচিয়াছিলেন, সেদিন্‌কার দৃশ্যে সকলে দিশাহারা, জ্ঞানহারা হইয়া প্রেমে উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছিল। বৃন্দাবন লীলার অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্য রজনীযোগে উদ্যানে উদ্যানে প্রতি বৃক্ষতলায় মনের সুখে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই নৃত্যের সময় বাসুদেব দত্ত

ভিন্ন আর কেহ গাইতে পাইত না। স্বরূপ মৃদঙ্গ বাজাইতেন।

রথোৎসবের পঞ্চমী তিথিতে হোরা-পঞ্চমী নামে জগন্নাথ মন্দিরে এক কৌতুক-জনক উৎসব হইয়া থাকে। রাজা প্রতাপ-রুদ্র কাশীমিশ্রকে ডাকিয়া এবারে সেই উৎসব খুব জাঁকজমকের সহিত করিতে ও শ্রীচৈতন্যকে উহা দেখাইয়া সুখী করিতে আদেশ করিলেন। নিরূপিত দিনে শ্রীমন্দির লোকে লোকারণ্য, নানা বাদ্যোদ্যম হইতেছে, এমন সময়ে মিশ্র মহাশয় ভক্তগণ পরিবৃত গৌরচন্দ্রকে আইটোটা হইতে ডাকিয়া আনিয়া উত্তম স্থানে বসাইলেন। জগন্নাথের প্রেয়সী লক্ষ্মী-বিগ্রহ শ্রী-মন্দিরে আছেন। জগন্নাথ বনবিহারে গিয়াছেন, লক্ষ্মীকে লইয়া যান নাই। লক্ষ্মী বিরহ-বিধুরা হইয়া যে পাণ্ডাগণ জগন্নাথকে বনবিহারে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্য স্বীয় দাসী-দিগকে হুকুম দিলেন। দাসীগণ পাণ্ডা-দিগকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিয়া কটূক্তি করিতে লাগিল। পাণ্ডাগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া অঙ্গীকার করিল যে, অতি শীঘ্র জগন্নাথকে আনিয়া দিবে। লক্ষ্মীঠাকুরাণী তখন তাহাদের মুক্তি দিয়া দেবদাসীদিগের সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। লক্ষ্মী-বিগ্রহকে নানা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া দেবদাসীগণে পরিবৃত করাইয়া জাঁকজমক ও বাদ্যকোলাহলের মধ্যে বাহিরে আনিয়া উৎসবে এই রঙ্গ অভিনীত হইল। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তগণ দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন। যত কেন ক্ষুদ্র বিষয় হউক না, মহানুভব ব্যক্তিগণ তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ না করিয়া ছাড়েন না। তাই রসিকচূড়ামণি গৌরচন্দ্র এই ছেলেখেলার ন্যায় কৌতুকজনক ব্যাপার দেখিয়া স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জগন্নাথ সুন্দরাচলে বনবিহারে গিয়াছেন, লক্ষ্মীকে সঙ্গে লন নাই কেন?' স্বরূপ উত্তর করিলেন, 'জগন্নাথের বনবিহার কৃষ্ণের ব্রজলীলা বই ত নয়! ব্রজলীলায় গোপী ভিন্ন লক্ষ্মীর অধিকার নাই। লক্ষ্মীকে সেই জন্য লইয়া যাওয়া হয় নাই।'

শ্রীচৈতন্য। কিন্তু এ বনবিহারে ভ্রাতা বলদেব, ভগিনী সুভদ্রা সঙ্গে গিয়াছেন; গোপীদিগের সহিত ব্রজবিহার গুপ্তলীলা; তাহা ত প্রকট হইতে পারে না। তবে লক্ষ্মীর এত রাগ কেন?

স্বরূপ। প্রেমবতী কান্তার স্বভাবই এই যে, স্বামীর ঔদাস্যভাবে রাগ উপস্থিত হয়। কথায় কথায় ব্রজদেবীদিগের মানের কথা উঠিয়া পড়িলে স্বরূপ দামোদর ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা, মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা প্রভৃতি নায়িকা লক্ষণ বিবৃত করিয়া শ্রীরাধিকার বাম্য, কৌটিল্য, কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, হর্ষ, সঞ্চারি, বিলাস, প্রভৃতি মহাভাবের উপাদানগুলি বর্ণনা করিলেন। মহাপ্রভু প্রেমে উন্মত্ত হইয়া 'বোল বোল' বলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত কৌতুক করিয়া স্বরূপকে বলিলেন, 'দেখ, আমার লক্ষ্মীর কত ঐশ্বর্য্য! তোমার ঠাকুর রাজ-ভোগ ছেড়ে বৃন্দাবনের ফল ফুল লইতে ও গোয়ালাবাড়ী দই দুধ খেতে গিয়া কি অন্যায় কর্ম্মই করিয়াছেন?' শ্রীবাসের পরিহাস শুনিয়া ভক্তগণ হাসিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'পণ্ডিত! আপনার নারদ-স্বভাব, তাই বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য আপনার এত ভাল লাগে। কিন্তু স্বরূপ শুদ্ধ ব্রজবাসী;

বৃন্দাবনের মাধুর্য্যময় বিশুদ্ধ সম্পদ্ ভিন্ন ঐশ্বর্য্যসুখ ইহার ভাল লাগিবে কেন'?' দামোদর তখন প্রগল্‌ভতা সহকারে ব্রহ্ম-সংহিতার শ্লোকাবৃত্তি করিয়া বলিলেন 'শুন শ্রীবাস! মাধুর্য্যপূর্ণ চিন্ময় বৃন্দাবনধামের অলৌকিক কথা!! এখানকার একমাত্র রাজা পরমপুরুষ ভগবান্; কত শত শোভাময়ী লক্ষ্মী এখানকার কান্তাগণ; ইহার ভূমি চিন্তামণি; গৃহাদি দাসদাসীগণও চিন্তামণি-ময়; কল্পপাদপই বন; ভগবৎ সেবাবাসনাই কামধেনু; এখানকার অধিবাসীরা ভগব-দিচ্ছা পালন ও ভগবৎ সেবা ভিন্ন অন্য ধনের প্রয়াসী নহে; এখানে ভগবদ্‌বাণী-রূপা বংশীই প্রিয়সখীর ন্যায় উপদেশ দেয়; প্রেমামৃতই এখানকার জল, কণ্ঠধ্বনিই মধুর সঙ্গীত এবং সহজগমনই নৃত্য। এক চিদানন্দ জ্যোতিঃ এখানে চিরবিরাজিত।' শ্রীবাস এই কথা শুনিয়া আনন্দে বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিলেন, শ্রীচৈতন্য প্রেমভরে 'বোল বোল' বলিতে লাগিলেন, চারি সম্প্রদায় তখন মৃদঙ্গ করতাল যোগে সংকীর্ত্তন জুড়িয়া দিলে গৌর নাচিতে লাগিলেন। লোক সকল মুগ্ধ হইয়া গেল। বেলা তৃতীয় প্রহরে নৃত্যকীর্ত্তন থামিলে গৌরচন্দ্র নরেন্দ্রে স্নান করিয়া উদ্যানে যাইয়া বন্ধুগণ সহ বনভোজন করিলেন।

এইরূপে আনন্দ আহ্লাদে, ভাবে, প্রেমে আট দিন গত হইলে নিরূপিত সময়ে জগ-ন্নাথের ভিতর-বিজয় অর্থাৎ মন্দিরে প্রত্যা-গমন হইল। গৌরচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় রথাগ্রে কীর্ত্তন করিতে করিতে গুণ্ডিচা হইতে নীলাচলে আসিলেন। যে সকল পট্টডুরী দ্বারা জগন্নাথকে বাঁধিয়া রথ হইতে অব-তরণ করান হইল, জগন্নাথের ভরে তাহা ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া শ্রীচৈতন্য একগাছি ডুরী লইয়া কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খাঁনকে দেখাইয়া আদেশ করি-লেন, 'প্রতি বর্ষে দেশ হইতে এই আদর্শে খুব মজবুত করিয়া ডুরী নির্ম্মাণ করিয়া আনিয়া মহোৎসবে প্রদান করিবে। এই ডুরীতে অনন্তরূপী শেষ অধিষ্ঠিত জানিয়া ভক্তির সহিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।' সেই অবধি কুলীনগ্রামী ভক্তের পট্টডুরী যোগান ব্রতের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেল।

রথোৎসবের গোলমাল চুকিয়া গেলে বঙ্গের ভক্তগণ গৌরচন্দ্রকে এক এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব বাঁসায় ভোজন করা-ইতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের নিমন্ত্রণের ঘটাই কিছু অধিক মাত্রায় হইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়াও আচার্য্যের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ হইলে তাঁহার সঙ্গে পুরী ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ গমন করিতেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন যে, অনেক সময়ে তাঁহার আহার হইত না। তাহাতে নিমন্ত্রণ-কারী ব্যক্তি মনে মনে বড় অসুখী হইতেন। এক দিন অদ্বৈত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'আজ যদি কোন গতিকে সন্ন্যাসীগণের আসা না হয়, তাহা হইলে মনের সাধে প্রভুকে ভোজন করাই।' মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইলে গৌর-চন্দ্র একাকী অদ্বৈতের বাঁসায় উপনীত হইলেন। আর আর ভক্তগণ স্নানাদি করিতে তখন সমুদ্রে গিয়াছিলেন। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা আসিয়া জুটিতে পারিলেন না। তখন অদ্বৈত আচার্য্য অভীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া মহা

মন্দে ইন্দ্রের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন, ও অশেষ প্রকারে গৌরকে ভোজন করাইলেন। সেদিন নাকি গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের পাক করা সমস্ত দ্রব্য খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এক দিন অদ্বৈতাচার্য্য পুষ্পচন্দন লইয়া গৌরের বাঁসায় গিয়া তাঁহাকে পূজা করিলে গৌরচন্দ্র সেই কুসুমাদি কাড়িয়া লইয়া নাকি 'যোঽসি সোঽসি নমোস্তুতে' মন্ত্র পড়িয়া আচার্য্যের পূজা করিয়াছিলেন। আর এক সময়ে শ্রীচৈতন্য নিজ বাঁসায় অদ্বৈতের সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'আচার্য্য! কোথা হইতে আসিতেছেন?' অদ্বৈত উত্তর করিলেন, 'জগন্নাথদর্শন করিয়া।'

শ্রীচৈতন্য। কহ ত কিরূপে জগন্নাথ দেখিলে?

অদ্বৈত। কেন, দর্শনান্তে প্রদক্ষিণ করিলাম;

গৌর হাসিয়া বলিলেন, তোমার হার।

অদ্বৈত। কেন?

গৌর। আমি অমন করিয়া ঠাকুর দর্শন করি না। প্রদক্ষিণ করিতে যতক্ষণ ঠাকুরের দিকে পৃষ্ঠ দিতে হয়, ততক্ষণ তো দর্শন হয় না। আমি কেবল অনিমিষ নয়নে মুখপানে তাকাইয়া থাকি।

অদ্বৈত। একথার অধিকারী তোমাভিন্ন জগতে আর কেহ নাই। তা আমি কেন! এবিষয়ে তোমার নিকট সকলেরই হার মানিতে হয়। গৌরচন্দ্র কৌতুক করিয়া ছিলেন। অদ্বৈতের উত্তর শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বঙ্গের ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া জগন্নাথের নানা মহোৎসবে প্রভুসঙ্গে নানা লীলা করিতে লাগিলেন। জন্মাষ্টমীদিনে শ্রীচৈতন্য ভক্তগণ সহ গোপবেশ ধারণ করিয়া দধি-দুগ্ধের ভার স্কন্ধে লইয়া মহোৎসবের স্থানে আসিয়া নাচিতে লাগিলেন, কানাই খুঁটিয়া নন্দ ও জগন্নাথ মাহাতি যশোদা সাজিলেন। রাজা প্রতাপ রুদ্র, সার্ব্বভৌমাদিও দধি হরিদ্রার জলে অভিষিক্ত হইয়া মহোৎসবে যোগ দিলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুকে বলিলেন 'কেমন গোয়ালা দেখিব, লগুড় ফিরাও দেখি!' শ্রীচৈতন্য এক বৃহৎ লগুড় হাতে লইয়া নানারূপে কৌশলে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভাঁজিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিলেন। বিজয়া দশমীদিনে লঙ্কাবিজয় স্মরণ করিয়া মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া আপনি হনুমান সাজিলেন ও হনুমান ভাবে আবিষ্ট হইয়া বৃহৎ এক বৃক্ষশাখা স্কন্ধে লইয়া লঙ্কার গড়ে যেন ফেলিয়া গড় ভাঙ্গিতেছেন মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কাঁহা রে রাবণা! আরে পাপী জগন্মাতা সীতাকে হরণ করিয়াছিস্। আর কি তোর রক্ষা আছে? সবংশে মারিয়া ফেলিব'। দর্শকগণ প্রভুর ভাবাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া জয় জয় রবে গগণ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। দীপান্বিতা, রাসযাত্রা ও উত্থানদ্বাদশী দিনেও এইরূপ নানা আমোদ কৌতুকের সহিত মহোৎসব হইল। যাঁহারা ধর্ম্ম সাধনকে শুষ্ক কঠোর ব্যাপার মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা গৌরের এইসব লীলা কৌতুক দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে পান, ভোজন, শয়নাদি নিত্যকর্ম্মের মধ্যে, আমোদ, আহ্লাদ, কৌতুক, মহোৎসবের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের যোগ রাখিতে পারিলে ঈশ্বর আরাধনা কেমন সুখময় হইয়া উঠে, জীবনযাত্রা

কেমন আনন্দ সম্ভোগের ব্যাপার হইয়া যায়।

বঙ্গীয় ভক্তগণের স্বদেশযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে গৌরচন্দ্র একদিন নিত্যানন্দকে নিভৃতস্থানে ডাকিয়া সমস্তদিন গুপ্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণার বিষয় কি ছিল, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী আচরণের দ্বারা ভক্তগণ তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। বিদায়ের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে শ্রীচৈতন্য সমস্ত ভক্তগণকে একত্রিত করিলেন এবং নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন 'তুমি এখন গৌড়দেশে গমন করিয়া অনর্গল হরিনাম প্রচার করগে ও প্রেমভক্তি বিলাওগে। তোমার কার্য্যের সাহায্য জন্য রামদাস, গদাধর, বাসুদেব দত্তকে নিযুক্ত করিয়া দিলাম।' নিত্যানন্দের পরবর্ত্তী জীবনে দেখা যাইবে, ইহার পর তিনি দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ বৈষ্ণবরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তবে কি শ্রীচৈতন্যের গুপ্ত মন্ত্রণার বিষয় ইহাই ছিল যে, তিনি নিতাইকে বিবাহ করিয়া বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতে বলিয়াছিলেন? কিন্তু যিনি আকুমার বিরক্ত সন্ন্যাসী, যিনি এতদিন গৌরের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ফিরিতেছিলেন, তাঁহাকে এরূপ আদেশ কেন দেওয়া হইল? গৌরের মনের গভীরভাব কি ছিল? তাহা কে বলিবে? অদ্বৈতকে গৌরচন্দ্র সম্মানপুরঃসর বলিলেন "প্রতিবৎসর ভক্তগণকে নীলাচলে আনিয়া গুণ্ডিচা মহোৎসব দেখাইবেন এবং চাতুর্ম্মাস্য আমার সহিত অবস্থিতি করিয়া আমাকে সুখী করিবেন। এক্ষণে দেশে ফিরিয়া যাউন এবং আচণ্ডালে হরিনাম ও হরিভক্তি দিয়া দেশ পবিত্র করুন, জন্ম সফল করুন।" শ্রীবাস পণ্ডিতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৌর বলিলেন 'তোমার অঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব। কেবল তাহা তুমি দেখিবে, আর কেহ দেখিতে পাইবে না। আমার মাকে এই বস্ত্রখানি ও মহাপ্রসাদগুলি দিয়া আমার দণ্ডবৎ প্রণাম বলিবে ও আমার অপরাধ সকল ক্ষমা করিতে বলিবে। আমি দুর্ম্মতির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সেবা ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিয়াছি। তাঁর সেবা আমার পরমধর্ম্ম; তাহা ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হওয়ায় আমার ধর্ম্ম হওয়া দূরে থাকুক্, নিজধর্ম্ম নাশ করিয়াছি। বাতুল না হ'লে কি আর এমন কর্ম্ম কেহ করে? মাকে বলো, বাতুল পুত্রের অপরাধ যেন ক্ষমা করেন। সংসারের মধ্যে প্রেমের ন্যায় আর কি ধন আছে? সেই মাতৃ-প্রেম ছেড়ে আমি সন্ন্যাস লইয়া কি করিব? মা'কে বলো আমি তাঁর আজ্ঞাতেই নীলাচলে আছি; এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার চরণ দর্শনে যাইব। আর আমি নিত্যই তাঁর কাছে যাই, তিনি স্ফূর্ত্তি বিবেচনায় তাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারেন না। কোনদিন তিনি উত্তম অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া—নিমাইর প্রিয় এসব তরকারী; বাছা আমার ঘরে নাই, কে ইহা খাইবে, বলিয়া কতই কাঁদিয়া ছিলেন। আমি তখনই তাহা জানিতে পারিয়া গিয়া ভোজন করিয়াছিলাম। মা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শূন্যপাত্র দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া মনে করিলেন 'আমি কি তবে বাড়িতে ভুলিয়া গিয়াছি,' আশঙ্কায় পাকপাত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, ঐসব পাত্রে অন্নব্যঞ্জন পূর্ণ রহিয়াছে। মনভ্রান্তি হইয়াছিল মনে করিয়া তিনি আবার অন্নাদি বাড়িয়া আমার

উদ্দেশে সমর্পন করিলেন। বিগত বিজয়া দশমীদিনে এইরূপ হইয়াগিয়াছে। মাকে এইসব কথা বলিয়া তাঁহার প্রতীতি করাইয়া দিও যে, আমি সর্ব্বদা তাঁহার সন্নিকটেই আছি।' গৌরচন্দ্র এই কথা বলিতে বলিতে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু বন্ধুদিগকে তাহা বুঝিতে না দিয়া অন্যান্য ভক্তগণকে মিষ্টালাপে বিদায়দিতে লাগিলেন। রাঘব পণ্ডিতের সরল বিশ্বাস ও সেবার আয়োজনের নিষ্ঠাভক্তি বর্ণন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শিবানন্দ সেনকে গৌরচন্দ্র বলিলেন 'প্রতিবর্ষে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া তুমি পথে প্রতিপালন করিয়া আনিবে। তুমি ইঁহাদের প্রতিপালক হইলে। আর তোমার গ্রামবাসী বাসুদেব দত্তের আয় ব্যয়সম্বন্ধে তোমাকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাসুদেব পরম উদার, যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলেন। গৃহস্থ ব্যক্তির সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য, না করিলে কুটুম্বাদি প্রতিপালিত হয় না। ইঁহার আয় ব্যয় তোমার অজ্ঞাত নাই। তুমি ইঁহার সরখেল হইয়া সব সমাধান করিয়া দিও।' কুলীনগ্রামী সত্যরাজকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিলেন 'প্রতিবর্ষে পট্টডুরী লইয়া আসিবে, গুণরাজ খাঁ বলিয়াছিলেন 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'; সেই এককথায় তোমাদের বংশের নিকট আমি চিরবিক্রীত হইয়া আছি। তোমাদের ত কথাই নাই, তোমার গ্রামের কুকুর পর্য্যন্ত আমার যেমন প্রিয়, এমন আর কেহই নয়। সত্যরাজ বলিলেন 'আমি গৃহস্থ বিষয়ী; সাধন ভজন কিছুই জানি না। আমার এখন কর্ত্তব্য কি? যদি শ্রীমুখে কিছু উপদেশ দেন, তবে কৃতার্থ হই। শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'নিরন্তর হরিনাম সংকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণসেবা ও বৈষ্ণব সেবন করা তোমার কর্ত্তব্য। সত্যরাজ বলিলেন 'বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে?'

শ্রীচৈতন্য। যাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিলে মুখে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি পায়; তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিয়া তাঁহার সম্মান করিবে। এইরূপ নাম স্ফুরণ হইলে সংসারাসক্তি ছুটিয়া যাইবে, চিত্ত দ্রবীভূত হইবে এবং নববিধ ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। পরে শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ দাস, নরহরি ও রঘুনন্দনের দিকে তাকাইয়া প্রভু বলিলেন 'মুকুন্দ! রঘুনন্দন তোমার পুত্র না তুমি তাঁহার পুত্র? মুকুন্দ উত্তর করিলেন "রঘুই আমার পিতা, আমি তাহার পুত্র। কেননা আমাদের কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হইতে।" শ্রীচৈতন্য এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন 'ঠিক্ বলিয়াছ; যাঁহা হইতে ভক্তিলাভ হয়, তিনিই গুরু।' তখন গৌরচন্দ্র সর্ব্বজন সমক্ষে মুকুন্দের গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ইঁহার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে নির্ম্মল নিগূঢ় প্রেম দেখা যায় না। ইনি ম্লেচ্ছরাজের রাজবৈদ্য। এক দিন উচ্চ টুঙ্গিতে বসিয়া রাজা ইঁহার সঙ্গে চিকিৎসা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা করিতেছিলেন। শিখিপুচ্ছের আড়ানি দ্বারা সেবক রাজাকে ব্যজন করিতেছিল। শিখিপুচ্ছ দেখিয়া মুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হওয়ায় ইনি প্রেমে অজ্ঞান হইয়া টুঙ্গি হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া লোক দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বড় বেদনা হইয়াছে কি?' ইনি বলিলেন, না। রাজা পুনরায় সুধাইলেন, 'এমন হইল কেন?' মুকুন্দ আসল কথা লুকাইয়া বলিলেন, 'আমার

মৃগীব্যাধি আছে।' কিন্তু রাজা বুদ্ধিমান্; ভিতরকার কথা বুঝিতে পারিয়া ইহাকে মহাসিদ্ধ জ্ঞান করিলেন। মুকুন্দকে গৌর বলিলেন, 'তুমি ধন উপার্জ্জনে ক্ষান্ত হইও না; রঘুনন্দন কৃষ্ণসেবা করিবেন, ও নরহরি আমার ভক্তগণ সঙ্গে থাকিবেন। সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতিকে একত্র দেখিয়া গৌর বলিলেন, 'সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ দারুব্রহ্মরূপে ও ভাগীরথী জলব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সার্ব্বভৌম দারুব্রহ্মের ও বাচস্পতি জলব্রহ্মের সেবা করিতেছেন। মুরারি গুপ্তকে উদ্দেশ করিয়া প্রভু বলিলেন,'ইনি রামচন্দ্রের একান্ত উপাসক; কিন্তু আমি এক সময়ে ইঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের গুণগরিমা কীর্ত্তন করিয়া ইহার মন ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। ইনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমার আজ্ঞাকারী, যাহা বলিবে তাহাই করিব।' কিন্তু রাত্রিকালে চিন্তা করিয়া প্রাতে কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিলেন, যে, 'রামচন্দ্রের পদে আমি মাথা বেচিয়াছি,কোন্ প্রাণে তাঁহাকে ছাড়িব? তা পার্‌বো না।' এই বলিয়া ইনি বিহ্বল হইলেন। তখন আমি বলিলাম, 'সাধু! সাধু!! এইরূপ বিশ্বাস চাই, নইলে কি ধর্ম্ম লাভ হয়? তুমি কেন রামচন্দ্রকে ছাড়িবে? আমি তোমার বিশ্বাস পরীক্ষার জন্য কেবল কৌতুক করিয়াছিলাম।' এই বলিয়া গৌর মুরারিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'তুমি আমার প্রাণসম।' গৌরচন্দ্র বাসুদেব দত্তের গুণের অনেক প্রশংসা করিলে দত্ত নিজ গুণ শুনিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'প্রভু! তোমার চরণে আমার এক নিবেদন আছে, জগতে জীবের দুঃখ আর দেখিতে পারি না! হরিবিমুখ জনের পাপক্লেশ দেখিয়া আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। আমার এই প্রার্থনা যে, তাহাদের সকল পাপ আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দাও, তাহারা নিষ্পাপ হইয়া উদ্ধার হইয়া যাউক্। আমি তাহাদের হইয়া নরকযন্ত্রণা ভুগিব।' গৌরচন্দ্র বাসুদেবের ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন এবং সকরুণ বচনে বলিতে লাগিলেন, 'তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের শক্তি ধর, ভগবান্ ভক্তাধীন! তুমি যখন এই প্রার্থনা করিলে, তখন অবশ্যই সকল জীব উদ্ধার হইয়া যাইবে। তোমাকে তিনি কেন নরকভোগ করাইবেন? ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, তিনি কি ভক্তের কাতর প্রার্থনায় ব্রহ্মাণ্ডের জীবকে উদ্ধার করিতে পারেন না? আর অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লীলা, একটী ব্রহ্মাণ্ডের জীব উদ্ধার হইলে কি সৃষ্টি লীলার কিছু হানি হইতে পারে? আর আর ভক্তগণকেও শ্রীচৈতন্য এইরূপে একে একে আলিঙ্গন প্রেমালাপ করিয়া বর্ষান্তে আসিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় দিলেন। ভক্তগণ বিষণ্ণচিত্তে দলবদ্ধ হইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হরিদাস ঠাকুর, গদাধর পণ্ডিত, পুরী, ভারতী, স্বরূপ, জগদানন্দ, দামোদর, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর এবং উৎকলের ভক্তগণ কেবল প্রভুর নিকট থাকিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে যমেশ্বর টোটায় থাকিবার অনুমতি হইলে তিনি সেইখানে বাস করিলেন এবং গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়া সাধন ভজন করিতে লাগিলেন।

একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'এখন গৌড়ের ভক্তগণ চলিয়া গেলেন, তোমারও নিমন্ত্রণের অবসর

হইল। আমার গৃহে যদি মাসাবধি ভিক্ষা কর, তবে বড় সুখী হই।

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন ‘এক স্থানে অধিক দিন ভোজনে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হানি হয়। তোমার গৃহে এক মাসের নিমন্ত্রণ লইতে পারি না।

সার্ব্বভৌম। তবে বিশ দিনের লও।

শ্রীচৈতন্য। তাও পারি না।

সা। তবে ১৫ দিনের।

গৌর। না! তোমার বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ লইতে পারি। সার্ব্বভৌম অনেক মিনতি করিয়া ৫ দিনের জন্য সম্মত করাইলেন এবং পুরী গোঁসাইকে আর পাঁচদিনের ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগকে দুই দুই দিনের নিমন্ত্রণ করিয়া এক মাস পূর্ণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, এক দিনে অধিক লোককে বলিলে ভাল করিয়া সেবা করিতে পারিব না, সেবাপরাধ হইবে। অতএব এক দিন এক এক জনকে ভোজন করাইয়া ক্রমে এক মাসে ব্রত উদ্যাপন করিব। যাহা হউক, ভট্টাচার্য্য সে দিন শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আসিয়া পাকের আয়োজন করিলেন। ভট্টাচার্য্যের এক কন্যা ছিল, তাহাকে ষাঠি বলিয়া ডাকিত। ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী ষাঠির মাতা দুই প্রহরের মধ্যে বিবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদির সহিত অন্ন প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। পাকশালার দক্ষিণ দিকে দুই খানি নূতন ঘর ছিল। এক খানি শালগ্রাম বিগ্রহের ভোগ মন্দির, আর একখানি শ্রীচৈতন্যের ভোজনের জন্য নিভৃত স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার বাহির দিকে একটী দুয়ার এবং পাকশালার দিকে দ্বিতীয় দ্বার। সেই গৃহে বৃহৎ কদলী পত্রে স্তূপাকারে অন্ন সজ্জিত হইয়া পীতবর্ণ সুগন্ধি গব্যঘৃতে সিক্ত হইল। তাহার চারিদিকে কেয়া-পাতের ডোঙ্গা ও মোচার খোলায় সারি সারি বিবিধ ব্যঞ্জন সজ্জিত হইল। এক শাকই দশ প্রকার, কত তরকারী, ভাজা, দাইল, অম্ল, বড়া, পিষ্টক, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, রম্ভা প্রভৃতি ফল নানা উপচারে খাদ্য সামগ্রী রক্ষিত হইল। বৃহৎ পিঁড়িতে নেত পট্টবস্ত্র মণ্ডিত করিয়া রাখা হইল এবং অন্ন ব্যঞ্জনের উপর তুলসী মুঞ্জরী দেওয়া হইল। শ্রীচৈতন্য অন্ন ব্যঞ্জন দেখিয়া খাইবেন কি প্রেমে বিহ্বল হইলেন এবং ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন, তুমি ধন্য যে এইরূপ অন্ন ব্যঞ্জন শ্রীকৃষ্ণে ভোগ দিয়াছ? এত সল্প সময়ের মধ্যে কেমন করে এত সামগ্রী প্রস্তুত করিলে? যাহা হউক, এত অন্ন খাইতে পারিব না; অল্প কিছু ২ তুলিয়া আমাকে স্বতন্ত্র স্থানে দাও। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, না খাইতে পার, পড়িয়া থাকিবে। ভোজনে বসো।

শ্রীচৈতন্য তাঁহার খাতিরে ভোজনে বসিলেন। বাহির দিকের দুয়ার বন্ধ করা হইল। ভিতর দিকের দুয়ারে ভট্টাচার্য্য বসিয়া প্রভুকে খাওয়াইতে লাগিলেন। অমোঘ ভট্টাচার্য্য নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত ষাঠি কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। সে ভট্টাচার্য্যের গৃহে ঘরজামাই থাকিত। পরনিন্দা করা অমোঘের স্বভাব। সে ভোজন গৃহের নিকট আসিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিল, ‘বাপরে! খাওয়া দেখ। ১০।১২ জনের ভাত সন্ন্যাসীটা একলা খাচ্চে।’ ভট্টাচার্য্য ক্রোধভরে তাহার পানে তাকাইলে সে পলাইয়া গেল। ভট্টাচার্য্য হাতে লাঠি লইয়া তাহাকে মারিবার জন্য পিছে পিছে দৌড়িলেন, কিন্তু তাহাকে ধরিতে

না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়া নানা প্রকারে শাপ শাপান্ত ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। এ দিকে ষাঠির মাতাও ষাঠি বিধবা হউক বলিয়া গালি পাড়িতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের রকম দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, হয়েছে কি যে তোমরা এমন করে উহাকে গালি দিতেছ? অমোঘ তো কিছু অন্যায় বলে নাই। বাস্তবিক অন্ন ব্যঞ্জন তো অধিক পরিমাণে দিয়াছ। এই বলিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে অধিক পরিমাণে ভোজন করিলেন; এবং আচমনান্তে মুখশুদ্ধি লইয়া গমনোদ্যত হইলে ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "হায়! নিন্দা করাইবার জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। আমাদের এ অপরাধ যে অমার্জ্জনীয়।' শ্রীচৈতন্য পতিপত্নীকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া বাঁসায় প্রত্যাগমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহার বাঁসা পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইয়া নানারূপে আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে শান্তনা করিয়া গৃহে পাঠাইলেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে আসিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন "চৈতন্য প্রভুর যে নিন্দা করে, তাহাকে বধ না করিলে অথবা আত্মহত্যা না করিলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কিন্তু ব্রহ্মহত্যা মহাপাতক, তাহা করিব না; তবে ঐ নিন্দুকের আর মুখ দেখিব না। তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম। ষাঠিকে বল যে নিন্দুক ও পতিত পতিকে সে ছাড়ুক।" অমোঘ এ দিকে যে পলাইয়াছে, আর সে রাত্রে বাড়ীতে আসিল না। দৈবাৎ সেই রাত্রিতে অমোঘ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইল। ভট্টাচার্য্য প্রাতঃকালে সে সংবাদ শুনিয়া বলিলেন 'ঈশ্বরাপরাধের ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলিয়াছে। ভালই হইল, দৈব সহায় হয়ে আমার অভীপ্সিত কার্য্য করিয়া দিলেন।' এ দিকে গোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুকে এই সংবাদ দিলে ও ভট্টাচার্য্য সপত্নীক উপবাসী আছেন জানাইলে, শ্রীচৈতন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া অমোঘের নিকট যাইয়া তাহাকে নানারূপে সুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিলেন ও সে নীরোগ হইলে তাহার বুকে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন 'ব্রাহ্মণের হৃদয় সহজেই নির্ম্মল, ভগবানের বসিবার উপযুক্ত আসন। তবে এই পবিত্র স্থানে মাৎসর্য্য চণ্ডালকে বসাইয়া কেন অপবিত্র করিলে? এখন অনুতাপ কর, উঠ! অবশ্যই ভগবান্ তোমায় কৃপা করিবেন।' অমোঘ অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া আপন গালে আপনি চড়াইতে লাগিল ও শ্রীচৈতন্যের চরণে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য প্রসন্ন চিত্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি আমার পরম স্নেহপাত্র। তোমার কি আমি কোন অপরাধ লইতে পারি? আর দুঃখ করিও না। উঠ! নিরন্তর কৃষ্ণনাম লও ও কৃষ্ণ সেবা কর।' ইহার পর গৌরচন্দ্র অমোঘকে সঙ্গে লইয়া সার্ব্বভৌমের নিকটে যাইয়া বলিলেন অমোঘ বালক, আমাদের ছেলে; তার উপর কি রাগ করিয়া উপবাসী থাকিতে আছে? এই দেখ অমোঘ স্বীয় দোষ বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে। ইহাকে গ্রহণ কর। ভগবানের কৃপায় এ ভক্তি লাভ করিয়া পরম বৈষ্ণব হইবে। এইরূপ নানা কথায় শ্বশুর জামাতায় মিলন করাইয়া দিয়া শ্রীচৈতন্য বাঁসায় আসিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেদের ধর্ম্ম প্রণালী।

প্রাচীন আর্য্যদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্ম-প্রণালীর বিবরণ প্রদান না করিলে তাঁহাদের সামাজিক নীতি ও সভ্যতার ইতিহাস নিতান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। অথচ ঋগ্বেদের ধর্ম্মপ্রণালীর কথা সকলেই অবগত আছেন।

প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু আশ্চর্য্যজনক, গম্ভীর, প্রকাণ্ড ও বিস্ময়কর, তাহার উপাসনা করাই যে বৈদিক ধর্ম্ম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে আকাশ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করিয়া রহিয়াছে, যে সৌন্দর্য্যময়ী ও লজ্জাবতী ঊষা সুনিপুনা গৃহিণীর ন্যায় লোকদিগকে জাগরিত করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেয়, যে প্রভান্বিত সূর্য্য পৃথিবীর লোকদিগকে প্রত্যহ প্রাণদান করে, যে বায়ু সমগ্র ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, যে অগ্নি হইতে উত্তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হই, যে ঝটিকা মহাসাহসী ব্যক্তির অন্তরেও ত্রাস জন্মাইয়া পশ্চাৎ বারিবর্ষণ পূর্ব্বক ভূমিকে কৃষিকার্য্যের উপোযোগী করিয়া লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করে, সেই সকল পদার্থকে দেবতাজ্ঞানে প্রাচীন আর্য্যেরা ভক্তি এবং আগ্রহ সহকারে স্তুতি ও পূজা করিতেন। মন্ত্রপ্রণেতা ঋষিরা এত আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে দেবতা বিশেষের স্তব কীর্ত্তন করিতেন যে, তাঁহারা তখন অন্য দেবতার কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন! সুতরাং ঐ সকল স্তব একমাত্র ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন বলিয়া গণ্য করা নিতান্ত সঙ্গত। বস্তুতঃ ঋষিরা প্রাকৃতিক জড়বস্তুর উপাসনা অতিক্রম করিয়া অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, দেবতা সমূহ এক অদ্বিতীয় অনাদি ঈশ্বরের নানা আবির্ভাব স্বরূপ। ঋগ্বেদের শেষভাগে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের স্তুতি পাওয়া যায়। বিশ্বজগতের উপাসনা হইতে বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের উপাসনা যে নিষ্কপট মনুষ্যহৃদয়ের পক্ষে অতি স্বাভাবিক ঘটনা, ঋগ্বেদ তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে।

অন্যান্য জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ তুলনায় ঋগ্বেদের এই এক বিশেষ মাহাত্ম্য। ঋগ্বেদে কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রণালী অথবা সভ্যতার কোন বিশেষ অবস্থার বর্ণনা নাই। অপরন্তু মানব-হৃদয়ে কিরূপে উদীয়মান সূর্য্য বা প্রভান্বিত আকাশের স্বভাব-সিদ্ধ শিশু-সুলভ নিষ্কপট আরাধনা হইত, সেই সূর্য্য ও আকাশ হইতে মহত্তর ঈশ্বরের—সেই সূর্য্য ও আকাশের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের উপাসনার ভাবের উদয় হয়, ঋগ্বেদে এই আধ্যাত্মিক বিকাশের জাজ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। ঋগ্বেদ ভিন্ন কোনও ভাষায় এমন কোনও গ্রন্থ নাই, যাহাতে মনুষ্যহৃদয় অল্প অল্প উচ্চ হইতে উচ্চতর মঞ্চে অধিরোহণ করিয়া অবশেষে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহান্ ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দার্শনিক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে ঋগ্বেদ অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ।

প্রাচীনকালে আকাশ উপাস্য পদার্থের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল; এবং আকাশের নানা আকার ধারণ হইতে

ইহাকে বিবিধ নাম দিয়া উপাসনা করা হইত। আকাশের প্রাচীনতম 'নাম দ্যুঃ' (বা দীপ্তিশালী)। গ্রীকদিগের জ্যূস্ (Zeus), রোমানদের জুপিটর শব্দের 'জু' (Ju), সাক্সন্ জাতির 'ট্যু' (Tiu), এবং জার্মান জাতির 'জ্যো' (Zio) একই দেবতা। এই সাধারণ নাম হইতে অনুমান হইতেছে যে, আর্য্যজাতীয় লোকেরা তাঁহাদের আদি-স্থান মধ্য এসিয়া হইতে চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বেই এই নামে আকাশ-দেবতার স্তুতি করিতেন।

গ্রীক ও রোমীয় দেবতাদের মধ্যে জ্যূস্ ও জুপিটরের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে দ্যুঃ দেবতার প্রতাপ রহিল না। আকাশ-দেবতা অন্য এক ভাবে আর্য্যদের হৃদয় অধিকার করিলেন। কারণ এদেশে বর্ষণশীল আকাশ নদী সকল পূর্ণ করে, ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে, শস্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। এই বর্ষণকারী আকাশ ইন্দ্রনাম গ্রহণ করিয়া বৈদিক দেবতার প্রথম স্থান অধিকার করিল।

আকাশের আর এক প্রাচীন নাম বরুণ; গ্রীক্ ভাষায় ইহাকে উরেণস্ (Uranus) বলে। বরুণ অর্থ আবরণকারী। যে আকাশ পৃথিবীকে আবৃত করিয়া আছে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে আবৃত করিয়া থাকে, তাহাই বরুণ। দিবা-আকাশের নাম মিত্র। পার্সিকের জেন্দাভেস্তায় "মিথ্র" (Mithra) নামে তাঁহার পরিচয়। সংস্কৃত টীকাকারেরা স্বভাবতই বরুণকে রাত্রি এবং মিত্রকে দিন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; পার্সিরা সূর্য্যকে মিথ্রনামে উপাসনা করিতেন, এবং বরুণকে আকাশের অধীশ্বর না হউক, স্বর্গবাসের অধীশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

এই সকল ঘটনা হইতে প্রমাণ হইতেছে, আর্য্যজাতি সমূহের পূর্ব্বপুরুষেরা গ্রীক, পারস্য, ভারত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে বরুণকে আকাশের দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিতেন। এমন কি সুবিখ্যাত জার্ম্মান্ পণ্ডিত রথ এবং অপরাপর অনেক ঋগ্বেদবেত্তা মনে করেন যে, হিন্দু ও ইরানীয়েরা বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে, বরুণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের পবিত্রতম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন, এবং ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক পবিত্র ভাবের প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন। হিন্দু ও ইরানীয়েরা বিচ্ছিন্ন হইলে এই পবিত্র দেবতা হইতে ইরানে অহুরা মজ্‌দ নামে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা প্রবর্ত্তিত হয়।

ভারতবর্ষে নূতন বলবান্ বর্ষণকারী ইন্দ্রদেবতা বরুণের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেও, প্রাচীন সময়ে বরুণের যে পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা ছিল, তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হয়েন নাই। ঋগ্বেদের পবিত্রতম মন্ত্রের দেবতা বরুণ, ইন্দ্র নহেন। সে যাহা হউক, বরুণদেবের পবিত্রতা সূচক মন্ত্রের অনুবাদ করিতেছি।

৬। হে বরুণ! এই উড্ডীয়মান পক্ষীগণ তোমার ন্যায় বল, তোমার ন্যায় তেজ প্রাপ্ত হয় নাই; এই অবিরামগতি নদী ও বেগবান বায়ু তোমার বেগ অতিক্রম করে না।

৭। বিশুদ্ধ পরাক্রমশালী রাজা বরুণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া তেজঃপুঞ্জ উর্দ্ধে ধারণ করেন। সে রশ্মিপুঞ্জ অধোমুখ কিন্তু তাহাদের মূল উর্দ্ধে। তাহারা যেন আমাদিগের প্রাণ রক্ষা কর।

৮। রাজা বরুণ সূর্য্যের গতির জন্য

পথ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন। পথহীন অন্তরীক্ষে সূর্য্যের পদবিক্ষেপের জন্য পথ করিয়াছেন। তিনি আমার হৃদয়-বিদ্ধকারী শত্রুকে তিরস্কার করুন।

৯। হে বরুণরাজ! তোমার শত সহস্র ঔষধি আছে, তোমার কৃপা বিস্তীর্ণ ও গভীর হউক। নিঋ তিকে (পাপদেবতাকে) পরাঙ্মুখ করিয়া দূরে রাখ; আমাদের কৃত পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর।

১০। "ঐ যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র, যাহা উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে, এবং রাত্রিযোগে দৃষ্ট হয়, দিবাযোগে তাহারা কোথায় চলিয়া যায়? বরুণের কর্ম্মসমূহ অপ্রতিহত, তাহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয়।" প্রথম মণ্ডল ২৪ মন্ত্র।

সপ্তম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তে আছে;—

৩। "হে বরুণ! আমি উতলাচিত্তে আমার পাপের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি অনেক পণ্ডিতের নিকট অনুসন্ধানের জন্য গিয়াছি, সকলেই আমাকে এইরূপ বলিয়াছেন যে, "এই বরুণ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন"। ৪। হে বরুণ! আমি এমন্ কি করিয়াছি যে, তুমি তোমার বন্ধু ও উপাসককে হনন করিতে ইচ্ছা কর। হে দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বিন্, আমাকে বল, যাহাতে আমি ত্বরায় বিনম্রভাবে তোমার স্তুতিগান করিয়া তোমার নিকট গমন করি। ৫। হে বরুণ! আমাদিগকে পিতৃলোকের পাপ হইতে মুক্ত কর। আমরা নিজ শরীর দ্বারা যাহা করিয়াছি, তাহাও বিনষ্ট কর। হে রাজন্! অপহৃত পশুখাদক চোরের ন্যায়, রজ্জুবদ্ধ গোবৎসের ন্যায়, আমাকে পাপ হইতে মুক্ত কর। ৬। হে বরুণ! সেই পাপ আমাদের ইচ্ছাকৃত নহে। ইহা ভ্রম, বা সুরা, বা মন্যু বা দ্যূতক্রীড়া বা অবিবেক বশত ঘটিয়াছে। কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠও বিপথে লইয়া যায়, স্বপ্নেও পাপ উৎপন্ন হয়। ৭। পাপমুক্ত হইয়া আমি দাসের ন্যায় বিশ্বস্তরূপে বাঞ্ছাপূর্ণকারী ও রক্ষক বরুণের পরিচর্য্যা করিব। আমরা অজ্ঞান; আর্য্যদেব আমাদিগকে জ্ঞান দান করুন। জ্ঞানময়দেব আমাদিগের প্রার্থনা গ্রহণ করুন এবং ধন প্রদান করুন।"

সপ্তমমণ্ডলের ৮৯ সূক্তে আছে।—

১। "হে রাজা বরুণ! মৃন্ময়গৃহ যেন আমি প্রাপ্ত না হই। হে সুক্ষত্র (মহা বলবান্)! দয়া কর, দয়া কর। ২। হে আয়ুধধারিন্ বরুণ! আমি বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় কম্পান্বিত কলেবরে আসিয়াছি, হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর। ৩। হে ধনবান্ পবিত্র বরুণ! আমি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পুণ্যকর্ম্মের বিরুদ্ধে গমন করিয়াছি। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর। ৪। জলমধ্যে বাস করিলেও তোমার উপাসক তৃষ্ণা প্রাপ্ত হইয়াছে। হে সুক্ষত্র! দয়াকর, দয়াকর। ৫। হে বরুণ! আমরা মনুষ্য, দেবগণের সম্বন্ধে আমরা যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, অজ্ঞানতাবশতঃ তোমার কর্ম্মে যে অনবধানতা করিয়াছি, সেই সকল পাপপ্রযুক্ত আমাদিগকে বিনাশ করিও না।"

এতদ্ভিন্ন আরো অনেক মন্ত্র আছে, এই সকল পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, বরুণ পবিত্রতা ও সাধুতার আধারস্বরূপ দেবতা বলিয়া প্রাচীন কালে যে বিশ্বাস ছিল, কস্মিন্‌কালে সেই ভাবের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, দ্যুঃ দেবতার ন্যায় বরুণ দেবতাও যবীয়ান্ ইন্দ্র দেবতাকে উচ্চ আসন ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ইন্দ্র ভারতীয় আর্য্যের বিশেষ সম্পত্তি। অন্য আর্য্যবংশে ইন্দ্র অপরিচিত।

বৃষ্টি বর্ষণের উৎপত্তি বিষয়ে ইন্দ্র সম্বন্ধে একটী অতি সুবিখ্যাত আখ্যায়িকা আছে। বোধ হয় অপর কোন আর্য্য জাতির মধ্যে এমন আখ্যায়িকা নাই। সমস্ত ভূমি শুষ্ক হইলে যে ধূসর মেঘ আকাশে দেখা দিয়া বিনা বর্ষণেই তিরোহিত হইত, তাহাকে প্রাচীন কালে বৃত্র বলা যাইত।

বৃত্র মেঘের জল বদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং আকাশদেবতা ইন্দ্র এই অসুরকে বজ্রাঘাত না করিলে কখনই জল ছাড়িয়া দেন না। বৃত্রাসুর হত হইলে বন্দীকৃত মেঘ-জল বৃষ্টি ধারায় পতিত হয়, নদী সকল জলে পূর্ণ হয়, ক্ষেত্র সমূহ সত্বর শ্যামল শস্যে আবৃত হয়, দেবতা ও মনুষ্যের আর আনন্দের সীমা থাকে না। এই ইন্দ্র বৃত্র বিরোধ বর্ণনা করিয়া ঋগ্বেদে অনেক তেজস্বী মন্ত্রের রচনা হইয়াছে। মারুতেরা এই যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য করেন, আকাশ-পৃথিবী যুদ্ধ-শব্দে কম্পমান। বৃত্র অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পলায়িত ও হত। অর্থাৎ অনাবৃষ্টির শেষ ও বৃষ্টির আরম্ভ।

ইন্দ্র নাম ভারতীয় আর্য্যদের একচেটীয়া বটে, কিন্তু এই উপাখ্যান অন্যান্য আর্য্য-জাতিতেও পাওয়া যায়। বৃত্রঘ্ন (ইন্দ্র) ইরানীয় জেন্দাভেস্তায় বিরিথ্রঘ্ন নামে পূজা প্রাপ্ত হইতেন। জেন্দাভেস্তায় অহি-বধের উপাখ্যান রহিয়াছে, ঋগ্বেদে অহি বৃত্রের নামান্তর মাত্র। জেন্দাভেস্তায় অহি-হন্তার নাম "থ্রেরেটেন।" ফরাসী পণ্ডিত বুর্ণো বলেন, কবি ফার্দ্দুসীর সাহনামার ফেরোডিন আর থ্রেরেটেনা এক নামই বটে। বেদের ও জেন্দাভেস্তার অহি হইতে পণ্ডিতেরা বলেন, গ্রীক উপাখ্যানের এখিদ্‌ ও এখিদ্‌না উৎপন্ন। এখিদ্‌নার পুত্র অর্থ্রস এবং আমাদের সুপরিচিত বৃত্র একই দেবতা। সুতরাং অর্থ্রস্‌-হন্তা হর্কুলিস, জেন্দাভেস্তার উক্ত থ্রেরেটেনা, এবং ঋগ্বেদের বৃত্রঘ্ন ইন্দ্র একই দেবতা।

এইরূপে অন্যান্য অনেক উপাখ্যান উদ্ধৃত করিতে পারি, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে নিবৃত্ত হইলাম। এস্থলে আনুষঙ্গিক ভাবে, রাত্রির অন্ধকারের পর ইন্দ্রের আলোক উদ্ধার করিবার উপাখ্যানের উল্লেখ করিব। আলোকের জ্যোতিকে গাভীর সহিত তুলনা করিয়া অন্ধকার কর্ত্তৃক হরণের কথা আছে। ইন্দ্র তাহাদের অন্বেষণ না পাইয়া তাহাদের উদ্ধারার্থ সরমাকে (অর্থাৎ উষাকে) পাঠাইলেন; সরমা বিলুতে (দুর্গে) উপস্থিত হইয়া দেখেন, অন্ধকারের অধিপতি পনিরা গাভীদিগকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছেন। পনিরা সরমাকে কত প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু সতী সরমা তাহাতে প্রতারিত না হইয়া ইন্দ্রের নিকট প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত কথা বলিলেন। তখন ইন্দ্র সসৈন্যে যাত্রা করিয়া বিলুদুর্গ ধ্বংস ও গাভী উদ্ধার করিলেন। রাত্রের অন্ধকার তিরোহিত হইয়া প্রভাময়ী উষার উদয় হইল। ইন্দ্রের অনেক স্তবে এই উপাখ্যানের উল্লেখ রহিয়াছে।

ভট্ট মোক্ষমুলর বলেন যে, গ্রীকদের ট্রয় অবরোধের উপাখ্যান উল্লিখিত বৈদিক উপাখ্যানের রূপান্তর মাত্র। ইহার অর্থ এই যে, সূর্য্যরশ্মি পশ্চিম দিকে বিলুপ্ত হইয়া আবার পূর্ব্বদিকে উদয় হয়। ঋগ্বেদের বিলু ও হোমারের ইলিয়স্‌ একই। ঋগ্বেদের পনি, এবং হোমারের পারিস্‌

উভয়েই প্রলোব্ধা। হোমারের হেলেনা ও ঋগ্বেদের সরমা একই ব্যক্তি; কিন্তু হেলেনা লোভে পড়িলেন, সরমা পুণ্য-শরীরে ফিরিয়া আসিলেন। ভারতীয় আর্য্যের এই মহত্ত্ব।

টয় নগর অবরোধ যথার্থ ঘটনা প্রমাণিত হইলেও, এই সৌসাদৃশ্য কাল্পনিক না হইতে পারে। কারণ পুরাকালে যত কাব্য লেখা হইয়াছে, তাহার সমস্তই বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনা ও দেবতাদের উপাখ্যানে মিশ্রিত। মহাভারতের কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধ সত্য, কিন্তু অর্জ্জুন কাল্পনিক ব্যক্তি। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের অপর নাম অর্জ্জুন। এইরূপ দেবতা সম্বন্ধীয় উপাখ্যান বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া হোমার কাব্য রচনা করিয়া থাকিবেন। ঋগ্বেদ হইতে এই উপাখ্যান-দ্বয় সম্বন্ধীয় কতিপয় ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি।

"১। বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার সেই কর্ম্ম সমূহ বর্ণনা করিব। তিনি অহিকে (মেঘকে) হনন করিয়াছিলেন। পরে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন, বহনশীল পার্ব্বতীয় নদী সমূহের পথ ভেদ করিয়া দিয়াছিলেন। ২। ইন্দ্র পর্ব্বতাশ্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন; ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য দূরগামী বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপর যেরূপ গাভী স্ববেগে বৎসের দিকে যায়, ধারাবাহী জল সেইরূপ স্ববেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছিল। ৩। ইন্দ্র বৃষের ন্যায় বেগের সহিত সোমগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিন প্রকার যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত সোম পান করিয়াছিলেন। মঘবান্ বজ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা অহিদের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিয়াছিলেন। ৪। যখন তুমি অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলে, তখন তুমি মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করিলে। পরে সূর্য্য, উষাকাল ও আকাশকে প্রকাশ করিয়া আর শত্রু রাখিলে না। ৫। জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্র দ্বারা ছিন্ন-বাহু করিয়া বিনাশ করিলেন। কুঠার ছিন্ন বৃক্ষশাখার ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে। ৬। গর্ব্বিত বৃত্র আপনার সমতুল্য যোদ্ধা নাই মনে করিয়া বহুবিনাশকারী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। ইন্দ্র বিনাশ কার্য্য হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্দ্র-শত্রু বৃত্র (নদীতে পতিত হইয়া) নদী সমুদয় পিসিয়া ফেলিল। ৮। ভগ্ন কূলকে অতিক্রম করিয়া নদ যেরূপ বহিয়া যায়, মনোহর জল সেইরূপ পতিত বৃত্র-দেহকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমা দ্বারা যে জলকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অহি এখন সেই জলের পদের নীচে শয়ন করিল। ১০। স্থিতি রহিত, বিশ্রাম রহিত, জলের মধ্যে নিহিত, নাম-শূন্য শরীরের উপর দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে; ইন্দ্র-শত্রু দীর্ঘ নিদ্রায় পতিত রহিয়াছে। ১১। পনির দ্বারা গাভী সকল যেরূপ গুপ্ত ছিল, বৃত্রপত্নী সমূহ অহি-রক্ষিত হইয়া সেইরূপ নিরুদ্ধ হইয়াছিল; জলের বহন দ্বার রুদ্ধ ছিল, বৃত্রকে হনন করিয়া ইন্দ্র সে দ্বার খুলিয়া দিলেন। (প্রথম মণ্ডল, ৩২ সূক্ত)।

বৃত্র সম্বন্ধীয় একটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম। এখন সরমা সম্বন্ধে দশম মণ্ডলের ১০৮ মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। "১। পনি বলিতেছেন—হে সরমা! তুমি কি বাসনায় এ স্থলে আসিয়াছ? ইহা অতি দূরের পথ।

এ পথে আসিতে হইলে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আসা যায় না। আমাদের নিকট এমন কি বস্তু আছে, যাহার জন্য আসিয়াছ? কয় রাত্রি ধরিয়া আসিয়াছ! নদীর জল পার হইলে কিরূপে? ২। সরমা বলিলেন—ইন্দ্রের দূতী স্বরূপ প্রেরিত হইয়া আমি আসিয়াছি। হে পনিগণ! তোমরা যে বিস্তর গোধন সংগ্রহ করিয়াছ, তাহা গ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। জল আমাকে রক্ষা করিয়াছে, জলের ভয় হইল পাছে আমি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক চলিয়া যাই। এই রূপে নদীর জল পার হইয়াছি। ৩। পনিদিগের উক্তি—হে সরমা! যে ইন্দ্রের দূতী হইয়া তুমি দূরদেশ হইতে আসিয়াছ, সেই ইন্দ্র কিরূপ? তাঁহাকে দেখিতে কি প্রকার? তিনি আসুন, তাঁহাকে আমরা বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। তিনি আমাদের গাভী লইয়া গাভীগণের সত্ত্বাধিকারী হউন। ৪। সরমার উক্তি—যে ইন্দ্রের দূতী হইয়া আমি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, তাঁহাকে পরাজয় করে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখি না। তিনিই সকলকে পরাজয় করেন। গভীর নদীগণ তাঁহার গতি রোধ করিতে সমর্থ নহে। হে পনিগণ! নিশ্চয় তোমরা ইন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া শয়ন করিবে। ৫। পনিদের উক্তি—হে সুন্দরি সরমে! তুমি স্বর্গের শেষসীমা হইতে আসিতেছ; অতএব এই সকল গাভীর মধ্যে যে কয়েকটী ইচ্ছা কর, তোমাকে তাহা দিতেছি। বিনা যুদ্ধে তোমাকে কেই বা এই সকল গাভী দিত? তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অনেক অস্ত্র আমাদিগের নিকট রহিয়াছে। ৯। হে সরমে! দেবতারা ভয় প্রদর্শন করিয়া তোমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছেন, সেই নিমিত্তই তুমি আসিয়াছ। তোমাকে আমরা ভগিনী স্বরূপ পরিগ্রহ করিতেছি। তুমি আর ফিরিয়া যাইও না। হে সুন্দরি! তোমাকে এই গোধনের ভাগ দিতেছি। ১০। সরমার উক্তি—আমি ভ্রাতৃ ভগিনী সংক্রান্ত কোন কথা বুঝিতে পারি না। ইন্দ্র ও পরাক্রান্ত অঙ্গিরার সন্তানেরা সকলই জানেন। তাঁহারা গাভী পাইবার জন্য আমাকে রক্ষা পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিয়াছেন; আমি তাঁহাদের আশ্রয় পাইয়া আসিয়াছি। হে পনিগণ! এই স্থান হইতে অতি দূরে পলায়ন কর।”

যে কয়েকটী সূক্ত উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বরুণ সম্বন্ধীয় মন্ত্র যেমন পবিত্র-ভাবে পূর্ণ, ইন্দ্র সম্বন্ধীয় মন্ত্র তেমনি তেজঃ ও সাহিকতায় পূর্ণ। বস্তুতঃ বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র মহা বলিষ্ঠ, সোমরসের একান্ত ভক্ত, যুদ্ধে তাঁহার মহা আনন্দ, মরুতগণ সহ বৃত্র বধ করিয়া অনাবৃষ্টি সংহারে সুদক্ষ, কৃষ্ণত্বক্ দস্যু বিনাশে যুদ্ধশালী আর্য্যদেব নেতা, এবং উর্ব্বর পঞ্চনদে আধিপত্য বিস্তারে তিনি আর্য্যদের পরম সহায়। “দ্যাবা পৃথিবী ও দেবগণ সেই ইন্দ্রকে শত্রুদিগের পক্ষে বিভু-নির্ম্মিত মুদ্গররূপে জন্ম দিয়াছিলেন।” ৩। ৪৯। ১। তেজীয়ান শিশু ইন্দ্র তাঁহার মাতা অদিতির নিকট আগমন করিয়া অন্ন যাচঞা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্থানে দীপ্ত সোম দর্শন করিয়া স্তন্য পানের পূর্ব্বে সোম পান করিলেন। ৩। ৪৮। ২ ও ৩। এই সোমপায়ী যোদ্ধ-পুরুষ অনেক সময়ে যজ্ঞের অভিযুক্ত সোমপানের লোভ ও গৃহের সুন্দরী কল্যাণকারিণী জায়ার লোভ—এই দুই লোভের

মধ্যে পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন। (৩। ৫৩। ৪, ৬)।

আমরা এতক্ষণ দ্যুঃ, বরুণ, মিত্র ও ইন্দ্রকে ঋক্‌বেদের প্রধান আকাশ দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এই সকল দেবতাকে উজ্জ্বল আকাশের দেবতা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে, কারণ উজ্জ্বল জ্যোতির ভাবও এই সকল দেবতায় প্রথম কল্পনা সময়েই প্রবেশ করিয়াছিল। অনেক দেবতাকে অদিতির সন্তান "আদিত্য" বলিয়া নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহারা জ্যোতির্ম্ময় দেবতা। ইন্দ্র অর্থ বর্ষণকারী; দ্যুঃ অর্থ উজ্জ্বল। কিন্তু অদিতির অর্থ তত সহজ নহে। অদিতির অর্থ অবিভক্ত, অসীম, অনাদি; অসীম অনন্ত, দৃশ্যমান অনন্ত; পৃথিবীর মেঘ, আকাশ অতিক্রম করিয়া অনন্ত ভাব প্রকাশ করিতে অদিতির সৃষ্টি। কোনও দেবতা সম্বন্ধে এইরূপ অসীম অনন্তের ভাব কল্পনায় যে স্থান পাইয়াছিল, তাহাই প্রাচীন হিন্দুদের প্রগাঢ় অনুশীলন ও চিন্তাশক্তির ধ্রুব প্রমাণ। অন্যান্য আর্য্যবংশীয়দের মধ্যে কোনও দেবতা সম্বন্ধে এইরূপ অনাদি অসীম ভাব দেখা যায় না। সিন্ধুদেশ পার হইয়া আর্য্যেরা এই ভাবের কল্পনা করিয়া থাকিবেন। জর্ম্মান পণ্ডিত রথ অদিতি শব্দের 'অনাদি-অনন্ত অবিনাশী' 'স্বর্গীয় জ্যোতিঃ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

কে অদিতি বা স্বর্গীয় জ্যোতির সন্তান, তৎসম্বন্ধে ঋগ্বেদে একটু গোলযোগ আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তে বরুণ ও মিত্র ভিন্ন আর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, ইহাদিগকেও আদিত্য নাম প্রদান করা হইয়াছে। নবম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে এবং দশম মণ্ডলের ৭২ সূক্তে আদিত্য সাতজন বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের নাম উল্লেখ নাই। ইন্দ্রও একজন আদিত্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি; সবিতা (সূর্য্য) অনেক স্থলে আদিত্য বলিয়া বর্ণিত; পূষা ও বিষ্ণু সূর্য্যের নামান্তর। ইহাদিগকেও আদিত্য সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে ১। আর্য্যমা, ২। ভগ, ৩। দক্ষ, ৪। অংশ, ৫। বরুণ, ৬। মিত্র, ৭। ইন্দ্র, ৮। সবিতা, ৯। পূষা, ১০। বিষ্ণু—দশজন আদিত্য। পূষা ও বিষ্ণুকে সবিতার নামান্তর জ্ঞান করিলেও ৮জন আদিত্য। অথচ মূলে রহিয়াছে আদিত্য ৭ জন।

সূর্য্য ও সবিতা, এই দুই নাম ঋগ্বেদে অনেকস্থলে দৃষ্ট হয়। সূর্য্যের প্রতিশব্দ গ্রীকভাষায় হেলিয়স (heleos) লাটীন ভাষায় সোল (Sol), ট্যুটন ভাষায় তীর (tyr), এবং ইরানি ভাষায় খোর্ষেদ্। সায়নাদি টীকাকারেরা উদীয়মান অবস্থায় সবিতা ও আলোকমণ্ডিত মধ্যাহ্ন-স্থিত অবস্থায় সূর্য্য বলিয়া বিভেদ করেন। প্রাতঃসূর্য্যের স্বর্ণ-প্রভা রশ্মিসমূহকে স্বভাবতঃ দীর্ঘবাহুর সহিত তুলনা করা হইত। তাহা হইতে যজ্ঞে সবিতার বাহু নষ্ট হইলে পরে তাঁহার স্বর্ণবাহু হয়, এই উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। জর্ম্মণদের মধ্যেও উপাখ্যান আছে, তীর-দেবতা (সবিতা) বাঘের মুখে হাত দিয়া হাত হারাইয়াছিলেন। আধুনিক ব্রাহ্মণেরা যে গায়ত্রীমন্ত্র প্রাতঃসন্ধ্যা জপ করেন, সবিতা তাহার দেবতা। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ বৈশ্য বিচার ছিল না। গায়ত্রী আর্য্য অর্থাৎ হিন্দুমাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি; ইহাতে পুরোহিতদিগের কোন একচেটিয়া দাবি নাই। ঋকটী এই "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদ-

য়াৎ”, ৩৬২।১০। সুপণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ইহার বক্ষমান বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়াছেন, “আমরা সবিতৃদেবতার সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি, যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।” ঋষি বিশ্বামিত্র এই মন্ত্রের রচয়িতা।

গোপাল ও মেষপালের চারণ ভূমির তল্লাস করিয়া সূর্য্যকে পূষা নামে স্তুতি করিতেন। তিনি মেষচালিত রথারোহণে গোপালদিগকে উর্ব্বর শস্যপূর্ণ দেশে লইয়া যান, এবং গোমেষাদিকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করেন। পূষার স্তুতিগুলি গ্রাম্য সরলতায় পরিপূর্ণ।

আধুনিক হিন্দুধর্ম্মে বিষ্ণুর অতি উচ্চ স্থান। ঋগ্বেদে বিষ্ণু যে সূর্য্যের নামান্তর মাত্র, এই কথা পুরাণ-ভক্ত হিন্দুরা কোনও মতে মানিবেন না। তাঁহারা মানুন্ না মানুন্, ঋগ্বেদে দেবদিগের মধ্যে বিষ্ণুর বড়ই সামান্য পদ। ইন্দ্র, বরুণ, সবিতা, অগ্নি, ঋগ্বেদে ইহারা সকলেই বিষ্ণু অপেক্ষা শ্রেয়ান্ দেব। শতপথব্রাহ্মণ রচিত হইলে দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুর কিছু প্রাধান্য জন্মে; এবং পৌরাণিক যুগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় কতিপয় শতাব্দী অতীত হইলে বিষ্ণুর ষোল আনা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঋগ্বেদে বিষ্ণু (সূর্য্য) তিন পাদে (উদয়াচল, অন্তরীক্ষ ও অস্তাচল) বিশ্ব ভ্রমণ করেন বলিয়া বর্ণনা আছে। তাহা হইতে এক পৌরাণিক লম্বা চৌড়া উপাখ্যান বল্পিত হইয়াছে।

সকল প্রাচীন জাতির মধ্যেই অগ্নি দেবতার পূজা দেখা যায়। ভারতবর্ষের আর্য্যদের মধ্যে যজ্ঞীয় অগ্নির সম্মান অন্য কোনও দেবতা হইতে ন্যূন নহে। অগ্নি ভিন্ন যজ্ঞ হয় না, এই জন্য অগ্নি ‘যজ্ঞের ঋত্বিক্’। অগ্নিদেবতাদের মধ্যে যবিষ্ঠ, কারণ অরণি ঘর্ষণে তিনি প্রত্যহ নবোৎপন্ন। এই প্রকার কাষ্ঠ ঘর্ষণে (মন্থনে) যজ্ঞীয়াগ্নির প্রভব, সুতরাং অগ্নির অপর নাম প্রমন্থ।

ঋগ্বেদে অগ্নির পদ এত উচ্চ যে, যখন পুরাতন টীকাকার যাস্ক বৈদিক দেবতাদিগকে দেবত্রয়ে বিভাগ করেন, তখন অগ্নিকে পৃথিবীর দেবতা, ইন্দ্রকে অন্তরীক্ষের দেবতা এবং সূর্য্যকে আকাশের দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাস্কের অনেক দিন পরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের প্রাধান্য।

অগ্নি যে শুধু পৃথিবীর অগ্নি, তাহা নয়; তিনি বজ্রাগ্নি ও সূর্য্যাগ্নিও বটেন; অদৃশ্য স্বর্গে তাঁহার বসতি। মাতরিশ্বা তাঁহাকে মর্ত্ত্যে আনিলে অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা তাঁহাকে যজ্ঞে প্রজ্জ্বলিত করেন। তদবধি অগ্নি মনুষ্যের রক্ষাকর্ত্তা।

বায়ু বৈদিক কবিদের নিকট তত সম্মান প্রাপ্ত হয়েন নাই; বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে কয়েকটী মাত্র স্তব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঝটিকার কর্ত্তা মরুতদের অধিকতর স্তুতি আছে; থাকিবারই কথা বটে। ভারতবর্ষের ঝটিকা, কাহার মনে তাহাতে ত্রাস না জন্মে? বিশেষতঃ মরুতগণ ইন্দ্রের সহচর, বৃত্রবধে ও অনাবৃষ্টি নাশে তাঁহারা ইন্দ্রের সহায়। যখন তাঁহারা মৃগ-চালিত রথারোহণে গমন করেন, সমস্ত পৃথিবী কম্পমান, তাঁহাদের আয়ুধ হইতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত, দেহালঙ্কার হইতে বিজলী বিস্ফারিত। দেখিতে এত ভয়ানক হইলেও তাঁহাদের অন্তর করুণায় পরিপূর্ণ, কারণ তাঁহারা মাতা পৃশ্নির (মেঘের) স্তন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক বৃষ্টিরূপে পাতিত করিয়া মানবজাতির মহোপকার করেন। রুদ্র অতি ভয়ানক

দেবতা, তিনি মরুতগণের পিতা, অতি-মাত্রায় শব্দকারী। যাস্ক ও সায়ন বলেন, রুদ্র অগ্নি বিশেষ। পণ্ডিতবর রথ যথার্থই বলিয়াছেন, ঋগ্বেদে রুদ্রের অর্থ শব্দায়মান অগ্নি অর্থাৎ বজ্র, ঝঞ্ঝাবাতের জনয়িতা। রুদ্র ভয়ানক হইলেও কাঁহারও অনিষ্টকারী নহেন। তিনি পরোপকারী, অন্যের সহায়, এবং নানাবিধ ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা।

বিষ্ণুর ন্যায় রুদ্রও ঋগ্বেদে এক জন দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা, সামান্য কয়েকটী মাত্র স্তব তাঁহার নামে প্রণীত। পৌরাণিক যুগে বিষ্ণুর ন্যায় রুদ্রেরও প্রাধান্য অনেক বাড়িয়া গেল। তিনি হিন্দুয়ানির প্রধান দেবতাত্রয়ের এক দেবতা মধ্যে গণ্য হইলেন। কোন কোন উপনিষদে অগ্নি-শিখার বিশেষণ-স্বরূপ "কালী" "করালী" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায় "অম্বিকা" রুদ্রের ভগিনী বলিয়া বর্ণনা আছে। কিন্তু যখন পৌরাণিক যুগে রুদ্রের প্রভুত্ব অসীম হইয়া পড়িল, তখন "কালী," "করালী," "অম্বিকা," এই সকলই রুদ্রের স্ত্রীর নাম বলিয়া গণ্য হইল। এমনি যুগ-মাহাত্ম্য! বলা বাহুল্য যে ঋগ্বেদে কালী, করালী, অম্বিকা, (বিষ্ণুর স্ত্রী) লক্ষ্মী, এই সকল দেবতার একবার উল্লেখও নাই।

পুরাণ সমূহে যমদেবের চরিত্র অনেক পরিবর্ত্তিত। পুরাণে যম সূর্য্যের পুত্র। ভট্ট মোক্ষমূলর বলেন, সম্ভবতঃ যম সৃষ্টির সময়ে তিনি অস্তমান সূর্য্যের নামান্তর ছিলেন। সূর্য্য অস্তগত হইয়া অদৃশ্য হয়েন। মনুষ্যও মৃত হইয়া অদৃশ্য হয়। সুতরাং এই অদৃশ্য সূর্য্য অদৃশ্য মানবাত্মার দেবতা, তাহা কল্পনা করা প্রাচীন হিন্দুদের ন্যায় নিষ্কপট লোকের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। এই ভাবেই পুরাণে সম্বন্ধ হইয়া যম সূর্য্যের তনয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

ঋগ্বেদে বিবস্বান্ (আকাশ) যমের পিতা, এবং সরণ্যু যম ও যমীর মাতা।

আকাশ ও সরণ্যুর (ঊষার) সন্তান কে? হয় সূর্য্য না হয় দিবা। যম ও যমী যে দিবারাত্রি বোধক দেবতা ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০ সূক্তে যমের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী ভগিনী যমী সহোদরকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যতা, কিন্তু এরূপ কার্য্য অপবিত্র, "সহোদর-ভগিনী অগম্যা" বলিয়া যম তাহাতে বিরত। এই মন্ত্রে যম ও যমীর যে কথোপকথন রহিয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, যম ও যমী দিবা-রাত্রি মাত্র। একে অন্যের অনুগামিনী ও অনুরাগিনী হইলেও কস্মিন্‌কালে তাহাদের একত্র সহবাস হইতে পারে না।

যে ভাব হইতেই যমের কল্পনা হইয়া থাকুক, ঋগ্বেদে যে তিনি বিশেষ গুণবিশিষ্ট দেবতা, প্রেতাত্মার অধিপতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ পর্য্যন্ত বেদে পুরাণে ঐক্য। বেদে যম স্বর্গের দেবতা, পরকালে সাধু লোকের সুখদাতা। মৃত ব্যক্তিরা পিতৃ-লোক নামে যমের আলোকমণ্ডিত স্বর্গে অশেষ সুখভোগে দিনাতিপাত করেন। পুরাণে যমের চরিত্র সম্পূর্ণ। তিনি নরকের অধিপতি, পাপীর শাস্তা, নিষ্ঠুরের একশেষ।

ঋগ্বেদের প্রারম্ভে পরলোকের কথা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। নিম্নে ঋগ্বেদের শেষাংশ হইতে পরলোকের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি, প্রথমাংশে তাদৃশ বর্ণনা কুত্রাপি নাই। "১। হে অন্তকরণ! তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়া সেবা কর। তিনি সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে

সুখের-দেশে লইয়া যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তাঁহার নিকট সকল লোক গমন করে। ২। আমরা কোন্ পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়া দেন। সেই পথ আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা গিয়াছেন, সকল জীবই সেই পথে যাইবেন। (দশম মণ্ডল ১৪ সূক্ত)

সোমরস সোমলতা ইহার উৎপন্ন সুরাবিশেষ, এবং যজ্ঞে তাহা দেবতাদিগকে পানার্থ প্রদত্ত হইত। অবশেষে সোমরস নিজেই দেবতা মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িলেন। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল এই সোমের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। সোমের একটী স্তুতিতে পরলোক বিষয়ক কথা রহিয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "৭। যে ভুবনে সর্ব্বদা আলোক, যেস্থানে স্বর্গালোক সংস্থাপিত আছে; হে ক্ষরণশীল সোমরস, সেই অমৃত অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৮। যে স্থানে বৈবস্বত আছেন, যে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যেস্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৯। সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিব্যলোক, যাহা নভোমণ্ডলের ঊর্দ্ধে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্ব্বদা আলোকময়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ১০। যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধ্নানামক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ১১। যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ আহ্লাদ ও আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির যাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ৯ মণ্ডল ১১৩ সূক্ত।

যম ও যমী বিবস্বান্ ও সরণ্যুর সন্তান। অশ্বিদ্বয়ও বিবস্বান্ ও সরণ্যুর সন্তান। প্রাচীনকালে, দিবারাত্রি অথবা প্রাতঃ-সন্ধ্যা এই দুইটী ভাব গ্রহণ করিয়া অশ্বিদ্বয় কল্পিত হইয়া থাকিবে।

যে ভাব হইতেই অশ্বিদ্বয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকুক, ঋগ্বেদে তাঁহারা শুধু চিকিৎসক।* রুগ্ন ও আহত ব্যাধির ঔষধদাতা, সকলের প্রতি সদয়। কি উপায়ে তাঁহারা রোগ উপশম করিতেন, তাঁহাদের অনুগ্রহ ও দয়া কত, সেই কথায় অনেক স্তব পরিপূর্ণ। ত্রিচক্রবিশিষ্ট রথে চড়িয়া তাঁহারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন এবং বিপন্নকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন।

বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি, স্তুতি বা মন্ত্রের দেবতা। ঋগ্বেদে ব্রহ্মণ শব্দের অর্থ স্তুতি, মন্ত্র, সূক্ত। অগ্নি ও সোম যেরূপে দেবতার স্থান পাইয়াছেন, বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতিরও সেইরূপে দেবত্ব লাভ হইয়াছে। অগ্নিশিখা ও সোমের যে প্রকার ক্ষমতা, স্তুতিপাঠেরও তদ্রূপ ক্ষমতা। স্তুতিপাঠের ফলোপধায়কতা হইতেই ব্রহ্মণস্পতি দেবতার সৃষ্টি।

ঋগ্বেদে ব্রহ্মণ মন্ত্র অতি সামান্য দেবতা। কিন্তু উপনিষৎকারেরা যখন অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে বৈদিক ব্রহ্ম শব্দে

* চিকিৎসা করিয়া দেবতার অসম্মান হয় না, কিন্তু মনুসংহিতা মতে ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট হয়। (তৃতীয় অধ্যায় ১৫২। চতুর্থ অধ্যায় ২১২) সময়ের এতই পরিবর্ত্তন! আজকাল ইংরাজী মতে চিকিৎসা করিলে জাতি যায় না; কিন্তু কবিরাজী মতে চিকিৎসা করিলে ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট হয়।

আখ্যাত করিলেন, ব্রহ্ম ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর একার্থবোধক হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলেও, বৌদ্ধদের দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্ম শান্ত পরোপকারী দেবতা রূপে স্থান পাইলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের লোপ হইলে পৌরাণিক যুগে আধুনিক হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মা শুধু সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উপনিষদের ব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ থর্ব্ব হইলেন। এইরূপে বেদোপনিষদাদি প্রাচীনতম শাস্ত্র সমূহ আলোচনা করিয়া কি প্রকার সামান্য ঘটনা হইতে পৌরাণিক যুগের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপাখ্যান সৃষ্টি হইয়াছে, আমরা তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। হরিদ্বারের সামান্য ঝরণা অল্পে অল্পে বিস্তীর্ণ হইয়া প্রকাণ্ড পদ্মা ও মেঘনায় পরিণত হইয়াছে। পথে দক্ষিণে বামে কত নদনদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। হরিদ্বারের গঙ্গা আর গোয়ালন্দের গঙ্গায় কত প্রভেদ। হিন্দুদেবতাদের সম্বন্ধেও সেই কথা। বৈদিক ব্রহ্মণ (স্তুতি) আর পৌরাণিক ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্ত্তা), বৈদিক বিষ্ণু (সূর্য্য) আর পৌরাণিক বিষ্ণু (স্থিতিকর্ত্তা), বৈদিক রুদ্র (বজ্র) আর পৌরাণিক রুদ্র (প্রলয়কর্ত্তা)—এতদুভয়ে যে প্রভেদ, বোধ হয় হরিদ্বারের ঝরণা ও মেঘনায় তত প্রভেদ নাই।

যে সকল নাম উল্লেখ করিলাম, দেবের মধ্যে তাঁহারাই প্রধান। দেবীর মধ্যে ঋগ্বেদে উষা ও সরস্বতী নাম দেখিতে পাই।

ঋগ্বেদে উষাদেবীর যে বর্ণনা রহিয়াছে, তদপেক্ষা স্নেহপূর্ণ ও কবিত্বময় বর্ণনা আর কুত্রাপি কোনও প্রাচীন ভাষায় দেখি নাই। আর যে ভাব অবলম্বন করিয়া উষার সৃষ্টি, এতদূর মনোহর ভাবের কল্পনা হইতে পারে, তাহাও বিশ্বাস করি না। উষা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি।

"২০। হে স্তুতিপ্রিয়া অমর উষা! কোন্ মনুষ্য তোমার সমাদরের জন্য! হে প্রভাবযুক্ত! তুমি কাহাকে প্রাপ্ত হও। ২১। হে ব্যাপনশীল বিচিত্র দীপ্যমান উষা! আমার নিকট হইতে বা দূর হইতে তোমাকে বুঝিতে পারি না। ২২। হে স্বর্গদুহিতে! সেই অন্নের সহিত তুমি আগমন কর। আমাদিগকে ধন প্রদান কর। প্রথম মণ্ডল ৩০ সূক্ত। ৭। তিনি রথ যোজিত করিয়াছেন, এই সৌভাগ্যবতী উষা দূর হইতে সূর্য্যের উদয় স্থানে উপরস্থ দিব্যালোক হইতে শতরথ দ্বারা মনুষ্যগণের নিকট আসিতেছেন। ১মণ্ডল, ৪৮ সূক্ত। ৭। ঐ নিত্য যৌবন-সম্পন্না শুভ্রবসনা, আকাশ-দুহিতা অন্ধকার দূর করতঃ মনুষ্যের দর্শন-গোচর হইয়াছেন। তিনি পার্থিব সমস্ত ধনের ঈশ্বরী। হে সুভগে! তুমি অদ্য এই স্থানের অন্ধকার দূর কর। ৮। অতীত উষাগণ যে অন্তরীক্ষ পথ দিয়া গিয়াছেন, সেই পথে উষা অনুগমন করিতেছেন, ভবিষ্যতে অনন্ত উষাগণ সেইপথ অনুধাবন করিবেন। উষা অন্ধকার দূর করিয়া জীবগণকে জাগরিত করিয়া মৃতবৎ সংজ্ঞাশূন্য লোককে চৈতন্য দান করেন। ১০। কত-কাল হইতে উষা উৎপন্ন হইতেছেন, কতকাল পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবেন? বর্ত্তমান উষা পূর্ব্ব উষাকে সাগ্রহে অনুকরণ করিতেছেন, আবার আগামী উষাসমূহ এই দীপ্তিমতি উষাকে অনুকরণ করিবে, ১। যে মনুষ্যেরা অতিপূর্ব্বকালের উষাকে আলোক প্রদান করিতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে গত হইয়াছেন। আমরা

এক্ষণে উষাকে দর্শন করিতেছি, ভবিষ্যতে যাঁহারা উষাকে দর্শন করিবেন, তাঁহারা আসিতেছেন। ১মণ্ডল,১১৩ সূক্ত। ৪। অহনা (উষা) নম্রভাবে প্রত্যহ প্রতি গ্রহ অভিমুখে গমন করেন। তিনি ভোগেচ্ছাশালিনী হইয়া প্রত্যহ আগমন করেন এবং হব্যরূপে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠভাগ গ্রহণ করেন। ১১। মাতা দেহ মার্জন করিয়া দিলে কন্যার দেহ যেরূপ উজ্জ্বল হয়, তুমিও সেইরূপ হইয়া দর্শনার্থ আপন শরীর প্রকাশ কর। তুমি ভদ্রা, তুমি অন্ধকারকে দূর করিয়া দাও, অন্য উষা তোমার কার্য্য ব্যাপ্ত করিবে না। ১মণ্ডল ১২৩ সূক্ত।"

উষা আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন উপাস্য দেবী ছিলেন, সুতরাং আর্য্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন বংশের মধ্যে উষার নাম ও উপাসনা দেখা যায়। গ্রীকদিগের মধ্যে (Eos) (ইয়স্) এবং লাটিনদের মধ্যে ঔররা (Aurora) উষস্ শব্দের নামান্তরমাত্র। কেবল যে উষা নামের প্রতিরূপ গ্রীকদের মধ্যে পাওয়া যায়, এমন নহে, উষার অনেক গুলি নামই গ্রীক ধর্ম্মে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের অর্জ্জুনি, বৃষয়া, দহনা, উষা, সরমা এবং সরণ্যু গ্রীক ভাষায় আর্গিনোরিস্, বৃষিস্, দফনী, ইরস, হেলেন, এবং ইরিনিস্ নামে পরিচিত। কিন্তু কেবল যে নামে সাদৃশ্য, তাহা নয়, উষা সম্বন্ধে এক প্রকারের কয়েকটী উপাখ্যান হিন্দু ও গ্রীকদের মধ্যে পাওয়া যায়। ১১৫ সূক্তে ২ ঋকে সূর্য্য উষার পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন, এরূপ কথা আছে। গ্রীকদের মধ্যেও প্রাচীন গল্প আছে। Apollo (সূর্য্য) Daphne (দহনা) দেবীর পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ধরিবা মাত্র দহনা বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে উষার শেষ হইল। ঋগ্বেদে উষাকে একস্থানে অহনা নাম দেওয়া হইয়াছে। গ্রীকদের সুবুদ্ধির দেবী অফিণী (লাটিন ভাষায় মিনার্ভা।) এই অহনার রূপান্তর মাত্র। সুতরাং হিন্দু ও গ্রীকেরা বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বেই এই সকল উপাখ্যান সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

আর্য্যেরা সরস্বতী নদীর কূলে যজ্ঞ সম্পাদন ও যজ্ঞীয় স্তুতিপাঠ করিতেন, এজন্য সরস্বতী অতি পবিত্র নদী। তাঁহা হইতে সরস্বতী স্তুতি ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন। বৈদিক দেবীদের মধ্যে একমাত্র সরস্বতীর পূজা আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। তাঁহার সঙ্গিনী 'দুর্গা' 'কালী', 'লক্ষ্মী' প্রভৃতি দেবীদেব নাম ঋগ্বেদে নাই। তাঁহারা আধুনিক কালের সৃষ্টি।

ঋগ্বেদে যে প্রকার প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা করা হইত, তাহা বিবৃত হইল, এবং চতুঃসহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুতীরে আমাদের পিতৃ পুরুষেরা যে সকল দেবদেবীর উপাসনা করিতেন, তাহাদের নাম ও প্রকৃতি লিখিত হইল। প্রাকৃতিক বস্তুকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের নিকট সরলচিত্তে ও নির্বন্ধাতিশয় সহকারে ধনপুত্র সৌভাগ্যের জন্য প্রার্থনা এবং পৃথিবীর সুখ সচ্ছন্দের জন্য তাঁহাদের নিটক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। তাহা হইতে একদিকে সেই বিজয়ী তেজস্বী জাতির সারল্য ও শৌর্য্যের, অপরদিকে চিন্তাশীলতা, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উচ্চ সভ্যতার পরিচয় পাইতেছি। যে সকল ভাব হইতে বৈদিক দেবতার কল্পনা হইয়াছে, তাহাতেই প্রমাণ হয়, আর্য্যেরা নীতি, চিন্তা, সহৃদয়তায় কত উন্নতি লাভ করিয়া-

ছিলেন। বৈদিক দেবতারা প্রভুর ন্যায় সর্ব্বদা মনুষ্যের সঙ্গে বিদ্যমান্, তাঁহারা অন্তর্য্যামী। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করা যায় না। পণ্ডিত বার্থ যথার্থই বলিয়াছেন, "মনুষ্যকে দেবতার প্রতি নিষ্কপট হইতেই হইবে। কারণ তাঁহাদিগকে প্রতারিত করা যায় না। মনুষ্যমাত্রের বিশ্বাস, দেবতারাও তাহাকে প্রতারণা করেন না। বন্ধু, পিতা, ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাদের প্রতি প্রীতি ও বিশ্বাস স্থাপন মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যখন দেবতারা সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও নিষ্কপট, তখন তদুপাসকেরা কি করিয়া অসৎ, ন্যায়হীন, কুটিল, কপট হইতে পারে? ঋগ্বেদীয় মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, দেবতাদের মধ্যে কেহই দুষ্টলোকের অনিষ্টকারী-দেবতা (সয়তান) নহেন, এবং দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে কোনও নীচ, নিষ্ঠুর, কষ্টদায়ক কার্য্যকলাপ দৃষ্ট হয় না। বেদমন্ত্র পাঠে উন্নত ও প্রশস্ত ধর্ম্মনীতির প্রমাণ পাইতেছি, এবং অদিতি আদিত্যদের নিকট নিষ্কলঙ্ক হইয়া উপস্থিত হইবার প্রয়াস হইতে তাহাদিগকে শুধু সোমঘৃতাদি প্রদান অপেক্ষা আর্য্য-হৃদয়ে তদধিক উচ্চপ্রকারের কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহার স্পষ্ট নিদর্শন দেখিতেছি।"

ঋগ্বেদে কোন দেবমন্দির বা প্রতিমা পূজার উল্লেখ নাই। বরং গৃহস্থ মাত্রেই পরিবারের কর্ত্তামাত্রেই স্বগৃহে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার নিকট সোমরস অর্পণ করিতেন, এবং দেবতাদের নিকট ঋগ্বেদের ভাষায় মনের পবিত্রতা, সুখসমৃদ্ধি, গাভী শস্য, নিরুগ্নতা ও শত্রুজয়ের জন্য সরলচিত্তে প্রার্থনা করিতেন। ঋগ্বেদের মন্ত্র আর্য্যজাতীয় লোক মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি ছিল। তখনও জন্মগত পুরোহিত জাতির উৎপত্তি হয় নাই; আর্য্যেরা বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্ম চর্চ্চার্থ অরণ্যে যাইতেন না, এবং অরণ্যে শরীরের কষ্টকর তপস্যা ও মন্ত্র পাঠ করিয়া দেহপাত করিতেন না। পুরাণের কাল্পনিক ঋষিদের কথা বলিতেছি না, কিন্তু ঋগ্বেদে যে সকল ঋষির কথা রহিয়াছে, তাঁহারা সাংসারিক লোক ছিলেন, বহু ধন জন ও প্রভূত শস্য গাভীর অধিস্বামী, যুদ্ধের সময়ে পাচন কাটী ও হল ছাড়িয়া ভল্ল তরবারি গ্রহণ করিতেন, এবং অসভ্য দস্যুদিগকে পরাজিত করিয়া যে ধনজন শস্য গাভীর জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতেন, বাহুবলে তাহা রক্ষা করিতেন। গৃহস্থ মাত্রেই একশরীরে পুরোহিত, যোদ্ধা ও চাষা ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এমনও প্রমাণ পাওয়া যে, কোন কোন রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তি মন্ত্রগানে সুপটু ও যজ্ঞের বেদী প্রভৃতি নির্ম্মাণে দক্ষ ব্যক্তিদিগকে আনিয়া যজ্ঞকার্য্য ও সামগান করাইতেন; এবং এই সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে বিস্তর অর্থ প্রদান করিতেন। ঋগ্বেদের শেষভাগে অপরের জন্য যজ্ঞকারী পুরোহিতের ও বহুমূল্য পুরস্কার প্রদানের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কতিপয় বংশের লোকেরা এইপ্রকার যজ্ঞ সম্পাদন ও মন্ত্র প্রণয়নে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র এই প্রকারে প্রণীত হইয়া স্ববংশীয় লোক কর্ত্তৃক কণ্ঠস্থ হইয়া আসিয়াছে। বংশানুক্রমিক পুরোহিত সম্প্রদায় সৃষ্টির এই প্রথম অঙ্কুর।

ঋগ্বেদের মন্ত্র দশ মণ্ডলে বিভক্ত। প্রথম ও দশম মণ্ডলের মন্ত্র নানা ঋষির প্রণীত।

কিন্তু বাকী অষ্ট মণ্ডলের এক এক মণ্ডল এক ঋষি অথবা একগোত্রের ঋষিদের প্রণীত। দ্বিতীয় মণ্ডল ভৃগুবংশের গৃৎসমদ ও অপরাপর ঋষিদের প্রণীত; তৃতীয় মণ্ডল বিশ্বামিত্রের, চতুর্থ মণ্ডল বামদেবের, পঞ্চম মণ্ডল অত্রির, ষষ্ঠমণ্ডল ভরদ্বাজের, সপ্তম মণ্ডল বশিষ্ঠের, অষ্টম মণ্ডল কণ্বের ও নবম মণ্ডল অঙ্গিরা বংশের কৃত। এই সকল নাম হিন্দুমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। পুরাণে ইহাদের অনেক গল্প উপাখ্যান রহিয়াছে। এই সকল বংশে জন্ম বলিয়া হিন্দুর মহাগর্ব্ব।

পূর্ব্বোল্লিখিত এবং অন্যান্য কতিপয় বংশীয় লোকদিগের পুরুষ পরম্পরার চেষ্টায় আর্য্যবংশীয়দের প্রাচীনতম (ঋগ্বেদ) গ্রন্থ লোপ পায় নাই। বৃদ্ধদের মুখ হইতে স্ব স্ব বংশের মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া যুবকদের যৌবন চলিয়া যাইত। পুরুষানুক্রমে শত শত বৎসর ঋগ্বেদে এইরূপে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

সভ্যতার উন্নতি, যজ্ঞীয় কর্ম্মকাণ্ডের বাহুল্যে কতিপয় পুরোহিত বংশের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যদের প্রাচীনতম ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। কি প্রকারে দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইল, মৃত্যুর পরে কি গতি হয়, এইরূপ মনুষ্য প্রকৃতির অতি গভীর ও গূঢ়তম বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে পুরোহিতেরা অনাদি-অনন্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরের জ্ঞানলাভে সমর্থ হইলেন, কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক দেবতা সমূহের উপাসনা পরিত্যাগ করিলেন না। ঋগ্বেদের শেষভাগ হইতে পরলোক বিষয়ক মন্ত্র ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই স্থানে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধীয় মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। "সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপে দৃষ্টি করিয়া, মনে মনে আলোচনা করিয়া জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এই দ্যাবা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। যখন ইহার চতুঃসীমা ক্রমশঃ দূর হইয়া উঠিল, তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক হইয়া গেল। ২। বিশ্বকর্ম্মা যিনি, তাহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্ম্মাণ করেন, ধারণ করেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সকল অবলোকন করেন, সপ্তঋষির পরবর্ত্তী যেস্থান তথায় তিনি একাকী আছেন, এইরূপ বিদ্বানগণ বলেন। সেই বিদ্বান্‌দিগের অভিলাষ সকল অন্নদ্বারা পূর্ণ হয়। ৩। যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্ব ভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, তিনি একমাত্র অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাহার বিষয় জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়। ৭। যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে তোমরা বুঝিতে পারনা। তোমাদের অন্তকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই। কুঝ্‌জটিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানাপ্রকার কল্পনা করে, তাহারা আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে, এবং স্তব স্তুতি উচ্চারণ করতঃ বিচরণ করে" (দশম মণ্ডল ৮২ সূক্ত)

"পরমেশ্বর বুদ্ধির অগম্য" ত্রিসহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন সময়ে উদ্ধৃতমন্ত্রে সেই কথা যেমন পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে, বোধ হয় অন্যত্র কোথাও তাহা পাওয়া যাইবে না। "১। তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না; যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি-দূর-বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে

এমন কে ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল কি তখন ছিল? ২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা-মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাসপ্রশ্বাস প্রযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্ব-ব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সে এক বস্তু জন্মিলেন। ৪। সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্ব প্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমান্‌গণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন। ৫। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন, মহিমা সকল উদ্ভব হইলেন। উহাদের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নোদিকে এবং উর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইল, নিম্নদিকে স্বধা রহিল! প্রযতি উর্দ্ধদিকে রহিলেন। ৬। কেই বা প্রকৃতি জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কখনই বা জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা বস্তুর সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সকল নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে তাঁহারা হইলেন, তাহা কেই বা জানে? ৭। এই সকল নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভু স্বরূপ পরমধামে আছেন।” দশম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত।

আর্য্যজাতিদের মধ্যে সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইবার এই প্রথম চেষ্টা। ত্রিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের মনে বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে তেজস্বী ও উচ্চ ভাবের প্রথম উদয় হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইল। প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা হইতে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ক আর একটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। “১। সর্ব্ব প্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রেই সর্ব্বভূতের অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী ও আকাশ স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব? ২। যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করে। যাঁহার ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যাঁহার বশতাপন্ন। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব? ৩। যিনি নিজ মহিমাদ্বারা যাবতীয় দার্শনেন্দ্রিয় সম্পন্ন গতি-শক্তিযুক্ত জীবদিগের অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছেন, যিনি এই সকল দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রভু। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব? ৪। যাহার মহিমাদ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে, সসাগরা ধরা যাঁহার সৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয়, এই সকল দিক্‌বিদিক্ যাঁহার বাহুস্বরূপ। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিবে? ৫। যিনি এই সমুন্নত আকাশ ও এই পৃথিবী স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাগলোককে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অন্তরীক্ষ লোক পরিমাণ করিয়াছেন। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব? ৬। দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাঁহাকর্ত্তৃক স্তম্ভিত ও উল্লাসিত হইয়াছিল এবং সেই দ্যাবাপৃথিবী যাঁহাকে মনে মনে মহিমান্বিত বলিয়া বুঝিতে পারিল, যাঁহাকে

আশ্রয় করিয়া সূর্য্য উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হয়েন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব? দশম মণ্ডল, ১২১ সূক্ত।

এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কোন বিশেষ ধর্ম্ম প্রণালী ঋগ্বেদের ধর্ম্ম নহে। প্রাকৃতিক জড় বস্তুর উপাসনা হইতে ঐ জড়বস্তু সমূহের অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনার বিকাশ ঋগ্বেদের ধর্ম্ম। রক্তিমাভ ঊর্ষার শিশুসুলভ প্রশংসা-বাদ হইতে সৃষ্ট ও স্রষ্টার গভীর তত্ত্ব আলোচনা পর্য্যন্ত ঋগ্বেদের ধর্ম্ম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৈদিক ঋষিগণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, কতিপয় কর্ম্ম-নিষ্ঠ ও সুবিদ্বান পরিবার বৈদিক যুগে মন্ত্র প্রণয়ন ও বৈদিক নিয়মানুসারে যাজন কার্য্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এই সকল ব্যক্তি-দিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া অর্থ প্রদান করিতেন। এই কতিপয় বংশের লোকে-রাই যুগে যুগে বেদসমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া বিস্মৃতি-সাগর হইতে তাহা রক্ষা করিয়াছেন। আধু-নিক হিন্দুরা এই সকল বংশের সঙ্গে রক্ত-সম্পর্ক থাকাকে অতি গৌরবের বিষয় মনে করেন। সুতরাং ইহাদের বিবরণ হিন্দুপাঠ-কের নিকট কখনই অপ্রীতিকর হইবে না।

বেদের ঋষিবংশের মধ্যে বিশ্বামিত্রবংশ ও বশিষ্টবংশ অতি বিখ্যাত। আধুনিক সং-স্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া পণ্ডিতবর মুইর তদীয় 'সংস্কৃত গ্রন্থ' সমূহের প্রথম খণ্ডে বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বশিষ্ট-বিশ্বা-মিত্রের উপাখ্যান সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তৎসমস্তই বাল্যকালে বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি।

মহাবল পরাক্রান্ত রাজা সুদাস, বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্র উভয়কে আদর ও সম্মান করি-তেন। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের মন্ত্রসমূহ বিশ্বামিত্র ও তদ্বংশীয়দের প্রণীত। এই মণ্ড-লের ৫৩ সূক্তে লিখিত আছে, "বিশ্বামিত্র মহান্, তিনি ঋষি, তিনি দেবের জনয়িতা, দেবকর্ত্তৃক আকৃষ্ট, তিনি নেতৃগণের উপ-দেষ্টা। তিনি জলবিশিষ্ট সিন্ধুর বেগ নিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি যখন সুদাস রাজার যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র কুশিকবংশীয় দের সহিত প্রিয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।" ৯ ঋক্। পুনরপি সপ্তম মণ্ডলের মন্ত্রগুলি বশিষ্ঠ ও তদ্বংশীয়দের কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই মণ্ডলের ৩৩ মন্ত্রে লিখিত আছে—"শ্বেতবর্ণ কর্ম্ম-পূরক দক্ষিণ-ভাগে চূড়াধারিগণ* আমাকে হর্ষযুক্ত করি-তেছেন। আমি বর্হিঃ হইতে উঠিবার সময় লোক সকলকে বলি যে, বশিষ্টগণ আমার নিকট হইতে যেন দূরে না যান!" [ইহা সুদাস রাজার উক্তি] ৮৩ মন্ত্রে আছে—"৮। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যেখানে নির্ম্মলগামী ও জটাবি-শিষ্ট কর্ম্মযুক্ত তৃৎসুগণ অন্ন এবং স্তুতির দ্বারা পরিচর্য্যা করে, সেই দেশে দশজন রাজা কর্ত্তৃক চারিদিকে পরিবেষ্টিত সুদাসকে তোমরা বল প্রদান করিয়াছিলে।"

এই দুই পুরোহিত বংশে হিংসা-বিদ্বেষ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। উভয়েই সমবিদ্বান ও সমধার্ম্মিক। ঋগ্বেদে পরস্পরের প্রতি অপ্রিয় ভাষারও পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ মন্ত্রে বিশ্বামিত্র বশিষ্টদের সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন;—

* বশিষ্টগণ মস্তকের দক্ষিণভাগে চূড়া ধারণ করিত।

"২১। হে শূরবান্ ইন্দ্র! আমরা শত্রু-হিংসক। আমাদিগকে প্রভূত ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয় প্রদান করিয়া প্রীত কর। যে [বশিষ্ট] আমাদিগকে দ্বেষ করে, সে নিকৃষ্ট হইয়া পতিত হউক; আমরা যাহাকে [বশিষ্টকে] দ্বেষ করি, প্রাণ-বায়ু তাহাকে পরিত্যাগ করুক্। ২২। পরশুদ্বারা বৃক্ষ যেরূপ তাপ প্রাপ্ত হয়, (সেইরূপ শত্রু [বশিষ্ট] তাপ প্রাপ্ত হউক)। শিমুল ফুল যেরূপ বিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ শত্রু শরীর বিচ্ছিন্ন হউক। প্রহত, জলস্রাবী পাকস্থলী যেরূপ ফেণ উদ্গীরণ করে, সেইরূপ শত্রুমুখ হইতে যেন ফেণ উৎসীর্ণ হয়। ২৩। হে জনগণ! তোমরা বিনষ্টকারী (বিশ্বামিত্রকে) জান না। (তপঃফল) লুব্ধকে পশুবৎ মনে করিয়া লইয়া যাইতেছে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মূর্খ ব্যক্তিকে হাস্যাস্পদ করে না। অশ্বের সম্মুখে গর্দ্দভকে লইয়া যায় না। ২৪। হে ইন্দ্র! ভরত বংশীয়গণ [বিশ্বামিত্রের বংশীয় লোকেরা] (বশিষ্টগণের সহিত) পার্থক্যই জানে, একতা জানে না। সংগ্রামে (বশিষ্টদের বিরুদ্ধে) ভরতবংশীয়গণ সহজ শত্রুর ন্যায় অশ্ব প্রেরণ করে, ধণুর্দ্ধারণ করে।"

এই মণ্ডলে আরো দুইটী ঋক্ আছে, তাহাতে বশিষ্ট-বিশ্বামিত্র-দ্বেষের আভাস পাওয়া যায়। "১৫। জমদগ্নি-দত্তা সর্প্পরী অজ্ঞানকে বাধা দান করতঃ প্রভূত শব্দ করিতেছেন। সূর্য্যের দুহিতা দেবগণের নিকট ক্ষয়রহিত অমৃতরূপ অন্ন বিস্তার করিয়াছেন।* ১৬। পঞ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে অন্ন আছে, সর্প্পরী শীঘ্র তাহা আমাদিগকে অধিক পরিমাণে দান করুন। বৃদ্ধ জমদগ্নিগণ আমাদিগকে যে (পক্ষ্যা) দান করিয়াছেন, সেই সূর্য্যদুহিতা নূতন অন্ন দান করুন্।"

বশিষ্টও ছাড়িবার পাত্র নহেন। অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ জয় করিবে, তাহা বুদ্ধের ও শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম, অনেক পরে আবিষ্কৃত হয়। বশিষ্ট নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে বিশ্বামিত্রের অভিসম্পাত প্রত্যর্পণ করিলেন। ১৩। সোমদেব পাপকারীকে প্রবর্ত্তিত করেন না; বলযুক্ত মিথ্যাবাদী পুরুষকেও প্রবর্ত্তিত করেন না। তিনি রাক্ষসকে হনন করেন, অসত্যবাদীকে হনন করেন, তাহারা হত হইয়া ইন্দ্রের বন্ধনে বাস করে। ১৪। যদি আমার দেবতাগণ অসত্য স্বরূপ, অথবা যদি আমি বৃথা দেবগণের নিকট গমন করি, তাহা হইলে হে জাতবেদা অগ্নি! কি জন্য আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছ? মিথ্যাবাদিগণ তোমার হিংসা বিশেষরূপে লাভ করুক। ১৫। যদি আমি জাতুধান হই, অথবা যদি পুরুষের আয়ু নাশ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি যেন এখনি মরিয়া যাই। অথবা যে আমাকে বৃথা রাক্ষস বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, সেই তোমার দশ বীরপুত্র যেন নষ্ট হয়। ১৬। আমি রাক্ষস, যে আমাকে জাতুধান এই সম্বোধন করিতেছে' এবং যে 'রাক্ষস' 'আমিশুচি' এই কথা বলিতেছে, ইন্দ্র মহা আয়ুধ দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করুন্, সে সকল জন্তুর অধম হইয়া পতিত হইক।" (৭।১০৪)

পাণ্ডিত্যে সমান, সম্ভ্রমে সমান, দুই পুরোহিত বংশে এইরূপে বিদ্বেষ থাকা, এবং তাহা মন্ত্রে প্রকাশ পাওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু এই সকল স্বাভাবিক ঘটনা অবলম্বন

* কথিত আছে, সুদাসের যজ্ঞে বশিষ্টের পুত্র, শক্তি, বিশ্বামিত্রের বল ও বাক্য হরণ করেন। জমদগ্নিগণ বাগ্দেবতাকে আনিয়া বিশ্বামিত্রকে প্রদান করেন।

করিয়া পরবর্ত্তী সময়ে যে সকল অমানুষিক, অত্যাশ্চর্য্য উপাখ্যানমালার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার উদাহরণ প্রদান করিতেছি।

ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এইরূপ জাতিপ্রথার কোন নিদর্শন না থাকিলেও বশিষ্ট ব্রাহ্মণ আর বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, এই অমূলক কল্পনা করা হইল। বিশ্বামিত্র আধুনিক ব্রাহ্মণ জাতির প্রাতঃসন্ধ্যার উচ্চার্য্য গায়ত্রী মন্ত্রের প্রণেতা। এই বৈদিক বিশ্বামিত্র কেন ক্ষত্রিয় বা বশিষ্ট কেন ব্রাহ্মণ, সে কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, এই কল্পনা করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির একটী উপাখ্যান মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, এবং অন্যান্য আধুনিক গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় কন্যা সত্যবতীর সহিত ব্রাহ্মণবর রিচীকের বিবাহ হয়।* রিচীক তাঁহার ক্ষত্রিয়জাতীয়া ভার্য্যার জন্য ব্রাহ্মণ-গুণোপেত সন্তান উদ্দেশ্যে একপাত্র, আর শ্বশ্রূর (ক্ষত্রিয়ানির) জন্য ক্ষত্রিয়গুণোপেত সন্তান উদ্দেশ্যে অপর এক পাত্র খাদ্য প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু মাতা ও দুহিতা, যাহার জন্য যে পাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, সে তাহা না খাইয়া একে অন্যের পাত্র নিঃশেষ করিলেন। সুতরাং ক্ষত্রিয়ানির গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পরে ব্রাহ্মণত্ব পাইলেন, আর ব্রাহ্মণ ভার্য্যা সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় গুণলাভ করিলেন। এই জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম বাহুবলে সপ্তবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্যা করিয়াছিলেন। বৈদিক ঋষিরা ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত লোক ছিলেন, এই মিথ্যা কল্পনা করিয়া আধুনিক যুগের লোকেরা বৈদিক ঋষিদের শৌর্য্য পরাক্রম যুদ্ধপ্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা করিতে ঈদৃশ রূপ-কথার সৃষ্টি করিয়াছেন।

বশিষ্ট-বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে এতদধিক আশ্চর্য্য উপাখ্যান রামায়ণ ও মহাভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজপুত্র বিশ্বামিত্র মৃগয়া করিতে করিতে বশিষ্টাশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলে বশিষ্ট তাঁহাকে সসম্ভ্রমে ষোড়শোপচারে তাঁহার আতিথিসেবা করিলেন এবং কামদুধা সুরভিকে প্রার্থনা করিবামাত্র যে সকল অমূল্য রত্ন পরিচ্ছদ পাইলেন, তাহা বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের ইচ্ছা যে বশিষ্ট তাঁহাকে সুরভি গাভিটী দেন। বশিষ্ঠ তাহাতে অসম্মত হইলে, বিশ্বামিত্র বল পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বশিষ্টের এই দুশ্চেষ্টায় ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র পরাজিত হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া অবশেষে ব্রাহ্মণত্ব পাইলেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব পাইয়া "তৎসবিতুর্বরেণ্যং" এই গায়ত্রী রচনা করিবার পূর্ব্বে বশিষ্ট ঠাকুর কোন্ মন্ত্র জপ করিতেন, এই উপাখ্যানকার তাহা প্রকাশ করেন নাই।

হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানে বিশ্বামিত্রকে নিতান্ত লোভী ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণনা আছে। বিশ্বামিত্রের দক্ষিণা দানের জন্য রাজার সমস্ত রাজ্য গেল, স্ত্রী*বিক্রয় হইল, পুত্র বিক্রয় হইল, নিজে বিক্রীত হইলেন, সকলে দাসত্ব করিতে লাগিলেন। যদি ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধির জন্য

---

* এই গল্প সৃষ্টির সময় বিবাহের জাতবিচার ছিল না। শুধু যজন-যাজনে জাত-বিচার ছিল, বোধ হয়।

* অথচ স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের মতে পাপ। যে ব্যক্তি এই উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন, বেদতো দূরের কথা, সামান্য স্মৃতিশাস্ত্রও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল।

এই সকল উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে এই কথা বলিতে পারি যে, শ্রদ্ধা না জন্মিয়া বরং দক্ষিণাপ্রিয় ব্রাহ্মণের উপর বিপরীত ভাব জন্মে। অবশেষে হরিশ্চন্দ্রের ভাগ্য প্রসন্ন হইল; তাঁহার পুত্রকে রাজত্ব দিলেন, তিনি নিজে স্বর্গে গেলেন। ইহাতে বশিষ্ঠ ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাতে বিশ্বামিত্রকে বধ করিলেন, এবং বশিষ্ঠ নিজে বিশ্বামিত্রের শাপে অরি পক্ষী হইলেন। দুই পক্ষীতে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল, বক-অরির যুদ্ধ, সামান্য কথা নয়, সমস্ত পৃথিবী কম্পমান। অবশেষে সৃষ্টিনাশ নিবারণার্থ ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে নামিয়া দুই ঠাকুরকে স্ব স্ব শরীর ধারণ করাইয়া মিটমাট করিয়া দিলেন। উপাখ্যান-লেখকের হাতে পড়িয়া বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কি দুর্দ্দশাই হইয়াছে!

ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যানও এতদনুরূপ। সশরীরে স্বর্গে যাবেন, রাজা ত্রিশঙ্কুর ইচ্ছা। বশিষ্ঠ বলিলেন, এ অসম্ভব কথা। তখন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্টের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিলেন, বশিষ্টের শাপে ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল হইলেন। এমন সময়ে তেজস্বী বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, সশরীরে স্বর্গে যাওয়া অতি সামান্য কথা। তজ্জন্য বিশ্বামিত্র এক যজ্ঞারম্ভ করিলেন, বশিষ্ট চলিয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞশেষ করিয়া ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠাইলেন। কিন্তু স্বর্গরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া নতমুখে পৃথিবীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া অমিততেজা বিশ্বামিত্র বলিলেন যে, 'দেখ আমি দ্বিতীয় স্বর্গ, দ্বিতীয় ইন্দ্রাদি সৃষ্টি করিতেছি।' বিশ্বামিত্রের দৃঢ় বাক্যে দেবতাদের ত্রাস হইল, ত্রিশঙ্কু নক্ষত্ররূপে স্বর্গে স্থাপন পাইলেন, কিন্তু উন্নতপদেও নতমুখ হইয়া থাকিতে হইল।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে শুনঃসেফ-উচ্চারিত বলিয়া যে স্তব রহিয়াছে, তাহা হইতে শুনঃসেফ উপাখ্যানের সৃষ্টি। উপাখ্যান অনুসারে শুনঃসেফ রিচীকের পুত্র, সুতরাং বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়। রিচীক যজ্ঞে বলি প্রদানের জন্য শুনঃসেফকে বিক্রয় করেন। তাঁহাকে যূপকাষ্ঠে বান্ধিয়া বলি দান করিবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে মাতুল বিশ্বামিত্র প্রণীত স্তব পাঠ করিয়া তিনি বন্ধন মুক্ত ও জীবন প্রাপ্ত হয়েন। শুনঃসেফের এই উপাখ্যান হইতে অনেকে ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে নরবলি ছিল, এরূপ অনুমান করেন। এই অনুমান যে নিতান্ত অমূলক, আমরা তাহা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

কল্মাষপাদের উপাখ্যানে বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় রাজা কল্মাষপাদ বশিষ্টের এক শত সন্তানকে প্রাণে বধ করেন। এই রূপে সকল যুগে, সকল রাজার সময়ে বশিষ্ট বিশ্বামিত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উপস্থিত। কোনও রাজবংশ বা বীরপুরুষের সম্বন্ধে এমন সংস্কৃত রচনা নাই, যাহাতে বশিষ্ট-বিশ্বামিত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে বর্ণিত হয়েন নাই। বিষ্ণুপুরাণ মতে ইক্ষাকুপুত্র নিমি ও সগর মধ্যে ৩৬ জন রাজা রাজত্ব করেন। কিন্তু বশিষ্ট নিমি ও সগর উভয়ের পুরোহিত। রামায়ণানুসারে ইক্ষাকু হইতে রাম ৬০ পুরুষ অন্তর। কিন্তু বশিষ্ট রামেরও পুরোহিত। বশিষ্ট বিশ্বামিত্র উপাখ্যান সমূহে এই প্রকার সময় বিচার আর নাই। সময় বিচার করিলে ঋগ্বেদের সামান্য উপমা বা ঘটনা হইতে অত্যাশ্চর্য্যজনক উপাখ্যানের সৃষ্টি হইতে পারিত না।

বিশ্বামিত্র কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব পাইলেন, তৎসম্বন্ধে নিত্য নূতন উপাখ্যান সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু কেহ একবার সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন না, 'বিশ্বামিত্র যথার্থই কি ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন?' মহাভারত হইতে মনু—মনু হইতে পুরাণ, সকলেই বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইলেন, এই কথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে ৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "বিশ্বামিত্র একাকী ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, শুধু তাহা নয়; কিন্তু যে কৌশিক বংশে অনেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-ঋষির * জন্ম, বিশ্বামিত্র কিরূপে সেই বংশের স্থাপয়িতা হইলেন।" পৌরাণিক যুগে মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সেই যুগে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব হইত। যে সময়ে আসল মহাভারত রচিত হয়, যখন পরবর্ত্তী সময়ের প্রক্ষিপ্ত রচনা মহাভারতে প্রবেশ করে নাই, যখন বর্ণবিচার আচার বিবাহাদি স্পর্শ না করিয়া শুধু যজন যাজনে বদ্ধ ছিল, তখন যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দেওয়া কঠিন কার্য্য হইত না। আর যখন বিশ্বামিত্র বেদের মন্ত্র রচনা এবং সুদাস রাজার দক্ষিণা গ্রহণ করেন, তখন এই প্রশ্নের উদয়ই হইতে পারিত না। ঋগ্বেদের সময় হিন্দু গৃহস্থমাত্রেই একাধারে পুরোহিত, যোদ্ধা ও কৃষক। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া জন্মগত বা ব্যবসায়জনিত জাতির সৃষ্টি হয় নাই। তখন গৌরকৃষ্ণ, আর্য্য-অনার্য্য, দ্বিজ-একজ (হিন্দু-অহিন্দু) এই দুই বর্ণের কথা লোকের জ্ঞাত ছিল।

* ঋগ্বেদের মন্ত্রপ্রণেতাকে ঋষি বা কবি বলে।

উক্ত অনুশাসনপর্ব্বের ৫২ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিতেছেন, জমদগ্নি ব্রাহ্মণের পুত্র কি প্রকারে ক্ষত্রিয় তেজ প্রাপ্ত হইলেন? আধুনিক উপাখ্যান সমূহে জামদগ্ন্য বিশ্বামিত্রের বিপরীত। পরশুরাম ব্রাহ্মণসন্তান হইয়াও মাতাকে বধ করিয়া পৃথিবীকে ২১ বার নিঃক্ষত্রিয় করেন; আর বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়সন্তান হইয়াও তপোবলে ও সাধুতারগুণে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই সকল কাল্পনিক ঘটনার যে হাস্যজনক কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি উভয়ে বৈদিক ঋষি। তাঁহারা ঋগ্বেদের মন্ত্র প্রণয়ন করিতেন, এবং যুদ্ধ করিতেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এইরূপ জাতিবিচার হইবার অনেক পূর্ব্বকার লোক।

ঋগ্বেদে জমদগ্নির নাম আছে। কিন্তু তাহার যোদ্ধাপুত্র পরশুরামের নাম নাই। উপনিষৎ সৃষ্টি সময়ে পুরোহিত ও রাজাদের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিরোধ—জ্ঞান ও কর্ম্ম-কাণ্ডের বিরোধ অবলম্বন করিয়া পুরাণসমূহে সপ্তবিংশবার পুরোহিত কর্ত্তৃক রাজন্যবর্গের পরাজয় পরশুরামের আখ্যায়িকায় বিবৃত হইয়াছে। এই উপনিষৎ যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কড়াকড়ি নিয়মের সূত্রপাত হইতেছিল। ক্ষত্রিয়েরা দ্বিরুক্তি না করিয়া পুরোহিত-প্রচলিত জাতিভেদ প্রথায় মস্তক অবনত করেন নাই, পরশুরামের উপাখ্যান তাহার প্রমাণ স্বরূপ। জাতিভেদের মত প্রকাণ্ড ব্যাপার এক পুরুষের বা একশত বর্ষে সম্পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাও বিশ্বাস করা যায় না। প্রথমতঃ যজন যাজনে জাতিবিচার, দ্বিতীয়তঃ অধ্যয়ন অধ্যাপনে জাতি-

বিচার, তৃতীয়তঃ বিবাহাদি বিষয়ে জাতি-বিচার, চতুর্থতঃ আহারাদি বিষয়ে জাতি বিচার, পঞ্চমতঃ জীবিকা বিষয়ে জাতি-বিচার। জাতিবিচারের অঙ্কুরোদ্গম হইতে পরিণতি পর্য্যন্ত সহস্রাধিক বৎসর অতীত হইয়া থাকিবে। উপনিষদ্-যুগের কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া অনেকদিন পরে মহাভারত লিখিত হইয়াছে। এই মহাভারতে দেখিতেছি, ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিকদের ও সাধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর ব্রাহ্মণ দ্রোণ যুদ্ধ-বিদ্যার আচার্য্য ও এবং যুদ্ধনীতিতে সুচতুর।

বশিষ্ট বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভৃগু, কণ্, ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা বংশীয়দের সম্বন্ধে কথা বলিব। ইহারা বেদ-মন্ত্র-প্রণেতা, বৈদিক ঋষি। তাঁহাদের জাতি কি, আধুনিক শাস্ত্রকারেরা এই অমীমাংস্য মীমাংসায় অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। এই আধুনিক "সংস্কৃত" শাস্ত্রকারদের মতে এই সকল বৈদিক ঋষিরা কেহ কেহ ক্ষত্রিয়গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, কেহ বা ব্রাহ্মণ-গুণবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়। এই আধুনিক ব্যক্তিদের মধ্যে দুই এক ব্যক্তি এই প্রহেলিকার আবরণ ভেদ করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন "বৈদিক ঋষিরা জন্মগত বা ব্যবসায়গত জাতিভেদ সৃষ্টির পূর্ব্বকার লোক।"

অঙ্গিরো বংশীয়েরা ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের মন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে (৪।২।২) অঙ্গিরসদের সম্বন্ধে লিখিত আছে, "নভাগের পুত্র নাভাগ; তাঁহার পুত্র অম্বরীষ, তাঁহার পুত্র বিরূপ। তাঁহার পুত্র পৃষদশ্চ, এবং তাঁহা হইতে রথিনর। ইহারা ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, পরে অঙ্গিরস নামে পরিচিত হয়েন। ইহারা ক্ষত্রিয়গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ।

বিষ্ণুপুরাণের অন্যত্র (৪।৩।৫) অঙ্গিরো হারিতকে ক্ষত্রিয় ইক্ষাকুবংশের সন্তান বলিয়া বর্ণনা আছে। বায়ু পুরাণে আছে যে, হারিতেরা অঙ্গিরো-বংশীয় লোক ক্ষত্রিয় গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। লিঙ্গপুরাণেও সেই কথা। অঙ্গিরা বংশীয়েরা ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ, যে ইহার মীমাংসা করিতে পারিবে, তাহাকে বলি বাহাদুর ব্যক্তি।

বামদেব বংশীয়েরা চতুর্থ মণ্ডলের এবং ভরদ্বাজ বংশীয়েরা ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রণেতা। মৎস্যপুরাণ (১৩২ অধ্যায়) মতে তাঁহারা অঙ্গিরো বংশীয়দের অন্তর্গত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় গুণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ।

গৃৎসমদের বংশীয়েরা দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রণেতা। টীকাকার সায়ন বলেন, তিনি অঙ্গিরো বংশীয় শুনোহোত্রের পুত্র, পরে ভৃগুবংশীয় শুনকের পুত্র, গৃৎ-সমদ নামে পরিচিত হয়। মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব্বের ৩০ অধ্যায়ে এই গোত্র পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, বীতহব্য নামে ক্ষত্রিয় রাজা পলাতক হইয়া ভৃগুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পলাতকের তল্লাসকারী উপস্থিত হইলে ভৃগু বলিলেন, "আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ, এখানে কোনও ক্ষত্রিয় নাই।" ভৃগুর কথা মিথ্যা হইতে পারে না। ক্ষত্রিয় বীতহব্য গৃৎসমদ নাম গ্রহণ করিয়া একেবারে ষোল আনা ব্রাহ্মণত্ব পাইয়া ঋক্ রচনা করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসরের তপঃ, অথবা মাতা দুহিতার খাদ্যভাণ্ড পরিবর্ত্তন অপেক্ষা গৃৎসমদের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ যে সহজ ও সম্ভব, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু অনেক ব্যক্তি মহাভারতোক্ত গৃৎসমদের জাতি-পরিবর্ত্তনের উপাখ্যানে বিশ্বাস করেন না। বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণে জাতি-ভেদ-সৃষ্টির পূর্ব্বে গৃৎসমদ জীবিত ছিলেন, এইরূপ ভাব রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে (৪।৮) আছে "গৃৎসমদ বংশে শৌনকের জন্ম। শৌনক চারিবর্ণের নিয়ম সৃষ্টি করেন। গৃৎসমদের পুত্রের নাম শুনক, এই শুনক হইতে শৌনক। এই বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি।" বায়ুপুরাণ। হরিবংশের ২৯ অধ্যায়ে এই কথা পুনরুক্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ ও হরিবংশ যে সর্ব্বদাই সংলগ্ন কথা বলিয়াছেন, তাহা নয়। কারণ এই সকল গ্রন্থের অপরাপর অংশে লিখিত হইয়াছে, গৃৎসমদের ২০ পুরুষ পরে ভার্গভূমির জন্ম। এই ভার্গভূমি হইতে চারিবর্ণের উৎপত্তি। পরস্পর-বিরোধী হইলেও এই সকল উপাখ্যান হইতেই জাতি-ভেদ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে গৃৎসমদের আবির্ভাব-কাল, তাহা দৃঢ়ীকৃত হয়।

কণ্বংশীয়েরা ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের প্রণেতা। তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধেও উপাখ্যান-লেখকেরা গোলযোগ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে (৪।১৯) এবং ভাগবত-পুরাণে (৯।২০।৬৭) কণ্ব অপ্রতিরথ বা অজমীঢ়ের পুত্র। "অজমিঢ় হইতে কণ্ব, কণ্ব হইতে মেধাতিথি, মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণেরা উৎপন্ন হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।" অপ্রতিরথ ও অজমীঢ়, উভয়েরই ক্ষত্রিয়-পুরুর বংশে জন্ম। তথাপি কণ্বেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া সংস্কার। ঋগ্বেদের ঋষিরা যে ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত ছিলেন, জাতি প্রথার সৃষ্টি হইলে ব্রাহ্মণেরা তাহা প্রতিপন্ন করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

এই বংশ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে (৪।২১) লিখিত হইয়াছে "এই বংশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছেন, অনেক রাজর্ষি এই বংশকে পবিত্র করিয়াছেন। কলিযুগে ক্ষেমকের পর এই বংশ লোপ পাইবে।" বিষ্ণুপুরাণের অন্যত্র (৪।১৯) আছে "এই বংশে গর্গের জন্ম। গর্গ হইতে সিবির জন্ম। তাঁহা হইতে গার্গ্য ও সৈবদের জন্ম। গার্গ সৈবেরা ক্ষত্রিয় গুণবিশিষ্ট হইয়াও অবশেষে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।" গর্গের ভাই মহাবীর সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে (৪।১৯) উক্ত আছে যে, তাঁহার তিন পৌত্র, ত্রয়ারুণ, পুষ্করি ও কপি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পুরুর ভাই অণু; অণুর বংশে বলীর জন্ম। মৎস্য-পুরাণ ও বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, এই বলী রাজা চারি-জাতির বা চারিবর্ণের নিয়ম প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। হরিবংশেও (৩১ অধ্যায়) এই কথা দেখিতে পাই। সুতরাং "ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি" জাতি-ভেদের মত আধুনিক। এই শ্লোক রচনা হইয়া প্রাচীন গ্রন্থে হয়তো প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

অত্রি বংশীয়েরা ঋগ্বেদের পঞ্চমমণ্ডলের প্রণেতা বলিয়া বিখ্যাত। পৌরাণিক উপাখ্যানানুসারে মনুষ্য সৃষ্টির সঙ্গে অত্রির জন্ম। বিষ্ণুপুরাণ (৪।৬) বলে, অত্রি ব্রহ্মার পুত্র, এবং ক্ষত্রিয় পুরূরবার পিতামহ।

এইরূপ পৌরাণিক শাস্ত্র অনেক উদ্ধৃত করিতে পারি। বেদ-প্রণয়নের দুই কি তিন হাজার বৎসর পরে এই সকল পুরাণ প্রণীত ও সংশোধিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল পুরাণে

বেদের পুরোহিত ও যোদ্ধা অর্থাৎ বৈদিক ঋষিদিগকে যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাদের বিষয়ে অনেক কথা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বৈদিক ঋষিদের সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী নিতান্ত অসংলগ্ন কথা নয়। এত দীর্ঘকাল পরে বৈদিক ঋষিদের কথা লিখিতে বসিয়া পুরাণ-কর্ত্তারা যে অনেক ঘটনা ও কিংবদন্তির প্রকৃত অর্থ উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নয়। কিন্তু তথাপি তাঁহারা প্রাচীন কিংবদন্তী বিকৃত করিয়া দেশাচারের অনুকূল করিয়া গঠিত করেন নহে। হিন্দু শাস্ত্রকারদের সত্য-প্রিয়তা সকল যুগেই সমান। অতি প্রাচীন সময় সম্বন্ধে এই সকল কিংবদন্তী। সেই প্রাচীন সময়ের আচার ব্যবহার পৌরাণিক যুগে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ সকল কিংবদন্তীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পুরাণ-লেখকদের একটু গোলযোগ উপস্থিত হইত। বেদের একজন ঋষি একাধারে মন্ত্রপ্রণেতা, যোদ্ধা ও কৃষক, অথবা মন্ত্রপ্রণেতা যোদ্ধা ও চাষা, তিনব্যক্তি একই পিতার সন্তান হইতে পারে, এই কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহাদের মনে দ্বিধা উপস্থিত হইত। অথচ পুরুষ পরম্পরাগত কিংবদন্তী হইতে অন্যকোন মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যায় না। এইজন্য তাঁহারা এই সকল কিংবদন্তীর মীমাংসা করিতে গিয়া কৌতুকা-বহ উপাখ্যানের কল্পনা করিয়াও কস্মিন্‌-কালে মূল-কিংবদন্তীগুলি বিকৃত করেন নাই। তাঁহাদের সত্যের অনুরাগ এত প্রবল। আমরা এস্থলে তাঁহাদের সত্যানুরাগের আর একটী উদাহরণ প্রদান করিব। মৎস্য-পুরাণে ৯১ জন বৈদিক ঋষির নাম করিয়া অবশেষে (১৩২ অধ্যায়ে) লিখিত হইয়াছে, "এই ৯১ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঋক্‌সমূহ প্রণীত বা সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সকল ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিলেন, তাঁহারা ঋষিকদের সন্তান; ঋষিকেরা বৈদিক ঋষিদের সন্তান।"

ঋগ্বেদ আর্য্যজাতীয় সকল ব্যক্তির সমান সম্পত্তি; শুধু পুরোহিতের একচেটিয়া নহে। এই ঋগ্বেদ ও বৈদিক কবি সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী বংশপরম্পরায় এতকাল চলিয়া আসিতেছিল, পুরাণ-সমূহে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যখন এই পুরাণ লেখ-কেরা বলেন যে, ঋগ্বেদ-প্রণেতারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় লোক ছিলেন; তাহা হইতেই আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি যে, পুরাণ-লেখকের মতে জাতিভেদ সৃষ্টি হইয়া আর্য্যজাতি ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের সাধারণ পিতৃপুরুষদের কর্ত্তৃক ঋগ্বেদ প্রণীত হইয়াছিল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

কুসুম।

১

নয়নে নয়নে,
সেই যে করেছি খেলা, বসন্তে বিকাল বেলা,
দেবপুরবাসী এক বালিকার সনে!
চিলাইর শ্যামতটে, সেই যে মন্দিরে—মঠে,
মনোহর শ্মশানের শ্যাম তপোবনে,
সেই যে করেছি খেলা নয়নে নয়নে!

২

সেই যে করেছি খেলা বালিকার সনে,
কলসী লইয়া কাঁকে, আসে আর চেয়ে থাকে,
হাসে আর চলে যায় দুই তিন জনে!
এক পা—দুই পা, আর পা চলে না,
বকুলের ফুলে লাগে উছট চরণে!
সে পথ দীঘল কত, যোজন যোজন শত,
অবিরত বেড়ে যায় তাহার গমনে!
আর যত বালিকারা, বকুল বিঁধেনা তারা,
সবারি ফুরায় পথ যায় যত জনে!
সকলেরি আঁখি আগে, তাহারি পশ্চাদ্‌ভাগে,
চলে যেতে সন্ধ্যা চাহে ফিরে পিছ পানে!
সেই যে করেছি খেলা বালিকার সনে!

৩

সেই যে করেছি খেলা নয়নে নয়নে,
দেবপুরবাসী এক বালিকার সনে!
মৃদুল মলয় বায়, অঞ্চল উড়িয়া যায়,
উলটি পালটি যেন চাঁপা ফুল বনে!
খুলিয়া গিয়াছে খোপা, অপরাজিতার থোপা,
মদন বিধুরে দেয় অঞ্জলি বদনে!
সংকোচে লজ্জায় হায়, ঠেকেছে বিষম দায়,
বেহায়া বেল্লিক সেই বাতাসের সনে!
কোকিল বকুল শাখে, সেও যেন তারে ডাকে,
আপদ লেগেছে যত পিছনে পিছনে!
এ বিষম গণ্ডগোলে, কার নাহি পথ ভোলে?
থমকি দাঁড়ায় বালা চমকি চরণে,
বসন্তে বিকাল বেলা বকুলের বনে!

৪

সকলে কলসী ভরি আনিয়াছে জল,
সে নিছে কলসী ভরি, প্রাণ হরি, মন হরি,—
হেসে মরি কেঁদে মরি হইয়ে পাগল!
ফিরিয়ে চলেছে ঘরে, আধা পথে গিয়ে পরে,
হাসিয়া উঠিছে সব বালিকার দল,
দেখিয়া কলসী খালি, কেহ দেয় করতালি,
কেহ বলে "ও কুসুমি! কোথা তোর জল?"
বোঝেনি সে বালিকারা, আমি যে আপনা হারা,
কুসুমেরি জলে মোর আঁখি ছল ছল!
তারা পড়ে হেসে গলে, এ উহার গায় ঢলে,
কেহ বলে "মাকে বলি বাড়ী চল চল!"
'কুসু'ত ঠেকেছে দায়, তাকি আর যাওয়া যায়,
পিছনেও আছে সেই পথে ফুলদল!
উভয় সঙ্কট মাঝে, কি শোভা সঙ্কোচে লাজে,
কমলে শেহালা মাথা আননে আঁচল!
সেই যে করেছি খেলা আঁখি ভরা জল!

৫

আননে আঁচল 'কুসু' মহা ভাবনায়!
অর্দ্ধেক কপোল রাগে, পশ্চিমের অর্দ্ধভাগে,
লেগেছে গোলাপী আভা আকাশের গায়!
বালিকারা আশে পাশে, তেমনি আনন্দে হাসে,
ঢেউয়াইয়া তপোবন সোণালী সন্ধ্যায়!
তারি যেন লেগে ছিটা, তাহা জলে মিঠা মিঠা,
পূরবের অর্দ্ধাকাশে অর্দ্ধ নীলিমায়!
মন্দিরে আরতি করে, দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
দিদি ডাকে "ও কুসুম, বাড়ী আয় আয়!"
বুল্‌বুল্ ভাবে মনে, বুড়ী বুঝি এ জনমে,
কখনো বকুল ফুল বিঁধে নাই পায়!
বুড়ী যে হয়েছে বুড়ী, কাছাকাছি তিন কুড়ি,
তবুও দাদার হাওয়া ল.গ নাই গায়!
'শ্যামা' ভাবে ঘরে গিয়া, এ শূন্য কলসী নিয়া,
কি করিয়া কি বলিবে শুধাইলে মায়?
দিদি ডাকে "ও কুসুম, বাড়ী আয় আয়!"

৬

প্রসন্ন বসন্ত সন্ধ্যা প্রসন্ন গগন,
জয় জয় দেবপুরে পুণ্য তপোবন!
প্রসন্ন প্রসন্নতম, সুপ্রসন্ন ভাগ্য মম,
ততোধিক সুপ্রসন্ন কুসুমের মন!
স্নেহেমাখা, লাজেঢাকা, প্রাণে রাখা, দূরে থাকা,
আপনারে ঢেলে দেওয়া দয়ার্দ্র নয়ন,
আবার তুলিয়া বালা, শত জন্ম করি আলা,
সরাইয়া হৃদয়ের ভস্ম আচ্ছাদন,

চাহিলা মধুরে হাসি, প্রথম সুধাংশু রাশি,
সীমাশূন্য নীলসিন্ধু করিয়া চুম্বন!
সে ভুলিল আমি ছাড়া, তারে ছাড়া আমি হারা,
কি যেন আবেশময় বিরশ স্বপন,
নয়নে নয়নে সেই আত্ম সমর্পণ!

৭

জ্বলিছে অমৃত দীপ চন্দ্র তারকায়,
নীল চন্দ্রাতপ তলে গগনের গায়!
কোকিলা দিতেছে হুলু, চিলাইর কুলু কুলু,
ললিত পঞ্চমে গায় শ্যামা পাপিয়ায়!
সে পবিত্র মহোৎসবে, জগতবাসীরে সবে,
আতর গোলাপ বায়ু আপনি বিলায়!
কামিনী চামেলী বেলী, এয়োতারা সবে মেলি,
মন্দিরে মঙ্গল শংখ বাজে উভরায়!
প্রেমের দেবতা হর, মহাদেব মহেশ্বর,
বিশ্বরূপে বিরাজিত প্রেমের সভায়!
জানিনা বুঝিনা ঠিক্, কি আনন্দে দশদিক্,
জগৎ ভাসিয়া গেল প্রেমের সুধায়!
হায় সে মাহেন্দ্র ক্ষণ, এ জীবনে অতুলন,
সে অমৃতযোগ দৈব যোগে পাওয়া যায়!
নয়নে নয়ন দিয়া, দু'জনে করিনু বিয়া,
সেই সন্ধ্যাকালে সেই কদম্ব তলায়,
দিদি ডাকে "ওকুসুম, বাড়ী আয় আয়!"

৮

সেই—
কুসুমের বনে পাওয়া কুসুম আমার,
শত জনমের যেন কত পুরস্কার!
কেরে তারে কেড়ে নিয়া, কারে দিল পরাইয়া,
সেকিগো রাক্ষস এত দয়া নাই তার!
প্রেমের নন্দন বন, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মন,
শ্মশান করিয়া দিল শ্মশান আবার!
কার পাকাধানে মই, কবে আমি দিছি কই?
আমি ত আগুন বুকে দেই নাই কার!
তবে জোরে বলে ছিঁড়ে, সে পুণ্য কুসুমটীরে,
লুঠে নিয়া দিল কারে পাপী দুরাচার?
আমি ত আগুন বুকে দেই নাই তার!

৯

হায় হায় একি সত্য, একি জাগরণ?
আমার কুসুম হার, সে নাকি হইল কার,
কল্পনা করিতে যেন পুড়ে যায় মন!
একি লজ্জা একি লাজ, আমারি কুসুম আজ,
সে নাকি হইল কার কণ্ঠের ভূষণ!
ভাবিতে পারিনা আর, অসহ্য যন্ত্রণা তার,
হিংসায় জ্বলিয়া যায় ভূতল গগন!
দংশে যেন বিষধরে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
কি যেন গরল প্রাণে করে উদ্গীরণ!
অসাধ্য সে ঘৃণা লজ্জা ক্রোধ নিবারণ!

১০

ভুলিবে বালিকা সেই ভুলিবে কুসুম,
ভুলিবে সে ছেলেখেলা, বসন্তে বিকাল বেলা,
দু'দিনে হইবে তার স্মৃতি সম ভ্রম!
অনা'সে ভুলিবে সেই, নারীর স্বভাব এই,
অবলার আঁখি ভরা বারমেসে ঘুম!
আরো যে দেখেছি নারী, সব আমি চিনি তারি
রমণীর যতকিছু দিন চারি ধূম?
ভুলিবে বালিকা সেই—ভুলিবে কুসুম!

১১

বালিকা কুসুম বটে ভুলিবে সকল,
শত জাগরণ দিয়া, আমারি জ্বলিবে হিয়া,
বিঁধিয়া রহিবে বুকে "পথে ফুলদল!"
স্বপনে শুনিব খালি, বালিকার করতালি,
চমকি দেখিব সেই আননে আঁচল!
সে রক্ত কপোল ছবি, অৰ্দ্ধ অস্তগত রবি,
হৃদয়ে ঢালিবে সদা রাঙা হলাহল!
জ্বলিবে জীবন-ব্যাপি শ্মশান কেবল!
ছাড়িয়া সুরভি ফুল বায়ু যদি যায়,
যদিও বিরহী বেশে, কেঁদে ফিরে দেশে দেশে
আতর অমৃত গন্ধ তবু থাকে গায়!

তেমনি তাহারে ত্যজি, যদিও এসেছি আজি,
তবু সে অমর জ্যোতি উছলে হিয়ায়!
দেখি সে কামিনী গাছে, তারি হাসি ফুটে আছে,
চাঁদের জ্যোস্নামাখা ঝরে মলয়ায়!
দেখি সেই দেবপুরে, দাঁড়াইয়া দূরে দূরে,
নয়নে নয়নে 'কুসু' আজো চুমো খায়!
মৃদুল মলয়ানিলে, আলিঙ্গন ঢেলে দিলে,
কাঁকাল ভাঙ্গিয়া পড়ে কদম্ব তলায়!
দিদি ডাকে "ও কুসুম, বাড়ী আয় আয়!"

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বৈদিক-সাহিত্য।

(পরিশিষ্ট গ্রন্থ।)

পরিশিষ্ট গ্রন্থ সমূহ বৈদিক সাহিত্যের চরম অবস্থা ও যথেষ্ট অবনতি প্রকটিত করিতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছন্দোময়ী পুস্তিকা ভারতীয় প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের অধস্তন সীমা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভারতীয় আর্য্য-সমাজের ক্রমিক অবনতি ও অধোগতির পরিচয় স্পষ্টরূপে প্রদান করিতেছে। সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই বৈদিক সাহিত্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল সংঘাতে হিন্দুধর্ম্মের সুদৃঢ় বন্ধন শিথিলীভূত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল উচ্ছ্বাসে সুপ্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের গতি বিরুদ্ধ ও বিলুপ্তপ্রায় হয়, এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতিহত স্রোত নবাবিস্ফূর্ত্ত পৌরাণিক ধর্ম্মপথে নানাবিধ শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে প্রতীপ বায়ুর প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রশান্ত তটিনীর হৃদয়ের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের কঠোর শাসন ও জাতিভেদের বৈষম্যবাদে প্রপীড়িত ও নিগৃহীত ভারতীয় আর্য্যসমাজ উত্তালতরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। বৌদ্ধধর্ম্মের তাড়িততেজ জীবন্মৃত আর্য্যসমাজের জড়ভাবাপন্ন দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। বৌদ্ধধর্ম্মের সাম্যবাদ ও বিশ্বজনীন প্রেমবাদে প্রাচীন আর্য্যসমাজে অভিনব জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লোপের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণের বিদ্যা ও বুদ্ধি, উন্নতি ও ক্ষমতা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, কিয়ৎকালের নিমিত্ত পর্য্যুদস্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অপ্রতিহত বেগ নিরুদ্ধ করিয়া বৈদিকধর্ম্মের অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপে সমাজের হৃদয় আকর্ষণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনর্ব্বার দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত সরল ও সুখবোধ্য ভাষায় পরিশিষ্ট নামক গ্রন্থাবলী এই সময়ে বিরচিত হইয়া থাকিবে। ইহাতে কোনরূপে কৃতকার্য্য না হওয়াতে, হিন্দুসমাজের অগ্রণী মহর্ষিগণ অনুষ্ঠানবহুল বৈদিকধর্ম্মে সমাজের অনাস্থা ও অনাদর অনুভব করিয়া তাহার স্থানে লোকরঞ্জক পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং অতি সরল ও সহজ ভাষায় বহুবিধ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ রচনা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের কলেবর সবিশেষরূপে বর্দ্ধিত করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাবাদের বিজয়দুন্দুভির নিনাদে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বহুবর্ষ পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় থাকে। অবশেষে হিন্দুধর্ম্মে জনসাধারণের অনুরাগ ও সহানুভূতি

আকর্ষণের নিমিত্ত হিন্দুধর্ম্মের পরিচালক প্রতিভাশালী মহর্ষিগণ কল্পনাবলে অসংখ্য দেবদেবীর সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মক্ষেত্রে নবযুগের অবতারণা করেন এবং নবগঠিত এই পৌরাণিক ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে বিদূরিত করিতে আরম্ভ করেন।

প্রাচীন আর্য্যগণ পঞ্চনদবিধৌত পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া সরল মনে ও নিরুদ্বিগ্ন হৃদয়ে স্ব স্ব চিন্তা ও ভাবনার স্রোতকে অসংযতভাবে প্রবাহিত হইতে দিয়া অজ্ঞাতভাবে ভারতীয় আর্য্যসমাজের ধর্ম্ম ও নীতি, সভ্যতা ও সাহিত্য, গৃহধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম ও সামাজিক ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রকৃতিদেবীর ভীমকান্তরূপে বিস্মিত ও মোহিত আর্য্যঋষিগণ যে সকল স্তোত্রমালা দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইতেই এই সময়ে ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্র রচিত হইতে আরম্ভ হয়। আর্য্যসমাজের তখন শৈশব অবস্থা। শৈশবের সরলতা, মধুরতা ও পবিত্রতা সেই সময়ে সমাজের পূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে। অনন্তশক্তিমান চৈতন্যময় পরমেশ্বরের বিভিন্ন শক্তির বিকাশ জড়জগতে বিরাজিত দেখিয়া আর্য্যগণের ভক্তিপ্রবণ হৃদয় ভক্তিভরে উৎফুল্ল হইতেছে। নৈসর্গিক অচৈতন্য শক্তিসমূহের আরাধনায় প্রেমরসাপ্লুত ও ভাবাশিষ্ট আর্য্যহৃদয় হইতে মনোহারিণী কবিতার উৎস নিঃসৃত হইয়া চতুর্দ্দিক আপ্লাবিত করিতেছে। নিবিড় অরণ্যানীর বিভীষিকাময়ী নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মধুর স্বরলহরী আকাশমার্গে উড্ডীন ও বিলীন হইতেছে।

কালক্রমে আর্য্যসমাজের সুখময় শৈশব অবস্থা অতিবাহিত হইল। সঙ্গীতময়ী কবিতা ও স্তোত্র মালার রচনা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। প্রকৃতিদেবীর প্রিয়তম পুত্র কবিতা-প্রণেতা ঋষিগণ আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠা বিধান করিয়া ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। কবিসম্প্রদায়ের অন্তর্দ্ধানের পর একদল সুযোগ্য ও সুবিজ্ঞ কাব্যসংগ্রাহক আর্য্যসমাজে আবির্ভূত হইলেন। এই সংগ্রাহকগণ কবিতা রচনায় সম্যক নিপুণ না হইলেও, কবিতার অমৃতোপম রসের আস্বাদনে অপারক ছিলেন না। কবিগণের শীর্ষস্থানীয় এই সংগ্রাহক ঋষিগণ নিরতিশয় যত্ন ও সাবধানতার সহিত পূর্ব্বপুরুষবর্গের হৃদয়কন্দর-নিঃসৃত সংখ্যাতীত কবিতামালা একত্র সংগৃহীত করিয়া যথেষ্ট ক্ষমতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহাদেরই যত্নে বৈদিকমন্ত্র একত্র সঙ্কলিত হইয়া বেদসংহিতায় পরিণত হয়। সংহিতার স্থায়িত্ব বিধান ইঁহাদেরই অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে নিষ্পন্ন হয়। প্রাচীন আর্য্যসমাজের ধারাবাহিক চিন্তাপ্রবাহের কোনও অংশ সেই সময়ে বিলুপ্ত, অপ্রচলিত ও বোধাতীত হয় নাই। জাতিভেদের কঠোর নিয়মাবলী তখনও সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজের স্বাধীনতা বিকাশের পক্ষে অন্তরায় সংঘটিত করে নাই। দেবপ্রতিমা বা দেবমন্দিরের অস্তিত্ব তখনও সমাজে কল্পিত হয় নাই।

আর্য্যসমাজের ক্রমিক বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সংহিতা তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইল। সংহিতার সরল ভাষা ক্রমে আর্য্যসমাজের অবোধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। সমাজে জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত হইয়া ব্রাহ্মণজাতিকে জনসাধারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া তুলিল। যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া-

কলাপ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্যাখ্যার সাহায্য ভিন্ন সংহিতার অধ্যয়ন অসাধ্য হইয়া উঠিল। এই সময়ে সংহিতার ব্যাখ্যারূপে ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণজাতি দ্বারা বিরচিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রতিভাশালী পূর্ব্বপুরুষগণের যদৃচ্ছা-সম্ভূত বেদসংহিতায় উল্লিখিত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বিস্তীর্ণরূপে সুপ্রণালী-বদ্ধক্রমে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইল। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলিয়া সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতে লাগিল। সংহিতাদির অধ্যয়ন ধর্ম্মানুমোদিত অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইল। আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণজাতির সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের ভাবী অবনতি ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সূচনা করিল। সমাজের এক অংশ প্রবল হইয়া অপর ভাগকে নিস্তেজ ও নির্জীব করিতে আরম্ভ করিল।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থের রচয়িতা ও সংগ্রাহকগণ জ্ঞানালোচনায় যথেষ্ট বিজ্ঞতা ও বিশিষ্ট ধীরতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানা-লোকে আলোকিত হইয়া তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা বিশ্বাস করিতেন, যাহা সমাজের কল্যাণকর বলিয়া ভাবিতেন, তাহাই সুপ্রণালীক্রমে ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহা-দের লিখিত ও প্রচারিত অভিমত নিঃসন্দি-গ্ধচিত্তে ও অবনত মস্তকে সমকালীন ও ভবিষ্যৎকালীয় আর্য্যসমাজ গ্রহণ ও প্রতি-পালন করিবে, এই অভিপ্রায়েই এই সকল সুবিজ্ঞ বৈদিকাচার্য্যগণ তাহা লিপিবদ্ধ করেন। সেই সময়ে সমাজের সর্ব্বত্র তাঁহা-দের অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সমদর্শিতা ন্যায়পরায়ণতার যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ক্ষমতার যথোচিত পরিচালন দুর্ব্বলমতি ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। ভারতীয় আর্য্য-সমাজের অগ্রণী ও শিক্ষক ব্রাহ্মণগণ তাঁহা-দের হস্তগত দীর্ঘকালব্যাপিনী প্রভুতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার না করিয়া সর্ব্বত্র ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের প্রণীত বিধিব্যবস্থা নিরাপত্তিতে আর্য্যসমাজে চিরকাল প্রতিপালিত হইবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। সেই সময়ে সমাজের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল, অন্ত-র্বিদ্রোহজনিত কোনও ভয়ের কারণ বিদ্য-মান ছিল না। অবিশ্বাস, নাস্তিকতা ও মতভেদ তখনও সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই। বৌদ্ধদেবের ন্যায় কেহ তাঁহা-দের বিরুদ্ধে নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের পরস্পর মতভেদ ও অসামঞ্জস্য প্রভৃতি দোষ প্রদর্শনে সাহসী হইবে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সময় সময় সংহিতার সরল ও কবিত্বপূর্ণ মন্ত্রের অর্থ পরিবর্দ্ধিত, রূপান্তরিত ও বিকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ গ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপে প্রযোজ্য বলিয়াই যেন মন্ত্র সকল বিরচিত হইয়াছিল, এইভাবে তাহারা ব্যাখ্যাত ও বিবৃত হইয়াছে। আর্য্য-সমাজে সরলভক্তি, প্রীতি, দৃঢ়বিশ্বাস ও ধর্ম্ম-জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যাগাদি অনুষ্ঠানের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্যের আয়তন ও পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-নির্দ্দিষ্ট জটিল ধর্ম্ম প্রণালী এবং আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়া কাণ্ড দুর্ব্বোধ ও দুরায়ত্ত হইয়া উঠিল। তৎকাল-প্রচলিত সমস্ত বিষয় সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে

অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করা স্মৃতি দৌর্ব্বল্যাদি কারণে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় তাহা লিখিয়া শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভূত হইতে লাগিল। প্রখর স্মৃতি শক্তির সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান লাভ কি উপায়ে সুসিদ্ধ হইতে পারে, সমাজের অগ্রণী বৈদিকাচার্য্যগণ তাহা উদ্ভাবনে যত্নপর হইলেন। স্বল্পাক্ষর-গ্রথিত শিক্ষাকল্পাদি বিভিন্ন বিষয়ে সূত্র রচনা করিয়া তাঁহারা শিষ্যমণ্ডলীকে উপদিষ্ট করিতে লাগিলেন। সূত্র সাহিত্যের রচনায় ও প্রচলনে তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

সূত্রকারদিগের সময়ে ব্রাহ্মণ-রচকগণের আত্মপ্রসাদ ও অহম্মুখতা, ক্ষমতা ও নির্ভীকতার ভাব ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হয়। দুরধ্যেয়, ক্রিয়াকাণ্ডপূর্ণ, সুবিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণগ্রন্থের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও তদনুমোদিত আয়াসসাধ্য অনুষ্ঠানে সময়যাপন আর্য্যসমাজ ক্লেশকর বিবেচনা করিতে লাগিল। বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক আচার্য্যগণের প্রচারিত মতভেদ বিভিন্ন সময়ে সমাজ মধ্যে লব্ধপ্রসর হইয়া বিষম বিরোধ ও দুর্নিবার শত্রুতা সঞ্চারের সূত্রপাত করিল। সমাজের অধিপতি সুবিজ্ঞ বেদবিৎ আচার্য্যগণ বুঝিতে পারিলেন যে, সংক্ষিপ্ত ভাবে সুযুক্তির সহিত সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় নবীকৃত আকারে আর্য্যসমাজে প্রচারিত করিতে না পারিলে, তাহা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবে না। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণে উল্লিখিত সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয় নির্ব্বিশেষে পরিত্যক্ত হইয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় অতি সংক্ষেপে সবিশেষ যত্নের সহিত স্বল্পাক্ষর-গ্রথিত সূত্রসাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে সংগৃহীত হয়। পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ও দুরায়ত্ত আকার অন্তর্হিত হইয়া সূত্র-সাহিত্য কর্ম্মোপযোগী নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে। বাক্যানুবাদের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের স্থানে স্থানে যে ভাষা অবলম্বিত হয়, সূত্র গ্রন্থে সেই সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক ভাষা শৌনক ও কাত্যায়ন প্রভৃতি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়। বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট ও অনুমোদিত যাগাদি ক্রিয়াকাণ্ডের স্বল্পায়াসে পরিজ্ঞান উৎপাদনের নিমিত্ত সমাজে সূত্রসাহিত্য রচিত ও প্রচারিত হয়।

বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও বিধি ব্যবস্থায় লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি ও অনুরাগ দিন দিন হ্রাস হইতেছিল বটে, কিন্তু তখনও সেই অনাদর ও অশ্রদ্ধার ভাব লোকে স্ব স্ব অন্তস্থলের গূঢ়তম অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৎকালে সমাজ সর্ব্ববিষয়ে পূর্ব্বপুরুষগণের পদ অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। আর্য্যসমাজের হৃদয় শংসয়দোলায় দোলায়মান হইতেছিল বটে, কিন্তু তখনও অন্তর্বিদ্রোহে সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে নাই, তখনও সমাজে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা, অভক্তি ও অশ্রদ্ধার বাহ্য বিকাশ পরিলক্ষিত হয় নাই, তখনও প্রাচীন রীতি, সভ্যতা ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে সন্দেহাবিষ্ট সমাজ সাহসী হয় নাই। প্রবল ঝটিকা-প্রবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকে যেমন শান্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজিত থাকিয়া প্রকৃতি দেবীর বিভীষিকাময়ী উন্মাদিনী মূর্ত্তির সূচনা করে, আর্য্যসমাজের সর্ব্বত্র সেইরূপ ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমাজের অগ্রণী সুবিজ্ঞ ও

সুচতুর সূত্রকারগণ এই বাহ্যিক আকারের অভ্যন্তরে অবিশ্বাস ও অসন্তোষের নিগূঢ় ভাব স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-রচক নির্ভীকহৃদয় মহর্ষিদিগের ন্যায় সূত্রকারগণ আপনাদিগের মত অভ্রান্ত এবং আপনাদিগকে দেবানুগৃহীত বলিয়া প্রচারিত করেন নাই। সূত্র-সাহিত্যের অন্তিম অবস্থায় সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে। তখনও তাহার প্রতাপ সমাজে বিশেষরূপে বিস্তৃত ও অনুভূত হয় নাই।

পরিশিষ্ট সাহিত্যে পূর্ব্বতন সাহিত্যের নির্ভীকতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। সমাজে এখন আর পূর্ব্ববৎ শান্তি ও নিরাপত্তি বিরাজিত নাই, ব্রাহ্মণাদি বৈদিক গ্রন্থের অনুশাসনে লোকের আর পূর্ব্ববৎ আস্থা নাই, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও মন্ত্রাদিতে সেই সরল ও নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস নাই, বেদবিৎ ব্রাহ্মণের সেই প্রভুত্ব, ক্ষমতা ও সম্মাননা নাই, দীর্ঘকালব্যাপী সেই অতি কঠোর ও পরম পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যপালন ও বেদাধ্যয়ন নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়া অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও ব্যক্তিগত চরিত্রবাদের ধ্বজা জয়রোলের সহিত উড্ডীন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম, জাতিভেদ ও আভিজাত্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের বিশ্বজনীন প্রেম ও সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব আর্য্যসমাজে লব্ধপ্রসর হইয়া যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধনের প্রতি অঙ্গ শিথিলীকৃত করিয়া তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতিকূল উচ্ছ্বাসে সমাজের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য সমাজের অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও কঠোরতম শাসনে আপনাদিগকে নিতান্ত উৎপীড়িত ও জর্জ্জরিত জ্ঞান করিয়া দলে দলে জনসাধারণ পৈতৃক হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৈষম্যবাদ ও জাতিভেদ পরিত্যাগ পুরঃসর বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তীর স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। বর্ণ, জন্ম ও কর্ম্মজনিত আভিজাত্য বিদূরিত হইয়া বর্ণজন্মনির্ব্বিশেষে জ্ঞান ও চরিত্রের মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ আভিজাতশক্তির প্রাধান্য উন্মূলিতপ্রায় হইয়া উদার ও বিশ্বব্যাপী প্রজাশক্তির প্রভাব সংস্থাপিত হইতেছে। উদার ও মহান বৌদ্ধধর্ম্মের জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া অনুদার ও সঙ্কীর্ণমনা হিন্দুধর্ম্মের অধঃপতন সূচনা করিতেছে। বহু আয়াসেও ভয়াতুর হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়িনী গতির নিরোধ সাধন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল ও চিরপ্রপীড়িতা সমাজের উন্মার্গগামী প্রবৃত্তি প্রশমিত করিতে পারিতেছে না। সম্ভবতঃ এই সময়েই পরিশিষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া বৈদিক সাহিত্য ও ধর্ম্মের অন্তিম দশা সূচিত হয়। পরিশিষ্টকারগণ বৌদ্ধধর্ম্মের তুমুল আন্দোলনে আপনাদের পরাজয় ও দুর্ব্বলতার বিষয় বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন। যে দিন মহাত্মা শাক্যসিংহ মগধে সাম্য, মৈত্রী ও চরিত্রবলের মহিমা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া ভারতে নব যুগের অবতারণা করেন, সেই দিন হইতে বৈদিক ধর্ম্ম ও সাহিত্যের অধোগতি আরম্ভ হয়, সেই দিন হইতে হিন্দুধর্ম্ম নবীন ও লোকরঞ্জন আকার ধারণ করিয়া ভারতবর্ষে স্বীয় প্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে, সেই দিন হইতে সংস্কৃত ভাষা সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের স্থানে আধুনিক পৌরাণিক সাহিত্য

সংস্থাপিত করিয়া নূতন বেশে আবির্ভূত হইতে চেষ্টা করিতে থাকে।

সূত্র সাহিত্যে যে সকল বিষয় অপ্রয়োজনীয় বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে, যে সকল ধর্ম্মমত, ক্রিয়ানুষ্ঠান, যজ্ঞীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৎকালে এতদূর পরিজ্ঞাত ও প্রচলিত ছিল যে, সূত্রকারগণ সেই বিষয়ে কোন কথা লিপিবদ্ধ করার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই, পরিশিষ্টে তাহাই সরল ও সুখবোধ্য গদ্যপদ্যময় ভাষায় বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত, ব্যাখ্যাত ও মীমাংসিত হইয়াছে। সূত্রকারগণ যাহা অতি ক্ষুদ্র ও নিষ্প্রয়োজনীয় বিবেচনায় অনাদর ও অবহেলার সহিত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পরিশিষ্টকার তাহাই অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিত্যাজ্য মনে করিয়া বিশিষ্ট যত্ন, গাম্ভীর্য্য ও ধীরতার সহিত স্বরচিত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। সূত্রকার যে বিষয় সম্পর্কে সাধারণ ভাবে উপদেশ প্রদানই পর্য্যাপ্ত মনে করিয়াছেন, পরিশিষ্টকার সেই সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সূত্রসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত, দুর্ব্বোধ্য ও বৈজ্ঞানিক ভাষার পরিবর্ত্তে পরিশিষ্টে সরল, গদ্যপদ্যময় পুরাণের ভাষা অবলম্বিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট সকল পুরাণ ও উপপুরাণের ন্যায় প্রায় অনুষ্টুভ ছন্দে বিরচিত। মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্য প্রদর্শনের নিমিত্ত অন্যান্য কতিপয় সহজ ছন্দও প্রদত্ত হইয়াছে। পুরাণের স্থানে স্থানে পরিশিষ্টের নানা অংশ উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। পরিশিষ্টের মধ্যে এমন অনেক প্রয়োজনীয় বিবরণ আছে, যাহা সূত্র সাহিত্যের কুত্রাপি পাওয়া যায় না। সূত্রকারগণের নামেই অনেক পরিশিষ্ট প্রচলিত ছিল। ফলতঃ, যাহাতে সুবিস্তীর্ণ ও দুরায়ত্ত ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্যতিরেকেই সর্ব্বসাধারণে অল্প সময়ের মধ্যে বেদবিহিত ক্রিয়াকাণ্ডাদি সূত্রসাহিত্যের সাহায্যে অভ্যাস ও আয়ত্ত করিয়া যাগযজ্ঞাদি বহুবিধ অনুষ্ঠান সম্পাদনে সমর্থ হয়, পরিশিষ্টে সেই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। সূত্র সাহিত্য অবলম্বনে তাহার অব্যবহিত পরেই পরিশিষ্ট সাহিত্য রচিত হইতে থাকে।

এই শ্রেণীর অনেক ক্ষুদ্র পুস্তিকার আদি বা অন্তে মহর্ষি শৌনক ও কাত্যায়নের নাম উল্লিখিত আছে। ইহার কোন কোন পুস্তিকা সূত্রকারগণের দ্বারা রচিত হইয়া থাকিবে। পরিশিষ্টে নূতন নূতন দেবদেবীর নাম, বহুবিধ পৃথক্ পৃথক্ জাতি, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সুপ্রচলিত লোকরঞ্জন ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের বিষয় সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু ত্রিমূর্ত্তির একতমের সবিশেষ প্রাধান্যের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। বেদবিৎ পরিশিষ্টকারগণ বৈদিক ধর্ম্মমত, ধর্ম্মানুষ্ঠান্ ও ক্রিয়াকাণ্ড লৌকিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের চিন্তাস্রোত নবাবিষ্কৃত কোনও পথে প্রবাহিত না হইয়া বেদনির্দ্দিষ্ট মার্গেরই অনুসরণ করিয়াছে।

পরিশিষ্ট গ্রন্থ পাণিনির পরবর্ত্তী সময়ে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। মহর্ষি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রের যে স্থলে (৪।১।৪৮) পরিশিষ্ট শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু পরিশিষ্ট সাহিত্য মহর্ষি পাণিনির পরিবর্ত্তী হইলেও, তাহা নিতান্ত আধুনিক নয়।

'চরণব্যূহ নামক গ্রন্থে বৈদিক শাখা সকলের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রের টীকাকার

রামকৃষ্ণের মতে এই 'চরণব্যূহ' মহর্ষি শৌনক প্রণীত। মহর্ষি গোভিলের পুত্র 'গৃহ্যসূত্র' নামে সামবেদীয় গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রের পরিশিষ্ট রচনা করেন। মহর্ষি কাত্যায়ন 'ছন্দোগপরিশিষ্ট' নামে সামবেদীয় আর একখানি পরিশিষ্ট রচনা করেন। আর কতকগুলি পরিশিষ্ট কাত্যায়নের মত অনুসারে তাঁহার শিষ্য ও বংশধরগণ দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে।* অথর্ব্ববেদীয় কল্পসূত্রের প্রণেতা মহর্ষি কুশিক ৭৪ খানি অথর্ব্ববেদের পরিশিষ্ট রচনা করেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

চরণব্যূহে যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ীদিগের ১৫টী শাখার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা পরিশিষ্ট ও বিষ্ণুপুরাণ দ্বারাও চরণব্যূহের এই নির্দ্দেশ সমর্থিত হইতেছে। কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের প্রকাশিত সুবিখ্যাত 'শব্দকল্পদ্রুম' গ্রন্থে যে চরণব্যূহ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে বাজসনেয়ী ১৭টী শাখারই উল্লেখ আছে। কাত্যায়নীয় শাখা এই দুই অতিরিক্ত শাখার অন্যতম। ইহা হইতে এই অনুমান অসঙ্গত নহে, যে সময়ে চরণব্যূহ প্রথমত সঙ্কলিত হয়, তখন এই দুই শাখা সৃষ্ট হয় নাই। চরণব্যূহের মতে পরিশিষ্টের সংখ্যা অষ্টাদশ মাত্র। চরণব্যূহের এই নির্দ্দেশ যজুর্ব্বেদ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। যজুর্ব্বেদের ন্যায় অপর তিন বেদেরও বহুতর পরিশিষ্ট বিদ্যমান ছিল।

ঋগ্‌বিধান, বহ্বৃচ পরিশিষ্ট, শাংখ্যায়ন পরিশিষ্ট, আশ্বলায়ন পরিশিষ্ট, আশ্বলায়ন গৃহ্য পরিশিষ্ট ঋগ্বেদীয় সাহিত্যের অন্তর্গত। সামবিধান, ছন্দবিচয়, ক্রতুসংগ্রহ, বিনিয়োগ-সংগ্রহ, সোমোৎপত্তি, কাত্যায়নীয় ছন্দোগপরিশিষ্ট (কর্ম্মপ্রদাপ), আর্ষ ব্রাহ্মণ, দেবতাধ্যায়, দালভ্য পরিশিষ্ট, সামবেদীয় নৈগেয় শাখায় প্রচলিত আর্চ্চিকার আর্ষ ও দৈবত পরিশিষ্ট নামে অনুক্রমণীদ্বয় সামবেদের অন্তর্ভুক্ত।

"ছন্দবিচয়ে, সামবেদীয় ছন্দঃ সমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সামবেদীয় 'নিদানসূত্র,' 'উকমশাস্ত্র', 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণ,' ও পিঙ্গলাচার্য্যের কৃত ছন্দঃসূত্র ইহার স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'ক্রতুসংগ্রহে' সামবেদীয় যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের এবং 'বিনিয়োগ সংগ্রহে' সামমন্ত্র প্রয়োগের বিষয় উল্লিখিত আছে। তাণ্ড্যব্রাহ্মণের অতি দুর্ব্বোধ অংশের ভাষ্য রচনায় মহামহোপাধ্যায় সায়নাচার্য্য এই উভয় পরিশিষ্টেরই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। দালভ্য ঋষির নাম ছান্দোগ্য উপনিষদে ও পুরাণাদি গ্রন্থে দেখা যায়। আর্ষ্য ও দৈবত পরিশিষ্টে শাকপূণি ও যাস্ক প্রভৃতি নিরুক্তকারের, শৌনক, আশ্বলায়ন, ঐতরেয়ী, শাতপথিক ও কাঠক প্রবচনের এবং সামবেদীয় তাণ্ড্য (পঞ্চবিংশ) ব্রাহ্মণের উল্লেখ দৃষ্টে এই পরিশিষ্ট দুইখানকে প্রাচীন বলিয়াই অনুমিত হয়। পরিশিষ্ট ভিন্ন "পদ্ধতি" নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে। তাহাতে সামবেদীয় সূত্রাদির সংক্ষিপ্তসার ও ভাষ্য প্রভৃতি লিখিত আছে। মধ্যে মধ্যে সূত্র গ্রন্থে অনুল্লিখিত বা আবশ্যক বোধে, পরিত্যক্ত বিষয় যত্নপূর্ব্বক অবতারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

* অষ্টাদশ পরিশিষ্টানি। তদাদৌ যূপলক্ষণং।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রবক্ষ্যামি বৃক্ষাণাং পশুভিঃসহ।
নিন্দাপ্রশংসে বক্ষ্যামঃ কাত্যায়নমতাৎতথা॥

চরণব্যূহের নির্দ্দেশ মতে অথর্ব্ববেদীয় ৭০ খান পরিশিষ্ট বিদ্যমান ছিল এবং তাহার সমুদয়ই মহর্ষি কুশিক কর্ত্তৃক প্রণীত হয়। ডাক্তার হোগ সাহেবের মতে অথর্ব্ববেদের পরিশিষ্টের সংখ্যা ৭২ খান এবং অধ্যাপক ওয়েবারের মতে (অথর্ব্ববেদীয় চরণব্যূহ সমেত) ৭৪ খান। ইহাদের অধিকাংশই শ্লোকাকারে রচিত হইয়াছে। পুরাণের ন্যায় এই সকল গ্রন্থে পরস্পর কথোপকথন দৃষ্ট হয়। গৃহধর্ম্ম, জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল, শাকুনিক ও সামুদ্রিক শাস্ত্র, নানা উৎপাতের শান্তিবিধানাদি বিষয় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ইহাদের অন্তর্গত কোন কোন অধ্যায় জ্যোতিষ সংহিতাদি গ্রন্থে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদীয় চরণব্যূহের মতে সমগ্র অথর্ব্ববেদে দুই হাজার পর্য্যায় (সূক্ত) এবং ১২৩৮০টী অথর্ব্বণ মন্ত্র বিদ্যমান আছে। ইহাতে নিম্নলিখিত ২০জন অথর্ব্ববেদীয় আচার্য্যগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

১। বৃহস্পতি। ২। অথর্ব্বণ। ৩। ভৃগু। ৪। ভার্গব। ৫। অঙ্গিরা। ৬। আঙ্গিরস। ৭। কবি উশনা। ৮। শৌনক। ৯। নারদ। ১০। গৌতম। ১১। কাঙ্কায়ন। ১২। কর্ম্মঘ। ১৩। পিপ্পলাদ। ১৪। মাহকি। ১৫। গর্গ। ১৬। গার্গ্য। ১৭। বৃদ্ধগর্গ। ১৮। আত্রেয়। ১৯। পদ্মযোনি। ২০। ক্রৌষ্টুকি।

যজুর্ব্বেদীয় চরণব্যূহের মতে যজুর্ব্বেদের পরিশিষ্ট সংখ্যা চরণব্যূহ সমেত ১৮ খান। যূপলক্ষণ, ছাগলক্ষণ, প্রতিষ্ঠালক্ষণ, অনুবাক সংখ্যা, শ্রাদ্ধকল্প, শুল্বিকানি, ঋগ্‌যজুংর্ষি পার্ষদ, ইষ্টকাপূরণ, প্রবরাধ্যায়, উক্থশাস্ত্র, ক্রতুসংখ্যা, নিগমপরিশিষ্ট, যজ্ঞপার্শ্ব, হৌত্রক, প্রসবোত্থান, কূর্ম্মলক্ষণ ও চরণব্যূহ, সমুদয়ে এই আঠার খানি যজুর্ব্বেদীয় পরিশিষ্ট।

যজ্ঞীয় পশু বন্ধনার্থ যূপ কি প্রকারে নির্ম্মিত হইলে যথাবিহিত শুভলক্ষণ সম্পন্ন হয়, তাহাই যূপলক্ষণে বর্ণিত হইয়াছে। সুলক্ষণাক্রান্ত যজ্ঞীয় ছাগাদি পশুর আকৃতি প্রকৃতি ছাগলক্ষণে নিরূপিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধকল্পের যে ভাষ্য বর্ত্তমান আছে, তাহা গোভিল ঋষির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুল্বদীপিকা নামক ক্ষুদ্রগ্রন্থে যজ্ঞীয় বেদি প্রভৃতি নির্ম্মাণের পরিমাণাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইষ্টকাপূরণের কর্ক ও যাজ্ঞিকদের প্রণীত দুইখানি ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে।

'প্রবরাধ্যায়' কাত্যায়ন কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ*। সপ্ত প্রধান প্রবর সপ্তঋষির নামে প্রসিদ্ধ। ভৃগু, অঙ্গিরা, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি ও অগস্ত্য, এই সপ্ত মহর্ষির আটজন বংশধর হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষের বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়া নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন। জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গৌতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য, এই আটজন মহর্ষির সন্তান সন্ততিগণ ৪৯ গোত্র সংস্থাপন করেন। তাঁহাদের বংশবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আট প্রধান গোত্র হইতে পূর্ব্বোক্ত উনপঞ্চাশটী গোত্র ভিন্ন অসংখ্য শাখা-গোত্র উদ্ভূত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের শেষ ভাগে এবং পুরুষোত্তম কৃত প্রবরমঞ্জরী নামক আধুনিক গ্রন্থে ভারতীয় ব্রাহ্মণ-

---

* কাত্যায়নঋষিরচিতো বিপ্রাণাং হিতকাময়া।
অধ্যায় প্রবরাখ্যোহয়ং পুরা ব্রহ্মর্ষিনির্ম্মিতঃ॥
"গোত্রনির্ণয়" নামে এবংবিধ আরও একখানি পুস্তক বিদ্যমান আছে।

দিগের এই অসংখ্য বংশাবলী বিবৃত দেখা যায়। আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশী, ভরদ্বাজ, কুণ্ডিন, ও লৌগাক্ষি প্রণীত কল্পসূত্র, মহাভারত, মৎস্যপুরাণ, মানবধর্ম্মশাস্ত্র (মনু-সংহিতা) প্রভৃতি পুস্তক ও তাহাদের ভাষ্যাদি অবলম্বন করিয়া—পুরুষোত্তম প্রবরমঞ্জরী রচনা করেন। বিভিন্ন কল্পসূত্রাদি গ্রন্থে প্রদত্ত বংশাবলীর পার্থক্য কারণ সহ এই প্রবরমঞ্জরী গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আশ্বলায়ন কল্পসূত্রের দেবস্বামী, বৌধায়ন-সূত্রের অমল, এবং আপস্তম্ব সূত্রের ধূর্ত্তস্বামী, কপর্দ্দী স্বামী ও গুরুদেব স্বামীর রচিত ভাষ্য হইতে নানাস্থল ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত উনপঞ্চাশৎ গোত্রের কোন্ গোত্রে তাঁহার জন্ম, তাহা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ক্রমানুসারিণী নামমালা প্রত্যহ উচ্চারণ করা, প্রত্যেক ব্রাহ্মণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় পাকযজ্ঞে মন্ত্রপূত আহবনীয় অগ্নিকে আহ্বান সময়ে আহিতাগ্নিব্রাহ্মণ এক, দুই, তিন বা পাঁচজন প্রধান গোত্রপতি ও গোত্রপ্রবর্ত্তক পূর্ব্বপুরুষের নাম কীর্ত্তন করিতেন। দেবতাগণের হোতা ও ঋত্বিক্ অগ্নিদেব যজমানের সমন্ত্রক আজ্যাহুতি যেন অভীষ্ট দেবতার সমীপে তাঁহার গোত্রপতি পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রদত্ত আজ্যাহুতির ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে বহন করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত পাকযজ্ঞ সুসম্পন্ন করেন, অগ্নিদেবের নিকটে যথাবিহিত মন্ত্র পাঠ পুরঃসর যজমান প্রতিদিন এই প্রার্থনা করিতেন। প্রাত্যহিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সময়ে পূর্ব্বপুরুষদিগের যে নামাবলী আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণকে পরিকীর্ত্তন করিতে হইত, তাহাই "প্রবর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।* পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম-কীর্ত্তন ব্যতীত প্রাত্যহিক যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইত না। এই নিমিত্তই বৈদিকসাহিত্যের নানা স্থানে এই ঐতিহাসিক বংশাবলী ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখিতে পাওয়া যায়।

'ক্রতুসংখ্যা'য় যজুর্ব্বেদীয় যাবতীয় প্রধান প্রধান যাগাদির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। 'নিগমপরিশিষ্ট' যজুর্ব্বেদের নিরুক্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতে যজুর্ব্বেদ সংহিতার দুরূহ শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে চারি প্রধান বর্ণ ও শঙ্কর (মিশ্র) জাতির উল্লেখ আছে। সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ বরাহমিহির‡ প্রণীত 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থের চতুর্দ্দশ অধ্যায় কূর্ম্মবিভাগ নামে এবং

* জমদগ্নি-ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোঽত্রিগৌতমৌ।
বশিষ্ঠকশ্যপাগস্ত্যা, মুনয়ো গোত্রকারিণঃ॥
এতেষাং হ্যন্যপত্যানি, তানি গোত্রাণি মন্যতে॥
সর্ব্বগোত্রাণি প্রবরগণায়ত্তানি।
গোত্রাণাংতু সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
উনপঞ্চাশদেতেষাং প্রবরা ঋষিদর্শনাৎ॥

তস্য (আহবনীয়স্যাগ্নেঃ) [illegible] প্রার্থনানি তৈস্তৈ মন্ত্রদৃগ্‌ভিঃ এক-দ্বি-ত্রি পঞ্চ সংখ্যাকৈ বিশিষ্টানি, একাবেয়া আর্ষেয়াস্ত্রার্ষেয়াঃ পঞ্চার্ষেয়াঃ "প্রবরা" ইত্যুচ্যন্তে।

‡ বরাহমিহির খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথমভাগে (৫০৫ খ্রীঃ) সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী (অবন্তী) নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতা আদিত্যদাস সুদূর মগধদেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক উজ্জয়িনী নগরে উপনিবিষ্ট হন বলিয়া, বরাহমিহিরের রচিত বৃহজ্জাতকের টীকাকার ভট্ট উৎপল উল্লেখ করিয়াছেন। পিতার নিকটে শিক্ষালাভ করিয়া বরাহমিহির জ্যোতিষশাস্ত্রে সবিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি বৃহৎসংহিতা, সমাসসংহিতা, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহৎ ও লঘুজাতক, বৃহৎ ও লঘু যোগযাত্রা, বৃহৎ ও লঘু বিবাহপটল নামে জ্যোতিষ, সাম-

চতুঃষষ্টি অধ্যায় কূর্ম্মলক্ষণ নামে আখ্যাত। ইহাদের সহিত যজুর্ব্বেদীয় কূর্ম্মলক্ষণ পরিশিষ্টের কোন সংশ্রব আছে কি না, জানি না। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বসন্তে যমুনা তটে।

১

এখনো কি সখি তুমি যেতে বল তার কাছে
দয়া মায়া তেয়াগিয়ে যে সেথায় সুখে আছে?
সুখে আছে ভুলে আছে,
নব রসে মজিয়াছে,
মজে আছে সোহাগের—মল্লিকার পরিমলে,
কেমনে সেথায় গিয়া, লুটাব সে পদ তলে?

২

ঘনসার প্রবাহিত—আহা সেই পদ তল!
তাহাতেই ছিল বাঁধা এই রাধা শতদল,
দেখে শ্যাম রূপ রাশি,
সে ফুল উঠিত হাসি,
প্রেমের সাগরে ভাসি, ধাইত প্রফুল্ল মনে,
বাঁশীয়া নাশিয়া সুখ গেছে নব নিকেতনে!!

৩

যমুনা কাঁদিতে জানে, গায় মরমের গান,
করিব ও গান শুনে এ জীবন অবসান,
রাধার মনের কথা,
গভীর মরম ব্যথা,
ভগিনী তাপিনী বিনা বুঝে নাতো কেহ আর,
কাঁদি আমি—কাঁদে দিদি কুলু কণ্ঠে বারবার;

৪

চিরদিন চিরকাল যমুনা বহিবে কাঁদি
রাধিকার যত জ্বালা আপনার কণ্ঠে বাঁধি,
যদি কভু মোহ তার,
ভেঙে যায় কুবুজার,
আবার বেণুয়া-মুখ—রাধা ব'লে ডাকে যদি
না জাগিবে রাধা আর—উজানে ববে না নদী।

৫

ভালবাসা ছাড়া সখি বুঝিতাম নাহি আন
তাই যদি গেল চলে কি লয়ে বাঁচিবে প্রাণ?
প্রেমের মধ্যাহ্ন-ভানু,
আমার প্রাণের কানু,
রাধা বাঁশরীতে আর গাবেনা তেমন গান,
কি হবে বাঁচিয়া সখি বহিয়ে এ পাপ প্রাণ?

৬

হ'য়ে র'ত মন্ত্র-মুগ্ধ বাঁশি শুনে বৃন্দাবন,
রাধা-নামে শিহরিত মলয়ের সমীরণ,

ত্রিক ও শাকুনিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তর ভাউদাজির গণনা অনুসারে বরাহমিহির ৫৮৭ খ্রীষ্টিয়াব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার 'বৃহজ্জাতক' পুস্তকে (২৬ অধ্যায়, ৫ম শ্লোক) গ্রন্থকার আত্ম পরিচয় প্রদান স্থলে লিখিয়াছেন—

আদিত্যদাস তনয় স্তদবাপ্তবোধঃ
কাপিথকে সবিতৃলব্ধবরপ্রসাদঃ।
আবন্তিকো মুনিমতান্যবলোক্য সম্যগ্
ঘোরাং বরাহমিহিরো রুচিরাং চকার॥(২৬।৫)

উৎপল ভট্ট ৮৮৮ শকাব্দের (৯৬৬ খ্রীঃ) চৈত্রমাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিযুক্ত বৃহস্পতিবারে বৃহজ্জাতকের টীকা সমাপ্ত করেন বলিয়া স্বরচিত টীকার শেষভাগে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চৈত্রমাসস্য পঞ্চম্যাং সিতায়াং গুরুবাসরে।
বস্বষ্টাষ্টমিতে শাকে কৃতেয়ং বিবৃতির্ময়া॥

অধর-রন্ধ্রেতে কাণে,
ফুঁ দিয়ে ধরিত তান
প্রাণ-ছাড়া আর কেহ, না করিত অনুভব,
কানু গেছে প্রেম গেছে—গেছে রাধিকার সব।

৭

তমালের তলে সখি সে নর্ত্তন নাহি আর
নাহি সে নুপুর রুণু—ঝুনু ঝুনু চমৎকার
চূড়া মাথে বাঁকা ঠাম
নাহি সে মোহন শ্যাম
প্রাণ-হীন বৃন্দাবনে সুধু আছে হাহাকার,
আমারে কাঁদিতে দেও সে যে সখি কুবুজার।

শ্রীবেণোয়ারিলাল গোস্বামী।

পুরাতন।

১

এখনো উঠেনি ফুটে নূতনের রবিকর,
এখনো—এখনো তব ধরণীর রাজাসন,
আর একবার তবে শুনে নিই চেনা স্বর,
একবার—শেষবার দেখে নিই ও নয়ন।
নবজাত পাতাগুলি দিয়ে গেলি নূতনেরে,
দিয়ে গেলি নূতনেরে কোকিল কোকিলা তোর.
কোন্ ফুলবালিকায় বেঁধে দিয়ে গেলি এরে,
কোন্ মলয়ের শ্বাসে করিবে সে নিশি ভোর!
যাবি যদি, পুরাতন, দাঁড়া তবে কাছে এসে,
ধীরে ধীরে রাখ আর্দ্র হাতে হাতখানি তোর,
একটী চুম্বন-চিহ্ন রেখে যা ললাট-দেশে,
একটী নিশ্বাস-শ্বাস শিরায় শিরায় মোর;—
মুদিয়া আসিছে আঁখি, খসিয়া পড়িছে তোর,
পুরাতন! কোথা তুমি, রবি কি উঠেছে হেসে!

২

কোন্ দেশে, পুরাতন, ভেসে যাবি বল্,
আর কি হবেনা দেখা তোমায় আমায়?
সাগরে সঁপিতে প্রাণ তটিনী পাগল,—
সে যে যায় সেকি তবে চিরতরে যায়?
বসন্ত ত ফিরে আসে একবার গেলে,
প্রতি বরিষায় ফুটে স্বর নিঝরীর,
তুই কি আমারে যাবি চিরতরে ফেলে?—
এ ত নয়—এ ত নয় বিধি প্রকৃতির!
মানুষ মরিলে আত্মা ফিরে আসে তার,
যা ছিল তা আছে, আর রবে চিরদিন;—
তোমায় দেখিনা বলে তুমি নাই আর
প্রকৃতির মায়াখেলা নহে এত দীন।
কোথায় বা যাবি আর, জীবন-নলিন,
তুই ত গেছিস্ মিশে জীবনে আমার!

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। বিল বিভ্রাট পঞ্চরং।—প্রথম ভাগ। প্রকাশকের নাম নাই। গ্রন্থকর্ত্তা পদ্য ছন্দে নাটকাকারে সম্মতি বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। না আছে ভাব, না আছে ছন্দ, না লেখা ভাল। এরূপ অসার গ্রন্থ লিখিলে যে কি হয়, জানি না।

২। সাধুজীবন।—মূল্য ৵০ আনা। গ্রন্থকর্ত্তার নাম অপ্রকাশিত। স্বর্গীয় নবীন চন্দ্র রায় ও শিবচন্দ্র দেবের জীবনী ক্ষুদ্রাকারে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাধু-জীবন যতই প্রকাশিত হয়, ততই ভাল। নবীন বাবু ও শিবচন্দ্র বাবু উভয়েই ব্রাহ্ম সাধু। তাঁহাদের জীবনে শিখিবার অনেক বিষয় আছে।

৩। স্বর্গের ফুল।—২নং শঙ্কর ঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তিকায় পরলোকগত কয়েকটী ব্রাহ্ম যুবক যুবতীর জীবনকাহিনী লিখিত আছে। বিশ্বাসী-দিগের নিকট পরলোক যে আনন্দময় লীলা

স্থান, এই সকল জীবনে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। লেখা মন্দ নয়।

৪। ভাব-লহরী।—শ্রীপ্রসন্নকুমার গুহ প্রণীত। মূল্য।০ আনা। গুহ মহাশয় সুকুমারমতি বালক বালিকার উপকারের জন্য এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। ভাষা সরল হইলেও প্রকৃত কবিতা ইহাতে নাই বলিলেই হয়। স্থানে স্থানে অর্থও স্ফুট হয় নাই। সাহিত্যভাণ্ডারে এরূপ কবিতা পুস্তকের অভাব নাই। গুহ মহাশয়ের ইহাতে হাত না দিলেই ভাল হইত।

৫। ফুল (কবিতা ও গান।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত; মূল্য।০ আনা। গ্রন্থখানিতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ও কয়েকটী গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফুলগুলি নেহাইত বাসিও নয়, খুব তাজাও নয়। চেষ্টা করিলে গ্রন্থকার কালে সুগন্ধযুক্ত টাট্‌কা ফুল প্রসব করিতে পারিবেন।

৬। রসায়ন প্রবেশ।—কটক কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র রায়, এম্, এ, প্রণীত। গুরু শিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে অতি সহজ ভাষায় যোগেশ বাবু রসায়ন শাস্ত্রের সহজ সহজ সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুকুমারমতি বালকদিগের পক্ষে ইহা খুব সুখবোধ্য হইয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থ বঙ্গভাষায় যতই প্রকাশিত হইবে, ততই ভাল। স্কুল সমূহে এই গ্রন্থ অধীত হইবার উপযুক্ত।

৭। ছাত্রবোধ ব্যাকরণ।—শ্রীআনন্দমোহন রায় কর্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ৵০ আনা। প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য এই ব্যাকরণখানি রচিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বুধগণ যখন এ গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছেন, তখন আর আমাদের বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। বাস্তবিকও প্রথম শিক্ষার্থীগণ উপক্রমণিকা ব্যাকরণ অপেক্ষা ইহা পাঠে অধিক পরিমাণে ফল লাভ করিতে পারিবেন। তবে ইহাতে সন্ধি প্রকরণের যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বালকদিগের স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে উপক্রমণিকা বা কৌমুদীর প্রণালী হইতে উৎকৃষ্টতর বলিয়া আমাদের বিবেচনা হইল না। লিঙ্গ নির্ণয় ও তিঙন্ত প্রকরণ অল্পের মধ্যে বেশ হইয়াছে।

৮। শাপাবসানম্ (নাটকম্)—বৈদ্যবংশজ শ্রীনৃত্যগোপাল কবিরত্নেন বিরচিতম্। মূল্য।০ আনা। মহাভারতের অমৃতসমান কথা সুমধুর সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হইলে উপাদেয় হইবে না কেন? কাশীরামদাস বঙ্গীয় কবিতায় মহাভারতের কথা গ্রথিত করিয়া বলিয়াছেন, পুণ্যবান্ লোকেই উহা শুনিয়া থাকে। আমরাও তাই বলি। অভিমন্যু বধের পর্ব্বাধ্যায় লইয়া শাপাবসান লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত কবিতাগুলি ও গদ্যগুলি বেশ সরল ও সুখবোধ্য হইয়াছে। তবে শাপাবসানে খুঁত নাই, এমন নয়। তৃতীয়াঙ্কের পঞ্চম ও সপ্তম গর্ভাঙ্কে ব্যূহে প্রবেশ করিতে না পারিয়া মহাবীর ভীমসেন জয়দ্রথের নিকট কাকুতি মিনতি করিতেছেন, তাহা বীরজনোচিত বলিয়া মনে হয় না। শেষ নান্দীতে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা অনুধ্যান করিতেছেন ও তৃতীয়াঙ্কের শেষে অভিমন্যু শ্রীকৃষ্ণকে 'রাধিকা হৃদয়রঞ্জন' পদে সম্বোধন করিতেছেন। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, বিশেষতঃ রাধিকানাম, মহাভারতীয় উপাখ্যানের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান সময়ের ভাব যুধিষ্ঠির ও অভিমন্যুর মুখে তুলিয়া দেওয়ায় মূল বিষয়ে কালাতিপাতের দোষ হইয়াছে।

উত্তরা, সুভদ্রা, বিশেষতঃ সখীদিগের সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন না হইয়া প্রাকৃত ভাষায় হইলেই ভাল হইত। বেণীসংহারাদি নাটকে দ্রৌপদী প্রভৃতি মহিষীগণ প্রাকৃত-তেই কথা কহিয়াছেন।

৯। পঞ্চপুষ্প।—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব প্রণীত। চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ পাঁচটী প্রবন্ধে এই গ্রন্থখানি রচিত। এ গ্রন্থের ভাষা বড় গভীর; আর একটু পাতলা হইলে ভাল হইত। স্থানে স্থানে একটু একটু বন্ধুরও হইয়াছে। 'স্ত্রীজাতির মানসিক উৎকর্ষতা' প্রবন্ধটী বেশ হইয়াছে। 'বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা' প্রবন্ধটীতে স্থানে স্থানে বৃত্তান্ত-ঘটিত কিছু কিছু ভুল লক্ষিত হইল।

১০। বিবিধ প্রবন্ধ।—শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। ফুল ফুটে কাননে, সন্ধ্যার আকাশে ফুটে নক্ষত্র, আর ভাবের ফুল ফুটে ভাবুকের মনে। "মানুষের মন বহুকোণী, তাই ভিন্ন দিকে ভিন্ন রঙ্গ প্রতিভাত হয়।' এক গাছে জুই, চামেলী, টগর, বেলি, গোলাপ, মল্লিকে ফুটেনা, কিন্তু এক মনে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, বিরহ, শান্তি, মান, প্রণয়, লালসা, বাসনা, সুখ, দুঃখ, সকল ভাবই ফুটে। ক্ষীরোদ বাবুর 'বহুকোণী' মনে আজ হর-রকমের ভাবের ফুল ফুটিয়া কোমল মধুর ভাষার তারে গাঁথা হইয়া একছড়া অপূর্ব্বমালা হইয়াছে। পাঠক! ঐ মালা গাছটী পরে এসো, ঐ বাঁশী বাজিতেছে শুন, আর তালে তালে নাচ। মানাবে ভাল; সুখী হবে। এমন জিনিস এদেশে অল্প মিলে।

১১। গণিত সোপান।—শ্রীযোগে-শচন্দ্র সিংহ প্রণীত। কুমিল্লা সিংহযন্ত্রে গোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য।৴০ আনা। এই পুস্তকে বালক বালিকা-দিগকে কৌতুক ছলে অঙ্ক শিক্ষা দিবার সহজ উপায় লিখিত হইয়াছে। শিক্ষার্থী বালক বালিকাগণ এ পুস্তক অবলম্বন করিলে প্রাথমিক অঙ্ক শিক্ষার খুব সাহায্য পাইবে।

১২। সীতা।—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ, প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। মহর্ষি বাল্মীকির অমৃতময় সৃষ্টি সীতা চরিত্র কাব্য-সংসারে দুর্ল্লভ। পতি-প্রেমিকা সীতাদেবী সতীরমণীকুলের আদর্শ। সীতার মনোহর জীবনকাহিনী যিনি পাঠ করিবেন, তাঁহার হৃদয়াকাশে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় চিরদিন সীতার ভুবনমোহিনী প্রেমময়ী মূর্ত্তি আলোক বিস্তার করিবে। সীতা প্রেমের অবতার, সীতা লক্ষ্মীরূপিণী, সীতা শান্তির নির্ম্মল প্রস্রবন। এহেন সীতা চরিত্র নানা ভাষায় অনুবাদিত হউক এবং পৃথিবীর নানা দেশীয় লোকে পাঠ করুক, প্রার্থনা করি। গ্রন্থকার যে আকারে বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন; এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সীতা-চরিত্র বঙ্গভাষায় অদ্যাপি আর প্রকাশিত হয় নাই। পরিণয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদয় জীবন-বৃত্তান্ত এ পুস্তকে অতি দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে। এ পুস্তক প্রত্যেক শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার অবশ্য-পাঠ্য।

১৩। মহা যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।—(ভারতী হইতে পুনর্মুদ্রিত) আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রে প্রকাশিত। এ পুস্তকখানি কলিকাতায় অধিবেশিত জাতীয় মহা সমিতির সাদর নিমন্ত্রণ। পুস্তকের প্রতি-ছত্রে নিমন্ত্রণ-কারীর স্বদেশ-হিতৈষণা ও জাতীয় মহাপ্রাণতার উজ্জ্বল ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা পুস্তক পাঠ করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছি।

১৪। কুমুদিনী চরিত্র।—কুচবিহার ষ্টেট্ প্রেস হইতে প্রকাশিত। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক বাবু রামচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী দেবী আর ইহজগতে নাই। অশিক্ষিতা, অবরুদ্ধা, পরাধীনা ও অবগুণ্ঠনবতী অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গ রমণীগণ স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে আসিলে কি রমণীয় রূপ ধারণ করেন,--সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মমাধুর্য্য দ্বারা কিরূপে পরিবার ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে মোহিত করেন, কিরূপে জলন্তধর্ম্ম বিশ্বাস দ্বারা চরিত্র সংশোধন করেন, তাহা এই কুমুদিনীচরিত্রে দেখিতে পাই। সতী সাধ্বী কুমুদিনী ধর্ম্মপিপাসা, ঈশ্বরনির্ভর ও ব্রতপালন বিষয়ে বড় বড় জ্ঞানীকেও পরাস্ত করিয়াছেন। কুমুদিনীর স্বরচিত সঙ্গীতগুলিতে ভগবদ্ভক্তি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

১৫। বিরাগসঙ্গীত।—আহমদী সম্পাদক আবদুল্ হামিদ্‌খান আহ্‌মদী ইউসফজয়ী কর্ত্তৃক বিরচিত, টাঙ্গাইল আহ্‌মদী যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।০ আনা। এই পদ্য গ্রন্থখানি সংস্কৃত মোহমুদ্গরের অনুকরণ মাত্র। বিষয়াসক্ত মন, বিষয়ের মালিন্য দেখিয়া ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হউক, গ্রন্থকারের ইহাই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অনুযায়ী পুস্তক রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কবিত্ব, ভাষা, ভাব কিছুই হয় নাই।

১৬। চন্দ্রপ্রভা।—(প্রাকৃতিক দৃশ্য কাব্য) শ্রীঅসিতরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গোয়াড়ি হইতে শ্রীপঞ্চানন সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। এ পুস্তকের স্থানে প্রকৃত কবিত্ব আছে, ভাষা কোমল ও প্রাঞ্জল।

১৭। সদ্ভাবকুসুম।—শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।/০ আনা। এখানিও পদ্যগ্রন্থ। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। আমরা বলিতে পারি, তাঁহার এ চেষ্টা সফল হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি সুকুমারমতি বালকগণের ধারণার অতীত। "বিবেকবাণী," "জীবনযুদ্ধ," "ঈশ্বর মিলন আশা," ইত্যাদি প্রায় সকলগুলি কবিতাই অপেক্ষাকৃত জ্ঞানিগণের পাঠ্য। পুস্তক বিদ্যালয়ের অপাঠ্য হইলেও লেখকের পরিশ্রম বিফল হয় নাই,—যুবক ও বৃদ্ধের পাঠ্য হইয়াছে। লেখকের কবিত্বশক্তি, ভাব ও পদবিন্যাস ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। কবিতাগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

১৮। দম্পতিসুহৃদ্।—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত।—লেখক লিপিকুশল। এ পুস্তকে অনেক কাজের কথা আছে। সংসার-প্রবেশার্থী হিন্দু যুবক যুবতীগণ এ পুস্তক পাঠ করিলে অনেক উপকার লাভ করিবেন।

১৯। মানসপ্রবাহ।—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি, এ, প্রণীত। কলিকাতা ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট নিউ বুক সোসাইটি হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানিও পদ্যগ্রন্থ। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে। লেখক সুরুচি-সম্পন্ন সুকবি।

২০। অভিমন্যুবধ কাব্য।—শ্রীমহেশচন্দ্র দাস ডাক্তার প্রণীত। আমরা এ পুস্তক পাঠ করিয়া প্রীত হই নাই।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪৪)

গৌড়ে প্রত্যাগমন।

সন্ন্যাসের পর চারি বৎসর গত হইয়াছে; শচীনন্দন নীলাদ্রির পুণ্য ভূমিতে সুখে বাস করিতেছেন। ক্রমে দুই বৎসরে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তৃতীয় বৎসরে বৃন্দাবন গমনে ইচ্ছা হইলে রামানন্দ সার্ব্বভৌমকে মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। বিচ্ছেদের ভয়ে তাঁহারা আজ কাল করিয়া দুই বৎসর কাটাইয়া দিলেন। পঞ্চম বৎসরে বঙ্গদেশের ভক্তগণ রথযাত্রার পূর্ব্বে আসিয়া রথযাত্রা দর্শন করিয়াই দেশে প্রত্যাগমন করিলেন, অন্যান্য বর্ষের ন্যায় সেবারে চাতুর্ম্মাস্য নীলাচলে থাকিলেন না। ভক্তগণ বিদায় হইয়া গেলে শ্রীচৈতন্য একদিন রামানন্দ রায়ের ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট বলিলেন, 'বৃন্দাবন যাইবার জন্য আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আমার দুইটী প্রিয়তম বস্তু আছে, প্রথম জননী, দ্বিতীয় জাহ্নবী। তাঁহাদিগকে দর্শন করা নিতান্ত প্রয়োজন। তোমাদের দুই জনের বাধায় যাইব যাইব করিয়া দুই বৎসর কাটাইয়া দিলাম, যাইতে পারিলাম না। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমাকে যাইতে অনুমতি দাও।' উভয়ে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, এখন বর্ষা সমাগত হইল, পথে যাইতে বড় ক্লেশ হইবে, আগামী বিজয়া দশমী দিনে যাত্রা করিবেন।' শ্রীচৈতন্য এই কথায় সম্মত হইলেন এবং বর্ষার কয়েক মাস কাটাইয়া দিয়া বিজয়ার দিনে শুভ যাত্রা করিলেন। জগন্নাথের প্রসাদ ও মালা চন্দন সংগ্রহ করিয়া লইয়া শচীনন্দন প্রাতঃকালে যাত্রা করিলেন। উৎকলবাসী সমস্ত ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতে লাগিল। গদাধর পণ্ডিতকে ডাকিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তোমার ক্ষেত্র সন্ন্যাস ছাড়া উচিত নয়, তুমি যাইও না।' পণ্ডিত উত্তর করিলেন, 'তুমি যেখানে, সেই নীলাচল; আমার ক্ষেত্র সন্ন্যাস রসাতলে যাউক।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'তোমার গোপীনাথের সেবা ছাড়া উচিত নয়।'

পণ্ডিত। তোমার চরণ দর্শনের কাছে কোটী সেবাও তুচ্ছ।

শ্রীচৈতন্য। ছি ছি! অমন কথা বলো না। তুমি সেবা ছাড়িলে আমার অপরাধ হইবে। এখানে থাকিয়া সেবা কর, আমি সুখী হইব।

গদাধর পণ্ডিত রাগ ও অভিমানে উত্তর করিলেন, 'আমি তোমার সঙ্গেও যাব না, তোমার জন্যেও নয়; একাকী যাবো—সঙ্কল্প শচী মাতাকে দর্শন করা। ইহাতে প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়ার যে দোষ হয় হইবে, আমি তাহার ভাগী। তবুও আমি যাইব।'

শ্রীচৈতন্য ইহার পর আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। গদাধর পণ্ডিত দল ছাড়া হইয়া একাকী পাছে পাছে যাইতে লাগিলেন। কতক দূর আসিলে গৌরচন্দ্র কতক লোককে বিদায় দিলেন, তথাচ প্রধান প্রধান ভক্তগণ সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। পুরী গোঁসাই, স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য্য, দামো-

ধর পণ্ডিত এবং রামাই নন্দাই প্রভৃতি সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। ভবানীপুরে আসিয়া সকলে অবস্থিতি করিলেন। এখানে রামানন্দ রায় ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দোলারোহণে আসিয়া মিলিত হইলেন। বাণীনাথ বাহক দ্বারা অনেক মহা প্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন, ভোজনান্তে যাত্রীদল ভুবনেশ্বর হইয়া কটকে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীচৈতন্য সাক্ষীগোপাল দর্শনান্তে স্বপ্নেশ্বর নামক বিপ্র ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বকুলতলায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে রামানন্দ রায় রাজ প্রাসাদে যাইয়া প্রতাপ রুদ্রকে সংবাদ দিলে রাজা ব্যগ্র চিত্তে বকুলতলায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে রামানন্দ রায় রাজপ্রাসাদে যাইয়া প্রতাপচন্দ্রকে সংবাদ দিলে রাজা ব্যগ্র চিত্তে বকুলতলায় আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া অনেক দিনের মনের সাধ মিটাইলেন। কারণ ইহার পূর্ব্বে রথের সময়ে পুষ্পোদ্যানে যে দর্শন, সে প্রভুর অন্তর্দ্দশায় বিহ্বল অবস্থায়, শ্রীচৈতন্য সে সাক্ষাতে রাজাকে চিনিতে পারেন নাই। রাজা প্রেম-গদগদচিত্তে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে শ্রীচৈতন্য কৃপা-পরবশ হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া রাজাকে অকপট আলিঙ্গন দিলেন এবং রাজার নিষ্কপট প্রেম ভক্তি দেখিয়া মহাসুখী হইলেন। নানা রূপ কথাবার্ত্তায় রাজা ও অমাত্যবর্গকে সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিয়া গৌরচন্দ্র যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর গমনের সুবিধার জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন। সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত কর্ম্মচারী-দিগের প্রতি আদেশ হইল, নানা প্রকার সামগ্রী সম্ভার আনিয়া প্রভুর সেবা করিও। সৈন্যগণ বেত্র হস্তে সঙ্গে যাইতে, বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিতে ও বিনা ক্লেশে ঘাটাদি পার করিয়া দিতে আদিষ্ট হইল। হরিচন্দন ও মঙ্গরাজ নামক সচিবদ্বয় ও রাজা রামানন্দকে প্রভুর সঙ্গে যাইতে আদেশ হইল। এদিকে সহরের চিত্রোৎপলানদী ঘাটে পারে যাইবার জন্য উৎকৃষ্ট তরণী রক্ষিত হইল, নগরের পথে ও ঘাটে রমণীয় তোরণ ও স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। মহাপ্রভু সন্ধ্যাকালে যাত্রা করিবেন জানিতে পারিয়া রাজা বৃহৎ বৃহৎ হস্তীর উপরে পটমণ্ডপ রচনা করিয়া তাহার মধ্যে রাজমহিষী, পুরঙ্গনা ও পরিজনদিগকে লইয়া যাইবার পথে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নিরূপিত সময়ে চৈতন্যদেব গণসহ নদীঘাটে আসিয়া স্নানাবগাহন করিলেন। এই সময়ে রাজা মহিষীদিগকে সঙ্গে লইয়া পাদবন্দনা করিলে গৌর কৃপা আশীর্ব্বাদ করিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া গৌর বলিলেন, 'প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িয়া আমার সঙ্গে আসিতে যে সংকল্প করিয়াছিলে, তাহাতেই সিদ্ধ হইল। সেবা ত্যাগ প্রথম অপরাধ, নিজের সুখ বাঞ্ছা করিয়া আমার সঙ্গে থাকিবার অভিলাষ দ্বিতীয় অপরাধ। ইহাতে তোমার ধর্ম্ম হানি হইবে জানিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। অতএব আর কেন, নীলাচলে ফিরিয়া যাও। আমার শপথ লাগে যদি আর আপত্তি কর।' এই বলিয়া চৈতন্যদেব সপার্ষদে নৌকায় উঠিলেন। গদাধর নদীতীরে সৈকত ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতকে সুস্থ করিয়া সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া গৌরচন্দ্র নদী পার হইয়া চতুর্দ্বার নামক স্থানে আসিয়া রজনী যাপন করিলেন।

প্রাতঃকালে রাজাজ্ঞায় নীলাচল হইতে অনেক মহাপ্রসাদ আসিয়া উপনীত হইল, গৌরচন্দ্র স্বদলে প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে প্রসাদ ভোজন করিয়া পথ অতিবাহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাজপুরে আসিয়া গৌরচন্দ্র রাজা অমাত্য দ্বয়কে বিদায় দিলেন, এবং রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গে রেমুনা (কোন মতে ভদ্রক) পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। যেখানে যান, সেইখানে রাজাজ্ঞায় গৌর মহাসুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ যোড় হস্তে তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

রেমুনা হইতে গৌরচন্দ্র রামানন্দ রায়কে বিদায় দিলে রায় শোকে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ইহার পর গৌরচন্দ্র উৎকল রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলে রাজকর্ম্মচারী মহাপাত্র তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। দুই চারিদিন বিশ্রামের পর মহাপাত্র বলিলেন, ইহার পর পিছলদা পর্য্যন্ত সব দেশ মদ্যপ যবন রাজার অধিকার; সে ব্যক্তি অতি দুর্দ্দান্ত, তাহার ভয়ে কেহ পথে চলিতে ও নদীতে নৌকা বাহিতে পারেনা। আপনি দিনকতক এখানে বিশ্রাম করুন। আগে তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া লই, পরে আপনাদিগকে নৌকারোহণে দেশে পাঠাইব। এই মদ্যপ যবনরাজ কে, তাহার সঠিক বৃত্তান্ত পাইবার উপায় নাই। অনুমান হয়, একজন পরাক্রান্ত মুসলমান ভূম্যধিকারী অথবা বঙ্গেশ্বরের সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইবেন। এই সময়ে যবন রাজের এক গুপ্ত চর ছদ্মবেশে উড়িয়া কটকে আসিয়া চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি, আচরণ ও প্রেম চেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল ও স্বীয় প্রভুকে যাইয়া নিবেদন করিল যে, জগন্নাথ হইতে এক সন্ন্যাসী অনেক সিদ্ধ পুরুষ সঙ্গে আনিয়াছেন, সকলেই হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় এবং কৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বল হইয়া কি করে, তাহার ঠিকানা নাই। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হইয়া যাইতেছে। এই বলিয়া সেই লোক পাগলের ন্যায় হাসিতে কাঁদিতে নাচিতে লাগিল। দেখিয়া যবনাধিপের মন ফিরিয়া গেল। তখন তিনি আপন বিশ্বাসকে উৎকল রাজকর্ম্মচারীর সমীপে পাঠাইলেন। বিশ্বাস মহাপাত্রের নিকট যবন রাজের গৌরাঙ্গ দর্শনের ব্যাকুলতা ও তাঁহার প্রতি বন্ধুতাভাব জানাইলে মহাপাত্র বলিলেন, নিরস্ত্র হইয়া কেবল মাত্র ৪।৫টী ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিতে অঙ্গীকার করিলে আসিতে বলিও। বিশ্বাস যবন শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া এই সংবাদ দিলে, ম্লেচ্ছাধিপ হিন্দুর বেশ ধারণ করিয়া উড়িয়া শিবিরে আসিলেন ও চৈতন্য দেবকে দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহাপাত্র তাঁহাকে বহু সম্মান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। যবন রাজ শ্রীচৈতন্যকে বলিতে লাগিলেন, হায়! কেন আমি মুসলমান বংশে জন্মিয়াছিলাম? তা না হলে তো তোমার চরণ সেবা করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতাম। মহাপাত্র বলিলেন, প্রভু তুমিই ধন্য, যে নাম গ্রহণে চণ্ডালও পবিত্র হয়, ইনি তোমার প্রভাবে সেই পবিত্র হরিনাম লইয়া যে ধন্য হইবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি? কে ইহার অন্তরে থাকিয়া মন ফিরাইয়া দিল? শ্রীচৈতন্য যবন রাজকে তখন কৃপা করিয়া হরিনাম দীক্ষা দিলেন।

যবন রাজ বলিলেন', প্রভু, আমি ঘোর পাপী, কত যে পাপ করিয়াছি তার সীমা নাই। যদি এই অধমকে কৃপা করিলেন, তবে আপনার সেবা করিতে অধিকার দেন, আমি ধন্য হইয়া যাই। মুকুন্দ দত্ত সময় বুঝিয়া বলিলেন, বঙ্গ দেশে যাইতে প্রভুর বড় ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি যদি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তবে বড় উপকার হয়। ম্লেচ্ছপতি উত্তর করিলেন, এ আর একটা কঠিন ব্যাপার কি ? অতঃপর তিনি বৈষ্ণবগণের যথাযোগ্য পাদ বন্দনা করিয়া বিদায় হইয়া গেলেন। উৎকল রাজপ্রতিনিধি যবন রাজের সহিত আলিঙ্গন কোলাকুলি করিয়া অনেক সামগ্রী সম্ভার দিয়া মৈত্রতা স্থাপন করিলেন। উভয় রাজ্যে সন্ধি হইয়া গেল। পর দিন প্রাতে অনেক নৌকা সাজাইয়া যবনপতি বিশ্বাস পাঠাইয়া প্রভুকে দলসহ নিজ শিবিরে আনিলেন। মহাপাত্রও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ম্লেচ্ছরাজ প্রভুর পাদবন্দনা করিয়া এক সুবৃহৎ নূতন নৌকা রমণীয় প্রকোষ্ঠে গণ সহ উঠাইয়া দিয়া জলদস্যু ভয়ে আর দশখানি নৌকায় সৈন্য পূর্ণ করিয়া স্বয়ং সঙ্গে চলিল। শ্রীচৈতন্য উৎকল রাজপ্রতিনিধিকে আলিঙ্গন দিয়া বিদায় করিলে, মহাপাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে, মন্ত্রেশ্বর নামক দুষ্ট নদী পার করাইয়া দিয়া যবন রাজ পিছলদা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিলেন এবং নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়াছেন জানিয়া প্রভুর পাদবন্দনা করিয়া সাশ্রু লোচনে বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে মহাপ্রভু সেই নৌকারোহণে অচিরাৎ পানিহাটী গ্রামে আসিয়া উপনীত হইয়া নাবিকদিগকে কৃপাসাটি পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। যে পথে গৌরচন্দ্র পেনেটী আসিলেন, ইহা কোন্ পথ, ঠিক্ জানা যায় না। অনুমান হয়, সুবর্ণরেখানদীর মুখ দিয়া বঙ্গোপসাগর পার হইয়া ভাগীরথীতে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। পানিহাটী বা বর্ত্তমান পেনেটী গ্রামে গৌর ভক্ত রাঘব পণ্ডিতের বাসস্থান। প্রভু আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া রাঘব পণ্ডিত স্বশিষ্যে যাইয়া মহা সমাদরে গৃহে আনিলেন ও নানা উপচারে গণসহ প্রভুর সেবা করিলেন। রাঘবের ভগিনী দময়ন্তী দেবী প্রভুর একান্ত ভক্ত, নানা খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। গৌর আসিয়াছেন শুনিয়া রাঘব-গৃহে মহা জনতা হইল। এঁড়িয়াদহ-নিবাসী গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস ও রাঘব শিষ্য মকরধ্বজ করকে এই খানে মহাপ্রভু কৃপা করিলেন। নিত্যানন্দও এইখানে গৌরের সঙ্গে মিলিত হইলেন। রাঘব গৃহে একদিন অবস্থিতি করিয়া গৌরচন্দ্র প্রাতঃকালে কুমারহট্ট বর্ত্তমান হালিসহর গ্রামে শ্রীবাস ভবনে আগমন করিলেন। গৌরের সন্ন্যাস গ্রহণ ও উৎকল যাত্রার কিছু পরেই শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপের বাস পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে বাস করিয়াছিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে, গৌরের অনুপস্থিতিতে পণ্ডিত জীর উপর অত্যন্ত নির্যাতন হওয়ায় তিনি বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চারি সহোদরের মধ্যে এখন কেবল শ্রীবাস ও শ্রীরাম জীবিত ছিলেন। গৌর পণ্ডিতের অনেক পোষ্য ও সাংসারিক কষ্ট দেখিয়া ধন উপার্জ্জনের জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে বলিলে, বিশ্বাসী শ্রীবাস হাতে

তিন তালি দিয়া বলিলেন, যদি তিন উপবাসের পরও ভক্ষ্য দ্রব্য না আইসে, তাহা হইলে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিব, তথাচ উপার্জ্জনের চিন্তা মনে ঠাঁই দিব না। গৌরচন্দ্র শ্রীবাসের বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব দেখিয়া মহা সুখী হইয়া বলিলেন 'তোমার কেন অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে? কৃষ্ণ কৃপায় আপনা হইতে সব মিলিয়া যাইবে।' শ্রীবাসের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ ও পণ্ডিতের বিদূষক লীলায় মহানন্দে গৌরের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেনের নিবাসও কুমারহট্টে। গৌর-সুন্দর তাঁহাদের গৃহে যাইয়াও কত লীলা কৌতুক করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব শ্রীচৈতন্যের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। ইহারা তিন ভাইই অতি সুগায়ক, গৌরের আদেশে নীলাচল হইতে নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহাদের পৈতৃক বাস কুমারহট্টে। গৌর বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন, 'আমার শরীর পর্য্যন্ত তোমার, আমাকে তুমি যে হাটে বেচ, আমি সেই খানেই বিকাই।' আচার্য্য পুরন্দরের সহিত শ্রীবাস মন্দিরে সাক্ষাৎ হইলে গৌর ইঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। পাঠক মহাশয়ের মনে আছে, ইঁহাকে গৌর পিতৃ সম্বোধন করিতেন। গৌরের নবদ্বীপ ত্যাগের পর ইনিও কুমারহট্টে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, কতক দিন শ্রীবাস গৃহে বিহার করিয়া ও শ্রীরাম পণ্ডিতকে শ্রীবাসের সেবা করিবার জন্য বিশেষ উপদেশ দিয়া গৌর চন্দ্র সশিষ্যে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। বিদ্যাবাচস্পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ সহোদরও নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। বোধ হয়, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিদ্যাবাচস্পতি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টের নিকটে গঙ্গাতীরে কোনগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য লোকসংঘট্ট এড়াইতে নির্জ্জনে গঙ্গা-বাস করিবেন বলিয়া তাহার আলয়ে নিভৃত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। বাচস্পতি মহাশয় পরমানন্দিত হইলেন। কিন্তু সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপনে থাকে? তাঁহার আগমন বার্ত্তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় নবদ্বীপ অঞ্চল ও অন্যান্য অনেক স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক আসিতে লাগিল। বন, উপবন, মাঠ, ঘাট, পথ, লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। কেহ বা নৌকায়, কেহ ভেলায়, কেহ কেহ বা ঘট বুকেদিয়া গঙ্গাপার হইয়া গৌরাঙ্গ দর্শনে আসিতে লাগিল। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ মনুষ্যের গহনে ক্ষুদ্রগ্রামে স্থান থাকিল না। শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ দিয়া বিদায় দিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকের ভিড় তথাচ কমিল না। দিন দিন মহাজনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। গৌরচন্দ্র লোকের ভিঁড়ে উত্ত্যক্ত হইয়া বাচস্পতির অজ্ঞাতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র বিশ্বাসী বন্ধু সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপের নিকট কুলিয়া গ্রামবাসী মাধব দাস নামক ব্যক্তির গৃহে পলাইয়া আশ্রয় লইলেন। এদিকে গৌরকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া আগন্তুক লোক সকল বাচস্পতিকে তিরস্কার ও নির্যাতন করিতে লাগিল। কিন্তু বাচস্পতি গৌর কোথায় গিয়াছেন, কিছুই অবগত নহেন। সুতরাং লোক নির্যাতনে বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। পরে প্রভুর কুলিয়া গমনের সংবাদ শুনিতে

পাইয়া আত্মদোষ ক্ষালনার্থ সেই সব লোক সঙ্গে লইয়া কুলিয়ায় আসিলেন ও চৈতন্য প্রভুকে অনুরোধ করিয়া সকলের সমক্ষে আনিয়া তাঁহাকে লুকাইয়া রাখার অযথা কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কুলিয়াতে জনকোলাহল আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। অনন্ত অর্ব্বুদ লোক আসিয়া গ্রাম-প্রান্তর বন-জঙ্গল ছাইয়া ফেলিল। ঘাটে বহুসংখ্যক নৌকা রাখিয়াও পারের সুবন্দোবস্ত হইল না। গ্রামে দোকানী-পশারী বসিয়া এক মহা মেলা হইয়া গেল। কথিত আছে, যে সকল লোক গৃহস্থাশ্রমে থাকার সময় গৌরের নিন্দা কুৎসা রটাইত, তাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার স্মরণাগত হইল। তিনি তাহাদিগকে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণভক্তি উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। কুলিয়াতে যে সকল লোককে শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে চাপাল গোপাল ও দেবানন্দ পণ্ডিত প্রধান। চাপাল গোপালের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এই ব্যক্তি সাধু, অপরাধের জন্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছিল। গৌরের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে একদিন গঙ্গার ঘাটে সে তাঁহাকে চটেপটে ধরিয়াছিল। গৌরচন্দ্র তখন তাহাকে প্রসন্ন হয়েন নাই। এক্ষণে তাঁহার কুলিয়ায় আগমন সংবাদ পাইয়া সে ব্যক্তি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। গৌর প্রসন্ন বদনে ও করুণ বচনে তাহাকে বলিলেন, দেখ! শ্রীবাসের স্থানে তোমার অপরাধ আছে, দুষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করগে। তিনি তোমায় প্রসন্ন হইলে তোমার ব্যাধি দূর হইবে। পরে সে শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রসন্নতা লাভ করিয়া ব্যাধি মুক্ত ও নিষ্পাপ হইয়াছিল।

দেবানন্দ পণ্ডিতের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে ৮৫ পৃষ্ঠা দেখ। ইনি সার্ব্বভৌমের পিতা মাহেশ্বর বিশারদের প্রতিবাসী; একজন পরম জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ইহাঁর যে অপরাধ ছিল, তাহার জন্য গৌর একদিন ইহাঁকে নবদ্বীপের রাজপথে দেখা পাইয়া অনেক মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, সে কথা ইনি নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু পাপ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই, গৌরচন্দ্রের নীলাচলে অবস্থিতি করার সময় ভক্ত বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে ইহাঁর পরিচয় হইয়াছিল; বক্রেশ্বর তাঁহার আলয়ে কিছু দিন ছিলেন। বক্রেশ্বরের অদ্ভুত প্রেম-চেষ্টা, উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন দেখিয়া শুনিয়া দেবানন্দ প্রেমভক্তির আস্বাদন জানিতে পারিয়াছিলেন। গৌরের কুলিয়ায় উদয়ের পর বক্রেশ্বর এক দিন প্রেমে নাচিতে নাচিতে দেবানন্দের গলা ধরিয়া প্রভুর নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে অনুতপ্ত জানিয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রসাদ করিয়াছিলেন। দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধুনিন্দা ও পরনিন্দা-জনিত পাপ কিসে ক্ষয় হয়?

চৈতন্য দেব উত্তর করিলেন, 'নিন্দিত ব্যক্তির নিকট নিজ পাপ স্বীকার করা, তাঁহার স্তুতি করা, পুনরায় আর নিন্দা না করা এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা, ইহার প্রায়শ্চিত্ত।'

দেবানন্দ বলিলেন, আমি ভাগবত পড়াই

বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ নিজেই বুঝিতে পারি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভাগবতার্থ বুঝাইয়া দেন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য সর্ব্বভক্ত সমক্ষে ভাগবতের আদ্যন্তে ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজন, ব্যাখ্যা করিয়া দেবানন্দকে উপদেশচ্ছলে সর্ব্বভক্তকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সাতদিন কুলিয়া গ্রামে অবস্থিতি করিয়া ও বহুবিধ লোককে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়া শ্রীচৈতন্য দলবল সহ শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে আচার্য্য ভবনে একজন সন্ন্যাসী অতিথি হইয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশব ভারতী চৈতন্যের কে? অদ্বৈত তদুত্তরে 'গুরু' এই কথা বলিবা মাত্র অদ্বৈতের পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র অচ্যুতানন্দ দুঃখিত ও কুপিত হইয়া পিতাকে তিরস্কার করিলেন, চৈতন্যইতো জগদ্গুরু, তাঁহার আবার গুরু কে? আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? অদ্বৈত-শিশু পুত্রের ঈদৃশ চৈতন্য-নিষ্ঠা দেখিয়া প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া পুত্রকে কোলে করিয়া আঙ্গিনায় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্রীচৈতন্য সানন্দে হরিবোল দিয়া আচার্য্য সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। আচার্য্যের আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। হরিনামের ঘোর ঘটা পড়িয়া গেল। মহা মহোৎসব লাগিয়া গেল। অদ্বৈত বাহক ও দোলা পাঠাইয়া নবদ্বীপ হইতে শচীদেবীকে আনিলেন। মাতা পুত্রের পুনর্ম্মিলনে সুখতরঙ্গ বহিতে লাগিল। শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া প্রাণের নিমাইকে খাওয়াইতে লাগিলেন। নবদ্বীপের সব ভক্ত আসিয়া একত্রিত হইলেন। কয়েক দিন পরে প্রত্যাগমন কালে পুনরায় আসিবেন, বলিয়া গৌরচন্দ্র ভক্ত গোষ্ঠি সহিত বৃন্দাবন দর্শনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে অগণ্য লোক যাইতে লাগিল। পথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, লোক সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী নামে গৌরের এক জন উড়িয়া ভক্ত সঙ্গে ছিলেন। ইনি নৃসিংহ উপাসক ছিলেন বলিয়া চৈতন্য তাঁহাকে আদর করিয়া নৃসিংহানন্দ বলিয়া ডাকিতেন। চৈতন্য প্রভুর মথুরায় যাইতে পথশ্রম না জন্মে, এই জন্য ইহার মনে বড় সাধ হইয়াছিল যে, কুলিয়া গ্রাম হইতে মথুরা পর্য্যন্ত পথ রত্ন দিয়া বাঁধাইয়া দেন, তাহার উপরে নির্বৃন্ত কুসুমশয্যা পাতিয়া দেন, পথের দুই ধারে প্রস্ফুটিত কুসুম-বকুল তরুরাজি পুঁতিয়া দেন, মাঝে মাঝে নির্ম্মলসলিলা পুষ্করিণী কাটিয়া দেন, তাহাতে জলচর নানা পক্ষী ক্রীড়া করে, পাদপচ্ছায়ায় সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, এবং বকুল ডালে পাখী সব কলকণ্ঠে গান করিতে থাকে। ভক্ত মনে মনে এইরূপ করিয়া পথ বাঁধিয়া রাজমহলের নিকটবর্ত্তী কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত আসিয়া, কে জানে কি জন্য, তাঁহার আর আগে যাইতে ইচ্ছা হইল না। তাহাতে মনোবলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এবার গৌরের বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে না; কানাইর নাটশালা হইতে ফিরিতে হইবে। এই কথা তিনি নাকি ভক্ত বৃন্দের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীচৈতন্য ভক্ত দল ও লোক সমাগম লইয়া অল্প দিন মধ্যে বঙ্গের তৎকালের রাজধানী গৌড় নগরের নিকটবর্ত্তী রামকেলি গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। সহর কোতোয়াল

গৌড়েশ্বরকে জানাইল এক সন্ন্যাসী সঙ্গে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া নিরবধি ভূতের সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে। (পূর্ব্বভাগ ৩০।৩১ পৃষ্ঠা দেখ)। সৈয়দ হুসেন সা বা দ্বিতীয় আলাউদ্দীন তখন বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি তাঁহার হিন্দু সভাসদ্‌গণকে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, কেশবছত্রী, রূপও সাকর মল্লিক বা দবীর খাস আতঙ্কিত হইয়া উত্তর করিলেন যে, ভিখারী সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটন করিতে যাইতেছে, তাঁহার সঙ্গে দুই চারি জন ভিক্ষুক চলিয়াছে। তাঁহার এমন কি শক্তি যে, হজুরের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন। মুসলমান কর্ম্মচারীগণ আপনার নিকট ঠকামি করিয়াছে, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এ দিকে তাঁহারা গোপনে চৈতন্য প্রভুকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, যবনজাতি ঘোর অবিশ্বাসী, যদিও মুখে ভাল কথা বলিতেছে, কি জানি কখন্ কি বিপদ্ ঘটায়। কিন্তু তাঁহাদের আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। কারণ সৈয়দ হুসেন সাহা শ্রীচৈন্যের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা দূরে থাকুক, তাঁহার থাকিবার ও সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ও কাজীগণ তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে না পারে, তজ্জন্য রাজ আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন।

রূপ ও সাকর মল্লিকের বীরখাস ও দবীরখাস উপাধি ছিল। ইহাঁরা কে, পাঠক-মহাশয় জানিতে চাহেন কি? শ্রীচৈতন্যের প্রেমমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ধুলির ন্যায় রাজকীয় পদ মর্য্যাদা ও ধন সম্পদ ত্যাগ করিয়া কন্থা-করঙ্গ লইয়া চৈতন্যরঙ্গভূমিতে যাঁহারা রূপ সনাতন বলিয়া খ্যাত, বৈরাগ্যের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি, সেই মহাপুরুষদ্বয়ই গৌড় সচিব রূপ সাকর মল্লিক। কর্ণপূর সত্য সত্যই তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপিমুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রসইব পরো মূর্ত্ত এবাদ্যমূর্ত্তঃ
প্রেমালাপৈ র্দৃঢ়তর পরিস্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহদেবঃ"

যিনি প্রিয়তমের গুণে সমাকৃষ্ট হইয়া রামকেলি গ্রামে প্রেমালাপ ও আলিঙ্গন কৃপা লাভ করিয়া সংসার মায়া হইতে মুক্তিলাভ করত মূর্ত্তিমান্ মধুর রসের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন, সম্প্রতি ভ্রাতা অনুপমের সহিত সেই রূপকে চৈতন্যদেব প্রয়াগে অনুগ্রহ করিলেন।

"গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ।
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসরইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম।"

রূপাগ্রজ এই সনাতন গৌড়েশ্বরের সভার অলঙ্কার ছিলেন; ইনি মহা সম্পত্তি-রূপা লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া নবীন বৈরাগ্য লক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়াছেন। শৈবালাচ্ছাদিত মহা সরোবরের ন্যায় ইঁহার হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ! কিন্তু বাহিরে অবধূত বেশ। ইনি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞদিগের প্রীতিপ্রদ।

কর্ণাটদেশে ভরদ্বাজগোত্রে সর্ব্বজ্ঞ নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। ইনি যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইলেও সকল বেদে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ নামে তাঁহার পুত্র। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর এবং কনিষ্ঠ হরিহর। রূপেশ্বর শাস্ত্রে ও হরিহর শাস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী

হইয়াছিলেন। দুই পুত্রকে স্বীয় রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া পিতা অনিরুদ্ধ পরলোকে গমন করিলেন। কতক দিন পরে হরিহর জ্যেষ্ঠের রাজ্য কাড়িয়া লইল। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া আটটী অশ্বে আপনার চারি জন বর্গ ও কিছু ধন সম্পত্তি লইয়া স্বীয় বন্ধু পৌরস্ত্য দেশের শিখরেশ্বর রাজার আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন ও তদবধি সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ; ইনি যৌবন কাল হইতেই বেদাদি অশেষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং জগন্নাথ উপাসক ছিলেন। ইনি গঙ্গাবাস করিবার অভিপ্রায়ে শিখর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে নবহট্ট অর্থাৎ নৈহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। এখানে পুরুষোত্তম মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মহা মহোৎসবে প্রতিষ্ঠা করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা এবং পাঁচটী পুত্র জন্মিয়াছিল। পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ, এই পাঁচটী পুত্র। মুকুন্দের পুত্র কুমার বাল্যকাল হইতেই পরম ধার্ম্মিক ও শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে যে, দৈবাৎ যবন দর্শন হইলে ইনি সে দিন উপবাসী থাকিতেন ও প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পান ভোজন করিতেন না। ইনি অতি নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন, জ্ঞাতিদিগের দৌরাত্ম্যে নৈহাটীর বাস পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ নামক গ্রামে উঠিয়া গেলেন এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য যশোহরের অন্তর্গত ফতয়াবাদ নামক গ্রামে দ্বিতীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কুমার দেবের অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম রূপ ও কনিষ্ঠ বল্লভ বা অনুপমই বৈষ্ণব সমাজে সুবিখ্যাত। বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। সনাতন ও রূপ বাল্যকাল হইতেই নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। তাঁহাদের প্রখর বুদ্ধি ও গূঢ় মন্ত্রণা কৌশলের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, গৌড়াধিপ যবন রাজ তাঁহাদের অসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার কথা শুনিয়া ডাকিয়া আনিয়া উচ্চতম রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। যবনের অধীনতা করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও অপমান ও নিষ্পীড়নের ভয়ে তাঁহাদিগকে রাজ কার্য্য অঙ্গিকার করিতে হইল। তাঁহাদের সাধু মন্ত্রণায় গৌড়াধিপের রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় বাদসাহ স্বল্প করে তাঁহাদিগকে অনেক জমিদারী দিলেন। রামকেলিগ্রামে তাঁহারা বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং অল্পদিনেই খুব যশস্বী, প্রতাপান্বিত, দানশীল ও ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। নানা দেশ হইতে তাঁহাদের সভাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গায়ক, বাদক, নর্ত্তক, কবি সকল আসিতে লাগিলেন। সভাতে নানা শাস্ত্রের বিচার চলিতে লাগিল। তাঁহারা মুক্ত হস্তে দান করিয়া সকলকে সুখী করিতে লাগিলেন। অনেক জ্ঞাতি কুটুম্ব আনাইয়া রামকেলিতে বাস করাইলেন এবং কর্ণাট দেশ হইতে পূর্ব্ব পুরুষদিগের জ্ঞাতি অনেক লোক আনাইয়া ভট্টবাটী নামে গ্রাম তাঁহাদের বাস জন্য দিলেন। কথিত আছে, ন্যায়াদি দর্শন শাস্ত্রে দুই ভ্রাতা অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ভট্টাচার্য্যগণের মধ্যে কোন বিষয়ে তর্ক বাধিলে তাঁহারা মীমাংসা করিয়া দিতেন। সনাতন একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যেন এক বিপ্র আসিয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত

গ্রন্থ উপহার দিয়া গেল। তদবধি তিনি ভাগবত অধ্যয়নে একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। সনাতন কৃত দশম টীপ্পনিতে গ্রন্থকার সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও বিদ্যা বাচস্পতিকে গুরু ও পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, রামভদ্র ও বাণীবিলাস নামক ব্যক্তিত্রয়কে উপদেষ্টা বলিয়া বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, বিদ্যাচর্চ্চায় ইহারা তাঁহার গুরু ছিলেন। নবদ্বীপের বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদের সভায় যাতায়াত করিতেন এবং বিদ্যা বাচস্পতি বৎসরের মধ্যে কতিপয় মাস রামকেলিতেই অবস্থিতি করিতেন। রূপসনাতন পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। প্রথম হইতেই তাঁহাদের ধর্ম্মপিপাসা অতি বলবতী ও সাধন প্রগাঢ় ছিল। বাড়ীর নিকট এক নিভৃত স্থানে কদম্বাদি বৃক্ষ ছায়ায় রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড খনন করিয়া দুই ভাই বৃন্দাবন-লীলা স্মরণ করিতেন ও নামাদি গ্রহণে রত থাকিতেন। অতুল রাজ্য, পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও রূপসনাতন মহা বিনয়ী ও দীন ভাবাপন্ন ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা পুরুষ পুরুষানুক্রমে পরম শ্রদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের পিতা ম্লেচ্ছ দর্শন হইলে অনুতাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেন, আর তাঁহারা ম্লেচ্ছসেবী, ম্লেচ্ছ সঙ্গী ও ম্লেচ্ছ ব্যবহারে রত হইলেন ভাবিয়া দুই ভ্রাতা আপনাদিগকে যবন হইতেও হীন মনে করিতেন। এবং তজ্জন্য সময়ে ২ তাঁহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনাদিগকে যে ম্লেচ্ছ বলিতেন, তাহা হইতেই অনেকে ভ্রমক্রমে তাঁহাদিগকে মুসলমান বলিয়া থাকেন।" সে যাহা, হউক, চৈতন্য লীলায় চারিজন ভক্তে চারি প্রকারে গুণ অতি পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। রামানন্দের জিতেন্দ্রিয়তা, দামোদরের নিরপেক্ষতা, হরিদাসের সহিষ্ণুতা ও রূপ সনাতনের দীনতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

রূপসনাতনের ম্লেচ্ছত্ব সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বতোভাবে ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। তাঁহারা যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও বৈরাগ্য গ্রহণের পূর্ব্বেই সংস্কৃত শাস্ত্রে অশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ম্লেচ্ছসেবা করিতেন বলিয়াই যে তাঁহারা আপনাদিগকে ম্লেচ্ছ মনে করিতেন, এরূপ মনে করিতে পারা যায় না। কারণ তাহা হইলে নীলাচলে যখন গমন করিয়াছিলেন, তখন কেবল তাঁহারাই কেন যবন হরিদাসের বাসায় থাকিতেন, যমেশ্বর টোটায় যাইবার সময় সনাতন গোস্বামী কেন যবনের নিষিদ্ধ পথ ছাড়িয়া তপ্তবালুকাময় সমুদ্র-পথে গিয়াছিলেন এবং কেনইবা পংক্তি ভোজনে বসিতেন না? এই সকল কথার উত্তর ভাবিতে গেলে আপনা হইতেই মনে হয়, কোন প্রকারে তাঁহারা যবন-ভাবাপন্ন হইয়া থাকিবেন।

রাজদরবার হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রূপ ও সাকর মল্লিক চৈতন্যচন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শন মানসে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লুকাইয়া যাত্রা করিলেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর লোক পরম্পরায় তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া তাঁহারা তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মধ্যে দুই একার পত্র দ্বারা আপনাদের কর্ত্তব্য কি, বিষয়ে উপদেশ চাহিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য সেই সকল

পত্রের উত্তরে একটীমাত্র সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাটী এইঃ—

'পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপিগৃহকর্ম্মসু
তমেবা স্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্।'

অর্থাৎ পরপুরুষে আসক্তা কুলনারী গৃহকর্ম্মে ব্যস্তা থাকিয়াও মনে মনে যেমন রসবিশেষ আস্বাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া ভগবানের রসামৃতে মন মগ্ন রাখিবে। দবীরখাস সেই অনুসারেই চলিয়া আসিতেছিলেন। এখন রামকেলিতে প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। দুই ভাই দন্তে তৃণ করিয়া প্রথমতঃ হরিদাস ও নিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তাঁহারা চৈতন্যের নিকট লইয়া গেলেন। রাজমন্ত্রীদ্বয় অমনি প্রভুর চরণতলে পড়িয়া বিনয় করিয়া কত কাঁদিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন· 'উঠ' 'উঠ' ভয় নাই। মঙ্গল হইবে। বীরখাস দবীরখাস স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! আমাদের ন্যায় পাপাত্মা আর নাই; আমাদের উদ্ধার কর। আমাদের কথা বলিতেই লজ্জা করে। জগাই মাধাই হইতেও আমরা ঘোর পাপী। একে ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী ও ম্লেচ্ছসেবী, তাহাতে বিষয়ের গভীর তমকূপে পড়িয়াছি। সেখান হইতে আমাদের তুলিয়া লয় তোমাভিন্ন এমন বলবান্ইঁ বা আর কে আছে? তোমার নাকি অসীম দয়া; আমাদের যদি কৃপা না কর, তবে আর দয়া চরিতার্থই বা কোথায় করিবে? হে প্রভো! হায় আমাদের কি এমন সুদিন হইবে, যখন, বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর তোমার অনুচর ও কিঙ্কররূপে সেবাব্রত লইয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারিব?

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'বীরখাস।' দবীরখাস! দৈন্যছাড়, তোমাদের দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমরা আমার পুরাতন বন্ধু। পূর্ব্বে কত যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহাতেই ত তোমাদের হৃদয় জানিতে পারিয়াছি। উত্তরে যাহা উপদেশ দিয়াছি, তাহাও ত জান। তোমাদের বড় ভালবাসি, তাই এখানে আসিয়াছি, নইলে রামকেলিতে আসার আমার ত কোন প্রয়োজন ছিল না? তা ভাল হ'ল, তোমাদের দেখা পেলাম, এখন ঘরে যাও, শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তোমাদের অচিরাৎ উদ্ধার করিবেন। এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য উভয় ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন ও মস্তকে হাতদিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং সকল ভক্তগণকে বলিলেন, 'সকলে কৃপা করিয়া এই দুইজনকে উদ্ধার কর।' তখন নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি ও বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত দুই ভ্রাতার পরিচয় করিয়াদিলে, সকলে তাঁহাদের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। উহাঁরা ভক্তগণের পাদ বন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, এখন হইতে ইঁহাদের যবন নামে কেহ ডাকিতে পাইবে না। ইঁহাদের নাম হইল রূপ ও সনাতন। নৈশগগন বিদীর্ণ করিয়া হরিধ্বনি উঠিল। রূপসনাতন চৈতন্যের শক্তিসঞ্চার হেতু নবজীবন পাইলেন। বিদায় হইয়া যাইবার সময় সনাতন চৈতন্যকে বলিলেন, 'প্রভু, শীঘ্র এস্থান হইতে চলিয়া যাও। নিষ্ঠুর ও খল যবন রাজকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। যদিও সে এখন তোমাকে ভক্তি করিতেছে, কিন্তু

কি জানি বিপদ ঘটাইতেই বা আটক কি, বিশেষতঃ তুমি শান্তির সময় শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইবে। এত লোক সঙ্গে লইয়া যাওয়া কি ভাল? সাত্ত্বিক ধামে একাকী যাওয়াই উচিত। অতএব নিবেদন করি, শীঘ্র এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর।' শ্রীচৈতন্য পরদিন প্রত্যূষেই যাত্রা করিয়া কানাইর নাট্‌শালাগ্রামে চলিয়া আসিলেন এবং দিবাভাগে তীর্থদর্শন করিয়া রজনীতে সনাতনের উপদেশের বিষয় চিন্তা করিয়া বৃন্দাবন যাওয়া স্থগিত করিলেন এবং প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া পুনরায় শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখানে শচীমাতাকে আনাইয়া দশদিন পর্য্যন্ত মহা মহোৎসবে অতিবাহিত করিলেন। শচীদেবী স্বহস্তে পাক করিয়া পুত্রকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্যের গুরু শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর তিথি আরাধনা উপলক্ষে অদ্বৈত গৃহে মহামহোৎসব হইল। মুরারি গুপ্ত রামভক্ত। তিনি এক রামাষ্টক রচনা করিয়া ভাবে গদ্‌গদ হইয়া ভক্তমণ্ডলীর নিকট পাঠ করিলে গৌরচন্দ্র তাঁহার ললাটে রামদাস নাম লিখিয়া দিলেন। রঘুনাথ দাস আসিয়া মহোৎসবে যোগ দিলেন এবং চৈতন্য প্রভুর নিকট উপদেশ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীচৈতন্য মাতা ও ভক্তদের নিকট বিদায় লইয়া ও সে বৎসর ভক্তদলকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়া কেবলমাত্র বলভদ্র আচার্য্য ও দামোদর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। পথে বরাহনগরে ভাগবতপরায়ণ এক ব্রাহ্মণের নিকট ভাগবত শুনিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া পাঠককে ভাগবতাচার্য্য উপাধি প্রদান করিলেন এবং যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া নীলাচলে চলিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র জানিতে পারিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পথে পরিচর্য্যা জন্য লোক রাখিয়াছিলেন। গৌর নীলাচলে আসিয়া বহুলোক সমাগমহেতু সনাতনের পরামর্শানুসারে বৃন্দাবন গমন স্থগিত করিয়া যে প্রকারে কানাইর নাট্‌শালা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেকথা, এবং রূপসনাতনের মিলন কথা সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের নিকট বর্ণনা করিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

শৌচ ও তীর্থ।

মনুষ্যের যতপ্রকার শৌচ অর্থাৎ শুদ্ধি আছে, তন্মধ্যে ভাবশুদ্ধিই প্রকৃত শুদ্ধি। অন্য তীর্থে স্নান করিলে দেহ পবিত্র হয় বটে, কিন্তু আত্মারূপ মহাতীর্থে অবগাহন না করিলে অন্তরাত্মা পবিত্র হয় না। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—

"আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা
সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র!
ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥"

আত্মাই পবিত্র নদী, দম তার ঘাট,
সত্যই সলিল তার, শীল তার তট;

সকল জীবের প্রতি করুণা অপার,
তরঙ্গরূপেতে তাহে উঠে বার বার;
সে নদীতে কর স্নান হে পাণ্ডুতনয়!
অন্য জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নাহি হয়।

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।)

শুদ্ধি প্রধানতঃ দুই প্রকার, বাহ্যশুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধি। মৃত্তিকা, গোময়, জল প্রভৃতি দ্বারা (অথবা সাবাং, গোলাপজল, ফুলালি তেল প্রভৃতি দ্বারা) বাহ্যশুদ্ধি হয়। সত্য, সংযম, দয়া, শীল ও ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা আত্মার শুদ্ধিকে ভাবশুদ্ধি বলে;—

"সত্যশৌচং মনঃশৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়াশৌচং জলশৌচং তু পঞ্চমম্॥
শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা
মৃজ্জলাদিকৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথাপরম্॥"

(গারুড়ে)

ভাবশুদ্ধিই পুরুষার্থসিদ্ধির মূল; এজন্য ভাবশুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ;—

"অগ্নিহোত্রং বিনা বেদা ন চ দানং বিনা ক্রিয়া।
ন ভাবেন বিনা সিদ্ধিস্তস্মাদ্‌ভাবো হি কারণম্॥
ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্‌ভাবো হি কারণম্॥"

(বৃদ্ধচাণক্য)

যেমন অগ্নিহোত্র বিনা বৈদিক অনুষ্ঠান হয় না, দান বিনা পুণ্যকর্ম্ম হয় না, তেমনি ভাব অর্থাৎ আত্মার অদ্বৈত প্রেম বিনা পুরুষার্থসিদ্ধি হয় না। অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ। কাষ্ঠ, পাষাণ, ধাতু বা মৃত্তিকা প্রভৃতির মধ্যে দেবতা নাই, ভাবেই দেবতা বিদ্যমান অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে পিতামহ! সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ কোন্ তীর্থ তাহা আমাকে বলুন। ভীষ্ম কহিতেছেন,—

"অগাধে বিমলে শুদ্ধে সত্যতোয়ে ধৃতিহ্রদে।
স্নাতব্যং মানসে তীর্থে সত্যমালম্ব্য শাশ্বতম্॥
তীর্থশৌচমনর্থিত্বমার্জ্জবং সত্যমার্দ্দবম্।
অহিংসা সর্ব্বভূতানামানৃশংস্যং দমঃ শমঃ॥
তত্ত্ববিত্ত্বনহংবুদ্ধিস্তীর্থপ্রবরমুচ্যতে।
শৌচলক্ষণমেতত্তে সর্ব্বত্রৈবান্ববেক্ষণম্॥
নোদকক্লিন্নগাত্রস্তু স্নাত ইত্যভিধীয়তে।
স স্নাতো যো দমস্নাতঃ সবাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ॥
জ্ঞানোৎপন্নং তু যচ্ছৌচং তচ্ছৌচং পরমং মতম্॥
মনসা চ প্রদীপ্তেন ব্রহ্মজ্ঞানজলেন চ।
স্নাতি যো মানসে তীর্থে তৎ স্নানং তত্ত্বদর্শিনাম্॥"

(ইত্যাদি)

অর্থাৎ—যাহা অগাধ নির্ম্মল ও পবিত্র, সত্যই যাহার সনাতন জল, সেই ব্রহ্মযোগ-রূপ মানসতীর্থেই স্নান করিবে। নিস্পৃহতা, প্রসন্নতা, সারল্য, সত্যনিষ্ঠা, কোমলতা, অহিংসা, বিশ্বজনীন করুণা, ইন্দ্রিয়সংযম ও শান্তি—এই সকলই প্রকৃত শৌচ। অহং-জ্ঞানশূন্য ব্রহ্মযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। সর্ব্বত্রই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকে শৌচের প্রধান লক্ষণ জানিও। জলে গাত্র ভিজাইলেই স্নান করা হয় না; সংযম-জলে স্নান করা-কেই স্নান বলে এবং সেই স্নানেই বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধ হয়। দেহশুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি ও চরিত্রশুদ্ধি প্রভৃতি যতপ্রকার শুদ্ধি আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানজনিত আত্মশুদ্ধিই চরম শুদ্ধি। যিনি জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হইয়া সেই অমৃতময় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করেন, সেই তত্ত্বদর্শীর স্নানই প্রকৃত স্নান।

নির্ম্মল আত্মাই ধর্ম্মের ক্ষেত্র। যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বিকার হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়াছেন, ঘরেই থাকুন, আর বাহিরেই যান, সকল স্থানই তাঁহার তীর্থময়।

আত্মতীর্থম্।

আত্মৈব পরমং তীর্থং মুক্তিক্ষেত্রং সনাতনম্।
ত্রিতাপহারিণী যত্র ভক্তিগঙ্গা বিরাজতে ॥১॥

আত্মাই মুক্তির ক্ষেত্র তীর্থ সনাতন,
কিবা আর আছে তীর্থ এ তীর্থ যেমন ;
ত্রিতাপহারিণী যথা পতিতপাবনী,
ভক্তিরূপে বিরাজিতা গঙ্গা নারায়ণী ॥১॥ (১)

তীর্থে তীর্থে পরিভ্রম্য মূঢ়াস্তাম্যন্তি মুক্তয়ে।
আত্মৈব পরমং তীর্থং যত্র মুক্তিময়ো হরিঃ ॥২॥

তীর্থে তীর্থে মুক্তি আশে করিয়া ভ্রমণ,
বৃথাই অশেষ ক্লেশ সহে মূঢ়গণ ;
আত্মাই পরম তীর্থ জানিবে নিশ্চিত,
মুক্তিরূপে নারায়ণ যথা বিরাজিত ।২।

ন দেবো বিদ্যতে মন্ত্রে ন তন্ত্রে ন ব্রতেঽপি বা।
ন তীর্থে প্রতিমায়াং বা ভাবগম্যো হি কেশবঃ॥৩॥

মন্ত্রে তন্ত্রে জপে তপে ব্রতে প্রতিমায়,
তীর্থে তপোবনে কেহ নাহি পায় তাঁয় ;
ভকতবৎসল তিনি ভকতজীবন,
কেবল ভকতি দিলে মিলে সেই ধন ।২।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং পূর্ণং জ্যোতির্ম্ময়ং বিভুম্।
একমেবাদ্বিতীয়ং তমাত্মন্যেব বিলোকয় ॥৪॥

অখণ্ডমণ্ডলাকার পূর্ণ সনাতন,
জ্যোতির্ম্ময় অদ্বিতীয় যিনি নারায়ণ ;
ত্রিভুবনে অন্য কোথা না পাইবে তাঁয়,
ভক্তিযোগে হের তাঁরে আপন আত্মায় ।৪।

অজাপুরুষয়োর্যত্র গঙ্গাসাগরয়োরিব।
অদ্বৈতঃ সঙ্গমো হ্যেকঃ স কৃষ্ণস্তীর্থসত্তমঃ ॥৫॥

প্রকৃতি পুরুষ গঙ্গাসাগরের প্রায়,
একাধারে একাকারে মিলিত যথায় ;
একমাত্র সেই 'কৃষ্ণ' সর্ব্বতীর্থসার,(২)
সে তীর্থে ডুবিলে মুক্তি সদ্যই তাহার ।৫।

আত্মা কাশী মহাতীর্থং মুক্তিক্ষেত্রং সনাতনম্।
নিত্যং সন্নিহিতো যত্র রাজরাজেশ্বরঃ শিবঃ ॥৬॥

ভক্তের আত্মাই কাশী তীর্থ সনাতন,
কি আছে মুক্তির ক্ষেত্র এ তীর্থ যেমন ?
নিত্য বিরাজেন যথা জগতের গুরু,
রাজরাজেশ্বর সেই শিব-কল্পতরু ।৬।

তদেব ভক্তহৃদয়ং গয়াতীর্থং বিমুক্তিদম্।
পাদপদ্মং বিনিদধে যত্র দেবো গদাধরঃ ॥৭॥

গয়াতীর্থ মোক্ষধাম ভক্তের হৃদয়,
গদাধর-পাদপদ্ম নিত্য যথা রয় ।৭।

শ্রীক্ষেত্রং পরমংতীর্থং ভক্তস্য হৃদয়ং হি তৎ।
মুক্তিদাতা স্বয়ং যত্র জগন্নাথো বিরাজতে ॥৮॥

শ্রীক্ষেত্র পরম তীর্থ ভকতেরি চিত,
মুক্তিদাতা জগন্নাথ যথা বিরাজিত ।৮।

নিত্যানন্দময়ো যত্র হৃদয়ে রমতে হরিঃ।
সর্ব্বতীর্থোত্তমং তদ্ধি সর্ব্বতীর্থোত্তমং হি তৎ ॥৯

যে হৃদয়ে নিত্যানন্দ হরির বিহার,
সর্ব্বতীর্থ-সার সেই সর্ব্বতীর্থ-সার ।৯।

ত্রৈলোক্যং ভ্রম রে জীব তৃষ্ণাশান্ত্যৈ নিরন্তরম্
আত্মতীর্থং বিনাতৃষ্ণা ন তে কুত্রাপি শাম্যতি॥১০॥

রে জীব ! ত্রৈলোক্য তুমি করহ ভ্রমণ,
কোথাও তৃষ্ণার তব না হবে শমন ;
আত্ম-কুণ্ডে শান্তিজলে না করিলে স্নান,
এ ঘোর পিপাসা কোথা হইবে নির্ব্বাণ ॥১১॥

রে মূঢ় মজ্জ শততীর্থজলেষ্বজস্রম্
ধৌতং ততঃ খলু ভবেদ্রজএব বাহ্যম্।

(১) "ঈশ্বরাদ্রিসমুদ্ভূতা যেশ্বরাম্বুধিগামিনী।
প্রেমদ্রবময়ী ধারা সৈব গঙ্গা সনাতনী।"

যে দ্রবময়ী প্রেমধারা, ঈশ্বররূপ মহাগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া ঈশ্বররূপ মহাসাগরে মিলিত, তাহার নাম সনাতনী গঙ্গা। (সদ্ভাব, ২৭ শ্লোক দেখ)

(২) 'কৃষ্ণ'—এই শব্দটি 'কৃষি' ও 'ণ' শব্দের সংযোগে নিষ্পন্ন। 'কৃষি' শব্দের অর্থ সত্তা এবং 'ণ' শব্দের অর্থ আনন্দ ; ঈশ্বর সৎ ও আনন্দ অর্থাৎ 'সচ্চিদানন্দ' বলিয়া 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত। মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বে, যথা,—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥" (ব্যাস)

নৈবাত্মতীর্থপরিষেবণমন্তরেণ
মালিন্যমান্তরমপৈতি ন নির্বৃতির্বা ॥১১॥
রে মূঢ়! সহস্র তীর্থে করহ মজ্জন,
বাহিরের ধূলা তাহে হইবে ক্ষালন;
আত্মতীর্থে নাহি যদি কর যোগস্নান,
যাবে না মনের রজ, পাবে না নির্ব্বাণ।১১।

পরিভ্রমসি কিং দূরং তুচ্ছকাচজিঘৃক্ষয়া।
মনঃ কি নাভিজানীষে গৃহে চিন্তামণিং তব ॥১২॥
কাচের আশায় দূরে ভ্রম কেন মন!
জান না কি গৃহে তব চিন্তামণি ধন?॥১২॥ (৩)
ইতি শ্রীতারাকুমার শর্ম্মণা।
বিরচিতম্ আত্মতীর্থম্।

ঢাকুর সমালোচনার প্রতিবাদ।*

"অকারণদ্বেষি মনস্তু যস্য বৈ
কথং জনস্তং পরিতোষয়িষ্যতি॥"

গত আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের নবজীবনে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'ঢাকুর' পুস্তকের যে সমালোচন বা প্রতিবাদ করিয়াছেন, তৎপাঠে বিস্মিত হইয়াছি। মজুমদার মহাশয় ঢাকুরের সমালোচন উপলক্ষে ইতিবৃত্ত-লেখক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সত্যের অপলাপকারী কলহপ্রিয় ইত্যাদি বলিয়া নিজের সত্যনিষ্ঠার প্রচুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পরন্তু ঢাকুর গ্রন্থকার, ঢাকুর শব্দের অর্থ জানেন না বলিয়া তাঁহাকে যে ঢাকুর শব্দের অদ্ভুত অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন, ইহা সামান্য বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। যাহা হউক, তিনি ঢাকুর শব্দের অর্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া আপনাকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে করুন, আমাদের কোন আপত্তি নাই। অন্য কোন লেখক বা গ্রন্থকারের কোনও কথাকে যদি অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, আর প্রতিবাদ করাই যদি কলহপ্রিয়তা হয়, তবে মজুমদার মহাশয় ঢাকুর পুস্তকের প্রায় সমুদায় কথারই যে অসঙ্গত প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাকে কোন্ নামে অভিহিত করিবেন? সমালোচকের মতে এরূপ ব্যবহার ইউরোপীয় কুশিক্ষার ফল। সমালোচক যাহাকে কুফল বোধ করেন, স্বয়ং সে ফল ভোগ করেন কেন? আমাদের বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, সমালোচক মহাশয় নিতান্তই অসূয়ার বশবর্ত্তী হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। ঢাকুর গ্রন্থকার বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, প্রাচীন পদ্য ঢাকুর পুস্তকখানি অনেক সামাজিক বারেন্দ্র কায়স্থের গৃহেই আছে। তাই তিনি ঢাকুর পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, "কোনও বারেন্দ্র কায়স্থের যদি তাঁহার প্রকাশিত ঢাকুর পুস্তকের লিখিত বংশবিবরণ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তবে প্রাচীন পদ্য ঢাকুরের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিবেন।"

(৩) ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—
"মন! তুমি কাঙ্গালি কিসে?
তোর ঘরের মাঝে অমূল্য ধন চিনিলি না তা সর্ব্বনেশে"

* এই প্রবন্ধটী নবজীবনের জন্য লিখিত হইয়াছিল, নবজীবন বাহির হইতেছে না বলিয়া নব্যভারতে প্রকাশিত হইল।

এই কথার প্রতিবাদে সমালোচক লিখিয়াছেন, "যে পদ্য ঢাকুরের সহিত গদ্য ঢাকুরের ঐক্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, সে খানিকে মুদ্রিত করিলেন না কেন?" আশ্চর্য্য জিজ্ঞাসা! যদি নিতান্ত আবশ্যক বোধ করেন, সমালোচনকারীই কেন তাহা মুদ্রিত করিয়া বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের উপকার করেন না?

বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের প্রাচীন ও মান্য পণ্ডিতবর গুরুচরণ সরকার মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঢাকুর পুস্তক সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাই ঢাকুর গ্রন্থকার নিজ পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, সমালোচকের ইহা বড়ই বিরক্তির কারণ হইয়াছে। বিজ্ঞ পাঠকগণ এ বিরক্তির কারণ অনুভব করিবেন। সমালোচকের মতে ইহা "বিলাতী সভ্যতা"। নানা অসার বিষয়ে যাঁহারা বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মুখে বিলাতী সভ্যতার নিন্দা নিতান্ত রহস্যজনক ব্যাপার। মজুমদার মহাশয় ঢাকুরের সমালোচন ব্যপদেশে যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহারই একাধিকস্থলে তিনি বিলাতি সভ্যতার অত্যধিক অনুকরণ করিতে ছাড়েন নাই। যাহা হউক, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বদেশীয়ই হউক, অথবা ভিন্নদেশীয়ই হউক, হিতকর বিষয়ের অনুকরণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ইতিবৃত্ত প্রকাশের পূর্ব্বে, ঢাকুর গ্রন্থকার কায়স্থ জাতি কোন্ মূল জাতি হইতে সমুৎপন্ন, এ বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সমালোচক মহাশয় ইহাতে মহা বিরক্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে ঢাকুর গ্রন্থকার যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেও অনেকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং সেই স্কন্দপুরাণ, সেই পদ্মপুরাণ এবং সেই তন্ত্রশাস্ত্রের পুরাণ কথা, পুরাণ প্রমাণ ঢাকুর গ্রন্থকার সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া সমালোচক বিশেষ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন। সমালোচনকারী জানেন না যে, একমাত্র ঋষিপ্রণীত পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে কত গ্রন্থকার স্বমত সমর্থনার্থ একই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পুরাণ-কথা পুরাণ হইলেও শাস্ত্রজ্ঞদিগের নিকট নিত্য নূতন। যত প্রাচীন স্মৃতিসংগ্রহকর্ত্তা আছেন, সকলেই নিজ মত সংস্থাপন বিষয়ে পৌরাণিক সেই প্রাচীন পচা শ্লোক গুলিই নূতনরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। নূতন প্রস্তুত শ্লোক প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। তবে সেই প্রাচীন শাস্ত্রীয় প্রমাণ গুলি কিরূপ যুক্তির সহিত প্রদর্শিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহারই বিচার করিয়া থাকেন।

ভরতমল্লিক কায়স্থকে বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন, এ নিমিত্ত ঢাকুর গ্রন্থকার তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও সমালোচকের অসহনীয় হইয়াছে। সমালোচনকারী কিন্তু একজন বারেন্দ্র কায়স্থ। ভরত মল্লিক, 'করণ' শব্দ দ্বারা বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ এবং কায়স্থ,—উভয়কে বুঝাইয়াছেন, এবং সেইরূপ লিখিয়াছেন, সমালোচনকারী এরূপ প্রমাণ কোথায় পাইলেন? প্রত্যুত সমালোচক একমাত্র বর্ণসঙ্কর করণকে করণ ও কায়স্থ, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আশ্চর্য্যরূপে কায়স্থ জাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বর্ণসঙ্করত্ব করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু কায়স্থসমাজ এ অসঙ্গত কথা স্বীকার

করিতে পারেন না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অগ্নিপুরাণের যে সকল কৃত্রিম প্রমাণে কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, ঢাকুর সমালোচনকারী তাহারই পক্ষপাতী। কায়স্থজাতির মধ্যে এরূপ লোক আছেন, আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। ইনি প্রশ্ন করিয়াছেন, "আমরা যদি অগ্নিপুরাণের বচনকে প্রক্ষিপ্ত বলি, তাহা হইলে বিরুদ্ধবাদীরা স্কন্দপুরাণাদির বচনও প্রক্ষিপ্ত বলিলে তাহাতে আমাদিগের কি কোন যুক্তিযুক্ত প্রত্যুত্তর আছে?"—ইত্যাদি। অধিকাংশ স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত যে কথার ঐক্য নাই এবং যাহাতে অত্যন্ত আধুনিক শব্দ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বা কৃত্রিম না বলিয়া কি বলা যাইবে? সমালোচনকারী অগ্নিপুরাণোক্ত ঘোষ, বসু প্রভৃতি শব্দগুলিকে পুরাণ বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিয়াছেন। এক অগ্নিপুরাণ ব্যতীত অন্য কোনও পুরাণে কি সমালোচক উক্ত শব্দগুলি দেখাইতে পারেন? অনেক গ্রন্থেই যে প্রক্ষিপ্ত বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়, পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করেন। কেবল ঢাকুর-সমালোচনকারীই স্বীকার করেন না। তন্ত্ররত্নাকর প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে অদ্বৈত নিত্যানন্দ ও লণ্ডন নগর প্রভৃতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ তন্ত্র বা তন্ত্রোক্ত বচনকে বিজ্ঞগণ আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন, এই নিমিত্ত ঢাকুর-সমালোচনকারী অন্যান্য তন্ত্রবচনকেও কি প্রক্ষিপ্ত বলিবেন? সংস্কৃত পাটীগণিত লীলাবতীতে পর্য্যন্ত প্রক্ষিপ্ত বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামানুজ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ রামায়ণ ও মহাভারতাদিতেও প্রক্ষিপ্ত বচন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির ঐক্য সংস্থাপন করিয়া, কেবল কায়স্থসমাজ নহে, বৈদ্যসমাজকেও ঢাকুরসমালোচনকারী অবাক্ করিয়াছেন। স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রাদির রাশি রাশি প্রমাণকে অগ্রাহ্য পূর্ব্বক কায়স্থ ও বৈদ্যের সমীকরণ চেষ্টা আশ্চর্য্য সাহসের কার্য্য। সমালোচনকারীর "অম্বষ্ঠ" শব্দ সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণকে পরাভূত করিয়াছে। এই নিমিত্তই তিনি অহঙ্কার করিয়া লিখিয়াছেন যে, "আমরা কায়স্থ ও অম্বষ্ঠকে (অর্থাৎ বৈদ্যকে) যে এক ও অভিন্ন মনে করিলাম, তাহা পরিহারযোগ্য নহে।" পরিহারযোগ্য হয় কিনা, বিজ্ঞ পাঠকগণের বিচারসাপেক্ষ। অম্বষ্ঠ শব্দে দেশ বিশেষ, এবং কায়স্থ জাতীয় ব্যক্তি বিশেষকেও বুঝায় বলিয়াই বৈদ্য ও কায়স্থ একজাতীয় নহে। একটিমাত্র শব্দ দ্বারা শাস্ত্রের বিস্পষ্ট প্রমাণাবলী প্রতিহত হইতে পারে না, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি যে এক, কোনও শাস্ত্রে এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বরং সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সেনরাজগণ সম্বন্ধে ঢাকুরসমালোচকের কি বিষম ভ্রম রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের এ স্থলে লিপিবাহুল্য করিবার প্রয়োজন নাই। সমালোচনকারী ঐতিহাসিক তত্ত্ববিৎ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের লিখিত "সেনরাজগণ" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিবেন। অতঃপর সমালোচনকারী কায়স্থসমাজকে আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টায় বিরত করিবার অভিপ্রায়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। কায়স্থজাতি, বর্ত্তমানে যে ভাবে আছেন, সেই ভাবে থাকিলে অগৌরবের বিষয় কি, সমালোচক তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কায়স্থ-

সমাজের যতদূর অধঃপাত হইবার তাহা হইয়াছে, কিন্তু সমালোচনকারী কায়স্থ-জাতির কোনও অগৌরবের কারণ দেখিতে পান না। ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্ব কতদূর অধঃপাত, তাহা সহৃদয় কায়স্থ-সমাজ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং খিদিরপুর, ফরিদপুর ও পঞ্জাবের কায়স্থগণ এ নিমিত্ত সভা সমিতি করিতেছেন। সমালোচক যদি কায়স্থ না হইতেন, তবে আমাদিগের বিশেষ আক্ষেপের কারণ ছিল না। কায়স্থজাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ, অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণসমাজে কিরূপ ঘৃণিতভাবে পরিগৃহীত হন, সমালোচনকারী বোধ হয় তাহা জানেন না। ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক, বৈদ্যগণ পর্য্যন্ত কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া যেরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন, অযথা গৌরবে কৃতার্থম্মন্য সমালোচনকারী তাহাও জানেন না। আর্য্যসমাজে শূদ্রজাতি কিরূপ ঘৃণার পাত্র, লিপি-বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।

সমালোচনকারী, গ্রন্থকারের নিকট গুরুতর গবেষণা পাইবার আশা করিয়াছিলেন, না পাইয়া দুঃখিত হইয়াছেন। আমরা বলি, তিনি নিজে গুরুতর গবেষণা করিয়া নিজের এবং সাধারণের দুঃখ দূর করুন। ঢাকুরগ্রন্থকার হইতে তিনি অনেক স্থলেই স্বীয় জ্ঞানগরিমা প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ অভিমান দ্বারা সমালোচনকারী পণ্ডিতসমাজে অবশ্যই হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

বারেন্দ্রসমাজ-সংঘটনকারী, ভৃগুনন্দী প্রভৃতি, বল্লালসেন দেবের সমসাময়িক ছিলেন, প্রাচীন পদ্য ঢাকুরে ইহা লিখিত আছে। ঢাকুর গ্রন্থকারও এ বিষয় অপ্রকাশিত রাখেন নাই। কিন্তু ভৃগুনন্দী হইতে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ অধঃস্তন পুরুষের সময় নির্ণয় করিয়া দেখিলে ভৃগুনন্দী প্রভৃতিকে বল্লালসেনের পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়, ঢাকুর এই বিষয়টি নূতনরূপে লিখিয়াছেন। এই উভয় মতের মধ্যে বিজ্ঞগণ যে মতের অনুমোদন অথবা সঙ্গত বোধ করেন, তাহাই করিবেন। সমালোচনকারী লিখিয়াছেন, তিনি ভৃগুর সমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তিগণের পর্য্যায়ের যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান পর্য্যায়ের উর্দ্ধে ১৬৷১৭ পর্য্যায়ের নামের তালিকা পাইয়াছেন। কোন কোন স্থলে শিশু-সন্তান সহ গণনা করিলে ১৬৷১৭ পুরুষ হইতে পারে; কিন্তু ১৬৷১৭ পুরুষের সময় নির্ণয় করিলেও ভৃগুনন্দী বল্লালসেনের সমসাময়িক হইতে পারেন না। সমালোচনকারী ঢাকুরগ্রন্থকারের অবলম্বিত পদ্য ঢাকুরের বলিয়া যে একটি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, গ্রন্থকারের অবলম্বিত পদ্য ঢাকুরে আমরা তাহা দেখিতে পাই নাই। সেরূপ অসঙ্গত প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে গ্রন্থকার অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন, গ্রন্থকারের অবলম্বিত পদ্য ঢাকুর বারেন্দ্র-কায়স্থসমাজে অনেকের নিকটেই আছে। সমালোচক ভৃগুর সমসাময়িক ব্যক্তিগণের (বোধ হয় নরদাসের) পর্য্যায়ের যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান পর্য্যায়ের উর্দ্ধে ১৬৷১৭ পর্য্যায়ের নামের তালিকা পাইয়াছেন, এইরূপ লিখিয়া আবার পরক্ষণেই লিখিয়াছেন, তাহাতেও ভৃগুর সমকালীন ব্যক্তিগণের নাম পান নাই। এরূপ অসম্বদ্ধ কথার আর আমরা কি উত্তর করিব? ঢাকুরগ্রন্থকার ভৃগুর যে বংশা-

বলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত নহে, পদ্য ঢাকুর ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ক্রমসংগৃহীত পুরাতন লিপি অনুসারে বংশাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন। পোতাজিয়ানিবাসী ভৃগুবংশীয় নবরত্ন পাড়ার রায়দিগের গৃহেও ভৃগুবংশাবলী লিখিত আছে। প্রাচীন পদ্য ঢাকুরেও ভৃগুর অধঃস্তন ষষ্ঠ পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঢাকুর সমালোচক লিখিয়াছেন, "আমাদিগের গ্রন্থকার শৌলকূপ ও নন্দী গ্রামকে বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত নহে বলিয়া একটি গুরুতর ভ্রমের কারণ করিয়াছেন।" ঢাকুর-গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি অকারণ দোষারোপ করাই যখন সমালোচকের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন তিনি উক্তরূপ লিখিবেন, আশ্চর্য্য কি? ঢাকুরগ্রন্থকার শৌলকূপা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, ঢাকুরের ৪২ পৃষ্ঠা হইতে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, কিন্তু পাঠক দেখিবেন সমালোচনকারী কিরূপ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। যথা ;— "পদ্য কুলপঞ্জিকাতে লিখিত আছে, বল্লালের উক্তরূপ উচ্ছৃঙ্খলাবস্থার সময়েই ভৃগুনন্দী, নরহরি দাস ও মুরারী চাকী বল্লালের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বরেন্দ্র প্রদেশে আইসেন এবং শৌলকূপার নাগবংশীয় জমিদারদিগের সাহায্যে বারেন্দ্র কায়স্থসমাজ সংস্থাপন করেন। ইত্যাদি।" এইরূপ লেখাতে শৌলকূপা কোন্ দেশের অন্তর্গত বুঝায়, পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। নন্দীগ্রাম কোন্ প্রদেশের অন্তর্গত, ঢাকুরগ্রন্থকার সে বিষয়ে কিছুই লেখেন নাই, কিন্তু সমালোচনকারী বলিয়াছেন, "আমাদিগের গ্রন্থকার শৌলকূপ ও নন্দীগ্রামকে বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত নহে বলিয়া একটি গুরুতর ভ্রমের কারণ করিয়াছেন।" আশ্চর্য্য দোষারোপ! ঈর্ষ্যা-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইলে লোকে অভ্রান্তকে ভ্রান্ত, সত্যনিষ্ঠকে সত্যের অপলাপকারী এবং শান্ত শিষ্টকে কলহপ্রিয় সকলই বলিতে পারে।

ভৃগুনন্দী যেস্থানে প্রথমতঃ বাস করেন, তাহার নাম নন্দীগাঁতি। শৌলকূপার ভূম্যধিকারী, ভৃগুকে এই গ্রাম প্রদান করেন। এইরূপ চাকীর গাঁতি ও দাসের গাঁতি নামেও মুরারি চাকী ও নরদাসের দুইটি বাসস্থান ছিল। এই সকল গ্রাম শৌলকূপার নিকটবর্ত্তী। নন্দীবংশীয়েরা আপনাদিগকে যে নন্দীগ্রামের নন্দী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, এ নন্দীগ্রাম বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত নহে, ইহা কান্যকুব্জ-দেশের অন্তর্গত বলিয়া জনশ্রুতি আছে। রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর তাঁহার শব্দকল্পদ্রুমে রাজসাহীকেই বরেন্দ্রদেশরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ মতের অনুসরণ করিলে শৌলকূপাকে সম্প্রতি আর বরেন্দ্রের অন্তর্গত বলা যা না। অতএব ঢাকুরগ্রন্থকার যদি শৌলকূপাকে বরেন্দ্রের অন্তর্গত নাও বলেন, তথাপি তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা যায় না। শৌলকূপা যশোহরের মাগুরা উপবিভাগের অন্তর্গত।

বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের সমাজ ও ব্যক্তিগত কতিপয় অপবাদ আছে, ঢাকুরগ্রন্থকার তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভৃগুবংশীয় জগদানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রূপরায় মহাশয়ের সগোত্র বিবাহ সমাজ-বিরুদ্ধ হইলেও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয় নাই ইত্যাদি যাহা লিখিয়াছেন, তৎপাঠে সমালোচক মহাশয় মহা বিরক্ত হইয়া নিজের

সত্যনিষ্ঠার যথোচিত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "উক্ত সমাজে রূপরায় নামক একব্যক্তি স্ববংশে বিবাহ করিয়া হীন হইয়াছিলেন ইত্যাদি।" রূপরায় সম্বন্ধে প্রাচীন পদ্য ঢাকুরে লিখিত আছে, "সগোত্র বিবাহ তেঁহ না জানিয়া কৈলা।" রূপরায় সগোত্রে বিবাহ করেন, ঢাকুরে এইমাত্র লিখিত আছে, সবংশে বিবাহ করেন এরূপ লিখিত নাই, কিন্তু সমালোচনকারী লিখিয়াছেন, রূপরায় সবংশ বিবাহ করিয়াছেন। এরূপ সত্যের অপলাপ করা ন্যায্য ও ধর্ম্ম নহে। সমালোচকের জানা উচিত যে, শূদ্রের সম্বন্ধে সগোত্র-বিবাহ ও সবংশ-বিবাহ এক পদার্থ নহে। শূদ্রের সগোত্র-বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে, সমাজবিরুদ্ধ বলিয়াই যে রূপরায় নিন্দিত হইয়াছেন, এই বিষয়টি প্রমাণ করাই ঢাকুর-গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। কায়স্থসমাজে সবংশ-বিবাহ প্রচলিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। ঢাকুরের কুত্রাপি এরূপ কথার উল্লেখ নাই। সমালোচনকারী, অপরিজ্ঞাত কায়স্থজাতীয় দাসমাত্র, নন্দীমাত্র, বা চাকীমাত্রকে সবংশ বলেন, এমতে ভারতের যে প্রদেশে যত দাস বা যত নন্দী আছে, সকলকেই পরস্পর সবংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এরূপ স্বীকার করিবার কোনও শাস্ত্র-যুক্তি নাই। বারেন্দ্র কায়স্থসমাজে যাঁহারা নন্দীগ্রামের নন্দী বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগকেই বাস্তবিক একবংশসম্ভূত বলা যায়। নন্দী মাত্রই একবংশসম্ভূত নহে। এই নিমিত্তই এরূপস্থলে বৈবাহিক সম্বন্ধ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং ঢাকুর গ্রন্থকার উক্তরূপ উভয় নন্দীবংশে বৈবাহিক ক্রিয়া দূষণীয় নহে লিখিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। ঢাকুরসমালোচক লিখিয়াছেন, "এরূপ বিবাহ যে, সর্ব্বথা দূষণীয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।" সমাজে দূষণীয় হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রেও যে দূষণীয়, সমালোচক কি ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন? সকল সামাজিক নিয়মই শাস্ত্রানুমোদিত নহে। সমালোচনকারীর মতে ভারতের সকল দাসই সবংশ, সকল নন্দীই সবংশ এবং সকল চাকীই সবংশ। এই অভিনব মত কেবল শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ইহা প্রাচীন পদ্য ঢাকুরের মতেরও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। পদ্য ঢাকুরে চাকীবংশ নির্ণয়ের শেষে লিখিত আছে; —

> "ইহা বহির্ভূত চাকী, কেবল জানিবে ফাঁকি।
> জোড়াতাড়া দিয়া পরিচয়॥"

চাকীবংশ সম্বন্ধে প্রাচীন ঢাকুরে যাহা লিখিত হইয়াছে, বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের নন্দী প্রভৃতি সাত ঘর (বংশ) সম্বন্ধেই এই কথার সঙ্গতি রহিয়াছে। অতএব ঢাকুর-সমালোচকের উক্ত মত যে নিতান্ত হেয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ইনি পুনর্ব্বার লিখিয়াছেন, "এই মত পরিব্যক্ত করায় তিনি (গ্রন্থকার) কেবল স্বকীয় সমাজে নহে সমগ্র কায়স্থ সমাজেই নিন্দিত হইয়াছেন।" শাস্ত্রাভিমত প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার দুই চারিজন অনভিজ্ঞ কায়স্থের নিন্দাভাজন হইতে পারেন, অভিজ্ঞ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কখনই তাঁহার নিন্দা করিবেন না। ঢাকুর পাঠ করিয়া অনেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ কায়স্থ, গ্রন্থকারের প্রতি অতীব সন্তোষ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও পুস্তক পাঠে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা খিদিরপুর কায়স্থ সমিতি প্রভৃতি, ঢাকুর

পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ঢাকুর-সমালোচক যে শ্রেণীর লোক, সেই বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থদিগেরও কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি ঢাকুরপাঠে সন্তুষ্ট হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। এই সকল পত্র প্রকাশ করিলে সমালোচক বলিবেন, ইহা বিলাতি সভ্যতা।

সমালোচক আধুনিক কৃতবিদ্য সমাজ ও বিলাতি সভ্যতার প্রতি বড়ই বিরক্ত। স্বপক্ষ সমর্থনার্থ কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত প্রকাশ করা যে ভারতের প্রাচীন রীতি, সমালোচনকারী ইহা জানেন না বলিয়াই এরূপ রীতিকে বিলাতি সভ্যতা বলেন। ঢাকুরে লিখিত আছে, "অসপিণ্ড ও অসমানোদক স্থলে উভয় নন্দীবংশেও বৈবাহিক ক্রিয়া শাস্ত্রানুসারে দূষণীয় হয় না।" এই কথায় সমালোচনকারী, গ্রন্থকারকে বিস্তর উপহাস করিয়া লিখিয়াছেন, "বিপ্র স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের আসন অধিকার পূর্ব্বক গুরুতর ব্যবস্থা প্রদান করত তিনি, (গ্রন্থকার) যে প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা লজ্জার বিষয় বটে" ইত্যাদি। সজাতীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সমালোচকের কাছে আমরা তাহার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতামত না জানিয়াই শাস্ত্রজ্ঞ গ্রন্থকারের প্রতি অযথা উক্তি প্রয়োগ করা কি লজ্জাশীলতার কার্য্য? আমরা ঢাকুর হইতে স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, বিজ্ঞ পাঠক দেখিবেন, সমালোচকমহাশয় কিরূপ সত্যনিষ্ঠ। যথা;—

"প্রাগুক্তমনুশাতাতপবচনে দ্বিজাতিগ্রহণং সগোত্রাবর্জ্জনে শূদ্রস্য ব্যাবৃত্ত্যর্থং সপিণ্ডসমানোদকতাতু শূদ্রেপ্য বিশিষ্টা।"
(উদ্বাহতত্ত্ব)

ইহার অনুবাদ এই যে, মনু ও শাতাতপ-বচনে দ্বিজাতি শব্দ গৃহীত হওয়াতে শূদ্রের সগোত্রে বিবাহ যে নিষিদ্ধ নহে, ইহাই প্রতীত হইতেছে। সপিণ্ড ও সমানোদকতা সম্বন্ধে, দ্বিজাতি ও শূদ্রে কোনও বিশেষ নাই। পরন্তু;—

"সমানগোত্রপ্রবরাং শূদ্রামূঢ় ন দোষভাক্।" ইত্যাদি
(গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ধৃত স্মৃতি।)

অর্থাৎ সমান-গোত্র-প্রবরা-বিবাহ শূদ্রের পক্ষে দূষণীয় নহে। ঢাকুর গ্রন্থকার, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থানুসারেই স্বীয় পুস্তকে শূদ্রের পক্ষে অসপিণ্ড ও অসমানোদক বিবাহ দূষণীয় নহে লিখিয়াছেন। সমালোচক ইহাকে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধ-নূতন ব্যবস্থা বলিয়া গ্রন্থকারকে বিস্তর উপহাস করিয়াছেন এবং নিজের শাস্ত্রজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন যে,—"গ্রন্থকার, বারেন্দ্র কায়স্থসমাজে সবংশ-বিবাহ প্রথা আছে বলিয়া যে বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ইত্যাদি।" বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজে সবংশ-বিবাহ প্রথা আছে, এরূপ উক্তি ঢাকুরের কুত্রাপি লিখিত নাই, সগোত্র ও সমানপ্রবর-বিবাহ প্রথা থাকার কথা লিখিত আছে। গ্রন্থকার তাহার প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন। বারেন্দ্র কায়স্থসমাজে সগোত্র বলিলেই সবংশ বুঝায় না। ভিন্ন বংশও সগোত্র আছে। ব্রাহ্মণ সমাজে এরূপ হইতেই পারে না। কেননা তাঁহাদের গোত্র ও বংশ অভিন্ন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সমালোচক মহাশয় গ্রন্থকারের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া মিথ্যা দোষারোপ করিতে লোক ও ধর্ম্মভয় করেন নাই। এত অসূয়ার কারণ

কি? আজ কাল, কেহ কেহ অনুমান করেন, সমানবংশীয়া কন্যাতে যে সকল সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহারা দুর্ব্বল ও হীনমনা হইয়া থাকে। এই অনুমান কতদূর ঠিক্, তাহারই গবেষণা উপলক্ষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, উক্ত অনুমান যদি ঠিক্ হইত তবে ক্ষত্রিয় জাতিতে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও উন্নতমনা শত শত বীর পুরুষ কখনই দৃষ্ট বা শ্রুত হইত না। সমালোচক বলেন, ক্ষত্রিয় জাতিতে সবংশ ও মামাতু পিস্‌তাতু ভগ্নী বিবাহ প্রচলিত থাকাতেই যদুকুল ও কুরুকুল অকালে বিনষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের বিনাশ উক্তরূপ বিবাহের কুফল, ইহা আমরা নূতন শুনিলাম। যদু ও কুরুকুলে পূর্ব্বে যে রীতিতে বিবাহ হইত, তাহা তাৎকালিক ঋষিদিগের অনুমোদিত ছিল। বেদব্যাসাদি মহর্ষিগণ যাহাতে দোষ দেখিতে পান নাই, ঢাকুর-সমালোচক আজ তাহাতে ভীষণ দোষের সমাবেশ দেখিতে পাইলেন, ইহা সামান্য কৌতুকাবহ ব্যাপার নহে। সমালোচক, ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণের আসন আক্রমণ পূর্ব্বক নূতন মত প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন নাই, কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা প্রনয়ন করার অপবাদ আরোপ পূর্ব্বক ঢাকুর গ্রন্থকারের প্রতি বিলক্ষণ কটূক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এস্থলে সমালোচনকারীকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, সবংশ-বিবাহ নিমিত্তই যেন কুরুকুল ধ্বংস হইল, উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল যবনবংশ কেন ধ্বংস হইতেছে না? ইহারা যে খুল্লতাত-কন্যাকে পর্য্যন্ত বিবাহ করে। সমালোচক একথার উত্তরে আর কিছু না বলিলেও ক্রোধভরে ইহা অবশ্যই বলিবেন যে, আমরা কায়স্থসমাজে উক্তরূপ বিবাহ প্রচলিত করিতে ইচ্ছুক।

সবংশ-বিবাহ কেন নিষিদ্ধ হইল, শাস্ত্রে তাহার কোনও কারণ উক্ত হয় নাই। শাস্ত্রের নিষেধাজ্ঞার কারণ আমরা অনুভব করিতে পারি না পারি, বালকের পিতৃ-আজ্ঞার ন্যায় তাহা পালন করিতেই হইবে। জীবের অস্থিমধ্যে শঙ্খ এবং বিষ্ঠামূত্রমধ্যে গোময় গোমূত্রকে পবিত্ররূপে গ্রহণ করিতে শাস্ত্রের আজ্ঞা আছে, হিন্দুসমাজ অবনত মস্তকে সে আজ্ঞা পালন করিতেছেন। এইরূপ সমান বংশে বিবাহসম্বন্ধেও জানিতে হইবে। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় জাতির সবংশ-বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ছিল না বলিয়া তাঁহারা উক্তরূপ বিবাহ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদিগের অপরাধ কি? সমালোচকের মতে সেকেলে মুনি ঋষিরাই অপরাধী হইতে পারেন। আমাদিগের ঢাকুরগ্রন্থকার অসপিণ্ড ও অসমানোদক উভয় নন্দীবংশের বিবাহে শাস্ত্রানুসারে কোনও দোষ নাই যাহা বলিয়াছেন, তাহা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অনুমোদিত; সুতরাং এবিষয়ে তিনি নিন্দার পাত্র হইতে পারেন না, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যই নিন্দার পাত্র। সগোত্র-বিবাহ বিষয়ক স্মৃতি সংহিতার প্রচুর প্রমাণ সত্ত্বেও সমালোচনকারী, অপত্যোৎপাদনোপযুক্তা স্ত্রী সম্বন্ধীয় আয়ুর্ব্বেদের একটি সাধারণ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন কেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সমালোচনকারী কি তাঁহার উদ্ধৃত আয়ুর্ব্বেদীয় বচনের সর্ব্বথা মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ? ইনি আরও লিখিয়াছেন যে, "জর্ম্মান রাজবংশীয় ব্যক্তিগণ সে,হীনমনাদি হইয়া থাকেন;

তাহার কারণ জর্ম্মান শারীর তত্ত্ববিদেরাও সবংশ বিবাহকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।” জর্ম্মান রাজবংশীয় সমুদায় ব্যক্তিই হীনমনাদি অর্থাৎ হীনমনা, দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইয়া থাকেন, এ সিদ্ধান্ত কেবল যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, প্রত্যক্ষবিরুদ্ধও বটে। যে কথা দৃষ্টফলের বিপরীত, ২১১ জন জর্ম্মান পণ্ডিতের উক্তি বলিয়াই তাহা মানিত হইতে পারে না। ঢাকুর সমালোচক, বিলাতি শিক্ষা ও বিলাতি সভ্যতার বিরুদ্ধবাদী হইয়া জর্ম্মান পণ্ডিতের প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথায় শ্রদ্ধা করেন কেন? হীনমনা অসুরকুলেও মহামনা পরম ভাগবত ব্যক্তিগণের যে উৎপত্তি হইয়াছে, আমাদের আর্য্যাভিমানী সমালোচক, আর্য্য শাস্ত্রে কি ইহার প্রমাণ পান নাই? অসৎ কুলে সৎ, ও সৎকুলে অসজ্জনের উৎপত্তির প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঢাকুর সমালোচকের একটি অবিজ্ঞ জনোচিত সংস্কার এই যে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অথবা তাদৃশ অন্য কোনও প্রধান ব্যক্তির মতের বিরুদ্ধে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করাও নির্ল্লজ্জতা ও প্রগল্‌ভতার কার্য্য। ইহা যদি বাস্তবিক নির্লজ্জতা ও প্রগল্‌ভতার কার্য্য হয়, তবে অধিকাংশ বিজ্ঞ বিচক্ষণ বক্তিকেই নির্লজ্জ ও প্রগল্‌ভ বলিতে হয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, তাঁহার নিজকৃত স্মৃতিতত্ত্বে মহামহোপাধ্যায় মৈথিল নিবন্ধকারের অধিকাংশ ব্যবস্থার প্রতিকূলেই নিজের নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি, ইনি স্থলবিশেষে ভাল চোখ্‌ও কানা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভারতের অন্য প্রদেশের কথা দূরে থাকুক, এক বঙ্গপ্রদেশেই সর্ব্বত্র স্মার্থ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মত মানিত হয় নাই। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সমুদায় মত মানিত হয় না। এতদ্দ্বারা আমরা মহামান্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অবজ্ঞা করিতেছি, বিজ্ঞ পাঠক এরূপ যেন মনে না করেন। অনেক পণ্ডিতই পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য নিবন্ধকারদিগের মতের বিরুদ্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাকে প্রগল্‌ভতা বা নির্লজ্জতা বলা যাইতে পারে না। যেহেতু শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতীত কেহই স্বকল্পিত কোনও কথা দ্বারা প্রতিবাদ করেন নাই। ইহার মধ্যে কথা এই যে, পরস্পর বিরোধী মতের কোন্‌টি উপাদেয়, তাহা পণ্ডিতসমাজের বিচারসাপেক্ষ। এইরূপ বাদানুবাদ দ্বারাই শাস্ত্রসাগরের অমূল্য রত্নসকল উদ্ধৃত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক জ্যোতির্ব্বিৎ মহামহোপাধ্যায় ভাস্করাচার্য্য, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মগুপ্ত ও লল্লাচার্য্য প্রভৃতির মতের বিরুদ্ধে অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা কি তিনি প্রগল্‌ভতার পরিচয় দিয়াছেন? আর অধিক কথার প্রয়োজন কি, সে দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত নিবন্ধকারদিগের মতের বিরুদ্ধে বিধবাবিবাহের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়া ঢাকুরসমালোচনকারীর মতে অবশ্যই নির্লজ্জতা ও প্রগল্‌ভতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ঢাকুরসমালোচক যে বিষয় উপলক্ষে গ্রন্থকারকে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে বাস্তবিকই গ্রন্থকার, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধবাদী নহেন, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে স্থলে কেবল “দ্বিজাতি” শব্দ দ্বারা সগোত্র বিবাহ সম্বন্ধে

ক্ষত্রিয় বৈশ্যকেও ব্রাহ্মণের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই স্থলেই ঢাকুর-গ্রন্থকার, শাস্ত্রীয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতের বিরুদ্ধে দুই এক কথা বলিয়াছেন। পরন্তু তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, এই বিষয়টি বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিচারসাপেক্ষ। ইহাই কি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতের বিরুদ্ধে ঢাকুর-গ্রন্থকারের নূতন ব্যবস্থা? শূদ্র বা কায়স্থ সমাজ সম্বন্ধে এ কথার ত কোনই সম্বন্ধ নাই।

শ্রীকিশোরী মোহন রায়।

মলয়-বাতাস।

১

এ মধুর হাসিরাশি ঢেলে,
আজ ভাই! কোথা থেকে এলে?
এসেছ ত ব'স ভাই!
কুশল জানিতে চাই,
ফুলের সৌরভ আজ কতখানি পেলে?
উছলি তটিনী-প্রাণ,
গাহিয়া অমিয় গান,
কতগুলা তাপিতের পরাণ জুড়ালে?

২

এত দিন ছিলে কোন দেশ—
কও তাই জানি সবিশেষ;
প্রকৃতি তোমারি তরে,
বেঁচে ছিল ম'রে ম'রে,
জগতে ছিলনা কিছু আরামের লেশ;
তুমিই ছিলেনা তাই,
সব ভস্ম সব ছাই,
স্নেহের ভবন যেন বড়ই বিদেশ।

৩

নিতি নিতি কল কণ্ঠে পাখি,
তোমারে করিত ডাকাডাকি;
রবিটী সকাল বেলা,
খেলিত না ছেলেখেলা,
চাঁদেবো সোণার মুখে দুখ মাখামাখি!
ফুলেরা হাসিয়া হেন,
খসিয়া পড়ে নি যেন!
তুমি না আসিলে আমি "একা একা" থাকি

৪

আজ ভাই! কও সমুদয়,
তুমি বুঝি এ ভবের নয়?
সরল কোমল প্রাণ,
নাহি ভান নাহি মান,
উদার হৃদয় খানি স্নেহের নিলয়!
শারদ-পূর্ণিমা-রাকা,
মধুর জ্যোছনা মাখা,
ডুবানো পরার্থে মরি! মাখানো বিনয়।

৫

জগতে তো "আপনার, পর"
ভরা আছে সবারি অন্তর;
সুখ শান্তি ধন মান,
সবাই নিজস্ব চান,
শুনিয়া পরের সুখ গায়ে আসে জ্বর!—
সবাই আপনা বোঝে,
সবাই সে স্বার্থ খোঁজে,
পরার্থের অর্থ নাই সংসার ভিতর।

৬

তুমি দেখি পরেরে ভবিয়া,
দিনরাত বেড়াও খাটিয়া;

ফুলের সুবাস বও,
চাঁদের জ্যোছনা লও,
নদীর হৃদয় দাও সুখে মাতাইয়া!
ব্যথিত মানব-গা'য়,
সুধা হয়ে প'ড় হায়,
কেন ভাই! এত স'ও পরের লাগিয়া?

৭

একটুকু নাই আত্ম জ্ঞান,
পরে পরে ভরা ও পরাণ!
ছোট, বড়, ধনী, দীন,
কিছু নয় তব ভিন,
কমল, শেহালা যেন দুটিই সমান!—
কোথাকার সরলতা,
কোথাকার মধুরতা,
এমন উদার ভাই, কোথাকার প্রাণ?

৮

জগতে মানুষ আছে যারা
"ছোট বড়" বেছে লয় তারা।—
দশের চোখের প'রে,
দয়া বিতরণ করে,
দয়ার দুয়ারে জাগে "সুযশ" পাহারা!
তোমার মতন কেহ,
নীরবে না দেয় স্নেহ,
কাঙ্গালে ঢালে না কেহ অমৃতের ধারা!

৯

তুমি দেব,—তুমিই দেবতা;
বুক ভরা করুণা মমতা!
আমি জানি দেবতারা,
ভালবেসে আত্মহারা,
দেবতা জানে না কভু "বাণিজ্য" বারতা!
অনাথ দীনের দুখে,
শত অশ্রু ঝরে মুখে,
দেবতার বুকময় শুধু কোমলতা!
পুণ্যপূর্ণ শান্তিময়,
ধেয়ানে পাতক ক্ষয়,
দীন হীনে কন কত আদরের কথা!—
শত রবি শশী হায়,
যে আলোকে নিভে যায়,
চিনি আমি দেব-জ্যোতি দেব-অমরতা!

১০

তাই ডাকি, দাঁড়াও দাঁড়াও,
মোর শিরে পা'র ধূলা দাও!
একটু নয়ন ভরি,
পরাণ সফল করি,
পাপীর মরমে আজ স্বরগ জাগাও!
তোমার স্বর্গীয় নীতি,
পর-সেবা, বিশ্ব-প্রীতি,
আমারে করুণা করি একটু শিখাও!
আমি ভাই! বেঁচে মরা,
ষোল আনা স্বার্থ ভরা,
অধমতারণ তুমি, কেন ফেলে যাও?
পরশ পরশে হায়,
লোহা সোণা হয়ে যায়,
তুমিও আমার কাণে দেব-গীতি গাও—
তুমিও আমার শিরে পদ-ধূলি দাও।

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

ভক্তিকথা।

৩৩২। যে বিদ্যার আলোচনায় বাহ্য বস্তু ও আর আর বিষয়ের কার্য্যকারিতা প্রভৃতি নামা গুণ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল বিষয়ে মঙ্গলময়ের মঙ্গল, মহিমা,

জ্ঞান, কৌশল, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্যাদি জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই যথার্থ বিজ্ঞান শাস্ত্র।

৩৩৩। হে বৃদ্ধ! তুমি কি তোমার ভার্য্যাকে স্নেহ-নয়নে মাতৃ সম্বোধনে সম্বোধন করিতে প্রস্তুত হইয়াছ? তোমার ভৃত্য-গণকে কি প্রতিপাল্য রূপে দেখ? মানব ও মানবীদিগকে দেশ, জাতি, বর্ণ, ধন, দারিদ্র্য ও ধর্ম্ম সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মসন্তান বলিয়া দেখিবার অভ্যাস কি করিয়াছ? তুমি কি অসঙ্কুচিত মনে তাহাদিগের সহিত বিহিত অন্ন গ্রহণে সমর্থ হও? তুমি কি বিরক্তি বা অবমাননা সহ্য করিতে পার? তুমি কি আধ্যাত্মিক ভাবে সংসারের সকল বিষয় দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছ? তুমি যদি এ সকল বিষয়ে সক্ষম না হইয়া থাক, তবে, বয়োবৃদ্ধ! নিশ্চয় জানিও যে তুমি নিষ্কামুকতা, ঔদার্য্য, প্রেম, বিনয়, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা গুণে একটী নিতান্ত স্তন্যপায়ী শিশু। তোমার ঐ সকল গুণাঙ্কুর এখনও অঙ্কুরিত হয় নাই।

৩৩৪। যে শোভা দৃষ্টে মনোমধ্যে পবিত্র ভাবোদয় না হইয়া অপবিত্রতা উত্তেজিত হয়, তাহা আত্মার বলনাশক ঘৃণিত শ্রীহীনতা।

৩৩৫। যতই দেবত্ব, ততই মনুষ্যত্ব। যে পরিমাণে দেবত্বের জয়, সেই পরিমাণে পাশবতার ক্ষয়। এই শুভ ফল বিনা মানব উন্নতি ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইতে পারেনা; সুতরাং তজ্জন্য তাহার মনুষ্যত্ব লাভ হয় না।

৩৩৬। মানুষ মানুষকে চায়; দেবতা দেবতাকে চায়। আমরা যত দিন না দেব ভাবে উন্নত হই, তত দিন মনুষ্য অপেক্ষা সেই পরম দেবতার পবিত্র সহবাস ভোগের জন্য ব্যাকুল হই না।

৩৩৭। সাকারবাদীরা বলিতে পারেন না যে, যিনি অনাদি, অনন্ত, নিরাধার, নির-বলম্ব, তিনি নিরাকার নন; নিরাকার-বাদীরাও বলিতে পারেন না যে, তিনি সাকার নন, কারণ উভয় বাদীরাই বলেন যে, সেই অরূপ ঈশ্বরই জগতের প্রাণ রূপে সাকার হইয়া রহিয়াছেন। অতএব ঐ দুই সম্প্রদায়ই নিরাকার ও সাকার ঈশ্বরেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা যথাবশ্যক জ্ঞানা-ভাবে প্রতিমোপাসক হন, তাঁহাদিগের জ্ঞান যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে, সেই পরি-মাণে তাহারা অপ্রতিমোপাসক হইবেন। অপ্রতিম ব্রহ্মোপাসক না হইলে কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না; ইহা সকল শাস্ত্র ও ঋষি-জীবনানুমোদিত সত্য।

৩৩৮। যে পরিমাণে ঈশ্বর-সহবাস-ভোগ ও পরোপকার সাধন, সেই পরিমাণে আমা-দিগের জীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ।

৩৩৯। উদ্যানে যেমন গোলাপ ফুল অধিক রমণীয়, মানব সমাজে সেই রূপ ঈশ্বরপ্রাণা ও পরসেবিকা নারী অধিক মনো-হারিণী। লোকোদ্যান মধ্যে তাঁহারই মত গুণবতী মানবী গোলাপ পুষ্প।

৩৪০। যেমন মানব শরীর গরম ও ঠাণ্ডার সম্মিলনে সুস্থতা ভোগ করে, সেই রূপ তাহার আত্মা জ্ঞান ও প্রেমের সম্মিলনে পবিত্রতা ভোগ করে। ঐ দুই গুণের অস-ম্মিলনে অর্থাৎ একটী অপেক্ষা অপরটীর ন্যূনাধিক্যে রোগ, পাপ ও দুঃখোৎপন্ন হয়। অতএব উহাদিগের সম্মিলন সাধন করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৩৪১। সত্যই পবিত্রতা। অসত্যই অপবিত্রতা। যাহা সত্য স্বরূপের দান, তাহাই সত্য, তাহাই পবিত্র।

৩৪২। আপনার স্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন-মঙ্গলের জন্য নানা কষ্ট সত্ত্বেও যে নারী জীবন ধারণ করেন, তিনিই সতীর মহৎ গুণে ভূষিতা হইয়া নানা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের কারণ হন।

৩৪৩। যাঁহারা জ্ঞান ও প্রেমের প্রভাবে সত্যাসত্য হইতে সত্যকে চিনিয়া লইতে ও আপনাদিগের জীবনকে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত ও পবিত্র করিতে পারেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মোপাসনা করিবার যোগ্য হন।

৩৪৪। পবিত্রতা-বিহীন শোভা শোভাই নয়; তাহা শ্রীভ্রষ্টকারী মহাপাপ।

৩৪৫। ব্রহ্মযোগই পবিত্রতা, ব্রহ্মবিয়োগই পাপ।

৩৪৬। বায়ু যেমন রূপবিহীন হইয়াও মানব শরীরে স্পর্শ সুখ দান করে, ভগবান সেইরূপ অমূর্ত্ত হইয়াও তাহার আত্মাতে তাঁহার বিমল স্পর্শ-সুখ প্রদান করেন।

৩৪৭। কেবল রক্তের সম্বন্ধ পাশব সম্বন্ধ, আর ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। শেষোক্ত সম্বন্ধই নিত্য।

৩৪৮। পূর্ব্বতন কালাবধি নানা দেশের ভক্তগণ প্রাণেশ্বরের সঙ্গে যোগ সাধন জন্য বহুবিধ উপদেশ দিয়া আসিতেছেন; তন্মধ্যে ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম, এই চতুর্ব্বিধ যোগ সাধন বিষয়ে শিক্ষাই প্রধান। উহার মধ্যে যাহা সকল স্থান ও কালের সাধকদিগের মঙ্গলজনক, তাহা অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ উপদেশাদি দিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মগণ যতই তাহা পালনে সমর্থ হইবেন, ততই তাঁহারা যোগানন্দ ভোগ করিয়া আপনাদিগের জীবনকে উন্নত ও পবিত্র করিতে পারিবেন। সেই অনাদি, অনন্ত ও পূর্ণ মঙ্গলময়ের অধীনতায় আমাদিগের ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম ও কার্য্যের সার্থকতা ও তৃপ্তি হয়, তাহাতেই ঐ চারি প্রকার যোগ সাধন হয়। তাঁহার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম ও কার্য্যের অধীনতা বিনা তাঁহার সহিত আমাদিগের যোগ সাধন নিতান্ত অসম্ভব। ঐ চারি প্রকার যোগের মধ্যে প্রেমযোগই সর্ব্ব প্রধান।

সর্ব্বাগ্রে প্রাণেশ্বরকে প্রাণের সহিত প্রীতি করিতে না পারিলে তাঁহার সহিত কোনরূপ যোগসাধনের চেষ্টা হইতে পারে না। তন্নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রেম-যোগসাধনই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহা আর আর যোগাপেক্ষা অধিক সরস, সহজ ও ইদানিন্তন কালের বেশী উপযোগী। ইহাই ব্রাহ্মদিগের সাধারণরূপে সেবনীয়। এই যোগ যতই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইবে, ততই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা, জ্ঞান ও কার্য্য ঘন হইতে ঘনতররূপে সাধকের হৃদয়ঙ্গম হইবে ও তাঁহার কৃপায় অপর অর্থাৎ ঐ তিন প্রকার যোগ সহজ হইয়া আপনাআপনি সাধিত হইতে থাকিবে। প্রেমময় স্বয়ং এই মহাযোগাভ্যাস করিবার শিক্ষাদান করিতেছেন। তাঁহার আদেশ এই যে, তিনি যে উদার, বিশ্বব্যাপী, অনাহত ও নিত্য-প্রেমে জগৎকে প্রীতি করিতেছেন ও ঈশা চৈতন্যাদি তাঁহার প্রেমিক ভক্তগণ যে অসাম্প্রদায়িক, নানা কষ্টবহ ও প্রাণগত প্রীতিতে তাঁহাকে ও তাঁহার জগৎকে প্রীতি করিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্রহ্মোপাসকগণের শিক্ষনীয়, অনুকরণীয় ও অভ্যাস-যোগ্য।

৩৪। ভগবান-প্রদত্ত যে শক্তির দ্বারা আমরা এই সংসারকে ভালবাসি, তাহার অপব্যবহারে তাহা বিকৃত হইয়া মূল সত্য

ঈশ্বরের স্থানে আশ্রিত সত্য ইহলোককে বসায়, ও মায়া মোহাদিরূপে প্রকাশ পায়। নিত্য সত্য ও পূর্ণ ঈশ্বরাপেক্ষা অনিত্য ইহ-জীবনকে অধিকতর ভালবাসাই এই দুর্দ্দশার কারণ। অতএব মায়া, মোহাদির ভ্রমজাল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদিগকে নিরন্তর সেই নিত্য সত্য পরমাত্মাকে অনিত্য সংসারাপেক্ষা অধিকতর প্রীতি করিতে হইবে।

৩৪৭। মঙ্গলময়ের নিকট কৃত অপরাধের মার্জ্জনাপেক্ষা দণ্ড প্রার্থনা করা অধিকতর শ্রেয়ঃ। কারণ প্রথমটীতে অপরাধীর স্বার্থপরতা, কিন্তু দ্বিতীয়টীতে ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে তাঁহার বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব প্রকাশ পায়। তিনি পাপীকে তাহার পাপক্ষয়ের জন্য তাঁহার মঙ্গলাভিষিক্ত কঠোর ন্যায় শাসনের দণ্ড দান করেন।

৩৫০। সাধক যতদিন কেবল নানা গ্রন্থাধ্যয়ন রূপ উপায়াবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানোপার্জ্জনে রত থাকে, ততদিন সে বিদ্যালয়ের ছাত্রের অবস্থায় অবস্থিতি করে। পরে সে আরাধনা, প্রার্থনা, চিন্তাদি দ্বারা ঈশ্বর পূজায় সতত প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার কৃপায় তাঁহার উপদেশবাণী সে নিজ অন্তরে যতই শ্রবণ ও তাঁহার সহবাস যতই ভোগ করে, ততই তাহার জ্ঞানের পরিপক্কতা, তৃপ্তি ও প্রেমের চরিতার্থতা হইতে থাকে। হে জ্ঞানময়! তব জ্ঞানালোক বিনা মানব জ্ঞানের তৃপ্তি হয় না। হে প্রেমময়! তব প্রেম বিনা তাহার প্রেমের সার্থকতা হয় না!

৩৫২। যে যত অনিত্য পাশব ভাব ছাড়িয়া নিত্য দেবভাব দিয়া মানুষকে দেখে, সে তত তাহার নিত্য জীবনকে ঠিক বুঝিতে ও চিনিতে পারে।

৩৫৩। যাঁহার মন প্রাণ ভক্তি রসার্দ্র হইয়া সদা সেই অনন্তস্বরূপের অনন্ত মহিমা-সাগরে মগ্ন থাকে, সেই তাঁহাতে বাস করে, তাঁহার সহিত রমণ করে, সেই সশরীরে স্বর্গভোগ করে।

৩৫৪। যাহার ভিতরে দীনতা ও বাহিরে ধনের আড়ম্বর, সেই ভক্ত প্রচুর ধনেশ্বর হইয়াও নির্ধন। অনাসক্ত তাহারি জীবন।

শ্রীকানাইলাল পাইন।

ধর্ম্মশাস্ত্র ও গর্ভাধান।

(প্রতিবাদ।)

বিগত ফাল্গুনের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দত্ত "কামাতুর দের জন্য মানব ধর্ম্মশাস্ত্র নহে" এই শিরোনাম দিয়া যে প্রস্তাব প্রকাশিত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের রাশি রাশি আপত্তি আছে। নব্যভারত-সম্পাদক, সকলের মত জানিতে চাহিয়াছেন, একারণেও বটে, আর লোকের কুসংস্কার বদ্ধমূল না হয়, সে কারণেও বটে, এই প্রবন্ধ রচনা করিলাম। আশাকরি, লেখক মহাশয় সদ্ভাবে সমস্ত গ্রহণ করিবেন। বিচারের প্রথমেই প্রবন্ধের নাম নির্ব্বাচন বিষয়ে একটি

ঈঙ্গিত করিতে ইচ্ছা করি। "কামাতুর" শব্দপ্রয়োগ না করিয়া "অজিতেন্দ্রিয়" শব্দ ব্যবহার করিলে সন্দর্ভ-প্রণেতার উদ্দেশ্য বিফল হইত কি? স্ত্রীলোকে, ব্রাহ্মে ও বিজ্ঞলোকে যে পত্র পড়েন, তাহাতে ওরূপ অশ্লীলতা কেন? শুনিতে পাই, লেখক নিজেও ব্রাহ্ম; অশ্লীলতা নিরাকরণে প্রত্যেক ব্রাহ্মই বদ্ধকরিকর। আর ব্রাহ্ম না হইলেই বা কি? অশ্লীলতা যতদূর পরিহার করা যায়, ততই মঙ্গল। একথা কি প্রবন্ধ-লেখক অস্বীকার করিবেন, এই কারণেই আমরা ঐ শব্দ প্রয়োগে এত অসন্তুষ্ট।

বোধ-সৌকর্য্যার্থে বিচারের প্রকৃষ্ট প্রণালী ক্রমে অর্থাৎ অগ্রে "প্রবন্ধ লেখকের মত" তৎপশ্চাৎ "আমাদের বক্তব্য" এরূপ ধারাবাহিক নিয়মে এই সন্দর্ভ লিখিত হইল।

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে যে "নিষেক" শব্দ দৃষ্ট হয়, মনুর টীকাকার মেধাতিথি, তাহার অর্থ গর্ভাধান লিখিয়াছেন। শ্রীনাথ বাবু, ঐ অর্থে সন্তুষ্ট না হইয়া, বিষ্ণুসংহিতা ও শঙ্খসংহিতার আশ্রয় লইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার অভীষ্ট কতদূর সিদ্ধি হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করুন।

১। প্রবন্ধ-লেখকের মত।—"টীকাকার মেধাতিথি, নিষেক শব্দের অর্থ গর্ভাধান করিয়াছেন। কিন্তু টীকাকার মেধাতিথি অপেক্ষা শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ স্বয়ং শাস্ত্র-কারেরা নিষেক সংস্কারের যে অর্থ ও ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। মহর্ষি বিষ্ণু বলিয়াছেন—"গর্ভস্য স্ফুটতাজ্ঞানে নিষেক কর্ম্ম।" সপ্তবিংশ অধ্যায়।

১। আমাদের বক্তব্য।—প্রবন্ধ-লেখক প্রথমে বলিলেন, বিষ্ণুসংহিতা হইতে নিষেকের অর্থ ও ব্যবস্থা প্রদর্শন করিবেন, অথচ "নিষেক" শব্দের অর্থ যে কি, তাহা আদৌ নির্দ্দেশ করিলেন না, কেবল বিধান দেখাইয়াছেন। এটি মন্দ কৌশল নয়। স্থানান্তরে ৫৮৫ পৃষ্ঠার প্রথমার্দ্ধ ভাগে বলেন "ব্যাসাদিকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষেক শব্দ নাই। তাঁহারা গর্ভাধান শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।" ইহাতে তিনিই ত সপ্রমাণ করিলেন যে, নিষেক ও গর্ভাধান সমানার্থক। বিষ্ণুস্মৃতি সংহিতার টীকাকার নন্দ পণ্ডিত, কেশব বৈজয়ন্তী নাম্নী টীকায় গর্ভ শব্দের অর্থ ঋতু বলিয়াছেন। কেবল ঋতু বলিয়াই টীকাকার ক্ষান্ত হন নাই, তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রথম ঋতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" গর্ভোঋতুঃ গর্ভবীজসমুদ্ভবমিতি যোগিপ্রয়োগাৎ। তস্য স্পষ্টতাং প্রাদুর্ভাবং জ্ঞাত্বা নিষেকো গর্ভাধানাখ্যং কর্ম্ম কার্য্যমিতি সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ।" জরায়ু প্রবৃদ্ধ হইলেই নিষেক (গর্ভাধান ব্যবস্থা) করিবে। প্রথম স্ত্রীগমনে হোমাদি ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়। ইহার সাধারণ নাম গর্ভাধান। ঋতুর সময় অপত্যোৎপাদনের সহায়, একারণ ঐ কালেই নিষেক কার্য্য কর্ত্তব্য। পরাশর, পশুপতি, রাম দত্ত, কলেসি, বাসুদেব ভট্ট, ভবদেব ভট্ট, রঘুনন্দনাদি ভূরি ভূরি বুধমণ্ডলী, গর্ভাধান অপালনের দণ্ড বিধান করিয়া গিয়াছেন।

২। প্রবন্ধ-লেখকের মত।—"প্রথম গর্ভ যদি অসংস্কৃত হইয়া স্রাবিত হয়, তবে দ্বিতীয় গর্ভে গর্ভসংস্কার করিবে। তাহা হইলে বিশুদ্ধি হয়।"

"তবে এই হইল যে, নিষেক সংস্কার

এমন সময় হইবে যে, তাহা না হইতেই গর্ভস্রাব সম্ভব ছিল। মহর্ষি বিষ্ণু ও শঙ্খের মত (গর্ভস্যস্ফুটতাজ্ঞানে নিষেকঃ) অঙ্গিরা-বাক্যে দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।"

২। আমাদের বক্তব্য।—গর্ভসংস্কার শব্দে "নিষেক" বুঝাইতেছে, ইহার কোন প্রমাণই শ্রীনাথ বাবু দিলেন না; গর্ভ সংস্কারই বা কি, তাহাও বলা হইল না, অথচ, বিষ্ণু ও শঙ্খের মতের সহিত অঙ্গিরার মত মিলাইয়া দিলেন। এই মিলনের কথা শুনিয়া আমাদের একটি গল্প মনে পড়িল। সেটি এই,—কোন সময় এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কতকগুলি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করেন। ঘটনাক্রমে আয়োজনের ক্রটি ঘটে। উদ্যোগের অভাব বটে, কিন্তু নিমন্ত্রিতগণের সংখ্যা যেরূপ অনুমান করা হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক হয়। একে আয়োজনের অভাব, তাহাতে আবার সংখ্যার আধিক্য, সুতরাং ব্রাহ্মণগণ আশা-নুরূপ ব্যাঞ্জন না পাইয়া "এ পাতে মাছ দাও" "এখানে ভাজা আন" "আমি পায়স পাই নাই", এইরূপ অনবরত গোলমাল করিতে লাগিলেন। অগত্যা তখন অধ্যাপক মহাশয়কে পরিবেশনের আসরে নামিতে হইল। তিনি রন্ধনশালায় প্রবিষ্ট হইয়া একবাটি মাত্র গুড় অম্ল আনিয়া সকলকে বিতরণ করিয়া বলিলেন "দেখ তোমাদের অম্বল টম্বলে এক রকম হয়ে গেল।" তিনি সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রদ্ধাস্পদ, সুতরাং কেহই তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু তাঁহারা জঠর জ্বালায় জ্বলিতে লাগিলেন, অথচ ওদিকে অধ্যাপকের সিদ্ধান্তও মনে স্থান পাইলনা। প্রস্তাব-লেখকের সিদ্ধান্তও ওদিকে সেইরূপই। তিনি ত সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা যে কিছুই বুঝিলাম না।

৩। প্রবন্ধ-লেখকের মত।—"মহর্ষি ব্যাস লিখিয়াছেন,— প্রথম মাসে গর্ভাধান, তৃতীয় মাসে পুংসবন, অষ্টম মাসে সীমন্ত, সন্তান জন্মিলে জাতকর্ম্ম।"

"কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন, এক মাস গর্ভ হইয়াছে কিনা, তাহা জানা যায় না; সুতরাং প্রথমতঃ শব্দের অর্থ প্রথম মাস নয়। যদি মাস জানা না গেল, তবে তৃতীয় ও অষ্টম মাস কি প্রকারে জানা যাইবে? ব্যাস, গর্ভের প্রথম মাস নির্দ্ধারণ করা যায়, বিশ্বাস করিয়া, প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম মাস ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল স্থানে বিষ্ণু ও শঙ্খ "গর্ভের স্ফুট-জ্ঞানে" এবং "স্পন্দনের পূর্ব্বে" এইরূপ বিধি দিয়াছেন। কুমারী ভার্য্যার প্রথম রজোদর্শনে গর্ভাধান সংস্কারের সময়, বিষ্ণু, শঙ্খ, অঙ্গিরা ও ব্যাস কেহই এই কথা বলেন নাই।"

৩। আমাদের বক্তব্য।—শ্রীনাথ বাবুর মতে "প্রথম মাসে গর্ভাধান ইহার অর্থ, একমাস গর্ভ হইলে গর্ভাধান! অগ্রে গর্ভের আধান, না অগ্রে গর্ভ! তাঁহার মতে প্রথমে অঙ্কুর হউক, তবে বীজ রোপণ কর। যে কোন উপায়ে অগ্রে গর্ভ হউক, পরে (অর্থাৎ একমাস পরে) গর্ভাধান করিবে। এখানে বীজাঙ্কুর ন্যায়ের তর্ক উপস্থিত। শ্রীনাথ বাবু একজন বিজ্ঞান-বিৎব্যক্তি। অগ্রে বীজ, না অগ্রে অঙ্কুর, তাহা তিনিই বিচার করিবেন! আমরা সামান্য চক্ষে দেখিয়া থাকি,—আগে বীজ বপন হইলে, পরে অঙ্কুর হয়। এখানে প্রথম মাসে গর্ভাধান, ইহার অর্থ প্রথম

ঋতুর একমাস মধ্যে গর্ভাধান ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারে না।" প্রমাণার্থে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি (৪নং বাদ প্রতিবাদে) উদ্ধৃত করিলাম। এখন পাঠক বুঝিতে পারিলেন, প্রথম মাসে গর্ভাধান, আর ঋতুকালে গর্ভাধান, এ দুয়ের সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য কি? তিনি যে যে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন, সে সকল না করিয়া যদি প্রকৃত সংশয় অপনীত করিতে চেষ্টা করিতেন, তবেই যথার্থ অভাব বিদূরিত হইত। তাহা না করাতেই হট্টগোল বাধিয়াছে।

৪। প্রবন্ধ-লেখকের মত।—যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন, "ঋতুকালে গর্ভাধান-সংস্কার হইবে" প্রথম ঋতুতেই গর্ভাধান, এইরূপ অর্থ না করিয়া বিবাহের পর প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান, এই অর্থ করিলে কোনও প্রকারে কদর্থ হয় না। তবে কি না যাজ্ঞবল্ক্য অরজস্কা অবস্থায় কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত, বক্ষ্যমাণ শ্লোকে এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—'অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতৌ বৃতৌ'।

কন্যা ঋতুমতী হইলে, কন্যাদাতার ভ্রূণহত্যাপরাধ হয়।

"জিজ্ঞাসা করি, "গর্ভাধানমৃতৌ"। প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান, এই অর্থ কি করিয়া হইবে? ঋতুকালে অর্থাৎ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ষোড়শ্ দিন মধ্যে গর্ভাধান সংস্কার হইবে, অনৃতুকালে অর্থাৎ এই ষোড়শ্ দিন অতিক্রান্ত হইলে আর গর্ভাধান সংস্কার হইবে না, ইহাই প্রকৃত অর্থ।

"নিষেক সম্বন্ধে দুইমত দৃষ্ট হইতেছে। এক মতে 'গর্ভ' নিশ্চয় হইয়াছে জানিলে অথবা গর্ভের প্রথম মাসে সংস্কার। বিষ্ণু, শঙ্খ ও মনু এই মতের পোষক। অপর মতে গর্ভ হউক, এই ইচ্ছা করিয়া যে কোন ঋতুতে প্রথম স্ত্রী সঙ্গম হয়, সেই ঋতুতে গর্ভাধান সংস্কার হইত। যাজ্ঞবল্ক্য এইমতের প্রবর্ত্তক। যে শাস্ত্রই অনুসরণ কর, স্ত্রীর প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান সংস্কার না করিলে, প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়, ইহা কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রের অভিপ্রেত নয়।"

৪। আমাদের বক্তব্য।—যাজ্ঞবল্ক্য, যখন ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহের বিধি দিতেছেন, আর বলিতেছেন, ঋতুকালে গর্ভাধান করিবে, তখনইত সিদ্ধান্ত হইল—প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান করিবে। যাজ্ঞবল্ক্যের মত প্রদর্শিত হইল। প্রস্তাব-রচয়িতা, আপত্তি খণ্ডন ও সন্দেহ নিরসন নিমিত্ত যে যে কথা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কিছুই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। "কন্যা ঋতুমতী হইলে কন্যাদাতার ভ্রূণ হত্যা পাপ হয়" এই উক্তির খণ্ডন কোথায়? "যে শাস্ত্রই অনুসরণ কর, স্ত্রীর প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান সংস্কার না করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়, ইহা কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিপ্রেত নয়।" প্রবন্ধ-লেখকের এই দাম্ভিকতা পূর্ণ, স্বকপোল কল্পিত সিদ্ধান্ত এখন কোথায় রহিল? আর "এই সুযুক্তিপূর্ণ তর্ক সম্বন্ধে অন্যান্য পণ্ডিতগণ কি বলেন, আমরা জানিতে চাই" নব্যভারত সম্পাদকের এই প্রার্থনাই বা কোথায় থাকিল? তর্কটি "সু" কি "কু" এখন আর কাহারও বুঝিবার বাকী আছে কি? অন্যত্র ইত্যগ্রেই বিষ্ণু, ব্যাস, শঙ্খ ও মনুর অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ঋতুর পূর্ব্বকালে যে কন্যাদানের সময়, নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শন করা গিয়াছে। প্রস্তাব-রচয়িতার প্রধান অবলম্বন মনুও ঋতুর পূর্ব্বেই বিবাহ দিবার পক্ষপাতী; কেবল তাহাই নহে; তিনি ঋতুকালে অর্থাৎ প্রথম

সময়েই স্বামী সহবাসের বিধানকর্ত্তাও বটেন। তৃতীয় অধ্যায় পয়তাল্লিশ শ্লোকে মনুই কহিয়াছেন,

—ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো রতি কাময়া। ৩।৪৫।

পর নারীর প্রতি অভিলাষ না করিয়া আপন জায়ার প্রতি সতত অনুরক্ত থাকিবে। ঋতুকালে ভার্য্যা সহবাস করিবে। ভার্য্যার প্রীত্যর্থে "অনৃতুকালে" অর্থাৎ ঋতু ভিন্ন অন্য সময়েও ভার্য্যাগমন করিবে। (ঋতু হউক বা অনৃতু হউক) অমাবস্যাদি পর্ব্বে গমন নিষিদ্ধ।

পুনশ্চ মনুসংহিতায় নবম অধ্যায় লেখা আছে,

পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুল্কন্তু কন্যামৃতুমতী হরন্।
স হি স্বাম্যাদতিক্রমেদৃতূনাং প্রতিরোধনাৎ॥ ৯।৯৩

ঋতুমতী তনয়াকে যে পরিণয় করিবে, কন্যার পিতাকে সে শুল্ক দিবে না। ঋতুরোধ হওয়ায় পুত্রোৎপাদন রোধ করায়, ঐ কন্যাতে উহার স্বত্ব নষ্ট হয়।

রজস্বলা কন্যাতে পিতার স্বত্ব লোপ পাওয়া হিন্দুর পক্ষে নির্দ্দয় ব্যবহার। তাহা হইতে দেওয়াও হিন্দুর অযোগ্য।

এই সকল উক্তি দ্বারা ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মনুর মতে কেবল সৎপাত্রের অপেক্ষায় ঋতুর পরেও বিবাহ দেওয়া উচিত।

ঋতুর পূর্ব্বে যদি নিতান্ত পক্ষে উৎকৃষ্ট বর না মিলে, তবেই ঐ বিধি। এ স্থলে দুইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া চাই।
২। সুপাত্রে কন্যাদান করা চাই।

এই দুই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইলে, ঋতুর পূর্ব্বেই উত্তম বর অনুসন্ধান করিবে। যদি অনেক চেষ্টায় না পাওয়া যায়, তবে তিন বৎসর পর্যান্ত অপেক্ষা করিতে পারে।

প্রবন্ধ-লেখক বরকন্যার বিবাহের সময়-নির্ণয় জন্য নির্দ্ধারিত বয়স মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত করেন নাই কেন, বুঝিতে পারিলাম না। তিনি ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে বিবাহ দিবার বিধান, শাস্ত্র হইতে কেবল উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা এখানে বয়ঃক্রমের একটা নিষ্পত্তি প্রদর্শন করিতেছি,

ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং,
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ ৯।৯৪॥

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ, দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে, চতুর্ব্বিংশ বর্ষীয় পুরুষ অষ্টম বর্ষীয় কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহার অন্যথা করিলে ধর্ম্ম হানি হয়।

এই স্থলে বর কন্যার বয়সের অনুপাত মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। বিবাহের নির্দ্দিষ্ট বয়স বিচারিত হয় নাই। উহাতে প্রমাণিত হইতেছে, বরের বয়স, কন্যার তিন গুণ বা আড়াই গুণ হওয়া আবশ্যক। অনেকে কিন্তু বার ও আট বৎসর, কন্যাগণের বিবাহ বয়স সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অষ্টম ও দ্বাদশ বৎসরের উল্লেখ থাকাতে ইহাও অনুভূত হয় যে, সে সময়ে ঋতুর পূর্ব্বেই বিবাহ হইত। নতুবা যদি কেবল বয়সের অনুপাতই নির্দ্দেশ করিতেন, তাহা হইলে বালিকার অধিক বয়স উল্লেখ করিতে পারিতেন। ফল কথা এই—ঐ শ্লোক দ্বারা বয়সের অনুপাত ও ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ, এই দুইটিই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৬। প্রবন্ধ-লেখকের মতে "মানবধর্ম্মানুসারে যে কোন সময়ে উপযুক্ত বর মিলিবে, তখনই বিবাহ দিবে। সুতরাং ঋতুমতী হইয়া অনেক কন্যার বিবাহ হইত। বাঙ্গালা

দেশে কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদের অনেকের রজস্বলা হইলে বিবাহ হয়।"

৫। আমাদের বক্তব্য।—"কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদের অনেকের রজস্বলা হইলে বিবাহ হয়" এই বাক্যের অর্থ, ভাষার দোষে হউক, আর প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণার্থে তালিকা না দেওয়ার জন্যই হউক, আমাদের বুদ্ধিগম্য হইলনা। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে উন নব্বই শ্লোকে বলা হইয়াছে, যাবজ্জীবন ঋতুমতী হইয়াও কন্যা পিতৃগৃহে অবস্থান করিবে, তথাপি নির্গুণ পাত্রে সম্প্রদান করিবে না।

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যার্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥ ৯।৮৯॥

প্রবন্ধ-রচয়িতা বলেন,—

৬। "যম ও পরাশর ভিন্ন সমস্ত আধুনিক শাস্ত্রকারদের মত এই যে, যে বয়সেই হউক, পিতৃগৃহে কন্যার রজোদর্শন হইলে পিতা, মাতা ভ্রাতা, ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবেন্। মুসলমানদের অধিকার কালে এই সকল (আধুনিকশাস্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে।"

৬। আমাদের বক্তব্য——মতের সহিত সমঞ্জসীভূত না হইলেই তাহা আধুনিক হইল!! আধুনিকত্ব প্রমাণ-সাপেক্ষ। যাঁহারা ভৃগু-প্রোক্ত মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র, অমুক খ্রীষ্টাব্দে রচিত বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা পরাশরের কাল মুসলমান রাজত্ব-সময়ে স্থির করিবেন, তাহায় আর বিচিত্রতা কি!!! যে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে মনুসংহিতার তুল্য প্রাচীন, তাহাও ইহাঁদিগের মতে আধুনিক! এখানে লেখক, স্বচ্ছন্দমনে, নির্ব্বিকার ভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তি না দেখাইয়াই অবোধ পাঠক বৃন্দকে বুঝাইতে উদ্যোগ করিয়াছেন। যদি আধ্যাত্মিক নিয়মে উহা বুঝিতে হয়, তবে ইহাই নিরূপিত হইল যে, যবন রাজত্বেই স্মৃতি সকল বিরচিত! তবে কি না, মহাভারতে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা যম মহানুভবের নির্দ্দেশ আছে। আর, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের মতে কুরুপাঞ্চালের আবির্ভাব খ্রীষ্টাব্দের ১৪০০—১২০০ বর্ষ পূর্ব্বে, এবং উহাদের যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ১২০০ অব্দে হইয়াছিল। মহাভারত তৎপরেই রচিত হয় *, সুতরাং যম-সংহিতাও মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক। মহাভারত, আবার খ্রীষ্টজন্মের অত পূর্ব্বের গ্রন্থ। আর খ্রীষ্টের ৬০০ বৎসরে মোহম্মদের জন্ম। এবং ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ গিজনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। লেখকের স্মৃতিশক্তির এবং যুক্তির বাহাবা না দিয়া থাকা যায় না। ইহাতে সৎপাত্রে দুহিতা-সমর্পণের কর্ত্তব্যতাই দৃঢ়ীভূত হইল। পরবর্ত্তী শ্লোকে ঋতুর তিন বৎসর অপেক্ষা করিবার কথা আছে। ঋতুর পূর্ব্বেই যে পরিণয় হওয়া উচিত, মনুর নবম অধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে অন্যান্য কথার সহিত তাহার বিধান দৃষ্ট হইতেছে।

কালেঽদাতা পিতা বাচ্যোবাচশ্চানুপযন্‌পতিঃ।
মৃতে ভর্ত্তরি পুত্রস্তু বাচ্যোমাতুররক্ষিতা ॥ ৯।৪॥

কালে (যোগ্য সময়ে) কন্যার বিবাহ না দিলে, পিতা লোকের নিকট নিন্দনীয় হন। ঋতুর পূর্ব্বকালে, কন্যা সম্প্রদানের সময়। পতি যদি ঋতু সময়ে পত্নীতে উপগত না হন, তবে তাঁহাকে সমাজে এক সময়ে গর্হনীয়

* সাহেবগণের ও তন্মতাবলম্বীদের এই মত। বর্ত্তমান সময়ের ন্যূনাধিক চারি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে রচিত, ইহা স্থির।

হইতে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রেরা, নিজ জননীর রক্ষা না করিলে নিন্দাভাগী হয়।

প্রবীন মনুর সমস্ত উক্তির একবাক্যতা করিলে যাহা সিদ্ধান্ত হয়, তাহা এই,—

ক। মনু মহোদয়, সৎপাত্রের অভাবে ঋতুর পরেও বিবাহ দিবার বিধি দিয়াছেন, কিন্তু অভাব পক্ষে অগত্যা এই বিধি।

খ। রজস্বলা কন্যার দান জন্য পিতার প্রাপ্য শুল্কে অধিকার নাই কেন, বুঝিয়া দেখিলেই তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় জানা যায়।

গ। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, রজোদর্শনের পূর্ব্বেই কন্যা পাত্রস্থ করা মনুর মত। তাহার কারণ, ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহবিধি আছে।

কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদের ঋতু হইবার পর বিবাহ হইত বটে, কিন্তু এখন আর সে প্রথা নাই। ফলতঃ ঐরূপ হওয়াও হিন্দু ধর্ম্ম মতে দূষনীয়। কুলীন কন্যাদিগের অধিক বয়সে বিবাহ হওয়ার প্রথা প্রচলিত থাকায় ঐ সমাজে যে কি অমঙ্গলকর দুর্নীতি আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। যাহা হউক, যে যে লোক দোষাশ্রিত, তাহাদের দৃষ্টান্ত ধরিয়া বিচার্য্য বিষয় বিচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

৭। প্রস্তাব-লেখক লিখিয়াছেন,—

"পঞ্চদশ বর্ষ হইতে অন্ততঃ চত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত ঋতু হয়"।

৭। আমাদের বক্তব্য—এই তত্ত্ব তিনি কোথায় পাইলেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। সুশ্রুত-সংহিতা পাঠে দেখা যায়, দ্বাদশ হইতে পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত ঋতুর স্থায়ী কাল। যথা,——

'তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাৎকালে বর্ত্তমানমসৃকপুনঃ।
জরাপক্ব-শরীরাণাম্ যাতি পঞ্চাশতঃক্ষয়ং"॥

—সুশ্রুত, শারীর স্থান।

লেখক এই তত্ত্বের অস্তিত্ব জানিতেন না।

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক মহামূল্য উপদেশ, হিন্দু-সমাজের বারংবার পরিবর্ত্তনে ও বিপ্লবে পরিগৃহীত হয় নাই, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু গর্ভাধান-বিষয়ে কোনই অন্যথা ঘটে নাই, ঘটে নাই।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি।

বেদ-বিদ্যালয়।

"মহাশূদ্র জাতি আদি ভারত-নিবাসী।
একবার জ্ঞানচক্ষু কর উন্মীলন;
তোমাদের জমা, জমী, শ্রম, অর্থ রাশি,
তোমারাই এদেশের মালেক স্বজন।
অপবিত্র ঘৃণা পাত্র বলিয়া যাহারা
স্পর্শ নাহি করে শূদ্রে মিথ্যা শাস্ত্র বলে,
এদেশের নয় তারা বিদেশের তারা,
মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে আছ তোমরা সকলে!"

এই মহাবাক্য বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া অনাচরণীয় শূদ্রের হিতার্থে একখানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা-তরণী (১) সমাজ-সাগরে ভাসমান হইয়াছে। ভরতের সমাজ নানাবর্ণের বিভিন্ন স্বার্থের বীচি-বিক্ষোভে তরঙ্গায়মান, কিন্তু এই বটপত্র সদৃশ ক্ষুদ্র তরণী কাণ্ডারি-হীন অথবা ইহার কাণ্ডারী স্বয়ং ঈশ্বর। ইহা ন-গণ্য এবং ক্ষুদ্রতা বশতঃ দৃষ্টি বর্হিভূত,

(১) চল চল

কিন্তু ইহাতে একটী কথা আছে, তাহা ক্ষুদ্র নহে। সে কথাটী এই ;—

"বেদ হিন্দু ধর্ম্মের মূলগ্রন্থ। বেদ আলোচনার জন্য একটী বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপিত করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে অনুবাদিত বেদ ও ব্যাখ্যাত ধর্ম্ম শাস্ত্র রীতিমত জাতি নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দেওয়া হউক এবং শিক্ষিত যুবকবৃন্দ ধর্ম্ম প্রচারার্থে দেশে ও বিদেশে গমন করুন।" চল-চল, ৯ পৃষ্ঠা।

পুনশ্চ,—

"অতএব হে অনাচরণীয় শূদ্রগণ। আপনারা সম্প্রতি একটী বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করুন। বঙ্গভাষায় অনুবাদিত বেদ এবং ব্যাখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্র সকল তাহাতে রীতিমত অধ্যাপিত হউক। যদি ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে শাস্ত্রে মূর্খ রাখিবার কল্পনা কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন না ; আপনারা প্রচলিত মাতৃভাষার সুবিধা দ্বারা তাহাদিগকে পরাজিত করিতে যত্ন করুন।" চল চল, ১০ পৃষ্ঠা।

ভারতে হিন্দুজনসংখ্যার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ শূদ্র। ইহাদের মধ্যে অনেকে আচরণীয় হইয়াছে বটে, তথাচ যাহারা অনাচরনীয় আছে, তাহাদের সম্প্রদায় ভারতে কোন সম্প্রদায় হইতে সংখ্যায় ন্যূন নহে। স্পর্শ-দোষ প্রথা এবং কৃত্রিম বর্ণ-বিভাগ বশতঃ ইহাদের উন্নতিমার্গ এমন অপ্রশস্ত হইয়াছে যে, তাহার ফলাফল চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বঙ্গের অতুল্য প্রতিভা-সম্পন্ন শ্রদ্ধেয় বাবু বঙ্কিম চন্দ্র ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গিয়া কটাক্ষপাতেও ইহাদের প্রতি চাহিলেন না। পৌরাণিক ভিত্তির উপর দর্শন-শাস্ত্রের লীলাতরঙ্গে ঔপন্যাসিক ধর্ম্ম ব্যাখ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন! কিন্তু ধর্ম্ম মস্তিষ্কের চাতুর্য্য বা প্রতিভার মায়াজাল নহে। ইহা হৃদয়ের প্রসার। তবে, মস্তিষ্কের সহচরী যদি একপ্রকার প্রতিভা থাকে, হৃদয়ের সহচরীও এক প্রকার প্রতিভা আছে, ইহা বলা যাইতে পারে। মস্তিষ্কের সহচরী প্রতিভা কুটিল নয়নে, লাবণ্যে এবং সৌন্দর্য্যসম্ভারে মনোমোহিনী, সন্দেহ নাই। কিন্তু হৃদয়ের সহচরী প্রতিভা দীনা ও মলিনা সতী ও হিতব্রত-পরায়ণা। ইনি মস্তিষ্কের সহচরী প্রতিভার ন্যায় অত্যুপাদেয়, আপাতঃ মধুর খাদ্য সামিগ্রী লইয়া দুই চারিজন স্বগোত্রীয় বন্ধুর নিকট উপস্থিত এবং রূপ গৌরবে ও দেহ ঝঙ্কারে প্রশংসিত হইতে না পারেন, কিন্তু ইহাঁর অন্নপূর্ণা স্বভাব কখন তিরোহিত হয় না। বর্ণাবর্ণ বিচার নাই, দীনদরিদ্র বোধ নাই, না খাইয়াও যে আসে, তাহাকে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য দিতেই হইবে। পরসেবায় দেহ যষ্টি বিকল হউক, পরিধান বস্ত্র জীর্ণ হউক, বক্ষঃস্থলে গুপ্ত ভাবে অমৃত উৎস ধারণ করিয়া তিনি অন্ন বিতরণে নিয়ত প্রস্তুত আছেন।

এতাদৃশী হিতব্রত-পরায়ণা প্রতিভার বশবর্ত্তী হইয়া বালক রমেশ বালক বিহারীকে বলিয়াছিল ;—

"বিহারি, তুমি ইংলণ্ডে যাইতে ইচ্ছা কর?"

বিহারী বলিল ;—"ইচ্ছা করিলে হয় কি? আমার চলিবে কিসে?"

রমেশ উত্তর করিল ;—"আমার পিতা আমাকে যে খরচ পাঠাইবেন, তাহার দ্বারা তোমারও চলিবে।"

এই বিহারী এক্ষণ শ্রীযুক্ত বি,এল্ গুপ্ত, সি, এস,আর এই রমেশ এক্ষণ শ্রীযুক্ত আর,সি দত্ত সি, এস। বিহারী বাবুর ইংলণ্ডে শিক্ষা রমেশ বাবুর সহায়তায়ই হইয়াছিল।

অনেকেই বোধ হয় ইহা স্বীকার করি-

বেন যে, বিহারী বাবুর যে পত্রানুসারে ইলবার্ট বিলের আন্দোলন, তাহারই পরিণতি জাতীয় সমিতি। দেশীয়দিগের রাজনৈতিক স্বত্ব বৃদ্ধির জন্য বিহারী বাবু যে রেখাসম্পাত করিয়াছেন, তাহা লুপ্ত না হইয়া বরং সহস্র গুণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

যে সহানুভূতির অমৃত বিন্দু সংযোগে বি, এল, গুপ্তের উৎপত্তি এবং তাঁহার যত্ন হইতে জাতীয় সমিতির জন্ম, সেই সহানুভূতি আজ সহস্রমুখী হইয়া ঋক্-বেদকে অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছেন। শূদ্রজাতি ও সর্ব্ব সাধারণের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য আর ত কেহ কিছু করিলেন না; রমেশ বাবু, হৃদয়ের বেগে সেই দৃঢ়রুদ্ধ দ্বারকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন!

তবেই দেখ হৃদয়ের সহচরী যে প্রতিভা, তাহার কার্য্য অনন্ত কালস্থায়ী ও অনন্ত সুখের নিদান। এতাদৃশ প্রতিভাই রমেশ বাবুর সর্ব্বস্ব এবং তদীয় বক্ষঃস্থলে যে অমৃত উৎসের কথা বলিয়াছি; তাহাই দ্বিধারা হইয়া, কেবল বঙ্গের নহে, সমস্ত ভারতের হিতার্থে গঙ্গা যমুনার ন্যায় পরিষ্কারভাবে বাহির হইয়াছে। এই দ্বিধারা রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি—একস্থানেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ একস্থানে মিলিয়া কাশী বারাণসী সৃজন পূর্ব্বক শিবালয়ে বিশ্বেশ্বরের মহতী পূজা সম্পাদন করিবে। বঙ্গবাসিন্, ভারতবাসিন্, তোমারা কি ইহা এক্ষণও বুঝিতে পার নাই? তোমরা কি এতাদৃশ পূজায় যোগ দিবে না?

যাঁহারা ভাবেন, জাতীয় সমিতির কোন ধর্ম্মনীতি নাই, তাঁহারা রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি কিছুই বুঝেন না, ধর্ম্ম বালকের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম গ্রহণ করে, যদিও ইহার প্রভাব উত্তর কালেই দেখা যায়। সুতরাং ভারতীয় জাতীয় সমিতিরও ধর্ম্মনীতি আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। যেমন বৈদেশিক রাজশাসন এই রাজনীতি চর্চ্চার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তদ্রূপ মানব জাতির সর্ব্বাদি ধর্ম্ম চিন্তা, যাহা ভারতে ঋক্‌বেদাকারে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই জাতীয় সমিতির ধর্ম্মনীতির আলোচ্য কেন্দ্র হওয়া উচিত। হিন্দু মুসলমান, পার্সী, খ্রীষ্টান সকলেই ঐ কেন্দ্রে মিলিত হইবার যথেষ্ট উপকরণ পাইবেন এবং যে ব্যক্তি সেই উপকরণ সমূহ রাজা ও প্রজা, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, ধনী ও দরিদ্রের দ্বারদেশে উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাকে যাঁহারা উপহাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে যে কিছু মনুষ্যত্ব আছে, ইহা ত আমাদের বুদ্ধির অতীত। যাহা হউক, এরূপ লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে অধিক হইলেও, তাঁহাদের ক্ষমতা ও বিদ্যাবুদ্ধি এত অল্প যে, তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতের প্রয়োজন কেহই বোধ করেন না। পক্ষান্তরে যে সকল ব্যক্তির এদেশে পূজণীয় পদ আছে, যথা, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শিবনাথ শাস্ত্রী ইত্যাদি, ইঁহারা সকলেই রমেশ বাবুর কার্য্যের প্রশংসা ও সহায়তা করিয়াছেন। বঙ্কিম চন্দ্রও রমেশ বাবুর কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

বিশেষতঃ সম্প্রতি বাবু রাজনারায়ণ বসু, নরেন্দ্র নাথ সেন এবং চারু চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সুযোগ্য মহোদয়গণ যাহাতে বেদ বাঙ্গলার জাতি নির্ব্বিশেষে পঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন। এজন্যই পূর্ব্বে

বলিয়াছি, সমাজসাগরে যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাতরণী ভাসমান হইয়াছে, তাহাতে যে একটী কথা আছে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে।

বেদবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রমেশ বাবুতে ও প্রবন্ধ-লেখকে যে চিঠিপত্র লেখা চলিতেছে, পাঠক অদ্য তাহার কিয়দংশ পাঠ করুন।

প্রবন্ধ-লেখক রমণীয় ও মোহণীয় চরিত্র-সম্পন্ন রমেশ চন্দ্রের নিকট পরিচিত আছেন। তাঁহার মনোবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যও প্রবন্ধ-লেখকের যথেষ্ট সুবিধা ও অবকাশ হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি সাহস পূর্ব্বক রমেশ বাবুকে লিখিয়া পাঠান যে, কেবল বেদানুবাদে অভীষ্ট ফল লাভের আশা নিকটবর্ত্তিনী নহে। অতএব একটী বেদবিদ্যালয় বাঙ্গালাভাষায় স্থাপিত করিয়া হিন্দুর মৌলিক ধর্ম্মশাস্ত্র এরূপে শিক্ষা দেওয়া হউক যে,সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকবৃন্দ ভারতের নানাস্থানে, মিসরে, গ্রীসে এবং ইতালীতে ধর্ম্মপ্রচারার্থে বহির্গত হইতে পারেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থে তিনি ইহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

পত্রের উত্তরে তিনি প্রবন্ধ-লেখককে লিখিয়াছেন—

Burdwan.
2nd June, 1890.

MY DEAR MODHU SUDUN BABU,

I am glad to get your letter after a long time and thank you for the sympathetic and kind wishes it contains. Don't trouble yourself much about the opposition which I occasionally meet with in carrying out my great object and placing before my countrymen for their acceptance the healthy religion and social customs which we had in the past. The opposition which I meet with only shews that my work is being felt and producing its effects! The great scheme, which you suggest, of starting a regular school is impossible of execution for the present—for you must remember my time is not my own and I have no faith in starting a movement which I can not personally derect and lead to success. But something in the way you suggest will be effected gradually and you will see the results bye and bye. I am full of hope and confidence for the future—"the rising tide is with us, the ebbing tide is with our opponents——who are also the Opponents of all social, and political reforms.

Yours Truly,
(Sd.) R. C. Dutt.

এই পত্র প্রাপ্তির পর যে পুস্তিকায় বেদবিদ্যালয় স্থাপনের কথা ছিল, তাহার এক খণ্ড ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক নরেন্দ্র বাবুর নিকট প্রেরিত হয় এবং "vox populi" নাম দিয়া উচ্চ ও নিম্ন হিন্দুর সমতা জন্য যে পত্র প্রেরিত হয়, তাহা ইণ্ডিয়ান মিরারে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহারই কিছু কাল পরে দেখা গেল যে,বেদবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব অপেক্ষাকৃত স্ফুটোন্মুখ হইয়াছে। তাহা দেখিয়া পুলকিত হৃদয়ে আমি আবার রমেশ বাবুকে লিখি। তিনি তাহার উত্তরে দিনাজপুর হইতে লিখিয়াছেন।—

"I am glad to learn that my worthy friends Babus Raj Narain Bose and Narendra Nath Sen have taken up the idea of the vedic school. I sincerely wish it success and I will help it to the utmost of my power.,,

এক্ষণ বোধ হয় ভরসা করা যায়, কলিকাতায় বাঙ্গলাভাষার একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপিত হইতে আর বিলম্ব হইবে না। যাঁহারা কাশীতে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণকুমার-

গণের জন্য বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া লজ্জিত হইবেন যে, সমুদায় ভাবে বেদালোচনা হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, বৈদিক, কোরাণিক ও বিব্রিক, সর্ব্বপ্রকার হিন্দুই এই বেদবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারিবে। আমাদের আরও বিশ্বাস এই, বৌদ্ধেরা যেমন পালি ভাষার সহায়তায় ধর্ম্ম ও ভাষার ভারতব্যাপী প্রসার সাধন করিয়াছেন, বাঙ্গালীর যদি বুদ্ধি ও তদনুরূপ শক্তি একেবারে লুপ্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারাও এবম্বিধ সুবিধা পরিত্যাগ করিবেন না। মনে রাখা উচিত, বৌদ্ধধর্ম্মেরও বীজোৎপত্তি বর্ত্তমান বাঙ্গালার সীমান্তর্গত।

ঋক্‌বেদের পুনরালোচনাই সত্যযুগের অব্যর্থ লক্ষণ এবং **"বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের"** প্রকৃত নিদান।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

বৈদ্যনাথে কুষ্ঠরোগীদিগের দুরবস্থা।

বৈদ্যনাথ ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অতি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। ইহা বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার অপর নাম দেবগৃহ বা দেওঘর। জ্যোতির্লিঙ্গ বৈদ্যনাথের অধিষ্ঠান বশত ইহা বৈদ্যনাথ অথবা দেবগৃহ (চলিত কথায় দেওঘর) নাম লাভ করিয়াছে। প্রতিদিন বহু সংখ্যক হিন্দু-যাত্রী বৈদ্যনাথের পূজার জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে এখানে সমাগত হইয়া থাকেন। শিবরাত্রি, শ্রীপঞ্চমী এবং ভাদ্র পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে এখানে সময়ে সময়ে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। সে সময়কার দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। চতুর্দ্দিকে বাদ্যোদ্যম, যাত্রিগণের কলরব এবং সহস্র সহস্র নরনারির কণ্ঠ-সমুদ্গত "ব্যোম ব্যোম" শব্দে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে; উপাসকগণের অর্পিত পুষ্প, বিল্বদল এবং গঙ্গোদকে মন্দিরের অভ্যন্তর এবং প্রকাণ্ড প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া যায় এবং যাত্রিগণের প্রদত্ত পতাকা ও সজ্জায় বৈদ্যনাথের ও পার্ব্বতীর মন্দিরের চূড়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করে। দূর দেশ হইতে সমানীত গঙ্গোদকের ভার স্কন্ধে বহন করিয়া এবং বিবিধ বর্ণের পতাকারাজি উড্ডীন করিয়া, যাত্রিগণ যখন শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বৈদ্যনাথ দেবের মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন তাঁহাদিগের সেই পরিশ্রম-ক্লিষ্ট, অথচ হর্ষোৎফুল্ল মুখমণ্ডল দর্শন করিলে অতি ধর্ম্মহীন হৃদয়েও ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়। দূর হইতে বৈদ্যনাথ দেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন করিবা মাত্র যাত্রিগণ যখন ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতে থাকেন, তখন তাহা দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথ ভিন্ন, পার্ব্বতী, লক্ষ্মীনারায়ণ, আনন্দভৈরব, রামচন্দ্র প্রভৃতি আরও অনেক দেব দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল মন্দিরে কোন বিশেষ কারুকার্য্য অথবা নির্ম্মাণ-কৌশল নাই। সাধারণ প্রস্তরে এবং অতি স্থূল প্রণালীতে এই সকল মন্দির গঠিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি

তাহাদিগের সমবায়ে বৈদ্যনাথ মন্দিরের অঙ্গনের এমন একটি গম্ভীর শোভা হইয়াছে যে, অন্য অনেক তীর্থ ক্ষেত্রে তাহা দুর্ল্লভ। জ্যোৎস্নাময় নিশীথে যিনি কোন দিন বৈদ্যনাথ প্রাঙ্গনের নীরব গাম্ভীর্য্য অনুভব করিয়াছেন, তিনি জীবনে আর কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না

বৈদ্যনাথ একদিকে যেমন তীর্থক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, অন্যদিকে তেমনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং স্বাস্থ্যকর জল বায়ুর জন্যও পরিচিত। ইহার তরঙ্গায়িত ভূমি, যোজনান্তব্যাপী প্রান্তর, শাল পিয়াল পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্য, এবং বর্ষাজলপুষ্ঠ নির্ঝরিণী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়গণের নিকট বড়ই তৃপ্তিপ্রদ। এখানে যদিও কোন বৃহৎ পর্ব্বত নাই, কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিকই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড শৈলে পরিবৃত। পর্ব্বত, প্রান্তর, অরণ্য, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় স্রোতের একত্র সমাবেশের জন্য বৈদ্যনাথের জল বায়ু বঙ্গ দেশের অপর সকল স্থানের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার জল বায়ুর গুণে আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতার অনেক ধনাঢ্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এখানে আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এবং বৎসরের কিয়দংশ সেখানে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। শারদীয় অবকাশের সময়ে এখানে দলে দলে লোক সমাগম হয়। পরিশ্রম-পীড়িত বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অনবরত মস্তিষ্কের চালনায় জীর্ণ অধ্যাপক, ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকগণ এখানকার প্রাণপদ জলবায়ুতে অবসন্ন দেহ নবাভূত করিবার জন্য সেই সময় এখানে আগমন করেন। সেই কয়দিনের জন্য বৈদ্যনাথ এক অভিনব বেশ ধারণ করে। বঙ্গদেশের এমন স্থান প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানকার দুই একজন অধিবাসী সেই সময় এখানে উপস্থিত না থাকেন। রাজপথ, যাত্রিনিবাস, অধিবাসীদিগের গৃহ লোকে পূর্ণ হইয়া যায়। পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপ পরিচয়ে সেই কয়দিন বৈদ্যনাথ-প্রবাসী বাঙ্গালিদিগের সময় অতি আনন্দে অতিবাহিত হয়। শারদীয় উৎসবের অবসানের সঙ্গে বিদেশীয়গণ স্বস্ব স্থানে প্রতিগমন করিতে আরম্ভ করেন এবং কয়েক দিনের জন্য কোলাহলপূর্ণ বৈদ্যনাথ, পুনর্ব্বার আপনার স্বাভাবিক নীরব শান্ত ভাব ধারণ করে।

পাঠক! বৈদ্যনাথ তীর্থের মাহাত্ম্য অথবা ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণন করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা হয় নাই। যে বিষাদময় দৃশ্য, এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ পুণ্যক্ষেত্রে শ্মশান ভূমির চিত্র প্রদর্শন করিতেছে, বঙ্গীয় নর নারীগণের সমীপে তাহা নিবেদন করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হিন্দুর এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে কতকগুলি হতভাগ্য হিন্দু সন্তানকে কিরূপ নিদারুণ ক্লেশে জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা লেখনী ধারণ করিয়াছি। বৈদ্যনাথের অনুগ্রহে পীড়া আরোগ্য হইবে, এই আশায় ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে পীড়িত ব্যক্তিগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন। তারকেশ্বর ভিন্ন বোধ হয় বঙ্গদেশের অপর কোন তীর্থক্ষেত্রে এত অধিক পীড়িত ব্যক্তির সমাগম হয় না। অন্যান্য রোগগ্রস্তগণের ন্যায় বহু সংখ্যক কুষ্ঠরোগীও এখানে আরোগ্যলাভের

আশায় আসিয়া থাকেন। সুদূর পঞ্জাব হইতে আরম্ভ করিয়া, মধ্যভারত, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারতভূমির নানা প্রদেশ হইতে ব্যাধিগ্রস্তগণ এখানে বৈদ্যনাথের পূজা দিবার জন্য আগমন করেন। যখন আর অপর কোন ঔষধ কার্য্যকর বলিয়া মনে হয় না, তখন বৈদ্যনাথে হত্যাদান, বৈদ্যনাথের স্নানজল ও চন্দন ব্যবহার এবং বৈদ্যনাথের পূজাই ব্যাধিগ্রস্তগণের এক মাত্র ঔষধরূপে পরিণত হয়। কেহ কেহ উহাদ্বারা উপকার লাভ করে; কিন্তু অধিকাংশ রোগীই এই দুর্মোচ্য ব্যাধির হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে না পারিয়া, জীবনের সুখ শান্তির আশায় হতাশ্বাস হয়। যাঁহাদিগের আত্মীয় স্বজন আছেন, অথবা যাঁহাদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উত্তম, সেইরূপ রোগিগণ কিছু দিন এখানে অবস্থান করিয়া আরোগ্য লাভ সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইলে স্বদেশে প্রতিগমন করেন। কিন্তু যাঁহাদিগের আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে; অথবা যাঁহারা একবারেই নিঃসম্বল, সেইরূপ রোগিগন নিরাশ্রয় অবস্থায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এখানেই বাস করিতে বাধ্য হন। তীর্থক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ভিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং এখানে থাকিলে বৈদ্যনাথের অনুগ্রহে তাহাদিগের পীড়ার উপশম হইলেও হইতে পারে, এই দুই কারণে কুষ্ঠরোগিগণ অন্য স্থান অপেক্ষা বৈদ্যনাথেই বাস করিতে অধিকতর ইচ্ছা প্রকাশ করে। সেই জন্য সকল সময়েই বৈদ্যনাথে বহুসংখ্যক কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। রাজপথে, দেবমন্দিরের পার্শ্বে, রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে, এমন স্থান নাই, যেখানে না তাহাদিগের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হয়; যেথান না তাহাদিগের শোণিতলিপ্ত বিগলিতদেহ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী পুরুষে পঞ্চাশৎ জনেরও অধিক কুষ্ঠরোগী বৈদ্যনাথে বাস করিতেছে। যে শোচনীয় অবস্থায় তাহারা এখানে বাস করে, তাহা বর্ণন করিয়া পাঠক পাঠিকাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারি, আমাদিগের এমন সাধ্য নাই। ইতর পশুপক্ষিদিগেরও জীবনে যে সুখ এবং যে শান্তি বর্ত্তমান আছে, এই সকল হতভাগ্য এবং হতভাগিনীদিগের জীবনে তাহাও নাই। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, বাসগৃহের অভাব, সকল প্রকার অভাব, তাহাদিগকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পশুর ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। শীতাতপে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, বৈদ্যনাথে তাহাদিগের জন্য এমন কোন স্থান নাই। গৃহস্থের গৃহে, যাত্রিনিবাসে, পান্থশালায় কোথাও তাহারা আশ্রয় প্রাপ্ত হয়না। পরিত্যক্ত জীর্ণ দেব মন্দিরের পার্শ্বে, বৃক্ষতলে, অথবা রাজপথের সন্নিকটে তাহারা অনাবৃত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হয়। বর্ষার ধারা, প্রখর রৌদ্র, দারুণ শীত, সমস্তই অবাধে তাহাদিগের শরীরের উপর দিয়া অতিবাহিত হয়। রোগের ভীষণ আক্রমণে যাহাদিগের হস্ত পদ অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, তাহারা এ অবস্থায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করে; কে তাহাদিগের জন্য ভিক্ষা আনিয়া দিবে? এরূপ অবস্থায় শৃগাল কুক্কুরে দংশন করিলেও তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ঔষধ এবং পথ্য দূরে থাকুক, প্রাণ

ধারণোপযোগী খাদ্য এবং শীত নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্রও তাহারা প্রাপ্ত হয়না। বৈদ্যনাথের নিদারুণ শীতে উন্মুক্ত অকাশের তলে শতগ্রন্থিযুক্ত এক এক খানি বস্ত্র মাত্র অবলম্বন করিয়া, তাহারা কিরূপ ক্লেশে রাত্রি যাপন করে, তাহা কি বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা আছে? বর্ষার প্রবল ধারা এবং ঝঞ্ঝাবায়ুতে উপদ্রুত হইয়া, যদি তাহারা কখনও কম্পান্বিত কলেবরে কোন গৃহস্থের গৃহের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করে, লোকে অমনি শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় "দূরদূর" করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। রোগের যন্ত্রণায় এবং লোকের এইরূপ উপেক্ষায় মানব হৃদয়ের কোমল বৃত্তি সমূহ তাহাদিগের প্রকৃতি হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। ধর্ম্ম, সামাজিক কর্ত্তব্য, আধ্যাত্মিক উন্নতি, তাহাদিগের নিকট আকাশ-কুসুমে পরিণত হইয়াছে। সংসারে শান্তি নাই, আশা নাই, আশ্রয় নাই, মৃত্যু আসিয়া কবে তাহাদিগকে বিশ্রাম দান করিবে, কেবল এই আশায় তাহারা প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছে। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা, একবার চিন্তা করিয়া বলুন দেখি, আমাদিগের এই সকল হতভাগ্য ভ্রাতা এবং হতভাগিনী ভগ্নিদিগের সম্বন্ধে কি কোনরূপ কর্ত্তব্য নাই? ধর্ম্মানুরাগে এবং কারুণ্যে আমরা পৃথিবীর অপরাপর জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই বলিয়া কত সময় আমরা গর্ব্ব করি; কিন্তু হিন্দুর এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে অনাথ হিন্দুরোগিগণ এইরূপ নিদারুণ যন্ত্রণায় জীবন যাপন করিতেছে, ইহা কি আমাদিগের কারুণ্যশীলতার পরিচায়ক? বৈদ্যনাথস্থ কুষ্ঠরোগিদিগের দুরবস্থা, আমাদিগের সমগ্র হিন্দু সমাজের পক্ষে লজ্জার কারণ হইয়াছে। এই সকল রোগিদিগের মধ্যে সকলেই যে নীচ জাতীয়, তাহা নহে; ইহাদিগের মধ্যে অনেক সদ্বংশজাত এবং উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত আছেন। কিন্তু হায় নিদারুণ রোগ তাঁহাদিগকে চণ্ডালের অপেক্ষাও অস্পৃশ্য করিয়া তুলিয়াছে। কারুণ্যই হিন্দু জাতির চরিত্র ও লক্ষণ; কিন্তু করুণস্বভাব হিন্দুগণ কি জন্য যে বৈদ্যনাথের (অথবা কেবল বৈদ্যনাথের বলি কেন, সমগ্র ভারতভূমির) কুষ্ঠরোগিগণের সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন, বলিতে পারি না। কুষ্ঠরোগ জন্ম জন্মান্তরের মহাপাপের ফল, এবং কুষ্ঠরোগী অস্পৃশ্য ও অনুকম্পার অযোগ্য, এইরূপ একটি চিরপ্রচলিত সংস্কারই বোধ হয় হিন্দু সমাজকে কুষ্ঠরোগিদিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু যাহারা আমাদিগের ন্যায় আধ্যাত্মিক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, তাহাদিগের পক্ষে কি এইরূপ সংস্কার লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার অধিকার আছে? প্রেমএব পুণ্যের অবতার শ্রীচৈতন্য কুষ্ঠরোগিদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তবে আমাদিগের ন্যায় মহাপাপিগণ কেমন করিয়া বলিতে সাহসী হইবে যে, "কুষ্ঠরোগি, তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূরীভূত হও, তোমার সম্বন্ধে আমার কোন কর্ত্তব্য নাই"! কুষ্ঠব্যাধি পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের পরিণাম কি না এবং তজ্জন্য ব্যাধিগ্রস্তদিগের পক্ষে কিরূপ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন, সহস্র অপরাধে অপরাধী আমাদিগের ন্যায় মানবের পক্ষে সে কথা আলোচনা করিবারও অধিকার নাই। আমাদিগের কেবল এইমাত্র মনে করা কর্ত্তব্য যে, অন্যান্য সমস্ত ব্যাধির ন্যায়

কুষ্ঠব্যাধিও নিজের এবং পিতৃ পিতামহগণের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল; এবং বিসূচিকা অথবা তাদৃশ অন্য কোন রোগগ্রস্ত বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা যদি আমাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করাও আমাদিগের অকর্ত্তব্য নয়। প্রিয় পাঠক পাঠিকা, যে ইয়ুরোপ ভূমিকে আমরা ম্লেচ্ছভূমি বলিয়া এত ঘৃণা করি, তাহা এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা কত গুণে শ্রেষ্ঠ! কত সহৃদয় য়ুরোপিয় পুরুষ এবং দয়াবতী মহিলা কুষ্ঠরোগিদিগের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন! মহাপুরুষ দামিয়েন এবং মোরেভিয়ান ভগ্নী সম্প্রদায়ের নাম আমাদিগের পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। দামিয়েন ষোড়শ বর্ষকাল অবিশ্রাম কুষ্ঠ রোগিগণের সেবা করিয়া এবং অবশেষে স্বয়ং কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মবিসর্জ্জন হইতে সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি কুষ্ঠরোগিদগের দুরবস্থা সম্বন্ধে আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, ফাদার কন্‌রাডী, ফাদার ওয়েণ্ডিগিলন, কুমারী নাইটিঙ্গেল, কুমারী কেট মার্সডেন প্রভৃতি অনেক দেব প্রকৃতির নরনারী জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কুমারী কেট মার্সডেন রুশিয়া দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, ভারতের কুষ্ঠরোগিদিগের দুরবস্থা অনুসন্ধানের জন্য এদেশে আগমন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। দামিয়েনের অশরীরী সত্ত্বা যেন অদৃশ্য ভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে। অধিক দিনের কথা নয়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, ফাদার টেষ্টিভিউডিও নামক জনৈক খ্রীষ্ট ধর্ম্মপ্রচারক, দামিয়েনের ন্যায় জাপান দেশীয় কুষ্ঠ রোগিগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। জাপান দেশীয়া একটি হতভাগিনী রমণী ব্যাধিগ্রস্তা হইয়া, আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিতেছিল। ফাদার টেষ্টিভিউডিও সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া আশ্রয় দান করেন। এই হইতে হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্তদিগের সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হয়। তিনি এক্ষণে কুষ্ঠরোগিদিগের জন্য এক বিস্তৃত আশ্রম সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদিগের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। জাপান অথবা মোলাকাই বহুদূরবর্ত্তী, সেখানকার কুষ্ঠরোগিদিগের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, কিন্তু এই বঙ্গ ভূমির অন্তর্গত পুরুলিয়া নগরেই খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম-প্রচারকগণ কুষ্ঠরোগিগণের জন্য যাহা করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিলে আমাদিগের নিশ্চেষ্টতার জন্য শতবার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। পুণ্যভূমি য়ুরোপ, তুমি ধন্য! তোমার সুসন্তানগণ জাতি, ধর্ম্ম এবং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে পৃথিবীর দুঃখী তাপিগণের জন্য কতস্থানে কত ভাবে জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, আর জননী ভারতভূমি, তোমার এই অসংখ্য সন্তানগণের মধ্যে এমন কেহ কি নাই, যিনি এই সহস্র সহস্র অনাথ অনাথিনীগণের জন্য কিয়ৎ পরিমাণে স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারেন? হায় ভারত-ভূমিতে কবে একজন দামিয়েন, অথবা একজন টেষ্টিভিউডিও জন্ম গ্রহণ করিবেন!

ইয়ুরোপীয়গণ বৈদেশিকগণের জন্য আত্ম বিসর্জ্জন করিতেছেন, আর আমরা আমাদিগের স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয়গণের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। এই ভারতভূমিতে

তিনলক্ষেরও অধিক কুষ্ঠরোগির বাস! গৃহচ্যুত এবং আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত রোগীর সংখ্যা এক লক্ষের ন্যূন নহে। ইহারা যে কি অবস্থায় দিনপাত করে, তাহা বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। তীর্থক্ষেত্র বৈদ্যনাথে যখন তাহাদিগের এই রূপ দুরবস্থা, তখন অন্যান্য স্থানে তাহারা যে কিরূপ ক্লেশে কাল যাপন করে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়াও তাহারা নাস্তিক, এবং সমাজের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য না করিয়াও তাহারা সমাজচ্যুত। মনুষ্য নাম ধারণ করিয়া এবং মনুষ্যোচিত বৃত্তি সমূহ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা পশুর ন্যায় দিনপাত করিতেছে। সংসারে সুখ নাই, শান্তি নাই, আশা নাই; মৃত্যু আসিয়া কবে তাহাদিগকে এই যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দান করিবে, তাহারা কেবল সেই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। রোগ এবং দরিদ্রতা অনেক সময় সমাজের অজ্ঞতা এবং ঔদাসীন্যের ফলে ঘটিয়া থাকে; সেইজন্য দরিদ্র এবং ব্যাধিগ্রস্তদিগের প্রতি সমাজের একটী বিশেষ কর্তব্য আছে। কিন্তু হতভাগ্য কুষ্ঠরোগিগণের সম্বন্ধে আমাদিগের যে কোন রূপ কর্তব্য আছে, সে কথা একবারও আমাদিগের মনে উদয় হয় না। আমরা আতুরকে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়াই আমাদিগের কর্তব্য শেষ হইল, মনে করি। কিন্তু ভিক্ষা দান ব্যতীত তাহার সম্বন্ধে যে আমাদিগের আরও কর্তব্য আছে, সে কথা আমরা একবারও চিন্তা করি না। কিন্তু দরিদ্র এবং আতুরের সম্বন্ধে সমাজ একটী অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রহিয়াছে, সে কথা আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হইয়া থাকি। আমাদিগের এতগুলি ভ্রাতা ভগ্নী ঔষধ এবং পথ্যের অভাবে রাজপথচারী কুক্কুর কুক্কুরীর ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতেছে, আর আমরা অবিকৃত চিত্তে সুখাদ্য সুপেয় দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হইতেছি—বিলাস বাসনা তৃপ্তির জন্য অর্থ ব্যয় করিতেছি, ইহাতে কি আমাদিগকে অপরাধী হইতে হইতেছে না? সমুদ্রের যে তরঙ্গ এক কূল ভগ্ন করে, তাহাই আবার মৃত্তিকা সঞ্চয় করিয়া অপর দিকে অভিনব ভূমির সঞ্চার করে। যে অনুকূল ঘটনা সমাজের এক শ্রেণীর লোকদিগকে সুখ সম্পদের অধিকারী করিয়াছে, তাহাই আবার ভিন্ন মূর্ত্তিতে অপর এক শ্রেণীকে অন্ধ, আতুর এবং ব্যাধিগ্রস্তে পরিণত করিয়াছে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় একের উন্নতিতে অপরের অবনতি এক রূপ অনিবার্য্য। সেই জন্য দরিদ্রের সম্বন্ধে ধনীর দয়া অনুগ্রহমূলক নহে, কঠোর কর্ত্তব্যমূলক; প্রদত্ত অন্ন জল, দান নহে, ঋণ পরিশোধ মাত্র। পাঠক স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন "যে রোগ শিবেরও অসাধ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে মনুষ্যের চেষ্টায় আর কি ফল হইতে পারে?" কুষ্ঠব্যাধি যে দুশ্চিকিৎস্য এবং তাহার প্রতীকার সমর্থ ঔষধ যে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, সে কথা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু তাহাদিগের রোগ আরাম করিতে না পারিলেও তাহাদিগের যন্ত্রণার যে কিয়ৎ পরিমাণে উপশম করা যাইতে পারে, সে কথা কে অস্বীকার করিবেন? এই সে দিন মাত্র হইল, এক হত-

ভাগিনী ব্যাধিগ্রস্তা রমণী, বৈদ্যনাথের এক প্রকাশ্য রাজপথের পার্শ্বে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কত লোক সেই পথে যাতায়াত করিতেছিল, কিন্তু কেহ তাহার সংবাদ মাত্র লইল না। সজীব অবস্থাতেই তাহার শরীর হইতে কৃমি নির্গত হইতেছিল! সে অবস্থায় তাহার ক্ষতে কয়েক বিন্দু তৈল নিষেক করিতে পারিলেও ত মৃত্যুকালে তাহার কৃমি দংশন যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ উপশম হইত। রোগিদিগের ক্ষত যদি পরিষ্কৃত এবং মক্ষিকার দংশন হইতে রক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের কত ক্লেশের অবসান হয়। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, কুষ্ঠরোগিদিগকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিতে না পারিলেও আমরা যে তাহাদিগের যাতনার হ্রাস করিতে পারি, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু হায়, ভারতভূমির কত স্থানে কত হতভাগ্য এবং হতভাগিনী সমাজের সম্পূর্ণরূপ উপেক্ষায় এবং ঔদাসীন্যে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, অথচ কেহ তাহার সংবাদ মাত্র লয় না! কত অশ্রু জল নীরবে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, কত দীর্ঘ শ্বাস বায়ুর সঙ্গে মিলিত হইতেছে; কেহ দেখিবার, কেহ শুনিবার নাই। কিন্তু সেই সর্ব্বজ্ঞপুরুষ সমস্তই জানিতেছেন, সমাজকে তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

যাহাদিগের দেহ রক্ষার উপযুক্ত ঔষধ এবং পথ্য সংগৃহীত হইতেছে না, তাহাদিগের আধ্যাত্মিক কল্যাণের কথা আর কি বলিব? কত আত্মা যে সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পশুভাব উপার্জ্জন পূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে, উপেক্ষা করিতে, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি আছেন, কিন্তু সস্নেহ বাক্যে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগের প্রাণে ধর্ম্ম বিশ্বাস উদ্বোধিত করিতে এক জনকেও দেখিতে পাই না। কুষ্ঠরোগিগণ মহাপাপী, অস্পৃশ্য এবং অনুকম্পার অযোগ্য, ইহাই অনেকের সংস্কার, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যে অনেক উন্নতচেতা এবং ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি থাকিতে পারেন, সে কথা অতি অল্প লোকেরই মনে উদয় হইয়া থাকে। প্রবন্ধ-লেখক বৈদ্যনাথে এমন দুইজন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন যে, বহু বর্ষাবধি রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও তাঁহাদিগের হৃদয়ের কোমল বৃত্তি সমূহ শুষ্ক হইয়া যায় নাই। একজন নিজে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও অপর সকলের তত্ত্বাবধান করেন এবং যাহারা চলৎশক্তি রহিত, তাহাদিগের জন্য ভিক্ষা আনিয়া দেন। রোগের ভীষণ আক্রমণে অপরের হস্তের অঙ্গুলিগুলি বিরূপ হইয়া গিয়াছে, দৃক্‌শক্তি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে; কিন্তু ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনে তাঁহার আসক্তি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে মধুর রামগুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, প্রবন্ধ-লেখকের পাষাণ হৃদয়ও অনেকবার বিগলিত হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তি যদি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইতেন, তাহা হইলে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ তাঁহাদিগকে এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। আজ ইঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, খ্রীষ্টভক্তগণ অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহাদিগকে হৃদয়ে গ্রহণ করেন। কিন্তু এত যন্ত্রণা এবং এত ক্লেশ সহ্য

করিয়াও তাঁহারা যে আজিও হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করেন নাই, সে জন্য কি, তাঁহাদিগের কল্যাণের কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়? ভারতভূমিতে এমন কেহ কি নাই, যিনি এই হতভাগ্য এবং হতভাগিনী-গণের কল্যাণের জন্য জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দ কিয়ৎ পরিমাণেও বিসর্জ্জন করিতে পারেন? ভারতের কুষ্ঠরোগিদিগের দুরবস্থা মোচনের জন্য একজন হাউয়ার্ড, একজন দামিয়েন, অথবা একজন বুথের ন্যায় ব্যক্তির প্রয়োজন। কত-দিনে ভারতভূমিতে সেরূপ একজন দেবতার আবির্ভাব হইবে, তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞপুরুষই কেবল বলিতে পারেন।

কুষ্ঠরোগিগণের দুরবস্থা বর্ণন মাত্র করিয়া বিরত থাকা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; তাহা বিমোচনের জন্য আমরা প্রত্যেকে কিরূপ সাহায্য করিতে পারি, এইবার আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমাদিগের মধ্যে যিনি যে অবস্থার লোক হউন্ না কেন, ইচ্ছা করিলে আমরা প্রত্যেকে কিয়ৎ পরিমাণে তাহা-দিগের দুর্দ্দশার হ্রাস করিতে পারি। ধনাঢ্য-দিগের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁহাদিগের কটাক্ষপাতেও ইহাদিগের দুঃখাবসান হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্রতম ব্যক্তিও বর্ষান্তে একখানি পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্র প্রদান করিয়া, ইহাদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে উপকৃত করিতে পারেন। আমা-দিগের মিউনিসিপালিটী এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সমূহ গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। আমাদিগের সংবাদ পত্র লেখকগণ তাহা-দিগের দুরবস্থা বর্ণন করিয়া, লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন। আমাদিগের চিকিৎসকগণ তাহাদিগের পীড়া আরাম করিতে না পারেন, যাহাদ্বারা তাহাদিগের যাতনার কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হয়, (যে সকল স্থানে অনেক কুষ্ঠ-রোগির বাস, সেই সকল স্থানে) সেইরূপ ঔষধ প্রেরণ করিয়া, তাহাদিগের ক্লেশের শান্তি করিতে পারেন। আমাদিগের ধর্ম্ম প্রচারক এবং সাধুপুরুষগণ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া, তাহাদিগের অবসন্ন প্রাণে আশা এবং বিশ্বাসের সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। ধর্ম্মবিশ্বাসজনিত সান্ত্বনা, যদি জগতে কাহারও পক্ষে আবশ্যক থাকে, তবে তাহা এইরূপ হতভাগ্যদিগের পক্ষেই আছে। ধর্ম্মোপদেশ সুস্থ এবং সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য, আর আতুর এবং অনাথের জন্য কি নয়? কুষ্ঠরোগিদিগকে সাহায্য করিতে অবসরের অভাব কি? তাহা-দিগকে ঘৃণা এবং উপেক্ষা না করিয়া, একটি মাত্র মধুর বাক্যে যদি কেহ তাহাদিগের শুষ্ক প্রাণে সরস ভাব উদ্দীপিত করিতে পারেন, তবে তাহাও ত যথেষ্ঠ। লোকের অবজ্ঞায় এবং ঘৃণায় যাহারা জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে, একটি সস্নেহবাক্য তাহা-দিগের পক্ষে বহু মূল্যবান। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, আমাদিগের মধ্যে যিনি যে অবস্থারই লোক হউন না কেন, ইচ্ছা করিলে আমরা ইহাদিগের জন্য যথেষ্ঠ করিতে পারি। কাহারও জন্য কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া, অপরের পক্ষে সহজ নয়। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা, নিজের নিজের শক্তি এবং ইচ্ছা অনুসারে তাহা নির্ব্বাচন করিবেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

বৈদ্যনাথস্থ কুষ্ঠরোগিদিগের দুর্দ্দশাই বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখককে লেখনী ধারণে প্রণোদিত করিয়াছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদিগের দুরবস্থার কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কুষ্ঠরোগিগণ কিরূপ ক্লেশে বৈদ্যনাথে বাস করে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অন্যান্য সকল প্রকার অভাবের মধ্যে বাসগৃহের অভাবই তাহাদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশকর। বৈদ্যনাথ দেব মন্দিরের সদাব্রত হইতে এবং লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহারা যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কায় ক্লেশে তাহাদিগের একরূপ দিনপাত হয়। কিন্তু শীতাতপে তাহারা মস্তক রক্ষা করিতে পারে, বৈদ্যনাথে তাহাদিগের জন্য এরূপ স্থান নাই। রীতিমত একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগের আহার, পরিচ্ছদ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অল্পবীর সাধ্য নহে। পঞ্চাশ জন রোগীর স্থান হইতে পারে, এরূপ একটি আশ্রম সংস্থাপন করিতে হইলে মাসিক অন্তত সাড়ে তিন শত টাকার প্রয়োজন। বৈদ্যনাথের ন্যায় তীর্থক্ষেত্রে যেখানে ভারতের অনেক রাজাধিরাজ হইতে দীন হীন ভিক্ষুক পর্য্যন্ত পদার্পণ করিয়া থাকেন, সেখানে অনাথ হিন্দুরোগিদিগের জন্য মাসিক সাড়ে তিন শত টাকা ব্যয়ের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে। বৈদ্যনাথে এমন সকল সৌভাগ্যবান পুরুষের পদার্পণ হয় যে, যাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে একাই ভার গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত বিধাতার কৃপায় সেরূপ কোন মহানুভব পুরুষের দৃষ্টি কুষ্ঠরোগিদিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে আকৃষ্ট না হয়, ততদিন আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও সমবেত চেষ্টায় কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদিগের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। তাহাদিগের বাসের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে পারিলেও তাহাদিগের অনেক কল্যাণ সাধন করা হয়। জলাভাবে তাহাদিগের যে কি নিদারুণ কষ্ট হয়, তাহা বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগের মধ্যে অনেকের হস্ত পদ এরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে যে, কূপ হইতে রজ্জু সংযোগে জল উত্তোলন করিবার তাহাদিগের সাধ্য নাই। নগরের মধ্যে যে দুই একটি পুষ্করণী আছে, সংক্রামকত্বের ভয়ে স্থানীয় মিউনিসিপালিটি এবং অধিবাসিগণ তাহাদিগকে তাহার জল ব্যবহার করিতে দিতে সাহস করেন না। এরূপ অবস্থায় স্বচ্ছন্দ অবগাহন অথবা স্নান তাহাদিগের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটেনা। এখানকার পার্ব্বতীয় স্রোত বর্ষা শেষে একবারেই শুষ্ক হইয়া যায়। দশ পনর অঙ্গুলি বালুকা খনন না করিলে তাহার ভিতর হইতে জল পাওয়া যায় না। রোগিদিগের মধ্যে অনেকেরই হস্তের অঙ্গুলি বিগলিত হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে কিরূপ ক্লেশে পানীয় জলের জন্য নদীর বালুকা খনন করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সে দৃশ্য দর্শন করিলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারা যায় না। পঞ্চাশ জন রোগীর উপযুক্ত বাস গৃহ, তাহাদিগের পানীয় জলের ব্যবস্থা, গৃহটি প্রতিদিন পরিষ্কার এবং তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন লোকের বেতন ইত্যাদি কার্য্যে অন্যূন পাঁচ সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন। এখানে গৃহ নির্ম্মাণের উপকরণ

কলিকাতার অপেক্ষা অনেক সুলভ। স্থানীয় লোকদিগের দ্বারা কাষ্ঠাদির কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য হইতে পারে। আনুমানিক আড়াই সহস্র মুদ্রা হইলে, পঞ্চাশৎ জনের উপযুক্ত বাসগৃহ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা হইতে পারে। অবশিষ্ট আড়াই সহস্র মুদ্রার বার্ষিক সুদ একশত টাকা হইতে পরিচারকের বেতন এবং ভবিষ্যতে গৃহটির সংস্কার-কার্য্য চলিতে পারিবে। জলাভাবে তাহাদিগের কিরূপ ক্লেশ হয়, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যদি একজন পরিচারক দ্বারা প্রতিদিন একটি বৃহৎ চৌবাচ্চা জলে পূর্ণ করিয়া রাখা যায় এবং কলিকাতার কলের ন্যায় নল সংযোগে তাহাদিগকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের একটি গুরুতর ক্লেশ দূরীভূত হয়। একবার একটি গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারিলে, তীর্থযাত্রী, স্থানীয় লোক এবং করুণহৃদয় বদান্য ব্যক্তিদিগের সাহায্যে ক্রমশ তাহাদিগের পরিধেয়, আহার্য্য, এমন কি চিকিৎসারও ব্যবস্থা হইতে পারিবে। প্রয়োজনীয় পাচ সহস্র মুদ্রার মধ্যে প্রায় আড়াই সহস্র মুদ্রা প্রতিশ্রুত এবং সংগৃহীত হইয়াছে। বৈদ্যনাথের কুষ্ঠরোগিদিগের দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া, যদি কোন অনুকম্পাশীল পাঠক এই কার্য্যের জন্য আমাদিগকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে এই হতভাগ্যদিগের বিশেষ উপকার করা হইবে। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, দেব-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে কতস্থানে কত বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়া থাকে; কোন অনুকম্পাশীল পাঠক উদ্যোগী হইয়া তাহার কয়েকখণ্ড এখানকার কুষ্ঠরোগিদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রেরণ করিলে কতই উপকার করা হইবে। শিশুদিগের পুত্তলিকা ক্রীড়ায় কত বস্ত্র নষ্ট হয়, কিন্তু এই হতভাগ্যগণ অনেক সময় ক্ষত আচ্ছাদন করিবার উপযুক্ত বস্ত্রখণ্ডও প্রাপ্ত হয় না। কোন দয়াবতী পাঠিকা নিজের এবং আত্মীয়াদিগের পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্র গুলি নষ্ট না করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিলে এই হতভাগ্যগণ অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থা হইতে রক্ষা পায়। তাঁহাদিগের সাবকাশ কালে যদি তাঁহারা পুরাতন বস্ত্র হইতে ইহাদিগের শীত নিবারণের উপযুক্ত কোনরূপ অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহা হইলে ইহারা নিদারুণ শীতের হস্ত হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হয়। সুখাদ্য এবং সুপেয় বস্তু ইহারা জন্মেও কখন দেখিতে পায় না। নিমন্ত্রিতদিগের ভুক্তাবশিষ্ট সামগ্রী, কত সময় রাজ পথে পদদলিত হইতে থাকে, কিন্তু এই সকল ক্ষুধার্ত্ত হতভাগ্যদিগের কথা কেহ একবার চিন্তাও করেন না। উদ্যানের ফল মূল, ক্রিয়া কর্ম্মোপলক্ষে উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি, স্মরণ করিয়া, ইহাদিগের জন্য পাঠাইয়া দিলে ইহারা কত পরিতৃপ্ত হয়। বৈদ্যনাথে উদ্ভিজ্জাদি বড়ই দুষ্প্রাপ্য, দরিদ্রের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা সহজ নয়। একবার একজন ব্যাধিগ্রস্তা রমণীকে একটুকু মিষ্ট কুষ্টাণ্ড প্রাপ্ত হইয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখিয়াছিলাম, এখনও তাহা মনে পড়িতেছে। বিপন্নকে সাহায্য করিলে সাহায্যগ্রহণকারীই যে কেবল উপকৃত হন, তাহা নয়; সাহায্যদাতা তাহা হইতে যে শিক্ষা এবং যে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, প্রদত্ত সাহায্যের তুলনায় তাহা বহু গুণে অধিক মূল্যবান। প্রিয় পাঠক পাঠিকা, ইচ্ছা করিলে নানাবিধ উপায়ে ইহাদিগের দুরবস্থা দূর করা আপনা-

দিগের সাধ্যায়ত্ত। প্রচুর অর্থ প্রদান করিবার শক্তি না থাকিলে যে কোন শুভানুষ্ঠানে সাহায্য করিতে নাই, এ বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রমাত্মক। সুস্থ এবং ব্যাধিগ্রস্ত প্রত্যেকেই যাঁহার করুণার সমাধিকারী, সেই সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ, আমাদিগের প্রদত্ত দান দেখেন না, যে হৃদয়ে আমরা দান করি, কেবল তাহাই দেখেন। কোন ধনাঢ্যা এবং দয়াবতী মহিলা কুষ্ঠ-নিবাসের জন্য সহস্র মুদ্রা দান করিলে তাঁহার কার্য্যই যে আদরনীয় হইবে এবং কোন দরিদ্রা বিধবা অবকাশ কালে প্রতিবাসিনী দিগের নিকট সংগৃহীত জীর্ণ বস্ত্র হইতে একখানি কন্থা নির্ম্মাণ করিয়া দিলে তাঁহার কার্য্য আদরনীয় হইবে না, তাহা নয়। দরিদ্রের কপর্দ্দক ধনির মনিখণ্ড অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান। প্রিয় পাঠক পাঠিকা, যদি আপনাদিগের ইচ্ছা হয়, বর্ষান্তে এক এক খানি পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্র প্রেরণ করিয়াও আপনারা ইহাদিগের সাহায্য করিতে পারেন। একমুষ্টি তণ্ডুলের জন্য যাহারা লোকের দ্বারে দ্বারে রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত সহ্য করিয়া সকল সময়ে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে এবং একখানি শতগ্রন্থিজীর্ণ বস্ত্রের অভাবে যাহাদিগের রক্ত পূযপূর্ণ, মক্ষিকাকুলিত ক্ষত নগ্নাবস্থায় লোকের ঘৃণা এবং বিভীষিকা উৎপন্ন করিতেছে, তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অবসরের অভাব কি? তাহাদিগের দুরবস্থা বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। শূন্য পদে ভ্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে হয়। রাজপথের কঙ্কর এবং বালুকা, তাহাদিগের পদের ক্ষতে প্রবেশ করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা উৎপাদন করে। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে পদ আবৃত করিয়া ভ্রমণ করিতে পারিলেও কিয়ৎ পরিমাণে এ যন্ত্রণার হ্রাস হয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে ইহাও তাহারা সকল সময় প্রাপ্ত হয় না। পাঠক, পৃথিবীর মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাগ্রস্ত, তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অবসরের অভাব নাই। তাহাদিগের দুরবস্থা জানাইতে পারিলে সাহায্য প্রদানে প্রস্তুত লোকেরও অভাব হইবে না। অভাব কেবল উদ্যমশীলতার। নিশ্চেষ্টতা আমাদিগের জাতির প্রধান দোষ; অনেক সময় দুঃখির দুঃখ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়, মন সাহায্য প্রদানে প্রস্তুত হয়, কিন্তু উদ্যোগী হইয়া সাহায্য প্রেরণ, ইহাই অনেক সময় ঘটিয়া উঠে না। যদি এই নিশ্চেষ্টতা পরিহার পূর্ব্বক কৃপাশীল পাঠকবর্গ তাঁহাদিগের সাধ্যানুসারে একার্য্যে সহায়তা করেন, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যেই বৈদ্যনাথে একটি কুষ্ঠ নিবাস প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি এখানকার কুষ্ঠরোগিদিগের অবস্থা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলে, অথবা তাহাদিগের সাহায্যার্থ উদ্যোগী হইলে প্রবন্ধ-লেখক আনন্দের সহিত তাঁহাকে প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রেরণ করিতে এবং তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। কুষ্ঠরোগিদিগের গৃহ নির্ম্মাণার্থ যে উদ্যোগ হইতেছে, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাহার অন্যতর উদ্যোক্তা। প্রদত্ত সাহায্য তাঁহার নিকট, নব্যভারত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট, অথবা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিলে তাহা যতই সামান্য হউক, সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

দেওঘর, বৈদ্যনাথ। জ্যেষ্ঠ, ১২৯৮। } প্রধান শিক্ষক। দেওঘর স্কুল।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(কুরুপঞ্চালের প্রাদুর্ভাব সময়। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৪০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত।)

প্রথম অধ্যায়ের সাতটী পরিচ্ছেদে আমরা সিন্ধুতীরবাসী আর্য্য হিন্দুদিগের সভ্যতা, ধর্ম্মপ্রণালী, রীতি নীতি ও ইতিহাস বর্ণনা করিতে যত্ন করিয়াছি। সেই অনন্ত পরাক্রম ও যশঃশালী হিন্দুগণ এক্ষণে শতদ্রু পার হইয়া গাঙ্গ্য প্রদেশে নূতন নূতন উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমরা এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতটী পরিচ্ছেদে সেই গঙ্গাতীরবাসী নূতন ২ হিন্দু জাতিদিগের অর্থাৎ কুরু, পঞ্চাল, বিদেহ, কোশল ও কাশী জাতিদিগের বিষয় বিবরণ করিব।

আর্য্যদের বিজয় পতাকা দেশ হইতে দেশান্তরে উড্ডীন হইতে লাগিল। যে বীরবংশ সমূহ পঞ্চনদস্থ সমস্ত দেশ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা শতদ্রু ও সরস্বতীর কূলে শান্ত ভাবে বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। ইতিপূর্ব্বেই কোন ২ সাহসী পুরুষ শতদ্রু ও সরস্বতী অতিক্রম পূর্ব্বক যমুনা ও গঙ্গার কূলবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ আবিষ্কার করিয়া তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং গাঙ্গ্য প্রদেশ পঞ্চনদস্থ আর্য্যদের একেবারে অবিদিত ছিল না; ঋগ্বেদের দুই এক মন্ত্রে এই সকল দেশের উল্লেখই তাহার প্রমাণ। ক্রমশঃ এই উপনিবেশীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল যে, তাঁহারা আধুনিক দিল্লীর চতুঃপার্শ্বে এক অতি সমৃদ্ধিশালী ও পরাক্রান্ত জাতি হইয়া উঠিলেন। এই উপনিবেশীরা কুরুবংশের আদিপুরুষ।

কুরুবংশীয়েরা পঞ্জাবের কোন্ অংশ হইতে আসিয়া দিল্লীতে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।১৪) লিখিত আছে, হিমালয় পর্ব্বতের অপর পারে অর্থাৎ উত্তর দিকে উত্তর কুরু ও উত্তর মাদ্র বংশীয়দের নিবাস স্থান। গ্রীকপণ্ডিত টলমীর গ্রন্থেও ওট্টরকোরা (Ottorakorra) দেশের উল্লেখ আছে। আমাদের বোধ হয়, কাশ্মীর বা তন্নিকটস্থ পর্ব্বত-সঙ্কুল কোন প্রদেশে এই উত্তর কুরুদিগের নিবাস ছিল এবং তাঁহাদেরই সন্তানেরা গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আসিয়া অনুমান ১৪০০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে হস্তিনাপুরে রাজধানী করিয়া নূতন কুরু রাজ্য সংস্থাপন করিলেন।

যখন একবার গাঙ্গ্য প্রদেশে কিছু অধিনিবেশের সূত্রপাত হইল, তখন দলে দলে আর্য্যেরা দোয়াব প্রদেশে আসিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। যে সময়ে কুরুবংশীয়েরা একটী নূতন অধিনিবেশ করিতেছিলেন, সেই সময়েই পঞ্চালবংশীয়েরা আধুনিক কানোজের অনতিদূরে প্রাচীন কাম্পিল্য নগর রাজধানী করিয়া নূতন পঞ্চাল রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। পঞ্চালদিগের আদি নিবাস স্থান জানা যায় না; তবে কুরুদিগের ন্যায় তাঁহারাও হিমালয়ের পর্ব্বত-সঙ্কুল প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে

কোনও সন্দেহ নাই। কুরু ও পঞ্চাল বংশীয়েরা এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহে এই ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ দুই বংশের বীরত্ব, বিদ্যাবত্তা ও সভ্য আচার নীতির ভুয়সী বর্ণনা রহিয়াছে।

শতদ্রু সীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে আর্য্যেরা পঞ্চালে বহু শতাব্দী অতিবাহিত করিয়া থাকিবেন। এই সময় মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি ও সামাজিক নীতির বিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়া থাকিবে। পঞ্চনদের আর্য্যেরা যেমন এদিকে স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেন, আবার ওদিকে শত্রুভাবাপন্ন দস্যুদিগকে শাসন করিতেন, কুরুপঞ্চালের বীরেরা সেইরূপ অবস্থা অতিক্রম করিয়া উঠিয়া ছিলেন, অনার্য্য দস্যুদের সঙ্গে অবিশ্রান্ত যুদ্ধের বিরাম হইয়াছিল। আচার পরিবর্ত্তিত ও সামাজিক নীতি সুমার্জ্জিত, বিদ্যাচর্চ্চা ও শিল্পশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল। রাজারা বিজ্ঞ ও সুবিদ্বান লোকদিগকে সভায় সমাদর, তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচন ও বহু আড়ম্বর সহ যজ্ঞ কার্য্য নির্ব্বাহ এবং বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য সহ সমর যাত্রা করিতেন। এতদ্ভিন্ন উপযুক্ত লোক কর্ত্তৃক রাজস্ব আদায় ও বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সংক্ষেপতঃ সভ্য সমাজে যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, এই সময়ে রাজারা তৎসমুদয় সুসম্পন্ন করিতেন। রাজবংশীয় ও রাজার আত্মীয় সকল ব্যক্তি এবং দেশের যোধব্যক্তি মাত্রেই বাল্যকাল হইতে ধনুর্ব্বিদ্যা, অশ্বারোহণ, রথচালনা শিক্ষা করিতেন এবং, পুরুষ পরম্পরাগত বেদ ও বেদাঙ্গ অভ্যাস করিতেন। পুরোহিতেরা যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের অনেক বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া একমাত্র বিদ্যাচর্চ্চায় জীবন যাপন করিতেন, এবং অপর সকলকে বিদ্যাশিক্ষা ও যজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্য করিতেন। অপরাপর লোকেরা নগরে ও গ্রামে বাস করিয়া গৃহাগ্নিতে নিত্য যজ্ঞ করিতেন ও স্বস্ব প্রবৃত্তি অনুসারে জীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের সন্তানেরা বাল্যকাল হইতে বেদ ও সামাজিক আচার নীতি ও যজ্ঞ প্রণালী শিক্ষা করিত। এই সকল সামাজিক নীতি ভবিষ্যৎকালে হিন্দুদের গৃহসূত্র ও ধর্ম্ম শাস্ত্র নাম ধারণ করে। সমাজে স্ত্রীলোকেরা যথোচিত সমাদর ও সম্মান প্রাপ্ত হইতেন; অবরোধ ও অবগুণ্ঠন প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না।

সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে ২ কোনও দেশে যুদ্ধাদি কাণ্ডের একেবারে বিরাম হয় না। কুরুপঞ্চাল ইতিহাসের মধ্যে তাঁহাদের যুদ্ধই প্রবল ঘটনা, এবং এই যুদ্ধই মহাভারতের কবিতার মুখ্য বিষয়। তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহাভারত কাব্য এক্ষণে যেরূপ পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত অবস্থায় দেখিতে পাই, তাহা হইতে প্রকৃত যুদ্ধের বিবরণ অতি অল্পই জানিতে পারা যায়।

প্রাচীন গ্রন্থ অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণ সমূহ হইতে জানা যায় যে, কুরু ও পঞ্চাল নামক দুইটী মহাবল পরাক্রান্ত জাতি অনেক দিন পরস্পরের মিত্রতায় বাস করিতে লাগিল। পরে কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগের মধ্যে একটী ঘোর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর জনমেজয় পরীক্ষিত দিগ্বিজয় করিয়া আপন রাজ্য স্থাপন করেন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা দোষের জন্য একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

এই মাত্র কথা বেদের ব্রাহ্মণ ও

উপনিষদে পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন গ্রন্থে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির নাম নাই, পাণ্ডব শব্দের উল্লেখ মাত্র নাই, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই, পঞ্চ ভ্রাতা এক নারীকে বিবাহ করেন, এরূপ জঘন্য গল্প নাই। কুরু পঞ্চালদিগের মধ্যে প্রকৃত যে যুদ্ধ হয়, তাহার বিবরণ আধুনিক মহাভারতে কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, পাঠকগণ এক্ষণে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। পঞ্চ পাণ্ডবের কথা বেদের ব্রাহ্মণে বা উপনিষদে নাই, এ কথাটী কবির কপোল রচিত মাত্র। ঋগ্বেদে "পঞ্চ জন" অর্থাৎ পাঁচটী মিত্রতাবদ্ধ জাতির কথা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে যে "পঞ্চাল" জাতির বিবরণ পাওয়া যায়, তাহারও অর্থ পাঁচ জাতি মিলিত হইয়া এক জাতি। আমার বোধ হয়, কবি কল্পনা বলেই পঞ্চ বা পঞ্চাল জাতি হইতে পঞ্চ বীর পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু সে পঞ্চ জাতির একই সেনা, একই ক্ষমতা, একই নীতি। অতএব কবি কল্পনা করিলেন, পঞ্চবীরের একই ঘরকন্না; একই নারী,—পাঞ্চালী। এ অনুমান প্রকৃত হউক, আর নাই হউক, আমরা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে যাহা দেখিতে পাই, তাহা হইতেই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, আধুনিক মহাভারতে যে যুদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায়, সেটী কুরু পঞ্চালদিগের প্রকৃত যুদ্ধের বিবরণ নহে। প্রকৃত জাতিদিগের ঘটনা ও বীরদের প্রকৃত নাম ও বংশ আধুনিক মহাভারত পাঠে কিছুই জানা যায় না। কিন্তু এত পরিবর্ত্তন ও বিকার সত্ত্বেও মহাভারত দ্বিতীয় যুগের আচার নীতি সভ্যতা বিষয়ক বর্ণনার অমূল্য আকর স্বরূপ। যুগে যুগে যে সকল কবিগণ নূতন কথা প্রবিষ্ট অথবা পুরাতন কথা পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বজাতির বা স্বীয় ধর্ম্মমতের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কুরুপঞ্চালদের প্রাচীন আচারনীতির জাজ্বল্যমান চিত্র বিকৃত করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং যুদ্ধের বিবরণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন সভ্যতা আচার ব্যবহারের যে সুন্দর বর্ণনা আছে, সেটী পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তিন সহস্রবৎসর পূর্ব্বে আর্য্যদের যে প্রকার ধর্ম্মনীতি, আচারনীতি ও যুদ্ধনীতি ছিল, যুবরাজেরা যে প্রকারে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন, কুরুবংশীয় কুলমাতা, কুলবধূ ও কুলকন্যারা যে প্রকার প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে আসিয়া স্ব২ সন্তান, স্বামী ও ভ্রাতার যুদ্ধনৈপুণ্য দর্শন করিতেন, মহাভারতে তাহার অতি পরিষ্কার বর্ণনা রহিয়াছে। কন্যারা যৌবনে পদার্পন করিয়া বিবাহ করিতেন। অসামান্যরূপ গুণসম্পন্না রাজকুমারীরা সমবেত শত শত রাজকুমারের মধ্যে মনোমত পাত্র স্বয়ং বরণ করিতেন। রাজাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই ঘটিত, কিন্তু এই সকল যুদ্ধকাণ্ডেও স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান, দুর্ব্বলের প্রতি দয়া প্রভৃতি বীরগুণ হইতে কেহই স্খলিত হইতেন না। বিজয়ী মহাপুরুষেরা অশ্বমেধ যজ্ঞের সূচনা করিয়া আর্য্য রাজ মাত্রকেই নিমন্ত্রণ করিতেন।

ফলতঃ জগতের মধ্যে অতুল্য এই মহাকাব্য পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, গাঙ্গ্য প্রদেশে যে হিন্দু জাতি প্রথম আসিয়া উপনিবেশ করেন, তাঁহাদের সাহস, শৌর্য্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ও অধ্যবসায় পঞ্চনদস্থ বৈদিক

যুগের হিন্দুদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। রাজারা এই যুগে বহু-বিস্তৃত ও বহুলোকাকীর্ণ ভূভাগ শাসন করিতেন; আচার নীতি অনেক পরিমার্জিত, আর্ত্তজনে দয়া প্রভৃতি বীরগুণের আদর, সামাজিক ধর্ম্ম নীতির প্রকর্ষ, এবং যুদ্ধ বিদ্যার প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু এত সভ্যতার উন্নতির মধ্যেও বৈদিক যুগে শত্রুনির্য্যাতনে যে অদম্য ও অনিবার্য্য স্পৃহা ছিল, এই যুগের বীরপুরুষদের মধ্যেও তাহা পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্ট হয়। সভ্যতার উন্নতি সত্ত্বেও জাতীয় উন্নতির মূল সাহস ও শৌর্য্যের কোন অংশে খর্ব্বতা হয় নাই। মহাভারতকে প্রক্ষিপ্ত রচনায় বিকৃত করিলেও যথার্থ জাতিভেদ প্রথা এই যুগে দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই, উহাতে তাহার অনেক জাজ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। শান্তনু রাজার এক ভ্রাতা দেবাপি ঋষি ছিলেন। যুধিষ্ঠির পণ্ডিতের অগ্রগণ্য, অথচ তিনি ক্ষত্রিয়। দ্রোণ যোদ্ধার অগ্রণীয় অথচ তিনি ব্রাহ্মণ। আর বেদ-সংগ্রহকার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস তিনি কি ব্রাহ্মণ, না তিনি ক্ষত্রিয় সন্তান?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদেহ, কোশল ও কাশী।

(খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১২০০ অব্দ হইতে ১০০০ অব্দ পর্য্যন্ত)

অপ্রতিহত গতিতে আর্য্যেরা দেশের পর দেশ অধিকার করিয়া গঙ্গা যমুনার দোয়াব খণ্ডে বসবাস করিতে লাগিলেন, এবং আর্য্য আচার ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচলিত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সাহসী ব্যক্তিরা দলে দলে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া তৎপূর্ব্ব-দেশে গমন এবং তথায় অধিনিবেশ স্থাপন করিলেন। অনেক নদ নদী পার হইলেন, ঘোর অরণ্য পরিষ্কার পূর্ব্বক তাহাকে বাস্তুভূমি ও কৃষিভূমিতে পরিণত করিয়া আর্য্য-মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এজন্য না জানি কত যুদ্ধ বিগ্রহই করিতে হইয়াছিল; কত রক্তপাতই হইয়াছিল, কত বীরত্বই প্রকাশ পাইয়াছিল। অবশেষে এই সকল হিন্দু উপনিবেশ, মহাসমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়া অযোধ্যায় কোশল, উত্তর বিহারে বিদেহ এবং বারাণসীতে কাশী বংশের উদয় হইল। সমকালীন ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে সমৃদ্ধিশালী অবস্থার এই কোশল, বিদেহ ও কাশীর বিবরণ দেখিতে পাই।

আর্য্যেরা যে এইরূপে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া দেশের পর দেশ জয় করিয়াছিলেন, তৎ সম্বন্ধে পুরাকালে অনেক কিম্বদন্তীও প্রচলিত ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নোক্ত পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। "১০। মাধব বিদেঘ বৈশ্বানর-অগ্নি মুখে ধারণ করিলেন। ঋষি গৌতম রাহুগণ তাঁহার কুলপুরোহিত। গৌতমের কথায় মাধব কোন উত্তর করিলেন না, পাছে অগ্নি মুখ হইতে নির্গত হইয়া পড়ে।

"১১। তথাপি তিনি উত্তর করিলেন না। পুরোহিত বলিলেন "তং ত্বাং ঘৃত স্নবীমহে চিত্রভানো স্বর্দৃশম্।" ঋগ্বেদ ৫।২৬।২।

এই ঋক্ আবৃত্তি শেষ না করিতেই ঘৃতের নাম শুনিবামাত্র বৈশ্বানর অগ্নিরাজার মুখ হইতে প্রজ্বলিত ভাবে বহির্গত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন, রাজা আর তাঁহাকে মুখে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না।

"১৪। তখন মাধব বিদেঘ সরস্বতী তীরে ছিলেন। অগ্নি তথা হইতে সমস্ত পদার্থ দাহ করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে চলিলেন, গৌতম রাহুগণ ও মাধব বিদেঘ তাঁহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পথে যত নদী পাইলেন, বৈশ্বানর তাহাদিগকে শোষণ করিলেন। অবশেষে উত্তর হিমাদ্রি-নিঃসৃত সদানার (গণ্ডক) তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাহাকে শোষণ করিলেন না। এজন্য পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা সদানীর অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিতেন না।

"১৫। কিন্তু এখন সদানীরের পূর্ব্বদিকে অনেক ব্রাহ্মণ অবস্থিত করিতেছেন। পূর্ব্বে সদানীরের পূর্ব্বদিকস্থ ভূমি সমূহ নিতান্ত আর্দ্রভূমি ছিল, তাহাতে কেহ কৃষি করিত না, কারণ বৈশ্বানর অগ্নি সেই দেশ স্পর্শ করেন নাই।

"১৬। কিন্তু এখন এ অঞ্চলে প্রচুর চাস বাস চলিতেছে, কারণ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ-অগ্নি এই দেশকে বিশুদ্ধ করিয়াছে। গ্রীষ্মাবসানেও এই নদীর মহা বিক্রম; ইহার জল অতি শীতল, কারণ বৈশ্বানর অগ্নি ইহাকে স্পর্শ করেন নাই।

"১৭। তখন মাধব-বিদেঘ অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি এখন কোথায় বাস করিব?" অগ্নি উত্তর করিলেন, এই নদীর পূর্ব্বদিকে বাস কর। এখনও এই নদী বিদেহ ও কোশলের সাধারণ সীমা। কারণ ইঁহারা মাধব্য অর্থাৎ মাধব বিদেঘের বংশ।" শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৪।১।

উদ্ধৃত অংশে উপন্যাসচ্ছলে আর্য্যদের সরস্বতী হইতে গণ্ডকী তীর পর্য্যন্ত পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া দেশসমূহ অধিকারের বিবরণ পাইতেছি। গণ্ডকী নদী উত্তর রাজ্যের সাধারণ সীমা। তাহার পশ্চিমে কোশল এবং পূর্ব্বে বিদেহ।

এই বিদেহ ক্রমশঃ প্রতাপ ও সভ্যতায় উন্নত হইয়া অবশেষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদ অধিকার করে। বিদেহের রাজা জনক অতি সুবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। শুধু তৎকালীয় আর্য্যভূমের পূর্ব্বপ্রান্তে সভ্যতা বিস্তার করিলেন, তাহা নহে; আবার আর্য্যভূমির মধ্যে তাঁহার রাজধানী বিদ্বন্মণ্ডলীর আশ্রয় স্থান হইল। তিনি তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন এবং পরব্রহ্ম বিষয়ক গভীর সত্যসকল তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। এজন্য রাজর্ষি জনক অধিনশ্বর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। কাশীর রাজা অজাতশত্রু নিজে মহা বিদ্বান ছিলেন; বিদ্বান ব্যক্তিদের যথেষ্ট আদরও করিতেন। তথাপি হতাশ হইয়া তিনি আক্ষেপ করিতেন "জনক আমাদের রাজা, এই বলিয়া সকলেই জনকের সভায় চলিয়া যাইতেছে।" বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২।১।১।

জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয়ী নামে একজন মহাপণ্ডিত পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যও জনকের সুখ্যাতির এক কারণ বটে। তিনি জনকের উৎসাহ ও পরামর্শানুসারে যজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগকে ব্যাখ্যা ভাগ হইতে ভিন্ন করিয়া শ্বেত যজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয়ী যজুর্ব্বেদ নামক এক নূতন যজুর্ব্বেদ সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন। এবং ব্যাখ্যাভাগকে শতপথ ব্রাহ্মণ নাম প্রদান করিলেন। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ এক পুরুষে সম্পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয়ী, ও বিদেহরাজ জনকই এই মহা গ্রন্থের সূত্রপাত করিয়া যান। রাজর্ষি জনককে আদর ও শ্রদ্ধা করিবার আরও গুরুতর কারণ রহিয়াছে। এসময়ে পুরোহিত সম্প্রদায় প্রতিদিন যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের বাহুল্যবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পুরোহিতদিগের ঈদৃশ দাম্ভিকতা ও পণ্ডিতম্মন্যতা ক্ষত্রিয়দের

অনেকটা অসহ্য হইয়া উঠিল। চিন্তাশীল, চরিত্রবান্ ও ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়গণ ভাবিতে লাগিলেন, এই সকল যজ্ঞক্রিয়া এবং ইহার কর্ম্মফল ব্যাখ্যাই কি ধর্ম্ম? এতদ্ভিন্ন কি আত্মার শুভাশুভ নাই, সদসৎ বিচার নাই? বিদ্বান ক্ষত্রিয়েরা পুরোহিতদের প্রবর্ত্তিত যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যাগ করিলেন না বটে, কিন্তু মানবাত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক প্রকৃত মঙ্গলকর বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষত্রিয়দের পরমাত্মা সম্বন্ধীয় বিচার এত সতেজ ও যুক্তিপূর্ণ যে, অহঙ্কারস্ফীত পুরোহিতেরাও আপনাদের হীনতা বুঝিতে পারিয়া পরব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে ক্ষত্রিয়দের নিকট উপস্থিত হইতেন। দ্বিতীয় যুগের শেষ ভাগে উপনিষৎ গ্রন্থ সমূহ রচিত হয়; এই সকল গ্রন্থ ক্ষত্রিয়দের পরব্রহ্ম বিচারে পরিপূর্ণ। এবং রাজর্ষি জনক এই পরব্রহ্ম জ্ঞান প্রচারের প্রবর্ত্তয়িতা, এইজন্য তিনি আর্য্যমাত্রেরই পূজনীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র।

বিদেহ-রাজ জনকের সহিত তিন জন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের নাম শ্বেতকেতু, আরুণেয়, সোমশুষ্ম সত্যযজ্ঞী ও যাজ্ঞবল্ক্য। রাজা ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি প্রকারে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিতে হয়?" ব্রাহ্মণেরা সাধ্যানুসারে উত্তর করিলেন, কিন্তু সদুত্তর হইল না। যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর অপর দুই ব্রাহ্মণের অপেক্ষা ভাল হইল বটে, তথাপি সম্পূর্ণরূপ শুদ্ধ হইল না। "আপনাদের উত্তর শুদ্ধ হয় নাই" এই কথা বলিয়া জনক রথারোহণে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণেরা বলিতে লাগিলেন, "এই রাজন্য ব্যাটা আমাদের অপমান করিল।" যাজ্ঞবল্ক্য রথারোহণ করিয়া জনকের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলেন, এবং কিরূপে অগ্নিহোত্র করিতে হয়, তাহা অবগত করাইলেন। (শতপথ ব্রাহ্মণ।১১।৪।৫)

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।৩) দেখা যায়, শ্বেতকেতু আরুণেয় পঞ্চালের সভায় আসিলে নৃপতি প্রবাহন জাবালি তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতু সদুত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া রহিলেন। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মনের দুঃখে পিতাকে বলিলেন "ঐ রাজন্য ব্যাটা আমাকে পাঁচটা প্রশ্ন করিল; আমি এক প্রশ্নেরও সদুত্তর করিতে পারিলাম না।" পিতা গৌতমও কোন সদুত্তর করিতে না পারিয়া প্রবাহন জাবালির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রবাহন বলিলেন "জাবালি, ইতঃপূর্ব্বে কোনও ব্রাহ্মণ এই বিদ্যা প্রাপ্ত হয় নাই; একমাত্র ক্ষত্রিয়েরা ইহার অধিকারী।" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে পঞ্চপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের অন্যত্র দেখা যাইতেছে যে, প্রবাহন দুই দাম্ভিক ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাক্ করিয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে পরব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিলেন।

শতপথব্রাহ্মণে (১০। ৬। ১। ১) এই গল্প আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৫। ২) ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। পাঁচলোক স্নাতক ব্রাহ্মণ "আত্মা কি, এবং পরমাত্মা কি" এই কথা জানিতে উপস্থিত হইলেন। উদ্দালক আরুণি এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় রাজা অশ্বপতি কৈকেয়ের নিকট লইয়া গেলেন। রাজা তাঁহাদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আমি যজ্ঞারম্ভ করিয়াছি। আপনারা যজ্ঞ সমাপন পর্য্যন্ত অপেক্ষা

করুন। আমার রাজ্যে চোর নাই, কৃপণ নাই, মাতাল নাই, যজ্ঞবেদী ভিন্ন গৃহী নাই, মূর্খ নাই, ব্যভিচারী নাই, ব্যভিচারিণী নাই। আমি এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছি। প্রত্যেক ঋত্বিককে যত দক্ষিণা দিব, আপনারা থাকিলে আপনাদিগকেও তত দক্ষিণা দিব।"

রাজার এই সমাদরে তাঁহারা তথায় রহিলেন, এবং আগমনের কারণ জ্ঞাপন করিলেন। অপর দিন প্রাতঃকালে শিষ্যের ন্যায় কাষ্ঠহস্তে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা আর কোন আড়ম্বর না করিয়া তাঁহাদিগকে পরব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিলেন।

উপনিষদ সমূহে একই ব্যক্তির নাম, এবং অনেক স্থলে একই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে, উপনিষদ সমূহ একই সময়ে রচিত হইয়াছে। কৌষিটকি উপনিষদে উদ্দালক আরুণি (গৌতম) এবং তৎপুত্র শ্বেতকেতু রাজা চিত্র গঙ্গায়নির নিকট কাষ্ঠহস্তে তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ যাজক হইয়া উপস্থিত। ক্ষত্রিয় চিত্র বলিলেন "আপনি ব্রাহ্মণগণের উপযুক্ত বটেন; যেহেতু আপনি অহঙ্কারে মোহিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভে বিমুখ হয়েন নাই। এখানে বসুন, আমি আপনাকে তত্ত্বকথা বলিতেছি।" কৌষিটকী ১। ১।)

কৌষিটকী উপনিষদে কাশীরাজ অজাতশত্রু ও মহাপণ্ডিত গার্গ্য বালাকির কথোপকথন রহিয়াছে। দাম্ভিক ব্রাহ্মণ রাজাকে ধর্ম্মালোচনায় আহ্বান করিলেন; অবশেষে নিজে পরাজিত হইয়া নীরব হইলেন। তখন অজাতশত্রু বলিলেন "হে বালাকি! আপনি এতদূর পর্য্যন্ত জানেন, ইহার অধিক আর কিছু জানেননা।" বালাকি বলিলেন, "হাঁ, আমার জ্ঞান এতদূর পর্য্যন্ত।" তখন অজাতশত্রু বলিলেন "আপনি বৃথা গর্ব্ব করিয়াছিলেন। আপনি ব্রাহ্মণ; আপনাকে কি আমি তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিব? হে বালাকি, আপনি যাঁহাদের নাম করিয়াছেন, যিনি তাঁহাদেরও স্রষ্টা, এই জগৎ যাঁহার সৃষ্ট, এক মাত্র সেই ব্রহ্মই তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য।" "তখন বালাকি কাষ্ঠহস্তে ক্ষত্রিয় সমীপে আসিয়া বলিলেন "আমাকে কি আপনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন?" অজাতশত্রু বলিলেন "ব্রাহ্মণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করা আমি উচিত মনে করি না। আমার নিকট বসুন, আমি তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছি।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই উপাখ্যান এবং শ্বেতকেতু আরুণেয় ও রাজা প্রবাহন জাবালির উপাখ্যান বিবৃত রহিয়াছে।

উপনিষদ্ সমূহে এই প্রকার অনেক উপাখ্যান রহিয়াছে। তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, ক্ষত্রিয়েরা তত্ত্বজ্ঞান চিন্তায় এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রাজন্যশ্রেণী এই দ্বিতীয় যুগে সমাজে অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞান এক নূতন জ্ঞান; "ব্রাহ্মণেরা কখনও পূর্ব্বে এই জ্ঞানলাভে অধিকারী হন নাই। ইহা শুধু ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।" এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারই বিদেহ রাজ জনককে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবার যথার্থ কারণ। আশ্চর্য্য কথা এই যে, ভারতবাসীগণ এ কথাটী বিস্মৃত হইয়া আর্য্যদের দাক্ষিণাত্য পরাজয় বিষয়ক এক উপাখ্যানে জনকের নাম সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

মহাভারতের ন্যায় রামায়ণও একটী প্রাচীন মহাকাব্য, কিন্তু আধুনিক মহাভারত যেরূপ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আধুনিক

রামায়ণও সেইরূপ হইয়াছে। এবং মহাভারতের নায়িকার ন্যায় রামায়ণের নায়িকাও কাল্পনিক।

লাঙ্গলে চাস করিলে যে রেখা থাকে তাহাকে সীতা বলে। এই সীতাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করা ঋগ্বেদের সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। আর্য্যেরা দাক্ষিণাত্যে অধিকার ও কৃষি বিস্তার করিলে এই সীতা অর্থাৎ লাঙ্গল রেখা দাক্ষিণাত্যে আনীত হইল। কবির কল্পনায় দেবী বা মানবী সীতা দাক্ষিণাত্যে জাত হইলেন! সে সীতাকে কাহার কন্যা বলিয়া বর্ণন করা যায়? কবি পুণ্যাত্মা রাজর্ষি জনককে সে সম্মান দান করিলেন।

ঐতিহাসিক ঘটনা নিদ্ধারণ বিষয়ে মহাভারতের ন্যায় রামায়ণ নিতান্ত কাল্পনিক হইলেও প্রাচীন কালের আচার ব্যবহার নিয়ম বিষয়ে মহাভারতের ন্যায় রামায়ণ অতি অমূল্য গ্রন্থ। রামায়ণ মহাভারতের অনেক পরে রচিত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাভারতের ন্যায় রামায়ণে আর ক্ষত্রিয়ের অগ্নিতুল্য-তেজঃ, এবং আত্মগৌরব-রক্ষা দৃষ্ট হয় না, ব্রাহ্মণজাতির প্রাদুর্ভাব রামায়ণ রচনা সময়ে বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রামায়ণে বিদ্যা, বুদ্ধি ও সম্ভ্রমে অতুলনীয় রাজর্ষি জনকও যেন ব্রাহ্মণদের অনুগত দাস মাত্র। ব্রাহ্মণ পরশুরামকে পরাজয় করিতে রামায়ণের নায়ক রামও তাঁহার প্রতি কত অনুনয় বিনয় প্রকাশ করিলেন। পরশুরাম-উপাখ্যানে গূঢ় ঐতিহাসিক সত্য রহিয়াছে। পরশুরাম সপ্তবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া অবশেষে রামহস্তে পরাজিত হন। ইহাতে বোধ হয়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে অনেক কাল বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। উপনিষদেও এই বিরোধের অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। ফলতঃ রামায়ণ পাঠে বোধ হয় যে, গঙ্গার কূলে বাস করিয়া জলবায়ুর দোষে ক্ষত্রিয়েরা ক্রমশঃ বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাভারতীয় ক্ষত্রিয়ের শূরোচিত ব্যবহার; ভীমের অগ্নিতুল্য ক্রোধ, অপমান-প্রতিশোধে দ্রৌপদীর অদম্য স্পৃহা, কর্ণের অহঙ্কার ও তেজ, ভীষ্মের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগ্রহ ও উৎসাহ---রামায়ণে এই সকল কিছুই নাই। নায়কেরা পুরোহিতদের নিতান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য, নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত আচার ব্যবহারের বড়ই পক্ষপাতী। রামায়ণে যুদ্ধ অনেক আছে; কিন্তু যোদ্ধারা যেন একান্ত নিয়মের বশীভূত হইয়াই যুদ্ধ করিতেছেন। যুদ্ধে তেমন উৎসাহ নাই, প্রাণপণ চেষ্টা নাই, ক্রন্দনই অধিক। মহাভারত ও রামায়ণ রচনা সময়ের মধ্যে লোকের চরিত্র অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ভদ্রতা, নিয়মের আনুগত্য, অর্থাৎ সভ্যতার অনেক উন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎ সঙ্গে সঙ্গে লোকের সাহস ও বীর্য্যেরও অনেক লাঘব হইয়াছিল। খ্রীষ্টের চতুর্দ্দশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী তেজস্বী ও চির-জয়শালী আর্য্যদের চরিত্র জানিতে হইলে মহাভারত এবং খ্রীষ্টীয় দশ শতাব্দী পূর্ব্বে গঙ্গাতীর নিবাসী পুরোহিতভক্ত ও সুসভ্য কোশল ও বিদেহের আর্য্যদের চরিত্র জানিতে হইলে রামায়ণ পাঠ করুন। দ্বিতীয় যুগের আরম্ভে ও শেষে হিন্দু চরিত্রে যে মহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, মহাভারত ও রামায়ণই তাহার প্রমাণ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

মধ্যাহ্ন সঙ্গীত।

একটি বন্ধুর সহিত অনেক দিন এক সঙ্গে বাস করিয়াছিলাম। লোকের যেরূপ স্বর থাকিলে গান গাহিতে পারে, বলা যায়, সে স্বর তাঁহার কণ্ঠে ছিল। অনেক প্রকার জাতীয় বিজাতীয় নাট্য পাঠ্য ও অপাঠ্য সঙ্গীত তাঁহার অভ্যস্থ ছিল। এক তন্ত্রী হইতে বহুতন্ত্রী পর্য্যন্ত, খোল হইতে ঢোল পর্য্যন্ত, এমন কোন যন্ত্র ছিলনা, যাহার সাক্ষাৎ পাইলে একবার তিনি করাঘাৎ না করিয়া ছাড়িতেন। এক সঙ্গে থাকিতাম বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক, আমি কখনও তাঁহাকে গান শুনাইতে অনুরোধ করি নাই। তবে তিনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া শুনাইতে ছাড়িতেন কি না, সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কখনও অনুরোধ করি নাই, তবে একদিন করিয়া-ছিলাম। একদিন, তখন চৈত্র মাসের দ্বিপ্রহর ; প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড পৃথিবীকে লণ্ড তণ্ড করিয়া তুলিয়াছিলেন ; পড়িতে পারা যায় না, ঘুম পায়, শুইয়া সুখ নাই, বিছানা বড় গরম ; কিন্তু তখনও সেই রৌদ্রে অশ্বত্থ বৃক্ষের ডালে বসিয়া, অনেক কিচির মিচির পরাভুত করিয়া বসন্তের প্রিয় পাখী, বিরহিনীর হৃদয় অপেক্ষাও অধিক উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে, কুহুরব ছড়াইতে-ছিলেন। শুনিয়াই আমার কবিতা লিখিতে ইচ্ছা গেল ; অনায়াসেই এক চরণ লিখিয়া ফেলিলাম :—"কি সুখে ডাকরে পাখী দুপুরের রোদে"। আর এক চরণ কিছুতেই মিলিল না। "রোদে"র সঙ্গে মেলে, অভিধানে এমন শব্দের অভাব অনুভব করা গেল। একটি পাইয়াছিলাম, সেটি "বোঁদে"; একবার ভাবিলাম লিখি, "থাম তুমি বাছা মোর খেতে দিব বোঁদে"। কিন্তু মনে মনে যে সকল কথা লিখিব বলিয়া বসিয়া-ছিলাম, তাহার একটিও নাকি প্রকাশ করা গেল না ; ফুল, পাখী, সমীরণ, জ্যোৎস্না-লোক, হাসি হাসি মুখখানি, এগুলির একটিকেও নাকি স্থান দিয়া উঠিতে পারি-লাম না ; সুতরাং সেই সুমিষ্ট বোঁদে মন্ন চরণের শরণ পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু আমার কবিতা-বাতালোড়িত হৃদয় কিছুতেই যেন আর থামেনা গোছ হইয়া উঠিল। দুর্ব্বুদ্ধি আমার, তাই কখনও যাহা সজ্ঞানে অজ্ঞানে শয়নে স্বপনে করি নাই, তাহা করিলাম। বন্ধু গম্ভীর ভাবে গাত্রের ঘর্ম্ম পুঁছিতে ছিলেন, আমি তাঁকে একটি গান গাহিতে বলিলাম। গান গাহিবার পরিবর্ত্তে তিনি আমার অনুরোধের যে উত্তর দিয়া-ছিলেন, আমরণ তাহা ভুলিব না। যদি তিনি সেই উত্তরটি তাঁহার সুকণ্ঠাভ্যন্তরে চাপিয়া রাখিয়া, তাঁহার বিবিধ বাদ্য যন্ত্র পীড়ণ জন্য কীণচক্র-গরিষ্ট শ্রীহস্তে, চপটাঘাত করিতেন, তবে আমার ক্ষোভ থাকিতনা ; বরং তাঁহাকে "বিদ্যালয়ের শিক্ষক হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতাম। বন্ধু আমাকে একটুখানি যেন বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন, "মধ্যাহ্নে সঙ্গীত হয় না"। মানুষ সকল ক্লেশ বহিতে পারে, কিন্তু যাহাতে তাহার আত্মাভিমানের ঘাড়ে হাত পড়ে, তাহা কিছুতেই সহিতে পারে না। সঙ্গীতে আমার স্বর নাই, সুতরাং কোন অভিমানও

নাই; কিন্তু গান গাহিতে পারিনা বলিয়া যে আমার ক্ষুদ্র একটি প্রশ্নে একরাশি ব্যাকরণ বা অলঙ্কারের ভুল থাকিবে, অথবা বুদ্ধি নামক সূক্ষ্ম পদার্থের অভাব বুঝা যাইবে, ইহা কি প্রাণে সহে?

ভাবিলাম, মধ্যাহ্নে কি সঙ্গীত হয় না? অরুণের তরুণ চ্ছটা, ঊষার কিশোর কান্তি, ও তদীয় চম্পক অঙ্গুলি স্পর্শোদ্দীপ্ত মেঘমালার স্নিগ্ধ শ্যামলাঙ্গ পরিশোভিনী রক্ত. রেখা, না থাকিলে কি কবিতা হয় না? সঙ্গীত ফোটে না? দিবসের শ্রান্তির অবসানে, বিশ্ব যদি অন্ধকারের গর্ভে এবার ডুবিয়া না যায়; যদি চন্দ্রালোক, অলসহৃদয়ে ক্লান্তিপূর্ণ সুসুপ্ত বিশ্বের মুখ চুম্বন না করে; তবে কি কণ্ঠস্বর, একটু ঘুরিয়া পেঁচিয়া, একটু অষ্ট বক্র হইয়া, পোঁ পোঁ ঘ্যান্ ঘ্যান্ সমভিব্যাহারে, শ্রোতার শ্রবণবিবর তাড়না করিতে পারে না? এবং সমিল বা অমিল চতুর্দ্দশটী অক্ষর সম্বলিত দু চারি খানি চরণ বিলম্বিত হয় না? শুনিয়াছি, প্রাচীন কুরসিকেরা সারঙ্গ গৌড়সারঙ্গ প্রভৃতিকে মধ্যাহ্নে স্থান দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কালের সুরসিকেরা, বিশেষ রূপে আমার বন্ধু তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতেছেন। কে সুরসিক, কে অরসিক, বুঝিতে পারিলাম না। যাঁহারা চৈত্র বৈশাখের রৌদ্রে, দরজা জানালা বন্ধ করিয়া, পাখার বাতাস সেবন করিতে করিতে, কর্ম্মময় পৃথিবীর বক্ষে নিস্তব্ধ হইয়া, একমাত্র নাসিকাটী সচেতন রাখেন, তাঁহারাই সুরসিক, না, যাঁহারা মধ্যাহ্নের প্রস্ফুট রূপে পূর্ণ যৌবনের শোভা সন্দর্শন করেন; রৌদ্রের অগ্নিময় তাপে প্রপীড়িত পরিশ্রান্ত তৃষিত স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিশ্বপ্রাণের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতে পান; এবং কোলাহলমগ্ন, অবিরত কর্ম্মনিরত, স্নেহসিক্ত মনুষ্যলোকে, জীবন, গৌরব ও উৎসাহের সঙ্গীত, সাকার, সচল, ও স্পর্শক্ষম দেখিতে পান, তাঁহারা সুরসিক?

একখানি বেত সম্মুখে পড়িয়াছিল: অন্যমনে সে খানি হাতে তুলিয়া, গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলাম। বেত্র যে বন্ধুপৃষ্টে পড়িয়া করুণ রসাত্মক সঙ্গীত উদ্গীরণ করাইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। তবে ঘরের ইটি সেটি, টেবিল খানি চেয়ার খানি, একটু ধীরে ধীরে নিপীড়িত হইতেছিল এইমাত্র। কিন্তু তাহাতে ঠক্ ঠক্ ঢ্যার্ ঢ্যার্ ভিন্ন অন্য কোন শ্রুতিমধুর শব্দ নিসৃত হয় নাই। সহসা বেত্রখানি অজ্ঞাতে একখানি মোটারকম পুস্তকের বাঁধামলাটে লাগিয়া, ঠক্ করিয়া উঠিল। অনুসন্ধানে দেখিলাম, সেখানি মেকলে সাহেবের প্রবন্ধ পুস্তক। এই দুপ্রহরের সময়, কি পাপে সেই মহাপুরুষের এই দণ্ড, ভাবিয়া পুস্তক উদ্ঘাটন করিলাম। প্রথমেই চোখে পড়িল "মিল্‌টন্"। দু চারি ছত্র পড়িয়াই ক্রোধ অধিক উদ্দীপ্ত হইল; যদি পুস্তক খানি নিজের না হইত, তবে উহাকে বেত্রাঘাতবিদারিত হৃদয় করিয়া ছাড়িতাম। দেখিলাম, মেকলে একজন মধ্যাহ্নসঙ্গীতবিরোধী। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীর যখন শৈশব ছিল, যখন মনুষ্য, সরল ও কুসংস্কার পূর্ণ নেত্রে জগচ্ছবি নিরীক্ষণ করিত, তখনই প্রকৃত কবিতা ফুটিতে পারিয়াছিল। আর, একালে সভ্যতার চাপে, বিজ্ঞানের তাপে, দর্শনের শাপে, কবিতা বিদায় লইতেছেন। যিনি প্রাচীন

ইতিহাসের গোটাকতক্ বাছা বাছা ঘটনা তুলিয়া, চতুর্দ্দশ অক্ষরের কারাগারে ফেলিয়া, কবি হইবেন বলিয়া সাধ করিয়াছিলেন; একথা তাঁহার উপযোগী বটে। শৈশব হউক, যৌবন হউক, বার্দ্ধক্য হউক, কোন্ অবস্থায় কবিত্ব নাই? যাহা হোমর্ ও বাল্মীকিতে ছিল, সেক্ষপীয়র ও কালিদাসে তাহার ক্ষয় দৃষ্ট হয় না; এবং গেটে· হিউগো, টেসিল্ হইট্‌ম্যান ও বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে তাহা অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে দেখিতে পাই। কবিতা কেবল "রাকাশশি শোভনা গত ঘনা" যামিনী লইয়াই ব্যস্ত নয়; অমাবস্যার দুর্দ্দিনেও চৈত্রের দুপ্রহরেও তিনি সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। সঙ্গীত কোকিলেও আছে, পেচকেও আছে; চন্দ্রে আছে, জোনাকিতেও আছে। বিধাতার মহিমা রচিত এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা কবিতা-শূন্য। নাটকের নায়ক কেবল পরম রূপবান্ গুণ-সম্পন্ন পুরুষই হইবেন, কে বলিল? যাহারা অন্ধ খঞ্জ, চপল পাপাসক্ত, তাহাদিগেরও অন্তরে কত দেবত্ব কত মহত্ব আছে, যাহার চক্ষু নাই, সে দেখিবে কি প্রকারে? তোমার সীতা হেলেন্ শকুন্তলা দেস্‌দিমোনা ও মার্গারেট একদিকে, আর ফ্যান্‌টাইন্, ইপোনাইন্, এলিস্, ভ্রমর, ও জেন্‌ইয়ারে আর এক দিকে। কুটিলাঙ্গ বলিয়া মন্থরা কুটীলা; কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রতিমা হইয়াও গুইনিভিয়র দুঃশীলা। সেকালে একালে এই স্থানে প্রভেদ।

পূর্ব্বে যাহা কবিতার অবিষয়ীভূতছিল, অথবা নীচ বলিয়া চক্ষে ঠেকিতনা, একালের দৃষ্টি সেই পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার মধ্য হইতে, রত্ন বাছিয়া বাহির করিতেছে। বালক কবি লিখিয়াছিলেন, A thing of beauty is ever; প্রাচীন কবি লিখিয়াছেন, The mind's internal heaven shall shed her dews of inspiration on humblest lay। কবিতা ফুরায় না। আধ আলো আধ ছায়ার কবিত্ব, প্রখর কিরণের কবিত্বকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। আর যদি আধ আলো আধ ছায়া লইয়াই কবিতা, তবে সে ছায়া কি দ্বিপ্রহরেও নাই? চক্ষু দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ঝলসিয়া যায়, সুতরাং তখন দূর দূরান্তর সেই অন্ধকারের ছায়ায়। দর্শন বিজ্ঞান অনেক প্রাচীন কুসংস্কার ভাঙ্গিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাচীন সংশয় এখনও দূর হইল না। ছায়া এখনও রহিয়াছে। দর্শন বিজ্ঞানে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, কিন্তু জগৎতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবন মরণের তত্ত্ব, চিরদিনই অন্ধকারে। শ্রেষ্ঠ কবিতা চিরদিনই জীবন রহস্য লইয়া, সুতরাং কবিতার উৎস অফুরন্ত।

অনেকে বলেন যে, চারি দিকে ব্যবসা বাণিজ্যের স্রোত, আমদানী রপ্তানী ও বোঝাই লইয়া পৃথিবী ব্যস্ত; রাত্রি দিন চাকার ঘড় ঘড় শব্দ; ইঞ্জিনের বংশীনিনাদে এ সভ্যতার বৃন্দাবনে প্রাণও গেল, কাণও গেল। এত টাকা পয়সার ঝঞ্চনানিতে কি কোকিলের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়? ইঞ্জিনের ধুঁয়ার গন্ধে মাথা পূর্ণ, মল্লিকাদির সুবাস পাইবার উপায় কি? আমি বলি যে, ফুল ও কোকিল লইয়া ত অনেক কবিতা হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি ছাড়িয়া এ কালের ব্যবসা বাণিজ্য কল কারখানা লইয়া কি কবিতা হয় না? আমার বন্ধু কখনও কখনও গাহিয়া থাকেন, এবং তাঁহার সেতারকে গাওয়াইয়া থাকেন,

"কি কল গড়েছে সাহেব কোম্পানি;" আমি সে গানের কথা বলিতেছি না। আমি যে কবিতার কথা বলিতেছি, তাহার কবি মার্কিন মহাত্মা হুইট্‌ম্যান্‌। হুইট্‌ম্যান্‌ই প্রকৃত পক্ষে মধ্যাহ্নের কবি। যে দুঃখে তোমার আমার রস শুকাইয়া যায়, সেই দুঃখে তাঁহার কবিত্বের প্রতিভা ফুটিয়া উঠে। তিনি সহরের রাস্তায় ঘাটে, বাজারে ও কর্ম্মক্ষেত্রে যে কোলাহল, তাহাকে লইয়াই কবিতা লিখিয়াছেন। এই কোলাহলের মধ্যে যে জীবন বিকশিত, এই নিরবধি পরিশ্রমের মধ্যে যে আনন্দ প্রকাশিত, তিনি তাহারই উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যে দিন ভারতবাসী এই সঙ্গীতের মাহাত্ম্য বুঝিবে, সেই দিন দুর্দ্দশার শেষ হইবে। সকলে মিলিয়া এই চৈত্র বৈশাখের রৌদ্রে, এই অধীনতার প্রখর সূর্য্যতলে, একবার কর্ম্মের মধ্যাহ্ন সঙ্গীত গাও। একবার 'গৌড় সারঙ্গ ধর। হে আমার সঙ্গীত অভিমানী বন্ধু, এ দুপ্রহরে ঘুমাইওনা; আমার এই প্রথম ও শেষ অনুরোধ রক্ষা কর; একবার মধ্যাহ্ন সঙ্গীত গাও।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম্ম।

যাঁহারা আর্য্যগৌরব এবং হিন্দুধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন, এবং স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রকৃত হিতৈষী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন, জাতীয় ধর্ম্মের গতি কোন্‌ দিকে এখন ধাবিত হইতেছে, ক্রমশঃ কিরূপ আকার ধারণ করিতেছে, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে বিচক্ষণতার সহিত তাঁহারা একবার আলোচনা করুন। বর্ত্তমান কার্য্যের ভবিষ্যৎ ফলাফলের জন্য যাহারা আপনাদিগকে দায়ী মনে করে না, যাহা কিছু আশু সুবিধাজনক, কেবল তাহার দিকেই দৃষ্টি করিয়া চলে, এবং তাহাকেই ধর্ম্ম বলে, তাহাদের নিকট এ বিষয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তরের প্রত্যাশা নাই। শিক্ষিত চিন্তাশীল এবং হিন্দুসমাজের প্রধান নেতা যাঁহারা, তাঁহাদিগকে আমি এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই। কি তাঁহারা ভাবেন, এবং কিইবা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন?

কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রথমেই একটা নিরাশের ভাব আসিয়া মনে উদয় হয়। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য দায়ী কাহারা? ইহার নেতৃত্ব পদে কোন্‌ কোন্‌ মহাত্মাকে বরণ করা যাইতে পারে? প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন উপযুক্ত ব্যক্তি বা দল আমরা দেখিতে পাই না। সুতরাং হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। যে বিষয়ের জন্য কাহারো দায়িত্ব বোধ নাই, ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের জন্য ভাবনা নাই, তাহার মীমাংসা চেষ্টা কেবল অরণ্যে ক্রন্দন। যাই হউক, আপাততঃ যাঁহাদিগকে নেতার পদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়, সাধারণ হিন্দুসমাজ যাঁহাদিগের মুখের পানে চাহিয়া আছে, তাঁহাদিগকেই আমরা নির্ব্বাচন করিয়া লইলাম। ইহাঁদিগকে দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করিয়া বিষয়টী আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন,

কর্ম্মকাণ্ডের বিধি ব্যবস্থা দেন, তত্ত্বচিন্তায় যাঁহারা বিখ্যাত এবং ধর্ম্মবিষয়ক মতামত লইয়া আজ কাল আন্দোলন করিয়া থাকেন এবং বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করেন, তাঁহাদিগকেই আমি লক্ষ্যস্থলে রাখিলাম। প্রথমতঃ বঙ্গদেশের মধ্যে নবদ্বীপ ভাটপাড়া পূর্ব্বস্থলী বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের কতিপয় অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য। তাহার পরেই যদি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন, পণ্ডিত শশধর, কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মদন গোপাল গোস্বামী প্রভৃতি হরিসভার প্রচারকদিগকে স্থাপন করা যায় (টোলধারী অধ্যাপক মহাশয়েরা এটা কত দূর পছন্দ করিবেন, জানি না) ভরসা করি, তাহা অন্যায় হইবে না। আর এক শ্রেণীর শিক্ষিত মার্জ্জিতবুদ্ধি বহুদর্শী লোক আছেন, যাঁহারা হিন্দু নামেই বিখ্যাত, কিন্তু উদার মতাবলম্বী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি। এই দলের প্রধান মধ্যে মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা গণ্য করিতে পারি। ইহা ব্যতীত অনেক সন্ন্যাসী সাধু ভক্ত মহান্ত নানা স্থানে থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সমাজের জন্য দায়ী নহেন, ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে, তাহা তাঁদের ভাবিবারও প্রয়োজন হয় না।

হিন্দুধর্ম্ম এক বিস্তীর্ণ মহাসাগর বিশেষ। ইহার ভিতর অদ্বৈতবাদী জ্ঞানী বৈদান্তিক, ব্রহ্মবাদী ও নৈষদিক যোগী, প্রতিমাপূজক কর্ম্মী, অশিক্ষিত নরনারী এবং লীলারসপিপাসু পৌরাণিক অবতারমতাবলম্বী ভক্ত, সকলেরই স্থান আছে। কুসংস্কারান্ধ অজ্ঞানদিগের জন্য অনেক অলৌকিক গল্প উপন্যাস, অদ্ভুত ঘটনা চাও, তাহাও পাইবে। যাহার যাহাতে ইচ্ছা, তিনি সেই ভাবে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন। ভক্তি অনুরাগ থাকিলে এখানে শাস্ত্র বা সাধনপ্রণালীর জন্য কাহাকেও কষ্ট পাইতে হয় না। যদি তোমার বিশুদ্ধ জ্ঞান সংস্কার জন্মিয়া থাকে, প্রাণায়াম ধ্যান যোগ বৈরাগ্য সমাধি লইয়া থাক; কাণে মন্ত্র দিবার জন্য বা কর্ম্মকাণ্ডের জন্য গুরু পুরোহিতেরা তোমাকে পীড়াপীড়ি করিবেন না; তবে এ সকলকে তুমি ঘৃণা করিতে পারিবে না, তদ্বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারিবে না। প্রচলিত সামাজিক প্রথা, ধর্ম্মকর্ম্ম এবং জাতিভেদ বজায় রাখিয়া আপনাকে হিন্দু স্বীকার করিয়া হিন্দুপরিবারমধ্যেই তুমি অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া থাকিতে পার। তোমার আন্তরিক মত বিশ্বাস, সাধন ভজন যাহাই হউক, সে জন্য কেহ কিছু বলিবে না। প্রকাশ্যে ধর্ম্ম নীতির নাম দিয়া আধুনিক হিন্দুরীতি পদ্ধতি না ভাঙ্গিলেই হইল। এ বিষয়ে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ বড়ই উদার। উকিল শাস্ত্রকারগণও শাস্ত্রীয় বিধি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া খাটাইয়া দিতে পারেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা প্রতিদিন ঘরে ঘরে ঘটিতেছে, তাহাই আমি বলিব, কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের নিন্দা গ্লানি উদ্দেশ্য নহে। কত সহজে এখন হিন্দুনাম রক্ষা করা যায়, তাহা সকলে স্বচক্ষে দেখিতেছেন, বলা বাহুল্য। এই সহজ উপায়ে সমাজবন্ধন এখনো কতকটা হিন্দু ভাবে রক্ষা পাইতেছে; অন্যান্য সুবিধাও ইহাতে যথেষ্ট আছে; এখন কাহাকে কোন ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না; বরং যাহাতে কোনরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে না হয়, সেই জন্যই এই সহজ পথ অবলম্বিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ জাতি জ্ঞাতি কুটুম্ব-

দিগের ইহাতে সহানুভূতি আছে। কেনই বা থাকিবে না? সকলেরই এক দিন বিপদ আপদ ঘটিতে পারে। ঘরে ঘরে অহিন্দু ব্যবহার চলিতেছে। যাঁহারা প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক, সমাজের অভিভাবক, তাঁহাদেরও ইহাতে অনুমোদন আছে। কারণ, তাঁহারা কালের গতি দেখিয়া কেহ আর শাসন করিতে সাহসী হন না। তদ্ব্যতীত অনেক অভিভাবক উদার শিক্ষিত, কুসংস্কারবর্জ্জিত, বৈদেশিক বিদ্যা সভ্যতায় আলোকিত। তাঁহারা যাহা নিজে মানেন না, বিশ্বাস করেন না, তাহা অন্যের উপর কেমন করিয়া চাপাইবেন? তদনন্তর শাস্ত্রী অধ্যাপক পণ্ডিত এবং গুরু পুরোহিতের দল। ইহাঁদের এখন ধর্ম্মের তেজ নাই, বড় বড় বাবুদের মন যোগাইয়া ইহাঁদিগকে শাস্ত্রীয় বিধি সকল সঙ্কোচ কিম্বা প্রসার করিয়া লইতে হয়। উভয়ের মধ্যে বেশ এক প্রকার সন্ধি বন্ধন আছে। স্ত্রী জাতি একটু গোলমাল করে। কারণ, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ভ্রান্তি বা কুসংস্কার যাহাই হউক, তাহাতে শ্রদ্ধা এবং ভয় ভক্তি প্রকাশ পায়। অন্ততঃ সাংসারিক অমঙ্গলের জন্য তাঁহারা দেবতা গোসাঞী মানে। কিন্তু পুরুষদিগকে সে জন্য তাহারা কোন বিষয়ে বাধ্য করিতে আর চায় না। যদি কিছু খুঁৎ মুৎ করে, একটা ধমক দিলেই চুপ করিয়া থাকে। ফলতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত ও ব্যবহার আচরণের আজ কাল তত আঁটা-আটি নাই। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে এবং রাজকার্য্যে কি শুভক্ষণেই যে ধর্ম্মনিরপেক্ষতা মত প্রচার করিয়াছিলেন, এখন কলেজ স্কুলে সমাজে পরিবারে বিবাহে সভা সমিতিতে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মনিরপেক্ষতা দৃষ্ট হয়। এমন কি, ধর্ম্মকর্ম্মেও এই ধর্ম্মনিরপেক্ষতা দেখা গিয়া থাকে।

এইরূপ উদারতা, সহিষ্ণুতা এবং নিরপেক্ষতা একদিকে বেশ সুবিধার বটে। লোকের জাত্যভিমান ও কুলগৌরবও রক্ষা পাইতেছে, বিদেশের বিলাস সভ্যতার সহিত দেশের এবং জাতীয় সুখ সুবিধার সমন্বয়ও হইয়াছে। সামাজিক সুখ শান্তিতে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এ সমস্তই স্বীকার করা গেল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম টুকু কোথায় রহিল? হিন্দুর ধর্ম্ম কি কেবল একটা সামাজিক প্রথা মাত্র? আর্য্য জাতির মহত্ত্ব গৌরব কি এই স্বেচ্ছাচারিতা এবং সাংসারিক সুবিধার উপর পুনঃ স্থাপিত হইবে? যোগ বৈরাগ্য বিশ্বাস ভক্তি ব্রতনিষ্ঠা সদাচার ব্রহ্মধ্যান কি তবে কবিকল্পনা?

কেহ হয়তো বলিতে পারেন, "কেন, যাঁহার ইচ্ছা ইহার ভিতর থাকিয়া তিনি আশ্রমধর্ম্ম সমস্তই পালন করিতে পারেন; তাহাতে বাধা কিছুই নাই। যে ধর্ম্ম করিবে, সে কি আর কোন প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য করে?" করে না সত্য, কিন্তু গুরু গোস্বামী, আচার্য্য নেতৃগণ যদি দৃষ্টান্ত না দেখান, কে সেই উচ্চ হিন্দুধর্ম্ম সাধন করিবে? এখন কেবল সুবিধাটাই আগে দেখা হয়। বিলাতফেরত বাঙ্গালী সাহেবকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, ইয়ংবেঙ্গল স্বেচ্ছাচারী, সন্ধ্যা পূজাবিহীন হিন্দুসন্তানকে কিরূপে দলে পুরিয়া রাখা যায়, এই ভাবনাটাই বেশী। আর্য্যগণের পবিত্র ধর্ম্মভাব, সদাচার, ইষ্টনিষ্ঠা থাক্ আর যাক্, সে বিষয়ে কাহারো ভাবনা চিন্তা নাই। ইহার পরিণাম কি ভয়ানক, তাহা দিব্যচক্ষে দেখা যাইতেছে। বেশী বিলম্ব হবে না, অর্দ্ধশতাব্দী

পরে হিন্দু সমাজ কিরূপ মূর্ত্তি ধরিবে, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখুন। বর্ত্তমানে তাহার নমুনা দেখুন।

মনে কর, যে কয়জন সরল হৃদয় প্রকৃত বিশ্বাসী বিজ্ঞ প্রাচীন প্রাচীনা এ যুগে জীবিত আছেন, (কয় জন খাঁটি হিন্দু সাধক আছেন, জানি না) তাঁহারা পরলোকে চলিয়া গেলেন। পরে যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা বিলাতফেরত, অবশিষ্ট ইয়ংবেঙ্গল্ নেটিভসাহেব, তার সঙ্গে কতিপয় অৰ্দ্ধশিক্ষিত হাপহিন্দু। স্ত্রী জাতির মধ্যে ধর্ম্মানুরাগ যে কিঞ্চিৎ ছিল, তাহা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। নব্যশ্রেণীর হিন্দুসমাজপতিগণ দেশী বিদেশী শাস্ত্রযুক্তি এবং আপনাদের অহিন্দু ব্যবহার ও বিশ্বাসহীনতার দৃষ্টান্তে আর পঞ্চাশ বৎসর পরে একবারে এই সমাজটীকে ভরাডুবি করিয়া তুলিবেন। যদি বল, চারি হাজার বৎসরের ধর্ম্ম, যাহা জাতীয় শোণিতের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তাহাকে কি কেহ একবারে ভরাডুবি করিতে পারিবে? আমি বলি, করিয়া তুলিল, আবার পারাপারি কি! দিন কতক অপেক্ষা কর না, শেষজীবনে স্বচক্ষে দেখিয়া যাইবে। গোটাকতক বড় বড় যোগী ঋষি, মহাপুরুষ সে কালে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুণ্যের বলে এত কাল চলিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ববংশে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী এক এক দল সাধক সেই স্রোত বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন আর সে স্রোত চলিবে না। চালাবে কে? আধুনিক হরিসভা আর্য্যসভার বক্তাগণের কর্ম্ম নয়। তেজস্বী তপোধন ব্রাহ্মণদিগের সে পুরাতন পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা করা ভাড়াটীয়া কিম্বা ভেকধারী লোকের কর্ম্ম নয়। ইহারা যত উদার নিরপেক্ষ হইবে, বিনাশের কাজ তত শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইবে। যত কপটতা অবিশ্বাস স্লেচ্ছাচার মিথ্যা আড়ম্বর পেয়াদারি ধর্ম্মগোল জঞ্জাল ইহার মধ্যে ঢোকাবে, ধর্ম্মের নামে অসাত্ত্বিকতার প্রশ্রয় দিবে, ততই বিপদ নিকটবর্ত্তী। অনেক ধনী জ্ঞানী একসঙ্গে দলবাঁধিয়া ইহা করিতেছে, বলিয়া মনে করিও না যে নিরাপদ। অভিপ্রায় সম্পূর্ণ নীচ এবং নূতন হইয়া গিয়াছে। যদি তোমাদের জয়লাভ হয়, তবে সে জয় ধর্ম্মনাশের পক্ষে হইবে।

ধর্ম্মসমাজে লোকসংখ্যা অধিক হইলে, তাহাতে কতকটা অনাচার পাপ প্রবেশ করে, ইহা সত্য, কিন্তু পক্ষান্তরে তাহা সংশোধনের জন্য যদি সাধুজীবন বিশ্বাসী চরিত্র থাকে, তবে রোগ ক্রমে সারিয়া যায়। এখন পাপের দিকেই গতি কি প্রবল নহে? সংশোধক উপযুক্ত ধর্ম্মবল কি নিতান্ত অল্প নহে? দেশব্যাপী এ মহারোগ, কে নিবারণ করিবে? কোন রকমে চাপাচুপি দিয়া আপনাপন কাজ সারিয়া চলিয়া যাইব, তার পর যা হয় হইবে; এই বলিয়া অনেকে নিশ্চিন্ত মনে হাস্যামোদ করিতেছেন। কোন প্রকার সংস্কারের কথা শুনিলে তৎপ্রতি তাঁহারা উপহাস করিবেন, আর যাহা স্পষ্ট দেখিতেছেন, অন্তঃসারবিহীন তাহারই গুণ গাইবেন। কিন্তু যে কার্য্যের যে ফল, তাহা নিশ্চয়ই ফলিবে। এই ভীষণ স্রোতের মুখে মানুষ কিছু করিতে পারে না বটে, কিন্তু যাহা সত্য তৎপ্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। অসার মিথ্যা অবাস্তবিক বাহ্য তাহা সমর্থন করা কেবল ভস্মে ঘৃতাহুতি দেওয়া।

যাহারা সমাজপরিচালক জ্ঞানী ধার্ম্মিক, তাঁহারা যদি এই স্রোত ফিরাইবার চেষ্টা না করেন, অন্ততঃ দুইটা কথাও না বলেন, তাহা হইলে তাঁরা কেবল নামমাত্র নেতা। হায় হিন্দুসমাজ এখন পিতৃ মাতৃহীন! কাহার নিকট এখন সে কাঁদিবে?

ভূভারহারী ভগবান্ ইহার প্রতিবিধান করিবেন। ধ্বংসের কার্য্য শেষ হইলে, পুনর্গঠন আরম্ভ হইবে। এই প্রচলিত গলিত পূতিগন্ধময় পচনোন্মুখ বিকৃত হিন্দুধর্ম্ম অগ্রে পচিয়া যাইবে, পরে তাহাতে সার জন্মিবে, সেই সার হইতে পুনরায় নব হিন্দুধর্ম্ম মহাধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া জগতে বিস্তার হইবে।

ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম্মের আকার কিরূপ হইবে? প্রাচীন যোগী ঋষিরা নববেশে পুনরুত্থান্ করিবেন। শাস্ত্র এক রকম, জীবন অন্য রকম, ইহা বেশী দিন থাকিতে পারিবে না। শাস্ত্রও বদল হইবে, ব্যবহারও বদল হইবে। আহারাদিতে এত বিচার আচার জাতিভেদ বিষয়ী জীবগণের পক্ষে খাটিবে না। যাহা মুখরোচক, স্বাস্থ্যকর, তাহা সকলে নিশ্চয়ই খাইবে, কিন্তু এখনকার মত লুকাইয়া খাবে না। যবন ও ম্লেচ্ছের সমস্ত আহার্য্য যার তার হাতে যখন তখন যেখানে সেখানে হিন্দুরা খাইবে, কিছুতেই ছাড়িবে না। ঘরে যদি তাড়া পায়, আস্তাবোলে গিয়া খাইবে। যেমন কলের জল, রেলের গাড়ী, তেমনি ঐ সকল খাদ্য। পরিধান বিষয়েও ঐরূপ। উপবাস করিয়া শুকাইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম কেহ করিতে পারিবে না। দুই একজন সাধক গোছের লোকছাড়া সকলেই আগে পেটের জ্বালা নিবারণ করিয়া তার পর পূজা আহ্নিক করিবে। ইহার অনুরূপ শাস্ত্র চাই। যদি না দাও, মতে কাজে চিরকাল বিবাদ চলিবে।

যাহাদের ধর্ম্মানুরাগ আছে, অথচ যাহারা শিক্ষিত, তাহারা খড় দড়ি বাঁশ মাটী কাঠ পাথরকে পূজা করিবে না, এক জ্ঞানময় তুরীয় ব্রহ্মের যোগসাধন করিবে। তাহাদের নীচে যারা, তারা নানাবিধ বাহ্য উপকরণের সাহায্যে—যে প্রাণকে প্রতিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাঁহাকেই পরমপুরুষ পিতা মাতা সখাজ্ঞানে পূজা করিবে। তার পর আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা জড় এবং নরপূজা করিতে ছাড়িবে না। ইহার জন্য পুতুলপূজা প্রণালী স্থাপনের আবশ্যকতা নাই। আদিম মানবেরা যেমন প্রকৃতির পূজা করিয়াছিল, কাহারো কাছে শিক্ষা পায় নাই, জনসাধারণ আপনিই তাহা করিবে। কালী দুর্গা কার্ত্তিক গণেশ রাম কৃষ্ণ শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতীর মূর্ত্তি চিত্রশালিকা এবং বড় বড় ড্রয়িংরুমে থাকিবে। মা বাপের শ্রাদ্ধে সপিণ্ডকরণে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া পুরোহিতের ধমক খাইয়া রাশি রাশি পিণ্ড কেহ দিবে না, কিন্তু আন্তরিক ভক্তির সহিত শ্রাদ্ধ করিবে। মঙ্গলানুষ্ঠানে পারিবারিক বড় বড় কাজে শালগ্রাম লইয়া টাঁনা টানি করিবে না। সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে ধন্যবাদ দিবে, ভক্তি বিশ্বাসের সহিত তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। যে সময়ের চিত্র আমি অঙ্কিত করিতেছি, তখন শালগ্রামশিলা অনেক বাবুরা পেপারওয়েট হিসাবে ব্যবহার করিবেন। যজ্ঞোপবীত থাকা না থাকা সমান হইবে। ধর্ম্মার্থিরা পানভোজন ইত্যাদি দেহযাত্রা নির্ব্বাহ সম্বন্ধে সদাচারী অথচ

আড়ম্বরবিহীন হইবেন। আর্য্যের পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও সরলতা তাঁহাদের লক্ষণ হইবে।

স্ত্রীসমাজে এখনকার মত কুসংস্কার অন্ধ-বিশ্বাসের আদর থাকিবে না। বিধবা-দিগকে বলপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য কেহ করাইতে পারিবে না। যাহারা করিবে, তাহারা বালাবিধবা হইলেও করিবে। পুরুষেরা ভয় দেখাইয়া ধমক দিয়া উহাদিগকে ধর্ম্ম কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা যদি ভাল সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, তবে তাহারা বশীভূত থাকিবে। শাস্ত্র এক রকম কাজ তার বিপরীত, মুখে বলিবে এক প্রকার, কাজে অন্য প্রকার, এত মিথ্যা ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম্মে চলিবে না। যথেচ্ছাচারী কপট ধর্ম্মধ্বজী পেসাদার গুরু পুরোহিত বক্তা বা শাস্ত্রী হইতে যদি কারো ইচ্ছা হয়, তবে হিন্দু নামটী তাঁহাকে ছাড়িতে হইবে। ইহাদিগের ললাটে "অনার্য্য শূদ্র" এইনাম ছাপ মারিয়া স্বতন্ত্র পল্লীতে রাখা হইবে। আর্য্য ঋষিদিগের অমরাত্মা পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া ইহা-দিগকে তফাত করিয়া দিবেন। ধার্ম্মিক চণ্ডালকেও তাঁহারা দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি করিবেন, আবার অধার্ম্মিক মূর্খ জন্মগত ব্রাহ্মণ জাতিকেও শূদ্রের পদতলে বসাইবেন। বড় ভয়ানক বিচারের দিন সম্মুখে আসিতেছে, সাবধান! যাহারা হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ায়, অথচ সন্ধ্যা গায়ত্রীর অর্থ জানে না; যে সকল শূদ্রজাতীয় অব্রাহ্মণ বেওয়ারিশি প্রাচীন শাস্ত্রীয় কথা ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দেয়, সেই সকল ব্যক্তিকে ব্রহ্মকোপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। আগুন লইয়া খেলা! কি ভয়ানক সাহসিকতা! পবিত্র সনাতন ঋষিধর্ম্মের এত অবমাননা কে সহ্য করিতে পারে? জীবিকা সাধনের জন্য সনাতন ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করার তুল্য মহাপাপ আর নাই। হিন্দু নাম লইয়া হিন্দুধর্ম্ম লোপ করা কি ভয়ানক! হে আর্য্যকুলাঙ্গার, এই কি তোমার পিতৃভক্তি, স্বদেশানুরাগ! ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইয়া ছদ্মবেশে পবিত্র আর্য্যধর্ম্ম নাশ করিতে বসিয়াছ? বর্ত্ত-মানের অবশ্যম্ভাবী ফল ভবিষ্যতে এইরূপ হইবে কি না, উপরোক্ত ধীমান বিচক্ষণ সারগ্রাহী সমাজপতিগণ বিচার করিয়া দেখুন। যেমন কর্ম্ম তদনুরূপ কার্য্যফল, ইহা বিধিনির্ব্বন্ধ, কেহই খণ্ডন করিতে পারিবেন না। সত্য আপনি আপনার প্রতিশোধ লইবে।

শ্রীঋষিকুমার দেবশর্ম্মা।

মেঘদূত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১১

"জনমে তব যে মৃদু গরজনে
শিলীন্ধ্র, সূচিয়া অবন্ধ্যা পৃথ্বী,
শুনিয়া তাহায় মানস-গমনে
হইবে উৎসুক মরাল পাঁতি;
ছিঁড়িয়া মৃণাল-মৃদু-কিশলয়ে
লইবে পাথেয় আকাশ-পথে,
উড়িবে ঘেরিয়া সুসহায় হয়ে
কৈলাস অবধি তোমার সাথে।

১২

"গমন সময়ে তোষ আলিঙ্গনে
তুঙ্গ ঐ গিরি * সুষমাধার,
যোগীন্দ্র-বাঞ্ছিত রাঘব-চরণে
অঙ্কিত পবিত্র মেথলা যার ;
প্রিয়সথা তব ঐ গিরিবর,
প্রাবৃটে মিলন বরষ পরে,
চির-অদর্শনে ব্যাকুল অন্তর,
তাই স্নেহে তার নয়ন ঝরে !

১৩

"কহি শুন, আগে, যাইবে যে পথে
এথান হইতে অলকা-পুরী,
বারতা আমার কহিব পশ্চাতে,
শুনিও যতনে শ্রবণ ভরি ;
পথশ্রমে ক্লান্ত হ'লে, জলধর,
লভিও বিশ্রাম শিথরি-শিরে,
গমনের ক্লেশে ক্ষীণ-কলেবর
হলে, পিও লঘু ঝরিণী-নীরে।

১৪

"উত্তর-মুখেতে আরোহি গগন
সরস-নিচুল এথান হতে,
যাও, দিগ্‌গজের করিয়া হরণ
স্থূল-শুণ্ড-গর্ব্ব বিমান-পথে ;
গিরিশৃঙ্গ কিবা উড়িছে পবনে ?'—
ভাবিয়া মনেতে বিস্ময়ে ভুলি,
মুগ্ধসিদ্ধ নারী চকিত-নয়নে
হেরিবে তোমায় বদন তুলি।

১৫

"রত্ন-রাজি-কান্তি-সুচারু-মিশ্রণ
ওই যে ভাতিছে বাসব-ধনুঃ,
বল্মীক-অগ্রেতে, নয়ন-রঞ্জন,
সাজায়ে তোমায় সুশ্যাম তনু,—
মরি, কি অতুল সুষমা তাহায়,
উজল ময়ূর-পুচ্ছেতে যথা
সাজাইয়া চূড়া শোভে শ্যামরায়,
রাথালের বেশ, রাথাল প্রথা !

১৬

"জানি কৃষি-ফল অধীন তোমারি,
সরল-নয়নে হরষ-ভরা
নেহারিবে তোমা জনপদ-নারী,—
ভুরুর বিলাস জানে না তারা !
সুরভিত-ভূমি সদ্য করষণে
উঠি মালক্ষেত্রে, বরষ তায় ;
উত্তরেতে পরে ত্বরিত-গমনে
যাও পুনঃ, হয়ে সুলঘু-কায়।

১৭

"তব জলধারে শান্ত-দাবানল
আম্রকূটগিরি যতন করি
পথশ্রমে তব শরীর বিকল
রাথিবে নিশ্চয় মাথায় ধরি ;
ক্ষুদ্রও বিমুথ না হয় সর্ব্বথা,
পূর্ব্ব উপকার জাগায়ে বুকে,
স্থান দিতে মিত্রে,—তার কিবা কথা
যার উচ্চশির গগনে ঠেকে ?

১৮

"সহকার-বনে ঢাকা গিরিবর,
পরিণত ফলে উজল-কায়,
চিকুর-চিকণ তুমি শিরোপর,—
অপরূপ শোভা হইবে তায় !
বিমান-বিহারী জনিত-মদন
দেথাবে অমর-মিথুন চোকে
যেন নীল-শেষ কনক-বরণ
উঠিয়াছে স্তন ধরণী-বুকে !

১৯

"বনচরবধূ-বিলাস-কাননে
লভিয়া বিশ্রাম ক্ষণেক তরে,—
লঘুকায় এবে আসার-বর্ষণে,—
যাও ছাড়ি গিরি, বেগের ভরে ;

* চিত্রকূট পর্ব্বত।

যাও, যথা রেবা লীলার বিভঙ্গে
বিন্ধ্যপাদমূলে ঢালিছে কায়,
রহিয়াছে যেন কুঞ্জরের অঙ্গে
বিভূতির রেখা-রচনা প্রায়।

২০

"তিক্ত গজমদে বাসিত সে নীর,
জম্বু-কুঞ্জে তার রোধিছে টান,
বমনে হয়েছ স্থূলঘু-শরীর,
পান করি তায় কর প্রয়াণ;
বায়ু না পারিবে আঁটিতে তোমারে
অন্তঃসার তুমি হইলে পরে,
পূর্ণের গৌরব জগত মাঝারে,
অনাদৃত রিক্ত লাঘব-তরে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সাঁওতালের বিবাহ প্রণালী।

বিবাহ পদ্ধতির প্রকৃষ্ঠতা অনুসারে জাতীয় সভ্যতার নির্ণয় হয়। এজন্য সাঁওতালের বিবাহ প্রণালী যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

এখন সাঁওতালের নিজের রাজা নাই। বিদেশীয় রাজার শাসনে সাঁওতালের সমাজ প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্বে সাঁওতালের বিষয় কর্ম্ম চালাইবার জন্য গ্রামে একটী মোড়ল থাকিত এবং একজন তাহার সহকারিতা করিত। মোড়লকে মাঝী এবং সহকারীকে প্রামাণিক বলে। সমাজ কার্য্যেও একজন প্রধান ও একজন সহকারী ছিল। প্রধানকে যোগ-মাঝী এবং সহকারীকে যোগ-প্রামাণিক বলে। পুরোহিত বা নায়েকী এবং তাহার সহকারী কুড়ম নায়েকী ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদন করে। ইহারা সকলেই আপন আপন কার্য্যের জন্য কিছু কিছু জমি পাইত। ইংরেজের বন্দোবস্তে যোগ-মাঝী এবং যোগ-প্রামাণিকের এবং নায়েকীর ও কুড়ম-নায়েকীর উপস্বত্ব কিছু নাই। এজন্য সমাজের প্রধান এবং তাহার সহকারী অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, এবং পুরোহিতেরা কোন প্রকারে দিন যাপন করিতেছে। সাঁওতালের শাস্ত্র কি অন্য কোন লিখিত গ্রন্থ নাই। যোগ মাঝীর অন্তর্দ্ধানে সামাজিক ব্যবহারাদির বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। এই বিশৃঙ্খলার ফলে ব্যভিচার স্রোতের শ্রীবৃদ্ধি কি না, বলা যায় না। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি যে পূর্ব্বের মত আর নাই, তাহা নিঃসন্দেহ।

পূর্ব্বে সাঁওতালের বিবাহ পদ্ধতি যাহা ছিল, এখন তাহা নাই। এখনকার পদ্ধতি অনেক সংক্ষিপ্ত। প্রাচীন পদ্ধতি অনেক অনুসন্ধান করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। তথাপিও বিস্মৃতি ক্রমে কোন কথা ছাড়িয়া গিয়াছি কি না, বলিতে পারিনা।

সাঁওতালের মধ্যে স্বয়ম্বর প্রথার প্রাদুর্ভাব বলিয়া পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, সে কথা সত্য নহে। কচিৎ দু একজন এরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ পিতা মাতা পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া দেয়। স্বয়ম্বর গৌরবের বিষয় বলিয়া সাঁওতালেরা মনে করে না। সাঁওতালের মধ্যে বাল্য বিবাহ

নাই। কিন্তু বাঙ্গালীদের অনুকরণে সাঁওতালী অল্পবয়স্ক পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছে, ইহাও দেখিতে পাইয়াছি। সাঁওতালের মধ্যে বহু বিবাহ নাই। কিন্তু যাহার ঘরে কাজ কর্ম্ম অনেক আছে, কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য কোথায়ও কোথায়ও দু একটী ধনবান সাঁওতাল প্রাচীনকে একাধিক বিবাহ করিতে দেখা গিয়াছে।

সাঁওতাল পরিচিত পক্ষেও পুত্র কন্যার বিবাহের প্রস্তাব স্বয়ং করে না, রায়বারী বা ঘটক নিযুক্ত করিয়া থাকে। ঘটক পাত্রী স্থির করিলে বরকর্ত্তা কোন্ দিন কন্যা দেখিতে যাইবেন, ঘটকমুখে পূর্ব্বেই কন্যা-কর্ত্তাকে সংবাদ দিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ভ্রাতা ঘটক ও অন্য দু চারিটী গ্রামের লোক সঙ্গে লইয়া কন্যার গ্রামে উপস্থিত হয়। একেবারে কন্যার বাড়ীতে যাওয়া নিষিদ্ধ। যদি পছন্দ না হয়, তবে লজ্জার বিষয় হইতে পারে। যাইবার সময় শুভাশুভের নিমিত্ত (omens) বিশেষ করিয়া দেখিয়া যায়। সেখান হইতে সংবাদ দিলে যোগমাঝী কন্যাকে যাইয়া বলে "মা আমার বাড়ীতে কুটুম্ব আসিয়াছে,বাড়ীতে কেহ নাই, তোমরা আসিয়া কুটুম্বের সেবা কর।" কন্যার মাতা পিতা সম্মতি দিলে তিন চারিটী কুমারী যোগমাঝীর বাড়ীতে যাইয়া আগন্তুকদের পা ধুয়াইয়া দেয়। সেই সময় ঘটক ইসারা করিয়া কন্যা দেখাইয়া দেয়। কন্যা দেখিয়া পছন্দ হইল কি না, সেখানে প্রকাশ করা ভদ্রতার বিরুদ্ধ। কন্যা দেখা শেষ হইলে যদি ইচ্ছা হয়, কন্যাকর্ত্তা দর্শকদিগকে ভোজ খাওয়ায়। মেয়ে পছন্দ হইলে ঘটকের মুখে শুনিয়া কন্যাকর্ত্তা বর দেখিয়া যায়। আজ কাল কষ্ট করিয়া গ্রামে যাইয়া কন্যা দেখা বড় প্রচলিত নাই। হাটে হাট করিতে আসিয়া অনেকেই বর কন্যা দেখার কার্য্য সম্পন্ন করে। ছেলে মেয়ে পছন্দ হইলে উভয় পক্ষে উভয়ের ঘর দেখিয়া আসে। সব পছন্দ হইলে গ্রামের লোককে বিবাহ-প্রস্তাব জানাইবার জন্য একটী দিন স্থির করিয়া ঘটক কন্যাকর্ত্তাকে সংবাদ দিয়া আসে। সেই দিনে কন্যাকর্ত্তা গ্রামের মাঝী, প্রামাণিক, যোগমাঝী ও আর দুচারি জন লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে এবং মদ খাইতে দেয়। দুএক দোনা মদ খাওয়া হইলে মাঝী বা যোগ-মাঝী কন্যাকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করে, এ কিসের মদ খাওয়া? কন্যাকর্ত্তা বলেন, অমুক গ্রামের ঘটক আসিয়াছে, আপনারা একথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন; তখন সেই কথা ঘটককে জিজ্ঞাসা করা হইলে ঘটক বলে, অমুক লোকের পুত্র এবং অমুক লোকের কন্যার জোড় বাঁধাইব বা অমুকের সহিত অমুককে বেহাই করিয়া দিব, আজ তাহাই প্রকাশ করিতেছি। তখন তাহারা ঘটককে উভয় পক্ষের পারিশ (গোত্র) জিজ্ঞাসা করিবে। স্বগোত্রে সাঁওতালদের বিবাহ হয় না। ঘটকের কথা মনঃপুত হইলে তাহারা ভালরূপে কাজ করিতে ঘটককে উপদেশ দিয়া এবং আর কিছু মদ খাইয়া বিদায় হয়। তাহার পর বরের গ্রামেও এই রূপে বিবাহ ঘোষণা করা হইয়া থাকে।

ঘোষণার পরে কন্যাকর্ত্তা ঘটককে বলে, যেরূপ হউক, আমরা জামাইকে ধুতি পরাইব, তুমি বরকর্ত্তাকে বলিয়া একটী দিন স্থির কর। নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘটককে সঙ্গে লইয়া কন্যাপক্ষ বাজনা' বাজাইতে বাজাইতে, নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে

বরের গ্রামে উপস্থিত হয়। তখন ঘটক যাইয়া বরপক্ষকে সংবাদ দেয়। বরপক্ষ নির্দ্দিষ্ট দিনের কথা পূর্ব্বেই গ্রামের মাঝীকে জানাইয়া রাখে। মাঝী সকলকে সাবধান করিয়া রাখে যেন সেই দিন কেহ গ্রাম ছাড়িয়া না যায় এবং সকলেই যেন প্রস্তুত থাকে। ঘটকের মুখে গ্রামের মোড়ে কন্যা পক্ষের পৌছিবার কথা শুনিয়াই বর-গ্রামের যোগমাঝী একবাটী তেল কতকগুলি দাঁতন এবং একখানি তেল ধুতি নিয়া কন্যাপক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। তাহাকে দেখিয়া কন্যাপক্ষের একজন জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি এই গ্রামের যোগমাঝী, আমাদের কেহ নাই, আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি, কোথায় বাসা পাইব? যোগমাঝী বলে, তোমাদের ভয় নাই, আমি বাসা করিয়া দিব, ও সব ঠিক করিয়া দিব। এই বলিয়া যোগমাঝী ঘাটে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে স্নানাদি করাইয়া সঙ্গে লইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে বরের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হয়। সেখানে চারিপাঁচটী কুমারী কন্যাপক্ষের পা ধুইয়া দিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে। সকলের পা ধোয়া হইলে বরের গোয়াল ঘরে যাইয়া বসে। সাঁওতালের বাড়ীতে গোয়ালঘর সকলের বড়। তখন যোগমাঝী শালপাতার উপরে এক-ঘটী জল লইয়া সকলকে অভিবাদন করে। সাঁওতালের অভিবাদন প্রণালী সম্বন্ধ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন। কাহাকেও কেবল মস্তক অবনত করিয়া, কাঁহারও জানু স্পর্শ করিয়া, কাহারও সম্মুখে জানুপাতিয়া বসিয়া, কাহারও স্কন্দ স্পর্শ করিয়া, কাহাকেও চুম্বন করিয়া অভিবাদন করিতে হয়। সময়ান্তরে একথা এবং শুভাশুভের কথা বলা যাইবে।

কন্যাপক্ষকে অভিবাদন করিয়া যোগমাঝী, বরকর্ত্তা, কর্ত্রী ও অন্যান্য সকলকে অভিবাদন করিবে। তখন উভয় পক্ষের আলাপ ও কথাবার্ত্তা হইবে। বর পক্ষ কন্যাপক্ষকে বলিবে, এখন পরস্পরের কুশল জানিলে ভাল হয় না? কন্যাপক্ষ বলিবে, তোমারা আমাদের তত্ত্ব লইয়াছ দেখিয়া প্রাণ পাহাড়ের মত উচ্চ এবং বুক চেটাইয়ের মত চেটাল হইল। এইরূপ, উভয় পক্ষে কিছু কথা হইলে এবং লুচির পশুপক্ষী তলমাটি শীতুলপানি সবপক্ষায় আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া সকরূপ ছদোনা করিয়া মদ দেওয়া হয় এবং জলপান দেওয়া হয়। জিনিস বেশী থাকিলে গ্রামের সকলকেই দেয়। তাহার পরে বরকেনা কাপড় পরাইতে প্রস্তুত হয়। গোয়ালঘরে বা উঠানে খড় বিচাইয়া সকলে বসে এবং বরকে সাজাইয়া সেই খানে আনে। জামায়ের সঙ্গে একজন লোক থাকে, সে কাহাকে কিরূপে অভিবাদন করিতে হইবে, তাহা বরকে শিখাইয়া দেয়। বর শালপাতার উপর এক ঘটী জল লইয়া প্রত্যেকের সম্মুখে রাখিয়া যথোচিত অভিবাদন করে। মর্য্যাদা অনুসারে পর্য্যায়ক্রমে কুটুম্বদিগকে অভিবাদন করিতে হয়। যাহাকে অভিবাদন করা যায়, সে [illegible] পাগড়ী, এক[illegible] বরকে দে[illegible] একদোনা [illegible] হয়। তারপর বরপক্ষের [illegible] গান করে—সাজায়ো সাজায়ো [illegible]টা পানি সে আইলো।

ইত্যাদি—

স্থ[illegible]ান ভিন্ন হয়। গানে উভয়

পক্ষের উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়া থাকে। তাহার পর কন্যাপক্ষ বিদায় হইয়া চলিয়া যায়।

সেই দিন বিকালে কন্যাপক্ষীয় পুরুষেরা বরের বাড়ীর ভিতরে যায়, বেহাই পক্ষীয়েরা বরের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে। অন্য লোক বাহিরে থাকে। বেহাইদিগকে বাটী করিয়া মদ খাইতে দিতে হয়। মদ খাওয়া হইলে গান আরম্ভ হয়।

সাথুঁটিদেখো খুঁটিদেখো সুমদিনী (সম্বন্ধিনী) বিবাহের খো শিরী (শ্রী) বিরিন্দাবন পাড় ঘটক নি পাড়দেখো সুমদিনী। পাড় দেখো স্থির র বিরিন্দাবন; রলা দেখো রলা দেখো সুমদিনী, রলা দেখো শিরী বিরিন্দাবন, ঝাঁটী দেখো ঝাঁটী দেখো সুমদিনী ঝাঁটী দেখো শিরী বিরিন্দাবন, খেড় দেখো খেড় দেখো সুমদিনী, খেড় দেখো শিরী বিরিন্দাবন।

গান হইয়া গেলে কন্যাপক্ষ বিদায় হয়। বিবাহের সময় টাকা দিতে হয়। ঘটক দু একজন লোক সঙ্গে করিয়া দোলায় করিয়া হলুদ এবং ভারে তৈল ও কিছু টাকা লইয়া কন্যাগৃহে উপস্থিত হয়। কন্যাকে হলুদ তেল মাখায় এবং কন্যার পিতাকে টাকা দেয়। তেল হলুদ কম পড়িলে সেই টাকা দিয়া ক্রয় করিতে হয়। কন্যার পিতার সহিত বিবাহের দিন স্থির হইলে যত দিন বাকী থাকে, সুতা বা দড়িতে ততটা গাঁট দিয়া বরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। পাঁচটী দড়িতে গাঁট বাঁধিতে হয়। একটী মুস্তাজিরের নামে, একটী বর কর্ত্তার নামে, একটী পাড়ওয়ালা কাপড়ের নামে, একটী দলওয়ালা কাপড়ের নামে। মেয়ের মা এই কাপড় পরে একটী বাজনার নামে। দুই খানি কাপড়ের জন্য লাল সুতায় গাঁট বাঁধিতে হয়, সেই গাঁট দেখিবার জন্য মুস্তাজির যোগমাঝী ও প্রামাণিক একত্র হয় এবং দেখিয়া আপনাদের গাঁট বাঁধে। কতকগুলি কুটুম্বদের এবং কতকগুলি অন্য পক্ষকে পাঠাইতে হয়। কন্যাপক্ষের নির্ব্বাচিত দিন মঞ্জুর হইল জানাইবার জন্য কন্যাপক্ষের নিকট পাঠাইতে হয়। এক একটী দিন অতীত হইলে এক একটী গাঁট খুলিতে হয়। কেবল বিবাহ ও জোম সীমের মুরগী খাওয়া অর্থাৎ সূর্য্যের পূজা উপলক্ষে এই গাঁট বাঁধিবার প্রথা আছে। ক্রমশঃ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

বিলাতের পত্র।

[illegible] কোন পত্র পাই নাই, আ[illegible]কে সম্বাদ দিতে ত্রুটি কর[illegible]মার সম্বাদ না পাওয়াতে নানারূপ[illegible] ও উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে, ভরসা [illegible] প্রকার নূতন বিঘ্নবিপদে পড়ে[illegible] আমার সম্বাদ দিয়াছি। কয়মাস য[illegible] চক্ষুর বেদনায় অত্যন্ত কাতর থাকায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াই। এখন অনেক আরাম হইয়াছি, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বাবস্থা পাই নাই। যাহা হউক, বিধাতার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ যে পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছি। পীড়ার সময় একদিন অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে পথে চলিতে-

ছিলাম, হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে একখানি গাড়ী আসিয়া ঘাড়ে পড়ে, তাহাতে কয়দিন একেবারে শয্যাগত থাকিতে হয়। এইরূপে এই দুর্ব্বল শরীরের উপর দিয়া অনেক বিপদ গিয়াছে; সকলই তাঁহার ইচ্ছা। সম্মুখে একটী পরীক্ষা আছে, তজ্জন্য বিশেষ ব্যস্ত আছি; কারণ এ বয়সে মুখস্থ বিদ্যা দ্বারা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া নিতান্ত সহজ নয়; পরীক্ষা সর্ব্বত্রই সমান—এক দিক দিয়া গলাধঃকরণ ও যথাসময়ে ঠিক্ ঠিক্ উদ্গীরণের উপর নির্ভর করে। নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ানের দরুণ কাগজ পত্র বিশেষ গোলমাল অবস্থায় পড়িয়াছে। পূর্ব্বলিখিত নোটগুলি যে শীঘ্র গুছাইবার সুবিধা ও অবকাশ পাইব, এমন ভরসা নাই। যাহা হউক, জুন মাসে টেম্পেল ৪ মাসের জন্য বন্ধ হইবে, সেই সময়ে সব ঠিক করিব মনে করিয়াছি। শরীর খারাপ হওয়ার দরুণ অত্যন্ত বীতরাগ জন্মিয়াছিল এবং দারুণ ভয় হইয়াছিল, জন্মের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলাম। সুতরাং প্রবন্ধাদির প্রতি খেয়াল করিয়াও কাজে কিছু করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম, বিধাতার ব্যবস্থায় আমার দ্বারা এ পর্য্যন্ত। আর এক কথা, শারীরিক হউক, মানসিক হউক, পরিশ্রমের ফলাশা না থাকিলে বা ফলে নিরাশ হইলে মন ভাঙ্গিয়া যায়। জৈনদিগের মকদ্দমা ও সহবাস সম্মতির আইন ব্যাপারে দেশ হইতে যে সকল সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। প্রথম কাণ্ডে বুঝিয়াছি যে, ধন মানুষের বুদ্ধি হরণ করে। "ধনীর জন্য স্বর্গের দ্বার চির অবরুদ্ধ", এই যীশুবাক্য সময়ে সময়ে ভাল উপলব্ধি করিতে পারিতাম না, ক্রমে দেখিতেছি, উহা কড়ায় কড়ায় সত্য। যীশু পূর্ব্ব দেশের লোক, তাঁহার আইন বর্ত্তমান পশ্চিম দেশে যদিও নির্ব্বিশেষে সম্পূর্ণ না খাটুক, পূর্ব্বদেশে ষোল আনা বরং পাঁচসিকা খাটিয়া থাকে। আপনি বোধ হয় অনেকটা বুঝিয়াছেন যে, জৈন ভ্রাতাদের বিলাত আসার মূলে অনেকটা আমার যত্ন, কিন্তু যেরূপ অজ্ঞাতভাবে তাঁহারা আসেন, তাহা আমার সম্পূর্ণ রুচির মোদিত, এবং ফিরিয়া যাওয়ার পরে যাহা ঘটিল, তাহা আমার পরামর্শের সেরূপ বিরুদ্ধে। আমি চিরকাল তাঁহাদিগকে বলিয়া আসিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, অসত্য কোন কালে কোন অবস্থায় টিকিতে পারে নাই, পারিবে না; মিথ্যা দ্বারা ষোল-আনা অশান্তি বই তিলমাত্র শান্তি, সুখ বা সুবিধা নাই। তত্রাচ তাঁহারা ধনবান আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় প্রতারিত হইয়া মিথ্যা জাতি, মিথ্যা সমাজের মিথ্যা ভয়ে নিজেদের প্রতি নানারূপ জঞ্জাল আনিতেছেন। ভয়ঙ্কর ত্যাগস্বীকার ভিন্ন জগতে কোন মহা হিত সাধিত হয় নাই। অর্থবল যখন আছে, অন্য প্রকার ত্যাগস্বীকার ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। যাহা হউক, বিধাতার খেলাই দেখা যাউক।—দ্বিতীয় কাণ্ডে দেশ হইতে বহু শোকপূর্ণ পত্র পাইয়াছি যে, যাঁহাদিগকে দেশ শিক্ষিত ও জ্ঞানী বলিয়া জানিত, তাঁহারাও এই জঘন্য ব্যাপারে যোগ দিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থপর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া অনেকের মর্ম্মে আঘাত করিয়াছেন। তদুত্তরে মনের দারুণ ক্লেশ চাপা দিয়া এইমাত্র লিখিয়াছি যে, দক্ষিণে বামে বড় ছোট স্বার্থের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া

সরল দৃষ্টিতে উপরে ভগবান ও অন্তরে বিবেক ভরসা করিয়া এ সংসারে কয়জন লোক চলিয়া থাকে? সুতরাং ঐ সকল লোকের ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই;—বিশেষ ভারতবর্ষে, যেখানে সামান্য ক্ষমতা ও পদ ও সামান্য অর্থ অনেককে ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছে, করিতেছে ও আরও কতকাল করিবে। Disraeli শেষ কিস্তিতে [illegible]rl হইলেন, কিন্তু Gladstone সে পদ [illegible]রিয়া অগ্রাহ্য করিলেন, এখানেও [illegible]কিতে পারে যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্য-[illegible]রূপ ত্যাগস্বীকার জন্য ধন্য ধন্য [illegible], ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের প্রধান বল প্রকৃতিপুঞ্জের উপর জীবদ্দশায় অতুল ক্ষমতা থাকিবে; কিন্তু এরূপ স্বার্থ স্বর্গের সামগ্রী, কারণ উহার উদাহরণ দ্বারা বর্ত্তমান ও ভাবীবংশের কোটী কোটী জীবের হৃদয়ে বল সঞ্চার ও মনের উন্নতি সাধন হইবে। চৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায় ন্যায়ের পুঁথি কয়জন ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে? হিতবাদী হঠাৎ বলিতে পারেন, ওরূপ গ্রন্থ ওরূপ সামান্য কারণে নষ্ট করা দোষের হইয়াছিল, কিন্তু হৃদয়ের বল ভিন্ন সহস্র মানসিক উন্নতির চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি; পুঁথি খানি থাকিলে দশ জন বিদ্যার্থীর যে টুকু লাভ হইত, উহা নষ্ট করার উদাহরণ দ্বারা, তদপেক্ষা আপামর সাধারণের, সহস্র গুণ লাভ হইয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান ভারতে গলাবাজী কলমবাজী ঢের হইয়াছে, তাহাতে কিছুই হয় নাই, কোন কালে হইবেও না; এখন হৃদয়বাজী আরম্ভ না করিলে আমাদের যাহা কিছু এখনও আছে, তাহার বাজীও ভোর হইবে। দুঃখের কথা আর কত ভাবিব। এক এক সময় মনে করি, যাহার কূল কিনারা নাই, আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির তাহা ভাবিবার কি দরকার? দূর কর ও সকল ভাবনা; আদার ব্যাপারি জাহাজের খবরে কাজ কি? কিন্তু কেমন পোড়া প্রাণ, কোথা হইতে অজ্ঞাত ভাবে দুর্ভাবনা সমূহ আবার আসিয়া জোটে। মালিক ভগবান, যেমন নাচাইবেন, তেমনি নাচিতে হইবে।

মিড্‌ল্ টেম্পলে রাজভোজ।

৯ই এপ্রেল ১৮৯১—অদ্য মিড্‌ল্ টেম্পেলের (Middle Temple) ইষ্টার টারম বড় দিন (Easter Term Grand Night)। প্রত্যেক টারমের এইরূপ রজনীতে বাহিরের বড় বড় লোক নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। সেই নিয়মে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আজ আহুত। বিশেষ ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর স্বয়ং প্রিন্স অব ওয়েল্‌স মিড্‌ল্ টেম্পেলের একজন বেঞ্চার রূপে (Master of the Bench) আমাদের সহিত পান ভোজন করিলেন, সুতরাং অদ্যকার যজ্ঞ মহাযজ্ঞ, যে যজ্ঞে তিনি প্রধান হোতা। চারিটী ইনের (Inns of Court) মধ্যে মিড্‌ল্ টেম্পেল রাজপরিবারের সঙ্গে বিশেষরূপে সম্বদ্ধ। রাজ্ঞী এলিজেবেথ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক রাজা, রাণী,

রাজকুমার এই হলে (Hall) পান ভোজন, নৃত্য, গীত, বাদ্য অভিনয়াদি দ্বারা আনন্দের ধ্বজা উড়াইয়াছেন। আজকাল অভিনয়াদি হয়না বটে, কিন্তু পান ভোজন গীত বাদ্যের ত্রুটি নাই।

অদ্যকার জন্য সাধারণ নিয়মের ব্যভিচারে বারিষ্টার ও ছাত্র অর্থাৎ সাধারণ মেম্বরগণের জন্য মোটে ২৭৫ খানি বিশেষ রকমের কার্ড বাহির হয়। উক্ত নিমন্ত্রণ পত্রের লিখিত নিয়মে সকলকে বৈকালিক পোষাকে (Evening Dress) যাইতে হইয়াছিল। রাত্রি পৌনে আটটার সময় ফলার আরম্ভ হইবার কথা, কিন্তু যুবরাজের অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। তিনি গাড়ী হইতে নামিলে বাদ্যকরগণ (Band of the Coldstream Guards) জাতীয় সঙ্গীত (National Anthem) "God save the Queen" বাজাইতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সহ বেঞ্চারবর্গ প্রিন্সকে আগে করিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের পদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল "March Prince of Wales"। তদনন্তর সকলে সমবেত ভাবে দণ্ডায়মান, পুরোহিত (Rev. Vaughan—Temple Church) প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে নিবেদন (Grace) পাঠ করিলেন।

"Gracious God, bless this food of which we are now about to partake and all other gifts of thy Providence for Jesus Christ's sake, Amen.

God bless our Queen, bless the Prince of Wales, the Princess of Wales and all the Royal Family, God bless our Church, bless our country &c &c"

এইবার ভোজন আরম্ভ। আজ পরিবেষণে এতই বিলম্ব যে, দেশের নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়ার কথা বিলক্ষণ মনে হইল। আহারের নিয়মিত সময় (প্রত্যহ ঠিক ছয়টার সময় আরম্ভ হয়) বহু উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সকলেই অত্যন্ত ক্ষুধিত অথচ পরিবেষকগণ (Waiters) খুব তাড়াতাড়ি করিয়াও কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছেনা। এক এক কিস্তির পর ১০।১২ মিনিট অপেক্ষা করিতে হইতেছে, তবে ক্রমাগত ব্যাণ্ড বাজিতেছে, ঐ আমোদেই থাকা গিয়াছে, কিন্তু লুচির পর তরকারি না আসিলে তজ্জন্য অপেক্ষায় যেরূপ অধীর হইতে হয়, মধ্যে মধ্যে সেরূপ একটু অশান্তিও হইতেছে।

ভোজের মাঝখানে গ্রাণ্ড নাইটের সাধারণ নিয়মানুসারে কর্ম্ম কর্ত্তা (Master Treasurer Lord Coleridge Lord Chief Justice of England) মহারাণীর টোষ্ট (toast) প্রস্তাব (propose) করিলেন, তজ্জন্য তত্ত্বাবধায়ক (Steward) ফুক্‌রাইয়া বলিল "Gentlemen ; charge your glasses" (মহাশয়গণ, পাত্রে সুরা ঢালুন)। পরে সকলে পান পাত্র হস্তে দাঁড়াইয়া সমস্বরে "The Queen" "The Queen" "The Queen" তিনবার বলিয়া একটু একটু পান করত পুনরায় আহারে বসিলেন।

ইহার অল্পক্ষণ পরে প্রিন্সের তামাক খাইবার ইচ্ছা হওয়ায় পুরোহিত যথানিয়মে ধন্যবাদ (Last grace) পাঠ করিয়া নিয়ম রক্ষা মত যজ্ঞ সমাপন করিলেন। (দুই গ্রেসের মধ্যে তামাক খাওয়া কায়দা বহির্ভুত।)

"We thank thee O Lord for the food of which we have just partaken. May it be for the nourishment of our bodies for Jesus Christ's sake, Amen."

প্রিন্সের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চুরট আরম্ভ করিলেন।

ভোজন প্রায় সমাপ্ত, সুরা ও ফল মূল চলিতেছে, এমন সময় লর্ড কোলরিজ উঠিয়া বলিলেন "Gentlemen, I give you, without preface and without expecting a reply, the one toast of 'The Health of Master his Royal Highness the Prince of Wales."

বিষম করতালির পর আবার পাত্র হস্তে দাঁড়াইয়া "The Prince of Wales "The Prince of Wales "The Prince of Wales" তিন বার বলিয়া সকলে একটু একটু পান করিলেন; এই সময় অনেকে প্রিন্স সম্বন্ধীয় একটী মঙ্গল গীত গাইয়া আসন পুনর্গ্রহণ করিলেন। এইবার উত্তর দিবার জন্য প্রিন্স উঠিলেন।

'Gentlemen, It was decided by our Treasurer that there should be only one toast and that no speeches were to be made, but I shall allow myself the privilege having been for 30 years a member of this Inn, ("আমি ৩০ বৎসর এই টেম্পেলের একজন মেম্বর, সেই সত্ত্বে প্রস্তাব করিতে অধিকারী" ইহা দ্বারা, আমি তোমাদের মধ্যেকার একজন, এইরূপ উদার প্রেমের ভাব প্রকাশ করায় এই সময়ে বিশেষ প্রীতি ও উৎসাহের সহিত আনন্দ ধ্বনির রোল উঠিয়াছিল।) of proposing a toast which I know you will all receive with acclamation—it is that of The Health of our Treasurer, the Lord Chief Justice of England.") খুব আনন্দ ধ্বনি সহ লর্ড কোলরিজের সম্মানান্তে সকলে উপবেশন করিলে উত্তর প্রদানার্থে তিনি উঠিয়া বলিলেন, "A great King in former days said 'put not your trust in Princes.' (সকলের হাস্য ও আনন্দধ্বনি) I invited his Royal Highness here upon the solemn undertaking that no speeches were to be made, yet his Royal Highness has forced upon me the duty of making one. (খুব হাস্য ও করতালি) All I can say is that when I was upon one occasion forced to make a speech much against my wish, a lady who sat next to me said, "Never mind, you will speak very late, every body will be very tired, nobody will in the least want to hear you or care what you say and when you have said that you do not want to make a speech, and then, and then, and then,——You can sit down. (সকলের হাস্য ও করতালি) That was her advice and I propose to follow it now." খুব করতালির মধ্যে লর্ড কোলরিজ আসন পুনর্গ্রহণ করিলে প্রেম-পাত্র (Loving cup) চলিতে লাগিল। অর্থাৎ একটী প্রকাণ্ড রৌপ্যপাত্রে নানাপ্রকার সুরা মিশ্রিত করিয়া প্রিন্স হইতে আরম্ভ হইয়া সকলে এক এক চুমুক পান করিলেন। প্রত্যেক প্রাণ্ড নাইটে এইরূপ প্রেম পেয়ালা ফিরিয়া থাকে। জুবিলির বৎসর প্রিন্স Master Treasurer ছিলেন, সে পদ হইতে অবসর গ্রহণ কালে তিনি একটী প্রকাণ্ড পাত্র টেম্পেলকে উপহার দেন, অদ্য সেই প্রেম পেয়ালা চলিল। রাত্রি ১১ টার সময় ভোজ সমাপ্ত করিয়া অনর্গল আনন্দধ্বনির মধ্যে ছুধারের প্রত্যেককে অভিবাদন করিতে করিতে যুবরাজ সদলে যাত্রা করিলেন। সাধারণ ভোক্তাগণ তাহার পরেও অনেকক্ষণ বসিয়া সুরা সেবন, ধূমপান ও কথোপকথনে নিযুক্ত থাকিলেন।

ফলার ফুরাইলে, বসিয়া ভাবিতে

লাগিলাম, ধন্ত জনবুলের কীৰ্ত্তি যে, দেশের আজ ভাবী সম্রাট পৃথিবীর লোক একত্র করত তাহাদের সঙ্গে বসিয়া পান ভোজন দ্বারা আনন্দ করিলেন। নির্ব্বিশেষে আফ্রিকার নিবিড় কৃষ্ণকায় কাফ্রি, চীন, জাপানের অধিবাসী, ভারতের হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের শ্বেত কৃষ্ণ নানাবর্ণের প্রকৃতিবর্গ, সেই সঙ্গে নিমন্ত্রিত গ্রীসদেশীয় মন্ত্রীবর,—ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, এসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া পঞ্চ খণ্ডের মানুষ স্বাধীন উন্মুক্তভাবে পরস্পরের প্রতি প্রেমের সহিত আহার করিতেছেন, ইংলণ্ডের প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সঙ্গে। ইহারই নাম England is a free cosmopolitan country, লণ্ডন কেবল ইংলণ্ডের রাজধানী নয়, সমগ্র পৃথিবীর রাজধানী। এই চিন্তার সঙ্গে বিধাতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম যে, তিনি এই নরাধমের প্রতি এতই করুণ বর্ষণ করিয়াছেন যে, সহস্র অনুপযুক্ততা সত্ত্বেও সে আজ এই সার্ব্বভৌমিক প্রেমের দরবারে একটু স্থান পাইল।

এদেশে না আসিলে এখানকার ব্যাপার সমূহ সম্বন্ধে কোন প্রকার ভাব ঠিক পাওয়া কঠিন। বারিষ্টারি ভোজ তাহার একটী উদাহরণ। দেশে থাকিতে, এবং এখানে আসিয়া প্রথম প্রথম যখন "ডিনার" খাইতাম, মনে হইত ব্যবস্থাটীর প্রতিষ্ঠা কালীন যদিও কোন প্রকার উদ্দেশ্য ছিল, এখন উহার কোনরূপ অর্থ বা উপযোগীতা নাই। কিন্তু ক্রমে দেখিতেছি, এবং অদ্যকার রাজভোজে বিলক্ষণ দেখিলাম যে, এরূপ একটী মহৎ অন্তর্ব্যবস্থান (institution) উঠিয়া গেলে সমূহ ক্ষতি বই লাভ নাই। শিক্ষা অর্থে কতকগুলি গ্রন্থ গলাধঃকরণ ও যথাসময়ে উদ্গীরণ যাঁহাদের বোধ, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারা আমার কাজ নয়। দশ জন মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, আচার ব্যবহার ব্যতীত মানুষের প্রকৃত শিক্ষা অসম্ভব। এইরূপ দহরম মহরম দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য এই মহোপযোগী ভোজের অন্তর্ব্যবস্থান ভিন্ন অন্য উপায় তত ফলপ্রদ নয়। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে চিত্ত যে দশ হাত লাফাইয়া উঠে, এরূপ ব্যাপারে তাহা আজ বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম। তবে যিনি রসনা বা উদর তৃপ্তি কিম্বা ফাঁকা আমোদ করিতে আসেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। যে ভাবে যে ভাবে, সেই ভাবে সে পায়।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

আশ্চর্য্য প্রত্যাদেশ। (১)

আমার জ্বালাময় পাপ-জীবনে আমি যাঁহার প্রসাদে শান্তিলাভ করিয়াছি, সংসারের বিষময় কোলাহল হইতে অপসৃত হইয়াছি, আমার দীক্ষাগুরু ইষ্টদেবী সেই শ্রীশ্রীমতী 'মা'-র চরণে বার বার নমস্কার।

আমি আমার মাতার ভৌতিক দেহের

(১) ইষ্টদেবীর এই প্রত্যাদেশ শুধু আমার জন্যে নহে, সকলেরি জন্যে, তাই প্রকাশ করিলাম। 'মাতৃদাস'।

স্মরণার্থে তাঁহার একবিন্দু পদ-ধূলি সোণার মাদুলীতে রাখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিতাম, তাহা একদণ্ডও কাছছাড়া করিতাম না, নিত্য নিত্য ফুল চন্দন দিয়া পূজা করিতাম; তাহা আর কেহই জানিত না। মনে হইত, বুঝি সে মাদুলী আমার বুকে না থাকিলে আমি বাঁচিব না। তাই সংকল্প ছিল, তাহা আর কণ্ঠ হইতে খুলিব না। একদিন কোনও গুরুতর শোকে অভিভূত হইয়া অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছি, তখন গভীর রাত্রি, গৃহজন সকলেই নিদ্রিত, এমন সময় যেন কোনও অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানে উপস্থিত হইলাম। সে এক নূতন সৃষ্টি! আধ আধ অরুণোদয়, আধ আধ অন্ধকার। গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না, কীট পতঙ্গেরও সাড়াশব্দ নাই। সেই নিঃশব্দ নিস্পন্দ বিজনে, সেই আলোছায়ার অন্তরালে এক দেবীমূর্ত্তি দেখিলাম। তিনি যেন মহাযোগে নিমগ্না, "নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্"—যেন নির্ব্বাত প্রদেশে দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল হইয়া আছেন। দেখিয়া মনে হইল, যেন আমারি সেই মাতৃমূর্ত্তি! কিন্তু তাহাতে আর সে মায়া নাই, সে তরঙ্গ নাই, সে মূর্ত্তি স্থির ধীর প্রশান্ত নির্ম্মল। ইচ্ছা হইল, দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার পায়ে পড়ি, কিন্তু দেহ অসাড়, যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। 'মা' বলিয়া ডাকিতে গেলাম, কিন্তু কথা ফুটিল না, স্বর বদ্ধ হইয়া গেল, কণ্ঠনালী হইতে কেবল ঘড় ঘড় শব্দ বাহির হইল। তিনি কিন্তু আমার আকিঞ্চন বুঝিতে পারিলেন, মৃদুমধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন;—নিশীথে সুদূর হইতে বংশীধ্বনির ন্যায়, মন্দ মন্দ মলয়বাতাসের ন্যায় সে কণ্ঠস্বর অনুভব করিলাম। তিনি বলিলেন, "বৎস! সেই মায়া-কানন হইতে আমিই তোরে এই স্থানে আনিয়াছি, আমি তোর জন্যই যোগিনী, তুই তার কি জানিবি। হাঁরে অবোধ সন্তান! তুই সোণা ফেলিয়া আঁচলে গেরো দিয়াছিস! অপার্থিব রত্নের সঙ্গে পৃথিবীর ছাই ভস্ম মিশাইয়াছিস্!" আবার বলিলেন,—"তোর হৃদয়ের ছাই ভস্ম সমস্তই ধৌত কর, তোর ও হৃদয় গঙ্গার জলে ধুইয়া দেবতার চরণে অর্পণ কর, দেবতার অমর প্রাণে আপনাকে অনুপ্রাণিত কর, দেবতার পায়ে—'নরবলি' হ। তুই পদধূলি লইয়াই উন্মত্ত! পায়ের ধূলো! হরি! হরি! হাঁরে পাগল! আমার সর্ব্বস্ব হইতে—হৃদয় হইতে—মন প্রাণ ও আত্মা হইতেও কি ক্ষণভঙ্গুর দেহের মূল্য বেশি? নশ্বর দেহের কি এতই গৌরব? হরি! হরি! আমি যে নিত্য নিত্য তোরে কত অমূল্য ধন দিয়া থাকি; আমার দানগুলি অমনি শুধু শুধু গেল! পায়ের ধূলো—আথার ছাই, পোড়া মাটি, তাহা এখনি বিসর্জ্জন কর। তোর জেদ যতই হউক, আমার জেদ তাহার উপরে। এ সব ছাই ভস্ম ভুলিয়া পঞ্চভূতের মোহ কাটাইয়া যে দিন প্রকৃতিস্থ হইবি (১), সেই দিন তুই মাতৃপূজার যোগ্য হইবি, সেই দিন তুই আমার পদতলে বসিবার যোগ্য হইবি, সেই দিন তুই দেবতার পদচ্ছায়ায় বসিয়া ত্রিতাপের জ্বালা ভুলিয়া যাইবি। তুই আজি হইতে আমার মৃণ্ময়ী

(১) সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থায় উপনীত হইলেই 'প্রকৃতিস্থ' বলে। অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তম তিনটিই আছে, অথচ কেহই আর বিকার ঘটাইতে পারে না।

মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে আমার এই চিন্ময়ী মূর্ত্তি স্থাপন কর, আমার আশীর্ব্বাদে অবশ্যই শান্তিলাভ করিবি,”—বলিতে বলিতে সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। সেই প্রত্যাদেশ শুনিয়া আমার অন্তরাত্মা অমৃতরসে প্লাবিত হইল, জ্বালাময় আগ্নেয় গিরি হিমালয়ের ন্যায় শীতল হইল, জ্বলন্ত উনান নির্ব্বাণ হইল,—

শুষ্ক কাষ্ঠে বহে রসের উজান,
জ্বলন্ত উনান হয় রে নির্ব্বাণ!

অনন্তর সে অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম, কিছুই জানি না। উঠিয়া দেখি অরুণোদয় হইয়াছে। কাহাকেও কিছু না বলিয়া গঙ্গাতীরে যাইলাম, সেই পদধূলির মাদুলী গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন করিলাম। তদবধি সেই মাদুলীর স্থানে সেই ইষ্টদেবীর চিন্ময়ী প্রতিমা স্থাপন করিলাম—“ওঁ তৎসৎ”।

যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি অন্তিমকালেও শ্বাস টানিতে থাকে; হিমাঙ্গ হইলেও, সমস্ত ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত হইলেও শ্বাস টানিতে থাকে, তাহার প্রাণবায়ু ছাড়িয়াও ছাড়িতে চায় না, অভ্যাস বশতঃ ভৌতিক দেহের মায়া ভুলিয়াও ভুলিতে চায় না, তেমনি আমিও সেই পদধূলিকে বিদায় দিবার সময়, জ্ঞান করিলাম, যেন আমার জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া, জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় তাহা গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিলাম। গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ফোঁটা চক্ষের জলও পড়িয়াছিল!!! উঃ! মহামায়ার কি মোহিনী শক্তি! যখন স্বয়ং রামচন্দ্রও সোণার হরিণ দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন, সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়াছিলেন, তখন আমি কোন্ ছার! যে তাহাতে ভুলিব না।

ইষ্টদেবীর সেই স্নেহমাখা, সেই অমৃতমাখা তিরস্কারে আমার দিব্যজ্ঞান হইল, আমি গভীর আঁধারে সেই দিন প্রথম আলোক দর্শন করিয়াছি, জড়ময়ীর অভ্যন্তরে চৈতন্যরূপিণীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। এখনও সে দৈববাণী, সে মাতৃকণ্ঠ বৈকুণ্ঠের বীণাধ্বনির ন্যায় আমার নাড়ীচক্রে অনুক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

যাঁহাকে ভৌতিক জগতের কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই, বেদ বেদান্ত ও দর্শনশাস্ত্রে যাঁহাকে খুঁজিয়া পাই নাই, সেই অঞ্চলের নিধি চিন্তামণি ধনটি শেষে মায়ের অঞ্চলেই পাইলাম!!!

দেবর্ষি নারদ শ্রীরাধাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

“নিগমতরোঃ প্রতিশাখম্
মৃগিতং মিলিতং নহি পরব্রহ্ম।
মিলিতং মিলিতমিদানীম্
গোপবধূটীপটাঞ্চলে নদ্ধম্॥”

নিগম-তরুর আমি শাখায় শাখায়, (১)
খুঁজিয়া খুঁজিয়া হরি! না পাই তোমায়;
পেয়েছি পেয়েছি, এযে গোয়ালার মেয়ে,
অঞ্চলে পরমব্রহ্ম রেখেছে বান্ধিয়ে।

কস্যচিৎ
মাতৃদাসস্য।

(১) ‘নিগম-তরু’—বেদরূপ বৃক্ষ। বেদের অসংখ্য শাখা অর্থাৎ বিভাগ আছে।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার।

জন্ম কথা।

বিশু খ্রীষ্টের জন্ম-বৃত্তান্ত গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে বাইবেলের অষ্টাদশমহাপর্ব্বের কথা আসিয়া পড়ে; কিন্তু কি করি, যে বিবাহের যে মন্ত্র, তাহা অবশ্যই উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। স্বর্গে পরম পুণ্যময় শান্তিরাজ্যে দেবদূতগণ ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত করে। সে বিদ্রোহ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। দূতগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইয়াছিল, মর্ত্ত্যে সে সংবাদ কেহ বলিতে পারে না। যাহা হউক, উক্ত অপরাধ জন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গচ্যুত করেন ও তাহাদের স্থলে মনুষ্যকে অভিষিক্ত করণার্থ তাহাদের সৃষ্টি করেন। আদি নরনারী একটি পরম সুখময় উদ্যানে সংরক্ষিত হইয়াছিল। সে স্থান কিন্তু লোকের বুদ্ধির অগম্য। শয়তান, গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও অসৎ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিল না, প্রলোভন দ্বারা নর দম্পতিকে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, পাপে নিমগ্ন করিল। সুতরাং মনুষ্যকুল মৃত্যুর বশীভূত হইল। এ স্থলে সকলেরই মনে একটি বিতর্ক উদ্ভব হইতে পারে যে, মনুষ্য স্বকৃত পাপের জন্য মৃত্যুর বশীভূত হয় হউক, কিন্তু অন্যান্য নিরীহ প্রাণিকুল মরে কেন? বাইবেলের মধ্যে ইহার কিরূপ মীমাংসা আছে, জানি না। মহাপ্লাবনের সময় চল্লিশ দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণধারা পৃথিবীকে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে আর আর প্রাণিনিচয় নিরপরাধী হইলেও সে মহা উৎপ্লাবনে বিনষ্ট হয়। এ সব তর্কের কথা এখন থাক্‌। উপস্থিত প্রসঙ্গ পুনঃ উত্থাপন করি। শুনিতে পাই, আদি নরদম্পতি সুখস্থান হইতে বিতাড়িত হইবার সময় ঈশ্বর নাকি মনুষ্য কুলের পাপ ক্ষমার নিমিত্ত একজন মাত্র ত্রাণকর্ত্তাকে মর্ত্ত্যে প্রেরণ করিবেন, এরূপ অভয় বাণী দিয়াছিলেন। সেই হেতু লোকে জানিত, কোন একদিন পাপের পরিত্রাণের জন্য স্বর্গীয় ত্রাণকর্ত্তার মর্ত্ত্যে আবির্ভাব হইবে। পাশ্চাত্যভাববাদী ও ভাববাদিনীগণের দ্বারা এবিষয় প্রোক্ত আছে। মোশি (১), ইসায়া, সাইবিল প্রভৃতি। ইহাঁদের সঙ্গে প্রসিদ্ধ লাটীন কবি ভার্জিলও এক পালা ভবিষ্যদ্বাণী গাইয়া গিয়াছেন (২)। কিন্তু কথিত আছে যে, ইটালি দেশস্থিতা ভাববাদিনী কুমেন তাঁহাকে ধুয়া ধরাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে বিজ্ঞ লোকেরা ওকথার এক বর্ণও বিশ্বাস করেন না। কুমেনের স্বরচিত কাব্য কোথায় যে, ভার্জিল তাহা হইতে সৌন্দর্য্যাপহরণ পূর্ব্বক স্বরচিত গ্রন্থকে সৌষ্ঠবান্বিত করিবেন? কুমেনের স্বরচিত বলিয়া যে কাব্য লোক-জগতে বিদিত আছে, পণ্ডিতেরা বলেন, তাহা দ্বিতীয় খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর কোন খ্রীষ্টীয় প্রবঞ্চকের লিপি (৩)। যাহা হউক, নরনারীর অধঃপতনের ৪ সহস্র বর্ষ পরে

১। Founder of Christianity P. 14.

Isaias. ১৬, ৪৫, ৭৪ অধ্যায়।

Sibyls. Bobliothica Classica.

২। IV. Pastoral.

৩। Bebliothica Classica.

অলিম্পিয়ড্ সময়ে, রোম রাজ্য স্থাপনের ৭৫২ বৎসর পরে, রোম্ সম্রাট্ অক্টেবিয়নস্ অগস্তস্ কৈশরের দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ শাসন-কালে, ডিসেম্বর মাসের পঞ্চবিংশ দিবসে, শুভযোগে, পাপের মোচনকর্ত্তা বৈৎলেহম্-নগরে ইহুদীগৃহে অবতীর্ণ হন (৪)। তিনি যিশু, যোসেফের পুত্র বটে। কিন্তু প্রত্যক্ষে এ কথা ঈশ্বর মনুষ্যকে বলেন নাই. পাশ্চাত্য কোন কোন লোক নাকি স্বর্গীয় দূতের নিকট ঐ সংবাদ শ্রুত হইয়াছিলেন। ভাল কথাই, কিন্তু স্বর্গীয় দূত ব্যক্তি বিশে-ষের কাণে কাণে বলিয়া গেলেন কেন?

ভগবান্ জীবের কল্যাণ সাধন করেন, মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন, এ প্রবাদ আর্য্যজাতির চিরপরিজ্ঞাত। "সংসার যৎকালে পাপে মগ্ন হয়, আমি জীবের নিস্তার জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করত ধর্ম্মহীন জগৎকে পুনর্ব্বার সচেতন করি।" (৫) এ সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রও নীরব নহে। ললিতবিস্তর, মহাযান সূত্র, ভদ্রকল্পাঙ্গ, পিঠকাদি গ্রন্থে বুদ্ধের মর্ত্ত্যে আবির্ভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ আছে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে সংসারোৎপত্তি, স্থিতি এবং ইহার লয় সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ভদ্রকল্প তদন্তর্গত। ইহার স্থিতি দুই অর্দ্ধ ও ছত্রিশ কোটী বর্ষ। ইহার ১৫ কোটী, এক লক্ষ, দুইশত বর্ষ শেষ হইয়াছে। এ কল্পে ক্রমপরম্পরা সহস্র বুদ্ধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মস্থাপন করিবেন, তন্নিমিত্তই ইহাকে ভদ্রকল্প বলা হয়। ভদ্র কল্পের দুইটি সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। একৈক বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচার অবধি সংস্থাপিত ধর্ম্মের স্থিতি-কালই বুদ্ধান্তর বা বুদ্ধোৎপাদ নামে অভি-খ্যাত। এবং উক্ত সময়ের পর অবধি অপর বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচার পর্য্যন্ত সময়ই অবুদ্ধোৎপাদে নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। বুদ্ধোৎপাদে ধর্ম্মের দিগ্বিজয়, অবুদ্ধোৎপাদে অধর্ম্মের আধিপত্য বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণনা আছে। (৬) বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচারের অপরাভি-ধান ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন। এবং বৌদ্ধেরা উক্ত সময়কে বুদ্ধধর্ম্মানুশাসন কালের প্রারম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ কল্পে ক্রকুচাঁদ, কনকমুণি, কাশ্যপ এই বুদ্ধত্রয়ের ধর্ম্মাধিপত্য শেষ হইয়াছে, চতুর্থ বুদ্ধ-গৌতমের ধর্ম্মাধিপত্য চলিতেছে। গৌতম পাঁচ সহস্র বর্ষ ভূমণ্ডলে ধর্ম্মাধিপত্য করি-বেন, তন্মধ্যে বর্ত্তমান ১৮৯১ খ্রীষ্ট শতাব্দে বসন্ত পূর্ণিমায় গৌতমের ২৪৩৪ বৎসর ধর্ম্মাধিপত্য শেষ হইবে। অবশিষ্ট ২৫৬৬ বৎসরে ধর্ম্মাধিপত্য করিবেন। উহার পর পূর্ব্বোক্ত অবুদ্ধোৎপাদ কাল উপস্থিত হইলে পৃথিবী ধর্ম্মহীন হইয়া কিছুকাল বহু প্রকারে উৎপীড়িত হইতে আরম্ভ হইবে। পরে তুষিত নাম পুরী হইতে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনঃ অধর্ম্ম স্রোত সংযত করিবেন। এক্ষণে মৈত্রেয় অথবা বৌদ্ধ মেশায়ার আগমন সংবাদ দিলাম। পাঠকবর্গের বিস্ময়োৎপাদন জন্য আর একটী সুসংবাদ দিই। খ্রীষ্টের প্রেরিতগণ বোধ হয় বৌদ্ধদিগের বুদ্ধোৎপাদ ও

৪। সে পটুয়াযিন্থ বা গ্রীক ওলড্ টেষ্টেমেণ্ট মতে ৫৫০৪ বৎসর এবং হিব্রু ওলড্ টেষ্টেমেণ্ট মতে ৪০০৪ বর্ষ পরে। উভয় গ্রন্থে ১৫০০ বৎসরের বৈলক্ষণ্য আছে।

৫। "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" গীতা। প্রলয় পয়োধী জলে ইত্যাদি জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র।

৬। ত্রিপিটক দেখুন।

অবুদ্ধোৎপাদ মানিতেন। কারণ বৌদ্ধেরা ভদ্রকল্পের যে রূপ বর্ণন করিয়াছেন, বাইবেলে প্রায় অবিকল তদ্রূপ মিলেনিয়মের বর্ণনা দৃষ্ট হয়, কে এমন নির্ব্বোধ আছে যে, তাহা অস্বীকার করিবে? খ্রীষ্টীয় মিলেনিয়ম্ এবং বৌদ্ধ ভদ্রকল্প উভয় শব্দের কেবল সামান্য অর্থগত স্বাতন্ত্র্য মাত্র দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, ভদ্রকল্পে সহস্র বুদ্ধ ধর্ম্মাধিপত্য স্থাপন করিবেন, খ্রীষ্টোপাসকেরা বলেন, মিলেনিয়মে খ্রীষ্ট এক সহস্র বৎসর ধর্ম্মাধিপত্য করিবেন। লাটীন্ ভাষায় মিলি শব্দের অর্থ সহস্র, আনি অর্থাৎ বর্ষ, উক্ত উভয় শব্দের যোগে মিলেনিয়ম্ শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মতত্ত্বের পরস্পর নিকট সম্বন্ধ দৃষ্ট হইলে অগত্যা মনে একটা সংশয় জন্মে। নিম্নে উভয় সম্প্রদায়েরই কল্পের বিবরণ দৃষ্টান্ত স্থলে উদ্ধৃত করিলাম, বিহিত বিচার পাঠকদিগের নিকট।

ভদ্রকল্প।

"After the death of each Buddha, his religion flourishes for a time and then decays, till it is at last completely forgotten and wickedness and violence rule over the earth. Gradually then the world improves until at last a new Buddha appears, who again preaches the last Dharma or Truth."

Buddhism by Rhys Davids P. 180.

MILLEUNIUM.

"I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent which is the Devil and old Satan and bound him a thousand years, and cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal upon him. That he should deceive the nations no more till the thousand years should be fulfilled and after that he must be loosed a little season. And when the thousand years are expired, Satan shall be bound out of his prison and shall to deceive the nations." *Revelations, Chapter XX.*

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"হিতবাদী।"

"হিতবাদী" সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। এই সাপ্তাহিক বাহির হওয়ায় আমরা খুব খুসী হইয়াছি। অনেক লোকে মিলিয়া একটা খবরের কাগজ বাহির করা হয়ত এই দেশে এই প্রথম হইল। কেবল মাত্র অনেক লোক নহে; অনেক ভাল লোকে এই কাগজের স্বত্বের অংশীদার, উদ্যোগী, পোষক ও লেখক। ভরসা করা যায়, এত বড় একটা সম্মিলনে এই সংবাদ পত্রে অনেক গুণের সম্মিলন হইবে এবং "বঙ্গদর্শন" যেমন একদিন একপথে বাঙ্গালা ভাষার আদর বাড়াইয়াছিল, ইংরাজিনবিশকেও বাঙ্গালা ভাষা পড়াইয়াছিল, হাসির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানকে বিস্তার করিয়াছিল, তেমনি "হিতবাদী" অন্যপথে সপ্তাহে সপ্তাহে সহজ ভাষায় শিক্ষা ও হাসির ঢেউ বাঙ্গালার চতুর্দ্দিকে অযুতধারে বিস্তারিত করিবে, এবং অগণ্য বালক বালিকার, যুবক

যুবতীর হৃদয়-ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া প্রচুর সুখময়শস্য উৎপাদন করিবে। ভরসা করি, এই পত্রে দ্বেষ অহঙ্কার দোকানদারি কিছুমাত্র থাকিবে না। স্বদেশ-বাৎসলা, আত্মপ্রাণ-সমর্পণে পূত হইয়া এই সংবাদ-পত্র ধর্ম্মপ্রচার, নীতিপ্রচার ও জ্ঞানপ্রচার করিবে।

তিন সংখ্যা আমাদিগের হাতে আসিয়াছে। কোন কোন খবরের কাগজ প্রথম সংখ্যাতেই সমুদয় বিদ্যাবুদ্ধি খরচ করিয়া শীঘ্রই দেউলিয়া হইয়া যায়। এ কাগজ তেমন নহে, জয়ঢাক বাজাইয়া সাহিত্যজগতে প্রবেশ করে নাই। ইহাতে আত্মমর্য্যাদার গাম্ভীর্য্য আছে। আমাদের সম্পূর্ণ আশা যে, ইহা আপাততঃ যেরূপ বাহির হইতেছে, ক্রমশই তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ভাল চলিবে। যখন বঙ্কিম বাবুর প্রতিভা এই পত্রকে প্রদীপ্ত করিবে, যখন কালীপ্রসন্ন ঘোষের গম্ভীর নির্ঘোষ এই পত্রে নিনাদিত হইবে, যখন হেম বাবুর গুপ্ত কবিতা জাগ্রত হইয়া পাঠককে তূরীধ্বনিতে জাগাইয়া চমকিত করিবে, যখন রমেশচন্দ্রের গবেষণা ও স্বাধীন চিন্তা ইতিহাসের গূঢ় তত্ত্ব পাঠককে উপহার দিবে, তখন এই পত্র আরও কি রমণীয় হইবে। তাহার উপর কৃষ্ণকমল বাবুর বিবিধ বিষয়িনী গভীর বিদ্যা প্রতি সংখ্যার সমুদয় প্রবন্ধে সম্পাদকতার কার্য্যে প্রয়োজিত হইলে, এই সংবাদপত্র বঙ্গ সাহিত্য সমাজে অদ্বিতীয় হইবে, তাহার সন্দেহ কি।

রাজনীতি—এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখক অর্থনীতিতে ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। একদিকে আদম স্মিথ (Adam Smith), মিল (Mill), ফসেট (Fowcett) সম্প্রদায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা, অন্যদিকে হেনরি জর্জ (Henry George) প্রমুখ প্রজাপুঞ্জ-দুঃখহারী প্রস্তাব-প্রবর্ত্তক অর্থনীতিজ্ঞদিগের মত ও বিচক্ষণতা অবগত থাকা উচিত। আবার এই সকল মত ভারতবর্ষের অবস্থান্তরে কতদূর প্রচুর্য্য, স্বাধীন চিন্তায় তাহা অবধারিত হওয়া উচিত। লেখকদিগের ইতিহাসে বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ দখল থাকা আবশ্যক। আমাদিগের দেশে অধিকাংশ সংবাদ পত্রে জ্ঞানের ঘোরতর অভাব। লেখক নিজে অজ্ঞ হইলে পাঠকদিগকে কি শিখাইবেন, সুতরাং প্রায়ই কি ইংরাজি কি বাঙ্গলা সংবাদপত্র পড়িয়া পাঠক বিশেষ কিছুই শিখিতে পারেন না, যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারে থাকেন। "হিতবাদী"তে "যেরূপ কৃতবিদ্য লেখকের সম্মিলন হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের এই কলঙ্ক অপনীত হইবে, ভরসা করা যায়।

ধর্ম্মনীতি।—রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি হিন্দুগ্রন্থ হইতে দেশীয় উদাহরণ ও ভাব নির্ব্বাচন করিয়া শিক্ষা-বীজ বপন করিলে বিশেষ ফল ফলিবার সম্ভাবনা। এই সকল ভাব বিশদভাবে বুঝাইবার জন্ত অথবা সম্যক পরিপুষ্টার্থে ইংরাজি গ্রন্থের মত ও যুক্তি অনেক সময় গ্রহণীয়, কিন্তু মূলে দেশীয় গ্রন্থের ভাব যেমন সহজে দেশীয় হৃদয় আকর্ষণ করিবে, বিদ্ধ করিবে, উত্তেজিত ও জীবিত করিবে, তেমন আর কিছুতেই করিবে না। পরমার্থ বিষয়ে হিন্দু জাতি কোন্ জাতি অপেক্ষা ন্যূন? বঙ্কিম বাবু যে প্রণালীতে ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, সেই রূপ লেখা বোধহয় অনেক লোকের পাঠোপযোগী।

স্বাস্থ্য।—এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় মত প্রধানত উদ্ধৃত ও সমালোচিত হইয়া, যাহা এখন প্রচলিত বা রক্ষিত হওয়া হিতকর, তাহা প্রচারিত হওয়া বিধেয়। চরক, সুশ্রুত, বাভট, ভাবমিশ্র প্রভৃতি চিকিৎসাশিরোমণিগণ যে সকল রত্ন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমাদিগের দেশ বায়ু জলোপযোগী যে সকল অমূল্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সাধারণের নিকট বিলুপ্ত হইয়া, অজ্ঞানতা বশতঃ বিদেশীয়দিগের আচার ব্যবহার অনুকরণ করায় আমাদিগের যে হানি হইতেছে, তাহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। আপাততঃ বর্ষাকাল। বর্ষাকালে কি কি রূপ আহার, পান ও অবস্থান স্বাস্থ্যজনক, তৎসম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় মত ও ইংরাজি মত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ লেখা ভাল। যথা কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত নরসিংহ প্রণীত "নির্ঘণ্টুরাজ" নামক গ্রন্থে দ্রব্য সকলের বিশেষতঃ সাধারণের আহার দ্রব্য সকলের যে সকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রচার করা এবং ইউরোপীয় রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা যে সকল গুণ নির্ণীত হয়, তাহা প্রচার করা ভাল। আমাদের "শৈল স্বাস্থ্য নিবাস" প্রবন্ধটী বেশ। কিন্তু আমাদের দেশে বোধ হয় বিশ হাজার লোকের মধ্যে একজন লোক স্বাস্থ্যের জন্যও এই সকল নিবাসে যাইতে পারেন না। সুতরাং সমতলভূমিতে আমাদের প্রত্যেকের আবাসস্থান কিসে স্বাস্থ্য নিবাস হইতে পারে, এবং ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত দেশ কিসে স্বাস্থ্যজনক হইতে পারে, তাহার আলোচনা হইলে অধিক লোকের উপকার হইতে পারে। বস্তুতঃ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক লিখিবার প্রয়োজন। ভারতবাসীর বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান একত্র করিয়া যাহাতে অস্বাস্থ্য-পীড়িত স্বদেশীয়গণের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারা যায়, তাহা করা নিতান্ত আবশ্যক। যখন লেখকদিগের মধ্যে একদিকে কবিরাজ ও অন্য দিকে ভারতচিকিৎসক-কুলতিলক মহেন্দ্র লাল সরকার ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বহুদর্শী যদুনাথ বিরাজ করিতেছেন, তখন হিতবাদীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রধান ব্যবস্থাপক হওয়া উচিত।

জীবনচরিত।—"মহারাণী ভিক্টোরিয়া" বেশ হইয়াছে। তবে আরও সহজ ভাষায় দেশীয় মহিলাগণের হৃদয়স্পর্শী ভাবে লিখিত হইলে ইহার উপকারিতা আরও অধিক হইত। প্রতি সংখ্যায় একটী করিয়া জীবনচরিত থাকিলে ভাল হয়। বর্ত্তমান বড় লাট, ছোট লাট প্রভৃতি লোকের জীবনী বিবৃত করা মন্দ নহে।

আইন ও আদালত সম্বন্ধে প্রতিবারে অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে কিছু থাকিলে অনেকের পাঠ্য হইতে পারে। "কুলবধূর কারাবাস" বেশ হইয়াছে। যখন ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টে কোন প্রয়োজনীয় নজির বাহির হয়, তাহা সমালোচিত হওয়া ভাল। যদি সমালোচনা না হয়, তাহা হইলে সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিলে অনেকের উপকার হয়। "যথা গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা গচ্ছিত থাকিলেও তাহা তামাদি হইয়া যাইতে পারে, এই বিচিত্র বিচার*, হিন্দুনারী মুসলমান হইলেও পূর্ব্ব স্বামী জীবিত থাকিতে অন্য স্বামী গ্রহণ

* I. L. R. 18 Calcutta series, 234.

করিতে পারে না †, এই তর্ক সহ মৃত, অষ্টমের ইস্তাহারে রোবাবাদ লেখা না থাকিলে নিলাম রদ হইবে, এই বিচার প্রমাদ। ‡

সমালোচন।—নূতন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ভাল করিয়া করিলে তাহাতে আমোদ ও শিক্ষা দুইই আছে। ইংরাজি সাময়িক পত্রিকাতে যে সকল সারগর্ভ ও মনোহর প্রবন্ধ থাকে, বিশেষত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার সারাংশ প্রয়োজন সাত সটীক প্রকাশ করিলে পাঠকের জ্ঞান লাভ হইতে পারে।

হিতবাদী লেখক যদি এই সকল পত্রিকা আয়ত্ত করিবার সময় না পান, Stead সাহেবের Review of Reviews পত্রিকা হইতে অনেক সাহায্য পাইতে পারেন। কোন বিদেশীয় পুস্তকে কোন নূতন ও চমৎকার ভাব প্রকাশিত হইলে, তাহার স্থূল মর্ম্ম সংক্ষেপে পাঠককে জানান ভাল।

গল্প।—প্রত্যেক সংখ্যাতে একটীর অধিক গল্প থাকিলে প্রবন্ধ-দারিদ্র্য মনে হয়। আর দুটী ক্ষুদ্র গল্পে যে স্থান দেওয়া যায়, তাহা একটা গল্পে দিলে তাহা অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ হয়। গল্প গুলিতে একটু প্লট (plot) না থাকিলে, তাহা প্রায়ই মনোহর হয় না। তারপর কি হইল, তারপর কি হইল, জানিবার ইচ্ছা যে গল্পে উদ্দীপিত না করে, সেই গল্পই অধিকাংশ স্থলে প্রায় পঠিত হয় না। যেরূপ গল্প বাহির হইতেছে, ভরসা করি, তদপেক্ষা শীঘ্র মনোহর গল্প বাহির হইবে।

ভাষা আরও সহজ, সতেজ ও দেশীয় ভাবাপন্ন হইলে ভাল হয়। সুশিক্ষিত লোকের জন্য একটীমাত্র প্রবন্ধ থাকিলে চলে। কিন্তু অর্দ্ধ-শিক্ষিত যাহারা ইংরাজি জানেন না, এবং বাঙ্গালাই যাহাদিগের একমাত্র সম্বল, এরূপ নর নারী, বালক বালিকাদিগকে মনে রাখিয়া অতি সহজ অথচ সতেজ ভাষায় অন্তত দুইটী প্রবন্ধ প্রতি সংখ্যায় থাকা বিশেষ দরকার। আর যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, চাসার ফসল না হইলে চাসার মত যাহাদিগের অন্নকষ্ট, তাহাদিগকে মনে রাখিয়া মাসে মাসে রাজ্যের অবস্থা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা যাহা লিখিলাম, ভরসা করি, হিতবাদী-লেখককুল কর্ত্তৃক তাহা আত্মীয় ভাবে পঠিত হইবে এবং এই লেখাতে যদি আর কিছু না থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ একজন পাঠকের অভিলাষ 'হিতবাদী' অবগত হইলেন, এই মনে করিবেন। সাধারণ লোকে কি কি চাহে, যদি আমি বর্ণনা করিতে না পারিয়া থাকি, একজন পাঠক কি কি চাহে, অন্ততঃ তাহা বর্ণনা করিয়াছি।

গরিব ব্রাহ্মণ।

† I. L. R. 18 Calcutta series, 264.
‡ I. L. R. 18 Calcutta series, 474.

ভবভূতির প্রকৃতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

প্রকৃতি প্রেম, প্রকৃতি বর্ণনা, প্রকৃতি সহচারিতা, প্রকৃতি পদ সর্ব্বদাই প্রযুক্ত হইয়া থাকে; প্রকৃতি শব্দের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না করিলে ঐ সকল পদের অর্থ গৃহীত হইতে

পারেনা। আমরা সেই কাব্যগত প্রকৃতির, বিশেষতঃ ভবভূতি-প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

প্রকৃতি বেদান্তের ব্রহ্ম, বা কাব্য শাস্ত্রোক্ত বনদেবী নহেন। ইহাঁকে শঙ্করোক্ত মায়ার ছায়ায় স্থাপিত করা যাইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আকাশ হইতেও ইহার ব্যাপকতা অধিক; আকাশ পরমাণুর অভ্যন্তরে অবস্থান করিতে পারেনা, কিন্তু প্রকৃতি পরমাণুর অভ্যন্তরেও বিরাজিত। ইনি আকাশের ন্যায় অচেতন নহেন, এবং সাংখ্যোক্ত পুরুষ-সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ বা বেদান্তোক্ত ব্রহ্মবৎ শুদ্ধ চেতনা মাত্রও নহেন, কিন্তু চেতনাযুক্ত। জড় ও অজড় উভয়ই ইহার অসীম দেহের অন্তর্গত। কপিল শাস্ত্র হইতে গৃহীত হইলেও উক্ত শাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক প্রকৃতির ন্যায়, কবি-প্রকৃতি অচেতন নহেন। কপিল প্রকৃতি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ে স্বাধীন হইয়াও অচেতন এবং সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মিকা; কবি প্রকৃতি সচেতন ও কেবল সুখময়ী, উহাতে দুঃখ বা মোহের লেশও বর্ত্তমান নাই। অতএব মম্মট ভট্ট বলিয়াছেন "ব্রহ্মার সৃষ্টি সতত একবিধ, কবির সৃষ্টি সতত অভিনব; ব্রহ্মার সৃষ্টি সুখ, দুঃখ ও মোহময়, কবির সৃষ্টি বিশুদ্ধ আনন্দময়; ব্রহ্মার সৃষ্টি পরমাণু ও কর্ম্ম সাপেক্ষ, কবির সৃষ্টি স্বাধীন; ব্রহ্মার সৃষ্টিতে ষট্ রস, কবির সৃষ্টিতে নবরস; অতএব কবির ভারতীকে অভিবাদন করি।"* যদি বলা হয়, করুণ রসে দুঃখ সমুদ্ভূত হয় বলিয়া কবি প্রকৃতির আনন্দময়ত্ব স্বীকার্য্য নহে; তদুত্তরে বক্তব্য এই, "করুণ, বীভৎস, ও ভয়ানকাদি রসে যে পরম সুখ উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে সহৃদয়গণের অনুভবই একমাত্র প্রমাণ। তথাপি অসহৃদয়গণের প্রবোধার্থে বলা হইতেছে, যদি করুণাদিরসে দুঃখের লেশও বর্ত্তমান রহিত, তবে কেহই করুণ-রসের আস্বাদন জন্য এত ব্যস্ত হইতেন না। কোন চিত্তবান্ ব্যক্তিই দুঃখানুভবের জন্য ব্যস্ত হন না।" †

রসের উৎপত্তি কেমন অলৌকিক এবং উহার আস্বাদ কিরূপ আনন্দময়, তাহা বুঝিতে পারিলেই কবি-প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়; কেননা রসই কবিপ্রকৃতির প্রেম নিস্যন্দ; উহার একের অনুভবে অন্যের অনুভব অবশিষ্ট রহেনা। ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা মম্মট ভট্টের রস পরিচ্ছেদ হইতে কিয়দাংশ উদ্ধৃত করিব।

(১)"কাব্যে ও নাট্যে, কারণ এইরূপ নাম

* নিয়তি কৃতি নিয়ম রহিতাং
হ্লাদৈকময়ীমনন্য পরতন্ত্রাং
নবরস রুচিরাং নির্ম্মিতি
মাদধতী ভারতী কবের্জয়তি ॥ কাব্যপ্রকাশ।

† করুণাদাবপি রসে জায়েত যৎ পরং সুখং।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলং ॥৩৫
অপি শব্দাৎ বীভৎস ভয়ানকাদয়ঃ। তথপ্যসহৃদয়ানাং মুখমুদ্রণায় পক্ষান্তরমুচ্যতে।
কিঞ্চতেষাং যদা দুঃখং নকোঽপিস্যাত্তদম্মুখঃ ॥৩৬
নহি কশ্চিৎ সচেতা আত্মনা দুঃখায় প্রবর্ত্ততে।
সাহিত্যদর্পণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(১) "লোকে প্রমদাদিভিঃ স্থায্যনুমানে অভ্যাসপাটব বতাং কাব্যে নাট্যেচ তৈরেব কারণত্বাদি পরিহারেণ বিভাবনাদি ব্যাপারবত্বাৎ, অলৌকিক বিভাবাদি শব্দ ব্যবহার্য্যৈঃ মমৈবৈতে শত্রোরেবৈতে, তটস্থস্যৈবৈতে, ন মমৈবৈতে ন শত্রোরেবৈতে, ন তটস্থস্যৈবৈতে ইতি সম্বন্ধ বিশেষ-স্বীকার পরিহার-নিয়মানধ্যবসায়াৎ সাধারণ্যেন প্রতীতৈঃ অভিব্যক্তঃ সামাজিকানাং বাসনাত্মতয়াস্থিতঃ স্থায়ী রত্যাদিকো

ত্যাগ করত, স্থায়ী * ভাবের বিভাবক অর্থাৎ প্রকাশক বলিয়া, বিভাব এইরূপ অলৌকিক (অপ্রচলিত) নামে কথিত, এবং অভিনয় কালে এই সকল স্ত্রী প্রভৃতি বিভাব আমার, আমার শত্রুর বা তৃতীয়ের ; অথবা আমার নহে, আমার শত্রুর নহে, বা তৃতীয় পক্ষের নহে, এইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার বা পরিত্যাগ কিছুই না করিয়া, অভিনীত সীতা বা রামের সীতাত্ব বা রামত্ব রূপ বিশিষ্টাংশ ত্যাগ করত স্ত্রীরূপে বা পুরুষরূপে সামান্যত গৃহীত সীতাদিরূপ অভিনীত বস্তুদ্বারা, স্থায়ী ভাবের অনুমানে সমর্থ সহৃদয়গণের অন্তরে বাসনারূপ সূক্ষ্মভাবে স্থিত অনুরাগ প্রভৃতি স্থায়ীভাব * ব্যঞ্জনা শক্তিবলে অভিব্যক্ত হইলেই রসনামে কথিত হয়।

আস্বাদকালে আস্বাদ্যমান ও আস্বাদ-

নিয়ত প্রমাতৃ গতত্বেন স্থিতোপি সাধারণোপায়বলাৎ তৎকাল বিগলিত-পরিমিত--প্রমাতৃভাব--বশোন্মেষিত-বেদ্যান্তর-সম্পর্কশূন্যা পরিমিত ভাবেন প্রমাত্রা সকল হৃদয় সম্বাদ ভাজা সাধারণ্যেন স্বাকারে ইব অভিন্নোপি গোচরীকৃতঃ চর্ব্ব্যমান তৈকপ্রাণঃ বিভাবাদি জীবিতাবধিঃ পানকরসন্যায়েন চর্ব্ব্যমানঃ পুরইব পরিস্ফুরণ্ হৃদয়মিব প্রবিশন্ সর্ব্বাঙ্গীন-মিবালিঙ্গন্ অন্যৎসর্ব্বমিব তিরোদধৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্ অলৌকিক চমৎকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ।

মচনকার্য্যঃ বিভাবাদি বিনাশেঽপি তস্য সম্ভব প্রসঙ্গাৎ। নাপিজ্ঞাপ্যঃ সিদ্ধস্য তস্য সমভবাৎ। অপিতু বিভাবাদিভিঃ ব্যঞ্জিতশ্চর্ব্বণীয়ঃ। কারক জ্ঞাপকাত্যামন্যৎ ক্ব দৃষ্টং ইতি চেৎ ন কচিদ্দৃষ্টমিতি অলৌকিক সিদ্ধের্ভূষণমেতন্ন দূষণং। চর্ব্বণা-নিষ্পত্ত্যাতস্য নিষ্পত্তিরূপ চরিতা ইতি কার্য্যোঽপ্যুচ্যতাং।

অলৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণতাট স্থাব বোধ-শালিমিত যোগিজ্ঞান বেদ্যান্তর সংস্পর্শরহিত স্বাত্মমাত্র পর্য্যবসিত-পরিমিতেতর যোগিসংবেদন বিলক্ষণ-লোকোত্তর-স্বসংবেদন গোচর ইতি প্রত্যয়েঽপ্যভিধীয়তাং। তদ্গ্রাহকঞ্চ ন নির্ব্বিকল্পকং বিভাবাদি পরামর্শ প্রধানত্বাৎ। নাপি সবিকল্পকং চর্ব্ব্যমানস্য অলৌকিকানন্দময়স্য স্বসংবেদন সিদ্ধত্বাৎ। উভয়াভাব স্বরূপস্য চ উভয়াত্মকত্বমপি পূর্ব্ববৎ লোকোত্তরতামেব গময়তি নতু বিরোধমিতি।" কাব্যপ্রকাশ।

---

* প্রত্যেক রসই মনের একএকটী স্থায়ীভাবকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হয়। যথা শৃঙ্গাররস রতি বা অনুরাগকে আশ্রয় করে. অতএব রতিই শৃঙ্গার রসের স্থায়ীভাব বলিয়া উক্ত হয়। এইরূপ করুণ রস শোককে আশ্রয় করত প্রবাহিত হয়, অতএব সেই শোকই করুণ রসের স্থায়ীভাব। এইরূপ প্রত্যেক রসেরই একএকটী ভাব আছে, তাহাকে স্থায়ীভাব বলে। সেই অনুরাগ, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি স্থায়ীভাবের আবার কারণ আছে, সেই কারণকে অনুভাব বলা হয়। যথা রামের অনুরাগের কারণ সীতা, অতএব সীতাকে উক্তরসের বিভাব বলা হয়। সীতার কটাক্ষপাতাদি ইচ্ছা সহকৃত কার্য্য উক্তরসের কার্য্য, অতএব উহাকে অনুভাব বলা হয়, ঈর্ষ, অশ্রু প্রভৃতি সহকারী, তাহাকে ব্যভিচারী ভাব বলে। এই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব হইতে রস জন্মে। প্রত্যেক রসেরই এই তিনভাব আছে।

---

* শব্দের তিন প্রকার শক্তি আছে, অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। গঙ্গা এই শব্দের সঙ্কেত অনুসারে গঙ্গা বলিতে যখন গঙ্গা বুঝায়, উহা গঙ্গা শব্দের অভিধা শক্তিদ্বারা বুঝাইল মনে করিতে হইবে। যখন গঙ্গা বলিতে গঙ্গাতট বুঝায়, তখন মুখ্যার্থ বাধা হওয়াতে গঙ্গা শব্দের লক্ষণাশক্তি প্রকটিত হইল। "সূর্য্য অস্ত যায়" ইহাদ্বারা সূর্য্যাস্ত বুঝাইলে শব্দের অভিধা শক্তিই প্রকাশ পায়, কিন্তু চোরের মুখে "সূর্য্য অস্ত যায়" এই কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ "চুরি করিবার সময় হইয়াছে" এইরূপ অর্থগ্রহণ শব্দের যে শক্তিদ্বারা হয়, তাহাই ব্যঞ্জনা শক্তি।

ষ্বিতার ভেদ-প্রদর্শিকা ও লৌকিক বিষয়ের অনুভব শক্তি বিলুপ্ত হয় বলিয়া, অপরিমিত ভাবপূর্ণ সকল হৃদয়ের সম্বাদস্ত আস্বাদয়িতা কর্ত্তৃক রস ব্যক্তি বিশেষের নহে, কিন্তু সাধারণের বলিয়া চর্ব্বিত হয়।

যদিও আস্বাদই সরস, আস্বাদ ভিন্ন রসের অস্তিত্ব নাই, তথাপি যোগাচারমতে শব্দাদি বিষয় (external world) জ্ঞানের আকার (Forms of idea) বলিয়া স্বীকৃত হইলেও যেমন জ্ঞান দ্বারাই তাহার অনুভব হয়, সেইরূপ আস্বাদ রস হইলেও রস আস্বাদিত হয়। রস বিভাবাদির জীবন পর্য্যন্ত স্থায়ী, উহা চর্ব্বিত হইলে যেন সম্মুখে পরিস্ফুরিত, হৃদয়ে প্রবিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গে প্রসৃত, অন্যভাব বিলুপ্ত ও ব্রহ্মানন্দ প্রবাহিত করত অলৌকিক চমৎকারীরূপে প্রকটিত হয়।" ইহাদ্বারা রসের দিব্য উৎপত্তি ও পরমানন্দময়ত্ব প্রমাণিত হইল। প্রকৃতির প্রেম নির্য্যাসরূপ রস কি দিব্য উপকরণে রচিত, কিরূপ অপার্থিব সামগ্রী, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আরও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। "এই রস কার্য্য নহে, কেননা রসের কারণ বিভাবাদি বিনষ্ট হইলেও রসের অস্তিত্ব সম্ভব; রস জ্ঞাপ্যও নহে, কেননা ঘটাদির ন্যায় রস উৎপন্ন হইয়া জ্ঞাত হয়না, কিন্তু উৎপত্তির সমকালেই জ্ঞাত হয়; অর্থাৎ বিভাবাদিদ্বারা ব্যঞ্জিত হইয়াই চর্ব্বিত হয়। কারক ও জ্ঞাপক ভিন্ন বস্তু কোথায় দৃষ্ট হইয়াছে? এরূপ বস্তু অন্যত্র দৃষ্ট হয়না বলিয়াই রস অলৌকিক। অন্যত্র দৃষ্ট না হওয়া অলৌকিকত্বের পোষক, বিরোধী নহে। পক্ষান্তরে চর্ব্বণাদ্বারা রস নিষ্পত্তি হয় বলিয়া লক্ষণা বলে নিষ্পত্তি হেতু তাহাকে ঘটাদির ন্যায় কার্য্যও বলিতে পার। প্রত্যক্ষাদি লৌকিক-জ্ঞান, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ভিন্ন অপক্ক যোগিগণের ধ্যানজ জ্ঞান, ও পক্ক-যোগিগণের লৌকিক বিষয়ের সম্বন্ধ রহিত পরমাত্মক জ্ঞান হইতে অন্যরূপ, লোকাতীত যে স্বাত্মকজ্ঞান, রস তাহারই বিষয়; অতএব রসকে জ্ঞেয় বস্তুও বলিতে পার। রস যে জ্ঞানের বিষয়, তাহা * নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান নহে, কেননা বিভাবাদি দ্বারা রস অনুমিত হয়; উক্ত জ্ঞান সবিকল্পকও নহে, কেননা চর্ব্বণাকালে অলৌকিক আনন্দ উৎপন্ন হয় বলিয়া বিষয়ান্তরের প্রতীতি কোনরূপে সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে উক্তরস নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প উভয়বিধ জ্ঞানেরই বিষয়, সুতরাং রস অলৌকিক। রসের আলম্বন ও উদ্দীপনময়ী প্রকৃতি এই জন্যই কেবল আনন্দময়ী, অতএব কবির প্রকৃতি, কপিল প্রকৃতি হইতে ভিন্ন।

কবিপ্রকৃতি পরমেশ্বর নহেন। ইনি বিশ্বস্থ জীব-পুঞ্জের কর্ম্মফল বিধাত্রী নহেন। ইনি মনুষ্য-প্রকৃতির চিরসখী, অতি সুকুমার ও অতিশয় লজ্জাবতী। ইনি কাহার অপরাধ মনে পোষণ করত প্রতিফল প্রদানের জন্য ব্যস্ত নহেন। ঈশ্বরের ন্যায় অধ্যবসায় সহকারে শাস্তিবিধান বা পুরস্কার বিতরণ ইঁহার ব্যবসায় নহে। সুখী ও দুঃখী প্রভৃতি বিষম সৃষ্টিবিধান করত ঐশ্বর্য্য প্রকাশও ইঁহার কার্য্য নহে। ইনি বিপদে বরদাত্রী নহেন, যে বীজমন্ত্রে বা পুষ্পাদি উপহারে ঈশ্বর অনুকূল হন, ইনি সে

* বস্তুর নাম, রূপ, জাতি প্রভৃতি বিশেষণ শূন্য জ্ঞানই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান। তাহার বিপরীত জ্ঞান সবিকল্পক।

প্রকারে অনুকূল হইবার নহেন। স্বর্গে ও নরকে উত্তোলন ও নিপাতনে ইহাঁর অতিশয় আলস্য। ইনি পরলোকের সংবাদ রাখেন না। ইনি পরমেশ্বর নহেন।

ইহাকে বেদান্তমতে ঈশ্বর হইতে সূক্ষ্মতম, চিদচিৎ হইতে পৃথক, সদসৎ হইতে বিশিষ্ট, চিন্মাত্র সঙ্কেতিত ব্রহ্মও বলা যায় না। কারণ পঞ্চতন্মাত্র যেরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, উক্ত চিন্মাত্র সঙ্কেতিত পদার্থ তদ্রূপ মনেরও অগোচর; বহু সাধনান্তে মানব তাঁহাকে জ্ঞাননেত্রে লক্ষ্য করিতে পারে। পক্ষান্তরে কবি-প্রকৃতি মনুষ্যের অন্তর ও বাহ্য উভয় ইন্দ্রিয়কে পরিতর্পিত করত মোহিত করিতেছেন। ইনি শিশু-ভাবের অনুসারিণী। কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ শৈশবে নিভৃত কাননে প্রবেশ করত, বালকবৃন্দ কর্ত্তৃক বৃক্ষের পল্লবাদি ভগ্ন হইলেই, বনবাতের অব্যক্ত নিশ্বাস, প্রকৃতির সরোধ গর্জ্জন অনুভব করত বিস্ময়ে লোমাঞ্চিত ও স্তম্ভিত হইতেন।

ভবভূতি দাক্ষিণারণ্যের নির্জ্জন গিরি-ভূমিতে উপবেশন করত যমুনাতটের নিশীথ বংশীধ্বনিবৎ এই প্রকৃতির বিরহ সঙ্গীত শ্রবণে উন্মত্ত হইতেন। প্রকৃতির প্রশান্ত ভাব সমূহ বিরহের নিশ্বাস বাসিত হইয়া ভবভূতির চিত্ত অভিভূত করিত। আনন্দ-ময়ী হইয়াও ভবভূতির বিশ্বব্যাপিনী প্রকৃতি বিষাদের আবরণে আবৃত। অতএব ভব-ভূতির কাব্য, প্রকৃতির অগাধ গম্ভীর ভাব সমূহের প্রতিবিম্ব। কবি স্বকীয় কাব্যে প্রশান্ত ও বিপ্রলম্ভময় কোন ভাবের উপাসনা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতি আদ্যন্তই প্রশান্ত। তাঁহার অমৃত-ময়ী যে লেখনীর মুখ হইতে জানকীর দিব্য প্রেম নিস্যন্দিত হইয়াছে, সে লেখনী প্রকৃতির ভাগ্যেও এক প্রশান্ত ও উপাস্যভাব আসঞ্জিত করিয়াছে। তদীয় কাব্যে ভাব-চাপল্যের অবকাশ নাই; বৃহৎ তরঙ্গের উপর যে এক হাস্যময় ক্ষুদ্রবীচি নৃত্য করিয়া থাকে, কবির প্রশান্ত ভাব-তরঙ্গে তদ্রূপ চপল তরঙ্গের লেশও অবলোকিত হয়না। ভবভূতি কবি জীবনে আজন্ম বৃদ্ধ। তাঁহার হৃদয়ে সকলই গাম্ভীর্য্যময়। উহাতে তরুণের উন্মত্ত কবিতা লক্ষিত হয় না। তদীয় কাব্যে একটী হাস্য নাই, একটী বক্রোক্তি নাই, একটু প্রণয় কামিনীর বিভ্রম বিভা নাই। উহাতে একটু তিমিতের আভা বা হৃদয়-স্পৃক্ মন্দ মলয় মারুত নাই। চিত্র দর্শন সময়ে জানকী উর্ম্মিলাকে লক্ষ্য করত একটু হাস্য করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা হৃদয় কবাটোদ্ঘাটি নহে; লক্ষ্মণের লজ্জাস্থলে কবি সে হাস্যটুকু গোপন করত যেন তৎক্ষণাৎ স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা করি-লেন। বহু রোদনের পর সহসা সমুত্থিত হাস্যের ধবলিমা যেমন নয়ন জলে আবৃত হয়, ভবভূতির হাস্যও তেমনই বিষাদে নিমগ্ন হইয়া যায়। ভবভূতির সকলই অতি ঘন, অতি গভীর ও অতি তরস্বী, তাহার বিষাদ আনন্দের পোষক, আবার সেই বিষাদও ক্ষণিক আনন্দের উন্মেষে অলঙ্কৃত। ভাবের এইরূপ সংঘর্ষ তদীয় প্রকৃতির অন্তর হইতে প্রতিবিম্বিত। ভবভূতি দাস্যভাবে এই গাম্ভীর্য্যময়ী ও আনন্দময়ী প্রকৃতির উপাসনায় প্রমত্ত। ভবভূতির প্রকৃতি বনদেবীর ন্যায় একস্থানে অধিষ্ঠিতা নহেন, জগতের প্রতি দিশি তাঁহার অবস্থান, কিন্তু নির্জ্জন বনভূভাগে, গভীর নিকুঞ্জে ও তটবর্ত্তী গাঢ়চ্ছায়াময় বনপাদপ প্রতিবিম্বশালিনী

স্রোতস্বতী তাঁহার প্রকাশ ও আবির্ভাবের সমুচিত স্থান। সেইরূপ স্থানে প্রকাশিত হইয়াই তিনি কবির নির্ম্মল ও স্বচ্ছ চিত্তে স্বকীয় ভাব-তরঙ্গ প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। ভবভূতির কাব্য সমূহ তদীয় প্রকৃতির এই প্রকার চিত্র প্রদর্শন করত পাঠককে অবিরত মোহিত করিতেছে। ক্রমশঃ

শ্রীবসন্ত কুমার রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বঙ্কিমচন্দ্র।

বরষার শষ্প শ্যাম-তমাল বরণ
চির মরকত আভা—চির জ্যোতির্ম্ময়
প্রাণের প্রভাব তব—মহান হৃদয়!
গরীয়সী গরিমার রম্য নিকেতন—।
নহ শুধু বীরবর—কেন্দ্র মহিমার—
নিজ অমরতা দিয়া—যে মূর্ত্তি নিকর
গঠিয়াছ কাব্যবনে—তারাও অমর—
তারাও সংসার মাঝে, সৌন্দর্য্যের সার।
কিশলয় কোমলতা—ভ্রমর গুঞ্জন
বধূর মধুর ভাষা—দান—প্রতিদান
অন্তরের—হৃদয়ের—অমিয় সমান;
তোমার কাব্যের মাঝে করি পরশন
ভাবী বঙ্গগগনের তুমি পূর্ণ-কল
আমরা স্তিমিত তারা রহিব কেবল—।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথ।

ভাই রবি,
প্রতিভা মরীচি তব স্নিগ্ধ সুবিমল
সাহিত্য জগত যাহে, হ'য়েছে উজ্জোর,
পূর্ব্বরাগময় প্রাণে বসন্ত বিভোর—
যামুন—প্রবাহ রূপ—বহে অবিরল—
রূপপায়ী সখে তুমি প্রেমের পাগল!
প্রাণের নির্য্যাস প্রেম করি সদা পান
নহ তৃপ্ত তাই এত অতৃপ্তির গান;
মুষ্টিমেয় প্রতিদানে বিহ্বল বিহ্বল।
নয়নার লাবণ্যময় কণক কিরণ,
পান ক'রে ও নয়ন না হয় উদাস,
দৃষ্টিদিয়া বহে ধীরে দক্ষিণ বাতাস,
বিরহ মিলনে যেন, গঠিত জীবন
কবিতা বধূটি উঠে যৌবনে হাসিয়া
অধরের স্পর্শময় সম্ভাস শুনিয়া।

শ্রীবেণোয়ারী লাল গোস্বামী।

প্রতিদান।

প্রকৃতিগো চিরদিন তব স্নেহ আকিঞ্চনে
দীন ভিখারির মত চেয়ে রব অবিরত
তোমার অক্ষয় সুখ অমৃত ভাণ্ডার পানে?
স্নেহভিক্ষা পাব বলি, হয়ে আসি কৃতাঞ্জলি
প্রতিদিন দাঁড়াব কি তোমার দুয়ারে গিয়া?
নব উষা নব শশি নব নব স্নেহ রাশি,
চিরদিন চাহিবে কি অতৃপ্ত মানব হিয়া?
দুদিনের স্নেহভারে যেবা না বহিতে পারে
চিরদিন থাকে বসি—লয়ে অকৃতজ্ঞ প্রাণে;
সেবা কেন হাসিমুখে চায় ফেরে নব সুখে
ভাবে নাকি একদিনো বিমুখ সে প্রতিদানে!

প্রতিদিন নব রবি তাহার অযুত করে
ত্রিদশ-ভাণ্ডার হতে স্নেহসুধা বিলাইতে
এমনই আসিবে কি অভাগার ভাঙ্গাঘরে?
প্রতিদিন নিশি শেষে, উষা আসি দ্বার দেশে
ডাকিবেকি স্নেহ ভরে ঘুমন্ত হৃদয়ে মোর?
আমি কি অমনি উঠি, বাড়াইয়া হাত দুটী
প্রসাদ যাচিয়া লব লয়ে চোখে ঘুমঘোর?
যেদিন রাখিতে স্নেহে স্থান নাহি পাব গেহে
হৃদয় উপছি ব'বে কৃতজ্ঞের অশ্রুধারা;
সেই সে সুখের দিনে ক্ষুদ্র হৃদি প্রতিদানে
কিবা দিবে তাই ভেবে হই যে আপনা হারা।

শ্রীফকীরচন্দ্র সাধুখাঁ।

শিক্ষা। *

বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছায় আমাদের চিকিৎসা-বিদ্যালয় আবার এক বৎসর অতীত করিয়া নববর্ষে পদার্পণ করিল। আজ কয়েক বৎসর হইতে বৎসরের প্রারম্ভে একটী করিয়া রচনা পাঠ বা মৌখিক বক্তৃতা প্রদান করার পদ্ধতি হইয়া আসিতেছে। এ বৎসর এই গুরুতর ভার আমার স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। ইহাতে যদিও আমি আপনাকে বিশেষ সম্মানিত মনে করি, তথাচ আমি শতবার মনে করি যে, আমাপেক্ষা যোগ্যতর অন্য কোন শিক্ষক মহোদয় এই ভার গ্রহণ করিলে ভাল হইত।

কোন জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠে আপনাদিগের কর্ণকুহর শীতল করিতে পারিলেই চরিতার্থ লাভে সমর্থ হওয়া যায়, কিন্তু অন্ধের চিত্রপট-দর্শন-বাসনা মনে উদিত হইয়া মনেই বিলীন হইয়া যায়, সিদ্ধিলাভের পথ চির-তমসাচ্ছন্ন বলিয়া চরিতার্থ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমাদের হৃদয়ের বাসনা হৃদয়ে উঠিয়া বুদ্বুদাকারে হৃদয়েই মিলাইয়া গেল; জ্ঞানের অভাবে পরিপুষ্ট হইতে পারিল না। কিংশুক পুষ্পের গন্ধ নাই, তথাপি আড়ম্বরময় রূপের ছটায় জনগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে। কিন্তু রূপ-গন্ধহীন পুষ্পের অবস্থা কি হইবে? সে বনে ফুটিয়া বনেই শুকাইয়া পড়িবে। কেহ দেখিবে না, কেহ তাহার গন্ধ লইবে না। আমাদের মত মানবের অবস্থাও সেইরূপ। চিত্রকর চিত্রকার্য্যে সুনিপুণ হইলে তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে থাকিয়াও মনকে মোহিত করিতে পারে, কিন্তু আমাদের চিত্রকরণে সেরূপ ক্ষমতা নাই, তবে কেবল কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে এইরূপ গুরুতর বিষয়ে হস্তার্পণে কুণ্ঠিত হইলাম না। আমার নিজের এমন কিছু বিদ্যাবুদ্ধি নাই, যাহা দ্বারা আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারি; অন্য জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পুস্তক হইতে যৎকিঞ্চিৎ সারসংগ্রহ করিয়া আপনাদের চিন্তার উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য উপস্থিত হইলাম। অপরের কথা লইয়া যদি আপনাদের মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট করি এবং আপনাদের সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করি, তাহা হইলে আশা করি, বিষয়ের গুরুত্ব ভাবিয়া আপনাদের ঔদার্য্যগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

শিক্ষাই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। বিষয়টী অতিশয় গুরুতর। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে সভ্য সমাজের চিন্তার বিষয়। বিষয়টী পুরাতন হইলেও ইহা আমাদের এতদূর প্রয়োজনীয় যে, বারবার ইহার আলোচনা করিলেও ইহার আদর আমাদের নিকট হ্রাস হইবে না।

এই পৃথিবীতে মনুষ্যগণ জীবিত থাকিয়া যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহার প্রধান সহায় শরীর ও মন। মন চালক, শরীর চালিত। খাদ্য সংগ্রহের প্রবৃত্তি না হইলে হস্তাদি চালিত হয় না—এবং হস্তাদি না থাকিলেও সংগ্রহ-লালসা পরিপূরিত হয় না। এই শরীর ও মন, প্রভু ভৃত্যের ন্যায় অবস্থিত হইয়া সুপ্রথও ভূমণ্ডলে কত প্রকার উন্নতি বিধান করিতেছে, তাহা বলিয়া

* ১৬ই জুন কলিকাতা মেডিকেল স্কুলের বার্ষিক কার্য্যারম্ভ উপলক্ষে পঠিত।

শেষ করা যায় না। সেই জন্য শারীর-তত্ত্বের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত করা উচিত। মনুষ্যের শিক্ষা ভূমিষ্ঠকাল হইতে আরম্ভ হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। মনুষ্যের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকে। কিন্তু অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে শিক্ষা, সুশিক্ষা, আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় সকল প্রকার শিক্ষাই হইয়া থাকে। সমাজভুক্ত মানব সন্তানকে আবশ্যকীয় সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং অনাবশ্যকীয় কুশিক্ষা হইতে দূরে রাখা বিধেয়।

হারবার্ট স্পেন্সার সেই জন্য বলিয়াছেন—"আমার প্রথম প্রশ্ন এই,—কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবে, কেবল তাহাই নহে, কেমন করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।" তিনি আরো বলিয়াছেন,—কিরূপে শরীর চালন করিতে হইবে, কিরূপে মনকে চালন করিতে হইবে, কিরূপে আমাদের বিষয়-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, কিরূপে পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে, কিরূপে সমাজের একজন সভ্যের সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে, সৃষ্টির মধ্যে যে সকল সুখের আকর আছে, তাহা কিরূপে আয়ত্বাধীন করিয়া লইতে হইবে, আমাদের মানসিক বৃত্তি সকল কেমন করিয়া ব্যবহার করিলে নিজের ও অন্যের উপকারে আসিতে পারে, এই সকল বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে জীবন-যাত্রা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ করা হয়, সুতরাং এই সকল বিষয়েই আমাদের বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, এবং এই সকলই আমাদের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কেননা এই সকলই আমাদের আবশ্যক। তিনি উপরি উক্ত বিষয়গুলি পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মরক্ষা, (২) পরোক্ষে আত্মরক্ষা অর্থাৎ আহারাদি সংগ্রহ ও উপার্জ্জন, (৩) সন্তান পালন, (৪) সামাজিক ও রাজকীয় সম্বন্ধ রক্ষার্থে বিশেষ জ্ঞান উপার্জ্জন ও কার্য্যের অনুষ্ঠান, (৫) আমোদ প্রমোদ উপভোগ। স্পেন-সারের শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে এইরূপ বিভাগ যুক্তিসঙ্গত ও শ্রেষ্ঠ বোধে একে একে আমরা এই কয়েকটী বিষয় লইয়া আলোচনা করিব। তাঁহার পুস্তকের যে সকল স্থানে আমাদের মতের ঐক্য আছে, সে সকলই বর্ণিত হইবে। তিনি শিক্ষাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—(১) মানসিক, (২) নৈতিক, (৩) শারীরিক। আমরা শারীরিক শিক্ষার বিষয়ই প্রথমে আলোচনা করিব। যে শিক্ষার দ্বারা শরীরকে বলিষ্ট, দৃঢ়, কার্য্যক্ষম ও সুস্থ রাখে, তাহাকেই আমরা শারীরিক শিক্ষা বলি। কোন বৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়া তাহা হইতে পত্র পুষ্প ফল ফুলে সুশোভিত সুন্দর বৃক্ষ উৎপন্ন করিতে হইলে যেমন প্রথমে ভূমির পাট, পরে বৃক্ষের পাট অর্থাৎ উহার সার, জল, বায়ু, আলোক উত্তাপের প্রয়োজন, সেইরূপ মনুষ্য হইতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে মানব দেহের জরায়ু-জীবন হইতে উহার পাট করা আবশ্যক। কৃষক যেমন উদ্ভিদ্-তত্ত্বে ও কৃষিবিদ্যায় অজ্ঞ থাকিলে তাহার পরিশ্রম আশানুরূপ ফলদায়ী হয় না, সেইরূপ জনকজননীরা শিশু সন্তান-দের শারীর-তত্ত্বে অজ্ঞ থাকিলে, তাহাদের শরীরের অভাব এবং যে যে বয়সে যেরূপ

মনের বিকাশ সম্ভব, তাহা অবিদিত থাকিলে কখনই তাহাদের সন্তানে আশানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও মনুষ্যত্ব লাভ দেখিতে পান না। সন্তান পালন বিষয়ে জনক-জননীর যে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। সেই জন্য মহাবীর নেপোলিয়ন পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষিত মাতাই জাতীয় উন্নতির মূলীভূত কারণ। আমাদের দেশে ইহার অভাব বর্ত্তমান সময়ে অত্যন্ত অধিক। আজকাল বহু শতাব্দীর পর পুনরায় ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে, ইহাতে স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই মনে আনন্দ হওয়া উচিত। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা যেরূপ হইলে সমাজ ও পরিবারের সুখ বৃদ্ধি হইতে পারে, সেরূপ হইতেছে না বলিয়া কতক সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ইহাকে আদৌ পচ্ছন্দ করিতেছেন না। তাঁহারা বলেন, বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষায় সুফল না ফলিয়া কুফল উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং উহা একেবারেই না হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহাদের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শিশু যখন প্রথম চলিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার পদে পদে পদস্খলন হয়। আরো স্ত্রীশিক্ষার কুফল তাহাদের ইচ্ছা ও চেষ্টায় অধিক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া শারীরিক শিক্ষায় সম্বন্ধে জনক জননীর কি কর্ত্তব্য, তাহা আলোচনা করা যাউক।

গর্ভাবস্থায় জননীর শারীরিক সুস্থতা ও তাহার আচার ব্যবহারের উপর ভ্রূণের সুস্থতা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। সন্তানেরা যে কেবল পিতা মাতাদের অবয়ব ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বলবীর্য্য, রোগ ও দুর্ব্বলতা অধিকার করে। জনক জননীর শিক্ষা ও লালন পালনের গুণে বা দোষে সন্তানের উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে। অনেক সময় রোগ-বীজ ও দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত করিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু মহাশয়ের স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল। ডাক্তার কুল বলেন "ভোগপরায়ণ হইয়া অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ভক্ষণ করিলে যে কেবল মাতারই স্বাস্থ্যবৈলক্ষণ্য জন্মে, এমত নহে, প্রত্যুত তাহাতে সন্তানের তেজ বৃদ্ধিরও বিশেষ ব্যাঘাৎ জন্মে, এই সমুদয় অবিহিত অভিলাষ ও দৃষ্টিক্ষুধা হইতে গর্ভিণীকে প্রতিনিবৃত্ত করা আবশ্যক। আমাদের গর্ভিণীদের পাতখোলা, আমা ইট, খড়িমাটী প্রভৃতি অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ করা অতীব দূষণীয়। ডাক্তার ট্যানার তাহার বাল্য-চিকিৎসায় লিখিয়াছেন, "গর্ভবতী স্ত্রীর খাদ্য পরিমিত, সামান্য, লঘু অথচ পুষ্টিকর হওয়া উচিত। সচারাচর সসত্ত্বা রমণীর অনাবশ্যক, অস্বাভাবিক, অনিষ্টকারী ও অপুষ্টিকর সামগ্রীতে যে অভিলাষ জন্মে, তাহা বিশেষ যত্ন সহকারে দমন করা উচিত। গর্ভবতী স্ত্রীর পরিচ্ছদ পাতলা, লঘু ও আলগা হওয়া আবশ্যক"।" "যে পরিচ্ছন্নতা সর্ব্বকালে স্বাস্থ্য-রক্ষার আনুকূল্য করে, তাহা গর্ভাবস্থায় অধিকতর উপকারী। নিয়মিত সময়ে নিয়মিত রূপে স্নান বা গাত্রধৌত করা উচিত, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও সামান্য ব্যায়াম উপকারী ও আবশ্যক।" গর্ভবতী

স্ত্রী তাহার মনোবৃত্তি সকলকে সংযত রাখিবেন, কোন রিপুকেই প্রশ্রয় দিবেন না; স্থির ও সন্তুষ্ট চিত্তে অন্যায় ও অচপোচিত অভিলাষকে দমন করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিক গৃহ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া আশা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর স্থাপন করিয়া কালক্ষেপ করিবেন। ধর্ম্মদাস বাবু বলিয়াছেন, "গর্ভবতী স্ত্রীর মলমূত্রের বেগ ধারণ অব্যবস্থা, কারণ মূত্রাশয় ও মলাশয় অধিক পূর্ণ থাকিলে জরায়ুর উপর চাপ পড়ে এবং তাহাতে ঐ যন্ত্রের বৃদ্ধির ব্যাঘাৎ হয়, পেষণদ্বারা উহাতে নানা প্রকার বেদনা উপস্থিত হয়, জরায়ু স্থানচ্যুত হইয়া যায়, এবং সময়ে সময়ে মল মূত্র ত্যাগ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। মল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে যেমন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, উহাদের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইলেও সেইরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা। উদরাময়, আমাশয় এবং অন্ত্রের অন্যান্য পীড়া হইলে গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা।" গর্ভের প্রথম তিন মাস গর্ভপাতের প্রশস্ত সময়, এ নিমিত্ত এ সময়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। অধিকক্ষণ যানারোহণে বা পদব্রজে ভ্রমণ গর্ভিণী স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ; বিশেষতঃ গর্ভ প্রকারে প্রথম ও শেষ তিন মাস সাবধানে যানারোহণে ভ্রমণ করিবে।

তাহাদের পক্ষে আলস্য, রাত্রিজাগরণ ও স্বামী সম্ভোগ নিষিদ্ধ এবং তাহাদের অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি প্রবল প্রবৃত্তি সকল অনিষ্টকর। গর্ভিণীর প্রতি পরিবারের সকলের স্নেহ, দয়া, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা উচিত। ডাক্তার বুর্ল বলেন "প্রসূতির শয়নাগার (আমাদের সূতিকাগার) বৃহৎ ও বায়ু পরিবর্ত্তনের উপায় বিশিষ্ট হইবে এবং ঐ গৃহের সহিত অন্য গৃহের গমনাগমনের পথ থাকিলে ভাল হয়। এই গৃহে শীতকালে অগ্নি জ্বালাইবার নিমিত্ত অগ্নিস্থান থাকিবে। গ্রীষ্মকালে পার্শ্বস্থ গৃহে এই অগ্নি প্রজ্জলিত করিবে। বাটীর সমস্ত গৃহের মধ্যে ঐ গৃহ সর্ব্বাপেক্ষা জনরব শূন্য হওয়া উচিত।"

"সমস্ত মাস সূতিকাগৃহের বায়ু পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান থাকা আবশ্যক। ঐ গৃহের বায়ুকে স্নিগ্ধ ও বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে, উহার পরিমেয় উত্তাপ ৬০ তাপাংশের অধিক হইতে দেওয়া উচিত নহে, এবং যে কোন বস্তুর দ্বারা ঐ গৃহের বায়ু কোনরূপে দূষিত হইতে পারে, তাহা বিশেষ আবশ্যক ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও ঐ গৃহে থাকিতে দিবে না।"

ধর্ম্মদাস বাবু বলেন, "আমাদের দেশের সূতিকাগৃহের নিমিত্ত ১০×৭×৭ হস্ত আয়তনের গৃহ স্বাস্থ্যপ্রদ, কিন্তু কেবল আয়তনে গৃহ স্বাস্থ্যপ্রদ হয় না। ঐ গৃহ কাঁচা হইলে ১০×৬ বা ৯+৭ হস্ত পরিমিত হওয়া আবশ্যক, এতদ্ব্যতীত উহা উচ্চ, শুষ্ক, দ্বার ও বাতায়ন-বিশিষ্ট ও জনকোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত হইলে মাতা ও সন্তান উভয়েরই মঙ্গল।"

সূতিকাগৃহে আমাদের যে এক মাস অবস্থিতি করিবার নিয়ম আছে, তাহা অতিশয় উপকারী। এই কালের মধ্যে প্রসূতিকে যে একেবারে অশৌচ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য মহৎ। এইরূপ সুদৃঢ় সামাজিক নিয়ম না থাকা বশতঃ ইয়ুরোপীয় রমণীরা শীঘ্র সূতিকাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যে

প্রবৃত্ত হইয়া অনেক স্ত্রীরোগের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ডাক্তার প্লেফেয়ার বলিয়াছেন, "প্রসবের ছয় সপ্তাহ বা দুই মাস অতীত না হইলে জরায়ু ও তাহার গলদেশ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। দ্বিতীয় মাস গত না হইলে ঐ যন্ত্র উহার স্বাভাবিক গুরুত্ব প্রাপ্ত হয় না। প্রসবের পর তিন চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত জরায়ু হইতে একপ্রকার ক্লেদ নিঃসরণ হইয়া থাকে, উহাতে যাবৎ শোণিতের আভা থাকে, তাবৎ প্রসূতিকে কোন মতে গৃহান্তরে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। "ডাক্তার বুল বলেন "তিন সপ্তাহ অতীত না হইলে প্রসূতির পক্ষে বাটীর পরিজনবর্গের সহিত মিলিত হওয়া কখনই নিরাপদ নহে এবং অন্য কোন অমঙ্গল না ঘটিলে প্রসবের একমাস পরে ক্রমে প্রসূতি স্বীয় অভ্যস্থ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ও নির্বিঘ্নে বাটীর বহির্ভাগে গমন করিতে পারেন।"

শিশুর শরীর রক্ষার্থে খাদ্য, বস্ত্র ও ব্যায়াম, এই তিনই আবশ্যক। প্রথমে আমরা বস্ত্রের বিষয় অলোচনা করিব। কেননা ভূমিষ্ট হইয়া তিন চারি ঘণ্টা কোন আহার না করিলে শিশুর কোন অনিষ্ট হয় না, কিন্তু উক্ত কাল যদি শিশু অনাবৃত থাকে, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্ট হয়। যদিও এ দেশে শীতের প্রকোপ অধিক নহে, এবং এ দেশের শিশুদের শীতপ্রধান দেশের শিশুদের ন্যায় কষ্ট পাইতে হয় না, তথাপি সদ্যপ্রসূত শিশুগণ যে শীত সহ্য করিতে নিতান্ত অক্ষম, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। শিশুদের যথাপ্রয়োজন গাত্রবস্ত্র দেওয়া বিষয়ে আমাদের দেশে অধিক শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াও দেশীয় ধাত্রীর অজ্ঞতা বশত, যে পর্য্যন্ত না ফুল পড়ে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে শোণিত ও নানা প্রকার রসে আর্দ্র-কলেবর হইয়া একখানি সামান্য মাদুরের উপর কেবল ক্রন্দন করিতে হয়। ইহাতেই অনেক সময় অনিষ্ট হইয়া থাকে।

সন্তান ভূমিষ্ট হইয়া উত্তমরূপে ক্রন্দন করিলেই তাহার নাড়ী কাটিয়া তাহাকে, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইবে ও বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিবে। ডাক্তার বসু বলিয়াছেন, "চারিটী পাতলা অথচ ঘন ফ্ল্যানেলের জামা, চারি খানি চাদর, চারি জোড়া মোজা ও দুইটী টুপি থাকিলেই সমস্ত শরীর উত্তমরূপে রক্ষিত হইতে পারে। শয্যার নিমিত্ত কয়েক খানি কাঁথা, ২।৩ টী বালিস ও দুই তিনখানি তেল কাপড় (mackintosh cloth) বা রবারের চাদর চাই। ইংলণ্ডে এইরূপ বস্ত্রাদি প্রস্তুত না থাকিলে ও সন্তান মরিয়া গেলে, অনেক সময় তাচ্ছল্য হেতু সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মাতাকে বিচারালয়ে দণ্ডিত হইতে হয়।" 'অগ্নির' উত্তাপ দিয়া শিশুর দৈহিক উত্তাপ সমান রাখা যায় না, সুতরাং একবার উত্তপ্ত একবার শীতল হওয়া অপেক্ষা সমান উত্তাপ থাকাই শ্রেয়। অতএব তাপ রক্ষক কাপড় দ্বারা শিশুর সমস্ত শরীর আবৃত রাখা সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।"

"এই সময়ে উত্তাপ অতি প্রয়োজনীয়, কারণ স্বভাবত শরীরের যে উত্তাপ থাকে বা জীবন ধারণের নিমিত্ত যাহা একান্ত আবশ্যক, নবপ্রসূত সন্তানের দৈহিক উত্তাপ তদপেক্ষা অনেক কমিয়া যায়। সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইলে শিশু

সমস্ত দেহে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করতঃ অনাবৃত শরীরে উহাকে একখানি কাষ্ঠাসনে শোয়াইয়া ঐ আসন রৌদ্রের উত্তাপে স্থাপিত করা হয়। ইহার ফল, প্রথমত তেল লেপন হেতু লোমকূপ সকল রুদ্ধ হইয়া যায়, স্বেদ উত্তমরূপে নিঃসৃত হইতে না পারাতে দেহ মধ্যে থাকিয়া যায় এবং শোণিত উত্তমরূপ শোধিত হইতে পারে না, সুতরাং শিশুর ক্ষুদ্র মন প্রফুল্ল না হইয়া উগ্র ও কোপন স্বভাব বিশিষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ রৌদ্রের উত্তাপ দ্বারা য়কৃতের রক্তাধিক্য এবং অধিক পিত্ত নিঃসরণ হওয়াতে সন্তানের উদরাময় রোগ জন্মে। তৃতীয়তঃ শিশুর ত্বক প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিতে শিক্ষা করে, কিন্তু শীতের লেশ মাত্র লাগিলেই সর্দ্দি কাশি ইত্যাদি রোগাক্রান্ত হয়।" দুই চারি বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত শিশুদের শীতকালে অনেক সময় যথেষ্ট পরিমাণে শীত নিবারণ বস্ত্র দেওয়া হয় না। শীতকালে শৌচ প্রস্রাবার্থে যখন তাহারা বাহিরে যায়, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়া পাঠান হয়; এবং জননীদের অবসর কাল প্রতীক্ষা করিয়া, পরিষ্কারার্থে, প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে অনেকক্ষণ তাহাদিগকে কাঁপিতে দেখা গিয়াছে। অল্প পরিমাণে শীত তাপ ও বৃষ্টি লাগিলে সন্তানের কোন অনিষ্ট না হইয়া বরং উপকার হইবে, এই বিশ্বাসে সন্তানগণ শীত তাপ ও বৃষ্টির সময় অনাচ্ছাদিত শরীরে, অনাবৃত মস্তকে ও শূন্য পদে বাটীর বহির্ভাগে গমন করিলেও তাহাদিগকে নিবারণ করা হয় না। আবার কোন কোন প্রসূতি শিশুর গাত্রে হিম ও বায়ু লাগিলে পীড়া হইবে স্থির করিয়া অহোরাত্র গৃহের দ্বার, বাতায়ন ও অন্যান্য ছিদ্র উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া রাখেন।"

সন্তানকে শক্ত করিবার নিমিত্ত প্রথম উপায় অবলম্বন করা যেমন অবৈধ, উহাকে সুস্থ রাখিবার জন্য দ্বিতীয় উপায়ও সেইরূপ অনিষ্টকর। শিশুর শরীর উত্তমরূপে আচ্ছাদিত হইলে বাহ্য বায়ুর দ্বারা হটাৎ তাহার অনিষ্ট হইতে পারেনা এবং যে পরিমাণ শুষ্ক ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারিবে, ততই উহার শরীর ও মন সুস্থ থাকিবে। কিন্তু রাত্রি কালে হিম, প্রবল বাত্যা ও বৃষ্টি এবং দিবসে প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ সকলই অনিষ্টকর, অতএব এ সমুদয় হইতে শিশুকে রক্ষা করা উচিত। আর্দ্রভূমিতে ক্রীড়া করা ও আর্দ্রপদে চলিয়া বেড়ান বিশেষ অনিষ্টকর। শক্ত করিবার মানসে শিশু সন্তানকে ঐ সমুদয় স্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ অবস্থায় থাকিতে দেওয়া নিতান্ত অনুচিত। এ বিষয়ে স্পেন্সার এরূপ বলিয়াছেন, "শিশু সন্তানদিগকে "শক্ত করিবার ভাব অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। "শক্ত" করিতে যাইয়া অধিকাংশ শিশু শক্ত হইয়া এ পৃথিবী পরিত্যাগ করে। এবং যাহারা ঐ প্রণালীর হস্ত হইতে উদ্ধার পায়, তাহারা চিরকালের জন্য হয় অসুস্থ থাকে, অথবা খর্ব্বাকার হয়।" কার্য্য কারণ সম্বন্ধ উত্তমরূপে বিবেচনা না করাতেই এই মতের সৃষ্টি হইয়াছে। ধনী ও মধ্য শ্রেণীর ব্যক্তিরা নিম্নশ্রেণী ও শ্রমোপজীবীদের সন্তানদিগকে অসম্পূর্ণ রূপে শরীর আচ্ছাদন করিয়া মাঠে, ঘাটে, পথে পরম স্বচ্ছন্দে সুস্থ শরীরে খেলা করিতে বেড়াইতে দেখিয়া মনে করেন, এইরূপ অনাবৃত শরীরই বুঝি সুস্থতার কারণ; সুতরাং তাঁহাদের সন্তানদিগকে ঐরূপ শীত বাত

বৃষ্টি ও রৌদ্রে অনাচ্ছাদিত করিয়া ছাড়িয়া দেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা দেখেন না যে, শ্রমোপজীবীদের সন্তানেরা অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে। শ্রমজীবীদের সন্তানেরা সর্ব্বদা খেলা করিয়া বেড়াইতে পায়, তাহারা সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে এবং তাহাদের দেহ অতিরিক্ত মানসিক শ্রমদ্বারা ভারাক্রান্ত হয় না। শরীর অনাচ্ছাদনই যে তাহাদের সুস্থতার কারণ, তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের শরীর এত সুস্থ যে অনাচ্ছাদন হেতু অধিক ক্ষতি হয় না।

যে সকল সুস্থ শরীর শীত বাত সহ্য করিতে সক্ষম, তাহাদের শরীরের দৃঢ়তা বৃদ্ধির বিনিময় হইয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত আমরা মনুষ্য ও নিকৃষ্ট জীব উভয়েই দেখিতে পাই। সেট্‌ল্যাণ্ড দেশের পনি ঘোড়া দক্ষিণাংশের ঘোটকের অপেক্ষা অধিক শীতবাত সহ্য করিতে পারে, কিন্তু তাহারা ক্ষুদ্র অবয়ব-সম্পন্ন ইংলণ্ডের উত্তরাংশের গো মেষাদি অপেক্ষাকৃত অধিক শীত প্রধানদেশে থাকে বলিয়া ইংলণ্ডের গো মেষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র অবয়ব-সম্পন্ন। সুমেরু ও কুমেরু প্রদেশের মানবজাতি দীর্ঘে অন্যদেশের মনুষ্য হইতে ক্ষুদ্র। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড দেশবাসীরা ও ইস্কুইমো জাতি অতি খর্ব্বাকার। ডারউইন, টিরাডেলফিউগোবাসী লোকদিগের বর্ণনা স্থলে বলিয়াছেন যে, তাহারা এত ক্ষুদ্র ও বিকটাকার যে, সহজে আমাদের স্বজাতি বলিয়া বোধ হয় না। বিজ্ঞান ইহা দেখাইয়াছেন যে, এই খর্ব্বতা শরীরের উত্তাপ নষ্ট হওয়ায় হইয়া থাকে, এই উত্তাপ রক্ষার্থে খাদ্যের কোন কোন পদার্থের সহিত অম্লজানসংযোগ আবশ্যক এবং যে পরিমাণে বিকীরণ (radiation) দ্বারা শরীরের উত্তাপ নষ্ট হয়, সেই পরিমাণে খাদ্যের প্রয়োজন, কিন্তু পাকস্থলী ও খাদ্য-জীর্ণকারক অন্যান্য যন্ত্রের খাদ্য পরিপাক করিবার সীমা আছে। উত্তাপ উৎপন্ন করিবার জন্য যদি অধিক পরিমাণে খাদ্য ব্যয় হয়, তাহা হইলে শরীরের জীর্ণসংস্কার ও তন্তু নির্ম্মাণার্থে অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। এরূপ অবস্থায় শরীরের বৃদ্ধি-হ্রাস অথবা উহার উপাদান নিকৃষ্ট হইবে, কিম্বা উভয় প্রকার অনিষ্টই সাধিত হইবে। এতদ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, বস্ত্র আমাদের এক প্রকার খাদ্য, কেননা উত্তাপ উৎপাদক খাদ্যের অভাব কিয়ৎ পরিমাণে বস্ত্রের দ্বারা পূরণ হয় এবং আমরা দেখিতে পাই, বস্ত্রের অভাব হইলে অধিক পরিমাণে খাদ্যের প্রয়োজন হয়। নিকৃষ্ট প্রাণীর মেদ পেশীও বৃদ্ধির বিনিময়ে শীত সহ্য করিতে পারে। হৃষ্টপুষ্ট গবাদিকে অধিক শীতে রাখিলে তাহারা ক্ষীণ হইয়া যায়, অথবা তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে খাদ্য দিতে হয়।

ফ্রান্সের সদ্য-প্রসূত শিশুরা শীতকালের জন্য রেজিষ্টারি আফিসে যাওয়াতে প্রায়ই মৃত্যু হয়। বেলজিয়মে গ্রীষ্মকালে যেখানে একটী শিশুর মৃত্যু হয়, শীতকালে সেই স্থলে দুইটী শিশু কালগ্রাসে পতিত হয়। রুসিয়াতে এই কারণে শিশুদের মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। লেম্যান বলেন, সে শিশুর শরীরের গুরুত্ব অনুসারে বয়স্কদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণ কার্বনিক এসিড শরীর হইতে নির্গত হয়। অর্থাৎ দেড় মন ওজনের মনুষ্যের শরীর হইতে যদি ৬ সের কার্বণিক এসিড নির্গত হয়, তাহা হইলে দশ সের ওজনের

শিশুর শরীর হইতে এক সেরের পরিবর্ত্তে ২ সের নির্গত হয়। যে পরিমাণে উত্তাপ উৎপন্ন হয়, প্রায় সেই পরিমাণেই কার্বনিক এসিড নির্গত হয়, সুতরাং শিশু সন্তানদিগের স্বভাবতঃ উত্তাপ রক্ষার জন্য দ্বিগুণ বস্ত্র ও খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অজ্ঞতা হেতু পিতা মাতারা অপেক্ষাকৃত অধিক বস্ত্রাবৃত থাকেন এবং সন্তানেরা অতি সামান্যরূপে আচ্ছাদিত হয়। সকলের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, উত্তাপ উৎপন্ন জন্য যে প্রত্যেক ছটাক খাদ্য ব্যয় হয়, তাহা শরীরের পুষ্টি ও গঠনের পক্ষে অভাব হয়। শীত সহ্য করিয়া যদিও সন্তানেরা সর্দ্দি কাশি, আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্তাধিক্য প্রভৃতি রোগ হইতে রক্ষা পায়, তথাপি ইহার কুফল অন্য প্রকারে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ইহাতে শারীরিক বৃদ্ধির হ্রাস হইয়া থাকে, অথবা শরীর নিকৃষ্ট উপাদানে গঠিত হয়। সেই জন্য যে কোন প্রকারে হউক, সন্তানদিগের শরীর আচ্ছাদন করিলে যে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, সে আশা বৃথা। অনেক পিতা মাতা বেশভূষা ও বাহারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সন্তানদের কাপড় প্রস্তুত করেন। কিন্তু উহা উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত, উহাতে শরীরের সকল স্থান আবৃত হয় কি না, তাহা দেখেন না। দেখিতে ভাল হইলেই হইল, সুন্দর বর্ণের অনুরোধে বস্ত্রের দৃঢ়তার দিকে লক্ষ্য রাখেন না। এই সকল সুন্দর পরিচ্ছদ পরাইয়া তাহাদিগকে কেবল দেখিবার পুতুল করিয়া রাখা হয় এবং তাহাতে অনিষ্টও বিলক্ষণ হয়। আঁট সাঁট পোষাকে স্বচ্ছন্দতা বিনষ্ট হয় এবং উহাই অনেক রোগের কারণ হয়। পাছে কাপড়ে একটু ধুলা কাদা লাগে, পাছে কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, সেই জন্য স্বভাবতঃ চঞ্চল প্রকৃতি ক্রীড়াপ্রবণ সন্তানদিগকে দমন করা হয়। তাহাদের ক্রীড়ার ব্যাঘাতে শরীরের সুস্থতার ব্যাঘাৎ হয়।

এইবার আমরা খাদ্য বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণন করা সম্ভব নহে। যে সমস্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে শরীরের ক্ষতিপূরণ, বৃদ্ধি ও বিকাশ, এবং জাণসংস্কার সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহাই উপযুক্ত খাদ্য। অজ্ঞ মনুষ্যের পক্ষে স্বভাবের অনুকরণ করাই শ্রেয়। পরম কারুণিক বিধাতা শিশুর দেহ ধারণ, বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য যে খাদ্য জননীর স্তনে দুগ্ধরূপে দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কয়েকটী দ্রব্য আমরা দেখিতে পাই।—

(১) একপ্রকার পনিরময় পদার্থ (২) শর্করা, (৩) তৈলময় পদার্থ (৪) জল, (৫) কতকগুলি ধাতব ও উপধাতব পদার্থ। বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে উপযোগী খাদ্যতেও ঐরূপ গুণসম্পন্ন খাদ্যের আবশুক, উহাতে (১) এলবুমেন বা তজ্জাতীয় পদার্থ, (২) শ্বেতসার বিশিষ্ট বা মিষ্ট দ্রব্য, (৩) তৈলময় পদার্থ বা মেদ। (৪) জল (৫) নানা প্রকার লবণ ও ধাতব বা উপধাতব পদার্থ। প্রথমটী নাইট্রোজন বা যবক্ষারজন সমন্বিত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী হাইড্রোকার্ব্বোনেট বা কার্বোহাইড্রেট পদার্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শরীর পোষণার্থে উক্ত চারি প্রকার পদার্থই আবশুক, যবক্ষারজানময় পদার্থ প্রধানতঃ শারীরিক তন্তু সক-

লের বৃদ্ধি, এবং ক্ষতিপূরণ ও জীর্ণ-সংস্কারের সহায়তা করে। দ্বিতীয়তঃ শরীরের যে সকল রস প্রস্তুত ও ব্যয়িত হয়, তাহাদের জন্য ইহা আবশ্যক। ইহা কতক পরিমাণে শারীরিক যন্ত্রে ও তন্তুতে বিছিন্ন হইয়া অঙ্গার, উদজান ও অম্ল-জানের সহিত ইউরিয়া উৎপন্ন করত মল মূত্রের সহিত নির্গত হয়। অবশিষ্ট অঙ্গার, উদজান ও অম্লজান দেহে থাকিয়া শ্বেতসারময় পদার্থের ন্যায় কার্য্য করে।

"শ্বেতসারময় পদার্থ, সর্করা ও তৈল-ময় পদার্থ শরীরের পোষণ ও উত্তাপ রক্ষার্থে প্রধানত ব্যয়িত হয়। শ্বেতসার-ময় পদার্থ ও তৈলময় পদার্থ অম্লজানের সহিত বিহিতরূপে মিশ্রিত হইতে না পারিলে শরীরের কোন তেজই উৎপন্ন হয় না, শরীরের কেবল মেদ সঞ্চার হয়, এই জন্য শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যক। আরো, যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থের সাহায্য ব্যতীত ঐ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। সুতরাং শ্বেতসারময় পদার্থ আহার করিলে উহার সহিত যবক্ষারজানময় পদার্থ ও লবণাক্ত পদার্থ ব্যবহার করা ও শারীরিক পরিশ্রম করা আবশ্যক।"

জীবন ধারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে জল আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা দ্বারা শোণিত যথোপযুক্ত তরলাবস্থায় থাকিয়া শরীরের সকল স্থানে সঞ্চারিত হয়, এবং যন্ত্র সকলকে যথোচিত সিক্ত ও কার্য্যক্ষম করে। উহার অভাবে তাহারা শুষ্ক হয় এবং সর্ব্ব কার্য্য করিতে অক্ষম হয়। আবশ্যক মত জল ব্যবহার করিলে শারীরিক ক্রিয়া সকলের বৃদ্ধি হয়, পরিবর্ত্তন ক্রিয়াও শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে, দৈহিক মলিন পদার্থ সকল স্বচ্ছন্দে বহির্গত হয়।

লবণ। সকল প্রকার উদ্ভিদ ও ফলে কিয়ৎ পরিমাণে লবণ থাকে। ইহার দ্বারা দৈহিক ক্রিয়া সকল শীঘ্র শীঘ্র সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। ইহা আমাদের তন্তু, যন্ত্র ও শারীরিক রস সমুদয়ের প্রধান উপাদান। শরীরের সকল প্রকার অভাব মোচনার্থে উপরি উক্ত কয়েক প্রকার খাদ্য প্রথমত পুষ্টিকর হওয়া, দ্বিতীয়ত উহাদের পরিমাণ শারীরিক অভাবানুযায়ী হওয়া, তৃতীয়ত উহাদের বিহিত পরিমাণে মিশ্রিত, চতুর্থত উহা নানা প্রকারে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

ইহা ধ্রুব সত্য যে, পুষ্টিকর খাদ্যের তার-তম্যানুসারে জীবনীশক্তি ও কার্য্যপটুতার তারতম্য হইয়া থাকে।

স্পেন্সার বলেন—তৃণভোজী গো জাতি তাহাদের স্থূলদেহ ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ পদ দ্বারা গুরুভার বহন করিতে ও প্রচুর পরিমাণে খাদ্য পরিপাক করিতে অধিকাংশ শক্তি ব্যয় করিয়া থাকে, সুতরাং তাহারা নিশ্চেষ্ট ও জড়ভরতের ন্যায় অবস্থিতি করে।

অশ্বজাতির গঠন প্রকৃতি গোজাতির অনুরূপ হইলেও অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাদ্য আহার করে বলিয়া উহাদের দেহের সহিত পদের তুলনায় গোজাতি অপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট। উহাদের শক্তি গোজাতির ন্যায় দেহের গুরুভার বহন করিতে অথবা অধিক পরিমাণে খাদ্য পরিপাক করিতে ব্যয়িত হয় না বলিয়া উহা অপেক্ষাকৃত অধিক, শক্তিশালী, দ্রুতগামী ও তেজসম্পন্ন। সেইরূপ আমরা মেষ ও কুক্কুরের পার্থক্য

দেখি। পশুশালায় ভ্রমণ করিলে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাসী জীবের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা ও তাহাদের পিঞ্জর মধ্যে ইতস্তত ভ্রমণ দেখিয়া ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কোন উদ্ভিদ্‌ভোজী জীব এইরূপ স্বাভাবিক চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে না এবং পুষ্টিকর খাদ্যে ঘনত্ব ও শক্তির প্রাথর্য্য বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। এইরূপ বিভিন্নতা যে কেবল শরীর গঠনের উপর নির্ভর করে, তাহা নহে, কেননা ইংলণ্ডে যে সকল অশ্ব বোঝাই গাড়ী টানে, তাহারা দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট হইলেও অধিক পরিমাণে ঘাস ও অল্প ছোলা বা জৈ খাইয়া উদর পূর্ণ করে বলিয়া উহারা তেজোহীন ও নিশ্চেষ্ট, কিন্তু ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাদ্য আহার করে বলিয়া ক্ষীণ দেহ বিশিষ্ট হইয়াও তেজস্বী ও দ্রুতগামী। মনুষ্য জাতির মধ্যেও এইরূপ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়া দেশের বুসম্যান এবং অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর অসভ্য জাতিরা ফল মূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহারা খর্ব্বাকার, তাহাদের উদর বৃহৎ, পেশী সকল কোমল ও পূর্ণ বিকশিত নহে। তাহারা ইয়ুরোপীয় জাতির সহিত কি বলে, কি দীর্ঘকালস্থায়ী কোন শারীরিক পরিশ্রমে, কিছুতেই সমতুল নহে। কিন্তু কাফ্রিরা, উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান ও প্যাটাগোনিয়ান জাতিরা অধিক পরিমাণে মাংস আহার করে। তাহারা দীর্ঘাকার, বলশালী, উদ্যোগী ও কার্য্যক্ষম। ইংরাজ ও বাঙ্গালীর পার্থক্য আমাদের অবিদিত নাই। আমরা মানসিক বলের অহঙ্কার করিয়া থাকি, কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের মানসিক বৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ অল্প বয়সেই দেখা যায় এবং সেই সময়েই কোন কোন স্থলে ইংরাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া থাকি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রৌঢ় অবস্থায় পদার্পণ করিতে না করিতে আমাদের মানসিক বৃত্তির অবনতি দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণকালের জন্য রূপের চাকচিক্য দেখাইয়া শীঘ্রই বিলীন হইয়া যায়। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই ইহার অভাব উপলব্ধি করিয়া থাকি।

জগতের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যভোজী জাতিরাই বলবীর্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারাই পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যখন আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সময়ের ও আমাদের বর্ত্তমান কালের খাদ্যে, তুলনায়, যে অত্যন্ত প্রভেদ দেখা যায়, তাহার সন্দেহ নাই। যে ব্রাহ্মণেরা শারীরিক ও মানসিক বলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তাহাদের নিকটও কুক্কুট মাংস, গো মাংস অভক্ষ্য ছিল না। কেহ কেহ হয়ত এ কথায় আপত্তি করিবেন। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, যাগ যজ্ঞে যে গো মেষ মহিষ বলি হইত, তাহা অন্যে আহার করিত, অথবা ব্রাহ্মণেরা কদাচ কখনও ঐ রূপ পূজা উপলক্ষে দেবতার প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করিতেন, একথা স্বীকার করিলেও তাঁহারা যে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ও দুগ্ধোৎপন্ন সামগ্রী সকল যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একটী গাভী লইয়া পরাসর

ও বিশ্বামিত্র মুণি দ্বয়ের মধ্যে কি তুমুল কাণ্ড হইয়াছিল!

মৃগয়া, রাজা ও তাহার অনুচরবর্গ ও উচ্চ শ্রেণী লোকের একটী প্রধান ক্রীড়া কৌতুক ছিল। ব্যাধেরা পশু পক্ষী বধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, পশু পক্ষীর মাংস ব্যবহার জনসাধারণের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, হিন্দুধর্ম্মে তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃষকেতু উপাখ্যানে এক স্থানে আছে, "পক্ষী-মাংস মৃগমাংস যেবা রুচি হয়।" রাজার আহারার্থে গোবংশ নির্বংশ হইয়া আসিতেছে, সুতরাং দুগ্ধ এখন দুগ্ধপোষ্য বালকের ভাগ্যেই ঘটে না, তখন তাহাদের জনক জননীরা আর কি পাই-বেন! জননীর পুষ্টিকর খাদ্যের নিতান্ত অভাব বলিয়াই বোধ হয় এত শিশু-রোগের আধিক্য দেখা যাইতেছে। আমরা এ বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন, আমাদের ঘরে যাহাদের গাভী আছে, তাহারা গাভী প্রসূত হইলে অমনি তাহার এক সের অতিরিক্ত ঘাস, দুই সের ভুষি বন্দো-বস্ত করিয়া দেন, কিন্তু ভাগ্যহীন ভারত-ললনা সন্তান প্রসব করিলে তাঁহার আহারের কোন পরিবর্ত্তনই করা হয় না, তাঁহারি ভাগ্যে সেই থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়, অথবা ডাল চড়চড়ি ভাত বা ভাত চড়চড়ি ডাল, সেই চির-কালের বন্দোবস্ত, সীমা অতিক্রম করে না। এই আহারে তাঁহাকে একটী শিশুকে এক বৎসর হইতে কখন ৩।৪ বৎ-সর পর্য্যন্ত স্তন্য পান করাইতে হয়। গাভী এক পোয়া আধ সের দুগ্ধ বেশি হইবে বলিয়া আমরা উহার অতিরিক্ত খাদ্যের বন্দোবস্ত করি, কিন্তু জননী যে দুগ্ধ শিশুকে দেন, তাহা বন্ধ হইলে আমাদের শিশুর জন্য পৃথক দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিতে হইত, সে বিষয় আমরা আলোচনার মধ্যেই আনি না। বোধ হয়, জননীর স্তন্য দুগ্ধে শিশু ব্যতীত যদি কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে অন্য কেহ উপকৃত হইত, তাহা হইলে গাভীর ন্যায় পৃথক বন্দোবস্ত হইতে পারিত।

দুগ্ধের পর বাঙ্গালীর পুষ্টিকর সামগ্রী মৎস্য। তাহাও এখন এমন সুলভ হইয়াছে যে, প্রতি গরাসে মুড়া খাইতে পাওয়া যায়! মাংসের ত কথাই নাই!

ধর্ম্মদাস বাবু বলিয়াছেন,—

"খাদ্যে যবক্ষারজানময় পদার্থ অল্প হইলে মাংস পেশী ও স্নায়ু শক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিমিত্ত অতি সামান্য কারণে শরীর ম্যালেরিয়া জ্বর ও অন্যান্য পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। মানসিক শ্রম বা শারীরিক শ্রম কেবল যবক্ষারজানময় দ্রব্যের ক্ষয় শীঘ্রই ঘটে এবং সেই ক্ষতিপূরণ করিবার নিমিত্তই মাংসভোজনে অনু-রোধ করা যায়। কারণ পরীক্ষার দ্বারায় অবগত হওয়া গিয়াছে যে, নিরামিষ খাদ্য অপেক্ষা মৎস্য মাংস শীঘ্র পরিপাক হয়, সুতরাং শীঘ্রই ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। উদ্ভিদ-এলবুমিনেট শীঘ্র পরি-পাক হয় না, সুতরাং উহা হইতে যবক্ষারজান শীঘ্র বহির্গত হইয়া ক্ষতিপূরণে নিযুক্ত হইতে পারেনা। সেই জন্য অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করা যায় না।"

আমিষ ও নিরামিষ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ চলিয়াছে ও চলিতেছে, এ সম্বন্ধে

আমরা ডাক্তার স্মিথের খাদ্য বিষয়ক পুস্তক হইতে কিয়দ্দংশ উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইব।

(১) "নিরামিষ ও আমিষ উভয় প্রকার খাদ্যে সমান পরিমাণ পুষ্টিকর সামগ্রী আছে এবং কতক পরিমাণে এই দুই প্রকার খাদ্যই পরস্পরের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।"

(২) "উহাদের পুষ্টিকারিতার তারতম্য লোকের অভ্যাসের উপর নির্ভর করাও সম্ভব।"

(৩) "কিন্তু প্রায় দেখা যায় যে, মাংসের পুষ্টিকর সামগ্রী সমুদয় বিশেষ সুবিধা ক্রমে ও সুপাচ্যরূপে বিদ্যমান থাকে। নিরামিষ খাদ্যে অর্থাৎ বীজ সমূহে এমত অনেক দ্রব্য থাকে, যাহাকে বিশেষ প্রকারে জীর্ণ করিয়া পরিবর্ত্তন করিলে তবে তাহা হইতে দেহের পুষ্টি বা জীর্ণসংস্কার হয়।"

(৪) "পরিপাকের নিমিত্ত মাংস রন্ধন করা আবশ্যক নহে, কিন্তু নিরামিষ খাদ্য রন্ধন করা অতীব আবশ্যক, নচেৎ পাকস্থালী উহা জীর্ণ করিতে পারিবে না।"

(৫) "উহার প্রমাণ এই যে, সমান পুষ্টিকর নিরামিষ ও আমিষ খাদ্য ভক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, নিরামিষ ভোজনের পর অপেক্ষাকৃত অধিক মলত্যাগ করিতে হয়।"

(৬) "নিরামিষ অপেক্ষা আমিষ খাদ্য শীঘ্র ও সহজে পরিপাক হইয়া থাকে। আরো আমিষ ভক্ষণ করিলে যে পরিমাণে খাদ্য পরিপাক হয়, নিরামিষ ভোজন করিতে হইলে তদপেক্ষা অধিক খাদ্যের প্রয়োজন।"

খাদ্যের পরিমাণ শরীরের আবশ্যক মত হওয়া আবশ্যক। অতিরিক্ত হইলে অথবা অতিরিক্ত ঘৃত বা মসলা দিয়া রন্ধন করিলে গুরু ভোজনে অজীর্ণ হইবে ও বৃথা শারীরিক শক্তি ব্যয় হইবে। যে পরিমাণে যবক্ষারজান ও অঙ্গার আমাদের দেহ ধারণে প্রয়োজন, তাহা কেবল কোন একটী খাদ্যের দ্বারা সম্পন্ন হয় না। সুস্থ শরীরে গড়ে দুই সহস্র রতি অঙ্গার এবং দেড় শত রতি যবক্ষারজান প্রত্যহ শারীরিক ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজন। ইহা যদি কেবল চাউল বা ময়দা হইতে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত অনাবশ্যকীয় অঙ্গার গ্রহণ করিতে হইবে। উহাতে পরিপাক যন্ত্র সকলের অযথা শ্রম হইবে এবং বৃথা শক্তি ব্যয়িত হইবে। সেই জন্য মিশ্র খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন।

প্রত্যহ যদি একই প্রকারে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে আমাদের ভাল লাগে না, আমরা অল্প আহার করিতে বাধ্য হই এবং তদ্দ্বারা শারীরিক পুষ্টিরও ক্ষতি হয়। খাদ্যের বিভিন্নতা উৎপন্ন করিবার জন্যই আমাদের পঞ্জিকাতে ভিন্ন ভিন্ন বারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাদ্যের নিষেধ আছে। এক্ষণে শিশু সন্তানদের খাদ্যের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার ৫।৭ দিন পর উহাকে ২½ কিম্বা ৩ ঘণ্টা অন্তর স্তন্যপান করাইতে হইবে। পরে একমাস বা পাঁচ সপ্তাহ গতে ৩½ বা ৪ ঘণ্টা অন্তর স্তন্যপান করান বিধি। আমাদের প্রসূতিরা সন্তান কাঁদিলেই স্তন দিয়া থাকেন। এ সময়ে শিশুর ক্রন্দন যে কেবল ক্ষুধার উদ্রেক বশত হয় না, তাহা বিবেচনা করা উচিত। যদি স্তন্যপান করাইবার দুই ঘণ্টা মধ্যে

শিশু কাঁদে, তাহা হইলে উহার অন্য কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। কোন কোন জননী হয়ত বলিবেন কেন, যখনই স্তন্যপান করান যায়, তখন সন্তান নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। ইহার কারণ অতি ভোজনে শরীরের আলস্য, জড়তা ও নিদ্রা আনয়ন করে, কিন্তু এই অতি ভোজনের কুফল শীঘ্রই প্রকাশ পায়। ইহাও জানা আবশ্যক যে, কোন কোন সময়ে ক্রন্দনেই শিশুরা আমোদ পায়। অনেক স্থলে অল্প জলপান করাইলে শিশুর ক্রন্দন থামিয়া যায়। পরিমিতরূপে জলপান করাইলে শিশুর অনিষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

নিম্নলিখিত অবস্থায় শিশুর মাতৃ স্তনপান অনিষ্টকর। (১) "মাতা পীড়িত হইলে, (২) মাতা উগ্রস্বভাবাপন্ন হইলে তাঁহার দুগ্ধ শিশুর পুষ্টির উপযোগী হয় না। এক সময়ে উহার পরিমাণ অল্প হয় এবং অন্য সময় উহার গুণের এরূপ পরিবর্তন হয় যে, উহাতে শিশুর অনিষ্ট হইতে পারে" (বুল)। ট্যানার বলিয়াছেন,—"যে সকল অবস্থায় মাতৃস্তন শিশুর পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়া উঠে, তন্মধ্যে স্বভাবের উগ্রতা, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা, গুরুতর দৈহিক অপকর্ষ, স্ক্রফুলা, টুবার্কল ক্যান্সার, উপদংশ, মৃগী, বাতুলতা অথবা অন্য কোন প্রকার প্রবল পীড়া। হটাৎ ভীত হইলে, কঠিন পরিশ্রম করিলে কিম্বা ক্রোধান্ধ হইলে, মাতার স্তন দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস ও গুণের অপকৃষ্টতা জন্মে। তৎকালে শিশুকে দুগ্ধ পান করাইলে শিশুর উদরাময়, কনভল্সন (তড়কা) ও অন্যান্য পীড়া জন্মে।

(৩) মদ্যপানাসক্ত মাতার স্তন্য শিশুর অসেবনীয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এদোষ নাই বলিলেও হয়। (৪) গর্ভবতী মাতার স্তন্যপানে শিশুর উদরাময় হইয়া থাকে। "এইরূপ ঘটিলে, ৩০ বৎসর বয়সের ন্যূন এবং অন্যূন ১৮ বৎসর বয়সের সুস্থ, বলিষ্ঠ, স্তন্য পান করাইতে ইচ্ছুক, দয়ালু স্বভাব বিশিষ্ট ধাত্রী নিযুক্ত করিবে। তাহার শিশুর বয়স ঐ শিশুর ন্যায় হওয়া আবশ্যক। ঐরূপ ধাত্রীর অভাবে গাভী বা গর্দ্দভীর দুগ্ধ দিবে। গাভীর দুগ্ধ কিছু অম্লবিশিষ্ট এবং মানবীর দুগ্ধ কিঞ্চিৎ অম্ল বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট। স্তন্যদুগ্ধ জমিয়া গেলে উহাতে ছোট ছোট দানা হয় এবং উহা সহজে জীর্ণকরা যায়। কিন্তু গাভীর দুগ্ধ জমিয়া গেলে উহার দানা বড় ও কঠিন হয়, এজন্য শীঘ্র জীর্ণ করা যায় না। এই দুগ্ধে জল বা চুনের জল মিশাইয়া ফুটিয়া লওয়া আবশ্যক।" (ধর্ম্মদাস বাবু) জননী যতই কেন সুস্থ হউন না, তাঁহার দুগ্ধ একবৎসরের অধিক কাল শিশুর সম্পূর্ণ পোষণ উপযোগী থাকে না। সেই জন্য ৯ হইতে ১২ মাসের মধ্যে স্তন্যপান বন্ধ করা আবশ্যক। এবিষয়ে আমাদের দেশের সংস্কার ও রীতি ভিন্ন। অনেক স্থলে দেখা যায়, যতদিন না প্রসূতি পুনরায় গর্ভবতী হন, তত দিন তাহার সন্তান দুগ্ধ পান করিতে থাকে। আমরা ৪।৫ বৎসরের অনেক সন্তানকে দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়াছি। এমন কি, ২।৩ বৎসরের একটী এবং ২।৩ মাসের অপর সন্তানকে জননী স্তনপান করাইয়া থাকে, তাহাও দেখা গিয়াছে, এ প্রথা অতীব দূষণীয় এবং অধিককাল স্তনপান করিলে সন্তান যে বলিষ্ট হয়, সে সংস্কারও ভ্রমাত্মক। ৫।৬ মাস বয়সে অল্প অল্প এরারুট বা বার্লি দেওয়া যাইতে পারে। এবং

তাহাতে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, কেননা ঐ সময় হইতেই লালগ্রন্থি ও অন্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি সকল বৃদ্ধি ও বিকাশ পাইতে থাকে এবং উহাদের রস নিসৃত হইতে আরম্ভ হয়। এই রসের পক্ষে শ্বেতসারবিশিষ্ট লঘু খাদ্যই উপযোগী।

দেড়বৎসর হইলে অল্প পরিমাণে মৎস্য বা মাংসের কাথ দেওয়া উচিত, ক্রমে ক্রমে লঘু মৎস্য ও অন্ন, পরে ডাল ও অন্যান্য খাদ্য দিতে হইবে। অনেক ধনীর ঘরে দেখা যায় যে, ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানেরা কেবল দুগ্ধ খাইয়াই জীবনধারণ করে। ইহাও অবিধি। "দুইবৎসর বয়ক্রম না হইলে নিয়মিতরূপে অন্নাহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। অপক্ক ফল ও অরন্ধিত আনাজ যথা মূলা, কলা, মটরসুটী, বরবটী কদাচ ভক্ষণ করিতে দেওয়া উচিত নহে, বাসিমুড়ি চিড়ে-ভাজা কচুরি ইত্যাদি দুষ্পাচ্য।" ধর্ম্মদাসবাবু।

শিশুর ব্যায়াম।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাহার পরিচ্ছদ এরূপ হওয়া উচিত যেন তাহার শরীর চালনায় কোন ব্যাঘাৎ না হয়। অনেক ধনীর ও পুত্রহীন লোকের ঘরের সন্তানেরা কেবল কোলে কোলে ফেরে। এই-রূপে তাহাদের শরীর আবদ্ধ ও মনুষ্য দেহের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া সততই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, জননীর অবসর এত অল্প যে, তাহার শিশুকে অনবরতই বিছানায় পড়িয়া চীৎকার করিতে হয়, সুতরাং উগ্র স্বভাবাপন্ন হয়। এইরূপ শিশুদিগকে নিস্তব্ধ রাখিবার জন্য দোলায় সজোরে 'দোল' দেওয়া হয়। ইহাতে তাহাদের মস্তিষ্কের অনিষ্ট সাধিত হয়। শিশু সন্তান-দিগকে তাহাদের ইচ্ছামত খেলা করিতে দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু জলে, বৃষ্টিতে, অথবা রৌদ্রে অধিক বেড়াইতে দেওয়া উচিত নহে।

বালক বালিকা উভয়েরই শরীর চালনা প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের বালিকারা দশ-বৎসর অতিক্রম করিলে বিশেষত তাহাদের বিবাহ হইলে তাহাদের অঙ্গ সঞ্চালন এক-রূপ বন্ধ হয়। তাহাদিগকে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিতে হয়। শ্বশুরালয়ে যাইয়া কতই না সঙ্কুচিতভাবে তাহাদিগকে থাকিতে হয়। অনেক সময় শৌচ প্রস্রাবের বেগও সম্বরণ করিতে হয়। এইরূপে তাহাদের মনের স্ফূর্ত্তির হ্রাস হইয়া বুদ্ধি ও বিকাশেরও হ্রাস হয়। সহরের বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা স্থানাভাবে অনেক খেলা ও আমোদ হইতে বঞ্চিত হয়। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃ-পক্ষীয়েরা শরীর চালনার আবশ্যকতা কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিয়া কৃত্রিম শরীর চালনার উপায় অর্থাৎ Gymnastic বা ব্যায়ামের সৃষ্টি করিয়াছেন। শরীর চালনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকাপেক্ষা ইহা উপকারী, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরুষোচিত ক্রীড়া ও উহার আনুষঙ্গিক আমোদ প্রমোদের সহিত ইহার তুলনা হয় না।

স্পেন্সার বলেন, জিমন্যাষ্টিকে যথা প্রয়োজন পেশী সঞ্চালন হয় না এবং ইহার ফলও আশানুযায়ী নহে। ক্রীড়া কৌতুকে মনের যে উত্তেজনা ও স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার ফল বলকারক। বাস্তবিক সুখ ও আমোদ সকল ঔষধ অপেক্ষা বলকারক। ইহাতে শোণিত সঞ্চারের দ্রুতত্ব উৎপন্ন করে, এবং শারীরিক ক্রিয়া সকলও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সুতরাং ইহা সুস্থশরীরে স্বাস্থ্য-

বৃদ্ধি ও রুগ্ন শরীরের স্বাস্থ্য পুনঃ স্থাপন করে।

শারীরিক বল-হ্রাস ও অসুস্থতা, অতিরিক্ত মানসিক শ্রমের ফল। ডাক্তার চাভাসি বলেন "বালক বালিকারা এক্ষণে অতি উচ্চ বা দুরূহ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের মস্তিষ্ককে অধিক পরিশ্রান্ত বা দুর্ব্বল করা হয়। তাহার ফল এই হয় যে, তাহারা বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের বুদ্ধি নিস্তেজ হইয়া পরে। পূর্ব্বে যুবক যুবতীরা যাহা শিক্ষা করিতেন, এক্ষণে বালক বালিকারা তাহা শিখিতেছেন। অতি শিক্ষা হেতু জীবন-রজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়।" স্পেন্সার বলেন "কোন শারীরিক যন্ত্রের উপাদানের অস্বাভাবিক বা অতি শীঘ্র উন্নতি হইলে উহার আয়তন বৃদ্ধি অকালে স্থগিত হইয়া যায়, এবং অন্যান্য যন্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ ঘটে, মস্তিষ্ক সম্বন্ধেও নিশ্চয় সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। যে মস্তিষ্ক বাল্যকালে আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং যাহার গঠন অসম্পূর্ণ, সে যদি অসময়ে অযথা পরিমাণে কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার রচনা বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নতি হইবে। কিন্তু পরিণামে সে নিশ্চয়ই হীনশক্তি হইবে। অকাল বুদ্ধিমান বালক ও যুবকগণ যে কিছুকাল পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে সফলপ্রদ হইয়া অকস্মাৎ অপারক হইয়া পড়েন ও তাহাদের পিতা মাতাদের সকল বিফল প্রযত্ন হইয়া যায়, ইহাই বোধ হয় তাহার আংশিক প্রধান কারণ।"

মানসিক উত্তেজনা কিঞ্চিৎ অধিক হইলে পাকস্থলীর কার্য্যে যে ব্যাঘাৎ জন্মে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। মনের অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ অবস্থা ও অত্যন্ত ক্লেশের অবস্থা, এই উভয়েরই দ্বারা ক্ষুধামান্দ্য জন্মিয়া থাকে। যদি মনের আনন্দ বা ক্লেশদায়ক ঘটনা আহারের অব্যবহিত পরে ঘটে, তাহা হইলে পাকস্থলী ভুক্তদ্রব্য সকল উদ্গীরণ করে, অথবা অতি কষ্টে ও অনিচ্ছায় পরিপাক করে। বহুকালব্যাপী অতিরিক্ত মানসিক শ্রম হইতে নানা প্রকার রোগ জন্মে। কখন হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক স্পন্দন (Palpitation) হয়, নাড়ী ক্ষীণ হয় ও উহার গতির হ্রাস হয়, কখন অজীর্ণরোগ উৎপন্ন হয়। নিদ্রা প্রায়ই ক্ষণস্থায়ী ও অগভীর হয়। অস্বাভাবিকরূপে মস্তিষ্ক চালন হেতু নিশ্চয়ই কতক পরিমাণে শারীরিক বৈলক্ষণ্য ও দৈহিক অপকৃষ্টতা হইয়া থাকে। যথাবশ্যক বিশুদ্ধ শোণিত ব্যতীত গ্রন্থি বা অন্যান্য যন্ত্র স্বস্ব কার্য্য উত্তমরূপ করিতে পারে না। এবং উহা ব্যতীত দেহের যথেষ্ট বা সম্পূর্ণ আয়তন বৃদ্ধি হইতে পারে না।

নৈতিক শিক্ষার আলোচনায় এখন আমরা প্রবৃত্ত হই। যদিও আমরা শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ শিক্ষা একে একে বর্ণনা করিতেছি, তথাচ উহা যে একত্রে শৈশব কাল হইতে সকল সময়ে সমাধান করিতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই। নৈতিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যকে সদ্‌গুণসম্পন্ন ও চরিত্রবান করা। বর্ত্তমান সময়ে গৃহে ও বিদ্যালয়ে এই শিক্ষার অভাবে যে কুফল উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অনেক পিতা মাতা অতি দুঃখের সহিত অনুভব করিতেছেন। বিগত জ্যৈষ্ঠমাসে একটী সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকায় এ সম্বন্ধে যাহা

লিখিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল।

"ভিত্তির উপর গৃহ নির্ম্মিত হয়, বালক-চরিত্রের উপর জাতীয় চরিত্র নির্ম্মিত হয়। ভিত্তি সুদৃঢ় হইলে গৃহ খানির উপর আর আশঙ্কা থাকে না। বালক-চরিত্র সুগঠিত হইলে সমস্ত জাতির আর মার নাই। সে জাতিকে সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে আর বিনষ্ট করিতে পারে না * * * বীজের পক্ষে যেমন মৃত্তিকার রস ও রৌদ্র বৃষ্টির প্রয়োজন, বালক-চরিত্রের পক্ষেও তেমনি সাধু সংসর্গ, সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। ইহার অভাবে বালক-চরিত্র বিকৃত হইয়া যায়, জাতীয় চরিত্র আর সুগঠিত হইতে পারে না। বালক-চরিত্রে বিষ প্রবেশ করিয়াছে, বালকগণ দুর্ব্বিনীত ও উদ্ধত হইয়া পড়িতেছে। পিতা মাতা গুরুজনে আর তাহাদের তেমন ভক্তি নাই। সাধু ও সাধুতার উপর আর তাহাদের শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্ব প্রকার সৎকাজ তাহাদের বিদ্রূপ ও উপহাসের বিষয় হইয়াছে। হালকা বিষয়ে তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহ, নারী জাতির উপর কুৎসিৎ বিদ্রূপ করিয়া তাহারা সুখী, অশ্লীল গ্রন্থ পাঠে তাহাদের অনুরাগ, চঞ্চলতা ও সৎবিষয়ে নিষ্ঠাশূন্যতা তাহাদের জীবনের গৌরবের বিষয়। বালক চরিত্র যে এইরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেকেই দেখিতে পাইতেছেন।"

"পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এমন কথা শুনা যাইত না যে, পিতা সন্তানের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া পুলিষ আদালতের শরণাগত হইয়াছে। এখন প্রায় শুনা যায়, পুত্র পিতাকে প্রহার করিতেছে, পিতার প্রাণনাশ করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। পিতা আর কোন উপায় না দেখিয়া শান্তি রক্ষার জন্য পুলিষ আদালতে পুত্রের নামে মকদ্দমা আনিয়াছেন। পুত্র যে পিতার প্রাণবধ করিয়াছে, এমন ঘটনা হইয়াছে। মূর্খ ও দরিদ্র লোকের মধ্যে এমন কথা আগে শুনা যাইত, কিন্তু এখন ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের ঘরে এইরূপ কাণ্ড হইতেছে। পুত্রেরা যে এমন বিকৃত কেন হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে কেহই প্রস্তুত হয়েন নাই।"

"বালক-চরিত্রে বিষ প্রবেশ করিয়াছে, এ বিষে সমস্ত জাতি জর্জ্জরিত হইবে। যে জাতির বালক চরিত্র কলুষিত, সে জাতির ধ্বংশ অনিবার্য্য। আজ কাল গোবংশ ও অশ্ববংশ উন্নতির জন্য আলোচনা হইতেছে, মনুষ্যবংশ উন্নতির জন্য কোন আলোচনা হইতেছে না। বৃক্ষ লতার উন্নতির জন্য বহু লোকে আন্দোলন করিতেছেন; গোলাপ ফুলটা কিরূপে বড় করা যায়, অনেকে সে চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু মনুষ্য সন্তানের উন্নতির কথা বড় কেহ ভাবেন না।"

"পৃথিবীর নানা দেশে যাঁহারা আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন, ভূমণ্ডল যে সকল জাতির পরাক্রমে সর্ব্বদা ভীত, তাঁহাদের কথা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বালক চরিত্র গঠন করিবার জন্য তাঁহারা কত আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহারা জানেন, জাতীয় পরাক্রম বালক চরিত্রের উপর নির্ভর করে।"

"আর আমরা বাঙ্গালী জাতি অধোপাতে যাইবার যোগাড় করিতেছি।

আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ বড় ছিলেন, সে গৌরবে আর আত্ম রক্ষা করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্ব পুরুষের মহত্ত্ব স্মরণে বহুকাল ভাল ছিলাম। নম্রতা বিনয় প্রভৃতি অনেকগুলি গুণ আমাদের জাতীয় জীবনে দেখা যাইতেছে, কিন্তু নানা কারণে এ সকল গুণ হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি। বালকগণ উদ্ধত, দুর্ব্বিনীত ও অসাধু হইয়া পড়িতেছে। ইহারাই যখন বয়স বৃদ্ধির সহিত বাঙ্গালী জাতির আদর্শ হইবে,—এ জাতির তখন কি বিড়ম্বনা হইবে! বালকই জাতীয় ভিত্তি—এ ভিত্তি যদি না দৃঢ় হইল, তবে আর জাতীয় উন্নতির আশা কৈ!"

উপরোক্ত প্রত্যেক কথার সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে। শৈশবকাল হইতে সু-অভ্যাস ও সদ্গুণ বাল-হৃদয়ে সঞ্চার করিতে না পারিলে, কু-অভ্যাস ও অসদ্গুণে উহা পূর্ণ হইবে। হৃদয় শূন্য থাকিবে না। কেন না, "Nature abhors Vacuun"

আমাদের চলিত ভাষায় একটী কথা বলে, "কাঁচায় না নোয়ায় বাঁস, পাকায় করে ট্যাস ট্যাঁস।" কথাটী চরিত্রগঠন পক্ষে বিশেষ রূপে খাটে। তবে জ্ঞান শিক্ষা বা বিদ্যাশিক্ষা ভালরূপ হইলে, ও বালক চরিত্রবান হইলে, অধিক বয়সে আরো ভাল হওয়া কঠিন নহে। কিন্তু কু-অভ্যাস ও অসদ্গুণ সকল বয়সকালে দূরীভূত করিয়া সদ্গুণ-সম্পন্ন হওয়া নিতান্ত সহজ নহে।

নীতি শিক্ষার প্রশস্ত স্থান গৃহ, উহার প্রশস্ত কাল বাল্যকাল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, গৃহস্বামীর ঔদাস্য ও গৃহিণীর অজ্ঞতা এবং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের দায়িত্ব-বোধের অভাব বশতই এইরূপ অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে। আমরা এখন সমাজ সমিতিতে হই-চই করিয়া যে সময় নষ্ট করি, তাহার কিয়দংশ যদি আমরা শিশু সন্তানের চরিত্রগঠনে অতিবাহিত করি,তাহা হইলে বিশেষ ফল হয়।

দেশের বড় কাজ করা কিছু সকলের ভাগ্যে ঘটেনা, সকলের সে শক্তি নাই। আমাদের অনেকে এখন যৌবন কালে উপস্থিত, অথবা উহা অতিবাহিত করিয়াছেন, অনেকের সন্তান হইয়াছে এবং অনেকের সন্তান হইবার সম্ভাবনা আছে। আমরা যদি আর কিছু না করিতে পারি, কেবল ভারতমাতাকে গুটীকতক সত্যনিষ্ট, ন্যায়পরায়ণ, সদ্গুণসম্পন্ন, চরিত্রবান সন্তান দিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে ভারতমাতার ঋণ অনেক পরিমাণে পরিশোধ করা হয়। শিশুদিগের নীতি ও জ্ঞান-শিক্ষা, উভয়েই একসঙ্গে হইতে থাকে, উভয়কে পৃথক করা সুকঠিন। জ্ঞানশিক্ষা একশ্রেণীর মানসিক বৃত্তির কার্য্য এবং নীতি শিক্ষা অপর শ্রেণীর মানসিক বৃত্তির কার্য্য। এই উভয় শ্রেণীর বৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন করা পিতা মাতা ও শিক্ষকের কর্ত্তব্য। কিন্তু কেহই উপযুক্ত রূপে এ বিষয়ে মনোযোগ দেন না। সন্তানেরা তাহাদের স্ব স্ব শ্রেণীতে বা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট, আর কিছু চাহেন না, আর কিছু দেখেন না। কিন্তু যখন এই আংশিক মানসিক শিক্ষার কুফল ফলিতে থাকে, তখন তাঁহারা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও পারিবারিক দুর্গতি দেখিয়া অরণ্যে রোদন করিয়া থাকেন। নীতিবিহীন লোক অসাধু সঙ্গে পড়িয়া এমন

সকল জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় যে, তাহাতে তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ, অর্থের ক্ষতি, মানসিক উদ্বিগ্নতা এবং আত্মীয় স্বজনের অনিষ্ট ও কষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যে যখন বুদ্ধি ও নীতি বৃত্তির সামঞ্জস্য সংঘটিত হয়, তখনই সে নিজ কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হয়। এই কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষকে আদর্শ-চরিত্র বলা যায়। মনোবৃত্তির সঞ্চা-. লনে মানবের যে আচার বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহাকেই চরিত্র বলে। এই প্রকৃতি যখন অনুকরণের উপযুক্ত হইয়া উঠে, তখনই তাহাকে আদর্শ চরিত্র বলা যায়, অতএব আদর্শ চরিত্র আর কিছুই নহে, কতকগুলি সদ্গুণের সুন্দর সম্মিলন মাত্র। সুতরাং এক বা দুইটী সদ্বৃত্তি প্রবল থাকিলেই তাহাকে আমরা আদর্শ চরিত্র বলিতে পারি না।

বিনয়, দয়া, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, ধার্ম্মিকতা প্রভৃতিকে আমরা সদ্গুণ বলিয়া থাকি। যিনি বিনয়ে কোমলতা, দয়ায় অশ্রুপাত, জ্ঞানে গাম্ভীর্য্য, ন্যায়পরতায় তীক্ষ্ণ দর্শন এবং ধার্ম্মিকতায় অনন্ত তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনিই আদর্শ-চরিত্র। যাঁহার বিদ্যা জ্ঞানের নিমিত্ত, ধন দানের নিমিত্ত, শক্তি রক্ষার নিমিত্ত, তিনিই আদর্শ-চরিত্র। যাঁহার বিনয়ে চাটুকারিতা নাই, দয়ায় স্বার্থপরতা নাই, জ্ঞানে অহঙ্কার নাই, ধার্ম্মিকতায় বাচালতা নাই, তিনিই আদর্শ চরিত্র।

দেড় মাস বয়ঃক্রম শিশুকে মানুষের ভাবের বাহ্য প্রকাশের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখা যায়। আনন্দ ও হাসিপূর্ণ মুখ দেখিলে সে হাসে এবং তাহাকে ভয় দেখাইলে সে ম্লান হয়। সুতরাং দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কোমল মানসিক বৃত্তি সকল মাতার স্নেহ ও সান্ত্বনা বাক্য হইতেই প্রায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সময় হইতে পিতা মাতার যত্ন ও গৃহের সুশৃঙ্খলা ও শান্ত ভাবের প্রভাব শিশুদের কোমল মনে অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবসুলভ আনন্দময় প্রকৃতিকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করা একান্ত আবশ্যক। দয়া, বিনয়, সাধু ইচ্ছা, সৎ কার্য্যের অভ্যাস, দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দিবে। তাহাদের মনের সদাসৎ গতি বিবেচনা করিয়া চালাইতে হইবে। যদিও সকল মানসিক বৃত্তিকে উপযুক্তরূপে চালনা করিবার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক, তথাচ বলবতী বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে অধিকতর সাহায্য করিবে। অধিক পরিমাণে নিয়মা-ধীন করা অথবা অযথা শিথিলতা (নাই দেওয়া) প্রদর্শন করা, উভয়ই অনিষ্টের মূল। যে সন্তানেরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পায়, যে সামগ্রী চায় তাহা পায়, তাহারা অল্পদিনের মধ্যে স্বার্থপর, অপ্রেমিক, স্নেহ-মমতা-বিবর্জ্জিত ও সাধারণত অসুখী হইয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে। এবং যাহারা কর্কশ বা কঠিনভাবে শাসিত হয়, এবং যাহাদের কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না, সকল বিষয়েই পিতা মাতার ইচ্ছার আধি-পত্য স্থাপিত হয়, এবং যাহাদের কোমল আনন্দপূর্ণ ভাব সকল অবাধে পেষিত হয়, তাহারা যে অল্পেতে রাগান্ধ, সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট-চিত্ত, দুষ্ট স্বভাবাপন্ন, নিরুৎসাহী বা নিরাশা-যুক্ত হইয়া কালাতিপাত করিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি ?

যে সকল পুস্তকে উন্নত চরিত্রের গঠন ও কার্য্য উত্তমরূপে চিত্রিত আছে, যাহাতে

অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, জ্বলন্ত উৎসাহ ও আগ্রহ ভিন্ন যে মহৎ কার্য্যসকল সম্পন্ন হয় না, তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, এবং যাহাতে কার্য্য করিবার সৎ ইচ্ছা ও নিয়ম সকলের গুণানুকীর্ত্তন এবং স্বার্থপরতা ও কপটতার দোষ বর্ণন করিয়া ঘৃণা উৎপন্ন করিয়া দেয়, সেই সকল বিষয়ের পুস্তকই বালক বালিকা ও যুবক যুবতীর পাঠ্য।

ধর্ম্মদাস বাবু বলিয়াছেন,—"পারিবারিক নীতি ও আচরণ বিশুদ্ধ হইলে সন্তানগণ যে শীঘ্র দুশ্চরিত্র হইবে না, তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। এনিমিত্ত স্ব স্ব পরিবার মধ্যে বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা প্রত্যেক পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পরিবার মধ্যে কুরীতি বিদ্যমান থাকিলে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিলেও প্রকৃতির দোষ দূরীভূত হইবে না।"

"বিদ্যালয়ে নানা অবস্থায় নানা প্রকার বালক বালিকার সম্মিলন হয়, স্বভাবসিদ্ধ অনুকরণপ্রিয়তা হেতু পরস্পরের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় এবং বহুকাল একত্রে থাকিলে সেই সমুদয় পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইতে পারে। যাহাতে ছাত্রবৃন্দ মন্দ বিষয় অনুকরণ না করে এবং গুপ্তভাবে কোন অশ্লীল ক্রীড়াদি করিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে শিক্ষক মাত্রেরই লক্ষ্য রাখা উচিত। শিক্ষকদিগের আচরণ অনেক ছাত্রের আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকে, সুতরাং শিক্ষক মহাশয়গণ এবিষয় স্মরণ রাখিয়া স্ব স্ব চরিত্র ও ব্যবহার যতদূর উন্নত করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন।"

সন্তানদিগকে শাসন করিবার প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে শারীরিক দণ্ডবিধান করা উচিত নহে। এবিষয়ে ডাক্তার চাভেসি বলিয়াছেন, "আমি বিদ্যালয়ে শারীরিক দণ্ডের অনুমোদন করি না, আমার মতে উহা শরীর ও মন উভয়েরই অনিষ্টসাধন করে।" মস্তকে আঘাত করা অতীব দূষণীয় এবং উহা অবশ্য পরিত্যজ্য। বেত্রাঘাত সম্বন্ধে ডাক্তার ব্রাউন বলেন, প্রত্যেক বেত্র বা যষ্টির আঘাত স্নায়ুমণ্ডলীর অবসাদ (Shock) আনয়ন করে এবং উপর্য্যুপরি আঘাতের পর স্নায়ুর তেজ হ্রাস ও দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। কোন কোন সময়ে তজ্জন্য মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। এবং কখন কখন ছাত্রের মস্তিষ্কের পীড়া জন্মিয়াছে। সকল প্রকার প্রহার পরিহার্য্য। যদি কখন বিনা প্রহারে সন্তানদিগকে বশীভূত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কোন যন্ত্রের অনিষ্ট না হয়, এইরূপ ভাবে হস্তপদাদিতে আঘাত করিবে।"

ধর্ম্মদাস বাবু বলিয়াছেন, "সামান্য অন্যায় কার্য্য করিলে সন্তানের সহিত কথা কহিবেন। কাহাকে কটু কহিলে তাহাকে ক্ষমা চাহিতে হইবে, কোন দ্রব্য নষ্ট করিলে পর্ব্ব উপলক্ষে তাহার যদি কোন প্রাপ্য থাকে, অথবা তাহার যদি কোন সঞ্চিত অর্থ থাকে, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ দণ্ড করিবে। কোন দ্রব্য বা স্থান অপরিষ্কার করিলে তাহার নিজ হস্তে পরিষ্কার করাইয়া লইবে। গুরুতর দোষ করিলে অথবা অবাধ্য হইলে তাহাকে একস্থানে একাকী বসাইয়া রাখিবে, কেহ তাহার সহিত কথা কহিবে না। এবং তাহাকে কোথায় বেড়াইতে যাইতে দেওয়া হইবে না।"

এইবার আমরা তৃতীয় বিভাগে আসিয়া

উপস্থিত। ইহার প্রতি পিতা মাতা শিক্ষক সকলেরই দৃষ্টি অধিক। শৈশবকাল হইতে কিরূপে মানসিক বিকাশ অনুসারে বৃত্তি সকলের চর্চ্চা করা আবশ্যক, তাহাই একে একে আমরা আলোচনা করিব।

শিশুদিগের অনুভবশক্তি ও ধারণা শক্তি প্রথমে প্রকাশ পায়, পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তি সকল বিকশিত হইতে থাকে। রুঢ় পদার্থ হইতে যেমন যোগ রুঢ় পদার্থ উৎপন্ন হয়, মানব মনের বিকাশও সেইরূপ হইয়া থাকে। বালকদিগের প্রথম পদক্ষেপ ও প্রথম বাক্যোচ্চারণ যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি উহাদের বোধ-শক্তি ও ধারণা-শক্তি প্রথমে অতীব অসংযত থাকে। শিশুর চক্ষু প্রথমে কেবল আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য অনুভব করিয়া থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও তাঁহাদের প্রভেদ বুঝিতে পারে, এবং সর্ব্বশেষে বস্তু সকলের আকৃতি স্পষ্ট করিয়া জানিতে পারে। এইরূপ শিশুর মনও প্রথমে একবস্তু হইতে অন্য বস্তুর মোটামোটি জ্ঞান পাইয়া থাকে; পরে ক্রমশঃ উহাদের পার্থক্য ও বিশেষত্বের তারতম্য বুঝিতে পারে। সেইজন্য এই সকল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উহাদের মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে।

প্রথমত, খেলনা বা ছবি দেখাইয়া বাহ্য বস্তু সকলের আকার প্রকার শিক্ষা দিবে। "গৃহস্থ দ্রব্যসামগ্রীর নাম, উৎপত্তি, ব্যবহার, গো, মেষ, কুক্কুর, বিড়াল, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতির আকার ও স্বভাব, যাহা শিশুরা নিজ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারে, তাহা সরলভাবে গল্প চ্ছলে তাহাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহাদের মন নানা বিষয়ে আকৃষ্ট হইলেও উহাদের স্থূল বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার যত্ন, চেষ্টা, আগ্রহ ও কৌতুহল জন্মিবে। ইহার দ্বারা বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, হিতাহিত বিচার ও চিন্তাশক্তির ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকিবে।"

ডাক্তার ট্যাশার বলেন, "অকাল-পরিণত-বুদ্ধি (Precocious) ও দুর্ব্বল বালক বালিকাদিগকে কদাচ শীঘ্র শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। ভূয়োদর্শন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, মানসিক ফল শস্যক্ষেত্রের ন্যায় বিলম্বে ফলিতে আরম্ভ হইলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।"

শৈশব ও বাল্যকালে যাহাতে জানিবার ইচ্ছা বা কৌতুহল উদ্দীপ্ত হয়, সে বিষয় বিশেষ চেষ্টা করিবে।

ছয় সাত বৎসর বয়ক্রম হইলে বর্ণপাঠ এরূপ করিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবে যেন উহাতে তাহার বিরক্তি বা ক্লান্তি বোধ না হয়। শিশুতে যৌবনের মানসিক বিকাশ দেখিতে চাহিলে কখন শারীরিক শক্তির ক্ষয় বা অপভ্রংশ ব্যতীত হয় না। পুস্তক পাঠের সময় বস্তু সকল বা ঘটনা সকলের হেতু ও বাক্যের অর্থের প্রতি প্রথমে দৃষ্টি রাখিবে। স্বভাবের মধ্যে যে সকল আশ্চর্য্য কার্য্য ও সৌন্দর্য্য প্রচুর পরিমাণে বিকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি উহাদের দৃষ্টি চালিত করিলে পর্য্যবেক্ষণ অভ্যাস হইতে পারে। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা সকল জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিচারশক্তি পরে জন্মে। বয়োন্নতির সহিত মানসিক খাদ্যও গুরুতর হওয়া আবশ্যক। তর্ক ও মীমাংসা শক্তিতে মনকে বলিষ্ঠ করিবে। ধৈর্য্য, সন্তোষ ও

তিতিক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তাহাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিবে। তাহাদের মনে এই সত্যটী সর্ব্বাগ্রে অঙ্কিত করিবে যে,তাহারা যে কার্য্য বা বিষয়ে নিযুক্ত হইবে, তাহাতে শ্রেষ্টত্ব লাভ করাই তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। উচ্চপদবী প্রাপ্ত হওয়া যে তাহাদের আয়ত্তাধীন, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুস্তক নির্ব্বাচন একটী গুরুতর কার্য্য। যে সকল পুস্তক বুদ্ধিবৃত্তি অপরিমিতরূপে চালিত না করিয়া বস্তু সকলের কারণ অনুসন্ধান করিতে শিক্ষা দেয় ও হৃদয়ে উচ্চ সদ্ভাব উৎপন্ন করিয়া দেয়, তাহাই প্রথম আবশ্যক।

পুস্তক-বহির্ভূত প্রয়োজনীয় বিষয় সকল গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিবে। গল্প শুনিতে সন্তানেরা যে অত্যন্ত ভালবাসে, তাহা বোধ হয় সকলেই অনুভব করিয়াছেন। এই প্রণালীতে নীতিশিক্ষা অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয়। ধর্ম্মদাস বাবু বলিয়াছেন,—"ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অহোরাত্র মধ্যে পূর্ব্বাহ্নে মানসিক বৃত্তি সকল সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ থাকে। অপরাহ্নে ও সায়ংকালে সর্ব্বাপেক্ষা নিস্তেজ থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালাপেক্ষা হেমন্ত, শীত ও বসন্তে অধিক কর্ম্মণ্য থাকে। বাল্য ও তরুণ কালাপেক্ষা যৌবন কালেই অধিক উন্নতিশীল থাকে। ঐ সময় মস্তিষ্ক উপযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইলে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা। আর তাহা না হইলে উহা মরুর ন্যায় অনুর্ব্বর হইয়া যায়।"

স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, যতদূর সাধ্য আত্মবিকাশকে সাহায্য করিবে, সন্তানদিগকে নিজে নিজে অনুসন্ধান করিতে দিবে এবং উহা হইতে তাহারা নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। অতি অল্প বিষয়ই তাহাদিগকে বলিয়া দিবে এবং সম্ভবমত তাহাদিগকে আবিষ্কার করিতে দিবে। ইহাই স্বভাবের শিক্ষার নিয়ম। আমরা দেখি, মাতৃভাষা সন্তানেরা আপনি শিক্ষা করে,বাহ্যবস্তুর জ্ঞান তাহারা অতি অল্প বয়সেই অন্যের সাহায্য ব্যতীত লাভ করে। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের বহির্ভূত অনেক বিষয়ের জ্ঞান নিজেরাই উপার্জ্জন করে। নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের সন্তানেরা কোন শিক্ষা ব্যতীত অনেক সাংসারিক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে; এবং অন্যান্য অনেক মহাত্মা সংসারে অতি হীন অবস্থায় থাকিয়া ও অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া উন্নতির উচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছেন। তখন ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, উপযুক্ত আকারে সুনিয়মে কোন বিষয় যদি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রের সম্মুখে দেওয়া যায়, তাহা হইলে অতি অল্প সাহায্যেই উত্তরোত্তর কঠিন বিষয় সকল আয়ত্ব করিবে। বালকদিগের মনে যে অনবরতই প্রশ্ন পর্য্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত চলিতেছে, তাহা কে না দেখিয়াছেন?

বালকদিগকে যে পুনঃ পুনঃ পাঠ বলিয়া দিতে হয়, তাহা তাহাদের স্থূল বুদ্ধির জন্য নহে, আমাদের অর্থাৎ পিতা মাতা শিক্ষকদিগের স্থূল বুদ্ধিই উহার কারণ। যে সকল সত্য ও জ্ঞান উহারা ভালবাসে এবং সহজে জীর্ণ করিতে পারে, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গুরুতর, কঠিন ও সহজে তাহাদের বোধগম্য নহে, এরূপ বিষয়ে আমরা উহাদের মনোনিবেশ করাইতে চেষ্টা পাই। সুতরাং এই সকল বিষয় তাহাদের অপ্রিয় হয়। যখন দেখি, তাহারা সহজে গুরুতর বিষয় শিক্ষা করে না, তখন

আমরা নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন ও দণ্ড বিধান করিয়া থাকি। এতদ্বারা মানসিক বৃত্তি সকলকে কেবল দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত করি এবং ইহার ফলে সকল প্রকার জ্ঞান লাভে বিতৃষ্ণা জন্মে। স্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিয়া সন্তানদিগের মানসিক বৃত্তি সকলকে যদি ক্রমে ক্রমে আপনি বিকাশ হইতে দিই, তাহা হইলে সময়ে উহার কার্য্যকারী শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে।

আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের অন্য প্রকার উপকারও আছে। ইহার দ্বারা ভাবসকল জাগ্রত ও স্থায়ী করিয়া রাখে। যে ছাত্র স্ব স্ব শক্তিতে জ্ঞান উপার্জ্জন করে, যে ছাত্র কোন জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা নিজে প্রমাণ করিতে পারে, তাহা যেমন তাহার নিজ সম্পত্তি, এমন আর কিছুই নহে। এই রূপে অজ্ঞতার উপর জয়লাভ করিতে চিন্তাশক্তির যে একাগ্রতার প্রয়োজন হয় এবং তৎপরে জয় হেতু যে উত্তেজনা ও সুখ অনুভূত হয়, তাহাতে ঐ সকল সত্য তাহাদের স্মরণ শক্তির উপর যেরূপ বিশেষ করিয়া অঙ্কিত করিয়া রাখে, পুস্তকে পঠিত বা শিক্ষকের নিকট শ্রুত সত্যে সেরূপ হয় না। এরূপ চেষ্টায় বিফল-প্রযত্ন হইলেও তাহার মানসিক বৃত্তির চালনা হেতু তাহাকে অধিক উপযোগী করে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ আত্ম চেষ্টায় নৈতিক চর্চ্চাও হইয়া থাকে। কঠিন বিষয় সকল আক্রমণ করিতে সাহস হয়। সহিষ্ণুতার সহিত অভিনিবেশ করিতে একগ্রতার উৎপন্ন হয়। বিফলপ্রযত্ন হইলেও ধৈর্য্য-অবলম্বন শিক্ষা হয়। এই সকল সদ্গুণই জীবন-সংগ্রামের পথে পদে পদে প্রয়োজন।

সকল শিক্ষিত বা উপদিষ্ট বিষয় যাহাতে ছাত্রদের নিজ সম্পত্তি হইতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আগ্রহের সহিত যাহা কিছু আমরা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করি, তাহা যে অধিক পরিমাণে স্মরণ থাকে, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। দৈনিক পাঠাভ্যাসে যে পরিমাণে আমোদ, সুখ বা দুঃখ বোধ হয়, সেই পরিমাণে নৈতিক উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে। দুইটী ছাত্রের মধ্যে যাহার পাঠাভ্যাস সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহার মুখ কেমন প্রফুল্ল, স্বভাব কেমন প্রীতিকর ও স্ফূর্ত্তিময় দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যাহার পাঠাভ্যাস হয় নাই, তাহাকে নিরানন্দ, অসুখী, শাসন ভয়ে ভীত, অধ্যয়নে বিতৃষ্ণ ও অসন্তুষ্ট এবং দুষ্ট স্বভাবাপন্ন হইয়া থাকিতে দেখা যায়। পরীক্ষায় সফল বা বিফল হইলে ছাত্রদের মনের উপর যেরূপ ফল উৎপন্ন হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বার বার বিফল-প্রযত্ন হইয়া কত ছাত্র যে রুগ্ন, জীর্ণ, নিরুৎ-সাহী, ভীত ও ম্লান হইয়া কালাতিপাত করিতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমরা, দুই তিনটী ছাত্রকে এই কারণে ইহকাল পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছি, এবং কতকগুলিকে উদ্বন্ধন বা অন্যোপায়ে আত্মহত্যা করিতে শুনিয়াছি। আবার যাহাদের মনোরথ পূর্ণ হয়, তাহাদের শরীর সুস্থ ও বলিষ্ট এবং তাহাদের মন উৎসাহপূর্ণ, প্রফুল্ল ও স্ফূর্ত্তিময় হয়।

মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা মনের প্রফুল্লতার উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং খেলা ও আমোদ প্রমোদে কিছু সময় প্রত্যহ অতিবাহিত

করা আবশ্যক। তাই বলিয়া যে সকল খেলায় শরীর অপেক্ষা মন অধিক পরিমাণে চালিত হয়, তাহা বালকদিগের পক্ষে অবিধেয়। অনেক স্কুলের ছাত্র তাস পাশা প্রভৃতি খেলিয়া আমোদ প্রমোদে কাল অতিবাহিত করে। উহাতে মনের বিশ্রাম হয় না, মস্তিষ্কের ক্ষয় বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না। স্বপ্নে কেবল বিস্তি, পঞ্চাশ, ছক্কা পঞ্জা দেখায় সুনিদ্রার ব্যাঘাৎ হয়, এবং অতিরিক্ত পাঠের যে দোষ, তাহা সকলই ঘটে। যে সকল ক্রীড়ায় শরীর চালনা হয় এবং মনের স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ হয়, তাহাই শ্রেয় এবং তাহাতেই শরীর মন উভয়ই সবল হয়।

"সুশ্রাব্য গীতবাদ্য শ্রবণ, সুন্দর ও সুরুচি-উদ্দীপক দ্রব্য বা চিত্রাদি দর্শন ও স্রোতস্বতী নদীতীরে বা গিরিপদে ক্রীড়া কৌতুক করিলে মন প্রফুল্ল ও শরীর বলিষ্ট হইবে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মনোহারিণী-শক্তি অনুভব করিতে পারিবে এবং মন ক্রমে নীচভাব ও কুরুচিতে পূর্ণ না হইয়া উন্নত হইতে থাকিবে।

বাল্য ও যৌবনকালে অতিরিক্ত শিক্ষার স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রভৃতি কুফল আমরা পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়াও উহা হইতে আমাদেরই সন্তানদিগকে রক্ষা করিতেছি না। স্পেন্সার বলিয়াছেন—যে কোন উদ্দেশ্যে এই দূষনীয় প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার প্রত্যেকেই ভ্রমাত্মক। অল্প কালে অধিক জ্ঞানোপার্জ্জন যদি উদ্দেশ্য হয়, সে উদ্দেশ্য সফল হইতে পারেনা। যেমন আমাদের শরীর অতিরিক্ত খাদ্য জীর্ণ করিতে ও সমী-করণ করিতে অক্ষম, এবং শীঘ্রই উদগীরণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ অপর্য্যাপ্ত সত্য ও জ্ঞান আমাদের মানসিক গঠন-সাধন করিতে অক্ষম। এইরূপ অতিরিক্ত চাপে অধ্যয়নের উপর সম্পূর্ণ রূপে বিরাগ জন্মে। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা ও আত্মোন্নতি করিবার বাসনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কেবল মানসিক মেদ সঞ্চয়ে কোন ফল নাই; মানসিক পেশীর আবশ্যক, শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইলে মানসিক বল সত্ত্বেও জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার আশা নাই। সংসারের উন্নতি, জ্ঞানাপেক্ষা কার্য্যকরী শক্তির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং যে শিক্ষায় কার্য্যকরী শক্তির ক্ষতি হয়, তাহা বৃথা। শারীরিক বলের আধিক্য হইতেই প্রবল ইচ্ছা ও অবিশ্রান্ত কার্য্য করিবার শক্তি উদ্ভূত হয়, এবং উহাই শিক্ষার অভাব অধিক পরিমাণে নিবারণ করিতে পারে। যদি শারীরিক বলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষার সংযোগ হয়, তাহা হইলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত, অতিরিক্ত অধ্যয়নে অসুস্থ শরীরসম্পন্ন সহযোগীদিগকে সহজেই পরাজয় করিতে পারা যায়।

ছোট অথচ সুগঠিত নহে, এমন একটী বাষ্পীয় কল অধিক পরিমাণে বাষ্পের চাপে কার্য্য করিলে উহা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও সুগঠিত অল্প বাষ্পের চাপে চালিত অপর একটী কল হইতে অধিক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কেহ কেহ মনে করেন, এইরূপ শরীরের ক্ষতি করিয়া যে উচ্চ শিক্ষা লাভ হয়, তাহাতে সাংসারিক সুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু উহার আনুষঙ্গিক অসুস্থতা অধিকন্তু দুঃখই আনয়ন করে। সে ধনে কি কাজ, যাহার উপার্জ্জনে যন্ত্রণা ও রোগবৃদ্ধি।

বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইবার বা ফল কি, যদি এই প্রশংসার সহিত কাল্পনিক রোগের (Hypochondria) সৃষ্টি হইয়া থাকে। চিরস্থায়ী শারীরিক অসুস্থতায় উচ্চ আশা ও ভাবী সৌভাগ্য-সূর্য্যকে মেঘাবৃত করিয়া থাকে। কিন্তু সবল সুস্থ শরীরের স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতায় মানবগণকে সহজে দুঃখের পথ দিয়া নিরাপদে লইয়া যায়। সেই জন্যই আমরা এই অতিরিক্ত মানসিক শ্রমকে সর্ব্বপ্রকারে অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি। প্রথমত, এই অতিরিক্ত শ্রমে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী, শীঘ্রই বিস্মরণ হয়।

দ্বিতীয়ত, ইহার দ্বারা জ্ঞানের সুরম্য অট্টালিকা সৃজিত না হইয়া কেবল ইটকাট চুন সুরকি প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়া আবর্জ্জণার ন্যায় পড়িয়া থাকে; কিন্তু উহার দ্বারা কাহারও উপকার হয় না। তৃতীয়ত, ইহার দ্বারা জীবনী শক্তির হ্রাস বা ক্ষতি হইয়া থাকে, সুতরাং এই শক্তির অভাবে শিক্ষিত মন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। চতুর্থত, ইহার দ্বারা সফল-মনোরথ হইলেও ইহার আনুষঙ্গিক অসুস্থতা অধিক কষ্টদায়ক। যখন অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তখন আর কষ্টের সীমা থাকে না।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এরূপ অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অধিকতর অপকারী। আমাদের দেশে ইহার কুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে; এখন হইতে যদি আমরা সতর্ক না হই, তাহা হইলে পশ্চাতে পরিতাপের সীমা থাকিবে না। আমি লণ্ডনে ব্রিটিস মিউজিউমের পুস্তকাগারে যুবতী পাঠিকাদিগের মধ্যে চস্‌মা ব্যবহার দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এ দেশের সবই বিপরীত, আমাদের দেশে যুবকদের নাসিকায় চসমার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এ দেশে যুবতীরাই চস্‌মা একচেটে করিয়া লইয়াছেন; যুবকদের চস্‌মার ব্যবহার অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু ভারত ললনাদের মধ্যে বড় কেহ বি এ, এমএ, উপাধি-গ্রস্ত হন নাই। এখন যে দুই চারিজন এই উপাধি পাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ২।৩ জনকে ইতিমধ্যে চস্‌মার সাহায্য লইতে হইয়াছে, ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়! উচ্চ শিক্ষা ও চসমার যদি এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে শতবার বলিব, উচ্চশিক্ষা অতীব শোচনীয় সামগ্রী, ইহা স্ত্রীজাতির অস্পৃশ্য হওয়াই উচিত। ভারত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী যখন পুরুষের পক্ষে দোষাবহ ও অসম্পূর্ণ, তখন যে উহা রমণীর পক্ষে কত অনুপযুক্ত, তাহা বলা যায় না। স্ত্রীলোকদের অতিরিক্ত মানসিক শ্রমে যে অধিকতর সহ্য করিতে হয়, তাহার কারণ উহারা পুরুষের ন্যায় শারীরিক ক্রীড়া কৌতুক সম্ভোগ করিতে পায় না। ইয়ুরোপীয় জননীরা, তাহাদের কন্যারা পুরুষের আকর্ষণের বস্তু হইবে বলিয়া, উহাদিগকে সুপাত্রে বরণ করিবেন বলিয়া এইরূপ অতিরিক্ত মানসিক শ্রমে নিযুক্ত করেন, কিন্তু এ উপায় যে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ, তাহা তাঁহাদের জ্ঞান নাই। আশা করি, আমাদের জননীরা ইহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইবেন। পুরুষেরা, স্ত্রীদের মধ্যে পাণ্ডিত্য অতি অল্পই গণ্য

কিন্তু তাঁহারা শারীরিক সৌন্দর্য্য, সংস্বভাব ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির একান্ত পক্ষপাতী। উপন্যাস, ইতিহাস এবং পৃথিবীর দৈনিক ঘটনা ইহার প্রমাণ দিতেছে। শারীরিক সৌন্দর্য্যের পর নৈতিক সৌন্দর্য্যই আকর্ষণের স্থল।

ব্রাহ্মগণ, সমাজসংস্কারকগণ ও বিলাত-প্রত্যাগত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের কন্যাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। ইহা সাধু সঙ্কল্প, তাহার সন্দেহ নাই। আশা করি এবং তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যেন এবিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্বের গুরুত্ব অনুভব করিয়া এই শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহাদের কন্যাদের শিক্ষার দোষগুণের উপর ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বা অবনতি অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। তাঁহারাই আপাতত স্ত্রীশিক্ষার পথ-প্রদর্শক ও দৃষ্টান্তের স্থল হইয়াছেন ও হইবেন। তাঁহাদের আচার ব্যবহার সকল অতি তীব্রভাবে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায় সমালোচন করিবে। তাহাদিগকে অঙ্গুলীর দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার দোষগুণ বিচার করিবে। সেই জন্য এই সকল পিতা মাতাদিগকে অনুরোধ করি যেন কেবল বেথুন বা লরেটো স্কুলে নিজ নিজ কন্যাদিগকে দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন না। তাঁহাদের কন্যাদিগকে শিক্ষার গুরুতর দায়িত্ব বুঝাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে এরূপ শিক্ষা দিবেন যেন স্ত্রীশিক্ষার শত্রু বা নিন্দুকেরা নির্ব্বাক হইয়া যান। ভাবীবংশের পক্ষে মানসিক উন্নতি ও শারীরিক অবনতি-সম্পন্ন স্ত্রী অতি অল্প কার্য্যে আসেন। কেননা, ইহার বংশাবলী দুই একপুরুষ গতে লোপ পাইবার অধিক সম্ভাবনা; কিন্তু মানসিক চর্চ্চা যত কেন অল্প হউক না, যদি শরীর সবল হয়, তাহা হইলে এরূপ স্ত্রীর ভাবী বংশধরের মানসিক বৃত্তির বিকাশ ক্রমশ পুরুষানুক্রমে অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে।

স্পেন্সার বলিয়াছেন—স্ত্রীশিক্ষা যতই কেন উচ্চ হউক না, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, যত উচ্চ হইবে ততই ভাল, কিন্তু দেখিবে যেন শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়। ইত্যবসারে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তোতা পক্ষীর বৃত্তির চালনা অল্প করিয়া মানবের মানসিক বৃত্তি অধিক করিয়া চালনা করিলে যথেষ্ট শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু যে শিক্ষায় শারীরিক অপকৃষ্টতা আনয়ন করে ও যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম হয় ও উদ্বিগ্নতা উৎপন্ন করে, তাহার কিছুই সার্থক হয় না। এইরূপ শিক্ষায় কন্যাদিগকে অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করিতে বাধ্য করিলে, তাহাদের ভাবী উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সহজ কথায় ইহাকে পরকাল-চড়চড়ি হওয়া বলে। এরূপ রমণীরা প্রায়ই চির কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করেন। বিধাতা যেন এরূপ দুর্ঘটনা ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষায় আনয়ন না করেন, এই আমাদের প্রার্থনা।

এইবার আমরা নিজের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। মনুষ্য স্বার্থপ্রিয় জীব, যাহা তাহার নিজের, তাহাই তাহার নিকট প্রিয়। অধিকাংশ লোক তাহার নিজের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির অহঙ্কার করে। কাহার অহঙ্কার করা সাজে, কাহার সাজেনা, আমরা জানিনা। আমরা যে শাস্ত্রের উপাসক, তাহার

কিঞ্চিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহাতে অহঙ্কার দোষে দোষী হইতে হইলে উপায় নাই। যে দিক দিয়া দেখিনা কেন, চিকিৎসা বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও ইহা যে কোন বিদ্যার অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সকল বিদ্যা ও জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ কার্য্য আছে, সমাজ ও জীবরক্ষার্থে সকলেরই আবশ্যক।

বিদ্যা বা শাস্ত্রের চর্চ্চায় আমরা কি ফল লাভ করি? প্রথমত, উহাতে শারীরিক সুখ দুঃখের কোন হ্রাস বৃদ্ধি না করিয়া, সাংসারিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া, কেবল মাত্র মানসিক উন্নতি ও আনন্দ লাভ হয়। এই উদ্দেশ্যে গ্রীকজাতীয় প্ল্যাটো প্রভৃতি পণ্ডিতেরা জ্ঞানের চর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা জ্ঞান বা বিদ্যাকে কোন সাংসারিক স্বার্থ সাধনে নিয়োগ করিতে দেখিলে নিতান্ত রাগান্বিত হইতেন এবং এইরূপ লোককে পাষণ্ড বলিয়া তিরস্কার করিতেন। দ্বিতীয়ত, উহাতে আমরা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজের ও অন্যের সাংসারিক সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখের হ্রাস করিতে পারি। তৃতীয়ত, উহাতে আমরা অন্যের জ্ঞান বৃদ্ধি, শারীরিক কষ্ট নিবারণ বা হ্রাস এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও পরোক্ষে আত্মরক্ষা করিতে পারি। চতুর্থত, উহাতে আমাদের মানসিক উন্নতি ও বিকাশ এবং প্রকৃত চরিত্রের উৎপত্তি ও মনুষ্যত্বলাভ হইতে পারে। চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আমরা উপরোক্ত সকল প্রকার ইষ্ট বিশেষরূপে লাভ করিতে পারি। সুতরাং সকল বিদ্যা অপেক্ষা ইহার মাহাত্ম্য আমাদের নিকট অধিক বলিয়া বোধ হয়। অন্য বিদ্যার মাহাত্ম্য ইহাপেক্ষা অল্প বলিয়া যে তাহাদের প্রয়োজন অল্প, তাহা আমরা কখনই মনে করি না। স্পেন্সার পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাতেই মনুষ্যের অধিক প্রয়োজন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। চিকিৎসা শাস্ত্র অধিকাংশ প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, সুতরাং ইহা যে কেবল চিকিৎসা ব্যবসায়ীর প্রয়োজন, তাহা নহে, সকলেরই ইহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

পৃথিবীর অধিকাংশ লোক কি উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, বাণিজ্যজাত দ্রব্য সকল প্রথমত উৎপন্ন, নানা প্রকারে উহাদিগকে প্রস্তুত, ও পরে নানা স্থানে উহা সঞ্চারিত করাতে অধিকাংশ লোকের জীবন ধারণ হয়। সভ্য দেশে বাণিজ্যজাত দ্রব্য বলিলে প্রায় সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী বুঝায়। ইহার মধ্যে কৃষিজাত শস্য, তুলা, পশম, রেসম, নানা প্রকার ধাতু কয়লা প্রভৃতি সকলই আছে। ঐ সকল বস্তুর রাসায়ণিক, ভৌতিক এবং জৈবনিক গুণসকল সম্পূর্ণরূপে জানা থাকিলে উহাদের উৎপত্তি, প্রস্তুত, ও সঞ্চারের সুবিধা হয়। রসায়ণ শাস্ত্রের জ্ঞানের সাহায্যে ইয়ুরোপীয়েরা নানাপ্রকার বস্ত্রের বর্ণ উৎপন্ন ও বিনাশ করিয়া কত প্রকার বস্ত্র উৎপন্ন করিতেছে। ইহারই সাহায্যে তাবা, টিন, দস্তা, শিশা, রূপা, লোহা প্রভৃতিকে বিগলন করিয়া নানাপ্রকার সামগ্রী নির্ম্মাণ করিতেছে। ইহার সাহায্যে চিনি পরিষ্কার, গ্যাস উৎপন্ন, বারুদ, সাবান, কাচ, চিনের বাসন, দেয়াশলাই নির্ম্মাণ হইতেছে, দুর্গন্ধ ও পচন নিবারণ, অসার আবর্জ্জনা হইতে সুগন্ধ প্রস্তুত ইহার সাহায্যে

হইয়া থাকে। কৃষিকার্য্যেও ইহার জ্ঞান প্রয়োজন। ভূমি ও সারের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করা ও কৃত্রিম সার প্রস্তুত করা ইহার কার্য্য। এইরূপে প্রাণীতত্ত্ব (Biology ও Zoology), শারীর-তত্ত্ব (Physiology), উদ্ভিদ-তত্ত্ব (Botany), পদার্থ দর্শন (Physics), রসায়ণ (Chemistry) প্রভৃতি যে সকল চিকিৎসা শাস্ত্রের অঙ্গ, তাহা সাধারণ লোকের রোগ-যন্ত্রণা নিবারণ ভিন্ন সাক্ষাতে ও পরোক্ষে আত্ম রক্ষা করিতেছে। সেই জন্য এই শাস্ত্রকে বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা উচ্চ স্থান দিয়াছেন। বেকন বলিয়াছেন—জ্ঞানের অনুধাবন করা অনুসন্ধিৎসুর চঞ্চল চিত্তের আরাম করিবার সুখকর শয্যা নয়। কিম্বা ইহা ইষ্টলাভে আশান্বিত ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী চিত্তের পদ-সঞ্চালন করিবার স্থান নহে; অথবা অহঙ্কারী চিত্তের উঠিবার উন্নত স্থান নহে। ইহা দুর্গ বা যুদ্ধ ক্ষেত্র নহে। ইহা লাভ বা বিক্রয়ের বিপণি নহে। কিন্তু ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার গৌরবের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার। ইহার দ্বারা মনুষ্যের ও রাজ্যের দুঃখ, রোগ যন্ত্রণা প্রভৃতি দুর্ঘটনা নিবারণ হইতে পারে। কারলাইল বলিয়াছেন—“আমি সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, যথার্থ মহত্বের তুলনায় কোন্ ব্যবসা চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমতুল? যিনি যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারেন ও রোগে মনুষ্যকে শান্তি দিতে পারেন, তিনিই বাস্তবিক সর্ব্বাপেক্ষা হিতকারী। তাঁহাকে কি অসভ্য কি সুসভ্য, সকলই সম্মান করিবে।

কোন বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। ইহা উচ্চস্থান অধিকার করিবে। আমি বিশ্বাস করি, এক অথবা দুই শতাব্দীর মধ্যে ইহা অন্য ব্যবসায়ী অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান এত উচ্চ ও মহৎ স্থান অধিকার করিলেও কেন উহার উপাসক ও ব্যবসায়ীরা সমাজের নিকট সেরূপ সম্মান পান না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমাদের নিম্ন লিখিত কয়েকটী দোষ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ মেডিকেল কলেজ বা স্কুলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমরা যে জ্ঞান ও বিদ্যা উপার্জ্জন করি, তাহা অতি সামান্য ও অসম্পূর্ণ। যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, যাঁহারা সাহিত্য, গণিত, আইন প্রভৃতিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এ সকল বিষয়ে অধিকাংশ চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ইহাদের কথোপকথনে আমরা ভাল করিয়া যোগ দিতে পারি না। অনেক সময় আমরা দেখিয়াছি যে, কোন সাধারণ সভায় বা নিমন্ত্রণে কতকগুলি চিকিৎসক উপস্থিত হইলে তাঁহারা একত্রে বসিতে চেষ্টা করেন ও নিজ নিজ শাস্ত্রের আলাপ করিয়া থাকেন। সম্যক্‌ভাবে যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের চর্চ্চা আমরা চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যয়নের পূর্ব্বে করিতে পারি নাই, তাহা পরে করিয়া লওয়া আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইচ্ছা করিলে আমাদের সময়ের অভাব হয় না। কোন মেডিকেল কলেজ বা স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পশারের জন্য কেবল দ্বারে দ্বারে ভিখারীর ন্যায় ভ্রমণ না করিয়া যদি আমরা আমাদের ঐ সকল অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের ইষ্টলাভ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞানও

আমাদের অসম্পূর্ণ। ইহা আমাদের গুরুতর দোষ। যেরূপ দায়িত্ব আমাদের মস্তকের উপর অর্পিত, তাহাতে আজীবন কাল অনবরত ইহার চর্চ্চা করা যথেষ্ট নহে। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কখন প্রয়োজন হইলে সেই বাল্য কালের পুরাতন পুস্তকের দুই এক পংক্তি হয়ত পড়িয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় আমাদের জ্ঞানের উপর মরিচা পড়িবে, তাহার আর বিচিত্র কি? এইরূপ বিদ্যা বুদ্ধি লইয়া আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া সর্ব্বদা আক্ষেপ করি যে, আপামর সাধারণ ও ভদ্রলোক কেহই আমাদের বিদ্যার যথেষ্ঠ সম্মান করেন না। সময় বড় মন্দ পড়িয়াছে। (Struggle for Existence) জীবন-সংগ্রাম অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। এরূপ বৃথা আক্ষেপে হা হুতোস্মি করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া যদি আমরা প্রতিদিন যেমন আহার ও বিশ্রামের জন্য সময় দিয়া থাকি, সেইরূপ অন্তত কিছু সময় চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনায় ক্ষেপণ করি, তাহা হইলে ভাল হয়।

তৃতীয়ত, আমাদের মধ্যে বুজরুকি, জুয়াচুরি ও কপট ব্যবহার নিতান্ত অল্প নহে। এ বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে লজ্জা হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটীতে হাতুড়ে চিকিৎসকদিগের চিকিৎসা বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা হয়। এ বিষয়ে গবমেণ্টকেও আবেদন করা হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যখন "মাই মিশ্চার" "মাই পিল" বলিয়া উপাধিধারীরা ব্যবস্থা করেন, তখন কি তাঁহাদের কোয়েকারি করা হয় না। একজন উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ ১৬ টাকা ভিজিটের বিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহার ব্যবস্থা পত্র অন্যকে দেখাইতে আমাকে নিবারণ করিয়াছিলেন। হাতুড়ের সহিত ইহাদের পার্থক্য কোথায়? কেবল উহাদের রীতিমত অধ্যয়ন নাই এবং এল্. এম্ এস, এম্, বি, বা এম্. ডি প্রভৃতির ছাপ উহাদের অঙ্গে নাই।

চতুর্থত, চিকিৎসকদের মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষ ও হিংসার ভাব অত্যন্ত প্রবল। ইহা যে কেবল বাঙ্গালীদের মধ্যে দেখা যায়, তাহা নহে, ইহা ইয়ুরোপীয়দের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অল্প সুযোগ পাইলেই ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া পরস্পরের নিন্দা করিয়া থাকি এবং পরস্পরের রোগীদের নিকট পরস্পরকে হীন ও অপদস্ত করিতে চেষ্টা করি। আমরা ভ্রান্ত হইয়া মনে করি, বুঝি এই উপায়ের দ্বারা নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি লাভ করিতে পারিব। কিন্তু ইহাতে যে আমাদের কতদূর অনিষ্ট হয়, বুঝিয়াও বুঝি না। যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা নিন্দককেই অপদার্থ মনে করিয়া থাকেন কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প; এবং আমরা প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে পরনিন্দা শুনিতে ভালবাসি। সুতরাং অনেকেই আমাদের পরস্পরের নিন্দাতে মজা দেখেন, আমাদের যে বিষয়ে দুর্ব্বলতা আছে, তাহা ফাঁকি দিয়া জানিয়া লন, সুতরাং আমরা এই উচ্চ শাস্ত্রের শিক্ষা করিয়াও জগতের নিকট হীন ও অপদস্থ হইয়া থাকি। আমরা যখন অন্যের নিন্দা করি, তখন হয় ত ভাবি, যাহার নিন্দা করিতেছি, সে কিছুই শুনিতে পাইবেনা, কিন্তু ইহা

নিশ্চয় যে, আমাদের নিন্দার প্রত্যেক কথা অতিরিক্ত ভাবে তাহার নিকট প্রকাশ পায়।

পঞ্চমত, দেশীয় হিতকর বিষয়ে অথবা জন সাধারণের ক্ষতিবৃদ্ধি বিষয়ে আমাদের উৎসাহ কিছু অল্প। আমরা নিজ নিজ কেন্দ্রের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াই। কেন্দ্রের বাহিরে হাজুক্, পুড়ুক্, মজুক্, কিছুতেই আমাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। কিন্তু এক বিষয়ে আমরা সকল ব্যবসায়ী অপেক্ষা নিজ স্বার্থ নষ্ট করিয়া লোকের উপকার করিয়া থাকি। বিনা অর্থে যে পরিমাণে চিকিৎসকেরা দরিদ্রের রোগ যন্ত্রণা নিবারণ করিয়া থাকেন, সেরূপ আর কোন ব্যবসায়ীদের দেখা যায় না। কয়জন ব্যারিষ্টার বা উকিল আদৌ কোন অর্থ না লইয়া কোন দরিদ্র উৎপীড়িত লোকের মকর্দ্দমা করিয়াছেন? যেখানে একজন ব্যবহারজীবী এইরূপ সৎকার্য্য করেন, সেখানে অন্তত বিশজন চিকিৎসক নিত্য ঐ কার্য্য করিতেছেন।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা যে শাস্ত্রের অধিকারী হইয়াছি, তাহা অতি উচ্চ। আমাদের দায়িত্বও অধিক; যদি আমরা কায়মনোবাক্যে উক্ত দোষ সকল পরিহার করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উচ্চস্থান আমরা লাভ করিব। কিন্তু কেবল দোষ পরিহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। দোষ পরিহারের সহিত একটী মহৎগুণ সঞ্চয় করিতে হইবে। এইগুণ সঞ্চয় কঠোর সাধন সাপেক্ষ, কষ্ট না করিলে কেহ কৃষ্ণ পায়না। যাহা কিছু পৃথিবীতে মনুষ্যের প্রার্থনীয়, তাহাই কষ্টসাধ্য। এই গুণের আধার যাঁহারা হইবেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবেন। সকল শ্রেণী, সকল ব্যবসায়ী লোকের পক্ষে ইহা উন্নতি সাধক; ইংরাজীতে ইহাকে Individualism কহে; বাঙ্গালায় ইহার প্রতিশব্দ বিশেষত্ব ও মনুষ্যত্বও বলা যাইতে পারে। ইহা অন্য মনুষ্য হইতে যে কোন প্রকার হউক বিভিন্নতা প্রকাশ করিলে হইল, তাহা নহে। ইহা যে কেবল এক প্রকার উচ্চ অভিলাষ, তাহাও নহে। বিজ্ঞানের মতে ইহা পরমাণুর বা একত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলা যাইতে পারে। যে শক্তি ও বলের জন্য একটী মনুষ্যকে তাহার সহযোগী হইতে সংসার পৃথক করিয়া থাকে, ইহা সেই মানসিক বিকাশ। ইহার অর্থ, চিন্তার একগ্রতা, ইচ্ছার দৃঢ়তা এবং আত্মনির্ভরের আধিক্যতা। ইহাই বলশালী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোকের ধর্ম্ম এবং তাহার সমস্ত জীবনের এক পরিচালক অখণ্ড নিয়ম (Master principle)। ইহার পরম শত্রু আলস্য বা জড়তা। মনুষ্য মধ্যে মানসিক জড়তা অতিশয় প্রবল এবং উহা অপনয়ন করা শারীরিক জড়তাপেক্ষা কষ্টকর। বিজ্ঞ লোকদিগের আবিষ্কৃত সত্য সকল গ্রহণ করা সহজ। ঐ সকল লোকের দোহাই দিয়া নিজের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাও সহজ। পক্ষান্তরে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা একাগ্র মনে কোন সত্য উদ্ভাবন করা ও শিক্ষা লাভ করা অতি কঠিন ব্যাপার। সহিষ্ণুতার সহিত সত্যান্বেষণ করা অপেক্ষা, ভ্রমরের মধু অন্বেষণের ন্যায়, এক মত হইতে মতান্তরের আশ্রয় লওয়া সহজ। কোন বিষয় নিজে উদ্ভাবন করা অপেক্ষা অনুকরণ করা সহজ। অনুকরণ ও অন্যের গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করা আমাদের জীবনের একটী প্রধান ঘটনা।

মনুষ্যত্বের বিশেষত্ব হইতেই প্রতিভা (Genius) উৎপন্ন হয় এবং মনুষ্যত্বের বিকাশের শ্রেষ্ঠ ফলই প্রতিভা। প্রতিভার বিশেষ কার্য্য নূতন সৃষ্টি বা আবিষ্ক্রিয়া, ভাবুকের মনে নূতন ভাবের উদয়ই নূতন সৃষ্টি বা আবিষ্ক্রিয়ার মূল। ভাবের উদয় উদ্বোধনের নিয়মাধীন। উদ্বোধন দুই প্রকার, সন্নিকর্ষ-জাত ও সাদৃশ্যজাত। কোন একটী পদার্থ মনে হইলে তাহার সমীপস্থ ও তাহার সদৃশ পদার্থ মনে পড়ে। একটী সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের কথা মনে পড়িলে কেহ তাহার বর্ণ, গন্ধ বা আকারের বিষয় ভাবিবেন, আবার কাহার বা শিশুর মুখ,. রমণীর যৌবন বা আকাশের নক্ষত্রের কথা মনে পড়িবে। মনোবিজ্ঞান দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে যে, এইরূপ সন্নিকর্ষ বা সাদৃশ্য বশতঃ মনুষ্যের মনে নিরন্তই এক ভাব হইতে ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছে।

সাধারণ লোকের মনে সন্নিকর্ষ-জাত উদ্বোধনই প্রবল, সাদৃশ্য নির্ণয় শক্তি সকলেরই কিয়ৎ পরিমাণে আছে। কিন্তু সাধারণ লোকে স্থূল সাদৃশ্যই দেখিতে পায়, একটী গোলাপ দেখিয়া তাঁহারা তাহাকে পুষ্প শ্রেণীতে ফেলিতে পারেন, ঐ পর্য্যন্ত। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের অন্তকরণে সাদৃশ্য-জাত উদ্বোধনই অসাধারণ রূপ প্রবল। তাঁহারা অন্যের নিকট বিসদৃশ প্রতীয়মান পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পান। কি বিজ্ঞানবিৎ, কি কবি, কি শিল্পী, সকলেরই প্রতিভার মূলে এই সাদৃশ্যোদ্ভেদ শক্তি লক্ষিত হয়। ভূপৃষ্ঠে পতনশীল পদার্থের গতি ও গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি একইরূপ, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া নিউটনের এত গৌরব। উপমা প্রয়োগেই কালিদাস জগদ্বিখ্যাত। সাদৃশ্য-নির্ণয় শক্তি প্রতিভার মূল হইলেও সকলের প্রতিভা সকল দিকে সঞ্চালিত হইতে পারে না। সেই জন্য কেহ কবি, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ শিল্পী, কেহ সঙ্গীতাচার্য্য; ইত্যাদি।

প্রতিভা সকলের ভাগ্যে ঘটে না ; কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যের ন্যূনাধিক পরিমাণে বিশেষত্বের (Individualism) অংশ আছে। শঙ্করাচার্য্য, কালিদাস, ভবভূতি, নিউটন, ডারউইন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অবিশ্রান্ত স্ব স্ব বিশেষত্বের শক্তিকে পূর্ণ বিকশিত করিয়াছিলেন। Longfellow বলিয়াছেন—

The hight by greatmen reached and kept
Were not obtained by sudden flight
But they while their companion slept,
Were toiling upward in the night.

"মহৎ ব্যক্তিগণ যে উচ্চস্থান লাভ করিয়া রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা অকস্মাৎ কোন উল্লম্ফন বশত হয় নাই। কিন্তু যখন তাহাদের সহযোগীগণ নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, সেই রজনীযোগে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা ক্রমশ উর্দ্ধে উঠিতে ছিলেন।"

আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, (১) সকল অবস্থার মনুষ্যেরই কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন চিন্তাশক্তি আছে।

(২) যে সকল সত্য ও মত তাহারা অন্য হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহা কোন কোন স্থলে সঞ্চিত থাকে, কোন কোন স্থলে পরিপাক করিয়া লোকে নিজের বিশেষত্বের ছাপা দিয়া পৃথিবীতে বিস্তার করিয়া থাকে।

(৩) এই সত্য ও ভাব সকল জ্ঞানের প্রতিধ্বনি স্বরূপ আমাদের নিকট থাকিতে

পারে, অথবা উহা জীবন্ত স্বর হইয়া পর-বর্ত্তী বংশের সাহায্যে পৃথিবীতে বিস্তার হইয়া পড়ে। বহুদর্শন কেবল শুক্ল কেশের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু যিনি যে পরিমাণে তাঁহার সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, তাহার সেই পরিমাণে বহুদর্শন হয়। একটী বিষয় মনোযোগের সহিত ভাল করিয়া দেখিলে ৫টী বিষয় ভাসা ভাসা দেখিবার অপেক্ষা উত্তম কার্য্য হয়।

ছাত্রবৃন্দ, তোমরা মহৎ বিদ্যা অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়াছ, সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব সকল তোমাদের নিকট প্রকাশ হইবার যেরূপ সম্ভাবনা আছে, তাহা অন্য কোন শ্রেণীর ছাত্রদের ভাগ্যে ঘটেনা। সেইজন্য তোমরা নিজকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতে পার। তোমাদের সুযোগ সকলের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিলে ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিলে তোমাদের মনোরথ সফল হইবে, ইহাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলই লাভ হইবে। ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের কলহ নাই, অধর্ম্মের সহিত অজ্ঞানের চিরকালই বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মনীতির যোগ কোথায়, এই বিষয় লইয়া তর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু শরীরের সহিত মনের যোগ নাই বলাও যা, আর বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের যোগ নাই বলাও তাই; বিজ্ঞান শাস্ত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, সমস্ত বিশ্বকার্য্যে কোথাও একটু মিথ্যা নাই। এই অগণ্য বস্তুপুঞ্জের মধ্যে যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, সে একই উত্তর দেয়—এই চরাচরে কোথাও অনিয়ম নাই, খেয়াল নাই ও অসত্য নাই। পদার্থ সমূহের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার কালও যেমন, আজও তেমন, চিরদিনই সেইরূপ। এই সত্য বিজ্ঞান-তত্ত্বান্বেষীর মনে এমনি দৃঢ় মুদ্রাঙ্কিত হয় যে, কোথাও তিনি নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে তৎক্ষণাৎ নূতন কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এরূপ স্থলে যাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র ধর্ম্ম বোধ আছে, সে এ অসীম বিশ্ব চরাচরের প্রত্যেক পরমাণু হইতে নিশি দিন সমস্বরে যে এক মহান সত্য প্রচার-বাণী ধ্বনিত হইতেছে, তাহা অন্তরে ও আচরণে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না।"

"বিজ্ঞান আর একটী কথা প্রচার করিতেছে, শক্তির চিরস্থায়িত্ব। কেবল মাত্র যে পরমাণুর বিনাশ নাই, তাহা নহে, প্রত্যেক পরমাণু অনন্ত জগতের সহিত এমনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ যে, তাহাদের কোন একটীর মধ্যে কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহা অনন্ত দেশে অনন্ত কালে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অন্তরের নিগূঢ় নিভৃত প্রদেশে এমন কোন চিন্তা, এমন কোন ভাব, এমন কোন বেদনার উদয় হইতে পারে না, ব্যথিত পীড়িত হৃদয় হইতে এমন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস উত্থিত হইতে পারে না, এমন কোন তুচ্ছ বাক্য উচ্চারিত, এমন কোন ক্ষুদ্র কার্য্য গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, জগতের আদ্যন্ত মধ্যে যাহার ইতিহাস চিরদিনের মত লিপিবদ্ধ না হইয়া যায়। এ তত্ত্ব স্মরণ করিলে গর্হিত আচরণে কি আর প্রবৃত্তি হয়?"

"এখন শেষ কথা, ঈশ্বর সম্বন্ধে বিজ্ঞান কি বলে? যখন ভাবিয়া দেখি, কতকাল

হইতে কত কত অসামান্য প্রতিভা সেই অকূল রহস্যসাগরের মধ্যে তরী ডুবাইয়াছেন, তখন আমার মত ক্ষুদ্র জনের একথা আলোচনা করিতে সাহস হয় না। কিন্তু স্বাধীন বুদ্ধি খাটাইবার দেবদত্ত অধিকার প্রত্যেক লোকেরই আছে, এই জানিয়া আমিও এ বিষয়ে সাধ্যমত চিন্তা করিতেছি এবং যে ধ্রুব আশ্রয় যুগে যুগে মানব হৃদয়ের আশা ও সান্ত্বনার স্থল, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিও অবশেষে সেই অভয় কূলেই উপনীত হইয়াছে।"

"প্রকৃতির বাহ্যদৃশ্য মাত্র দেখিয়াই মানব সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। মানব চিরদিন ধরিয়া এই আশ্চর্য্য সৃষ্টিকার্য্যের রহস্য ভেদ করিয়া ব্যাকুল ভাবে ইহার কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত। কোথা হইতে এই সমস্ত আসিল এবং কোথা যাইবে, আমারই বা আদি কোথায়, অন্ত কোথায়, ইহার মত পুরাতন প্রশ্ন আর নাই। এই আদিম জিজ্ঞাসার উত্তর জগতের মধ্য হইতে কখনও প্রকৃষ্ট রূপে পাওয়া যায় নাই; জগতের কর্ত্তা একটা পরম জ্ঞানস্বরূপকে না মানিলে ইহার কোন উত্তর নাই।"

"জগতের সর্ব্বত্রই বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য এবং তাহা সাধনের উপায় পরম্পরা এমনি শৃঙ্খলা সহকারে নিবিষ্ট যে, সেই আশ্চর্য্য কৌশল বহু প্রাচীন কাল হইতে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি মানবের বিস্ময়পূর্ণ ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে।"

"বিজ্ঞান বিশ্বকার্য্যের সেই শৃঙ্খলা, সেই কৌশল প্রতিদিন নূতন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছে। এবং বিজ্ঞান এক তারার সহিত অন্য তারার, এই পৃথিবীর সহিত সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর, মানবের সহিত অতীত বর্ত্তমানের সমুদয় জীব পরম্পরার এক অচ্ছেদ্য গোত্র-বন্ধন দেখাইয়া দিতেছে। বিজ্ঞান শাস্ত্র অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এই যে মহান ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছে, এই ঐক্য কি সেই পরম একের দিকেই ধ্রুব অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে না?"

"এই জগতে অণুতে পরমাণুতে, জড়ে জীবনে, বহ্নিতে সম্মিলিত এক বিরাট ঐক্য, এক অসীম বিশ্ব যখন বিজ্ঞানের আলোকে তত্ত্বান্বেষীর চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখন কি অভিভূত বিহ্বল চিত্ত অসহ্য ভক্তি ভরে পরম পুরুষের নিকট একান্ত নত হইয়া পড়ে না?"

"একজন কবি বলিয়াছেন, "ভক্তিহীন জ্যোতির্বেত্তা বাতুল।" বিজ্ঞান বলিতেছেন, প্রকৃতি তত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে গিয়া ঈশ্বরের প্রতি যাহার ভক্তি আকৃষ্ট না হয়, সে বাতুল।"

সেইজন্য বলি, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বপ্রেম যেন তোমাদের জীবনের ভূষণ হইয়া থাকে। যথার্থ সুচিকিৎসক হইতে হইলে মনুষ্য প্রকৃতি ও রোগ প্রকৃতি উভয়ই সমান রূপে অধ্যয়ন করিতে হইবে। কেবল অধিক সংখ্যক রোগী দেখিলে জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু যে সকল রোগী দেখিবে, তাহা মনোযোগের সহিত দেখিবে, এবং তাহার সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবে। তিন বৎসর কাল এখানে অধ্যয়ন, চিকিৎসা শাস্ত্রে সকল বিষয়ের বর্ণ পরিচয়ও নহে। আজীবন ইহার চর্চ্চা ও আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। যে ক্ষমতা আজ

তোমাদের মধ্যে কতকগুলির হস্তে অর্পিত হইয়াছে ও পরে যাহাদের উপর অর্পিত হইবে, দেখ, যেন তাহার অসদ্ব্যবহার না হয়।

অর্থের জন্য লালায়িত হইওনা, অর্থ লইয়া কেহ আসে নাই, অর্থ লইয়া কেহ যাইবে না। কেহ কেহ হয়ত বলিতেছেন, উদর পূরণ কিরূপে হইবে? বিধাতার এই বিস্তীর্ণ রাজ্যে যখন পশু পক্ষী, জীব জন্তু প্রভৃতি মনুষ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণীর স্থান আছে, আহারীয় দ্রব্য সঞ্চিত আছে, তখন বুঝিতে হইবে, তোমারও স্থান আছে, তোমারও আহার সঞ্চিত আছে। যদি আমরা কেবল আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংসার পথে নিজশক্তি ও পরম শক্তির উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া চলি, তাহা হইলে আমাদের সকল অভাব পূর্ণ হইবে। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মিত্র।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪৫)

বৃন্দাবন লীলা।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়াই বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভক্তগণ বর্ষার কয়েক মাস প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া শচীনন্দন বর্ষাকাল নীলাচলে অবস্থিতি করিলেন। বর্ষান্তে একদিন তিনি স্বরূপ রামানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন,'আমি রাত্রিযোগে একাকী শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিব, আমার সঙ্গে কেহ যাইতে পারিবে না। প্রাতঃকালে ভক্তদল যদি আমার অনুগমন করিতে চায়, তোমরা তাহাদের আটক করিও।'

স্বরূপ উত্তর করিলেন, 'তা কেমন করিয়া হইবে? বনপথে তুমি একাকী কি প্রকারে যাইবে? তোমাকে পাক করিয়া কে দিবে ও জলপাত্র বহির্ব্বাসই বা কে বহিয়া যাইবে? আমি বলি একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ সঙ্গে যাউক্।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'কাহাকে সঙ্গে লইব? একজনকে লইলে, আর সকলেই মনক্ষুণ্ণ হইবে। তবে একজন নবাগত অথচ সংস্বভাবান্বিত সঙ্গী জুটিলে লইতে পারি।'

স্বরূপ উত্তর করিলেন,'কেন? বল ভদ্রাচার্য্য সেদিন মাত্র তোমার সঙ্গে গৌড় হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারও তীর্থ ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা আছে। বিশেষতঃ তাঁহার এক ব্রাহ্মণ ভৃত্য সঙ্গে আছে। তাঁহারা সঙ্গে যাইলে বেশ হইবে। চৈতন্যদেব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গী ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া কাহাকেও না বলিয়া রজনীযোগে নীলাচল হইতে শুভ যাত্রা করিলেন। প্রাতঃকালে প্রভুর অদর্শনে ভক্তদল কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন এবং বৃন্দাবন যাত্রার কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অনুগমনে উদ্যত হইলেন। স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর মনের ভাব বলিয়া তাঁহাদিগকে শান্ত করিলেন। শ্রীচৈতন্য লোক সমাগমের ভয়ে প্রসিদ্ধ রাজপথ

পরিত্যাগ করিয়া উপপথে গমন করিতে লাগিলেন এবং কটক নগরকে ডাহিনে ফেলিয়া, গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে এইপথ 'ঝারিখণ্ড' বনপথ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অনুমান হয়, ছোটনাগপুর প্রদেশের বন পথেই শ্রীচৈতন্য গমন করিয়া থাকিবেন। বনের শোভা দর্শনে, কলনাদী বিহঙ্গমগণের গান শ্রবণে, ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য দর্শনে, কুরঙ্গ মাতঙ্গদিগেব ইতস্তত পাদসঞ্চারণে গৌরের বৃন্দাবনভাব উথলিয়া উঠিল। তিনি অনববত নাচিতে গাইতে মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র অনেকদিন উচ্চকণ্ঠে হরিসংকীর্ত্তন করেন নাই। এখন নির্জ্জন বন পাইয়া মনের সুখে সপ্তম স্বরে কৃষ্ণানুকীর্ত্তন করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিলেন। বনপথে দলে দলে ব্যাঘ্র, হস্তী, শূকর, গণ্ডার, ভল্লুকগণ বিচরণ করিতেছে; গৌরচন্দ্র নির্ভয়ে তাহাদের মধ্যদিয়া নাচিয়া গাইয়া চলিলেন। ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গী তদ্দর্শনে মহাভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কথিত হইয়াছে, গৌরচন্দ্রের প্রেমবিহ্বলতা ও ধর্ম্মোন্মত্ততা দেখিয়া হিংস্র শ্বাপদেরাও এক পাশ হইয়া দাঁড়াইত। একদিন পথে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শুইয়াছিল। আবেশে গৌর তাহার গায়ে পা দিয়া ছিলেন। বাঘ দেখিয়া তিনি 'কহ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ' বলিয়া হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন, অমনি সেই হিংস্র পশুও নাকি তালে তালে নাচিয়া উঠিল। আর একদিন শ্রীচৈতন্য এক নদীতে স্নানাবগাহন করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক মত্ত হস্তিযূথ জলপান করিতে আসিল। গৌর 'কৃষ্ণ কহ' বলিয়া তাহাদের গায়ে জল ফেলাইয়া দিলে তাহারা তাহাদের স্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া নাচিতে, জড়াজড়ি করিতে, চীৎকার করিতে ও লুণ্ঠন দিতে লাগিল। পথ গমনকালে গৌরের মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া দলে দলে মৃগগণ আসিয়া গা চাঁটিতে লাগিল। গৌর তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাগবতীয় নৈসর্গিক চিত্রের শ্লোকাবৃত্তি করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, ব্যাঘ্র, মৃগ, শূকরগণ পরস্পরের প্রতি হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া গিয়া গৌরের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিয়াছিল, পরস্পরের মুখ চুম্বন করিয়াছিল এবং নানারূপে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিল। বলভদ্র আচার্য্য দেখিয়া শুনিয়া চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন। ময়ূর ময়ূরীগণ নাচিতে লাগিল, তরু-লতা ফল-পুষ্প দিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিল এবং হরিনামে সমস্ত বন যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নিবিড় বনভূমি উত্তীর্ণ হইয়া গৌরচন্দ্র সাঁওতাল ও ভিলদিগের জনপদে প্রবেশ করিলেন এবং হরিনাম দিয়া সব দেশ পবিত্র করিয়া তুলিলেন। বনপথে যাইতে সর্বদিন আহারীয় সামগ্রী মিলিত না। সে জন্য ভট্টাচার্য্যকে কখন কখন ২।৪ দিনের তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া লইতে হইত। বন মধ্যে বন্যশাক ও ফলমূল তুলিয়া তিনি পাক করিতেন, গৌরচন্দ্র পরমসুখে ভোজন করিতেন। উষ্ণ প্রস্রবণের জলে স্নানে ও বন্য ভোজনে ও আরণ্য কাষ্ঠের অগ্নির তাপে শীত নিবারণ করিয়া তিনি সুখানুভব করিতে লাগিলেন। যে গ্রামে যান, গ্রামবাসীরা আতপ তণ্ডুল, উদ্ভিদ, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গুড় দিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা

করিতে লাগিল। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে পূর্ব্বে যেমন হরিনাম দিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঝারিখণ্ডের অসভ্য লোকদিগকেও তেমনি বৈষ্ণব করিতে লাগিলেন। নির্জ্জন বন ভ্রমণে, বন্যভোজনে ও বলভদ্রের সেবায় গৌরচন্দ্র এতই সুখানুভব করিলেন যে, একদিন ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া বলিলেন;—'শুন ভট্টাচার্য্য! আমি অনেক দেশ বেড়াইয়াছি, কিন্তু এবারে তোমার সঙ্গে আসিয়া এই নির্জ্জন বনপথে যেমন সুখ পাইলাম, আমার জীবনে এমন সুখ আর পাই নাই। দেখ শ্রীহরি কেমন দয়ালু! আমি তো বঙ্গদেশে মাতা ও ভক্তগণকে দেখিয়া ভক্তবৃন্দের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব মনে করিয়াছিলাম। সঙ্গে লক্ষ কোটি লোক চলিয়াছিল। ভগবান্ জানিতেন, আমার তাহাতে সুখ হইবে না। তাই সনাতনের মুখে বসিয়া আমাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি কৃপার সাগর! দীন হীনে এমন দয়া আর কাহারই বা আছে? তাঁর কৃপা বিনে কি কাহারও সুখ হইতে পারে?' এই বলিয়া গৌর ভট্টাচার্য্যের গলা ধরিয়া আলিঙ্গন করত বলিলেন। 'তোমার প্রসাদে আমার এই সুখ হইল। কি দিয়া তোমার উপকার করিব? আমার কি আছে?' বলভদ্র বলিলেন, আমি অধম; আমাকে দয়া করিয়া যে সঙ্গে আনিয়াছ ও আমার হাতে খাইতেছ, এ কি তোমার কম দয়া? অধম কাককে তুমি গরুড়ের আসন দিয়াছ। আমি ধন্য হইয়াছি।' এইরূপ কথাবার্ত্তায় যাত্রীদল মধ্যাহ্নসময়ে বারাণসীধামে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নানাবগাহন জন্য গমন করিলেন। সে সময়ে তপনমিশ্র গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অপরূপ রূপমাধুরী সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমে কিছু বিস্মিত হইলেন ও অনেক দিনের পর দেখায় হঠাৎ চিনিতে পারিলেন না। পরে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস লইয়াছেন স্মরণ করিয়া ও তিনিই ইনি মনে করিয়া আসিয়া পাদবন্দনা করিলেন। গৌর তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া স্নানাবগাহন করত অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দেখিয়া মিশ্রের বাড়ীতে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন। পাঠক মহাশয় তপন মিশ্রকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? অধ্যাপনা কালে বঙ্গদেশে গমন করিয়া নিমাই পণ্ডিত যাঁহাকে উপদেশ দিয়া কাশী যাইতে বলিয়াছিলেন, ইনিই সেই ব্যক্তি। (পূর্ব্বভাগ ১৩৫ পৃষ্ঠা দেখ) মিশ্র মহানন্দে প্রভুকে ভোজন করাইয়া সপরিবারে ভোজন শেষ খাইলেন। বলভদ্র আচার্য্য পৃথক পাক করিলেন। শ্রীচৈতন্য শয়ন করিলে মিশ্রের পুত্র বালক রঘুনাথ পাদ সম্বাহন করিলেন। এই রঘুনাথ উত্তর কালে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী নামে শ্রীচৈতন্যের ছয় গোস্বামীর অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তপন মিশ্রের চন্দ্রশেখর নামে এক বন্ধু কাশীতে বাস করিতেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য, ব্যবসা গ্রন্থ লেখা। সম্বাদ পাইয়া তিনি আসিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তুমি আপনা হইতে কাশীতে আসিয়াছ। এথামে কৃষ্ণ কথা কেহ বলেনা, কেবল মায়া, ব্রহ্ম, ষড়দর্শন লইয়া বিচার বিতণ্ডা শুনিতে শুনিতে তিতবিরক্ত হই-

য়াছি। মিশ্র কৃপা করিয়া আমাকে কৃষ্ণ কথা শুনান। দুই বন্ধুতে নির্জ্জনে বসিয়া তোমার চরণ ধ্যান করি ও মনের দুঃখ পরস্পর বলাবলি করি।' মিশ্র বলিলেন, 'প্রভু! যতদিন কাশীতে থাকিবে, আর কোথায় নিমন্ত্রণ লইতে পাইবে না। আমার বাড়ীতে ভিক্ষা লইতে হইবে।' এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তপন মিশ্রের বাটীতে আসিয়া কৃষ্ণচৈতন্যের রূপমাধুরী ও প্রেমচেষ্টা দেখিয়া বড়ই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিল। এই ব্যক্তি শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ পরমহংসের নিকট বেদান্ত পড়িত। শ্রীমান্ প্রকাশানন্দ তৎকালে বারাণসীস্থ সন্ন্যাসী পরমহংসদিগের অগ্রণী ছিলেন। বেদান্তে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও তিনি শঙ্করাচার্য্য-প্রদর্শিত মায়াবাদ মতের একজন প্রসিদ্ধ নেতা। তিনি বহু শিষ্য পরিবৃত হইয়া মঠে বসিয়া বেদান্ত পড়াইতেছেন, এমত সময়ে উপরুক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে 'জগন্নাথ হইতে কৃষ্ণচৈতন্য নামে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার যেমন রূপ, তেমনি ভগবন্নিষ্ঠা, প্রেম চেষ্টা, ও গভীর সাধন।' নিরন্তর তিনি কৃষ্ণ নাম করিতেছেন, হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, নাচিতেছেন, দুই চক্ষে অবিরল প্রেমধারা ঝরিতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ।' প্রকাশানন্দ শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও উপহাস করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হাঁ শুনিয়াছি, বাঙ্গলা দেশীয় একজন ভাবুক সন্ন্যাসী নাকি ভাব কালি করিয়া লোক প্রতারণা করিয়া বেড়াইতেছে। সে ব্যক্তি কেশব ভারতীর শিষ্য, মহা ইন্দ্রজাল বিদ্যা জানে এবং লোক মুগ্ধ করিতে খুব মজবুত। কতকগুলা লোক জুটাইয়া এখন দেশে দেশে নাচিয়া বেড়াইতেছে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহা বিজ্ঞ-পণ্ডিত, তিনিও নাকি তাহার সঙ্গে পড়িয়া পাগল হইয়া গিয়াছেন। তুমি তার নিকটে যাইও না। বেদান্ত শ্রবণ কর। উচ্ছৃঙ্খল লোকের সঙ্গে মিশে কি দুই কুল হারাবে? আর তাও বলি, কাশীপুরে আর তাকে ভাব কালি বেচিতে হয় না!' ব্রাহ্মণ এই কথায় অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং সভা হইতে উঠিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট মনোদুঃখ নিবেদন করিয়া বলিল, 'কিন্তু প্রভু! এক আশ্চর্য্য দেখিলাম, তিনবার চেষ্টা করিয়াও সে কৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে পারিল না, কেবল 'চৈতন্য, চৈতন্য' বলিল। ইহার কারণ কি?' শ্রীচৈতন্য হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী কৃষ্ণাপরাধী; কাজেই তাঁহার জিহ্বায় নাম স্ফূর্ত্তি হইল না। চৈতন্য নাম না আসিবে কেন? ব্রহ্ম চৈতন্য, মায়া, অধ্যাস, ইত্যাদি শব্দ লইয়াই ত তাঁহাদের নাড়া চাড়া। জীবের যেমন নামে, দেহে ও স্বরূপে ঐক্য নাই, ভগবানে সেরূপ নহে। ভগবানের নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, একই; লীলা গুণ, সব সচ্চিদানন্দময়। নামনামী, দেহ, দেহী সকলই লীলা জ্যোতিঃপূর্ণ, লীলানন্দময়। কৃষ্ণের গুণানন্দ বা লীলানন্দের কাছে ব্রহ্মানন্দ কোন্ ছার বস্তু? আত্মারামগণ ও লীলানন্দে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন না। মায়াবাদী সন্ন্যাসী, লীলা সুখ কি বুঝিবে? তাই লীলানন্দ পূর্ণ রসময় কৃষ্ণনাম করিতে পারে নাই। আর আমি— আমিত কাশীর হাটে ভাবকালি বেচিতে আসিয়াছি। গ্রাহক না জুটিলে আমার মাল বিকাবে না। কিন্তু বোঝাই বা

টেনে বেড়াব কত! দাম না পাইলে অল্প-স্বল্প মূল্যে ছেড়ে দিয়ে যাবো। তবু বোঝা বয়ে আর ফির্‌তে পারি না।' এই বলে তিনি উচ্চ হাস্য করিলেন এবং মহারাষ্ট্রীকে কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন। চন্দ্রশেখর ও মিশ্রের সেবায়, ইচ্ছা না থাকিলেও দশদিন কাশীতে অবস্থিতি করিয়া এবং প্রত্যাগমনকালে পুনরায় আসিবেন বলিয়া শ্রীচৈতন্য বলভদ্র আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া প্রকাশ্য রাজপথে যাত্রা করিলেন এবং অল্প দিনের পর প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণী-স্নান ও মাধব দর্শন করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। যমুনাদর্শনে তাঁহার বৃন্দাবন লীলা স্মৃতিপথে উদিত হইল। প্রভু দিশাহারা হইয়া ঝাঁপদিতে উদ্যত হইলে ভট্টাচার্য্য ধরিয়া রাখিলেন। তিন দিন প্রয়াগে থাকিয়া যাত্রীগণ মথুরা উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে যেমন দাক্ষিণাত্যের পথে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে নাম প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন; পশ্চিমের পথে গ্রামে চৈতন্যদেব এবারেও তাহাই করিতে লাগিলেন। পশ্চিমের লোক সব বৈষ্ণব হইতে লাগিল। মথুরায় আসিয়া গৌরচন্দ্র বিশ্রাম তীর্থে স্নান করিলেন এবং কেশবমন্দিরে কেশব দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে হাসিতে কাঁদিতে ও নাচিতে নাচিতে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব চেষ্টা দেখিয়া বহুতর লোক সমাগত হইল। আগন্তুকদিগের মধ্যে এক ব্রাহ্মণও প্রেমাবেশে নাচিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য ভাবে বিভোর। তাঁহার গলা ধরিয়া কোলাকুলি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিলেন। নৃত্যাবসানে উভয়ে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কেশব পূজারী প্রভুর সংকার অভ্যর্থনা করিল। শ্রীচৈতন্য আগন্তুক ব্রাহ্মণকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি যেরূপ সরল প্রেমিক, এরূপ ত অন্যত্র দেখিতে পাইনা, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, এ প্রেমধন আপনি কেমন করিয়া কোথায় উপার্জ্জন করিলেন?' ব্রাহ্মণ বলিল, 'শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী যখন মথুরায় আসিয়া ছিলেন, কৃপা করিয়া তিনি আমার বাড়ীতে ছিলেন ও আমাকে দীক্ষিত করিয়া আমার হাতে ভিক্ষা করিয়া ছিলেন। আমি সনোড়ীয়া ব্রাহ্মণ। সনোড়ীয়ার হাতে সন্ন্যাসীগণ আহার করেন না। কিন্তু শ্রীমন্মাধবেন্দ্র সে বিচার করেন নাই।'

পরিচয় পাইয়া শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, 'আপনি আমার গুরু স্থানীয়। আমাকে নমস্কার করিলেন কেন?'

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে প্রণত হইতে দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিল 'আপনি ওরূপ বলিতেছেন কেন? আমি গৃহী, আপনি সন্ন্যাসী হইয়া আমাকে প্রণাম করিলে আমার অপরাধ হইবে। কিন্তু আপনার প্রেম দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইতেছে যে আপনি মাধবেন্দ্রের কোন সম্বন্ধ রাখেন। এরূপ প্রেমচেষ্টা ত অন্যত্র সম্ভবে না।' বলভদ্র আচার্য্য কহিলেন, 'ইনি শ্রীমন্মাধবেন্দ্র শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য।'

ব্রাহ্মণ পরিচয় পাইয়া মহানন্দে মনে শ্রীচৈতন্যকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং বলভদ্র আচার্য্যদ্বারা বিধিমত পাক করাইয়া ভোজনার্থ প্রভুকে ডাকিলে তিনি বলিলেন, 'আপনি গুরু সম্পার্কীয়; বিশেষতঃ শ্রীমন্মাধবেন্দ্র আপনার হাতে খাইয়াছেন। আমাকে

আপনি কেন স্বহস্তে ভিক্ষা দিবেন না?' বলভদ্রের প্রস্তুত করা অন্ন না খাইয়া শ্রীচৈতন্য সনোড়ীয়ার গৃহে ভোজন করিলেন, বলভদ্র ও তাঁহার বিপ্র পৃথক খাইবেন। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক কথা নগরে রাষ্ট্র হইলে মথুরার বহুলোক তাঁহার নিকট সমাগত হইতে লাগিল। তিনি সকলকে নাম প্রেম উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। সনোড়ীয়া ব্রাহ্মণ প্রভুকে ক্রমে ক্রমে মথুরার তীর্থ সকল দেখাইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান করিয়া স্বায়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘ, বিষ্ণু, ভূতেশ্বর ও গোকর্ণাদি তীর্থ দর্শন করিলেন। ইহার পর বৃন্দাবনীয় চৌরাশী ক্রোশ বিস্তীর্ণ দ্বাদশ বন দর্শনে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীচৈতন্য বলভদ্র ও তাহার সেবক এবং সনোড়ীয়াকে সঙ্গে লইয়া মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বেহুলাবন, ভাণ্ডীরবনাদি বারটী বন দেখিতে লাগিলেন। নির্জ্জন বনস্থলিতে তিন চারিটী বন্ধু দিন রাত্রি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দিনমানে নির্ঝরিণীতে স্নান করেন ও বলভদ্র বৃক্ষমূলে বন্য ফলমূলে ভোজন দ্রব্য প্রস্তুত করেন; প্রভু পরম সুখে ভোজন করেন এবং রজনীতে বৃক্ষতলে শুইয়া যাপন করেন। গৌরের দিন এই নির্জ্জন শান্তি রসপূর্ণ বৃন্দাবন দর্শনে পরম সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার ভাবাবেশ আর ছাড়িত না, অষ্ট প্রহর তিনি ভাবে মাতোয়ারা হইয়া প্রকৃতির নিরুপম সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া থাকিতেন। অভ্যাসগুণে স্নান ভোজন নির্ব্বাহ হইয়া যাইত। কথিত হইয়াছে যে, পুরুষোত্তমে গৌরের যে প্রেম ছিল, ঝারিখণ্ডপথে তাহা শতগুণ, মথুরা দর্শনে সহস্রগুণ ও বনলীলায় লক্ষগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্যে গৌর চন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গাভী সকল কে জানে কি ভাবে তাঁহাকে দেখিয়া উর্দ্ধপুচ্ছ ও হম্বারবে তাঁহার কাছে আসিয়া অঙ্গ চাটিতে লাগিল; তিনি তাহাদের গাত্র কণ্ডুয়ন করিয়া দিয়া মহাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। হরিণগণ দলে দলে তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিল; কেহ গা চাটে, কেহ শৃঙ্গ দিয়া তাঁহার গা চুলকাইয়া দেয় ও তিনি প্রেমে বিহ্বল হইয়া কখন কখন তাহাদের গলা ধরিয়া রোদন করেন; শিখীগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে লাগিল; পিকাদি বিহঙ্গগণ কলকণ্ঠে গাইতে লাগিল ও উড়িয়া তাঁহার মাথায়, স্কন্ধে ও হাতে বসিতে লাগিল। তাহারা মানুষের হিংসায় কখন প্রতারিত হয় নাই; বা ব্যাধির জালে কখন পড়ে নাই; তাই তাদের এত বিশ্বাস। তরুলতাগণ যেন অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুকে পাইয়া অঙ্কুর রূপ পুলক প্রকাশ করিয়া, মধুরূপ অশ্রু ধারা বর্ষণ করিয়া ফলপুষ্প মুকুল ভরে নত শাখে আলিঙ্গন করিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদের আলিঙ্গন করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেলেন। পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া ধবল কৌমুদীবসনে বনস্থলিকে আবৃত করিয়া মধুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। সুখময়ী রজনীতে গৌরচন্দ্র তমালতরুতলে ধ্যানানন্দে বিভোর আছেন, হঠাৎ তাঁহার দুই স্কন্ধে শারীশুক আসিয়া উড়িয়া বসিল। তাহারা মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিতে পারে। শুক বলিল, 'আমাদের প্রভু জগন্মোহন

শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বসংসার রক্ষা করুন', শারিকা বলিল, 'শ্রীরাধিকার প্রেম ও সৌন্দর্য্য কেমন শোভা পাইতেছে দেখ? তিনি তোমার জগন্মোহনেরও চিত্তমোহিনী।' শুক উত্তর করিল, 'শারিকে? কৃষ্ণ আমার বংশীধারী, চিত্তহারী ও মদন মোহন।'

শারিকা বলিল, 'মহাপ্রকৃতি রাধার সঙ্গেই মদনমোহনই বল ও যে মোহনই বল, সবই সাজে। নইলেতো তিনি নিগুর্ণ,মোহে মোহিত।'

শারী শুক উড়িয়া গেল। শ্রীচৈতন্য ধ্যান ভঙ্গে শিহরিয়া উঠিলেন। এই সময়ে প্রত্যেক বস্তুতে গৌরের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইয়া নানা বিকার হইতে লাগিল; কখন তিনি মূর্চ্ছিত হন, কখন কণ্টকাকীর্ণ বনভূমিতে লুণ্ঠন করেন, অঙ্গ দিয়া রুধিরধারা পড়ে। বলভদ্র ও মাথুর ব্রাহ্মণ নানা প্রকারে তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

এইরূপে শ্রীচৈতন্য আরিঠ নামক গ্রামে উপনীত হইয়া গোপবালকদিগকে রাধাকুণ্ড কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। দুইটী ধান্য-ক্ষেত্র প্রদর্শিত হইলে গৌরচন্দ্র তাহার জলে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলেন এবং কুণ্ডের স্তব করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণলীলার তীর্থ সকল পূর্ব্ব হইতেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেব এইরূপ অনুসন্ধান পন্থা অবলম্বন করিয়া লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিতে লাগিলেন। এখান হইতে তিনি সুমন সরোবর দর্শন করিয়া গোবর্দ্ধন শৈলের নিকট গোবর্দ্ধন গ্রামে আসিয়া হরিদেব বিগ্রহ দেখিলেন। গোবর্দ্ধনগিরি দেখিয়া সমুদায় কৃষ্ণলীলা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, তিনি ভাগবতীয় শ্লোকাবৃত্তি করিয়া গিরিরাজের স্তব করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া পাক করিলে চৈতন্যদেব ভোজন করিয়া রাত্রি হরিদেব মন্দিরে যাপন করিলেন। শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠিত গোপাল-বিগ্রহ গোবর্দ্ধন শৈলের উপরে অন্নকূট নামক পল্লীতে স্থাপিত। গৌরচন্দ্র মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'আমিত পবিত্র লীলা-ভূমি শৈলের উপরে উঠিব না; তবে গোপালের দর্শন পাই কিরূপে?' এ দিকে সেই রাত্রিতে অন্নকূট গ্রামে একজন লোক প্রচার করিয়া দিল যে 'গ্রাম লুঠিতে তুড়ুক সোয়ার আসিতেছে, তোমরা সব পলাও'। গ্রামের লোক পলাইয়া নানাদিকে চলিয়া গেল; পূজারাগণ গোপাল লইয়া গাঁঠুলী গ্রামে লুকাইয়া রাখিল। গৌরচন্দ্র প্রাতঃ-কালে মানস গঙ্গায় স্নান করিয়া গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় এই সংবাদ পাইয়া গাঁঠুলী যাইয়া গোপাল দেখিয়া প্রেমে গদগদ হইলেন। মাধবেন্দ্রের পবিত্র চরিত্র তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে মহাস্বস্থ করিল। তিনদিন পর্য্যন্ত গোপাল দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য কাম্য বনে লীলাস্থান দর্শন করিলেন এবং সেখান হইতে নন্দীশ্বর শৈলে পাবনকুণ্ডে স্নান করত পর্ব্বতোপরি যাইয়া ব্রজেন্দ্র, ব্রজেশ্বরী ও কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সেখান হইতে তিনি খদির বনে শেষশায়ী ও খেলা তীর্থ দেখিয়া ভাণ্ডীর বনে আসিলেন। এখানে যমুনা পার হইয়া ভদ্রবন, শ্রীবন, লোহবন, ও মহাবন হইয়া গোকুল নগরে যাইয়া ভগ্নমূল যমলার্জ্জুন দেখিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিলেন। এবং বন পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া পুনরায় মথুরায় আসিয়া সেই

ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্যের সাধুতা ও প্রেমের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হওয়ায় নিত্য নিত্য অসংখ্য লোক তাঁহার দর্শনে আসিতে লাগিল। লোক ভিড়ে ত্যক্ত হইয়া তিনি যমুনার নিকট অক্রূর তীর্থে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অক্রূর তীর্থের নিকট কৃষ্ণলীলা সময়ের এক বৃহৎ তেঁতুল গাছ আছে। তাহার মূলদেশ পিঁড়ির আকারে উত্তম বাঁধান। গৌর সেইখানে আপন আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া যমুনা দর্শন ও হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এখানেও বহুতর লোক সমাগম হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি প্রত্যূষে বৃন্দাবনের বনমধ্যে পলাইয়া যাইয়া সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। তৃতীয় প্রহরে তেঁতুল তলায় ফিরিয়া আসিয়া স্নানাবগাহনান্তে অক্রূরে যাইয়া ভোজন করেন। সেই সময়ে আগন্তুকদিগকে নানা উপদেশ দিতেন ও তাহাদের সঙ্গে সৎ প্রসঙ্গ করিতেন। কৃষ্ণদাস নামে এক ব্যক্তি রজঃপুত জাতি যমুনা পারে বাস করিত। সে এই সময়ে শ্রীচৈতন্যের উপদেশে বৈষ্ণব হইয়া পরিবারাদি ছাড়িয়া নিরন্তর তাঁহার নিকট বাস করিতে লাগিল।

এই সময়ে একটী রহস্যজনক ব্যাপার উপস্থিত হইল। যে সকল লোক চৈতন্য দর্শনে আসিত, তাহারা তাঁহার রূপলাবণ্য ও প্রেম চেষ্টা দেখিয়া এবং উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে মানুষজ্ঞান করিতে পারিল না। তাই দেশময় এক জনরব উঠিয়াগেল যে পুনরায় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন। একদিন সন্ধ্যার সময়ে শ্রীচৈতন্য তেঁতুল তলার আসন হইতে দেখিলেন, বহুতর লোক মহা কোলাহল করিয়া বৃন্দাবনে যাইতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, 'কালিয়দহের জলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়া রজনীতে কালিয় শিরে নৃত্য করিয়াছেন এবং কালিয়ের মস্তকমণি দীপ্তি পাইয়াছে। লোকে এই কথা বলায় আমরা দেখিতে যাইতেছি।' শ্রীচৈতন্য কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সরল লোক; তিনি বলিলেন, 'প্রভু! অনুমতি করুন, একবার কৃষ্ণদর্শন করিয়া আসি।' শ্রীচৈতন্য তাঁহার গায়ে চাপড় মারিয়া উত্তর করিলেন 'মূর্খদিগের কথায় তুমিও যে প্রতারিত হইলে দেখিতেছি; শ্রীকৃষ্ণ কলিকালে প্রকাশিত হইবেন কেন? পাগ্‌লামি করোনা; চুপকরে থাক। আচ্ছা, যাইতে হয়, না হয় কাল রাত্রে যাইও।' পরদিন প্রাতঃকালে পরিচিত কোন ভদ্রলোক নিকটে আসিলে শ্রীচৈতন্য হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেমন কালিদহে কৃষ্ণ দেখিয়াছেন তো?' সে ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, 'প্রভু! সে রহস্য কথা আর কি বলিব? কালিদহের জলে নৌকায় চড়িয়া রাত্রি যোগে কৈবর্ত্ত মসাল জ্বালিয়া মৎস্য ধরিতেছিল। মূর্খলোক না বুঝিয়া নৌকাকে সর্প, মসালকে মাণিক ও ধীবরকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছে।'

শ্রীচৈতন্য বলভদ্রকে বলিলেন, 'শুন্‌লে কেমন কৃষ্ণ প্রকট হয়েছে?'

আগন্তুক ব্যক্তি বলিল, 'তা যাহোক্ কথা মিথ্যা নয়। লোকে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ দেখিতেছে, তাহা সত্য।'

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায়?'

আগন্তুক। 'কেন আপনি সন্ন্যাসী, জঙ্গম নারায়ণ। আপনি বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-

প্রকাশ হইয়াছেন, দেখিয়া লোক উদ্ধার হইয়া যাইতেছে।'

শ্রীচৈতন্য। বিষ্ণু! বিষ্ণু! এ কি কথা, সাবধান আর এমন কথা মুখে আনিও না। জীবাধমে কি কৃষ্ণজ্ঞান করিতে আছে? শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ জলন্ত সূর্য্যের ন্যায়। সন্ন্যাসীই বল, আর জ বই বল, তাঁহার অত্যল্প কিরণ কণার সহিত তুলিত হইতে পারে না। যে জীবে ও ঈশ্বরে সমবুদ্ধি করে, সে পাষণ্ড, ঘোর অপরাধী।

মথুরাবাসীগণ মাধবেন্দ্রশিষ্য সেই ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য তাহার মধ্যে এক একটী নিমন্ত্রণ বাছিয়া লইতে লাগিলেন। এক এক দিনে দশবিশ নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তি নানা দ্রব্য লইয়া অক্রুরে আসিয়া রন্ধন করত প্রভুকে ভোজন করাইতে লাগিল। এক দিন তেঁতুল তলায় বসিয়া শ্রীচৈতন্য 'অক্রূর এই ঘাটে বৈকুণ্ঠ দেখিয়াছিলেন' ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞান অবস্থায় যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস রজঃপুত নিকটে ছিল। সে চীৎকার করিয়া উঠায় ভট্টাচার্য্য দৌড়িয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া অনেক যত্নে প্রভুকে উঠাইলেন এবং নানা সুশ্রূষায় সুস্থ করিলেন। তখন বলভদ্র মথুরা-নিবাসী ব্রাহ্মণের সহিত যুক্তি করিয়া বলিলেন, 'আজ যেন আমি নিকটে ছিলাম, জল হইতে তুলিলাম, বৃন্দাবনের বন মধ্যে যাইয়া যদি ডুবেন, তবে কে তুলিবে? নিরন্তর লোক সমাগম ও নিমন্ত্রণের জঞ্জাল, তাহার উপর সর্ব্বদাই প্রভুর আবেশ। আমাকে গতিক ভাল লাগিতেছে না। এখান হইতে না যাইতে পারিলে অব্যাহতি নাই।' ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 'গঙ্গাতীরের প্রকাশ্য পথে সোরো ক্ষেত্র দিয়া চল প্রভুকে লইয়া প্রয়াগে যাই। সম্মুখে মকর যাত্রায় গঙ্গাস্নান করিব।' ভট্টাচার্য্য এই পরামর্শ জানাইলে শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তুমি আমাকে সঙ্গে আনিয়া বৃন্দাবন দেখাইলে, আমি তোমার এ ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।' পরদিন প্রাতঃকালে যমুনা স্নান করিয়া ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস ও মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ প্রভুকে নৌকায় পার করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া শ্রীচৈতন্য অদূরে এক দল গাভী চরিতেছে দেখিতে পাইলেন। বৃন্দাবন ছাড়িয়া যাইতেছেন ভাবিয়া মনে মনে কত কি আন্দোলন হইতেছে, এমন সময়ে এক গোপ বাঁশী বাজাইলে গৌরচন্দ্র কৃষ্ণাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার মুখ দিয়া লালা পড়িতে লাগিল, নিশ্বাস রুদ্ধ হইল, তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দিল্লীশ্বরের দশজন সম্ভ্রান্ত পাঠান সৈনিক পুরুষ অশ্বারোহণে সেই স্থানে উপনীত হইল। সঙ্গের চারিজন লোক ধুতরা খাওয়াইয়া যতির ধন সম্পদ হরণ করিবে বলিয়া অজ্ঞান করিয়াছে, এই সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত করিয়া সৈনিকগণ সঙ্গীদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল ও অসি নিষ্কাশিত করিয়া কাটিতে উদ্যত হইল। বাঙ্গালীর সাহস চিরকালই সমান। বলভদ্র ও তাঁহার সঙ্গী ব্যক্তি ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু রজঃপুত কৃষ্ণদাস নির্ভীক, সে বলিল, "দোহাই পাতসার। এ যতিকে

আমরা ধুতুরা খাওয়াই নাই। ইনি আমাদের গুরু। ইনি ব্যাধিগ্রস্ত, তাই অমন হইয়াছেন, এখনি উঠিবেন। আমাদের বাঁধিয়া রাখ, ইহার নিকট শুনিয়া তবে আমাদের কাটিও।' সৈনিক বলিল, 'এই গৌড়িয়া দুই জন কাঁপিতেছে কেন? ইহারা অবশ্যই ঠগ। তোমরা পশ্চিমা, তাই কাঁপিতেছ না।'

কৃষ্ণদাস এবার রাগিয়াছে, সে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া দেখাইয়া বলিল, 'ঐ গ্রামে আমার বাড়ী, একশত সোয়ার ও দুই শত কামান আছে। আমি ডাকিলেই তাহারা আসিবে। তোমার ঘোঁড়া পিড়া সব লুঠিয়া লইবে। তীর্থবাসী ব্রাহ্মণ বাঁধিয়াছ ও মারিতে চাহিতেছো? গৌড়ীয়া বাটপাড় না তোমরা বাটপাড়?' সৈনিকগণ এই কথায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া সকলের বন্ধন খুলিয়া দিল। এ দিকে শ্রীচৈতন্য সংজ্ঞা পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। ভট্টাচার্য্য সুশ্রূষা করিলেন। ম্লেচ্ছগণ গৌরকে বলিলেন যে, 'এই পাচজন কি তোমাকে ধুতুরা খাওয়াইয়াছে?' গৌর বলিলেন, 'ইহারা আমার সঙ্গী, ইহারা আমাকে কেন ধুতরা খাওয়াইবে? আর আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, আমার কি ধন আছে যে, ইহারা সেই লোভে আমাকে মারিবে, আমার মৃগী রোগ আছে, তাই মাঝে ২ অজ্ঞান হই।' সৈনিকগণে রমধ্যে বিজুলী খাঁ নামে এক ব্যক্তি রাজকুমার ছিলেন। আর এক ব্যক্তি কোরাণাদি শাস্ত্রে মহা মৌলবী ছিলেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সম্ভাষণ ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় শাস্ত্রীয় বিচার উঠিয়া পড়িল। পাঠানগণ কোরাণ প্রতিপাদিত ধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। শ্রীচৈতন্য তীক্ষ্ণ যুক্তিবলে তাহাদের তর্ক খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিলেন এবং নাম সংকীর্ত্তন ও প্রেমভক্তি লাভই যে একমাত্র মুক্তির উপায়, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। কথিত আছে যে, পাঠানদ্বয় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য মৌলবীর নাম পরিবর্ত্তনে 'রামদাস' নাম রাখিলেন। বীজলী খাঁ ও রামদাস অনুতাপে প্রভুর পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। 'পাঠান বৈষ্ণব' নামে তাঁহারা সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য এই স্থান হইতে বিদায় হইয়া সোরো ক্ষেত্র দিয়া প্রয়াগ অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কৃষ্ণদাস রজঃপুত, মাথুর ব্রাহ্মণ ও বলভদ্র ও তাঁহার সেবক চলিল।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

পৃথিবীর মৃত্যু গণনা।

যাহার জন্ম আছে, তাহার মরণ আছে। পশু, পক্ষী, মনুষ্য, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি জীবগণের জন্ম, যৌবন ও বার্দ্ধক্য ও মরণ আছে। কিছুতেই কেহ এই প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে না।

এমন কোন কাল ছিল, যখন আমাদের

পৃথিবী ছিল না। জীবগণের ন্যায় ইহার জন্ম হইয়াছে, উহাদিগের ন্যায় ইহার মরণ আছে কি? ইহা অনাদি নহে, সুতরাং ইহা অনন্ত হইতে পারে না। "অনিত্যাশ্চায়ং কারণতঃ" ইহার কারণ আছে, সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই অনিত্য।

এই শস্যশ্যামলা, বহুজনপূর্ণা অশেষ জীবসঙ্কুলা, নদনদী সাগর বন পর্ব্বত সুশোভিতা পৃথিবীর আবার বিনাশ আছে, একথা সহসা মনে হয় না। মানুষ ত যতদিন দেখিয়াছে, তাহাতে পৃথিবীকে যেন একই ভাবে দেখিয়াছে, আবহমানকাল পর্য্যন্ত মানুষ ইহার বিশেষ রূপান্তর দেখে নাই, পরেই বা ইহার রূপান্তর বা বিনাশ দেখিবে কেন?

কিন্তু মানুষ কয় দিনের? কত কত যুগযুগান্তর গিয়াছে, যখন মানুষ কি কোন জীবজন্তু উদ্ভিদই পৃথিবীতে ছিল না; যখন এই পৃথিবী কেবল প্রচণ্ড তাপ উদ্গীরণ করিতে করিতে সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে। তখন পৃথিবীর জন্ম হইয়া শৈশবকাল যাইতেছিল।

জন্ম ও মরণ—এই দুইটি, কার্য্যের আদি ও অন্ত। আদি ও অন্তের অন্তঃবর্ত্তী কালই জীবনকাল। পৃথিবীর শৈশবকাল বহুদিন গত হইয়াছে, যৌবনও গিয়াছে, এক্ষণে প্রখর কার্য্যাদির অবসান হইয়া যৌবনের পর স্থির প্রশান্ত প্রৌঢ়াবস্থার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। সে উদ্ভিদ্ বহুল অঙ্গারজনক যুগ কিম্বা দীনোথিরিয়ম, মাস্তোদন প্রভৃতি ভয়ঙ্কর প্রাণী বহুল যৌবনের ভোগকাল শেষ হইয়াছে।

পৃথিবীর এখনও বার্দ্ধক্য বাকী আছে; কিন্তু ইহারই মধ্যে অনেক পাশ্চাত্য দৈবজ্ঞ সময়ে সময়ে পৃথিবীর লয়ের আশঙ্কা ঘোষণা করেন। কোন কোন ভণ্ড দৈবজ্ঞ নাকি দৈবগণনা দ্বারা জানিয়াছে যে, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পৃথিবীর ভয়ানক রিষ্টিদোষ আছে, আর উক্ত বৎসর দোষ কাটাইয়া উঠিতে পারিলেও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নিস্তার নাই।

আজকাল নিতান্ত অশিক্ষিত কিম্বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি ব্যতীত এমন কেহই নাই যে, এই মিথ্যা কাল্পনিক আশঙ্কায় ভীত হয়। কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ অবস্থা ছিল না। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে একবার গ্রহণকালে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস হইবার সম্ভাবনা ছিল। কথিত আছে, তাহাতে ফরাসী দেশবাসী জনপদ, উক্ত গ্রহণে ভাবী অমঙ্গল চিন্তায় এত ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা দলে দলে গির্জ্জায় গিয়া পাদরীর নিকট পাপস্খালনের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস দ্বারা পৃথিবীর ধ্বংস স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিল। কোন ইতিহাস-লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, সেই সময়ে কোন গ্রামের পাদরী গ্রামস্থ যাবতীয় লোকের আত্মপাপ স্বীকার শুনিয়া শেষ করিতে না পারিয়া নাকি যজমানবর্গকে বলিয়াছিলেন যে, "হে ভ্রাতৃবৃন্দ! এত ব্যস্ত হইও না; দুই সপ্তাহের নিমিত্ত গ্রহণ স্থগিত হইয়াছে।"

আমাদের দেশেও সাধারণ লোকে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় বিপদাশঙ্কা করিয়া ঠাকুর দেবতার নাম ও দানাদি পুণ্য কার্য্য করিয়া থাকে। পুরাকালে এ সম্বন্ধে জনসাধারণের যেরূপ ভাব ছিল, এখনও এদেশে তাহাদিগের মধ্যে সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাস্তবিক, আমাদের শাস্ত্রকারগণ নানা ঘটনা হইতে নানাবিধ বিপদাশঙ্কা করিয়া প্রত্যেক বিষয়ের যথাযথ শান্তি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক দেশেই সকল সময়েই লোক সকলের মধ্যে প্রায় দেখা যায় যে, কোন অসামান্য নৈসর্গিক ব্যাপার দেখিলেই তাহারা নানাবিধ বিপৎপাত আশঙ্কা করিয়া থাকে। সভ্যতাভিমানী, বিজ্ঞানানুশীলনকারী ইংলণ্ডবাসীগণের মনেও এমন বহুবিধ কুসংস্কার আছে যে, তৎসমুদায়ের বর্ণনা পড়িলে বিস্ময় উপস্থিত হয়। যাহা হউক, দেখা যায় যে, আমাদের শাস্ত্রকারগণ শুভাশুভ সূচক উৎপাতকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনটি শ্রেণী এই,—দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম। গ্রহ নক্ষত্রের বৈকৃত, দিব্য, অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্রগণের বিকৃত যোগাযোগ, চন্দ্রার্কগ্রহণ ইত্যাদি 'দিব্য' উৎপাত নামে কথিত হইয়াছে। তারা, উল্কা, বজ্রপাতাদি, ধূমকেতুর উদয়, রক্তপদ্মারুণ সান্ধ্য, চন্দ্র সূর্য্যের পরিবেশ, ইন্দ্রচাপাদি, কৃষ্ণার্ণববৎ নভোমণ্ডল প্রভৃতি, আন্তরীক্ষ উৎপাত। জল-বৈকৃত, প্রসব বৈকৃত, বৃক্ষ বৈকৃত, চতুষ্পাদ বৈকৃত, ভূকম্প ইত্যাদি ভৌম উৎপাত।

যাহা হউক, উক্ত নানাবিধ বৈকৃতের বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে। তবে, আমরা পৃথিবীর উপপ্লবের বিষয় আলোচনা করিবার সময় দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম, এই ত্রিবিধ উৎপাতের নামোল্লেখ করিব।

পৃথিবীর জীব সমুদায় একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, একথা মনে চিন্তা করিতে অনেকেরই ক্লেশ হয়। কিন্তু যদ্যপি কোন আকস্মিক কারণ বশতঃ জীবকুল লুপ্ত হয়, তাহাতেই বা বিশেষ ক্ষোভের কারণ কি? প্রত্যেক মনুষ্যের মৃত্যুকালে একবার ত বিপদ উপস্থিত হয়, একেবারে যাবতীয় জীবের ধ্বংস হইলে উক্ত বিপদ বেশী ভয়ানক হইবে, এরূপ চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই।

আমাদের দুইটি বিষয় পৃথকভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। (১) উদ্ভিদ্ ও প্রাণী লইয়া পৃথিবীর জীব সমষ্টির লোপ, আর (২) পৃথিবীর নিজের ধ্বংস। এক্ষণে দেখা যাক, কি কি কারণে এই দ্বিবিধ ঘটনা ঘটিতে পারে। অবশ্য, যদ্দ্বারা পৃথিবীর ধ্বংস হইবে, তদ্দ্বারা যে জীবগণেরও লোপ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ জীবগণের ধ্বংস হইলেই যে পৃথিবীর ধ্বংস হইবে, এরূপ অনুমান ন্যায়সঙ্গত নহে।

দিব্য উৎপাত।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, জীবগণের উৎপত্তি ও স্থিতি কিরূপে সম্পাদিত হইতেছে। জীব অর্থে আমরা তরুলতাদি উদ্ভিদ ও মনুষ্য পশু-পক্ষী কীটাদি প্রাণী উভয়ই বুঝিব। বলা বাহুল্য, সূর্য্যই পৃথিবীতে তাপ ও আলোক দান করিয়া পার্থিব জীব প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক উদ্ভিদের জন্ম হওয়ার অর্থ, কিঞ্চিৎ জীবনী-শক্তির প্রকাশ। আধুনিক বিজ্ঞানবেত্তারা স্থির করিয়াছেন যে, শক্তি বিনষ্ট কিম্বা সৃষ্ট হইতেছে না। বিশ্বজগতের মধ্যে যেমন জড়পদার্থের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, কেবল উহার রূপান্তর আছে মাত্র, তেমনই বিশ্বজগতের মধ্যে যে শক্তি সমষ্টি আছে, তাহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, কেবল

তাহা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। রসায়ন বিজ্ঞান-বিদেরা জড়পদার্থের এবং পদার্থ বিজ্ঞান-বিদেরা শক্তির অবিনশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নানাবিধ আকারে শক্তি কার্য্য করিতেছে। কিন্তু রূপের পরিবর্ত্তন ব্যতীত তাহার পরিমাণের পরিবর্ত্তন ঘটে না। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটি সহজবোধ্য হইতে পারে। মানুষের কথাই ধরা যাউক। সকলেই জানেন যে, মানুষের জীবন ধারণ করিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ তেজঃ, বায়ু ও ভক্ষ্য বস্তুর আবশ্যক। আহার ভিন্ন জীবন ধারণ অসম্ভব, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। জল ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে, জন্তু কিম্বা উদ্ভিদ শরীরই, আমাদের ভক্ষ্য সামগ্রী। যে জন্তু আমাদের ভক্ষ্য, তাহা পরোক্ষে কিম্বা প্রত্যক্ষ ভাবে কোন না কোন উদ্ভিদ দেহ ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করে। এইরূপে বলা যাইতে পারে যে, বাস্তবিক আমরা উদ্ভিদ্ দেহ ভক্ষণ করিয়াই জীবিত আছি। জল ও বায়ুও আমাদের অপর আহার্য্য বটে, কিন্তু কেবল জল বায়ু ভক্ষণে জীবন ধারণ অসম্ভব। উদ্ভিদ্ দেহই আমাদের প্রধান আহার্য্য। দেখা যাউক, উদ্ভিদগণ কিরূপে স্ব স্ব দেহ পুষ্টি করিতেছে। প্রাণীগণের ন্যায়, জল, বায়ু, তেজঃ ও অপর আহার্য্য তাহাদিগের প্রয়োজন। বায়ুস্থিত অঙ্গারকাম্ল নামক গ্যাস তাহারা নিজ দেহে শোষণ করিয়া লয়। ইহাই তাহাদিগের দেহপুষ্টির প্রধান উপকরণ। অঙ্গারকাম্ল গ্যাস বিশ্লিষ্ট করিয়া তন্মধ্যস্থিত অঙ্গারক পদার্থটিকে তাহারা স্ব স্ব দেহে প্রতিষ্ঠিত করে। দেখা গিয়াছে যে, সৌর তেজঃ ব্যতীত উদ্ভিদ্গণ উক্ত গ্যাসটিকে বিশ্লিষ্ট করিতে পারে না। ইহার অর্থ এই যে, উদ্ভিদ্গণের দেহপুষ্টির প্রধান উপাদান প্রস্তুত করিতে সৌরতেজের প্রয়োজন। অথবা সৌরতেজোরূপ শক্তিই উদ্ভিদ্বর্গকে আহার যোগাইতেছে। উদ্ভিদ্-দেহই যখন আমাদের আহার্য্য, তখন দেখা গেল যে, সূর্য্যদেব আপনার তেজঃ দান করিয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন। উক্ত হইয়াছে যে, আহার্য্য ব্যতীত জীবন ধারণ জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাপ ও আলোকের প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সেই তাপ ও আলোকও সৌরতেজঃ মাত্র।

এক্ষণে অনায়াসে বুঝা যাইবে যে, কোন কারণ বশতঃ যদ্যপি সৌরতেজের হ্রাস হয়, অর্থাৎ যদ্যপি তাঁহার তেজের ভাণ্ডার কমিয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ জীবিত উদ্ভিদ সকল মরিতে থাকিবে, অপর উদ্ভিদ অতিকষ্টে অল্প পরিমাণে জন্মিতে থাকিবে, জল জমিয়া বরফে পরিণত হইবে এবং শীতের আতিশয্যে বোধ হয় বায়ুও মৃত্তিকা দ্বারা পরিশোষিত হইবে। সৌরতেজঃ আরও কমিয়া গেলে যখন উদ্ভিদের জন্ম অসম্ভব হইবে, তখন মনুষ্যের অবস্থিতি কোথায়? একথা পরে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইবে।

উপরে দেখা গেল যে, সৌরকরজালই মানুষের স্থায়িত্বের কারণ। এখন দেখা যাউক, এমন কিছু ঘটিতে পারে কি না, যদ্দারা সূর্য্যের তেজঃ হ্রাস হইতে পারে।

সৌরদেহ, ছোট বড় নানা আকারের কলঙ্কমালায় * পরিব্যাপ্ত। ঐ সকল কলঙ্করাশির মধ্যে যেটি ক্ষুদ্রতম, সেটির আকার আমাদের পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ।

* নব্যভারতের এক সংখ্যায় সৌর-কলঙ্কের বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কয়েকটি এত প্রকাণ্ড যে, দূরবীক্ষণ ব্যতীতও তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও আধুনিক জ্যোতির্বিদ্ পদার্থবিজ্ঞানবেত্তাগণের সকলেই এই টুকু স্বীকার করেন যে, সৌর তেজঃ হ্রাসই সৌরকলঙ্কের উৎপত্তির কারণ। সূর্য্যের তেজঃ প্রভূত, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারও ত পরিমাণ আছে। বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এমন কি, যুগের পর যুগ গত হইলে সঞ্চিত ধন প্রভূত হইলেও ক্রমাগত ব্যয় বশতঃ, এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই নিঃশেষ হইবে। সূর্য্যের দেহ অতীব প্রকাণ্ড, কম হইলেও আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৩ লক্ষ ৭২ হাজার গুণ বড়। উহার বিশাল দেহটি জ্বলন্ত বাষ্পরাশি নির্ম্মিত। কিন্তু উহার আয়তন যত বড়ই হউক, এবং উষ্ণতা যত অধিকই হউক, কিরণজাল অবিরত বিস্তার করিয়া সূর্য্যদেব নিশ্চয়ই এক সময়ে গতশক্তি হইবেন। এক্ষণে যেমন অল্প পরিমাণে সূর্য্যদেহে সৌরকলঙ্ক উৎপন্ন হইতেছে, এবং কোন কোন বৎসর প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না, কালক্রমে উজ্জ্বল সৌরদেহ কলঙ্ক রাশিতে আবৃত হইবে, এবং পৃষ্ঠদেশের আবরণ স্বরূপ হইয়া তাহার দিব্যদেহ জ্যোতিঃ হীন করিয়া তুলিবে।

অবিরত তেজের বিকীরণ বশতঃ সূর্য্য ক্রমশঃ নিশ্চয়ই শীতল হইয়া পড়িবে। কিন্তু শীতল হইতে আরম্ভ করিলেই যে উহা একটা বিশাল কঠিন পিণ্ডাকারে পরিণত হইবে, এমন নয়। অগ্রে অবশ্য উহার পৃষ্ঠদেশ শীতল হইবে। আমাদের পৃথিবীও, এককালে সূর্য্যের ন্যায় জ্বলন্ত বাষ্পময় ছিল। তাপ বিকীরণ বশতঃ যেমন উহার চারিদিকে এক কঠিন আবরণ জন্মিয়াছে, তদ্রূপ সূর্য্যেরও পৃষ্ঠদেশের চারিদিকে জ্বলন্ত বাষ্পরাশির পরিবর্ত্তে শীতল ও কঠিন আচ্ছাদন উৎপন্ন হইবে।

সূর্য্যের তেজঃ কি উত্তরোত্তর বাড়িতে পারে না? সূর্য্যাগ্নিতে প্রচুর ইন্ধন পতিত হইলে, উহার তাপ বৃদ্ধি হইতে পারে। বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাক্, উহার যতখানি তেজঃ একদিনের মধ্যে চারিদিকে চলিয়া যাইতেছে, ততখানি তাপ উৎপন্ন হইতে পারে, এমন ইন্ধন কোথায়? কোন কোন জ্যোতির্বিদ্ বলেন যে, ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সকল সূর্য্যদেহে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহার তেজোরাশি অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। বলা বাহুল্য, একথা সর্ব্ববাদীসম্মত কি প্রামাণিক নহে।

যেমন ইন্ধন অভাবে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ সূর্য্যও এক দিন নির্ব্বাপিত হইবে। সেই ভয়ঙ্কর দিন দুই এক শতাব্দীর মধ্যে আসিতেছে না। অনেক যুগ যুগান্তর গত হইলে সূর্য্যেরও, পৃথিবীর ন্যায়, মৃণ্ময় দেহ প্রাপ্তি ঘটিবে। সেই দুর্দ্দিন কবে উপস্থিত হইবে, বিজ্ঞানবিদেরা তাহার কতকটা পরিমাণ করিতে পারিয়াছেন। বৎসর বৎসর কি পরিমাণে সৌরতেজঃ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে, সেই পরিমাণ অবগত হইয়া তাঁহারা সৌরতেজের স্থায়ীত্বের কাল গণনা করেন। এই রূপে তাঁহারা বলেন যে, প্রায় বিশ কোটি বৎসর পরে সূর্য্য, পৃথিবীর আধুনিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং প্রায় দশ কোটি বৎসরের মধ্যেই উহা এত শীতল হইয়া

পড়িবে যে, তখন পৃথিবীতে এক্ষণকার ন্যায় জীব সকল্ জীবিত থাকিতে পারিবে না।

আন্তরীক্ষ উৎপাত।

পৃথিবীর লোক নাশের পক্ষে অপর কোন আশঙ্কা আছে কিনা, দেখা যাউক। ধূমকেতু উদয় হইতে অনেকেই দেখিয়াছেন এবং উদয় কালে সাধারণ লোকের মনে কতপ্রকার অমঙ্গলের ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহাও অনেকে বিদিত আছেন। "উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ" একথা সংস্কৃত সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নানাবিধ ধূমকেতুর বিষয় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এখনও অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ধূমকেতুর উদয়ের সহিত পৃথিবীতে মড়ক, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অমঙ্গলের সম্বন্ধ অনুমান করেন।

কোটি কোটি ধূমকেতু আকাশমার্গে নিয়ত বিচরণ করিতেছে। কোটি কোটি নক্ষত্র স্বদলবলে অন্তরীক্ষে স্বস্ব গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু কোটি কোটি, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ধূমকেতু বা নক্ষত্র আকাশ পথে ভ্রাম্যমান্ হইলে পৃথিবীর ক্ষতিবৃদ্ধি কি? 'দিগন্ত প্রসারিত' আকাশে কত অসংখ্য ধূমকেতু আছে, তাহার ইয়ত্তা করা মানুষের সাধ্য কি?

ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোন ধূমকেতু সৌর পরিবারের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখনই তাহা হইতে বিপদের আশঙ্কা করা যাইতে পারে। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, লক্ষ লক্ষ ধূমকেতু সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তির বশবর্ত্তী হইলেও, অত্যল্পই পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হয়। আবার, পৃথিবীর কক্ষপথের নিকটস্থ হয়, এমন ধূমকেতুর সংখ্যা আরও অল্প। সুতরাং কোটি কোটি ধূমকেতুর মধ্যে অধিকাংশই আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে গুলি পৃথিবীর কক্ষপথ অতিক্রম করে, সেই গুলি দ্বারাই পৃথিবীর অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে। ধূমকেতু গুলি নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল। কোন নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহাদের গমন পথ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ তাহারা যেন কোন সাধারণ বিধির অনুবর্ত্তী না হইয়া আকাশে বিচরণ করিতেছে, এরূপ মনে হয়। যাহা হউক, তাহাদিগের হইতে আমাদের এই ভয়, পাছে কোনটা ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবীর সম্মুখীন হয়। তাহা হইলে সেই ধূমকেতুর সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষণ অনিবার্য্য। এবং এইরূপ উৎপন্ন সংঘট্টই, ধূমকেতু হইতে প্রধান বিপদ্।

কিন্তু এরূপে সংঘট্ট উপস্থিত হওয়াও সুদূরপরাহত। প্রথমতঃ, ধূমকেতুর কক্ষ পৃথিবীর কক্ষকে ছেদ করা আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ ধূমকেতু ও পৃথিবী উভয়েরই, সেই ছেদ বিন্দুতে এক সময়ে উপনীত হওয়া আবশ্যক। হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে জানা যায় যে, এরূপে উভয়ের সংঘট্ট সচরাচর হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেহ কেহ বলেন যে, ধূমকেতু সকল, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী আকাশে উপস্থিত হইলেও, এপ্রকার ২৮ কোটি ধূমকেতুর মধ্যে কচিৎ একটির মাত্র পৃথিবীর সহিত সংঘর্ষণ ঘটিতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধূমকেতু হইতে উৎপাতের সম্ভাবনা অতীব অল্প; কিন্তু যখন উৎপাতের সম্ভাবনা আছে, তখন দেখা যাউক, ধূমকেতুর সহিত পৃথিবীর

সংঘর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এ সম্বন্ধে ফরাসী দেশীয় 'প্রকৃতি' নামক সংবাদ পত্রে এক ব্যক্তি সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইতে কয়েকটি যুক্তি সংগৃহীত হইল। পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮ মাইল বেগে ধাবমান হইতেছে। মনে কর যেন একটা ধূমকেতু উক্ত বেগে ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবীতে আসিয়া সংঘাত প্রাপ্ত হইল। যদ্যপি মনে করা যায় যে, ধূমকেতুর দেহ কোন ঘন দ্রব্যময়, তাহা হইলে উক্ত সংঘাতে ভূপঞ্জর অর্থাৎ পৃথিবীর কঠিনাবরণ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং ভূগর্ভস্থ অত্যুষ্ণ দ্রব পদার্থ সকল উদ্গীর্ণ হইয়া আগ্নেয় গিরির প্রচণ্ড উৎক্ষেপ উৎপন্ন হইবে। ঐ উৎক্ষেপ বশতঃ সমুদ্রজল সংক্ষুব্ধ হইয়া দেশ সকল উৎসন্ন করিতে পারিবে এবং বোধ হয় তাহাতে পৃথিবীর আবর্ত্তন রেখাও হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ, কেহ কেহ মনে করেন যে, গ্রহ সকলের কক্ষ-ক্ষেত্রের সহিত তাহাদের আবর্ত্তন রেখার যে কৌণিক ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা এইরূপ কোন কারণ বশতঃ ঘটিয়া থাকিবে। যাহাহউক, একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ঘনপদার্থময় ধূমকেতু এপর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

ধূমকেতু ঘন গ্যাসময় হইলে, পৃথিবীর সহিত উক্তরূপ সংঘাতে অন্যবিধ বিপদ্ উপস্থিত হইবে। এরূপ সংঘাতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ হঠাৎ অতীব বৃদ্ধি পাইবে, এবং তদ্দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর বাতাবর্ত্ত অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর বাতাবর্ত্তের উৎপত্তি হইয়া সমুদায় দেশ উৎসাদিত হইবে। এতদ্দ্বারা, বায়ুতে অন্যান্য গ্যাস আসিয়া উহার উপাদান পরিবর্ত্তিত করিবে। তাহাতে জীবগণের নিশ্বাস প্রশ্বাসের অনুপযুক্ত হইয়া জীবকুলের বিঘ্ন সম্পাদন করিবে। সম্ভবতঃ, তখন অগণ্য উল্কাপিণ্ডে আকাশ মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। জীবগণ সম্বন্ধে এরূপ নৈসর্গিক উপপ্লবের কি ভয়ানক ফল হইবে, তাহা চিন্তা করিতে হৃদয় মন শুষ্ক হইয়া যায়।

পৃথিবীর সহিত ধূমকেতু বিশেষের সংঘাত সম্ভবপর। কিন্তু উক্তবিধ সম্ভাবনা কতখানি, তাহাও উপরে সামান্যরূপ বর্ণিত হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, এরূপ সংঘট্ট কখনও ঘটিয়াছে কি ?

উল্কাপিণ্ড অনেকেই দেখিয়াছেন। আকাশে ক্ষণিক জ্যোতির্ম্ময় রেখা বিস্তার করিয়া উল্কা অদৃশ্য হয়। অনেক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত অনুমান করেন যে, ঐ সকল উল্কা, ধূমকেতু বিশেষের ছিন্নীভূত অংশ মাত্র। পূর্ব্বোল্লিখিত 'প্রকৃতি' পত্রিকায় এ বিষয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, বায়েলা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ধূমকেতু সাড়ে ছয় বৎসরে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। উহা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর দিবসে পৃথিবীর কক্ষ এমন স্থলে অতিক্রম করে যে, পৃথিবী তাহার এক মাস পরে তথায় আসিয়া উপনীত হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার পুনর্ব্বার উদয় হয়। কিন্তু তখন উহাকে একটির পরিবর্ত্তে, দুই অংশে বিভক্ত দেখা যায়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দুইটি ধূমকেতুকে একত্রে ভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছিল; তদবধি জ্যোতিষ্কেরা উক্ত ধূমকেতুকে আর দেখিতে পান নাই। কিন্তু ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর দিবসে

পৃথিবীকে অপার্থিব ধূলিরাশি ভেদ করিয়া যাইতে দেখা যায়। তখন প্রচুর উল্কা বৃষ্টি হইতে থাকে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর দিবসে নভোমণ্ডল যেন অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ দেখা যায়। ধূমকেতুর অবশেষ সামগ্রীর সহিত পৃথিবীর সংঘাতের ইহা একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ, সন্দেহ নাই। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের সেই সময় উল্কাবৃষ্টি দ্বারা আবার উক্তবিধ সংঘাতের পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, এবং উক্ত ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই বোধ হয় কোন দৈবজ্ঞ উক্ত বৎসরে পৃথিবীর বিলয় ঘোষণা করিয়া থাকিবেন।

ভৌম উৎপাৎ।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পৃথিবী বহুপরিবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরাকালে পৃথিবীর জল ও স্থলভাগের মধ্যে পরস্পর অনেক স্থানে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অনেকবার জীবসঙ্কুল প্রদেশ সকল ভূগর্ভনিহিত শক্তি দ্বারা জলমগ্ন হইয়াছে। অনেকবার ভূপঞ্জরের আলোড়ন বশতঃ অনেক উষ্ণ স্থান তুষারাচ্ছন্ন হইয়াছে। অনেক বিপ্লবিপত্তিরূপ ঝটিকা পৃথিবীর বক্ষের উপর বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে জীব বীজের ধ্বংসক্ষয় নাই। সুতরাং অনায়াসে মনে করা যাইতে পারে যে, এক্ষণেও উক্তবিধ কোন আকস্মিক কারণ বশতঃ বহুবিস্তৃত পরিবর্ত্তন ঘটিলেও পার্থিব জীবকুল নির্ম্মূল হইবে না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আগ্নেয় গিরির প্রচণ্ড উদ্গীরণ হইয়া গিয়াছে, অনেক নর নারী জীব জন্তু বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তৎসমুদায় ভৌম উৎপাত দ্বারা আংশিক ভাবে এবং দেশ বিশেষ মাত্রে অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রাকাতোয়ার ভীষণ উৎক্ষেপে পঞ্চাশ সহস্র লোক অকালে কালের করালগ্রাসে কবলিত হইয়াছে। ভয়ঙ্কর সমুদ্রতরঙ্গ, প্রবল বাত্যা প্রভাবে সংক্ষুব্ধ হইয়া দক্ষিণ সাবাজপুরের ন্যায় নানা দেশ সাগরজলে বিধৌত করিয়াছে। কিন্তু তৎসমুদায় জীবসমুদ্রের বিন্দু মাত্রও শোষণ করিতে পারে নাই।

বাস্তবিক, প্রকাণ্ড আগ্নেয় গিরির প্রচণ্ড উৎক্ষেপ, কিম্বা প্রবল বাতাবর্ত্তের ভীষণ পরাক্রম, কিম্বা ভয়ঙ্কর ভূ-কম্পের বহু বিস্তৃত আলোড়ন দ্বারা পৃথিবীর অংশ বিশেষ মাত্র উৎসাদিত হইতে পারে। উক্ত ভৌমউৎপাৎ হইতে পৃথিবীর জীবকুলের তাদৃশ ভয় নাই। আর একদিকে, পৃথিবীর ধ্বংসের বিশেষ কারণ সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, পৃথিবী এক সময়ে সূর্য্যের ন্যায় জ্বলন্ত বাষ্পরাশিময় ছিল। অবিরত তাপ বিকীরণ বশতঃ ক্রমে উহা শীতল হইয়াছে। শীতল হইবার সময় উহার জ্বলন্ত বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া জল স্থল ও বায়ুরূপে পরিণত হইল। কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ কঠিন মৃণ্ময় হইলেও, উহার অভ্যন্তরভাগ এখনও উষ্ণ দ্রব পদার্থে পরিপূর্ণ। কালক্রমে উহা যতই শীতল হইতে লাগিল, ভূগর্ভের উষ্ণ দ্রবপদার্থ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া হ্রস্বায়তন হইতে লাগিল। সুতরাং ভূগর্ভস্থ সঙ্কুচিত পদার্থরাশি দ্বারা আর পৃথিবীর বহিরাবরণ পরিপূর্ণ রহিল না। ভূগর্ভ এবং কঠিন বহিরাবরণের মধ্যে

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিতে লাগিল। গুরুভার বশতঃ উক্ত আবরণ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া নিম্নের সঙ্কুচিত পদার্থরাশির উপর পড়িয়া যাইতে লাগিল। পক্ব আম্রের শুষ্কাবস্থায় যেমন উহা তুবড়াইয়া যায়, তদ্রূপ পৃথিবীর গাত্রে উচ্চ নীচ স্থান সকল উৎপন্ন হইল। এইরূপে ভূপৃষ্ঠস্থ পাহাড় পর্ব্বত কন্দর উপত্যকাদির সৃষ্টি।

এখনও ভূ-গর্ভ নিরতিশয় উষ্ণ, উত্তাপ বিকীরণ কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। সুতরাং ভূ-গর্ভনিহিত তাপরাশি ক্রমশঃ কম হইয়া পৃথিবীর সঞ্চিত তাপরূপ শক্তির হ্রাস হইতে থাকিবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মৃণ্ময় কঠিনাবরণও ক্রমশঃ পুরু হইতে থাকিবে। ইহাতে ভূপঞ্জরের স্থানে স্থানে ফাটিয়া বা দমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিল। এইরূপে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। ক্রমাগত উষ্ণতার হ্রাস হেতু প্রাণস্বরূপ জল ও বায়ু ক্রমশঃ মৃত্তিকা দ্বারা শোষিত হইবে, কিয়দংশ বা বিশাল গহ্বরের ভিতর গিয়া সঞ্চিত এবং তন্মধ্যস্থ নবগঠিত মৃত্তিকার সহিত রাসায়নিক ভাবে সম্মিলিত হইবে। এই সমুদায় কার্য্যের অর্থ এই যে, পৃথিবী ক্রমশঃ দারুণ শীতল ও জলবায়ু পরিশূন্য হইয়া পড়িবে। ইহা কি কল্পনা মাত্র? এরূপ দশা কোন জ্যোতিষ্কের ঘটিয়াছে কি? চন্দ্রের এক্ষণে এইরূপ মুমূর্ষু দশা উপস্থিত। ইহাও এককালে বর্ত্তমান সূর্য্যের ন্যায় অতীব উষ্ণ ছিল। কিছু কাল পরে অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া উহা পৃথিবীর আধুনিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় উহা যে, পার্থিব জীবজন্তুর ন্যায় জীবগণের আবাস ভূমি ছিল না, কে বলিতে পারে? এক্ষণে উহা হ্রস্বগতি ও শীতল হইয়া পড়িয়াছে। শ্লথগতি ও শীতল ভাব বার্দ্ধক্যের বিশিষ্ট প্রমাণ। উহার জল ও বায়ুও বিলুপ্ত হইয়াছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর ও অত্যাচ্চ পর্ব্বতমালায় উহার দেহ নিতান্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় ভবিষ্যতে কবিকূলের আদরের ধন চন্দ্রমা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া কিয়ৎকাল সতীদেহের ন্যায় আকাশের ত্রিশূলে ভ্রাম্যমান থাকিয়া অবশেষে ধূমকেতু ও উল্কা রূপ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় কায়া বিসর্জ্জন করিবে। মেনিয়ার সাহেব বলেন যে, পৃথিবীর নাকি চন্দ্রের ন্যায় আর একটি উপগ্রহ ছিল। নিজ শক্তি ব্যয় করিয়া কালক্রমে তাহা অপার্থিব আন্তরীক্ষ ধূলাতে পরিণত হইয়াছে।

যে যে কারণ বশতঃ চন্দ্রের বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত, সেই কারণ পৃথিবীতেও কার্য্য করিতেছে। সুতরাং ভবিষ্যতে চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীরও যে অবস্থা হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যে নৈসর্গিক কঠিন নিয়মাবলীর অধীন হইয়া পৃথিবী এখন এমন হাস্যময়ী, সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়াই আবার তাহাই জরাগ্রস্ত হইবে। কালক্রমে ইহা জল ও বায়ু হীন ও আকাশের ন্যায় অতীব শীতল হইয়া পড়িবে। কিন্তু ইহার এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার অগ্রেই জীবগণ একে একে অদৃশ্য হইতে থাকিবে। মানবজাতি, উন্নতি ও সভ্যতার চরম সোপান অধিরোহণ করিয়া ক্রমশঃ হীনবীর্য্য ও ক্ষীণমস্তিষ্ক হইয়া পড়িবে। আধুনিক এস্কিমো জাতির দশা প্রাপ্ত হইয়া দারুণ শীতের ও আহার্য্যের অভাবের হাত হইতে

ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া কোনরূপে অতি কষ্টে শরীর রক্ষায় সমর্থ হইবে। শীতের আতিশয্য বশতঃ মানব নিরক্ষবৃত্ত মণ্ডলে বাসস্থান স্থির করিতে বাধ্য হইবে। সেরূপ অবস্থায় কি উন্নতি ও সভ্যতাভিমান, অহঙ্কার ও জ্ঞানগরিমা থাকিতে পারে? সেইরূপ অবস্থাতেই বা মানবের কতদিন যাইবে? শীতের দুরন্ত প্রকোপ ও ভক্ষ্য বস্তুর অনাটন সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। জন্ম ও ক্রমশঃ কম হইবার সম্ভাবনা, প্রকৃতির সহিত বিষম যুদ্ধে মানব ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইবে। সেই দুর্দ্দিনে, জল ও বায়ুর অন্বেষণে মানব হয়ত গহ্বরবাসী হইয়া ক্রমে ক্রমে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইবে।

এই কি প্রলয়? যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এ প্রলয়ের কথা বলে না। পার্থিব অবস্থার চক্ররূপ পরিবর্ত্তনই প্রলয়রূপে বর্ণিত হইয়া থাকিবে। পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রলয়কালে পর্জন্য শতবর্ষ ব্যাপিয়া ভূমিতে জলবর্ষণ করিবে না। জল ও ভক্ষ্যহীন হইয়া লোক সকল ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িবে। আপনারা পরস্পর ভক্ষণ করিতে থাকিবে। সমুদ্র, ধরণী, বৃক্ষ, লতা, দেহ প্রভৃতির রস, সূর্য্যদেব রশ্মি দ্বারা হরণ করিবেন। পরে হুতাশন দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় দগ্ধ হইবে। তৎপরে মহাধারা মহাস্বনা সংবর্ত্তক মেঘ শতবর্ষ ব্যাপিয়া গর্জ্জন ও বর্ষণ করিবে। নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক এই চতুর্ব্বিধ প্রলয়, পুরাতন শাস্ত্রকারেরা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুমোদিত যে প্রলয়ের সংক্ষেপ বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইল, তাহা বোধ হয় আত্যন্তিক প্রলয়।

পৃথিবীর দুইটি শক্তি আছে। একটি শক্তিদ্বারা ইহা আপন মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে; আর এক শক্তি,—ইহার তাপ। বিকীরণ বশতঃ তাপশক্তির হ্রাস হইবে, একথা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। অপর শক্তিটিরও ক্রমে হ্রাস হইবে। এ শক্তিটির পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বিস্তর হ্রাস হইয়াছে। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ বল সাহেব সে দিন দেখাইয়াছেন যে, এমন কোন কাল ছিল, যখন পৃথিবী এখনকার ন্যায় ২৪ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে অনেক কম সময়ে একবার আপন মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করিত। এমন দিন গিয়াছে, যখন একবার আবর্ত্তন করিতে ইহার ১০।১২ ঘণ্টা মাত্র সময় আবশ্যক হইত। আরও পূর্ব্বে ইহার আবর্ত্তনের কাল ৮।১০ ঘণ্টা মাত্র ছিল। তখন বোধ হয় ইহার জ্বলন্ত বাষ্পময় দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া চন্দ্রদেব গগনমার্গে জন্ম গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, ক্রমশঃ পৃথিবী হ্রস্বগতি হইয়া পড়িতেছে। ঘরের মিত্র পর হইয়াছে। জল ও বায়ুর দৈনন্দিন জোয়ার ভাটা দ্বারা ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুগতি হইতেছে। বৎসরের পর বৎসর, বায়ু ও জলরাশি পৃথিবীর আবর্ত্তন পক্ষে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। ইহাও যে চন্দ্রের ন্যায় শ্লথগতি হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? নিজের দুইটি শক্তির ক্ষয় দ্বারা ইহা যে ঠিক চন্দ্রের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

যাহা হউক, পৃথিবীর মৃত্যু হইবার অনেক পূর্ব্বেই জীবসম্প্রদায়ের মৃত্যু অনিবার্য্য ও নিশ্চিত। নিজশক্তির ব্যয় এবং সৌরতেজের ক্রমিক হ্রাস, পৃথিবীকে মৃত্যু পথে চালিত করিতেছে। তরুলতা

গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ্ এবং মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি যবতীয় প্রাণীর বিনাশে পৃথিবী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে।

বোধ হয়, এক্ষণে অনেক পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। অনেকেরই বোধ হয়, হাস্যরস অধিক মাত্রায় উদ্দীপ্ত হইয়াছে। কিন্তু উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা বিলুপ্ত মস্তিষ্কের খেয়াল নহে, কিম্বা উপন্যাসের কাল্পনিক ঘটনার মিথ্যা আড়ম্বর নহে। অতীত ঘটনা দেখিয়া ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিবার ক্ষমতা মানব প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং কারণ হইতে কার্য্য নিরূপণ করাও ন্যায়শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে।

সৃষ্টিস্থিতি সংহার লইয়াই জগৎরাজ্য চলিতেছে। অগণ্য বিশ্ব, অগণ্য সৃষ্টি! পৃথিবীর মত অতি ক্ষুদ্র, সূর্য্যের ন্যায় যৎসামান্য দেশের ধ্বংসে অসীম বিশ্বরাজ্যের ক্ষতিবৃদ্ধি কি? মনুষ্যের মত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তুচ্ছ প্রাণীর বিলয়েই বা অসীম সৃষ্টির ক্ষতিবৃদ্ধি কি? আর ক্ষতিবৃদ্ধি গণনা না করিবারই বা তাহার সামর্থ্য কোথায়? যিনি রাজ্যেশ্বর, তিনিই রাজ্যের আয় ব্যয় হিসাব করিবেন। অসীম বুদ্ধির কণিকা প্রসাদে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও মানুষের কত দম্ভ! যেন মানুষের জন্যই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে, যেন মানুষের জন্যই প্রকৃতি সুবিমল হাস্যরাশি চারিদিকে ছড়াইতেছে, যেন চিরকাল মানুষ পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া বাস করিবার জন্য আহূত হইয়াছে! বায়ুর এক ফুৎকারে কোথায় চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা স্মরণ নাই।

আর মানুষের ন্যায় ক্ষুদ্রজীবের সংহারেই বা সৃষ্টিকার্য্যের কি ব্যাঘাত হইবে? কে বলিতে পারে, আধুনিক মৃত দশার মধ্যেই চন্দ্র নানাবিধ রমণীয়, মানুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অসংখ্য জীবকে আশ্রয় দিতেছে না? বিজ্ঞান দেখাইতেছে যে, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন অতি ক্ষুদ্র স্থান নাই, যেখানে কোটি কোটি জীব সঞ্চারিত না হইতেছে। অতি গভীর তমসাবৃত গহ্বরই বা কি, অভ্রভেদী তুষারমণ্ডিত গিরি চূড়াই বা কি, আর গভীর মহাসমুদ্রের অন্তস্তলই বা কি, এমন স্থান কি কোথাও আছে, যেখানে কোটি কোটি জীবগণের কলরবে বিশ্বস্রষ্টার মহিমা প্রচারিত না হইতেছে? একটা গেলে আর একটা আসিবে, ইহাই তাঁহার নিয়ম।

"মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।"

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ভুল হয়েছিল।

১

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে,
দেবপুরে শ্মশানের তপোবনে যেয়ে !
সরসীর শ্যামকূলে, দাঁড়ায়ে বকুল মূলে,
মালা গাঁথে ও পাড়ার রাঙ্গা রাঙ্গা মেয়ে !
ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে !

২

ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে,
বসন্তে বিকাল বেলা তপোবনে যেয়ে !
কোকিলের কুহু রবে, হাসিয়া ভেঙ্গায় সবে,
কিবা সে বদন ভঙ্গি—গান গেয়ে গেয়ে !
ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে !

৩

ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে,
শ্মশানের তপোবনে বেড়াইতে যেয়ে !
আমারে দেখিয়া লাজে, পলাইল বন মাঝে,
ফুলের ঢেউয়ের মত সবে ধেয়ে ধেয়ে !
ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে !

৪

ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে,
পূবপাড়া সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যেয়ে !
মায়ে ঝিয়ে এক কাঠে, দাঁড়া'য়ে পুকুর ঘাটে,
মায়ের আঁচল টানে চাঁদপানা মেয়ে !
ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে !

৫

ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে,
পূবপাড়া সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যেয়ে !
'রাণী' ডাকে মেঁও মেও, 'আরো দেও, আরো দেও,'
আদরে বিড়াল ছানা চুমো খেয়ে খেয়ে !
ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে !

৬

ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে,
বসন্তে বিকাল বেলা পূবপাড়া যেয়ে,
গলাগলি দুই বোনে, কেহ যেন নাহি শোনে,
জিব কাটে আধা কথা কয়ে লাজ পেয়ে !
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে !

৭

ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে যেয়ে !
পূবপাড়া সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যেয়ে !
কাণে করঞ্জার ফুল, গালভরা এলো চুল,
মেঘ উড়ে শরতের চাঁদ মুখ ছেয়ে !
ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে !

৮

ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে,
শরতের সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যেয়ে।
কার নাম শুনিয়া সে, কিল ওছাইয়া হাসে,
দাঁতে কেঁটে লাল ঠোঁট—পাণ খেয়ে খেয়ে !
ভুল হ'য়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে !

৯

ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে,
শরতের সন্ধ্যাকালে পূবপাড়া যেয়ে !
তারা ওঠে, চাঁদ ওঠে, ঝিঙা ফুল চালে ফোটে,
সুধা ঝরে শুধু তার চাঁদ মুখ বেয়ে !
ভুল হ'য়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে !

১০

ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে,
সন্ধ্যাকালে পূবপাড়া বেড়াইতে যেয়ে !
দেখিয়া পলায় ঘরে, দেখিতেও সাধ করে,
থাকে সে বেড়ার ফাঁকে চুপে চুপে চেয়ে !
কাল শুনিয়াছি তার হ'য়ে গেছে বিয়ে !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(আর্য্যাধিকৃতদেশের নিকটবর্ত্তী অনার্য্য জাতিদের কথা।)

আর্য্যাবর্ত্তের নদীর গতি অনুসরণ করিয়া আর্য্যদের আর্য্যাবর্ত্ত জয়ের গতি নিয়মিত হইল। এদিকে সিন্ধু ও তাহার পঞ্চশাখার উপকূলে আর ও দিকে কাশী ও ত্রিহুত পর্য্যন্ত গঙ্গা যমুনার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে দ্বিতীয় যুগের শেষে আর্য্য-অধিকার বিস্তৃত হইল। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের অপরাপর অংশ আর্য্যদের সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত না হইলেও বশীভূত হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। এই আর্য্যভূমির পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে যে সকল অনার্য্য-জাতিরা বাস করিত, তাহাদের বিষয় আর্য্যদের সামান্যরূপ জ্ঞানগোচর ছিল। দক্ষিণ বেহার, মালব, দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ, গুজরাট, এবং রাজপুতনার মরুভূমি দ্বিতীয় যুগের শেষভাগে আর্য্যদের অধিকারে আসে নাই বটে, কিন্তু কি প্রকার লোক এই সকল দেশে বাস করিত, তাঁহারা তাহা অবগত ছিলেন ; কারণ "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থ সমূহে এই সকল দেশ "সত্ত্ব" বা মনুষ্যাকৃতি জন্তুর নিবাসভূমি বলিয়া উল্লেখ আছে। এই সকল অপরিচিত দেশে অল্পসংখ্যক অনুচর সঙ্গে করিয়া মহাসাহসী আর্য্যেরা যে অনার্য্য-দিগকে বাহুবলে বশীভূত করিয়া নদীতট-বর্ত্তী উর্ব্বরা ভূমিতে নগর সংস্থাপন এবং একতা, শৌর্য্য, বিদ্যাবুদ্ধি, সুশাসন প্রণালীর পরিচয় দিয়া অনার্য্যদিগকে চমৎকৃত করি-তেন, * তাহা অনায়াসেই কল্পনা করা যাইতে পারে। আর পবিত্রচেতা ঋষিরা এই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশের গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাতে আশ্রম সংস্থা-পন এবং বিদ্যানুশীলন ও বিদ্যা ব্যাখ্যা করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক সময় প্রবল পরাক্রান্ত রাজ-চক্রবর্ত্তী অসংখ্য সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ এই অনার্য্য দেশে আগমন করিতেন। কখন বা পরাজিত রাজারা স্বদেশ-তাড়িত হইয়া প্রাণের ভয়ে এই সকল দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ঈদৃশ বিবিধ কারণে এই সকল অনার্য্য প্রদেশ আর্য্যদের সুপরি-চিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্যের প্রমাণস্বরূপ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের † সর্ব্বশেষ অধ্যায় হইতে এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। আর্য্য-জাতীয় রাজ্যসমূহের উল্লেখ শেষে দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম প্রদেশ-নিবাসী অনার্য্যজাতি-দেরও তাহাতে উল্লেখ আছে। "বাসবেরা তখন সাম্রাজ্য লাভের জন্য ইন্দ্রকে পূর্ব্ব-দিকে ৩১ দিন এই তিন ঋকমন্ত্রে ও যজু-র্মন্ত্রে ও এই সকল বাক্যে অভিষেক করি-লেন ; এই জন্য পূর্ব্বাঞ্চলের রাজারা সম্রাট

* ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্য এই কথা প্রমাণ করিতেছে। ময়ূরভঞ্জে ৪ লক্ষ লোক ; তাহার মধ্যে ভঞ্জপুরাণে বোধ হয় ৪ হাজার মাত্র হইবে। শতকরা ৯৫ লোক অনার্য্য জাতীয় যথা ভূমিজ, কোল, সাঁওতাল, কুর্ম্মি, বাথুরি ইত্যাদি।

† এই ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে কাশী ও বিদেহ হিন্দুরাজ্যের পূর্ব্বতম সীমা ছিল।

নামে পরিচিত। তখন রুদ্রেরা দক্ষিণ প্রদেশে ৩১ দিন পর্য্যন্ত তিন ঋকমন্ত্রে ও যজুর্মন্ত্রে (সুখ) ভোগার্থ ইন্দ্রকে অভিষেক করিলেন। তদবধি এই সকল দেশবাসী 'সত্ত'দের রাজারা ভোজনামে পরিচিত। তখন স্বর্গীয় আদিত্যেরা ৩১ দিন পর্য্যন্ত এই তিন ঋক্ যজুর্মন্ত্র এবং ঐ সকল মহাবাক্যে স্বরাজ্য অভিষেক করিলেন। তদবধি প্রতীচ্য প্রদেশের এই সকল নীচ্য ও অপাচ্য জাতীয় লোকেরা স্বরাট্ * নামে পরিচিত। তখন বিশ্বদেব ইন্দ্রকে উত্তর-প্রদেশে ৩১ দিন পর্য্যন্ত তিন ঋক্‌মন্ত্রে, এক যজুর্মন্ত্রে এবং এই সকল মহাবাক্যে সুখ্যাতি মানসে অভিষেক করিলেন। তদবধি হিমাদ্রির উত্তর প্রদেশীয় ব্যক্তিরা (উত্তর-কুরু, উত্তর-মাদ্র প্রভৃতি জাতীয় ব্যক্তিরা) বৈরাজ্য-ভাবে (রাজা ভিন্ন) অভিষিক্ত হয়েন, এবং বিরাট নামে পরিচিত। তখন স্বর্গীয় সাধ্য ও আপ্ত দেবতারা ইন্দ্রকে মধ্যপ্রদেশ ৩১ দিন অভিষেক করিলেন। এই মধ্যপ্রদেশ রাজত্ব লাভের অমোঘ কেন্দ্র স্বরূপ। এই জন্য কুরু, পাঞ্চাল, বাস, ও উশীনর বংশীয়েরা রাজানামে অভিষিক্ত হয়েন।"

দ্বিতীয় যুগের শেষভাগে আর্য্য অধিকার যতদূর বিস্তৃত ছিল, এই উদ্ধৃতাংশে তাহা সংক্ষেপত উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-সীমায় কাশী, কোশল, বিদেহ আর্য্য-জাতিদের মধ্যে নবীনতম হইয়াও বিদ্যা, যশঃ প্রতিপত্তি, শৌর্য্যপ্রভাবে প্রাচীনতর জাতিদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলে,জনক, অজাতশত্রু প্রভৃতি তদীয় অধিনেতারা মহাগৌরবান্বিত সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিলেন, এবং বিদ্যা ও বীরত্বপ্রভাবে সেই উপাধির গৌরব রক্ষা করিলেন। চর্ম্মণ্বতী (চম্বাল) নদীর উপকূলে আগমন করিয়া কতিপয় সুসাহসী আর্য্য ব্যক্তি মালবের অনার্য্য জাতির বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। এই সকল অনার্য্যেরা "সত্ত" জানোয়ার তুল্য, মনুষ্যমধ্যেই পরিগণিত হইত না। ঐতরেয় সংহিতায় ভোজ নামের যে কারণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কাল্পনিক হইলেও, বিন্ধ্য ও চর্ম্মণ্বতী মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভোজনামে পরিচিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভোজ হইতে পশ্চিমদিকে চির জয়শালী আর্য্যেরা সমুদ্র পারে উপস্থিত হইলেন। এই সকল দেশবাসী লোকদিগকে আর্য্যেরা ঘৃণার সহিত নীচ্য ও অপাচ্য এবং তাহাদের অধিনেতাদিগকে স্বরাট্ বা স্বাধীন রাজা নাম প্রদান করিলেন। এই সকল জাতি আধুনিক সময়ে দাম্ভিক ও সুযোদ্ধা মহারাষ্ট্রীয়-দের পূর্ব্বপুরুষ। দ্বিতীয় যুগের শেষভাগের গ্রন্থে ইহাদের সামান্য মত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুরাট ও গুজরাট শব্দ জাতি-বাচক হইতে দেশবাচক হইয়াছে।

হিমালয়ের উত্তর দিকে—সম্ভবতঃ হিমালয়ের দক্ষিণদিকস্থ সানুপ্রদেশে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্রদের বাসস্থান ছিল। অদ্যাপি এই সকল প্রদেশের সমাজপ্রণালী সাধারণ-তন্ত্র-বদ্ধ। তাহাদের কোন রাজা ছিল না, সুতরাং তাঁহারা বিরাট্।

এই প্রাচীন আর্য্যমণ্ডলের কেন্দ্ররূপ গঙ্গা যমুনা প্রদেশে সুবিখ্যাত কুরু পাঞ্চাল এবং হীনপ্রভ বসঃ ও উশীনরঃ জাতির প্রাদুর্ভাব হয়।

* এই স্বরাট্ হইতে আধুনিক সৌরাষ্ট্র ও সুরাট উৎপন্ন।

পশ্চিমে রাজপুতনার মরুভূমি আর্য্যদের অজ্ঞাত ছিল। ভীল প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা নির্ব্বিঘ্নে তথায় বাস করিতেছিল। খ্রীষ্টাব্দারম্ভের পরে শকাদি পৃথক জাতি আসিয়া এই মরুভূমিতে অধিকার স্থাপন করেন। পূর্ব্বদিকে দক্ষিণ বিহারে আর্য্যদের বসবাস ছিল না। অথর্ব্ববেদ হইতে অধ্যাপক ওয়েবার কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আর্য্যেরা অঙ্গ ও মগধ দেশের লোকদিগকে বিদ্বেষ চক্ষে দেখিতেন। মগধ তথনও আর্য্যভূমি মধ্যে গণ্য হয় নাই; তথাপি মগধে যে কোন কোন হিন্দু যাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা দেশ দ্বিতীয় যুগের শেষভাগে আর্য্যদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

দাক্ষিণাত্য অর্থাৎ বিন্ধ্যাচল শ্রেণীর দক্ষিণদিকস্থ প্রদেশ সমূহে আর্য্যেরা এই যুগের শেষভাগেও অধিকার স্থাপন করেন নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৮) অনেক নীচ বর্ব্বর জাতির নামোল্লেখ সঙ্গে অন্ধ্রনাম দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তীযুগে অর্থাৎ দার্শনিক যুগে এই অন্ধ্রজাতি দাক্ষিণাত্যে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, তাহা ইতঃপশ্চাৎ বিবৃত হইবে।

দ্বিতীয় যুগে যে সকল আর্য্যজাতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং যে সকল অনার্য্যজাতি এই আর্য্যদেশ সমূহ বেষ্টন করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। এইযুগে রাজাদের রাজ্যাভিষেক বিবরণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "তিনি সিংহাসনে ব্যাঘ্রচর্ম্ম এই ভাবে পাতিত করিলেন যে, রোমরাশি বাহিরদিকে রহিল, এবং গ্রীবাদেশ পূর্ব্বাভিমুখী হইল। কারণ ব্যাঘ্র অরণ্য-জন্তুদের ক্ষত্র স্বরূপ। এই ক্ষত্রই রাজা। এই ক্ষত্রদ্বারাই রাজারা রাজকীয় বললাভ করেন। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার সময় তাহার পশ্চাৎ দেশ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া জানু পাতিয়া বসিবেন, যেন তাঁহার দক্ষিণ জানু ভূমি স্পর্শ করে। এই ভাবে দক্ষিণ হস্তে সিংহাসন ধারণ করিয়া তিনি এই মন্ত্র পাঠ করিবেন "হে সিংহাসন! এই গায়ত্রী সঙ্গে অগ্নি উত্থিত হউক। * * * রাজার মস্তকে এখন উদম্বর শাখা স্থাপন করিয়া, তাহাতে বারি সেচন করিবে। এই সময়ে পুরোহিত এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।—'এই শুভকর,সর্ব্বরোগহর, ক্ষত্র-প্রভাব-বৃদ্ধিকর জলে অমর প্রজাপতি ইন্দ্রকে, রাজা সোমকে, বরুণকে, যমকে মনুকে অভিষেক করিয়াছিলেন; আমি তদ্দারা তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি। যশস্বিনা মাতা তোমাকে প্রজাশাসনার্থ গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।' * * * এখন পুরোহিত স্বদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার হস্তে মাদক পাত্র প্রদান করেন। তথন রাজা উদম্বর শাখা-অভিমুখী হইয়া সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হয়েন।"

এই অভিষেক প্রণালীতে যে সকল রাজার অভিষেক হইয়াছিল বলিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহাদের অনেকের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। কবষ পুত্র তুর এই মন্ত্রে পরীক্ষিত পুত্র জনমেজয়কে অভিষেক্ত করেন। "এই জন্যই জনমেজয় দিগন্ত সীমাপর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" পর্ব্বত ও নারদ এই মন্ত্রে উগ্রসেনের অম্বকে (যুধাং-

ভ্রান্তিকে) বশিষ্ঠ ঋগ্বেদীয় রাজা সুদাসকে, এবং দীর্ঘতমা দুষ্মন্ত-পুত্র ভরতকে অভিষেক করিয়াছিলেন।

বাজসনেয় সংহিতায়ও রাজ্যাভিষেক মন্ত্রের উল্লেখ আছে; তাহা হইতে পুরোহিতের আশীর্বচন উদ্ধৃত করিতেছি। "যে বিধাতা সমস্ত জগত শাসন করিতেছেন, তিনি তোমাকে প্রজাশাসন করিতে ক্ষমতা প্রদান করুন্। যে গৃহাগ্নি গৃহে গৃহে পূজিত হইতেছে, তিনি তোমাকে গৃহীমাত্রের উপর প্রভুত্ব প্রদান করুন। উদ্ভিজ্জাধিপতি সোম তোমাকে অরণ্যের উপর প্রভুত্ব প্রদান করুন্। বাক্‌প্রণেতা বৃহস্পতি তোমাকে বাক্‌পটুতা প্রদান করুন্। দেবতার মধ্যে গরিষ্ঠ ইন্দ্র তোমাকে অমিত তেজঃ ও অতুল গৌরব প্রদান করুন। পশুপতি রুদ্র তোমাকে পশু সমূহের উপর ক্ষমতা প্রদান করুন্। সত্যস্বরূপ মিত্র তোমাকে সত্যে দ্রঢ়িষ্ঠ করুন্। পুণ্যের পোষ্টা বরুণ পুণ্যকার্য্যে তোমার সহায় হইন।" ইহার পর সমাগত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া পুরোহিত বলিতেন "অমুক জাতীয় লোক সমূহ (যথা, হে কুরুগণ। হে পাঞ্চালগণ!) ইনি তোমাদের রাজা।" অবশেষে রাজাকে সম্বোধন করিয়া পুরোহিত বলিতেন, "যদি রাজা হইতে তোমার অভিলাষ থাকে, সবল ও দুর্ব্বলের প্রতি সমভাবে ন্যায়-বিচার করিবে, অবিশ্রান্ত ও অনবরত প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত থাকিবে, এবং রাজ্যকে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

তুমি কি রমণী?

১

তুমি কি রমণী? বঙ্গকুলবালা?
এ দুর্গতি কেন মরি!
সুতনু তোমার, শ্মশান করিয়া,
কে নিল শরম হরি?
কোথা সে দেহের, সঙ্কোচ তোমার—
নর আঁখি পরশনে।
কোথা অধরের অজ্ঞানতা তব—
পবিত্রতা দরশনে!
কোথা সে তোমার চকিত নয়ন
ফুটিতে গুটায়ে যায়।
কোথা চরণের সে মৃদুল গতি
ধরা না বাজিত পায়!
কোথা সে বসন— নির্জ্জনের বাস,
সাধনার বেশ যেন!
তপস্বিনীরূপা ছিলে বঙ্গ নারী
বিলাসিনী বেশ কেন?

২

অন্দরের মাঝে, নিভৃত মন্দিরে
ছিলে তুমি কুলদেবী।
অবরোধ ভাঙি কে করিল তব—
এ হেন বিকৃত ছবি?
নবনী অধিক সুকোমল করি
বদনে গুণ্ঠন ছিল,
তুলি আবরণ ধরণীর ধূলি
কে তায় মাথায়ে দিল?
অবলা হইয়ে ছিলে প্রাণময়ী
কে দিল অধরে ভাষা?
অধীনা হইয়া ছিলে দয়াময়ী,
কে দিল বিলাস আশা?

অদৃশ্য হইয়া আকাশ কুসুম
ছিলে তুমি এ ধরায়,
প্রকাশ করিয়া কে রাখিল তোরে
পথের প্রাচীর গায় ?

৩

নিশার কুসুম, উঠিতে শিহরি,
তারার আলোক হেরি !
আপন বিকাশ, হেরিয়া আপনি
শরমে যাইতে মরি !
যৌবনের ভারে হইতে কাতর
কত অপরাধী তায় !
পতির অপাঙ্গ, সহিতে নারিতে,
ভাবিতে কতই দায় !
অঙ্গে অঙ্গে রূপ, পড়িত উছলি,
তবু দীন দরশন !
পুণ্য প্রতিকৃতি, পাপের ধরায়,
হীন জ্ঞান অনুক্ষণ !
পতির চরণে, হেরিয়া স্বরগ,
রহিতে জগত ভুলি !
তাহে মন প্রাণ, মিশায়ে রহিতে,
হইয়া চরণ ধূলি !

৪

ছিল বুকভরা, যেই অনুরাগ,
জানি না কি নাম তার,
নহে সে পীরিতি, নহে সে প্রণয়,
নহে প্রেম এ ধরার।
মানব হৃদয়ে, পারি না ভাবিতে,
কি ছিল সে প্রাণ তব !
ধরেছি হৃদয়ে, স্বরগ কল্পনা
সে কল্পনা দুরলভ !
জীবনে মরণে, জনমে জনমে
পতির চরণ সেবা !
মানবীর বুকে এ পূত কামনা
কল্পনা করিবে কেবা !

কে দিল ভাঙিয়া রমণী তোমার
প্রাণের সে ঘুম ঘোর !
ধরার ঈশ্বরী ছিলে, বঙ্গ নারি,
আজি একি দশা তোর !

৫

কি আলো হেরিতে, আসিলে বাহিরে
আঁধারে কি ছিল বাস ?
প্রাণের আলোক, ছিল যে ফুটিয়া
দু নয়নে বারমাস !
কি জ্ঞান লভিতে, আজ, বঙ্গনারি,
হইল তোমার আশা ?
শিখিবে নরের, অলীক জল্পনা
ত্যজিয়ে প্রাণের ভাষা !
জনম তোমার, স্নেহ মায়া দয়া
বিলাইতে এ ধরায়,
ধরিতে উদরে, মানবের কুল,
পালন করিতে তায়।
করুণা রূপিণী তুমি এ ধরায়,
প্রাণের প্রতিমা যেন !
হায়, অভাগিনি, আপনা ভুলিয়া
মানবী সাজিলে কেন ?

৬

সেজেছ কি বেশে, দর্পণ ধরিয়া
হের রূপ আপনার,
শান্ত প্রতিভা ছিল দেহ ভরা,
আজ বিনিময়ে তার—
ললাটে গরব, নয়নে চপলা,
অধরে উলঙ্গ হাসি,
কপোলে বিলাস, ভুরুতে ভঙ্গিমা,
চিকুরে তরঙ্গ রাশি।
সুকুমার তনু, "* * *" ত্রিভঙ্গ,
তবুও বাসনা তায় !
ললিত লাবণ্য আবৃত দেহের,
বসনের খোসা গায় !

৭

বাহ্য জগতের নহ তুমি—তুমি,
অন্তর্জগতের প্রাণী।
পুরুষের যশে, কি হেতু বাসনা,
তুমি হৃদয়ের রাণী।
জ্ঞানের জলধি, মন্থন করিয়া,
না হেরি প্রাণের সুখ,
আকুল হৃদয়ে, মানবের কুল
চাহিয়া তোমার মুখ।
অবনী ঘুরিয়া হতাশ নয়নে
ফিরিছে মানব ঘরে,
জীব জগতের, অমূল্য রতন—
রমণী স্নেহের তরে!
রমণী স্বভাবে, মানবের তুমি
জীবনের সার ধন!
ত্যজি সে প্রকৃতি, হারাইলে এবে,
দুর্লভ সে সিংহাসন!

৮

হায়, বঙ্গনারি, ভাঙিয়া পিঞ্জর,
উড়িলে আকাশে তুমি,
মিলিবে কি কভু, জীবনে তোমার
আশার আশ্রয় ভূমি?
কোথা পরিণাম, আশার তোমার,
ভেবেছ কি একবার?
আত্ম সুখ খুঁজি, কে কোথা ধরায়
পেয়েছে অবধি তার!
বুঝিতে সে যদি, পুরুষের বুকে
কি জ্বালা এ পিপাসার!
রমণি, রে তুমি, এ গরল সাধে
করিতে না পান আর।
হায়, অভাগিনি, শাখায় শাখায়,
ভ্রমিবে খুঁজিয়া স্থান!
পাপিয়ার মত, করুণ বিলাপে,
কাঁদায়ে কবির প্রাণ।

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাকার ও নিরাকারোপাসনা।

যে ঋষিরা শাস্ত্রে নিরাকারোপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারাই আবার সেই শাস্ত্রে কেন সাকারোপাসনার ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহা তত্ত্বপিপাসুদিগের অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বদেশের আচার ব্যবহারের প্রতি একান্ত বীতস্পৃহ ও পাশ্চাত্য ব্যবহারের একান্ত অনুরক্ত হইয়া পরিচ্ছদে, আহারে, আলাপে ও ব্যবহারে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত (metamorphosed) করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত আমার এ অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইবেন না, কারণ তাঁহারা অত্যন্ত স্বদেশ-বৎসল; নিজের স্বদেশীদিগকে সেই অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রীকদিগের ন্যায় সাকারোপাসনার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে দেখিয়া তাঁহারা নিতান্ত মর্ম্মাহত। এই ইচ্ছায় তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যাকুল যে, কেমন করিয়া এই দুর্দ্দশাপন্ন স্বদেশীদিগকে ঘোরতর অমার্জ্জিত অবস্থা হইতে সংস্কৃত করিয়া ইউরোপের সমতলে তুলিয়া লইবেন; তাদৃশ ব্যাকুল অবস্থায় প্রস্তাবিত আলোচনা সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের ভাল লাগিবে না, কিন্তু যদি তাঁহারা যোগ দেন, আমরা যথেষ্ট উপকৃত বোধ করিব।

আমি উপরে যে তত্ত্বপিপাসু শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, তাহা কেবল হিন্দু সমাজের তত্ত্বপিপাসুদিগকে লক্ষ্য করিয়া নহে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, কি বৌদ্ধ, তত্ত্বপিপাসু মাত্রেরই এ আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার আছে। আমি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহা ভ্রম-সঙ্কুল হইবার সম্ভাবনা আছে, কারণ একেত আমার অধ্যয়ন অল্প, তাহাতে আবার স্থানে স্থানে অর্থবোধেরও ব্যাঘাত না ঘটিয়াছে, এমত নহে। কেহ কৃপা করিয়া আমার ভ্রমের সংশোধন করিয়া দিলে, তিনি যে ধর্ম্মীই হউন না কেন, বিনীত ভাবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব। যাঁহারা নিজের পিতৃ-পিতামহ পরম্পরা হইতে ধারাবাহিকতা দ্বারা প্রাপ্ত উপাসনা প্রণালীর প্রতি মনঃ-সংযোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের এ বিতণ্ডার মধ্যে আসিবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা নানা ভাষা অধ্যয়নে নানা দেশ দর্শনে দ্বিবিধ উপাসনা প্রণালীর মধ্যে কোনটী শ্রেয়ঃ এই সমস্যায় দণ্ডায়মান, তাহাদিগের জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সাকার ও নিরাকারোপাসনা উভয়ই কি উত্তম? যদি উভয়টী উত্তম না হইয়া একটী হয়, তবে সে কোন্‌টী? ইহা জানিতে হইলে শাস্ত্র ও যুক্তিকে তন্ন তন্ন করিতে হইবে।

বেদ বলেন "একমেবাদ্বিতীয়ং।" কোরাণ বলেন "লা এলাহা এল্লেল্লা"। ইহার অর্থ এই যে, এক ঈশ্বর ব্যতীত কিছু নাই। এই উক্তি দুটী যখন মহামান্য শাস্ত্রদ্বয়ের শিরোভূষণ, তখন ইহার প্রতি কোন দোষারোপ হইতে পারে না। কিন্তু যদি ঈশ্বর ব্যতীত কিছু নাই, এই কথাই যদি সত্য হইল, তবে এই যে পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্ব দেখিতেছি, ইহা কি? উপরের মহাবাক্য অনুসারে হয় এ বিশ্ব নাই, নয় ইহা ঈশ্বর হইবে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন, জগৎকে মায়া বলিতে পার, কিন্তু মিথ্যা বলিতে পার না; বস্তুতঃ যে জগৎ এরূপ অসংখ্য দৃশ্যে ও সুখাসুখের বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহাকে আমরা মিথ্যা বলিতে পারি না, সুতরাং এ বিশ্বকেও ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে।

যদি এ মীমাংসা অভ্রান্ত হয়; তবে ঈশ্বরের সাকার নিরাকার দুটী রূপ স্বীকার করিতে হয়; তন্ত্রে যে বলিয়াছেন "এক এব পরং ব্রহ্ম স্থূল সূক্ষ্ম রূপদ্বয়ং" তাহারও সত্যতা রক্ষা হয়। এরূপ হইলে স্পষ্ট কথায় এইরূপ দাঁড়াইল যে, সেই সূক্ষ্ম ভাবকে নিরাকার ও স্থূলভাবকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া মানিতে হয়। স্থূল বিশ্ব-জ্ঞেয় ভাব; সূক্ষ্ম নিরাকার = অজ্ঞেয় ভাব। নিরাকার তাহার কোন নাম নহে, এবং উহার অর্থেরও উত্তম সঙ্গতি হয় না; তবে আজ কাল শব্দটা বড়ই প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া ঈশ্বরের সূক্ষ্মভাবের পরিবর্ত্তে ঐ শব্দ ব্যবহার করিতেছি।

তিনিই (ঈশ্বরই) যে এ বিশ্ব ইহা বেদান্তেও স্বীকার করা হইয়াছে; প্রশ্ন করা হয় যে, ঈশ্বর এ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ কি উপাদান কারণ, অর্থাৎ কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে, ঈশ্বর সেইরূপ আত্ম ব্যতিরিক্ত কোন পদার্থের দ্বারা এ বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন কিনা? তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, তিনি স্বয়ংই উভয়বিধ কারণ। এমত পাশ্চাত্য

Pantheism হইতে বিভিন্ন হইতেছে, কারণ বিশ্বসৃষ্টির দ্বারা তাঁহার স্বরূপের লোপ হয় নাই। গীতার ১০ম অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকে ভগবানও বলিয়াছেন "অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন, বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" অর্থাৎ আমি একাংশের দ্বারা জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি।

অতএব যুক্তি অনুসারে এ বিশ্ব যখন তিনিই, তখন সাকারোপাসনার সহিত নিরাকারোপাসনার পার্থক্য কৈ থাকিতেছে? এমত খণ্ডনের কোন উপায় আছে কি? ইহাতেও অভ্রান্তরূপে সম্পন্ন হইতেছে যে, যে কোন দ্রব্যের পূজা করিলেই, তাঁহার পূজা হয়; তবে সেই পূজার যে ত্রিবিধ ভাব আছে, তাহা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ২০, ২১, ২২ শ্লোকে অত্যন্ত বিশদ ভাষায় প্রকটিত হইয়াছে, যথা

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তংবিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধিসাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানা ভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তিসর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধিরাজসম্॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন কার্য্যেসক্ত মহৈতুকম।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥

লোক সকল যখন ত্রিগুণ প্রধান, তখন উপাসনা ত্রিবিধ হওয়া অনিবার্য্য; কোন কোন আধুনিক ধর্ম্মোপদেষ্টা রাজসিক ও তামসিক উপাসনাকে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহেন; কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, যেমন যে দণ্ডবিধি প্রত্যেক অপরাধের দণ্ডের বিধি করে নাই, তাহা অসম্পূর্ণ দণ্ডবিধি, সেইরূপ যে ধর্ম্মশাস্ত্র জনসাধারণের সকল প্রকার উপাসনা রুচিকে না বেষ্টন করিতে পারে, তাহাও অঙ্গহীন ধর্ম্মশাস্ত্র, জনসাধারণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র নহে, যে কেবল শ্রেণী বিশেষের ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

কোরাণিকেরা কোরাণ হইতে (বোত পূজাকে) সাকারোপাসনাকে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে কোরাণিক সমাজ হইতে সাকারোপাসনার বীজ একেবারে অপসারিত হয় নাই। উপাসনা প্রণালীর প্রতি মানুষের যে অনুরাগ জন্মে, তাহার হেতু শাস্ত্র-বিধি নহে। অর্থাৎ শাস্ত্রে বিধি থাকিলে অনুরাগ জন্মিবে, না থাকিলে জন্মিবে না, এরূপ নহে, উপাসনা প্রবৃত্তির প্রকৃত বীজ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে থাকে। হৃদয়ের ত্রিগুণত্ব যখন দুষ্পরিহার্য্য, তখন তুমি শাস্ত্রের ব্যবস্থার অপহ্নব করিয়া কি কল্যাণ সাধন করিতে পার, বল ত? যদি সংস্কার বশতঃ সাকারোপাসনা তোমার নিকট হেয়ই হয়, তথাপি বলাৎকারকে নিতান্ত হেয় অপরাধ জানিয়াও যখন দণ্ডবিধি বাধ্য হইয়া তাহার উল্লেখ করিয়াছে, তখন সাকারোপাসনা তোমার নিকট হেয় হইলেও যদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে সম্পূর্ণ করিতে তোমার অভিপ্রায় থাকে, তবে তাহাতে উহার উল্লেখ থাকা আবশ্যক, এবং তাহার সংজ্ঞা ও ক্রিয়াক্রম নিরূপিত থাকা চাই। কোরাণে সাকারোপাসনা নিসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জগৎ হইতে সাকারোপাসনার বীজ লুপ্ত হয় নাই। সময় সময় মুসলমান সমাজের ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগকে দণ্ড হস্তে লইয়া সাকারোপাসক মুসলমানদিগকে শাসন করিয়া বেড়াইতে হইতেছে, অনন্তকাল যে তাঁহাদিগকে এইরূপ করিয়া বেড়াইতে হইবে, কাল

তাহা তাঁহাদিগকে অবশ্য স্পষ্ট করিয়া দেখাইবে—ইহার হেতু ইহা নহে যে, লোক স্বভাবত কুপথগামী—হেতু এই যে বিশ্ব-রাজ্য সম্পূর্ণ হইতে চেষ্টা করে—গুণ সকল নাচিয়া নাচিয়া পুণ্য পথে পরিভ্রমণ করিতে চায়, মানুষ তাহার বাধা দেয়।

আমার এ উক্তি বিশ্বাস না হয়, খ্রীষ্টান সমাজ ও বৌদ্ধ সমাজের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিতে পাইবে, সেখানেও সাকারোপাসনা-প্রবৃত্তি শাসনের প্রতি পদাঘাত করিয়া নানা বেশে নানা কক্ষে বিরাজ করিতেছে। একটা যে কোন ক্যাথলিক গির্জায় প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে, কত আদরের সহিত তথায় সাকার ভাব উপাসিত হইয়া থাকে; একটা বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ কর, দেখিবে সাকারোপাসনা নিরাকারোপাসনাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজও সাকারোপাসনার বিরুদ্ধ; ব্রাহ্মেরা সাকারোপাসনাকে নিষ্ফল বালকের খেলা বোধ করেন; কিন্তু সাকারোপাসনার দ্বারা যে ধর্ম্মোন্নতি লাভ হয়, তাহা তাঁহারা হিন্দু খ্রীষ্টান বৌদ্ধ যে কোন সমাজে অনুসন্ধান করিলেই বিশ্বাস করিতে পারিবেন। সাকারোপাসনার যে হৃদয়ের কি মস্তিষ্কের বল কিছু অপহরণ করে, এবং নিরাকারোপাসনার তাহার পুষ্টি সাধন করে, ইহা কেহই বলিতে পারেন না, কারণ সাকার নিরাকার উভয় প্রকারের সমাজেই ধার্ম্মিক ও বীরপুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য বলি, সংস্কার বশতঃ নিরাকারোপাসনা তোমার নিকট শ্রেষ্ঠতর হইলেও, যেমন দেহের সুন্দর বর্ণকে আমরা উত্তম বলিয়া জানিয়াও সকল মানুষকে সুন্দর দেখিতে আশা করিতে পারি না, সাধুজীবন একমাত্র পবিত্র জীবন জানিয়াও সমগ্র মানব জাতিকে সাধুশীল দেখিতে আশা করি না, সেইরূপ নিরাকারোপাসনা তোমার নিকট উত্তম হইলেও, উহা মানবজাতির ধর্ম্ম হইবে বলিয়া আশা করিতে পার না।

মানবজাতির ধর্ম্ম নিশ্চয়ই অনন্তকাল পর্য্যন্ত গুণভেদে ত্রিবিধ থাকিবে ও শাখা প্রশাখায় বহুবিধ হইবে; তাহা নিবারণ করিতে ভূতলে কাহারও সাধ্য হইবে না, পঞ্চাশজন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কামান লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও মানুষ এ স্বভাব ছাড়িবে না। যাহারা মানুষের প্রকৃতি বুঝেনা—স্বাভাবিক পবিত্র সমাজ ভাঙ্গিয়া কৃত্রিম সমাজ স্থাপিত করিতে চায়; তাহারা কেমন করিয়া মানবজাতির ধর্ম্ম-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবে? কেমন করিয়া মানুষকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে?

আধুনিক সভ্যেরা সাকারোপাসকদিগকে একান্ত বর্ব্বর বোধ করেন, কিন্তু সাধনাবলে তত্ত্বজ্ঞানের একটা ক্ষুদ্র রশ্মিও যাঁহার হৃদয়ে পড়িয়াছে, তিনি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় দেখিতে পাইবেন, সাকারোপাসক কেমন বর্ব্বর। গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই দুই প্রকার উপাসনার ভেদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দ্বাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ দুন্দুভিধ্বনির ন্যায় তাহার একটী অতি পরিষ্কার উত্তর দিয়াছেন; যথা—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

এ মর জগতে এরূপ কেহ আছে কি, যে প্রকৃতিস্থ থাকিয়া এ মতের প্রতিবাদ

করিতে পারে? যদি এ মত খণ্ডন করিতে না পারা যায়, তবে সাকারোপাসনার বিরুদ্ধের স্বরটা একটু মৃদু করিলে ভাল হয় না কি? শ্রীকৃষ্ণকে তুমি ঈশ্বর বলিয়া না মানিতে পার, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের অসংখ্য জটিল দুরধিগম্য বিষয়ে তিনি যেরূপ যুক্তি-যুক্ত উত্তর সকল প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতেও কি তোমার আপত্তি আছে? যাহার নিকট জ্ঞানে পরাস্ত হইতে হয়, তাহাকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করাটা ত মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। এ বিষয়ে আরও এই কথা বলা যাইতে পারে যে, নিরাকার পিতার বাৎসল্যে, নিরাকার পুত্রের ভক্তিতে, নিরাকার সখার সৌহার্দ্দে যাহার চিত্ত পুলকিত হয় না; নিরাকার মিষ্ট রসে যাহার রসনা পরিতৃপ্ত হয় না, নিরাকার সুগন্ধে যাহার নাসিকা প্রীত হয় না, নিরাকার স্পর্শপদার্থে যাহার স্পর্শেন্দ্রিয় জুড়ায় না, নিরাকার বীণাস্বরে যাহার কর্ণ শীতল হয় না, নিরাকার ঈশ্বরে সে কি প্রীতি লাভ করিতে পারে?

অথবা যদি সংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়া তোমার নিরাকার উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠতর উপাসনা প্রণালী বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে তাহাতেই বা লাভ কি? মীমাংসা কেবল কথায় রাখিলে ত চলিবেনা, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। নিরাকারোপাসনায় ধ্যান করিব কি? না, তোমার মতে ধ্যান সাধনার কোন অঙ্গ নহে! যদি ধ্যানকে সাধনার প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া স্বীকার না কর, তবে আমি আলোচনা পরিত্যাগ করি, কারণ শাস্ত্রের নানা স্থানে ইহার আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহার ফলোপধায়িতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণও পাইয়াছি; এক্ষণ তুমি উহার আবশ্যকতা অস্বীকার করিলে নীরব থাকাই আমার একমাত্র উপায়।

এই সকল কারণে সাকারোপাসনায় আমি কোন দোষ দেখিতে পাই না—সভ্য সমাজের বর্ব্বর তিরস্কারে আমি কাতর নহি, বিশেষতঃ গ্রীসের জুপিটার, প্লুটো প্রভৃতি ও কাবামন্দিরের হোবাল প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি সকলের সহিত আর্য্য-শাস্ত্রের দেবমূর্ত্তির গুরুতর পার্থক্য আছে; ক্রিয়াবান মহাপুরুষদিগের নিকট শুনিয়াছি, চক্রভেদ কালে উক্তমূর্ত্তি সকল সাধকের ধ্যান-যোগে নিজের দেহের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়; সুতরাং শাস্ত্রের মূর্ত্তিগুলিকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পার না। যদি তুমি কোন ক্রমেই সাকারোপাসনার সারবত্তা অনুভব করিতে না পার, তবে যেমন অর্দ্ধ জগৎ নাই বলিলে জগৎ লোপ হয় না, যেমন তেমনি থাকে, সেইরূপ তুমি সাকারোপাসনার ন্যায্যতা বুঝিলেনা বলিয়া সাকারোপাসনা অন্যায় হইবেনা, উহা যেমন ন্যায় তেমনি থাকিবে।

ধর্ম্ম বিষয়ের অনুসন্ধান আজ নূতন হইতেছে না। উত্তম বুদ্ধির আবির্ভাব যে এই ঊনবিংশ শতব্দীতেই হইয়াছে, পূর্ব্বে ছিলনা, তাহার কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; বরঞ্চ উত্তম বুদ্ধি লাভের জন্য যে পূর্ব্বপুরুষেরা নানাবিধ কঠোরতা স্বীকার করিতেন, শাস্ত্রে তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ পাওয়া যায়। যীশু মহম্মদ উভয়েই পরম ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের পবিত্র হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে মানুষ উন্মত্ত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু যীশু মহম্মদের আবি-

র্ভাবের পূর্ব্বে একটা অতিশয় প্রকাণ্ড যুগ গিয়াছে, যখন ধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিতে হইলে ভক্তির সহিত প্রগাঢ় অধ্যয়নের যোগ থাকার আবশ্যক করিত। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভাষায়, গণিতে, ইতিহাসে, জ্যোতিষে, আয়ুর্ব্বেদে, ধণুর্ব্বেদে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তাহার পর দর্শনাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্র পড়িয়া তবে পিতামহেরা ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিতেন। এক্ষণ ধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিতে হইলে একটা গাউন, চাপকান বা এক জোড়া চসমা ও খান কয়েক বৈ কিনিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। পূর্ব্বে ধর্ম্মপথ অতিশয় দুর্গম ছিল; আহার, পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বিষয়ের অশেষবিধ কঠিন নিয়ম সকল পালন করিতে হইত—সংক্ষেপতঃ অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা তখন ধর্ম্মজীবন লাভ হইত; এক্ষণ তাহার তুলনায় কাল অতিশয় ঋজু, এখন ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিতে হইলে তপ জপ সাধন ভজনের বিশেষ আবশ্যক করেনা। এই কারণে পূর্ব্বে ধৃতধর্ম্মজীবন ব্যক্তিরা ক্রমে ক্রমে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিতেন—অর্থাৎ অবধূত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বে মধুর সদৃশ হইয়া অবস্থিতি করিতেন; এক্ষণকার ধর্ম্মবীরেরা কেহ সেরূপ অমৃত স্বরূপে বিরাজ করিতে পারেন কি?

উত্তম বুদ্ধি লাভের জন্য পিতামহেরা যে কত কষ্ট করিয়াছেন, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে, এক্ষণও প্রত্যেক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে যোগী ও পরমহংসদিগকে দেখিলে তাহার কিয়দংশ বিশ্বাস হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণ সাধনা পদ্ধতি লুপ্তপ্রায়, কিঞ্চিৎ যাহা ইতস্ততঃ আছে, তাহা পূর্ব্বের অবস্থার ভগ্নাবশেষ মাত্র। উত্তম বুদ্ধি লাভের আধুনিক ক্রম অধ্যয়ন ও দেশদর্শন; কলেজ হইতে পাঠ সমাধা করিয়া যেমন নির্গত হইল, অমনি পৃথিবী খানা ভ্রমণ করিয়া নানা দেশের আচার ব্যবহার দেখিয়া ফিরিয়া আসিল; অমনি তাহার বুদ্ধি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া গেল। কিন্তু এইরূপ কৃতবিদ্য, লব্ধবুদ্ধি পুরুষদিগের বহুতরকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ব্যবহারে তাহাদিগের কাম, ক্রোধ, লোভাদির কিছুই ন্যূনতা অনুভব করিতে পারি নাই।

পূর্ব্বে বুদ্ধি লাভের ক্রম অন্যরূপ ছিল। আহারের সহিত এক্ষণ ধর্ম্মের সংশ্রব অস্বীকৃত, কিন্তু আহার যে বুদ্ধি প্রবৃত্তির একটা অতি প্রবল নিয়ামক, তাহা পিতামহেরা জ্ঞানবলে অবলোকন করিয়া, আহার্য্য দ্রব্য সকলের বৃত্তি পুষ্টিতার শক্তি সকল সূক্ষ্মরূপে অবধারণ করিয়াছিলেন। পরিচ্ছদের আধ্যাত্মিক গুণ এক্ষণে কেহ স্বীকার করেন না, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষেরা তাহারও গুণাগুণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আজকালকার দিনে আমরাও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, সুরাপান করিলে চিত্তের যেরূপ অবস্থা হয়, দুগ্ধপানে সেরূপ হয় না; সর্ষপ তৈল ও তিল তৈলের গুণ একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত, কিন্তু তথাপি আহারের সহিত ধর্ম্মের সংশ্রব স্বীকার করিতে কেহ রাজি নহেন। আধুনিকেরা যাহা সুখাদ্য ও স্বাস্থ্যকর তাহাই উত্তম খাদ্য বলেন; যদি উত্তম স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিই জগতে বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে এ ব্যবস্থা দোষশূন্য বলিয়া গ্রহণ করিতাম, কিন্তু ঘটনায় ইহার অশেষ ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। পিতামহেরা খাদ্যকে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিন শ্রেণীতে

বিভাগ করিয়া যাহা সুবুদ্ধির পরিপোষক, তাহাকেই উত্তম খাদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; বিস্তার ভয়ে এস্থলে বিধির উল্লেখ করিলাম না।

একালের সহিত পুরাকালের বুদ্ধির ইতর বিশেষ নিরূপণ কল্পে শাস্ত্রপাঠে আরও জানা যায় যে, তখন ধ্যান ধারণার রীতি বিস্তারিতরূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে সে রীতি, যাঁহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অত্যন্ত বিরল। ব্যবহারে আমরা দেখিতে পাই যে, যে বিষয় আমরা সহজে বুঝি না, অনেক চিন্তা করিয়া পরে আবার তাহা বুঝিতে পারি। একটা কঠিন অঙ্ক বা অতিরিক্ত হঠাৎ পারি না, কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া পরে পারি; ইহাতে জানা যায় যে, চিন্তায় বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধি হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তির সকল দেশে সকল সমাজে আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চিন্তাশক্তিতে যাঁহারা এক্ষণে জগতে পূজিত, তাঁহাদিগের চিন্তার সহিত পুরাকালের যোগীজন সুলভ নিরুদ্ধ ধ্যানের কি উপমা হয়? চিত্তকে একাগ্র করিতে হইলে যে সকল পূর্ব্বক্রিয়া অপরিহার্য্য, তাহাতে এখনকার মনীষীদিগের আস্থা নাই, সুতরাং এক্ষণকার চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের চিন্তা প্রায়ই একাগ্রতা-শূন্য ও বিক্ষেপে পরিপূর্ণ। অতএব তত্ত্বনিরূপণের পক্ষে কোন্ চিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে অনুকূল, কোন্ মনে বুদ্ধির আবির্ভাবের সম্ভাবনা, তাহা পাঠকেরা বিচার করিবেন। যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ঋষিরা ধ্যানযোগে ব্রহ্ম বিষয়ক শব্দ বা রূপেরই ধ্যান করিতেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। শাস্ত্রের নানা স্থানে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁহারা তত্ত্ব-বিষয় লইয়াও ধ্যান করিতেন; তাঁহাদিগের যে সকল অখণ্ডনীয় মীমাংসা শাস্ত্রকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সমস্তই প্রায় ধ্যানের দ্বারা অবধারিত। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সেই সময়ের লোকের বুঝিবার শক্তি অধিক ছিল, কি এক্ষণকার লোকের শক্তি অধিক হইয়াছে। চেষ্টার প্রণালীতে যখন স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ দেখা যাইতেছে, তখন ফলে কি তাহার কিছু তারতম্য হইবে না?

দর্শন ও যোগশাস্ত্র পাঠে এরূপ বহুতর মীমাংসা পাওয়া যায়, যাহার সত্যতা অনুভব করিতে আমাদিগের সামর্থ্য হয় না। কি প্রকারে মহর্ষিরা সেই সকল মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহার কোন সূত্র বা পন্থা আবিষ্কার করা যায় না—শাস্ত্রের অন্য স্থানে এবম্প্রকার মীমাংসাকে যোগগম্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বুঝুন দেখি, ইহাতে আমরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিমান হইতেছি না মূর্খ হইতেছি। বালকেরা বলিতে পারে, ঋষিরা steam, electricity, magnetism, dynamics, hydrostatics সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সকল জানিতেন না। সাধনা দ্বারা যে সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি লাভ হয়, ইহা আমরা যে সকল নৈয়ায়িকের জুতা বহিবার যোগ্য নহি, এমন বহুতর দুর্দ্ধর্ষ নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করিয়াছেন; গীতায়ও এই মীমাংসা ঘোষিত হইয়াছে।

> "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
> তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধেঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥"

সিদ্ধপুরুষেরা প্রশ্ন করিলেই ধ্যানে জানিয়া তাহার উত্তর করিতে পারিতেন,

ইহা শাস্ত্রের বহুস্থানে প্রকাশ আছে। বিনা প্রশ্নেও ধ্যানের দ্বারা যে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়; সুতরাং তাঁহাদিগের জ্ঞানের সীমা যাহারা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা দেহে ৭ সাত ফুট লম্বা ও বিদ্যায় Wrangler হইলেও দুগ্ধপোষ্য বালক শব্দে বাচ্য। বিশেষতঃ জ্ঞানের মধ্যে কোন্ জ্ঞান উত্তম, এই বিষয় যখন মহাপুরুষদিগের নিকট, প্রশ্ন করা হইয়াছে, তখন উত্তরে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অধ্যাত্ম-জ্ঞানই জ্ঞান, অন্য সমস্ত অজ্ঞান।

যে কালে একাধারে প্রগাঢ় অধ্যয়নের সহিত পবিত্র রাগানুগা ভক্তির অবস্থিতি ছিল; যে কালে বিশুদ্ধ যোগমার্গে অবস্থিতি করিয়া, তটস্থ লক্ষণ অতিক্রম করিয়া স্বরূপ লক্ষণে অধিরোহণ পূর্ব্বক নিরুদ্ধ ধ্যানের দ্বারা তত্ত্ব সকল অবধারিত হইত, আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সেই পুণ্যযুগের অমৃত ফল। এই জন্য ঋষিদিগের ধর্ম্মমত কূটতর্কে উড়ে না, যত তর্ক কর, তত আরও পরিষ্কার হয়। এমন একখানিও মূল শাস্ত্র দেখিলাম না, যাহাতে অসাধারণ তর্কের ছটা দেখিতে পাইলাম না। যেমন ব্যূহ দ্বারা সৈন্য সকল সংরক্ষিত হয়, পিতামহদিগের ধর্ম্মমতও সেইরূপ অসংখ্য ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রের দ্বারা পরিরক্ষিত। সেই শাস্ত্রের শিষ্যদিগকে Pagan, Idolator, কাফের বলিয়া অবোধ জগৎ উপহাস করে, কিন্তু যাহারা বিধি অনুসারে শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করে, অথবা উপদেশ অনুসারে ক্রিয়ার আশ্রয় লয়, তাহারা কখনই ঋষিদিগের সিদ্ধান্তের প্রতি দোষখ্যাপন করিতে পারে না। যাহারা বিধি লঙ্ঘন করিয়া শাস্ত্র পাঠ করে, তাহারা শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। অনুবাদ পড়িয়া যাহারা শাস্ত্র জানিতে চেষ্টা করে, তাহারা অনুবাদকেরই বুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

ইউরোপ বিদ্বান হইলেও বয়সে অত্যন্ত তরুণ। মানুষের সুখভোগে তৃপ্তি না হইলে যেমন ধর্ম্মবিষয়ে মতি হয় না, জাতির সম্বন্ধেও সেই নিয়ম সত্য। এক্ষণে ইউরোপের সুখ-ভোগের অবস্থা, এই অবস্থার পরিণতি হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ধর্ম্ম পিপাসার উদয় হইবে, তাহার বিলম্ব আছে; সুতরাং এক্ষণে ইউরোপের নিকট জড় জগতের ভোগ বিষয়ক উপদেশ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ কিসে সুন্দর, পুষ্ট, দ্রুতগামী, ক্ষিপ্রকারী হওয়া যায়, এই সকল স্থূলবিষয়ে ইউরোপ উপদেশ দিতে সমর্থ। কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি, ভোগের অত্যন্ত বিরুদ্ধ, তাহাতে আপনাকে ক্ষুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর করিতে হয়, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় যাইতে হয়, ইউরোপের এক্ষণে সে দিকে মতি হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং যাহারা এক্ষণে ইউরোপের নিকট অধ্যাত্ম বিষয়ের উত্তম সংবাদ অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারা প্রতারিত হইবেন।

পাঠকেরা এক্ষণে বিবেচনা করুন, কোন্ পথ শ্রেষ্ঠ। যে শাস্ত্র সাকার নিরাকারের সামঞ্জস্য করিয়া উভয় মতকে সমভাবে বক্ষে ধারণ করিয়াছে, সেই শাস্ত্র মানব-ধর্ম্ম শাস্ত্র হইবে, কি এক দেশদর্শী নিরাকারবাদের শাস্ত্র মানবধর্ম্ম শাস্ত্র হইবে। যে শাস্ত্র উদারতায় গগন পর্য্যন্ত বিস্তারিত এবং প্রকৃতিতে প্রচার ও গোপনের সন্ধি-

স্থানে অবস্থিত, তাহাই মানুষের ধর্ম্মশাস্ত্র হইবে, কি সেই শাস্ত্রের একটী শাখা!— সাকারবাদের দোষারোপ-বৃত্তি হইতে যাহার উৎপত্তি, প্রচার দ্বারা ভজাইয়া বুঝাইয়া যাহার বিস্তার লাভের ভরসা, সেই শাস্ত্র মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইবে।

সাকারবাদের প্রকৃত তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিলে ধৃতব্রত হইয়া শাস্ত্র পাঠের দ্বারা উহা বিস্তারিত রূপে অবগত হইতে পারেন। আমরা দেহী, দেহীর ভাব বুঝিতে আমাদিগের স্বাভাবিক যোগ্যতা আছে; যদি নিরাকার অর্থাৎ অশরীরী হইতাম, নিরাকারোপাসনা আমাদিগের সুসাধ্য হইত। যদি যোগবলে এই পরিদৃশ্যমান দেহকে সূক্ষ্মত্বে পরিণত করিতে পারি, তাহা হইলেও নিরাকারোপাসনায় আমাদিগের অধিকার জন্মিতে পারে। এজন্য সাধারণতঃ যে সকল লোকে নিতান্ত ক্রিয়াহীন হইয়াও নিরাকার ভজিব বলিয়া ধাবমান হইতেছে, তাহারা উত্তম পথ ধরিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। আমার বরঞ্চ ইহাই বিশ্বাস যে, তাহারা সাকার পরিত্যাগের সহিত সাধ্যপথ পরিত্যাগী করিতেছে। তবে সহস্রের মধ্যে এরূপ কেহ থাকিতে পারেন, যিনি পূর্ব্বকর্ম্ম ফলে জন্মিয়াই সূক্ষ্মপথের অধিকারী; কিন্তু সেরূপ স্থল অত্যন্ত বিরল বলিয়া সাধারণের জন্য সূক্ষ্মপথ নিরূপিত হইতে পারে না।

যে সকল আধুনিক ক্ষুদ্র জ্ঞানীরা সাকারের মত পরিত্যাগ করিয়া নিরাকারের মত আশ্রয় করিয়া আপনাদিগকে দৈত্যবিজয়ী বীর পুরুষ মনে করেন; ইহা শুনিয়া হয়ত তাঁহাদিগের হৃৎকম্প হইবে যে জ্ঞান প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক কালে পরমপদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। "জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য পশ্চাৎ জ্ঞানং পরিত্যজেৎ" শ্লোকের দ্বারা ঋষিরা তাহাও ত্যজ্য পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূল কথা এই যে, ঋষি না হইতে পারিলে, ঋষিদিগের উক্তি পরিগ্রহ করা যায় না। আমরা নিতান্ত আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর লইতে লইতে যাই, তাই শাস্ত্রের পদে পদে অসঙ্গতি দেখিয়া বিস্ময়ের অকূল সাগরে হাবুডুবু খাইয়া মরি। অধিকারীভেদে, উপদেশের ভেদ, ক্রিয়ার ভেদ, আর্য্যশাস্ত্রের একটা সুদৃঢ় ভিত্তি। কিন্তু নব্য সম্প্রদায় পাশ্চাত্য সাম্যের পতাকা ধরিয়া এ নীতিকে অতিশয় কুৎসিত মনে করেন। তাঁহারা ভাবেন, সাম্যনীতিটা ইউরোপের একটা মহামূল্য আবিষ্কার, যাহা সেই সাম্যনীতি বিরুদ্ধ, তাহা নিশ্চয়ই কদর্য্য। কিন্তু সাম্যনীতিটা কোন নূতন নীতি নহে। গীতার ৫ম অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে জ্ঞানযোগের উপদেশ দিতে দিতে বলিয়াছেন।

"ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥"

এ যে সময়ের কথা, তখন আধুনিক ইউরোপের জন্মও হয় নাই; এ সাম্যের নিকট ইউরোপের সাম্য, দীপ্ত মার্ত্তণ্ডের নিকট খদ্যোত সদৃশ। যাঁহারা এ সাম্যের তাৎপর্য্য বুঝেন, এবং কার্য্যত অনুসরণ করিতে পারেন, তাঁহারা নিজের বিদ্যমানতার দ্বারা বিশ্বের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তুমি ভাব, সাম্যের মানে সকল মানুষকে

একভাবাপন্ন করা, স্ত্রী পুরুষকে সমস্বাধীনতা দেওয়া—এ নীতি কি জগতের শান্তির পরিপোষক হইতে পারে? যাহা বিশ্বের শান্তির বিরোধী, তাহার হেয়তা লইয়াও কি তর্ক করিতে হইবে?

শ্রীগঙ্গেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শকাব্দ।

বিগত আষাঢ় মাসের নব্যভারতে "ঢাকার পুরাতন কাহিনী" শীর্ষক প্রবন্ধে (১) বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ মহোদয় (বোধ হয় কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতানুসরণ করিয়া) লিখিয়াছেন, "কনিষ্ক ৭৮ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যে অব্দ প্রচলিত করেন, তাহা শকাব্দ নামে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। খ্রীঃ ৮ম শতাব্দী হইতে হিন্দুগণ ঐ অব্দ পাটলরাজ শালিবাহনের নামে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।" ডাক্তার ভাণ্ডারকর এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা এই প্রবন্ধে শকাব্দ সম্বন্ধে তাঁহার মতের ও যুক্তির সারাংশ বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

ডাক্তার ভাণ্ডারকর বলেন যে, (২) অধ্যাপক ওলডেনবার্গের মতে কনিষ্কই শকাব্দের প্রবর্ত্তক। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই মত প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, (১ম) যে রাজবংশে সর্ব্বশুদ্ধ তিনজন মাত্র রাজা রাজত্ব করেন, সেই রাজবংশ কর্ত্তৃক একটি শক বা অব্দ চিরস্থায়ী হইতে পারে না। উদাহরণস্থলে আমরা গুপ্ত-বংশের উল্লেখ করিতে পারি। উক্ত বংশে সাত জন রাজা হন ও তাঁহারা ১৫০ বর্ষাপেক্ষা অধিক দিন রাজত্ব করেন; কিন্তু তথাপি তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত অব্দ কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বিলুপ্ত হয়।

(২য়) শকাব্দ ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। কিন্তু কনিষ্কের প্রস্তরলিপির খোদিত অক্ষর গুলি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অপেক্ষা অনেক উত্তরকালীন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কনিষ্কের ৭৮ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ ও শকাব্দ প্রবর্ত্তন সম্ভবপর নহে।

(৩য়) কনিষ্কের শাসনপ্রভাব যে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রদেশে পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এরূপ কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু শকাব্দ বা শককাল অতি প্রচীন কালেও দাক্ষিণাত্যে বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রদেশে ব্যবহৃত হইত।

(৪) গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের সুবর্ণমুদ্রাগুলিও ইণ্ডোসিথিয়ান (Indoscythean) বা ভারতের শকজাতীয় রাজবংশের সুবর্ণমুদ্রা পরীক্ষা করিলে উক্ত রাজবংশদ্বয়ের সমসাময়িকতা প্রমাণিত হয়। কারণ, গুপ্তবংশীয় সুবর্ণমুদ্রা ও তৎখোদিত অক্ষরগুলি ইণ্ডোসিথিয়ান্ রাজবংশের সুবর্ণমুদ্রার অবিকল প্রতিরূপ মাত্র। উক্ত গুপ্তবংশ খ্রীঃ ৩১৯ অব্দে রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়। শক

(১) ১২৯৭ সালের নব্যভারত ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

(২) Vide Bhandarkar's Early History of Deccan, part VI.

বা ইণ্ডোসিথিয়ান্ বংশীয় কনিষ্ক, হুষ্ক, ও বাসুদেব এই তিনজন নৃপতির মধ্যে বাসু-দেবের রাজত্বকাল। কনিষ্ক ৭৮ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনারূঢ় হয়, এই কথা স্বীকার করিলে ১৭৮ খ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ এই বংশ স্থাপিত হইবার প্রায় এক শত বৎসর পরে সমাপ্ত হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কারণ বাসুদেবের শেষ প্রস্তরলিপিতে ৮৯ অব্দের (এই অব্দ কনিষ্ক প্রবর্ত্তিত) উল্লেখ আছে। তাহা হইলে গুপ্তবংশীয় প্রথম নরপতি ও ইণ্ডোসিথিয়ন্ বংশীয় শেষ নৃপতির মধ্যে ১৪০ বৎসরের অন্তর হইয়া পরে। কিন্তু এই গুপ্তবংশীয় সুবর্ণমুদ্রার সহিত ইণ্ডো-সিথিয়ান্ বংশীয় নৃপতিগণের সুবর্ণমুদ্রার এত অধিক নিকট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় যে, ঐ উভয় মুদ্রার মধ্যে ১৪০ বৎসর অপেক্ষা অনেক কম অন্তর ছিল বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

ডাক্তার ভাণ্ডারকর গুপ্তবংশ স্থাপনের কাল ৩১৯ খ্রীঃ অব্দ নির্ণয় করিয়াছেন। এবিষয়ে আলবিরুণির সহিত তাঁহার মতের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তাঁহার মতে ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তবংশ স্থাপিত ও গুপ্তকাল বা গুপ্তাব্দ আরম্ভ হয়। কিন্তু আলবিরুণী লিখিয়া গিয়াছেন যে, ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত-কাল বা গুপ্তাব্দ আরম্ভ ও গুপ্তবংশ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জেনারেল ক্যানিংহাম ও স্যার ই, ক্লাইব বেলী প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, গুপ্তকাল ৩১৯ খ্রীঃ অব্দের প্রায় ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। এই সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য ডাক্তার ভাণ্ডারকর স্বীয় গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টে (১) বিংশতি পৃষ্ঠাব্যাপী যে যুক্তি-পূর্ণ সুদীর্ঘ বিচার ও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল।

খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গিজনীর সম্রাট্ সুলতান মামুদ গুজরাট্ আক্রমণ করেন; সেই সময় আলবিরুণী নামক জনৈক আরব দেশীয় পণ্ডিত তাঁহার সহিত ভারতে আগমন করেন। তিনি সে সময় ভারতের যেরূপ অবস্থা দেখেন, তাহা স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, সে সময়ে কাঁমোজে গুপ্তাব্দ ও সৌরাষ্ট্রদেশে বল্লভী নামক অব্দ প্রচলিত ছিল; এবং এই দুই অব্দের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। তাঁহার এই কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। কারণ বল্লভী নৃপতিগণ পূর্ব্বে গুপ্তবংশের অধীনে থাকিয়া গুপ্তাব্দ ব্যবহার করিতেন। গুপ্তবংশের বিনাশের পরেও তাঁহারা গুপ্তাব্দই ব্যবহার করিতে থাকেন। আল্-বিরুণীর মতে শকাব্দের ২৪১ বৎসর পরে অর্থাৎ ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তাব্দ আরম্ভ হয়। তিনি বলেন যে, গুপ্তাব্দ নিরূপিত করিতে হইল শকাব্দের সংখ্যা হইতে ঘনছয় ও বর্গপাঁচের সমষ্টি (৬+৫) ২৪১ বাদ দিতে হয়। তারপর নিম্নলিখিত উদাহরণ দিয়া এই নিয়মের স্পষ্টীকরণ করিয়াছেন। উদাহরণ যথা:—৯৫৩ শকাব্দে বা ১০৩১-খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ আলবিরুণীর ভারতে অব-স্থান কালে ৭১২ গুপ্তাব্দ (৯৫৩—২৪১ = ৭১২) ছিল।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, গুপ্তাব্দ সম্বন্ধে আল্‌বিরুণীর মত ভ্রমশূণ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে

(১) Bhandarkar's Early History of Deccan. Appendix A.

অনেকেই তাঁহার কথায় আস্থা প্রদর্শন করেন না। এই নিমিত্ত ডাক্তার ভাণ্ডারকর আল্‌বিরুণীর কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য ৯টি বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে এস্থলে ২।১ টির উল্লেখ করিতেছি।

(১ম) এরন নামক স্থানে বুদ্ধগুপ্তের (ইনি গুপ্তবংশীয় শেষ নৃপতি) একটী প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহার তারিখ "গুপ্তাব্দ ১৬৫ আষাঢ়মাসের শুক্ল-পক্ষীয় দ্বাদশী বৃহস্পতিবার"। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে, ১৬৫ গুপ্তাব্দে (১৬৫ + ২৪১ = ৪০৬) শকাব্দ (বা ৪৮৪ খ্রীঃ অঃ) হয়। আল্‌বিরুণীর মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ৪০৬ শকাব্দের আষাঢ়মাসের শুক্লদ্বাদশী তিথিতে বৃহস্পতিবার হওয়া উচিত। ডাঃ ভাণ্ডারকর তাঁহার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক 'কেরুলক্ষ্মণ ছত্রে'কে সেদিন কোন্‌ বার ছিল, তাহা গণনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধে, অধ্যাপক 'ছত্রে' গণনা করিয়া বলেন যে, ৪০৬ শকাব্দের আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে বৃহস্পতিবার ছিল। আল্‌বিরুণীর মত ভ্রান্ত হইলে, সেদিন কথনই বৃহস্পতিবার হইত না।

(২য়) গুপ্তগণের নামাঙ্কিত মুদ্রাদৃষ্টে বোধ হয় যে, তাঁহারা সোরাষ্ট্রের সত্রপ (Satrap) রাজাদিগের পরে প্রাদুর্ভূত হন (১)। সত্রপবংশের শেষ প্রস্তরলিপিতে ৩০৪ অব্দের উল্লেখ আছে। যাঁহারা মহারাষ্ট্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস কিঞ্চিৎ মাত্রও অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, সত্রপগণ শকাব্দ ব্যবহার করিতেন। ৩০৪ শকাব্দে খ্রীষ্টীয় ৩৮২ অব্দ হয়। গুপ্তবংশের তৃতীয় নৃপতি চন্দ্রগুপ্তই সত্রপবংশের মূলোৎপাটন করেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ চন্দ্রগুপ্তের রোপ্যমুদ্রাগুলির সহিত সত্রপবংশীয় মুদ্রার সর্ব্বাংশের অবিকল সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং সত্রপবংশ ধ্বংশকারী চন্দ্রগুপ্ত ৩০৪ শকাব্দের কয়েক বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

চন্দ্রগুপ্তের শেষখোদিত লিপিতে ৯৩ গুপ্তাব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আল্‌বিরুণীর মত ভ্রান্ত হইলে চন্দ্রগুপ্ত ৩৮২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন। অর্থাৎ তাহা হইলে ৩৮২—৯৩ = ২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তাব্দ আরম্ভ ও ৯৩ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ (২৮৯ + ৯৩ = ৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দ), চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগ হয়। জেনারেল ক্যানিংহাম ও স্যার ই, ক্লাইব বেলীর মত (১) সত্য হইলে ৯৩ গুপ্তাব্দে যথাক্রমে ২৬০ ও ২৮৩ খ্রীষ্টাব্দ হয়; এবং সত্রপগণের বিনাশের যথাক্রমে ১১৮ ও ৯৫ বৎসর পূর্ব্বে গুপ্তগণের প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু গুপ্তগণ যে সত্রপগণের পরবর্ত্তী, তাহা পুরাতত্ত্ববিৎ মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তাব্দ আরম্ভ হয়, এ কথা স্বীকার না করিলে, এ বিরোধের মীমাংসা হয় না। কারণ তদ্ভিন্ন ৩৮২ খ্রীঃ অব্দের (৩০৪ শকাব্দের) পরে সত্রপবংশ ধ্বংশ ও ৯৩ গুপ্তাব্দে বা ৪১২ খ্রীঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব শেষ হওয়া সম্ভব হয় না।

পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধগুপ্তের ১৬৫ গুপ্তাব্দের প্রস্তরলিপি, ও চন্দ্রগুপ্তের ৯৩ গুপ্তাব্দের

(১) "ঢাকার পুরাতন কাহিনী" প্রবন্ধ দেখ।

(১) কানিংহামের মতে ১৬৭ খ্রীঃ অঃ ও ক্লাইব বেলীর মতে ১৯০ খ্রীঃ অঃ গুপ্তাব্দ আরম্ভ।

খোদিত লিপি প্রমাণিত করিয়া দিতেছে যে, গুপ্তাব্দ গুপ্তবংশ বিনাশের পরে আরম্ভ না হইয়া, উক্তবংশ স্থাপনের সময়েই উহা আরম্ভ হইয়াছিল। এ বিষয়ে আল্‌বিরুণী যে ভুল করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের দোষ নহে। হিন্দু জ্যোতির্ব্বিৎগণের কথার উত্তর নির্ভর করায় তিনি ভ্রমে পতিত হইয়া ছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কনিষ্কের মুদ্রার সহিত গুপ্তবংশীয় মুদ্রার এত অধিক নিকট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় যে, কনিষ্ককে গুপ্ত নৃপতিগণের সমকালবর্ত্তী বা ৩১৯ খ্রীঃ অব্দের সমীপবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। অতএব, প্রোঃ ওল্‌ডেবার্গের মত কোনও ক্রমেই বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কারণ, কনিষ্ক খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়া শকাব্দ (যাহা খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছিল, প্রবর্ত্তিত করিলেন কিরূপে? এই সকল যুক্তি দেখাইয়া ডাঃ ভাণ্ডারকর বলেন যে, শকাব্দ কনিষ্ক প্রবর্ত্তিত নহে।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

ওঁ

ব্রহ্মময়ী স্তোত্রম্।

শাশ্বতি শঙ্করি ভুবনবিধাত্রি !
ভক্তকৃপাময়ি শিবপদদাত্রি !
জননি বরাভয়শোভিতহস্তে !
জয় জয় ভগবতি দেবি নমস্তে ॥ ১ ॥

হে সনাতনি শঙ্করি! হে বিশ্ববিধাত্রি! হে ভক্তকৃপাময়ি! হে শিবপদপ্রদায়িনি! জননি! তুমি এক হস্তে বর, এবং অপর হস্তে অভয় ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছ; জয় দেবি ভগবতি! তোমারি জয়; তোমাকে নমস্কার। ১।

সর্ব্বজগন্ময়ি সাধকসাধ্যে !
দীনদয়াময়ি পরমারাধ্যে !
তত্ত্বং জ্ঞাতুং প্রভবতি কস্তে
জয় জয় ভগবতি দেবি নমস্তে ॥ ২ ॥

হে সর্ব্বজগন্ময়ি! প্রকৃত ভক্তেই তোমার সাধনা করিতে পারে; হে দীনদয়াময়ি! হে পরমারাধ্যে! কে তোমার স্বরূপ জানিতে পারে? জয় দেবি ভগবতি! তোমারি জয়; তোমাকে নমস্কার। ২।

ব্রাহ্মি মহেশ্বরি বৈষ্ণবি শক্তে !
কুরু ময়ি করুণাময়ি তব ভক্তে।
ত্বমসি গতিঃ কিল জগতি সমস্তে
জয় জয় ভগবতি দেবি নমস্তে ॥ ৩ ॥

হে ব্রহ্মশক্তি! হে বিষ্ণুশক্তি! হে মহেশ্বরশক্তি! হে করুণাময়ি! মাদৃশ ভক্তজনের প্রতি কৃপা কর; নিখিল জগতের তুমিই একমাত্র গতি; জয় দেবি ভগবতি! তোমারি জয়; তোকে নমস্কার। ৩।

তারা ব্রহ্মময়ী ক্ষরাক্ষরময়ী
[illegible]ন্ময়ী হৃন্ময়ী
বুদ্ধিস্ত্বং প্রতিভা [illegible]তিঃ স্মৃতিরসি
ত্বং জ্ঞানমিচ্ছা ক্রিয়া।
সৃষ্টিস্ত্বং স্থিতিরেব সংহৃতিরসি
ত্বং পঞ্চভূতাত্মিকা
ত্বং মায়া প্রকৃতিস্ত্বমেব জগতাং
মূলং হ্যমূলা স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

তুমি তারা ব্রহ্মময়ী (১); তুমি ক্ষর-

(১) 'তারা'—অর্থাৎ তারণকর্ত্রী;—যথা তন্ত্রসারে,—
"তারকত্বাৎ সদা তারা সুখমোক্ষপ্রদায়িনী।
উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা" ॥

স্বরূপা এবং অক্ষরস্বরূপা (২); তুমিই চিন্ময়ী ও হৃদয়ময়ী শক্তি; তুমি বুদ্ধি ও প্রতিভা; তুমি শ্রুতি ও স্মৃতি; তুমি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া; তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি ও ও সংহার; তুমিই পঞ্চভূত-প্রপঞ্চ; তুমিই মায়া ও প্রকৃতি; তোমার মূল নাই, অথচ তুমি সমস্ত জগতের মূল। ৪।

মায়াময়ং চক্রমতীব ঘোরম্
আরোপ্য ভূতান্যখিলানি শশ্বৎ।
প্রবৃত্তিমার্গেণ বিঘূর্ণয়ন্তীম্
সংসারধারাং ভবতীং নমামি ॥ ৫ ॥

তুমি নিখিল ভূতমণ্ডলীকে ঘোর মায়াচক্রে তুলিয়া প্রবৃত্তিমার্গে অবিরত বিঘূর্ণিত করিতেছ, তুমি সংসারধারারূপিণী, তোমাকে নমস্কার।

যথা নদী কাষ্ঠতৃণান্যশেষা-
ণ্যাদায় বেগাৎ জলধিং প্রয়াতি।
তথা ত্বমাদায় চরাচরাণি
ভূতান্যনন্তাভিমুখী প্রয়াসি ॥ ৬ ॥

স্রোতস্বতী যেমন সমস্ত তৃণকাষ্ঠাদি লইয়া মহাবেগে অনন্ত সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়, তুমিও তেমনি চরাচর ভূতগ্রামকে লইয়া অনন্তদেবের অভিমুখে চলিয়াছ। ৬।

সনাতনি ব্রহ্মবিভূতিমূর্ত্তে!
তবৈব রূপং প্রতিভাতি বিশ্বম্।
যথা জবায়াঃ স্ফটিকস্য ভিত্তিঃ
ত্বং ব্রহ্মণো বিশ্বমহো বিভর্ষি ॥ ৭ ॥

হে সনাতনি! পরব্রহ্মের বিভূতির বিকাসাবস্থাই তোমার মূর্ত্তি; এই বিশ্ব তোমারি মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইতেছে; যেমন স্ফটিকময় স্তম্ভ জবাপুষ্পের প্রতিবিম্ব ধারণ করে, তেমনি তুমি পরব্রহ্মের মূর্ত্তি নিজ গর্ভে ধারণ করিতেছ (৩)। ৭।

সুখমোক্ষপ্রদায়িনী ও তারণকর্ত্রী বলিয়া ব্রহ্মশক্তি 'তারা' নামে অভিহিত, এবং উগ্র অর্থাৎ ঘোর বিপদ হইতে ত্রাণ করায় 'উগ্রতারা' নামে অভিহিত।

(২) 'ক্ষর ও অক্ষর'; যথা গীতায়াম্,—
"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" ॥

অর্থাৎ যাহার বিকার আছে, সেই ব্রহ্মাদি-স্থাবরপর্য্যন্ত সমস্ত ভৌতিক শরীরকে 'ক্ষর' বলে, এবং যাহার বিকার নাই, সেই বীজস্বরূপকে 'অক্ষর' বলে।

(৩) এস্থলে প্রকৃতি স্ফটিকস্বরূপ, এবং ব্রহ্ম জবাপুষ্পস্বরূপ। প্রকৃতিমধ্যে ব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বকেই জীবাত্মা বলিয়া জানিবে। আবার, জীবাত্মার মধ্যে মনের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার নাম বন্ধ অর্থাৎ ভববন্ধন। মন বা মনোবৃত্তি প্রকৃতির একটী অবস্থা মাত্র। যেমন স্ফটিকের নিকট হইতে জবাপুষ্পকে অন্তরিত করিলে আর প্রতিবিম্বরূপ পৃথক্ পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মকে অন্তরিত করিয়া দেখিলে আর জীবাত্মারূপ পৃথক্ পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, সে জীবাত্মা তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মেই লীন হইয়া যায়। অর্থাৎ যাবৎ প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মের বিম্বানুবিম্বভাবে সম্বন্ধ দেখিবে, তাবৎ জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্বের উপলব্ধি হইবে; অদ্বৈতজ্ঞানে সেই প্রতিবিম্বভাব বিলয় পাইলে একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। এইরূপে জীবাত্মার অস্তিত্ববুদ্ধির লয় হইলেই ভববন্ধনের মোচন অর্থাৎ মহানির্ব্বাণ হয়। জীবাত্মার উপলব্ধি অর্থাৎ 'আমি সুখী, আমি দুঃখী'—ইত্যাকার জ্ঞান প্রতিবিম্ববৎ পদার্থ; এই জ্ঞান জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গেই লয় পায়।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" ॥

অর্থাৎ আমি চেতন, আমি করিতেছি,—এইরূপ প্রতীতি বুদ্ধির অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের পরিণাম মাত্র।

আদ্যাং যোগীশ্বরারাধ্যাং মহাবিদ্যাং সদাশিবাম্।
সিদ্ধেশ্বরীং সিদ্ধিদাত্রীং ভূতধাত্রীং নমাম্যহম্॥ ৮॥

তুমি যোগীশ্বরের আরাধ্যা আদ্যা শক্তি, তুমি সদাশিবা মহাবিদ্যা, তুমি সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধিদাত্রী ও ভূতধাত্রী; তোমাকে নমস্কার করি। ৮।

চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনয়নাং মহাকালস্বরূপিণীম্।
ব্যোমকেশীং ভবানীং ত্বাং ভূয়োভূয়ো নমাম্যহম্॥৯॥

তুমি মহাকালরূপিণী ভবানী; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি তোমার নয়ন, ব্যোম তোমার কেশ; তোমাকে বার বার নমস্কার। ৯।

ব্রহ্মমূর্ত্তিং ভগবতীং রাজরাজেশ্বরপ্রিয়াম্।
প্রত্যক্ষদেবতাং বন্দে বিশ্বসংসারমোহিনীম্॥১০॥

তুমি পরমৈশ্বর্য্যশালিনী ব্রহ্মমূর্ত্তি; তুমি রাজরাজেশ্বর বিশ্বেশ্বরের প্রাণবল্লভা; তুমি বিশ্বসংসারমোহিনী প্রত্যক্ষ দেবতা; তোমাকে নমস্কার। ১০।

সহস্রশীর্ষসম্পন্নাং সহস্রভুজশালিনীম্।
সহস্রচরণাং দেবীং সহস্রাক্ষাং নমাম্যহম্॥ ১১॥

তুমি সহস্র সহস্র শীর্ষে, সহস্র সহস্র হস্তে, সহস্র সহস্র চরণে এবং সহস্র সহস্র নয়নে শোভা পাইতেছ; তোমাকে নমস্কার। ১১।

সকলাভিঃ কলাভিস্ত্বাং সম্পূর্ণাং পূর্ণভূষণাম্।
পূর্ণানন্দময়ীং বন্দে পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণীম্॥ ১২॥

তুমি সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণা এবং পূর্ণ সজ্জায় বিরাজমানা; তুমি পূর্ণানন্দময়ী পূর্ণব্রহ্মরূপিণী; তোমাকে নমস্কার। ১২।

জ্ঞানশক্তির্ভগবতি ত্বমজ্ঞানবিনাশিনী।
অতোহসি কীর্ত্তিতা বেদে মহিষাসুরমর্দ্দিনী॥১৩।

হে ভগবতি! তুমি সেই স্বেচ্ছাময় ভগবানের সাক্ষাৎ জ্ঞানশক্তিরূপে মহামোহকে বিনাশ করিয়া থাক; এজন্য বেদে তুমি 'মহিষমর্দ্দিনী' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছ (৪)।১৩।

সর্ব্বদুর্গতিসংহর্ত্রি দুর্গে দুর্গমতারিণি।
মহাদেবমহাপীঠদেবতে তে নমোনমঃ॥১৪॥

হে সর্ব্বদুর্গতিহারিণি! দুর্গমতারিণি দুর্গে! তুমি মহাদেবরূপ মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তোমাকে বার বার নমস্কার (৫)। ১৪।

---

(৪) ভগবতী কাত্যায়নী মহিষাসুরকে বধ করিয়াছেন, এই পৌরাণিক রূপকের অর্থ এই যে,—পরব্রহ্মের জ্ঞানরূপা মহাশক্তির নাম কাত্যায়নী, এবং মহামোহের নাম 'মহিষাসুর'। ভগবানের জ্ঞানশক্তি অজ্ঞানকে বিনাশ করে বলিয়া উঁহার নাম 'মহিষমর্দ্দিনী'। যথা বরাহপুরাণে,—

"অথবা জ্ঞানশক্তিঃ সা মহিষোহজ্ঞানমূর্ত্তিমান্।
অজ্ঞানং জ্ঞানসাধ্যং তু ভবতীতি ন সংশয়ঃ॥
মূর্ত্তিপক্ষে চেতিহাসমমূর্ত্তে চৈকবন্ধৃদি।
ধ্যায়তে বেদবাক্যৈস্তু ইহ সা বেদবাদিভিঃ॥"

অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তির একটী নাম 'মহিষমর্দ্দিনী'। মূর্ত্তিমান্ অজ্ঞানকে 'মহিষ' বলে। অজ্ঞান যে জ্ঞানশক্তি দ্বারা বিনাশিত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যাঁহারা মূর্ত্তিবাদী, তাঁহারাই এ বিষয়ে পৌরাণিক ইতিহাস কল্পনা করিয়াছেন। আর, যাঁহারা ব্রহ্মবাদী, তাঁহারা বেদবাক্যানুসারে এই শক্তিকে ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি হইতে অভিন্ন ভাবিয়া থাকেন।

(৫) হরি অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্ব্বময়ী সর্ব্বশক্তির নাম দুর্গা, "সর্ব্বস্বরূপিণী শক্তিঃ সা দুর্গেতি চ পঠ্যতে", অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্বস্বরূপিণী শক্তিকেই দুর্গা বলে। যথা মুণ্ডমালায়াম্,—

"ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা
নরাঃ স্ত্রিয়শ্চাপি সুরাসুরাদ্যাঃ।
যদ্যদ্ধি দৃশ্যং খলু সৈব দুর্গা
দুর্গাস্বরূপাদপরং ন কিঞ্চিৎ॥"

অর্থাৎ সমস্ত ভূতমণ্ডলই দুর্গা, সমস্ত ভুবনমণ্ডলই দুর্গা; স্ত্রী, পুরুষ, দেব, দানব, মানবাদি সকলি দুর্গা; যাহা কিছু দৃশ্য,

নমামি সারদাং দেবীং বিজয়াং সর্ব্বমঙ্গলাম্।
মাহেশ্বরীং মহাশক্তিমভয়ামপরাজিতাম্॥ ১৫॥

হে দেবি! তুমি সারদা, বিজয়া ও সর্ব্বমঙ্গলা; তুমি মহেশ্বরের মহাশক্তি; তুমি অভয়া ও অপরাজিতা; তোমাকে নমস্কার। ১৫।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদাং ত্বাং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখাম্।
সর্ব্বেশ্বরীং সর্ব্বময়ীং সর্ব্বাণীং প্রণমাম্যহম্॥ ১৬॥

তোমার হস্ত ও পদ সর্ব্বত্রই প্রসারিত; তোমার চক্ষু, মস্তক ও মুখ সর্ব্বত্রই প্রসারিত; তুমি সর্ব্বাণী, সর্ব্বেশ্বরী ও সর্ব্বময়ী; তোমাকে নমস্কার করি। ১৬।

অনন্তশয্যাশয়নামনন্তসহবাসিনীম্।
অনন্তজগদাধারবিগ্রহাং ত্বাং নমাম্যহম্॥ ১৭॥

তুমি অনন্তদেবের সঙ্গিনী, অনন্তশয্যাশায়িনী, তোমার শরীর অনন্ত জগতের আধারস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। ১৭।

কালরাত্রিং মহাকালীং বন্দে ত্বাং কালকামিনীম্।
গিরন্তীমুদ্গিরন্তীং চ ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ॥ ১৮॥

তুমি কালরাত্রিরূপিণী, মহাকালের পত্নী মহাকালী; তুমি নিখিল ভূতগ্রামকে বারংবার গিলিতেছ ও উগারিতেছ; তোমাকে নমস্কার। ১৮।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তজগদ্যোনিমযোনিজাম্।
অখণ্ডমণ্ডলাকারব্যাপিনীং ত্বাং নমাম্যহম্॥ ১৯॥

তুমি আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত জগতের যোনি, কিন্তু স্বয়ং অযোনিজা; তুমি অখণ্ড মণ্ডলাকারে অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ; তোমাকে নমস্কার। ১৯।

অন্নপূর্ণাং মহামায়াং মহেশহৃদয়েশ্বরীম্।
যোগমায়াং যোগনিদ্রাং জগদ্ধাত্রীং নমাম্যহম্॥২০॥

তুমি অন্নপূর্ণা, মহামায়া এবং মহেশ্বরের হৃদয়েশ্বরী; তুমি জগদ্ধাত্রী, যোগমায়া এবং যোগনিদ্রা (৬); তোমাকে নমস্কার। ২০।

মাতঃ সাবিত্রি গায়ত্রি ব্রহ্মবিদ্যে পুরাতনি।
পূর্ণবিদ্যে নমস্তুভ্যং শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে॥২১॥

হে মাতঃ! তুমি সাবিত্রী ও গায়ত্রী; তুমি পুরাতনী ও ব্রহ্মবিদ্যা, তুমিই পূর্ণবিদ্যা; হে শিবে! হে সর্ব্বার্থসাধিকে! তোমাকে নমস্কার। ২১।

ত্বং মাতরচলানন্তাজরা বিশ্বম্ভরাক্ষরা।
ত্বং সুপ্তেঽপি জাগর্ষি মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী॥ ২২॥

জননি! তুমি অচলা, অনন্তা ও জরাবিরহিতা; তুমি অক্ষরা ও নির্ব্বিকারা; তুমি বিশ্বের পালনকর্ত্রী; হে ঈশ্বরি! সমস্ত ভূতগ্রাম বিলীন হইলেও তুমি মূলপ্রকৃতিরূপে জাগরিত থাক। ২২।

সে সকলি দুর্গা; দুর্গার স্বরূপ ছাড়া আর কিছুই নাই। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—

"দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা"॥

দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, পাপ, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, মহাব্যাধি, এই সকলকে দুর্গ বলে; যে নারায়ণী শক্তি এই সকল দুর্গ অর্থাৎ সঙ্কটকে বিনাশ করে, তাহাকেই দুর্গা বলে। "দুর্গং নিহন্তি যা নিত্যং সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা"।

অপিচ,—

"আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
যয়া জয়তি বিশ্বং চ যয়া সৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥
যয়া বিনা জগন্নাস্তি"—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে

সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী নারায়ণের আদ্যা শক্তি, যাহা দ্বারা বিশ্বকে জয় করা যায়, যাহা দ্বারা সৃষ্টি হয়, যাহা ছাড়া জগতের অস্তিত্ব থাকে না, তাহাকে দুর্গা বলে।

---

(৬) 'যোগনিদ্রা'—ব্রহ্মের পরমানন্দময়ী শক্তি। 'যোগমায়া'—ঈশ্বরের চিৎ-শক্তি, যাহা সর্ব্ব সঙ্কল্পের অধিষ্ঠান।

পঞ্চপ্রাণাত্মিকাং বন্দে প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবতাম্।
অব্যক্তাং মহতীং চৈব ভাবাভাবস্বরূপিণীম্ ॥২৩॥

তুমি প্রাণিগণের মধ্যে পঞ্চ প্রাণ রূপে অধিষ্ঠান কর, তুমি প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তুমি সূক্ষ্মরূপে (কারণরূপে) এবং তুমিই স্থূলরূপে (কার্য্যরূপে) বিদ্যমান আছ; তুমি ভাবস্বরূপা, এবং তুমিই অভাব-স্বরূপা, তোমাকে নমস্কার করি। ২৩।

ত্বাং বন্দে রাজসীং রক্তাং শ্বেতবর্ণাং চ সাত্বিকীম্।
তামসীং কৃষ্ণবর্ণাং চ ত্রিবর্ণাং ত্রিগুণান্বিতাম্ ॥২৪॥

তুমি রক্তবর্ণা রাজসী শক্তি, শ্বেতবর্ণা সাত্বিকী শক্তি, এবং কৃষ্ণবর্ণা তামসী শক্তি; তুমি ত্রিবর্ণা ও ত্রিগুণান্বিতা; তোমাকে নমস্কার। ২৪।

সূক্ষ্মমাত্মরসেনৈবাত্মানং পুষ্ণাসি মাতৃকে।
আত্মশক্ত্যৈব চাত্মানং প্রবর্ত্তয়সি নিত্যশঃ॥ ২৫॥

হে মাতৃকে! তুমি অলক্ষ্যভাবে আত্ম-রসেই আত্মাকে পোষণ করিতেছ, আত্ম-শক্তি দ্বারাই আত্মাকে নিত্য পরিচালিত করিতেছ (৭)। ২৫।

কান্তিং কীর্ত্তিং ধৃতিং মেধাং তুষ্টিং পুষ্টিং দয়াং রতিম্।
শান্তিং ক্ষান্তিং শুদ্ধিমৃদ্ধিং সত্যাং ত্বাং প্রণমাম্যহম্ ॥২৬

তুমিই বিশ্বের কান্তি, কীর্ত্তি, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, দয়া ও রতি; তুমিই শান্তি, ক্ষান্তি, শুদ্ধি, ঋদ্ধি ও সত্যস্বরূপা; তোমাকে নমস্কার করি। ২৬।

ভক্তিং ভুক্তিং চ মুক্তিং চ শ্রদ্ধাং প্রীতিং হ্রিয়ং ভিয়ম্।
প্রকাশাং চাপ্রকাশাং ত্বাং বিশ্বাধারাং নমাম্যহম্ ॥২৭

তুমিই ভক্তি; ভুক্তি ও মুক্তি; তুমি শ্রদ্ধা ও প্রীতি; তুমি লজ্জা ও ভয়; তুমি প্রকটরূপে এবং তুমিই অপ্রকটরূপে বিশ্বের আধারস্বরূপা; তোমাকে নমস্কার। ২৭।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপাং ত্বামবাঙ্মনসগোচরাম্।
ভূতসংযোগবিশ্লেষভবলীলাপ্রকাশিকাম্ ॥ ২৮॥

তোমার স্বরূপ অচিন্ত্য ও অব্যক্ত; তোমার মহিমা বাক্য ও মনের অগোচর; তুমি প্রতিক্ষণে পঞ্চভূতের সংযোগ ও বিশ্লেষ দ্বারা এই অপূর্ব্ব ভবলীলা প্রকাশ করিতেছ। ২৮।

অর্দ্ধনারীশ্বরাকারাং শিবশক্তিস্বরূপিণীম্।
পিতরং মাতরং চ ত্বাং জগতাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২৯॥

তুমি অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি (৮); তুমি শিব-

(৭) ব্রহ্মশক্তি ভগবতী প্রকৃতিদেবী আপনার রসেই আপনাকে পোষণ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি ইহারই রূপকমাত্র। ছিন্নমস্তা নিজদেহনিঃসৃত তিনটী শোণিতধারা নিজ মুণ্ডকেই পান করাইতেছেন। ঐ তিন শোণিতধারা দেহের প্রধান তিনটী নাড়ী হইতে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ তিন নাড়ীর নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। সুষুম্না সর্ব্ব-প্রধান, ইহা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপা। ইড়া নাড়ীর মধ্যে চন্দ্রের সঞ্চার, পিঙ্গলার মধ্যে সূর্য্যের সঞ্চার, এবং সুষুম্নায় চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের সঞ্চার। অর্থাৎ এই তিন নাড়ী চন্দ্রসূর্য্যাদি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য নাড়ীচক্রকে পোষণপূর্ব্বক জীবদেহ রক্ষা করিতেছে। এই রূপক দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, ত্রিগুণা প্রকৃতিদেবী চন্দ্র সূর্য্যাদিরূপ নিজ নাড়ী হইতে নিঃসৃত শোণিতাদিরূপ রসে সৃষ্টিপ্রবাহ পোষণ করিতেছেন।

(৮) এই অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তির চিত্রখানি স্থূলভাবে দেখিলে জ্ঞান হয়,—আধখানা প্রকৃতি ও আধখানা পুরুষ। কিন্তু সূক্ষ্ম-ভাবে দেখিলে সে ভেদ ঘুচিয়া যায়। স্থূল-দর্শীরা যে আধখানায় শুধু শক্তিমূর্ত্তি দেখেন, সূক্ষ্মদর্শীরা তাহার প্রত্যেক পরমাণুতেই দেখিতে পান,—শিবমূর্ত্তি জ্বলিতেছে। আবার, স্থূলদর্শীরা যে আধখানায় শুধু শিবমূর্ত্তি দেখেন, সূক্ষ্মদর্শীরা তাহার প্রতি পরমাণুতেই দেখিতে পান, শক্তিমূর্ত্তি জ্বলি-তেছে। এইরূপে, শিবে শক্তি ও শক্তিতে শিব, দুয়ে এক, ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি।

শক্তিস্বরূপা; তুমিই একাধারে জগতের পিতা মাতা; তোমাকে নমস্কার করি। ২৯।

ন দ্বৈতং নাসি চাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং ত্বমীশ্বরি।
ন শিবো নাপি শক্তিস্ত্বং শিবশক্তিস্বরূপিণী ॥ ৩০ ॥

হে ঈশ্বরি! তুমি দুইও নও, তুমি একও নও; তুমি দুয়ে এক। তুমি শিবও নও, তুমি শক্তিও নও, তুমি একাধারেই শিব-শক্তি। ৩০।

হিরণ্যগর্ভে ত্বদ্‌গর্ভে সত্যং জ্যোতিঃ প্রদীপ্যতে।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং ব্রহ্মমূর্ত্তিপ্রকাশিকে ॥ ৩১ ॥

হিরণ্যগর্ভে! তোমার গর্ভে সত্যস্বরূপ জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইতেছে; মাতঃ ব্রহ্মমূর্ত্তি-প্রকাশিকে! তোমাকে বারবার নমস্কার। ৩১।

নৌমি ভক্ত্যা মহাশক্তিমোঙ্কারব্রহ্মমাতৃকাম্।
প্রসীদ বরদে দেবি স্তোত্রেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ৩২ ॥

হে দেবি! তুমি মহাশক্তি, তুমি ওঙ্কার-রূপিণী ব্রহ্মমাতৃকা; আমি ভক্তিভাবে তোমার স্তব করিতেছি; বরদে! তুমি প্রসন্ন হইয়া এই স্তোত্রে অধিষ্ঠান কর। ৩২।

ওঁ প্রীয়তাং ব্রহ্মময়ী স্তোত্রেণানেন সা ময়ি।
শিবশক্তিময়ং স্তোত্রং ব্রহ্মার্পণমিদং কৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

ওঁ ব্রহ্মময়ী আমার এই স্তোত্রে প্রীত হউন; আমি এই শিবশক্তিময় ব্রহ্মময়ী-স্তোত্রটী ব্রহ্মে অর্পণ করিলাম (৯)। ৩৩।

স্তোত্রে মমাস্মিন্ যদমেধ্যবৎ স্যাৎ
অসত্যরূপং হ্যথবাঽপ্রকামম্।
অজ্ঞানতো মে যদশক্তিতো বা
মুকুন্দ! মন্দস্খলিতং ক্ষমস্ব ॥ ৩৪ ॥

হে নারায়ণ! আমার এই স্তোত্রে যদি কোনও অপবিত্রভাব প্রবেশ করিয়া থাকে, যদি অসত্যের ছায়া পতিত হইয়া থাকে, যদি বক্তব্য বিষয় অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা আমার অজ্ঞান ও অশক্তি বশতঃ বলিয়া ক্ষমা কর। ৩৪। শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

ইউরোপীয় মহাদেশ।

লুভ্রে (Louvre) সেইন নদীর তীরে পারিসের মধ্যে সকল প্রকারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দির। পূর্ব্বে এই স্থানে Lupara বা Louverie নামক বৃকাদি হিংস্র জন্তু পূর্ণ অরণ্য মধ্যে একটী মৃগয়া ভবন ছিল। ক্রমে লোকালয় হইলে

---

(৯) 'ব্রহ্মে অর্পণ' বা 'ব্রহ্মার্পণ';—

"ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে সম্প্রদীয়তে।
ব্রহ্মৈব দীয়তে চেতি ব্রহ্মার্পণমিদং পরম ॥ ১ ॥
নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা।
এতদ্ ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ২ ॥
প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥ ৩ ॥
যদ্বা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম" ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ যাহা কিছু দিবার আমাকে ব্রহ্মই দিতেছেন, আমিও ব্রহ্মকেই সম্প্রদান করিতেছি, আমি যাহা কিছু সম্প্রদান করিতেছি, সে সকলি ব্রহ্ম,—এইরূপ জ্ঞানকে 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। ১। আমি কিছুই করি না, সকলি ব্রহ্ম করিতেছেন, এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী ঋষিরা 'ব্রহ্মার্পণ' বলিয়া থাকেন। ২। এই কর্ম্মে সেই শাশ্বত ভগবান্ ঈশ্বর প্রীত হউন,—সদাই এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাকে 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। ৩। সমস্ত কর্ম্মফল ব্রহ্মেই সমর্পণ করিলাম,—ইহাকেই সর্ব্বোত্তম 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। (ইতি কূর্ম্ম-পুরাণে ৪র্থ অধ্যায়)।

পুরাতন বাটী ভাঙ্গিয়া তথায় বর্ত্তমান হর্ম্ম্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় (১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে)। লুভ্রের সকল ঘর একবার হন্ হন্ করিয়া ঘুরিয়া আসিতে দুই ঘণ্টা কাল সময় লাগে।

প্রথম তালা।—মিশরীয় মিউজিয়ম (Musee Egyptien)। ইউরোপের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। অতি প্রাচীন রাজা রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মূর্ত্তি ও ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী এবং নানাবিধ ভাস্কর কার্য্য এই সকল প্রকোষ্ঠে রক্ষিত। এই সকল আহরণ দ্বারা প্রাচীন মিশরীদিগের সভ্যতা, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ও শিল্পাদির ভাব সম্যক উপলব্ধি হয়।

এশিয়াটিক মিউজিয়ম (Musee des Antiquites Asiatiques.) বিখ্যাত প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদ্বয় M. Botta ও Sir H. Layard কর্ত্তৃক প্রাচীন আসিরিয়া রাজ্যের বহুতর ভাস্কর কার্য্যাদি নিনেভি ও অসুর (Ninevet & Assur) প্রদেশের ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হয়। ঐ সকল ঐতি-হাসিক সংগ্রহ ইংরেজ ও ফরাসির মধ্যে ভাগ হইয়া অর্দ্ধেক ব্রিটীশ মিউজিয়মে ও অর্দ্ধেক এই স্থানে রক্ষিত। তদ্ব্যতীত প্রাচীন ফিনিসীয় ও গ্রীকদিগের ভাস্কর কার্য্যাদি ও নানাবিধ ব্যবহার্য্য বস্তু অন্যান্য ঘরে স্থান রহিয়াছে।

—ইউরোপীয় প্রাচীন ভাস্কর কার্য্যের সংগ্রহ, (Musee des Marbres Antiques.) এই সকল ঘরে প্রাচীন গ্রীক ও রোমাণ সাম্রাজ্যকালের নানাপ্রকারের বিস্তর মর্ম্মর মূর্ত্তি রক্ষিত। তন্মধ্যে গ্রিসীয় Melos দ্বীপে আবিষ্কৃত ও তথা হইতে আনীত একটী ভিনস্ দেবীর মর্ম্মর মূর্ত্তি (Venus de Milo) ইউরোপের প্রতিষ্ঠার বিষয়। উহা বিশেষরূপে দেখিবার জন্য অনেকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমার চক্ষে কিন্তু কোনরূপ বিশেষত্ব ঠেকিল না, ইহা দ্বারা নিশ্চয় বুঝা উচিত যে, ওরূপ জিনিসের বিচার ক্ষমতা আমার নাই। যে ঘরে উহা রক্ষিত, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে Salle de la Venus de Milo, এতই খাতির। জর্ম্মান পণ্ডিত Lubke (Professor of Art-history) উক্ত মূর্ত্তি সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উহা কিরূপ মূল্যবান। তিনি বলেন, "This is the only statue of Venus that has come down to us which represents the *goddess* and not a beautiful woman. The power and grandeur of form, over which the infinite charm of youth and beauty is diffused, is in harmony with the pure and majestic expression of the head, which, free from human infirmity, proclaims the calm self-sufficiency of divinity."

দুঃখের বিষয়, হাত দুইটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, একটী কতক আছে, অপরটী একেবারেই নাই। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে উহা আবিষ্কৃত হয়, সেই অবধি এ পর্য্যন্ত দেশ বিদেশের অনেক পণ্ডিত ইহার ইতিহাসাদি সম্বন্ধে কলম চালাইয়াছেন। যাহা হউক, একমাত্র ডাক্তার লুব্‌কের সাক্ষ্য দ্বারা আমার অন্ধতা প্রমাণ হইল।

প্রথম তালায় অন্যান্য ঘরগুলিতে মধ্য-কাল ও বর্ত্তমান সময়ের ভাস্কর কার্য্য সকল রক্ষিত। দ্বিতলে—চিত্রশালা—(Musee de Tableaux)। এই সকল হলে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। একত্রে এত অধিক সংখ্যক ছবি পৃথিবীর আর কুত্রাপি আছে কি না, সন্দেহ। লণ্ডনের ভিন্ন ভিন্ন

চিত্রশালার ছবি এক জায়গায় করিলে হয়ত এখান অপেক্ষা অধিক হইতে পারে; কিন্তু চিত্রকর-কুলভূষণ মহাত্মা রেফেল (Rafaello রাফাএলো) প্রভৃতি অনেক চিত্রকর-গুরুর চিত্রসংখ্যা সম্বন্ধে লুভ্রে প্রধান স্থান, এমন কি অন্য কোথাও তাঁহাদের চিত্র সম্যক অধ্যয়ন করা অসম্ভব। সমগ্র সভ্যজগতের উচ্চ শ্রেণীর অসংখ্য ছবির আগার লুভ্রের এই অংশ বিশেষ শিক্ষার স্থান। চিত্রকরদিগের নামের আদ্যক্ষরানুযায়ী ছবিগুলি সাজান। এই খণ্ডের Galerie d'Apollon প্রকোষ্ঠ (Saloon) সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হল, ১৪০ হাত দীর্ঘ। অনেক ইংরেজের মুখে শুনিলাম "One of the finest halls in the world"। ইহার মধ্যস্থলে পাঁচটী কাচের ডেস্কে রত্নাদি নির্ম্মিত ও খচিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, পাত্র, রাজদণ্ড, পূর্ব্বতন নরপতিদিগের ঢাল তরবারি প্রভৃতি মহামূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত। দ্বিতলে এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি মিউজিয়ম আছে।

ত্রিতলে—সামুদ্রিক মিউজিয়ম—Musee de la Marine। এখানে ছোট ছোঠ নানা রকমের নকল জাহাজ, জাহাজী কল কারখানা, বন্দরাদির প্রতিকৃতি (in relief) ইত্যাদি বহু শিক্ষার বিষয় দেখান হইতেছে।

আর কতকগুলি হলে ভারত, চীন ও জাপান হইতে আনীত নানাবিধ জিনিস। সোণা, রূপা, হাতির দাঁত, বাঁশ প্রভৃতি প্রতীচ্য মাল মসলায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি। এখানে স্বয়ং বিষ্ণু-বিরাজিত একটী ছোট জগন্নাথের মন্দির ও গিল্টি করা সিংহাসনে বুদ্ধদেব উপবিষ্ট হঠাৎ আমাদের নয়ন আকর্ষণ করিল। আর একটী হলের মধ্যস্থলে সুয়েজ খালের নকল দৃশ্য (relief-plan 6: 100000) এবং খালের কল-কারখানার নকল ও ভিন্ন ভিন্ন অংশের দৃশ্যাবলী।

পাঁটেওঁ (Pantheon)। এই বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণে ২৬ বৎসর সময় লাগে; ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণ হয়। প্রথমে উপাসনালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক বৎসর পরে স্মৃতিমন্দিরে (memorial temple) পরিণত ও বর্ত্তমান নাম প্রাপ্ত হয়। নামের উপরে লেখা 'Aux grands hommes la patrie recounaissante' অর্থাৎ মহাজীবগণের নিকট দেশ কৃতজ্ঞ। এই বিরাঠ হর্ম্ম্যের ব্যবহার বারম্বার পরিবর্ত্তিত হওযার পর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কবিবর হিউগোর (Victor Hugo) অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া জন্য পুনরায় সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হয় (secularised)। ইহার আয়তন ৩৭০ ফুট দীর্ঘ, ২৭৬ ফুট প্রস্থ ও ২৭২ ফুট উচ্চ গম্বুজ বিশিষ্ট। ইহার মধ্যে একখণ্ডে (Tympanum) ১৬ ফুট উচ্চ ফ্রান্সের এক মর্ম্মর মূর্ত্তি সন্তানগণকে মাল্য বিতরণ করিতেছেন। বামে এক থাকে স্বাধীনতা দেবীর আশ্রয়ে রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মালহেয়ার্ব ও মিরাবো (Malesherbes and Mirabeau), বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মঁজ (Monge—Mathematician and Natural Philosopher), টেলিমেকস্ প্রণেতা ফেনেলঁ (Fenelon) এবং বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ লাপলাস্ (Laplace the Astronomer) প্রভৃতি অনেকগুলি মহাত্মার মূর্ত্তি:—দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রাণীতত্ত্ববিৎ দিগ্‌গজ পণ্ডিত কুবীর (Cuvier the Zoologist and Comparative Anatomist), বীরবর লাফেইট (Lafayette)

ভল্‌টেয়ার (Voltaire), রোসো (Rousseau) ও চিকিৎসক বিশা (Bichat the Physician.) দক্ষিণদিকে ইতিহাসের মূর্ত্তির পার্শ্বে বোনাপার্ট প্রভৃতি অনেক গুলি শূর বীর। আরও অনেক মূর্ত্তি ও চিত্রপট এখানে রক্ষিত।

তয়খানা (Caveaux) কতকগুলি যাত্রী একত্র হইলে স্থানের জনৈক রক্ষক আমাদিগকে এই পাতাল পুরিতে লইয়া, চলিলেন। অন্ধকারময় সংকীর্ণ গলি দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া যথা স্থানে উপস্থিত হইলাম। মিরাবোর দেহ এইখানে প্রথম সমাহিত হয়, তাহার দুই বৎসর পরে নরপিশাচ (তখনকার প্রজাবন্ধু) মারার সমাধি হয়, কিন্তু উভয় দেহ পরে সরকারি হুকুমে (by order of the Convention) স্থানান্তরিত হয়। প্রবেশ দ্বারের নিকট দক্ষিণে পুষ্প ও মাল্য-শোভিত ভিক্টর হিউগোর সমাধি। স্মরণার্থ চিহ্ন (monument) ও মূর্ত্তি শীঘ্র স্থাপিত হইবে। তদ্বিপরীতে এক পার্শ্বে রোসোর স্মরণার্থ চিহ্ন, অপর পার্শ্বে ভল্‌টেয়ারের স্মরণার্থ চিহ্ন ও মূর্ত্তি। মূর্ত্তির পাদদেশে লেখা Aux Manes de Voltaire—ভল্‌টেয়ারাত্মার সম্মানার্থ। ভল্‌টেয়ার সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় যাহা লিখিত আছে; এস্থলে তাহার বঙ্গানুবাদ দিলাম ;—

—"কবি, ইতিহাস-লেখক ও দার্শনিক। ইনি মানুষের মন উন্নত করিয়া স্বাধীনতা শিক্ষা দিয়াছেন। ইনি কালা (Calas) সরভাঁ (Sirven) বার (de la Barre) ও মংবেলি (Montbaily)* রাজদ্বারে দণ্ডিত নিরীহ ব্যক্তিগণের পক্ষ সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইনি নাস্তিকতা ও ধর্ম্মান্ধতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। ইনি সমদর্শন শিক্ষা দিয়াছেন এবং সকল প্রকার পরাধীনতা হইতে মানুষের স্বত্ব রক্ষা করিতে যত্নবান ছিলেন।"

রোসোর স্থানে লেখা প্রকৃতি ও সত্যের মানুষ এইখানে সমাহিত।

অন্যান্য মহাত্মার মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ লাগ্রাঞ্জ (Lagrange) এইখানে সমাহিত। হঠাৎ তয়খানার প্রতিধ্বনির বড় চমৎকার খেলা। পাণ্ডা উচ্চৈস্বরে কতকগুলি কথা বলিয়া আমাদিগকে তামাসা দেখাইলেন, ঠিক বোধ হইতে লাগিল যেন অপর দিক হইতে আর এক ব্যক্তি ব্যঙ্গ করিতেছে, বিশেষ সানুনাসিক পূর্ণ ফরাসী ভাষার প্রতিধ্বনি যেন প্রেতের আওয়াজ মনে হইতে লাগিল। শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

স্বাধীনতা।

১

স্বাধীনতা সাজে কি তাহার ?
পরপদ সেবা করা, পর বেশ ভাব ধরা,
শয়নে স্বপনে ব্রত যার,
স্বাধীনতা সাজে কি তাহার ?

২

উদার শিক্ষার বলে, কপটতা কুতুহলে,
জন্মায়েছে বিকার যাহার,
ত্যাগ করি সরলতা, স্বাভাবিক স্বাধীনতা,
ঘৃণা কৃষি বাণিজ্যে যাহার,
স্বাধীনতা সাজে কি তাহার ?

৩

অঙ্গেতে নাহিক বল, শুধু রাজনীতি বল,
সংগ্রহে সতত মতি যার,
অর্ব্বাচীন যেই জন, ছাড়ি অন্য প্রয়োজন,
বাক্‌যুদ্ধ করিয়াছে সার,
স্বাধীনতা সাজে কি তাহার ?

শ্রীঈশানচন্দ্র দত্ত।

* এই সকল নির্দ্দোষী ব্যক্তিগণের জন্য চিরকাল তিনি কর্ত্তৃপক্ষগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, এমন কি এই কারণে রাজাজ্ঞায় দেশ ত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হন। ভল্‌টেয়ার অন্যায় অত্যাচার, অবিচার ও অন্ধ-কুসংস্কারের পরম শত্রু ছিলেন।

সন্ধ্যা।

দিবস অবশ শুয়ে আকাশের কোলে,
প্রকৃতি অলস যেন পড়ে ঢুলে ঢুলে।
পথ ঘাট মাঠ যত ছায়ায় নিরালা।
নীরব নিথর থির অবসন্ন বেলা।
গাভীগণ গৃহে যায় স্বপনে বিবশ
দিন-দূত দ্রুত ধায় বাসায় বায়স।
ছেলেদের মুখ ভাবি কৃষক আন্মনা
ফসল সকল হবে কত কি কল্পনা।
রমণী অলস পদ কলস কাঁকালে
কত স্বপ্নরাজ্য রচি ধীরি ধীরি চলে।
পথিক পথের সখা কোন্ দেশে যায়
গৃহে বাঁধা মনখানা পিছে পড়ে র'য়।
শব্দময় পাখিগুলা মোহে মাতোয়ারা
মাথায় তারাটী ব'সে আঁধারে পাহারা।
মলয় মেতেছে মদে চলে ঢলে ঢলে
সলিলে আঁচোল দোলা ললিত হিল্লোলে।
ফুলগুলি আধকলি আধ আধ দোলে
সৌরভে শিথিল অঙ্গ আধ আঁখি ঢুলে।
ললিত লতিকা পাঁতি গলে গলে দোলে
কাছে কাছে গাছে গাছে কত কথা চলে।
বিরলে নীরব নদী কল কল গায়
কি জানি আপন কারে মরম বুঝায়।
ফলভরে তরুবর অঙ্গ আই ঢাই
অলসে অবশ যেন ঘুমাই ঘুমাই।
আকাশ শাসিত স্তব্ধে স্বপনে জাগ্রত
উদারে গাম্ভীর্য্য বীর্য্যে মৌন মহাব্রত।
তৃণদল লঘুবল নেশায় শয়িত
জনরব মহাস্তব্ধ মায়ায় মোহিত।
আঁধারে আঁধার শুধু স্পর্শে পথ ধায়
বিশ্ব ঘুমঘোরে, ঝিঁঝি জীবতন্ত্র তায়।
সন্ধ্যায় স্বভাব শোভা কি স্বপ্নে রচিত
মাঠমাঝে একা আমি মোহে বিমোহিত।
শান্তির নিশুতি সব মদিরা বিঘোর
আমারও মন যেন ঘুমেতে বিভোর॥

শ্রীমোহনবিহারী আঢ্য।

রাধিকা।

গহন নিকুঞ্জ বনে,
মৃদু শ্বাস-সমীরণে,
শোন্‌লো মধুর স্বনে
বাজিছে বাঁশরী ওই!
নিঝুম জ্যোছনা নিশি,
দখিণা মলয়ে মিশি,
ও তান হারায়ে দিশি
মরমে পশিছে সই!
কি যে এক মন্ত্রে সাধা!
ডাকে বাঁশী "রাধা, রাধা,"
চারিদিকে কত বাধা;
তবুও সে বোঝে কই!
মরি কি মধুর তান!
আকুল করিছে প্রাণ,
যাক্ ভেসে কুলমান
চল্‌লো ত্বরিতে সই!
বাঁশীর সুতানে ভুলে,
চেয়ে দেখ্ কূলে কূলে,
অলস লহরী তুলে
যমুনা উছলে ওই!
বিভল চাঁদিমা তারা
প্রকৃতি আপনা হারা,
পিয়ে ও মদিরা ধারা,
কে আছে চেতন সই?
আয় সখি, আয়, আয়,
মধুর বহিছে বায়,
দেখি গে সে শ্যামরায়,
কি হবে ঘরেতে র'ই?
তার সে মোহন মুখে
হাসিটি দেখিয়া সুখে
ডুবিতে যমুনা বুকে
পরাণ আকুল সই,
চল চল কুঞ্জবনে
বাঁশরী বাজিছে ওই!

শ্রীবিনয়কুমারী বসু।

প্রেমাবতার মহাত্মা বিদ্যাসাগর।

অন্ধকারাগরা, সদ্বীপা পৃথিবী গভীর রজনীতে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন,—কল্পনার রাজ্য, চিন্তার রাজ্য, সব ঘোর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন, এমন সময়ে বঙ্গদেশের কোমল দেহ দারুণ ভূকম্পনে যেন সহসা বিকম্পিত হইয়া উঠিল, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, নরনারী, জ্ঞানী মূর্খ—সকলে সহসা চকিত, সুপ্তোত্থিত। যে কখনও জাগে না, সেও আজ জাগরিত। যে সদা চঞ্চল, সেও আজ স্পন্দহীন। কি যেন ঘটিয়াছে, কি যেন গিয়াছে, কি যেন ডুবিয়াছে—এইরূপ ভাবিয়া সকলেই অস্থির, সকলেই অধীর। ভাষাহীন মুখে সকলেরই চক্ষের জল, ভূষণহীন দেহে সকলেরই বিষাদের গাঢ় ছায়া। এমন দৃশ্য এ পোড়া দেশে কে কবে দেখিয়াছে? এমন জীবন্ত সহৃদয়তা-মাখা একপ্রাণতার কথা কে কবে শুনিয়াছে? সকলেই এক প্রাণে, একমনে, গলা ধরাধরি করিয়া, নীরবে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া ঘোষণা করিতেছে,—হায়, বিদ্যাসাগর নাই?

পুণ্যাত্মা ম্যাট্‌সিনির মৃতদেহ ইতালীতে আনীত হইলে, ইতালীর সহস্র সহস্র নরনারী কিরূপ ব্যাকুল চিত্তে মৃত দেহের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়াছি; গ্যারিবল্ডির মৃত্যু সংবাদ ইতালীতে ঘোষিত হইলে সে দেশ কিরূপ শোক-বিহ্বল হইয়াছিল, তাহার বিবরণও পাঠ করিয়াছি। সেও বহুদিনের কথা নয়; ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্‌সিনি পরলোক গমন করেন ও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, ঠিক দশ বৎসর পর, গ্যারিবল্ডি স্বর্গধামে গমন করেন। স্কুল, কলেজ, আফিস, দোকান ও থিয়েটার বন্ধ হওয়া বিচিত্র নয়; ইতালীর প্রায় সমস্ত লোক ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডির মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর দুই তিন দিন কোন কাজ করিতে পারে নাই; এমন অঙ্গ-শৈথিল্য, ভাব-বিহ্বলতা, এমন দারুণ মর্ম্ম-বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। এদেশে সেরূপ হইতে পারে, ধারণাও ছিল না। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে আংশিকরূপে সে চিত্রের আভাস পাইতেছি। বিদ্যাসাগর এমনই সর্ব্বজনপ্রিয় পুণ্যাত্মা ছিলেন।

প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগেই গৌরবের কিছু থাকে। গৌরবের কিছু না থাকিলে, দেশ বা সমাজ টিকে না। প্রাচীন ভারতে গৌরবের অনেক জিনিস ছিল। বেদবেদান্ত, গীতাভাগবত, রামায়ণ মহাভারত প্রাচীন ভারতের গৌরব। ভবভূতি কালিদাস, বাল্মীকি বেদব্যাস, মনু যাজ্ঞবল্ক্য, অশোক বুদ্ধ, নানক কবীর, রামানন্দ শ্রীচৈতন্য—ভারতের প্রাচীন গৌরব। এখন সে সকল গৌরবের প্রাণ গিয়াছে,—সে সকলের কায়াহীন ছায়া, ভাবহীন, জীবনহীন স্বপ্ন, তেজোহীন কাহিনী কেবল এই ভারত-শ্মশানে বা প্রেত-ভূমে স্মৃতিতে বিচরণ করিতেছে। তবুও এ ভারতবর্ষ আছে কেন? তবুও এ দেশ ছিল কেন? কেন না—নব্যভারতেরও গৌরব ছিল। প্রাচীন ভারতের ন্যায় নব্যভারতের গৌরব রামমোহন, কেশবচন্দ্র কালের গর্ভে ডুবিলেও এ দেশের অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল,

বিদ্যাসাগর ছিলেন। আজ রজনীর কালের গর্ভে বা সময়-শ্মশানে লুক্কায়িত হইয়াছেন! হায়-হায়, এ দেশ আজ হাহাকার করিবে না কেন, বলত? এত আঘাত কাহার প্রাণে সয়? নব্যভারত বুঝিবা আজ সর্ব্বপ্রকার গৌরবহীন হইতে চলিল! নব্যভারতের নবভাবাবধূ আজ আশ্রয়হীনা, স্বামী-হীনা, দীনা, মলিনা, শোক-বিহ্বলা! বঙ্গদেশ আজ গভীর শোকে আচ্ছন্ন। বিষাদময় রজনীতে দারুণ শোক বঙ্গাকাশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

নব্য ইতালীর গৌরব যেমন ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডি, ফ্রান্সের গৌরব যেমন লেমিনে ও গেটে, ইংলণ্ডের গৌরব যেমন গ্লাডোষ্টোন ও কারলাইল, চিনের গৌরব যেমন কন্‌ফিউসস্, আমেরিকার গৌরব যেমন গারফিল্ড ও এমারসন, নব্যভারতের গৌরব তেমনি কেশবচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর। প্রাকৃতিক ভারতের গৌরব যেমন হিমালয়, প্রাণময় রাজ্যে নব্যভারতের তেমনি গৌরব, কেশবচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র। প্রাচীন যোগী ঋষিগণ যে একদিন এই পুণ্যভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এই দুই মহাত্মার আবির্ভাবে আমরা এ কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছি। পৃথিবীর গৌরবের বস্তু সকল (wonders) দেখিয়া পৃথিবীর নরনারী যেমন বিমোহিত, এই দুই মহাত্মাকে দেখিয়া বঙ্গভূমি তেমনি মন্ত্রমুগ্ধ। ভারতের আদরের ধন, গৌরবের বস্তু, এই দুই মহাত্মায় নিবদ্ধ। কলিকাতায় দেখিবার যদি কিছু ছিল, তবে ইঁহারাই ছিলেন; কলিকাতায় যদি কাহারও কথা শুনিবার ছিল, তবে ইঁহাদের কথাই শুনিবার ছিল। একজন শ্রেষ্ঠ ভক্তিতে, আর একজন শ্রেষ্ঠ প্রেমে। দুইয়ের ভক্তি ও প্রেম, গঙ্গা যমুনার ন্যায় ভাষা-প্রয়াগে সম্মিলিত হইয়া ভারতের অপূর্ব্ব মঙ্গলের ধারা প্রবাহিত করিয়াছে। ভক্তি আর প্রেমই ভারতের মৌলিক জিনিস। প্রাচীন ও নব্যভারতের গভীর যোগ-কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু আজ খণ্ডিত, বিলোড়িত। গঙ্গায় আজ উজান বহিতেছে, যমুনায় আজ ঘোর তুফান। তাই ভাষা আজ প্রভা বা প্রবাহহীন হইয়া নীরবে দুঃখকাহিনী জগতে ঘোষণা করিতেছে। লোকের মুখে আজ আর কথা সরে না, আজ আর লেখনী চলে না, আকুলপ্রাণে কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেই ইচ্ছা করে।

যে বিদ্যাসাগরের জন্য আপামর সাধারণের প্রাণ মন শিথিল, এবং গভীর শোকোচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা,—কত কথা কতজনে বলিতে চায়, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কেহই বলিতে পারে না, এই বিদ্যাসাগর মহাশয় কে এবং কি ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর নানা জনে নানা রকমে, সভা সমিতিতে, ঘাটে পথে, কাগজে কলমে দিতেছে। কেহ বলে, বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার জন্ম, কেহ বলে ৭১ বৎসর বয়সে বীরের ন্যায় বহু কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বলে তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিয়াছিলেন, কেহ বলে তিনি বাল্য বিবাহের বিরোধী, কেহ বলে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয় অতি আশ্চর্য্য, কেহ বলে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, কেহ বলে মেটপলিটান কলেজ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি, ইত্যাদি রূপে কতজনে কত কথায় তাঁহার পরিচয় দিতেছে। কেহ সে পুণ্যময় দেহের দয়ার কথা, কেহ

পরোপকারের কথা বলিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছেন। এ সকল অবান্তরিক কথায়, বটনার ও গল্পে এই অতলস্পর্শ মহত্বের খনি আবিষ্কৃত হইতেছে কি না, বড়ই সন্দেহের বিষয়। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের তেজ বল আর কোমলতা বল, জ্ঞানস্পৃহা বল আর ভাববিহ্বলতা বল, স্বাধীনতা-স্পৃহা বল আর মাতৃ-ভক্তির কথা বল, জ্ঞানপরায়ণতা বল বা দেবদুর্লভ অপরাজিত দয়ার কথা বল, এ সকলই এক অজেয় অখনিত মহত্বের খনি হইতে উদ্ভূত। সে মহত্ব কি, কেহ আজ পর্য্যন্ত তাহা আবিষ্কার করে নাই। তাহা আবিষ্কৃত হওয়া সময়-সাপেক্ষ, আমাদের ন্যায় প্রেমহীন, শুষ্ক, কঠোর, কর্ত্তব্যহীন লোকের সাধ্য নাই যে, তাহা প্রকাশ করিতে পারে। আমরা উপহাসাস্পদ হওয়ার জন্যই সে চেষ্টা করিতেছি। ধিক আমাদিগকে!

আধুনিক জগতে আমরা এমন মনমুগ্ধকর দুটী চিত্র দেখিয়াছি, যাহার সমতুল্য চিত্র বর্ত্তমান সময়ে কুত্রাপি মিলে নাই। এক চিত্র ইতালীর ম্যাট্‌সিনি, আর এক চিত্র বঙ্গের বিদ্যাসাগর। দুই-ই মাতৃভক্ত, দেশ-ভক্ত; দুই-ই দরিদ্রের মা বাপ। শৈশব হইতে ম্যাট্‌সিনি এমন প্রেমে মাতোয়ারা যে, দেশের দুর্দ্দশার কাহিনী প্রকাশের জন্য মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন *। ম্যাট্‌সিনি-জীবনে অন্য সুখের কামনা নাই, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব দেশ-সেবা, দরিদ্রের সেবায় নিবদ্ধ। অনাহারে থাকিয়া অন্যকে খাওয়াইতে, দরিদ্রের সেবার জন্য মাতার ভালবাসা (যাহার জন্য ম্যাট্‌সিনি পাগল ছিলেন) পর্য্যন্ত ভুলিতে, দেশের উন্নতির জন্য আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া কারাবাস-যন্ত্রণা অম্লান চিত্তে সহ্য করিতে, এই পৃথিবীতে কেবল ম্যাট্‌সিনিকে দেখিয়াছি। মহাপুরুষেরা নিজের সুখের দিকে চাহিতে পারেন না। "অন্যের কত অভাব, কত মানুষ দিবসে একবার আহার পায় না, আর আমি বিলাসের দাস হইব?"—প্রকৃত পরদুঃখ-কাতর মহাপুরুষের কথা এইরূপ। সে মহাপুরুষই নয়, দুঃখীর জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে না। ম্যাট্‌সিনি দেশের দরিদ্র সাধারণের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন-পাত করিয়াছিলেন; এই জন্য আমরা ম্যাট্‌সিনিকে প্রেমাবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি।† ঈশা, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, সকল মহাপুরুষই দরিদ্রের জন্য আসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সহৃদয়তায়, দয়ায়, কর্ত্তব্যপরায়ণতায়, মাতৃভক্তিতে ও দরিদ্র সেবায় এই সকল মহাপুরুষের সমশ্রেণীর বলিয়া বোধ হয়। পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ম্যাট্‌সিনি প্রেমে মাতোয়ারা;—আর আমাদের দরিদ্র দেশের দরিদ্র বিদ্যাসাগর শৈশব হইতে পরের জন্য অস্থির। প্রেমের টানে ম্যাট্‌সিনি অম্লানচিত্তে কারাবাস গিয়াছিলেন, এই প্রেমের টানে বিদ্যাসাগর নির্ভীক চিত্তে নদী সাঁতরাইয়া মাতৃধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পায়ে সামান্য চটীজুতা, গায়ে একখানি মোটা উড়নী, বেশের মধ্যে এই।—বিদ্যাসাগর সর্ব্বদা আড়ম্বরহীন, বিলাসিতাহীন, সংসারের সুখ বাসনাহীন। বিদ্যাসাগরের আহার সামান্য, পরিধেয় সামান্য, অথচ বিদ্যাসাগর গবর্ণমেণ্টের কত সম্মান ও

* I childishly determined to dress always in black, fancying myself in mourning for my country." Mazzini.

† বিবেকবাণী, ৩৫ পৃষ্ঠা।

ভালবাসার পাত্র। দরিদ্র বিদ্যাসাগর নিজ চেষ্টায় স্বাবলম্বন বলে শেষজীবনে বার্ষিক প্রায় ৫০ সহস্র টাকা আয় করিয়াছিলেন। কার জন্য এই টাকা, এই ঐশ্বর্য।—সব যেন দরিদ্রের জন্য। শুনিয়াছি, বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য তাঁহার ৮০ সহস্র টাকা ঋণ হইয়াছিল! কত লোকে ভিক্ষা দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। ভিক্ষাকে যে তুচ্ছ জ্ঞান না করে, সে মহৎই নয়। ভিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া ঘোর দারিদ্র্য-সংগ্রামে স্বীয় দুর্জ্জয় শক্তিতে জয়লাভ করিয়া এ সমস্ত টাকা তিনি নিজ আয় হইতে পরবর্ত্তী জীবনে পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন। একদিন কথায় কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়, মহারাণী স্বর্ণময়ী ও ৺তারক প্রামাণিকের নাম উল্লেখ করিয়া, আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "এ দেশে কেবল এই দুটী মানুষ আছে, আর সব পশু। পশুরাও নিজেদের লইয়া ব্যস্ত, ইহারাও তাই। কত ধনী এ দেশে আছে, কিন্তু এক বেলা দরিদ্রকে একমুষ্টি খাইতে দেয়. এমন লোক নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, অবিরল ধারায় চক্ষের জল পড়িতে লাগিল, আবার রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "এ দেশের গতি কি ফিরিবে? নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের গতি কি ফিরিবে? হায়, তাহাদিগকে আমরা পশু তুল্য জ্ঞান করি, মানুষের ন্যায় জ্ঞান করিলে হয় ত আমাদের দ্বারা তাহাদের কিছু উপকার হইত। আপনারা চেষ্টা করুন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এদেশের দরিদ্রদিগের গতি ফিরিবে না, তাদের মা বাপ নাই।" এইরূপ সহৃদয়তার কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অনেকবার শুনিয়াছি। শুনিয়া বিমোহিত চিত্তে ভাবিয়াছি— বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর, প্রেমের অবতার;— ভাবিয়াছি, এই গুণেই তিনি সর্ব্বজনপূজ্য।

আমরা অনেকবার অনেক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রেমই মানব জীবনের আদি মৌলিক জিনিস, তার পর জ্ঞান, কর্ম্ম, ন্যায়, ধর্ম্ম ও চরিত্র। প্রেমময়ী জননীর প্রেমক্রোড়ে স্বর্গের উলঙ্গ প্রেম-শিশু অবতীর্ণ। মাতৃক্রোড় হইতে এবং পরে সংসার হইতে আর সব সংগ্রহ। প্রেম হারাইয়া মাতৃক্রোড় হইতে যাহারা সংসারে অবতীর্ণ হয়, তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব, তাহারা অহঙ্কারে ধরাকে শরার ন্যায় জ্ঞান করে, অন্যকে উপেক্ষা করা তাদের জীবনব্রত, জ্ঞানে তাহাদের মনবিকার, ধনে আত্মাভিধান, বিদ্যায় গরিমা। পরনিন্দা তাহাদের গৌরব-পিপাসু হৃদয়ের প্রধান ভূষণ; পরশ্রী-কাতরতা তাহাদের প্রাণের আভরণ; হিংসার ঘাটে তাহারা দুবেলা গরল পান করে। তাহারা বিলাসের দাস, রিপুর দাস, অহঙ্কার ও হিংসার দাস। সৌভাগ্যক্রমে আমরা সকলেই স্বর্গীয় প্রেম লইয়া অবতীর্ণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেকেই মাতৃক্রোড়ে সেই দেবদুর্লভ প্রেম বিসর্জ্জন দিয়া সংসারে নামিয়া অপকৃষ্ট জীবরূপে লীলা খেলিতেছি।

ঈশা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য দেবশ্রেণীতে উন্নীত, সুতরাং তাঁহাদের কথা তুলিলাম না। যে সকল পুণ্যাত্মা প্রেম-মাতোয়ারা হইয়া সংসারে বাস করিতে পারেন; তাঁহারা নর-দেবতা, মানুষ দেবত্বে উত্থিত। দেবত্ব কিসে?—আমরা অনেকবার বলি-

রাছি, কেবল প্রেমে। প্রেমই আরম্ভ, প্রেমই শেষ। প্রেমই জ্ঞান, প্রেমই কর্ম্ম, প্রেমই পুণ্য, প্রেমই মানবের সর্ব্বস্ব। দেবত্বের নিদর্শন, এই মর্ত্ত্যলোকে, এই এক ভিন্ন দুই নাই। প্রেম, নিষ্কলঙ্ক, বিকারশূন্য, দ্বিধাশূন্য, বাসনা-শূন্য,—নিষ্কাম। প্রেমের স্বভাব—আত্মবিসর্জ্জন। দিতে দিতে, ধন ঐশ্বর্য্য সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়াও যখন তৃপ্তি হয় না, তখন গৃহ পরিবার, প্রাণ মন শরীর সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া মানুষ পৃথিবী হইতে প্রস্থান করে। ম্যাট্‌সিনির জীবনে আমরা ইহারই উজ্জ্বল ছায়া দেখিয়াছি, বিদ্যাসাগরের জীবনে ইহারই প্রগাঢ় নিদর্শন পাইতেছি। উভয়ের প্রেমই মাতৃক্রোড়ে অঙ্কুরিত, উভয়েই মাতৃভক্ত। ম্যাট্‌সিনির কথা সকলে নাও জানিতে পারেন, কিন্তু সকলেই জানেন, বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি এদেশে অতুলনীয়। ইঁহারা, নিজেদের জন্য নয়, অন্যের জন্য, দেশের জন্য জীবন ধারণ করিয়াছিলেন; তাহাদেরই জন্য সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া শেষে পুণ্যধামে, স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।

ম্যাট্‌সিনি জীবনে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর জন্য। বিদ্যাসাগর যাহা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে গভীর গবেষণা ও মস্তিষ্ক ব্যয় হইয়াছে বিধবাদের জন্য। ইতালীর নিম্নশ্রেণী ও ভারতের বিধবা এক অবস্থাপন্ন। ম্যাট্‌সিনি নিম্নশ্রেণীর উন্নতির জন্য জীবনের সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর বিধবাদের উন্নতির জন্য ও দরিদ্রদের সেবার জন্য সর্ব্বস্ব—জীবনের বিলাস, সুখ, চিন্তা, ধন, মান, সম্ভ্রম, এমন কি শরীরের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া জল করিয়া ঢালিয়াছেন; এমন কি, পরসেবার জন্য জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত। ম্যাট্‌সিনির মৃত্যুর পর ৮০ সহস্র সাধারণ লোক শোকবিহ্বল চিত্তে ম্যাট্‌সিনির শবের সহিত গমন করিয়াছিল; হায়, বঙ্গের বিধবা, তোমরা কুসংস্কার বা দেশীয় প্রথার বশবর্ত্তিনী, তোমরা কেহই তোমাদের উদ্ধারকর্ত্তার মৃতদেহের সহিত শ্মশানে যাইতে পার নাই! হায়, হয়ত তোমরা আজও বুঝিতে পারিতেছ না, তোমাদের জীবনের উন্নতির মূলে কি কুঠারাঘাত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর যে তোমাদেরই জন্য জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, এ কথা তোমরা কবে বুঝিবে? কে জানে কবে!! আর বাঙ্গলা ভাষা, তোমার জীবনদাতা যিনি, তিনি আজ শ্মশানের ভস্মে পরিণত, তোমার সাধ্যও হইল না যে, তুমি স্বর্ণাক্ষরে ইঁহার কথা আঁক। কবে তোমার সে শক্তি হইবে, কে জানে?

প্রেমের আর এক স্বভাব, স্বাধীনতা বা স্বাবলম্বন-স্পৃহা। স্বাবলম্বন—আত্ম বিসর্জ্জনেরই রূপান্তর। যার স্ব বা আত্ম বোধ আছে, সেই আত্মবিসর্জ্জন করিতে জানে। পরপ্রত্যাশী, পর-মুখাপেক্ষী, অধীন জীব পদে পদে অন্যের দিকে চায়, পদে পদে চলে। লোক কাছে আসিল, কি গেল, লোক ভাল বলিল, কি মন্দ বলিল, তাহারা এই সকল গণনা করিয়া মরে। আর স্বাধীন জীব, কর্ত্তব্য পালনের জন্য আপনার শক্তির উপর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান। ম্যাট্‌সিনি যখন রাজাজ্ঞায় দেশান্তরিত হইয়াছিলেন, তখন ম্যাট্‌সিনির পিতা অনুরোধ করিয়াছিলেন, "একবার ক্ষমা চাও, তবেই মুক্ত হইবে।" ম্যাট্‌সিনি পিতার অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন। পিতা সাহায্য বন্ধ

করিয়া ম্যাট্‌সিনিকে দারুণ কষ্টে ফেলিয়া এই ক্ষমা প্রার্থনার পথে আনিতে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ম্যাট্‌সিনি অবিচলিত। ইংলণ্ডে অবস্থান কালীন একসময়ে ম্যাট্‌সিনির কর্ত্তব্য পরিত্যাগের জন্য কত লোক, কত বন্ধু কত উপদেশ, কত পরামর্শ দিয়াছিলেন; অবশেষে কত লোক কত প্রকার নিন্দা করিয়াছিল, ম্যাট্‌সিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ইয়ং সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটু লেখা সংশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন। কথায় কথায় ইয়ং সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করিলে যখন বিদ্যাসাগর ৫০০৲ বেতনের চাকুরি পরিত্যাগ করিলেন, তখন ছোটলাট সাহেবের অনুরোধের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "২৲ টাকায় আমার এক দিন চলিত, এখন ৫৲ টাকায় চলিবে না? ভয় কিসের?" তারপর বিধবা বিবাহের আন্দোলনে—জাতি গেল, মান গেল, কত আত্মীয়ের অনুরোধ,কত পরামর্শ ব্যর্থ হইল; বিদ্যাসাগর একাকী ঘোরযুদ্ধে দণ্ডায়মান; দৃক্‌পাত নাই। এক দিনের জন্যও কাহার সাহায্যের অপেক্ষা করিলেন না!! যাহা সত্য বুঝিয়াছিলেন, তাহা পালন করিবার জন্য জীবনে যে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, ধারাবাহিক জীবন আলোচনা করিলে তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"সৎ কাজ করিবার সময় লোকের নিন্দাকে, লোকের কথাকে ভুলিতে না পারিলে এ পথে যাওয়া ঘোরতর অন্যায়। আমাকে লোকেরা এতদূর নীচ কথা পর্য্যন্ত বলিয়া সময়ে সময়ে গালি দিয়াছে যে, আমি চরিত্রহীন বলিয়া অল্প-বয়স্কা বিধবাদিগকে বাড়ীতে আশ্রয় দেই!" বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত নিন্দা, কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, ইহাতেই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অবিচলিত চিত্ত, একদিনের জন্যও কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হন নাই। "যে যায়, যে থাক্‌, শুনে চলি তোমারি ডাক্‌।" যে যা বলে বলুক, আকাশ হইতে চন্দ্রসূর্য্য স্খলিত হইলেও বীরের কর্ত্তব্য অবহেলিত হয় না। প্রকৃত বীরত্ব এইখানে; প্রকৃত স্বাধীনতা এই খানে, প্রকৃত আত্মনির্ভর এই খানে। যাহা জীবনে কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলেন, প্রেমের টানে তাঁহার জন্য সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, কাহারও দিকে দৃকপাত করেন নাই। তোমার রত্নসিংহাসন, তোমার লক্ষ টাকার মায়া, তাঁহার নিকট তুচ্ছ। ধন্য বীরত্ব, ধন্য সাহস, ধন্য স্বাবলম্বন-স্পৃহা।

প্রেমের তৃতীয় রীতি দয়া। প্রেমিকের স্বভাব দয়াতে গঠিত। প্রত্যুপকারের আশায় যে দান করে, সে ব্যবসাদার; ভালবাসার বিনিময়ে যে ভালবাসা চায়, সে ঘোর নারকী। প্রেমের স্বভাব এই, সে কিছুই চায় না, সে কেবল দিতে চায়। পাত্রাপাত্র বিচারজ্ঞান তাহার থাকে না, যে অনিষ্ট সাধন করে, অথবা যে শত্রু, তাহাকেও সে দিবে, তাহাকেও ভালবাসিবে। এরূপ শুনা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা উপকৃত হইয়া, তাঁহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা বা নিন্দা ঘোষণা করে নাই, অতি অল্প ব্যক্তি। অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনঃ পুনঃ সেই সকল ব্যক্তিদিগকেই, অকাতরে দান করিয়াছেন, নানাপ্রকার সাহায্যে নানা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "একব্যক্তি

আমার নিন্দা করিয়াছে শুনিয়া বলিয়াছিলাম, কই, আমি ত তাহার কোন উপকার করি নাই; তবে সে কেন নিন্দা করিল?" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধারণা এইরূপ ছিল, উপকার করিলেই লোক নিন্দা করিবে। অথচ তিনি অকাতরে দান করিতেন। তাঁহার প্রকৃতিই এইরূপ ছিল যে, অন্যের কষ্টের কথা শুনিলে ঠিক থাকিতে পারিতেন না। কোন প্রত্যাশা নাই, প্রতিদানের আশায় ছাই, তবুও দান-স্পৃহা! কি অপরাজিত প্রেমের টান, ভাবিলে মোহিত হইতে হয়। একটা টাকা দিতে আমরা কত ভাবি, বিদ্যাসাগর লক্ষ লক্ষ টাকা দরিদ্রের সেবায় ঢালিয়া দিয়াছিলেন! কত লোকের উপকার করিয়াছেন, কত বিপন্নকে উদ্ধার করিয়াছেন, এ জগতে তাহার তালিকা উদ্ধার হইবে না, কেন না, মহাজনের স্বভাব সেরূপ নয়। তিনি লোকের অজ্ঞাতে দান করিতেন। লোক জানাইয়া, সংবাদ-পত্রে ঘোষণা দিয়া যে দান করে, সে প্রেমিক নয়, সে যশ-লোলুপ। বিদ্যাসাগর— প্রকৃত দয়ারসাগর ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার শোকে সর্ব্বশ্রেণীর লোক আজ ব্যাকুল। দয়া সম্বন্ধে ম্যাট্সিনির সহিত তুলনা করিলাম না, কেন না, ম্যাট্সিনি নিজে উপবাসী থাকিয়াও আহারের দ্রব্য অনেক সময় অন্যকে দিতেন।

প্রেমের চতুর্থ স্বভাব—ভেদাভেদ-বোধহীনতা। প্রেমের চক্ষে বিষ্ঠা চন্দন সমান; বড় ছোট ভেদ নাই। যে বিদ্যাসাগর লাট সভায়, সেই বিদ্যাসাগর সাঁওতালের পর্ণকুটীরে; যে বিদ্যাসাগর রাজভবনে, সময়ান্তরে সেই বিদ্যাসাগর মুদির দোকানে সামান্যাবস্থায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন! মুটে মজুরের সহিত সমভাবে ব্যবহার করিতেন বলিয়া বিদ্যাসাগরকে অনেক সময়ে বহু রাজা মহারাজার ভালবাসা হারাইতে হইয়াছে! দুঃখীর সেবা, দরিদ্রের পরিচর্য্যা, রোগীর শুশ্রূষা, বিদ্যাসাগরের জীবনের ব্রত ছিল। এ কাজ তিনি না করিয়াছেন, এমন কাজ নাই। দরিদ্রের সেবার জন্যই যেন তাঁহার জন্ম। এগুণে তিনি খ্রীষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের সমতুল্য ব্যক্তি।

প্রেম-গুণের অনেক ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু আর অধিক উল্লেখ করিব না। প্রেমের প্রধান পরিচয়, গভীর জ্ঞানস্পৃহা ও কর্ত্তব্য-স্পৃহায় পাওয়া যায়। প্রেমিক জগতে আবির্ভূত হন, জ্ঞানপ্রচারের জন্য, জগতের কাজের জন্য। প্রেম আছে, অথচ জ্ঞান নাই, কাজ নাই, এমন দৃষ্টান্ত জগতে নাই। "খাটিতেই জন্ম, খাটিয়াই মরিব—" প্রেমিকের কথা এই। ম্যাট্সিনি আজীবন জ্ঞানান্বেষণ করিয়াছেন, আজীবন খাটিয়া খাটিয়া মরিয়াছেন। আর প্রেমিক বিদ্যাসাগর,—আজীবন জ্ঞান-পিপাসু। উদাহরণ, তাঁহার অমূল্য পুস্তকালয়। তিনি আজীবন বিবিধ প্রকারে খাটিয়াছেন, পরিচয়, তাঁহার রচিত পুস্তক রাশিতে, দীন দুঃখীর সেবাতে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ প্রভৃতিতে। পতিত পরাধীন দেশের জন্য ম্যাট্সিনির জ্ঞান ও কর্ম্ম উৎসর্গ হইয়াছিল, পতিত দেশের পতিত সমাজ-সংস্কারের জন্য বিদ্যাসাগরের জ্ঞান ও কর্ম্ম নিঃশেষিত হইয়াছে। ম্যাট্সিনির পরিশ্রমের ফলে ইতালী আজ স্বাধীন। বিদ্যাসাগরের পরিশ্রমের ফলে আজ বিদ্যার আলোকে পতিত সমাজ

অন্ধকার কুসংস্কার ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে; আর বঙ্গবিধবার জল-সিক্ত নয়নের কোণে ঈষৎ হাসি-রেখা ফুটিতেছে। আজ হউক, আর শত বৎসর পরে হউক, এ পতিত দেশের নরনারী বিদ্যাসাগরের পুণ্যের প্রভাবে উত্থান করিবেই করিবে।

প্রেমের আর একটী কথা বলিলেই আমাদের সব বলা হয়। কথাটী এই, প্রেমই পুণ্য, প্রেমই ধর্ম্ম। কেহই একথা বলিতে সাহস পান না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় পুণ্যাত্মা ছিলেন না, চরিত্রবান ছিলেন না, কিন্তু কেহ কেহ একথা বলেন, তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন না। যিনি প্রেমিক, তিনিই উচ্চশ্রেণীর ধার্ম্মিক, এ কথা আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রেমাবতার, সুতরাং তিনি উচ্চশ্রেণীর ধার্ম্মিক। প্রেমেরই নামান্তর ধর্ম্ম। প্রেমের মূল এমন এক রজ্জুতে আবদ্ধ, যাহার পরিসমাপ্তি নাই, যাহা অনন্ত, অপার। ধার্ম্মিকতা কথায় প্রকাশ পায় না। বর্ত্তমান সময়ে ধার্ম্মিকতার লক্ষণ, বক্তৃতা, বাহ্য পরিচ্ছদ ও বাহ্য অনুষ্ঠান ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন সময়ে এরূপ ছিল না। প্রকৃত ধর্ম্ম অন্তঃপুরের গভীর গুহায় নিহিত থাকিত। ধর্ম্ম প্রকাশ পাইবার হইলে, দয়া দাক্ষিণ্যে, ন্যায় পুণ্যে প্রকাশ পায়, পাউক, কিন্তু বক্তৃতায়, পোষক পরিচ্ছদে যত কম প্রকাশ হয়, ততই ভাল। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম-সমাজ সমূহে এত আবর্জ্জনা জুটিতেছে যে, এখন ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক বাছিয়া লওয়া কঠিন হইয়াছে। আড়ম্বরহীনতা ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে সে পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে; অহঙ্কার-শূন্যতা ধর্ম্মের দ্বিতীয় লক্ষণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় নিরহঙ্কারী লোক এ দেশে বিরল। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ধর্ম্মের জীবন, বিদ্যাসাগরের ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি এদেশে আর দেখা যায় না। পবিত্রতা ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান, বিদ্যাসাগরের ন্যায় পবিত্রচেতা লোক এ দেশে বিরল। শেষ জীবনে পীড়ার জন্য একটু অহিফেন গ্রহণ করিতেন, তাহা ছাড়িতে যাইয়াই এবার প্রাণ হারাইলেন !! জীবনে কখনও কোন নীতিবিরুদ্ধ অন্যায় কাজ করিয়াছেন বলিয়া আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই। ন্যায়পরায়ণতা ধর্ম্মের লক্ষণ, এই ন্যায়পরায়ণার খাতিরে আপন জামাতাকে পর্য্যন্ত মেট্রপলিটান কলেজ হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন! মিথ্যার প্রতি বিরক্তি, ইহার অন্যতর কারণ ছিল। মিথ্যার প্রতি, অন্যায়ের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ খড়্গহস্ত ছিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি এ দেশে সেরূপ দেখি না। স্ত্রীজাতির প্রতি তিনি যেমন সম্মান দেখাইতেন, এমন আর কেহ পারে কি না, জানিনা। কোন সময়ে কয়েকটী যুবক মেট্রপলিটান কলেজের নূতন গৃহের ছাদে উঠিয়া ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদের দেখিতেছিল। ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রোধে অধীর হইয়া ছাত্রদিগকে কলেজ হইতে চিরদিনের জন্য অপসৃত করিয়াছিলেন। বাল্য বিবাহ স্ত্রীজাতীর শরীর মাটী করিতেছে দেখিয়া, ধর্ম্মবীরের ন্যায় দেশীয় প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া, আপন কন্যাদের যৌবনে বিবাহ দিয়াছেন। এ সকল সদ্‌গুণ সত্ত্বেও যাঁহারা তাঁহাকে অধার্ম্মিক বলিতে সাহসী হন, তাঁহাদিগকে আর অধিক কিছু

বলিবার নাই; কেবল তাঁহার কথা তুলিয়া দেখাইব, তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতদূর সরল বিশ্বাসী ছিলেন। এক সময়ে আমাদিগকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা কোন্ সমাজ ভুক্ত?" আমরা উত্তরে বলিয়াছিলাম—"ব্রাহ্ম, কিন্তু কোন সমাজভুক্ত নই।" একথার উত্তরে তিনি সানন্দ চিত্তে বলিয়াছিলেন যে, নিজকেই যখন নিকাশ দিতে হইবে, তখন একা থাকাই ভাল, দশে মিলিলে কাজ নষ্ট হয়। আর একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা বলি না কেবল বেতের ভয়ে। নিজের বেতের ভয়েই অস্থির, অন্যেকে ধর্ম্ম কথা বলিয়া বেত্রাঘাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ভয় পাই।" বেতের ভয় সম্বন্ধে একটী গল্প বলেন, সেটী এস্থলে দিলাম। "মনে কর, সকলেই বিচারের দিন বিচারপতির সম্মুখে আনীত হইয়াছে। আমিও সেই খানে আনীত। বিচারপতি খাতা খুলিয়া নাম ডাকিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি অমুক দিন অমুক অন্যায় কাজ করিয়াছ? আমি উত্তরে বলিলাম, হাঁ, করিয়াছি। অমনি দশ বেতের হুকুম হইল। আমাকে বটতলা লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, আমি বেদনায় ছটফট করিতে লাগিলাম। একটু পরেই আবার আমার ডাক হইল। হাজির হইলে বিচারপতি বলিলেন, তুমি অমুক লোককে অমুক দিনে এই কথা বলিয়াছ? আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, হাঁ বলিয়াছি। অমনি আর দশ বেতের হুকুম হইল। সে লোক এজাহারে বলিয়াছিল যে, বিদ্যাসাগর বলিয়াছিল বলিয়া এই কাজ করিয়াছি। এইরূপ বহু লোককে বহু কথা বলিলে, সে পাপের ভাগী আমাকেই হইতে হইবে ও আমিই দণ্ড পাইব, এই ভয়ে আমি কাহাকেও কোন ধর্ম্মের কথা বলি না।" এটী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজ মুখে আমরা শুনিয়াছি। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্মমতের সূক্ষ্মমীমাংসা প্রকাশ পাইতেছে, তিনি যে উচ্চশ্রেণীর ধার্ম্মিক ছিলেন, ইহাতেই তাহা প্রকাশিত। তবে, তিনি অন্ধভাবে কোন সম্প্রদায়ের সকল মত মানিয়া চলিতেন না, একথা ঠিক। সকল সম্প্রদায়ের লোককেই তিনি আদর করিতেন। এই জন্যই সকল সম্প্রদায় তাঁহার জন্য আজ শোকে অস্থির। পৃথিবীর কোন মহাজন কাহারও প্রদর্শিত পথে চলিতে পারেন না। মহাজনদিগের বিশেষত্বই এই, তাঁহারা আপন পথে আপনারা চলেন। এ দেশে প্রচলিত কথা এই, সে মুনিই নয়, যাঁর মত বিভিন্ন নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রেমে সর্ব্বত্র পরিচিত, ঐ প্রেম নিগূঢ় ধর্ম্মের ঘনীভূত আভাস মাত্র। যে স্বর্গীয় শক্তি তাঁহার অন্তরে সদা কার্য্য করিত, প্রেম তাঁহারই বিকাশ রূপে জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এমন বীর, এমন আড়ম্বরশূন্য ধার্ম্মিক, এমন পুণ্যাত্মা এ দেশে দুর্লভ। বোধোদয়ে যাঁহার ধর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ, সেই মহাত্মাকে অধার্ম্মিক যে বলে, সে মূর্খ। ম্যাট্‌সিনির প্রতি কথায় ধর্ম্মের ছায়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার মর্ম্মভেদ করিলে ঐরূপ ধর্ম্মপ্রচারের ভাব প্রকাশ পায়। প্রেমিক প্রেমের কাহিনী লিখিতেই ভালবাসে, তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সকলের লক্ষ্য যে কেবল ধর্ম্ম প্রচার, স্থূল বুদ্ধি নরনারী তাহা বুঝিতে অক্ষম, কেননা তাহা ভাষা ও ভাবের অন্তরালে লুক্কায়িত।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মে প্রবীন, বিশ্বাসে অটল, সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার প্রতি ছত্রে ধর্ম্মের আভাস পাইয়া মুগ্ধ হন। এমন মধুর লেখা বাঙ্গলা সাহিত্যে দুর্লভ।

ধর্ম্ম যেমন প্রেমের একাঙ্গ, প্রতিভা তেমনি অন্যাঙ্গ। প্রতিভা সম্বন্ধে অধিক বলিব না, কেননা, প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে; তবে এই মাত্র বলি, প্রতিভার অঙ্কুর প্রেমে প্রোথিত, প্রেমে পোষিত, —জ্ঞানে উন্মেষিত, জ্ঞানে বর্দ্ধিত। প্রতিভা ও প্রেম—পাশাপাশী জিনিস, অথবা ভাই ভগ্নী। দুই-ই কোমল, দুই-ই ভাবুক, দুই-ই মাতোয়ারা, দুই-ই স্বর্গের কুসুম। কাব্যেই হউক, আর ধর্ম্মেই হউক, জ্ঞানেই হউক, আর কর্ম্মেই হউক, দুইয়ের কার্য্য সমতুল্য। এক হীন হইলে অপর খেলে না। প্রেমহীন প্রতিভা, অথবা প্রতিভাহীন প্রেম, দুই-ই আকাশ-কুসুম। ইহার যে সকল দার্শনিক যুক্তি আছে, সে সকলের উল্লেখ করিতে চাই না; তবে এইমাত্র বলি, জগতে যত প্রেমিক এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ঈশা, মুশা, শ্রীচৈতন্য, ম্যাট্‌সিনি, এমারসন, সকলেই প্রতিভান্বিত ব্যক্তি। বিদ্যাসাগরের প্রতিভা এত তীক্ষ্ণ যে, মানুষের অন্তর ভেদ করিয়া তাহা প্রদীপ্ত হইত। যাঁহারা ক্ষণকাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহবাসে থাকিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার প্রতিভার জীবন্ত চিত্র দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। কি গল্পে, কি উপহাসে, কি তর্কে, কি উপ-দেশে, এই প্রতিভা শতমুখী হইয়া প্রকাশ পাইত। সে নয়ন দুটী যেন প্রতিভার খনি, আবার সময়ান্তরে প্রেমের অস্ফুট ভাষা। একই জিনিস নয়ন, এক সময়ে প্রতিভা ও অন্য সময়ে প্রেমের ভাষা। এক সময়ে নয়ন উজ্জ্বল, এক সময়ে জলে অভিসিক্ত। ভাই ভগ্নীর ভাষা—একই নয়ন। আজ সেই নয়ন জ্যোতিহীন, প্রভাহীন, ভাবহীন—চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ। হায়, সেই প্রতিবার উজ্জ্বল খনি, প্রেমের অস্ফুট ভাষা আজ কোথায়? বিদ্যাসাগরকে হারাইয়া আমরা যে কি অমূল্যধন হারাইয়াছি, আজও বুঝিতেছি না। এমন গৌরবের জিনিস এ দেশে আর নাই; আর হইবে না। আমরা আজও অপ্রেমিক বলিয়া এই প্রেমাবতারের সম্যক্-রূপ পরিচয় দিতে বা হৃদয়ে ধারণা করিতে অক্ষম হইতেছি। বিদ্যাসাগরের বুদ্ধি বা জ্ঞান অপ্রচুর না থাকিতে থাকে, কিন্তু তাহা প্রেমেরই সহচর; বিদ্যাসাগর জীবনে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যৎসামান্য পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রেমেরই নিদর্শন। জগতে আজ তাহা উপেক্ষিত হইলেও একদিন তাহার আদর হইবেই হইবে। এক হৃদয়ের শক্তিতে বিদ্যা-সাগর অমর হইয়াছেন; এক চক্ষের জলে বিদ্যাসাগর জগতের পূজ্য। জগত আজও বিদ্যাসাগরের পরিচয় পায় নাই, তাতে কিছু আসিয়া যায় না; ভারতের বিধবার অশ্রুতে, সাঁওতালদের মর্ম্মবেদনায় ইঁহার গৌরব চিরকাল সুরঞ্জিত থাকিবে। এমন সময় আসিবে, যখন পৃথিবীর সকল শক্তির স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু হৃদয়-শক্তির ক্ষমতা বিলুপ্ত হইবে না। বিদ্যাসাগর হৃদয়-শক্তিতে পৃথিবীকে ধন্য করিয়াছেন। এমন অপরাজিত হৃদয় এই নব্যভারতে আর দেখিতে পাই না। এই অপরা-জিত হৃদয়-শক্তিতে বিদ্যাসাগর জগতে চিরকাল পূজা পাইবেন। আর সেই

স্বর্গে, সেই অনন্ত পুণ্যধামে, প্রেমাবতার ম্যাটসিনির পার্শ্বে দেবাসনে বসিয়া দেবশিশু বিশ্বপ্রেমের গুণ গাইয়া ত্রিলোককে মোহিত করিবেন। বিদ্যাসাগর প্রেমে চিরকাল ইহ-জগত ও পরজগতে দেবতা বলিয়া অভিহিত হইবেন। ভারত তুমি ধন্য যে, এমন প্রেমিকের চারণ-ভূমি বক্ষে ধারণ করিয়া আজ পৃথিবীকে আপন গৌরব জানাইতে সক্ষম হইতেছ। ভারতের জয়, প্রেমের জয়, বিধাতার জয়—এই জয় ধ্বনির নীরব-ঘোষণায় বিদ্যাসাগর বঙ্গভূমিকে কাঁপাইয়া গভীর রজনীতে স্বর্গে প্রয়াণ করিয়াছেন। বঙ্গভূমি আজ সুপ্তোত্থিত, আজও বুঝিতেছেন না, ভারত কি অমূল্যধনে বঞ্চিত হইয়াছেন। এমন দিন অদূরে, সে দিন ঘরে ঘরে এই বিদ্যাসাগরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইবে।

বিদ্যাসাগর।

(১)

দয়ার সাগর সেই বিদ্যার সাগর,
সত্যই কি আর নাই, শ্মশানে হয়েছে ছাই,
সে পবিত্র পুণ্যময় দেব কলেবর?
জ্বলন্ত তেজের খনি, বাঙ্গালার দিনমণি,
সত্যই ডুবিল নাকি এত দিন পর?
জনমের মত অস্ত, হইল কি রাহু-গ্রস্ত
সে করুণ সে কোমল স্নেহ সুধাকর,
দয়ার সাগর সেই বিদ্যার সাগর?

(২)

দয়ার সাগর সেই বিদ্যার সাগর,
জননীর প্রিয় ভক্ত, জনকের অনুরক্ত,
আহা সে মায়ের নামে দ্রব জলধর,
ভক্তির বহিত নদী, দুনয়নে নিরবধি,
কিবা সে স্বর্গীয় রূপ পবিত্র সুন্দর!
সে জননীগতপ্রাণ, জননীর সুসন্তান,
দেবত্বের মহত্ত্বের মহা বংশধর,
ভারতের উচ্চ চূড়া, সত্য কি হইল গুড়া,
কীর্ত্তিমান দেব-আত্মা ধবল শেখর,
দয়ার সাগর সেই বিদ্যার সাগর?

(৩)

দয়ার সাগর সেই বিদ্যার সাগর,
নিত্যকর্ম্মী অনলস, হৃদয় সংযত—বশ,
অতুল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নির্ভয় অন্তর,
অকপট সত্যভাষী, জ্বলন্ত বজ্রাগ্নি রাশি,
অসংকোচ মহাপ্রভা প্রদীপ্ত প্রখর!
উদ্যম উৎসাহ ধন্য, পতিত দেশের জন্য,
কাঙ্গালের তরে প্রাণ কোমল কাতর!
সত্যই কি আর নাই, পুড়িয়া হয়েছে ছাই,
সে পবিত্র পুণ্যময় দেব কলেবর,
দয়ার সাগর সেই বিদ্যার সাগর?

(৪)

দয়ার সাগর আহা বিদ্যার সাগর,
কাঁদাইয়া জন্মভূমি, সত্যই কি গেলে তুমি,
কাঁদাইয়া ভারতের কোটি নারীনর,
ডুবা'য়ে হিমাদ্রি বিন্ধ্য, ডুবা'য়ে আব্রহ্ম সিন্ধু
বহায়ে ভারতময় শোকের সাগর,
সত্যই কি গেলে আজ বিদ্যার সাগর?

(৫)

সত্যই কি গেলে আজ দয়ার সাগর?
চাহিলেনা পিছে ফিরে, অই যে নয়ন-নীরে,
ভাসে তব উপবাসী কাঙ্গাল কাতর!
অই যে দরিদ্র দীন, অনাথ আশ্রয়হীন,
অক্ষম আতুর অন্ধ পাপী তাপী নর,
তুমি বিনে নাহি যার, জগতে আশ্রয় আর,

তোমার উপরে যার জীবন নির্ভর,
অই সে দুর্ভাগা সবে, কাঁদে হাহাকার রবে,
শুনিলেনা তাহাদের সে করুণ স্বর,
কেমনে পলায়ে গেলে রেতে দুপ্রহর ?

(৬)

কেমনে গেলেহে হেন নিদারুণ হ'য়ে,
অই যে বিধবা নারী, আঁখিভরা অশ্রুবারি,
বুকভরা ভস্মরাশি কাঁদিতেছে ল'য়ে !
ঘৃণা লজ্জা অপমানে, তাদের ব্যথিত প্রাণে,
গেল আহা অশ্রুময় কত যুগ ব'য়ে,—
অই যে কাঁদিছে তারা, তোমারে হইয়ে হারা,
নিরাশ্রয়া রমণীরে কি গেলেহে ক'য়ে !
তারা যে মাগিছে বর, উর্দ্ধে তুলি দুই কর,
"বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে !"
ভারতের বিধবারে কি গেলেহে ক'য়ে ?

(৭)

অই যে দুখিনী আরো কাঁদে নিরন্তর,
হেমন্ত পদ্মের মত, জলভারে অবনত
ফুলিয়া হ'য়েছে আখি ডাগর ডাগর !
একটা পাষণ্ড পতি, দশগণ্ডা কুলবতী,
করিতেছে অপবিত্র ছুঁইয়া বর্ব্বর !
বিষম সপত্নী জ্বালা, সহিতে পারেনা বালা,
কারো বা পতির মুখ স্বপ্নে অগোচর !
আহা ঐ ব্যাধের ফাঁদে, কত যে হরিণী কাঁদে,
রুধির বমন করে বুকে বিঁধে শর !
কার হেন দয়া বুকে, কে আর তাদের দুখে,
নিষ্ঠুর সমাজ সনে করিবে সমর ?

(৮)

অই যে সন্তালগণ কাঁদিয়া আকুল,
অই যে পাহাড়ে মেয়ে, কাঁদে তব পথ চেয়ে,
প্রকৃতির প্রিয়তম নীল বনফুল !
যাহারে ছোঁয়না কেহ, তাহারে করিতে স্নেহ,
বুকে নিতে শিশু সেই কালী মাথা ঝুল !
অইযে তোমার তরে, তাহারা কাঁদিয়া মরে,
নয়নের নীরে বহে নদী কুল্ কুল্ !
তব বন্য-পরিবার, কে ভালবাসিবে আর,
কার হেন দেবদয়া মমতা অতুল ?
অই যে সন্তানগণ কাঁদিয়া আকুল !

(৯)

বাঙ্গালীর মাতামহ বিদ্যার সাগর,
কোথা আজি গেলে তুমি, কাঁদায়েভারতভূমি,
পিতৃহীনা মাতৃভাষা এত দিন পর !
কে বোঝে তাহার ব্যথা, তাহার দুঃখের কথা,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস উনপঞ্চাশ অক্ষর !
কোটি কণ্ঠে বজ্রনাদে, আকুলে অভাগী কাঁদে,
কাঁপায়ে ভুবন চৌদ্দ—চতুর্দ্দশ স্বর !
পিতৃহীনা মাতৃভাষা এতদিন পর !

(১০)

বাঙ্গালীর মাতামহ বিদ্যার সাগর,
বিশাল বাঙ্গালী জাতি, সমস্ত তোমার নাতি,
করিবে তোমার শ্রাদ্ধ স্নেহার্দ্র অন্তর !
জমাইয়া হা হুতাশ, জমাইয়া দীর্ঘশ্বাস,
স্মৃতির সমাধি স্তম্ভ রচিবে সুন্দর !
অভ্রভেদি সে মন্দির, উপরে তুলিবে শির,
শিখরে জ্বলিবে ভক্তি-মণি মনোহর !
বঙ্গের বিধবা নারী, পাদ্য দিবে অশ্রুবারি,
দিবে কৃতজ্ঞতা অর্ঘ্য দীন দুংখী নর !
কবি দিবে পুষ্পহার, আনন্দ চন্দনে তার,
গন্ধামোদে মাতিবেক বিশ্ব চরাচর !
হাতে লয়ে বর্ণশিক্ষা, তব মন্ত্রে হবে দীক্ষা,
বোধোদয়ে নিরাকার জপিবে ঈশ্বর,
বঙ্গের ভবিষ্য বংশ—শিশু নারী নর !

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর।

"শতগুণে সমাবেশ যেই তনু, তার শেষ
হইয়াছে কাল-সিন্ধু জলে ;
শতহৃদে দহে শোক, আকুল অনাথ লোক
অধোমুখে অশ্রুবিন্দু ফেলে।"

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

বিধাতার লীলা কে বুঝিবে? তিনি কেন রোমকে জগতের শ্রেষ্ঠ পদ দিয়া আবার আঁধারে ডুবাইলেন, কেনই বা ভারতের গৌরব-সূর্য্যকে মধ্যাহ্ন-গগনে তুলিয়া আবার অগাধ সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন, কে বলিবে? বসন্তের পরে কেন নিদাঘের ঝটিকা আসে, শরতের নির্ম্মল শশী কেন শীতের কুয়াসায় মলিন হয়, প্রভাতের ফুল্ল কুসুম কেন দ্বিপ্রহরে ঝরিয়া পড়ে, কে বলিবে? অভ্রভেদী হিমাদ্রি-শৃঙ্গের পাদমূলেই সমুদ্র কেন? উন্নতির অর্দ্ধাঙ্গ অবনতি, উত্থানের চিরসঙ্গী পতন, জীবনের বক্ষের উপরে মরণ, আলোক-আঁধার গঙ্গা-যমুনা, সুধা গরল একাধারে—এক সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত—সুখ দুঃখ দুই ভাই, হর্ষ বিষাদ, শোক আনন্দ এক সূত্রে গ্রথিত—এক আছে তো অপর আছে, এক নাই তো অপর নাই, জগতে এ বন্ধুরতা কেন? বল তো, কণ্টকে কমল কেন, ফণীর মাথায় মণি কেন, মৌমাছীর হুলের আবরণে মধু কেন? কেন, কে বলিবে? নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন সুখ, নিরবচ্ছিন্ন সৌভাগ্য কেন নাই, কে বলিবে?

বর্ষার পরে শরৎ আসে, শীতের পরে বসন্ত আগমন করে, দুর্দ্দিনের অন্ধকার শেষ হইলে, নবভানু উদিত হয়, এতো জগতের চিরপুরাতন নিয়ম। শোকাচ্ছন্ন অনাথ পরিবার যখন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে, অশ্রুর জলে বক্ষ ভাসায়, বিধাতা তাহার ভিতরেও অতি সংগোপনে শান্তির বিধান করিয়া থাকেন! শোকে বিহ্বল হইয়া যে কাঁদিয়াছে, সে জানে। পথিক দিক্-হারা, বিস্তীর্ণ কানন-পথ, সুধু আঁধার —পাথরের মত নিরেট অন্ধকার, মাথার উপরে ঝটিকা শোঁ—শোঁ—করিতেছে, মুসলধারে বৃষ্টি বর্ষিতেছে, দূরে ক্ষীণদীপ-রশ্মি আঁধার ভেদ করিয়া ডাকিতে লাগিল "আয়—আয়—ভয় নাই! আশ্রয় আছে, আশা আছে, আয়—আয়!" বল তো এ ডাক কেমন মধুর। দূরস্থ নিশীথ-বংশি-রব, বহুদিন পরে অকস্মাৎ শ্রুতি-প্রবিষ্ট প্রবাসী প্রণয়ীর মধুর কণ্ঠ-রব, কদাপি কি এত মধুর বোধ হয়? জগতের কুটিল-পথে দিক্-হারা পতিত জাতি আঁধারে পড়িয়া যখন সুধুই কাঁদে, যখন সুধুই ঝড়, সুধুই বৃষ্টি অনবরত শূন্য মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া যায়, তখন মধ্যে মধ্যে বিধাতা তাহাকে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি প্রদর্শন করেন। পতিত জাতির মধ্যে সময় সময় অপার কৃপাগুণে অনাথ-শরণ তাঁহার যে সকল সন্তানকে প্রেম-প্রতিভায় বিভূষিত করিয়া প্রেরণ করেন, তাঁহারাই সেই দীপরশ্মি—বিধাতার অপূর্ব্ব দান। তাঁহারাই সেই অন্ধকার বিদারণ করিয়া, দুঃখী জাতির

করে ধরিয়া বলেন, "আয়—আয়।—এই যে তোর লক্ষ্য পথ,এই পথে আয়—!" এইরূপে কত আলোকস্তম্ভ আগমন করে, কত আলোক প্রবাহ চলিয়া যায়, কত মধুর গম্ভীর আহ্বান উত্থিত হইয়া বিলীন হয়, পতিত জাতি কত স্বপ্ন দেখে, কতবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করে, কতবার চোক মেলে, ঘুমায়, কতকাল পরে গাত্রোত্থান করিবে কে বলিবে? বিধাতার নিগূঢ় লীলারহস্য কে ভেদ করিতে সমর্থ?

বিধাতার ইচ্ছায় একদিন হিন্দুজাতি উন্নতির উচ্চশেখরে উন্নীত হইয়াছিল, তাঁহারই ইচ্ছায় আবার অতল আঁধার গুহায় নিপতিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, এজাতির জাতিত্ব এখনো একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, এখনো ইহার অস্থিপঞ্জর বিদ্যমান আছে, গাঙ্ শুকাইয়াছে, রেখা আছে। আমরা বলি, এমন পাতালভেদী মহাপতন কিন্তু আর দেখি নাই, উত্থানের আশাহীন এমন গুরুপতন বোধ হয় জগতে আর কোথাও ঘটে নাই। রোম, গ্রীশ একদিন পড়িয়াছিল, আবার উঠিয়াছে। ভারত সেই যে পড়িয়াছে, আর উঠিল না, কত আহ্বান, কত দৈববানী বজ্রনির্ঘোষে আঁধার আকাশে বিলীন হইয়াছে, ভারত জাগিল না। ইহার ভিতরে বিধাতার কি গূঢ়-লীলা নিহিত আছে, কে জানে? বাঙ্গালী পতিত আর্য্য-জাতির মহা শব-দেহের অতি ঘৃণিত, অতি হীন, সামান্য প্রত্যঙ্গ মাত্র। বাঙ্গালীর নিজ-গৌরব নাই, পিতৃগৌরবও নাই, বাঙ্গালী সুধু শুষ্ককণ্ঠে, মলিনমুখে দূরপূর্ব্ব-পুরুষদিগের গত গৌরবের কথা বলিয়া জগতের নিকট মান-সম্ভ্রম বাঁচাইতে চায়, কিন্তু কে সে কথা শুনিবে? বাঙ্গালী ঘরে পরে নিন্দিত, হতাদৃত। বাঙ্গালী আচারভ্রষ্ট, বাঙ্গালী পতিত হিন্দু, বাঙ্গালীর ছোঁয়া জল পান করে, এমন হিন্দু ভারতে নাই। পৃথিবীর সকলেই বলে, বাঙ্গালী ভীরু, বাঙ্গালী দুর্ব্বল। আরো বলে, বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী, বাঙ্গালী তঞ্চক। হায়! জগতে বাঙ্গালীর যশ নাই, মান নাই, সম্ভ্রম নাই, দেহে বল নাই, মনে শক্তি নাই, ঘরে ভাত নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই। সংক্রামক জ্বর, বিসূ-চিকা, দুর্ভিক্ষ, দাসত্ব, দৈন্যছাড়া জগতে বাঙ্গালীর বন্ধু নাই। বল তো এমন দুঃখী কে? এমন পতন কে দেখেছ? এমন পতিত জাতি কোথায় আছে? বাঙ্গালা ভীষণ শ্মশান, মহা শ্মশান, বাঙ্গালী তাই শ্মশানকালীর উপাসনা বড় ভালবাসে। এ শ্মশানে রোদন নাই, শব্দ নাই, হুঙ্কার নাই, দীর্ঘশ্বাস নাই, কেন বল তো? অতি শোকে চক্ষে জল থাকে না, মুখে বিলাপ থাকে না, অতি দুঃখে যাতনার বোধ থাকে না, অতি পাপে অনুতাপ থাকে না, অতি-পতনেও বুঝি বা মনে ঘৃণা, তেজ এবং চেতনা থাকে না। বাঙ্গালী এত হীন, এত দুঃখী হইয়াও ভগবৎ-করুণায় বঞ্চিত নয়। কে না জানে, জগতে অদ্বিতীয় অদ্ভুত প্রেমের সঙ্গীত একদিন এই শ্মশানেই গীত হইয়াছে, রামমোহন, কেশবচন্দ্রের অপূর্ব্ব জ্ঞানজ্যোতি এই শ্মশান হইতেই বিকীর্ণ হইয়াছে? এই শ্মশানেই দাঁড়াইয়া, একদিন "কেশব বলিয়াছেন, জগতের লোক বিস্ময় মানিয়া শুনিয়াছে।" মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত জ্ঞানপ্রভা, আকাশের মত উদারতা এবং সমু-দ্রের মত উদ্বেলিত প্রেমরাশি লইয়া ভক্ত চূড়ামণি কেশবচন্দ্র এই শ্মশানেই আবির্ভূত

হইয়াছিলেন। "বর্ত্তমান পৃথিবীর চিন্তা-জগতের রাজা" এই শ্মশানকেই অনাথ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র—বিধাতার অপূর্ব্ব দান, কাঙ্গালের প্রতি অদ্ভুত প্রেম ও করুণার ধারা—একদিন—"একদিন" বলিতে যে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে—একদিন এই পাপক্ষেত্র পবিত্র করিয়াছিলেন। সাতরাজার ধন মাণিক কাঙ্গালের ভগ্ন পর্ণকুটীরে শোভা পাইবে কেন? চোর কৃতান্ত, তাই সে অমূল্য ধন চুরি করিয়াছে, অথবা বিধাতা তাঁহার স্বর্গের সৌষ্ঠব ও গৌরব বাড়াইতে, এ পাপশ্মশানভূমি হইতে সে পবিত্র মাণিক তুলিয়া লইয়াছেন। রাখিবেন কেন? আমরা কি ঈশ্বরচন্দ্রের যোগ্য? আমরা কি বিধাতার করুণা ও অপূর্ব্বদানের আদর বুঝিয়াছিলাম? শ্রীঈশ্বরচন্দ্র যে স্বর্গীয় আহ্বান লইয়া আসিয়াছিলেন, সে অহ্বান কি আমরা শুনিয়াছি? না। তিনি নিজে চক্ষুজলে ভাসিয়া অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পাপ ও অপরাধের ভারে সে স্বর্গীয় মহা পুষ্পেরও পূর্ণ বিকাশের বিষম ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। বোধ হয় যেন, তিনি অতি দুঃখেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র আমাদের অসারতা দেখিয়া, আমাদের মায়া-মমতা ত্যাগ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। আমাদের পক্ষে এ কি নিদারুণ সংবাদ! কিন্তু কৈ আজ তো বাঙ্গালার প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি ঘরে সেইরূপ মর্ম্মভেদী প্রকৃত শোকধ্বনি শুনিতেছি না? গত ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার নিশীথ সময়ে জাতিমন্দিরের সমুচ্চ চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাঙ্গালীর গৌরবসূর্য্য প্রভা ও তেজোরাশি লইয়া চির-আঁধারে মগ্ন হইয়াছে, কাঙ্গালের প্রেমচন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে, দুর্দ্দিন-আঁধারে দুঃখিনী বিধবা ও অসহায় বঙ্গ-বালার আশার প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, বঙ্গভাষার পিতা, বাঙ্গালীজাতির নেতা, তেজ ও আত্মসম্মানের দৃষ্টান্ত চিরদিনের জন্য ইহ জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন, কৈ ঘরে ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সমগ্র দেশের লোক তো একদিনও কাঁদিল না? ইতালীর সুসন্তান গেরিবল্ডীর শোকে ইতালীয়গণ দোকান পাট ও গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া মর্ম্মভেদী গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, ইংরেজের গ্লাড্‌ষ্টোন মরিলে আজ ইংলণ্ডে কি এক প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হইত, তাহা কল্পনায়ও চিত্রিত করিতে পারিতেছি না, আর আমাদের জাতির একজন সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বজনপ্রিয় মহৎলোক ইহলোক হইতে চির বিদায় লইয়াছেন, আমরা সকলে মিলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শোকে মুখখানিও ভাল করিয়া মলিন করিবার মত মলিন করিতে পারি নাই। দেশে শোক-কোলাহল উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সে শোকে পাষাণ ও বজ্র দ্রবকারী দাবাগুন কৈ? যে বিষ-প্রয়োগে মৃত প্রাণ পায়, সে অগ্নিসম হলাহল কৈ? যে মহাগ্নিতে এ শ্মশানময় মরুক্ষেত্র পুড়িয়া ছারখার হইলে, এ পাষাণে উর্ব্বরতাশক্তি সঞ্চারিত হইবে, এ রোদনে—এ অশ্রুধারায় কি সে অনলশিখা ধক্ ধক্ করিতেছে? কে বলিবে? আমরা মহতের আদর, ভগবৎ-কৃপার সম্মান করিতে জানি কৈ?

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্রকে বিধাতা বঙ্গের বক্ষ হইতে—ধরার পৃষ্ঠ হইতে তুলিয়া লইয়াছেন। বিদ্যার সাগর, প্রেমের সিন্ধু, দয়ার পারাবার চিরতরে শুকাইয়াছে, ন্যায়ের অবতার, উদ্যমের অনন্ত ধাতুচ্ছাস, গাম্ভীর্য্যের হিমালয় কাঙ্গাল বঙ্গকে

অধিকতর বাঙ্গালী করিয়া কল্পনার অতীত দেশে লুক্কায়িত হইয়াছেন! শ্মশানময় স্তব্ধ-মরু আজ গাঢ় আঁধাররাশির নিম্নে সুধু ধূ—ধূ—করিতেছে। বাঙ্গালায় আর লোক রহিল না। মানুষ কি সকলে হয়? দ্বিহস্ত, দ্বিপদ, বাঙ্‌ময় রসনাযুক্ত জীব হইলেই কি মানুষ হয়? এমন কোটি কোটি জীব-রাশির সমুদ্র মন্থন করিলেও একটী মানুষ-রত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না সন্দেহ। বাঙ্গালার ছয় সাত কোটি মানবাখ্যাধারী জীবের মধ্যে মানুষ ছিলেন, সুধু শ্রীঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর। সত্যে যাঁহার অচল প্রীতি, ন্যায় ও স্বাধীনতা যাঁহার জীবনের ভিত্তি, প্রেম ও দয়ায় যিনি পরিপূর্ণ, তিনি যদি পঙ্গু হন, বধীর হন, অন্ধ হন, দীন দরিদ্র হন, তবু তিনি মানুষ। রাশি রাশি ধন বা সম্রাটের সিংহাসন, নেপোলিয়ন বা আলেকজেণ্ডার দি গ্রেটের বীরপণা, ক্লিওপেট্রা বা মেনকার রূপরাশি, নিউটন বা কপিলের জ্ঞান পরিমা, ইহার কিছুতেই মনুষ্যত্ব নাই। শুষ্ক জ্ঞানে মনুষ্যত্ব থাকিলে, বেকন মনুষ্য-জগতের রাজা হইতেন, পররক্ত-পাতে মাহাত্ম্য থাকিলে, জঙ্গিস খাঁ, নাদীরসাহ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান মহাজন হইতেন, ধনে মানব-গৌরব থাকিলে, গিজ্‌নীর বিজয়ী মামুদ সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত মনুষ্য হইতেন। বিদ্যাসাগর নির্ধন ছিলেন, অথচ তাঁহাকে সম্মুখে দেখিলে, রাজার রাজমুকুট অবনত হইত। বিদ্যাসাগর সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন—টিকী ত্রিকচ্ছধারী, পায়ে চটিজুতা—অথচ তাঁহার পদশব্দে মহা প্রতাপশালী দুষ্ট লোকেরও হৃদয় থর থর কম্পিত হইত। বিদ্যাসাগর জ্ঞানী ছিলেন, প্রতিভান্বিত ছিলেন, কিন্তু সে জ্ঞানে, সে প্রতিভায় ন্যায় ও সত্যের, প্রেম ও দয়ার এমনই অপূর্ব্ব সমাবেশ ছিল যে, দিবাকরের আলোকে যেমন নক্ষত্র সকল নির্ব্বাপিত হয়, তাঁহার নিকটে মহা মহা পণ্ডিতগণেরও তদ্রূপ দশা ঘটিত। একদিকে বিদ্যাসাগরের প্রেম ও দয়া, নিঃসম্বল দুঃখীজনের, নিরাশ্রয় দুস্থ পরিবার সকলের সেবায় অকাতরে নিয়োজিত, বিধবা ও কুলীন কুমারীগণের অপার-দুঃখ মোচনে সদা উদ্বেলিত, সাধারণ জন-মণ্ডলীকে সমভাবে অতি সাদরে আলিঙ্গন করিতে নিরন্তর ব্যস্ত, অপর দিকে তাঁহার মনের তেজ ও স্বাধীনতা, ন্যায়পরতা ও বিচক্ষণতা, কুসংস্কারীর কুসংস্কার অপনোদনে, অন্যায়কারীর অত্যাচার দমনে, ধনী-দরিদ্র-রাজা-প্রজা-স্বজন-পরজন-অভেদে জ্বলন্ত বজ্রাগ্নি শিখার মত অতি ভীতিপ্রদ ছিল। যে চক্ষে পর-দুঃখে, দুঃখিজনের প্রসঙ্গমাত্রে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইত, অত্যাচারীর অত্যাচারের কথায়, অন্যায়-কারীর অন্যায় কাজের সংবাদে, সেই চক্ষু হইতেই কালাগ্নি শিখা নির্গত হইত। বস্তুত, কোমলতা ও দৃঢ়তা, ভাবুকতা ও গাম্ভীর্য্য, দয়া ও বিচক্ষণতা, প্রেম ও ন্যায়-পরতা, উদারতা ও স্বাধীনতা, অমায়িকতা ও তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা ও উদ্যম একত্র হইয়া বিদ্যাসাগর-চরিত্র রচনা করিয়া ছিল। বিদ্যাসাগরের প্রেম যে পাইত সে ডুবিয়া যাইত, বিদ্যাসাগরের কোপে যে পড়িত, সে ভস্মীভূত হইত। বিদ্যাসাগর-চরিত্রে সকল বিষয়েরই যেন পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, সকল গুণই যেন সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল। এমন পূর্ণাঙ্গ মানব-চরিত্র অতি দুর্লভ। এমন বীর,

এমন প্রেমিক, এমন নিরাড়ম্বর ভক্ত কে কোথায় দেখিয়াছ?

প্রেমের অবতার বিদ্যাসাগর দেশের উপকারের জন্য, দুঃখীর দুঃখ বিনাশ জন্য রাশি রাশি সৎকার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার মহা চরিত্রের ভূরি ভূরি সদ্ভাব-প্রকাশক দৃষ্টান্ত সেই মহৎ জীবনকে বিভূষিত করিয়াছে। তৎসমুদয় কে না জানে? তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে পত্রিকাস্তম্ভ সকল সেই স্বর্ণময় কীর্ত্তিকলাপের ব্যাখ্যানে পরিশোভিত হইয়াছে। সে অসাধারণ গভীর মাতৃ-ভক্তির, সে নিত্যোদ্বেলিত প্রেম-রাশির, সে জ্বলন্ত অগ্নিরাশি তুল্য ন্যায়পরায়ণতা ও মানসিক তেজোরাশির মহাদৃষ্টান্তরাজি কে ভুলিয়াছে? অমর বিদ্যাসাগর স্থূল জড় দেহ ত্যাগ করিয়া আজ আমাদের প্রাণের অতি নিকটস্থ হইয়াছেন। আজ আর তাঁহাকে বাহিরের কার্য্যকলাপরূপ রূপান্তরিত দেহে পরিপূরিত দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আরো কাছে, আরো কাছে, আরো কাছে এস, বলিয়া, সেই মহা পুরুষের মহান্ আত্মাকে আহ্বান করিতে সুধুই ইচ্ছা হইতেছে।

কীর্ত্তি-জগতে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র আজও জীবিত —চিরকাল জীবিত থাকিবেন। সর্ব্ব প্রলয়ঙ্কর মৃত্যু তাঁহাকে শ্রীভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, কখনো পারিবে না। আজ ঈশ্বরচন্দ্র অমর, জ্যোতির্ম্ময়রূপী—সে রূপের তুলনা নাই, বড় মধুর, বড় সুন্দর। সোণার কমল আজ বঙ্গ-নর-নারীর হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে প্রস্ফুটিত। পৃথিবীর ধূলি এবং পঙ্ক আর ইহাকে মলিন করিতে পারিবে না, নিদারুণ রোগের কীট আর ইহাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না, নির্ম্মম কৃতান্ত আর ইহাকে বৃন্তচ্যুত করিতে সমর্থ হইবে না। এস,—আরো কাছে, আরো কাছে, আরো কাছে! এ কৃতজ্ঞতা-হীন শুষ্ক প্রাণেও আজ একবার ফোট। এস, অশ্রুজলে চরণ পাখালিব, স্তুতি করিয়া প্রাণ জুড়াইব। এত কাল যে, তোমায় একটুও আদর করি নাই, দাঁত থাকিতে স্বপ্নেও যে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি নাই। তাই এস, তোমার গম্ভীর আহ্বান শুনি নাই, তোমার অঙ্গুলি-সঙ্কেত দেখি নাই, এস, আজ শুনিব, আজ দেখিব। তুমি যে দুঃখে সদা চক্ষের জলে ভাসিতে, মর্ম্মে বিষধরের দংশন অনুভব করিতে, এস, আজ আমরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তোমার সেই দুঃখ দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইব, এস। অসময়ে আজ ডাকিতেছি, এস। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, এস। দরিদ্র বঙ্গ-ভাষা আজ ডাকিতেছে এস। বঙ্গের দুঃখিনী বিধবা আজ ডাকিতেছে, এস। দুঃখিনী কুলীন-কন্যা আজ ডাকিতেছে, এস। বাল-বিধবার বৈধব্য যাতনা তো আজও দূর হয় নাই, কুলীনকুমারীর, বঙ্গরমণীর বহু সপত্নীর যন্ত্রণাগুন তো আজও নিবে নাই! তবে দয়ার সাগর, কি বলিয়া কেন আসিবে না? অনাথ ছাত্রবৃন্দ আজ ডাকিতেছে, বঙ্গের দরিদ্র অসহায় পরিবারবর্গ আজ ডাকিতেছে, দেশহিতৈষী পরিচালক হারাইয়া আজ ডাকিতেছে, পণ্ডিতমণ্ডলী শিরোরত্ন হারাইয়া আজ ডাকিতেছেন। বুঝেছি, এ অসময়ের ডাক আর শুনিবে না।

আজ তুমি কোথা নও? পুস্তকের বর্ণে বর্ণে তুমি, প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে তুমি,

ছাত্রের হৃদয়ে তুমি, পণ্ডিতের প্রাণে তুমি, দরিদ্রের দীর্ঘ শ্বাসে তুমি, বিধবার প্রতি অশ্রু বিন্দুতে আজ তুমি। আজ তুমি কোথা নও? বাঙ্গালীর মলিনমুখে তুমি, বঙ্গের বায়ুমণ্ডলে তুমি, ঘরে ঘরে, পথে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্র আজ তুমি। এত করিয়া আজ তোমায় পাইতেছি, এত তোমায় দেখিতেছি, এত তোমায় শুনিতেছি, তবু আজ প্রাণ খালি খালি বোধ হইতেছে কেন?

হে মহাত্মন্, তোমার মহামহিমান্বিত মহান্ আত্মা আমাদের বড়ই ভক্তি ও আদরের বস্তু। কিন্তু তোমার আত্মার বাস-গৃহ গৌরবান্বিত দেহ, জড়ময় ও বিনশ্বর হইলেও, তাহা আমাদের বিশেষ অনুরাগের জিনিষ ছিল। তুমি দেব, তাই তোমার অধিষ্ঠান-মন্দির দিব্য শরীর আমাদের নিকট পুণ্যময় স্বর্গতুল্য ছিল। একদিকে অমর জ্যোতির্ম্ময় মহিয়ান দেব-পুরুষ তুমি, অপরদিকে তোমার শ্রীধাম পবিত্রদেহ বৈকুণ্ঠ—পবিত্র কৈবল্যধাম, মর্ত্ত্যলোকে এই উভয়ে যে মণি-কাঞ্চন-যোগ হইয়াছিল, তাহা আমাদের বড়ই প্রীতি সম্পাদন করিতেছিল। আজ সেই প্রীতিময় যোগের অভাব স্মরণেও দুর্ব্বল প্রাণ বজ্রাহত হইতেছে, অগ্নিময় হইয়া উঠিতেছে। আজ নিমতলার শ্মশান-ক্ষেত্রকে ধন্য বোধ হইতেছে। যদিও সে সেই মহা দেহ ভস্মীভূত করিয়া ভীষণ রাক্ষসের কার্য্য করিয়াছে, তবুও কিছু কালের জন্য সেই পবিত্র দেহের পবিত্র ভস্ম বক্ষে ধারণ করিয়া, ধন্য ধন্য ও চির-বিখ্যাত হইয়াছে। আর ভাগিরথি, তুমি ধন্য! এক দিন শ্রীকেশবচন্দ্রের পবিত্র-দেহ-ভস্ম বহন করিয়া, গৌরবে আস্ফালন করিতে করিতে শতবাহু প্রসারণ পূর্ব্বক দিগন্তপ্রসারী সাগরকে প্রীতির উপহার দিয়াছিলে, আর কয়েক বৎসর পরে বিগত ১৪ই শ্রাবণ দিবা দ্বিপ্রহরে শ্রীঈশ্বরচন্দ্রের চিতাভস্ম ধৌত করিয়া তোমার পবিত্র সলিলকে অধিকতর পবিত্র করিয়াছ। তোমার বক্ষ পুণ্যময় হইল। কে বলে তোমার মাহাত্ম্য যাইতেছে? এই সুমহৎ ঘটনাদ্বয়ে তোমার যে মহিমা বৃদ্ধি পাইল, তাহা অনন্তকাল থাকিবে—কোটি কোটি বর্ষেও তোমার মাহাত্ম্য অন্তর্হিত হইবে না। সত্য সত্যই এখন তোমার জলে স্নানাবগাহন করিলে, পাপ দূরে যায়, মানবের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব বাড়ে, স্বীকার করিব।

বিধাতার জগতে কিছুরই অপ্রয়োজন নাই। জ্ঞানময় চৈতন্যস্বরূপ সৃষ্টির মঙ্গলার্থ বিশেষ বিধান করেন। সৃষ্টমাত্রেই সাধারণ এবং বিশেষ ভাব দৃষ্ট হয়। এই বিশেষত্ব কাহাতে বেশী, কাহাতে বা কম, কাহারো পরিদৃশ্যমান, কাহারো বা অনুমেয়। জগতে যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহাদের এই বিশেষ ভাব সাধারণ জনগণাপেক্ষা অতি পরিস্ফুট এবং পরিদৃশ্যমান। সকলেই তাঁহাদের আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব ও স্বীকার করে। তাঁহারা সমাজ-সমুদ্রের মন্থন-দণ্ড মৈনাকের মত আবির্ভূত হন। তাঁহাদের প্রভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হয়, কীর্ত্তি অনাহত শব্দে ঘোষিত হয়।

মহাত্মা বিদ্যাসাগর কেন আসিয়াছিলেন? পাশ্চাত্য সভ্যতা ও প্রাচ্য বঙ্গীয় ভাবের যোগে কিরূপ সুমহৎ সুধাময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে, বিদ্যাসাগর আপনার মহা-জীবনে তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালী পশ্চিমের কি লইবে, প্রাচ্যের কি রাখিবে, তাহাও তিনি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তরবারি ও রাইফেলের সাহায্য ব্যতীত, বিন্দুমাত্র রক্তপাত না করিয়াও যে, উচ্চ শ্রেণীর বীরত্বের অধিকারী হওয়া যায়, রাজনৈতিক আধিপত্য না থাকিলেও, মানুষ যে অতি উন্নত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, রাজা প্রজা সকলের ভক্তি ও সম্ভ্রমের পাত্র হইতে পারে, দরিদ্র হইয়াও যে মহত্ত্ববলে রাজা ও রাজপুরুষদিগের প্রাণের উচ্চ সম্মান লাভ করিতে পারে, বিন্দুমাত্র আড়ম্বর এবং বাহ্য প্রদর্শন ব্যতীতও যে মানুষ ভগবৎ-বিশ্বাসী, ধর্ম্ম-ভীরু, হিতব্রতাবলম্বী, সেবা-পরায়ণ হইতে পারে, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সম্পন্ন হইয়াও যে প্রেম ও দয়ার সাগর হইতে পারে, পিতৃত্ব ও মাতৃভাব, শিক্ষা ও বন্ধুতা যে একাধারে সমাবেশিত হইতে পারে, দুঃখী পতিত বাঙ্গালী জাতিকে তাহা বুঝাইতেই তিনি আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালী কোন্ পথে চলিবে, কোন্ পথে গেলে বাঙ্গালী-চরিত্রের প্রকৃত প্রস্ফুরণ ও পূর্ণ বিকাশ হইবে, তাহা বলিতেই, বিদ্যাসাগর এই তমসাচ্ছন্ন বঙ্গ-শ্মশানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের পথপ্রদর্শক ও আদর্শ স্থানীয়। তাঁহার পার্থিব জীবন-লীলা শেষ হইল, কিন্তু তিনি যে আহ্বান বহন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা গম্ভীর নিনাদে আজও বঙ্গের আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে, যতকাল না এ জাতি পুনরায় জাগিবে, পুনরায় নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবে, ততদিন সে ধ্বনি আকাশ হইতে আকাশে ছুটিয়া বেড়াইবে। সুধু শোক করিলে, কাঁদিলে, বিদ্যাসাগরের মত পুরুষ-সিংহের সম্মান করা হইবে না। এস, বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, বিধবা সধবা, অনাথ সনাথ, ধনি দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, এস, সকলে আজ সেই মহা পুরুষের মহা আহ্বান হৃদয়ে গ্রহণ করি, এস, আজ সেই মহা জীবনের মহা মন্ত্রে দীক্ষিত হই, সেই দেবপুরুষের প্রতি প্রকৃত ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করি। এস, আজ সেই মহা পুরুষকে রক্তে মিশ্রিত করি, প্রাণে মাখি, হৃদয়ে রাখি।

বিদ্যাসাগর কেন আসিয়াছিলেন, কিছু কিছু বুঝিলাম, কেন গেলেন, বুঝিলাম না। বিধবার কান্না, দরিদ্রের দুঃখ আজও শেষ হয় নাই, ঘোর অমানিশার আঁধারে বঙ্গ আজও আবৃত, আজও এ শ্মশানে শব্দ নাই, নিশ্বাস নাই, চেতনা নাই, তবু বিধাতা তাঁহার সন্তানকে কেন ডাকিয়া লইলেন, বুঝিলাম না। তাঁহার অনন্ত নিগূঢ় লীলা, সে লীলরহস্য কে বুঝিবে? আজ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র জ্যোতির্ম্ময় ধ্রুভূলোকের অতি সমুচ্চ স্থানে বাস করিতেছেন। দেবগণ, তদীয় সমাগমে আনন্দ কোলাহল করিতেছেন, তিনি জরা মৃত্যুর অতীত অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে অপার আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন। তবু আজ তাঁহার শোকে হৃদয় প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে কেন? বোধ হইতেছে যেন একটী প্রদীপ্ত আগ্নেয়গিরি হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, হিমাচল অকস্মাৎ বঙ্গের বক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। পৃথিবী শূন্য বোধ হইতেছে, আকাশ অন্ধকারপূর্ণ বোধ হইতেছে! এই যে দেবপুরুষ পুণ্য প্রভায় ইহ জগৎ আলোকিত করিতেছিলেন,

দেব-গানে আকাশ সুধাময় করিতেছিলেন! হঠাৎ কণ্ঠ নীরব হইল, সংসার তমসাচ্ছন্ন হইল! আলো কেন নিবিল? গান কেন থামিল? আশা অপূর্ণ থাকিতে, আশা-গগনের চাঁদ কেন অস্তমিত হইল? পিপাসা অতৃপ্ত থাকিতে, সুধা-সিন্ধু কেন শুকাইল? লীলা—লীলা—লীলা। লীলাময় হরি হে, তোমার জয় হউক, তব লীলার জয় হউক্। হৃদয় বজ্রে চূর্ণ হইবে, প্রাণ দাবা-গুনে দগ্ধ হইবে, তবু বলিব, তব লীলার জয় হউক্, তোমার জয় হউক্, ইহাইতো তোমার বিধান। আগুনে দগ্ধ হইয়া, সাগরে ডুবিয়া, যেন তোমার ভক্তের মত আমরা চিরদিন তোমার মঙ্গল বিধি শিরে বহন করিতে পারি। দেব, আমরা যে কাঁদিতেও জানিনা। আমাদিগকে কান্না শিখাও। যেন আমাদের আর্ত্তনাদে, অশ্রুর-তরঙ্গে একদিন তোমার সিংহাসন টলমল হয়, যেন একদিন তব আদেশে ঈশ্বরচন্দ্র শতরূপী হইয়া, বঙ্গের আঁধার কুটীর সকল আলোকিত করেন। তোমার জয় হউক্, তব লীলার জয় হউক্। তব লীলা অগম্য।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের মধ্যে আর নাই, কিন্তু পুরুষানুক্রমে বঙ্গবাসী-দিগের প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তিনি ইদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যের প্রণেতা, তিনি বঙ্গ সমাজের সংস্কার-কর্ত্তা, তিনি হৃদয়ের ওজস্বিতা ও দাক্ষিণ্য গুণে জগতের একজন শিক্ষাগুরু। গুরু আজি পাঠশালা বন্ধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিমণ্ডিত চিত্র খানি ধ্যান করিয়া দুই একটি বিষয়ে আজি শিক্ষা লাভ করিব।

যাঁহাদিগের বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, আজি তাঁহারা নিজ শৈশবাবস্থার কথা স্মরণ করিতেছেন। সে সময়ের বঙ্গ সমাজ অদ্যকার সমাজের মত নহে, তখনকার সাহিত্য অদ্যকার সাহিত্যের ন্যায় নহে। প্রাচীনা গৃহিণীগণ অথবা দোকানী পসারী লোকে রামায়ণ মহাভারত পড়িতেন, যুবকগণ ভারতচন্দ্র আওড়াইতেন, শাক্তগণ রামপ্রসাদের গান গাইতেন, নব্য সম্প্রদায় নিধুবাবুর টপ্পা গাইতেন, অথবা দাশুরায়ের ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব পাঠক কেহ কেহ চৈতন্যচরিতামৃতের পাতা উল্টাইতেন, শাক্ত পাঠক কেহ কেহ মুকুন্দরামের চণ্ডীখানি খুলিয়া দেখিতেন। এই ছিল বাঙ্গলা পদ্যের অবস্থা, সুমার্জ্জিত বাঙ্গালা গদ্য তখনও সৃষ্ট হয় নাই।

এইরূপ কালে ক্ষণজন্মা ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সহস্র সদ্গুণের মধ্যে তাঁহার ওজস্বিতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞতাই সর্ব্বপ্রধান গুণ। যেটী কর্ত্তব্য সেটী অনুষ্ঠান করিব,—যেটী অনুষ্ঠান করিব সেটী সাধন করিব,—এই ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ের সংকল্প। সমস্ত সমাজ যদি বাধা দিবার চেষ্টা করে, সিংহবীর্য্য ঈশ্বরচন্দ্র

সে সমাজব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহার অলঙ্ঘনীয় সংকল্প সাধন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র আজি আমাদের এই পরম শিক্ষা দান করিতেছেন,—এই শিক্ষা যদি আমরা লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের হস্তে,—পরের হস্তে নহে।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, বঙ্গভাষায় সুমার্জ্জিত নির্ম্মল হৃদয়গ্রাহী গদ্যগ্রন্থ নাই। ক্ষণজন্মা বিদ্যাসাগর স্বহস্তে তাহার সৃষ্টি করিলেন। সংস্কৃত ভাষার অমূল্যভাণ্ডার হইতে সুন্দর সুন্দর পবিত্র গল্প ও পবিত্র ভাব নির্ব্বাচন করিলেন, সংস্কৃত রূপ মাতৃভাষার সাহায্যে নূতন বাঙ্গালা ভাষায় সেই গল্প ও সেই ভাব প্রকাশ করিলেন,নিজের হৃদয়গুণে, নিজের প্রতিভাবলে সেই গল্পগুলি মনোহর ও হৃদয়-গ্রাহী করিয়া তুলিয়া বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারের উচ্চতম স্থানে স্থাপন করিলেন। বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা ও সীতার বনবাস, কোন্ বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা এই পুস্তকগুলি পড়িয়া চক্ষুর জল না বর্ষণ করিয়াছেন? কোন্ সহৃদয় বাঙ্গালী অদ্যাবধি যত্ন সহকারে না পাঠ করে? ঈশ্বরচন্দ্রের একটী সঙ্কল্প সাধিত হইল,—নির্ম্মল সুমার্জ্জিত বাঙ্গলা গদ্যের সৃষ্টি হইল। ইহাতেই বিদ্যাসাগর নিরস্ত রহিলেন না। আপনি যে পথে গিয়াছেন, প্রতিভাসম্পন্ন স্বদেশবাসীগণকে সেই পথে লইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সংস্কৃত না শিখিলে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতি নাই। কিন্তু সংস্কৃত কে শিখায়, কে শিখে? টোলে পড়িতে যাইলে অর্দ্ধেক জীবন তথায় যাপন করিতে হয়,—তখনকার পণ্ডিতগণ বলিতেন, এরূপ না করিলে সংস্কৃত শিক্ষা হয় না। তবে কি শিক্ষিত হিন্দুগণ চিরকাল ঐ পবিত্র ভাষায় বঞ্চিত থাকিবে? তবে কি হিন্দুদিগের পৈতৃক রত্নরাজি ও অনন্ত ভাণ্ডার হিন্দুদিগের চিরকাল অবিদিত থাকিবে? তবে কি হিন্দুজাতির গৌরবস্বরূপ সংস্কৃত সাহিত্য কেবল অল্প সংখ্যক লোকের একচেটিয়া ধন হইয়া থাকিবে?

বিদ্যাসাগর চিন্তা করিলেন, বিদ্যাসাগর উপায় উদ্ভাবন করিলেন, বিদ্যাসাগর কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন, বিদ্যাসাগর কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার একচেটিয়া উঠিয়া গেল, সহস্র সহস্র দেশানুরাগী যুবক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবিত সরল প্রণালীদ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যের মধুরতা আস্বাদন করিল, প্রাচীন গ্রন্থের, প্রাচীন রীতির, প্রাচীন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা অনুভব করিল—ক্রমে আজি হিন্দু-সমাজ সেই প্রাচীন পবিত্রতার দিকে ধাবিত হইতে চলিল। স্বার্থপর লোকের কি এ সমস্ত গায়ে সহে? হিন্দু-ধর্ম্মের ভণ্ডামি করিয়া যাঁহারা পয়সা আদায় করে, তাহারা সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। আবার দ্বার রুদ্ধ কর,—আবার শিক্ষিত দেশহিতৈষীদিগকে প্রাচীন শাস্ত্র-ভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত কর,—আবার স্বার্থপরদিগকে সেই ভাণ্ডারের প্রহরী স্বরূপ স্থাপন কর, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্য নষ্ট হয়, কিন্তু ভাণ্ডারীদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম লোপ হইয়া উপধর্ম্মের অন্ধকারে দেশ পুনরায় আবৃত হয়,—তাহাতে হানি কি? ভাণ্ডারীদিগের পয়সা আদায়ের উপায় হয়।

বৃথা আশা! জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার

উদ্ঘাটিত হইয়াছে,—হিন্দু-জাতি আপনাদিগের প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন বিজ্ঞান, প্রাচীন-ধর্ম্ম পুনরায় চিনিতে পারিয়াছে, তাহারা সে ধনে আর বঞ্চিত হইবে না।

তাহার পর? তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক উন্নতি-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নির্জ্জীব জাতির সামাজিক উন্নতি-সাধন করা কত কষ্টসাধ্য, তাহা আমরা অদ্যাবধি পদে পদে দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুনারীদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করাতে স্বার্থপর পুরুষে কত বাধা দেয়, তাহা আমরা আধুনিক ঘটনা হইতে দেখিতে পাইতেছি। যাঁহারা নিজে আর্য্য-সন্তান বলিয়া দর্প করেন, তাঁহারাই বাল্য-বিবাহ, বিধবার চিরবৈধব্য প্রভৃতি অনার্য্য-প্রথাগুলি সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। যাঁহারা নিজে হিন্দুয়ানীর গর্ব্ব করেন, তাঁহারাই রমণীগণকে অশিক্ষিত রাখা ও দাসীর ন্যায় ব্যবহার করা প্রভৃতি অহিন্দু আচারগুলির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এ সমস্ত কুপ্রথা ও কুতর্কের একমাত্র ঔষধি আছে;—এ সমস্ত অহিন্দু আচার প্রতিবিধান করিবার একমাত্র উপায় আছে,—সে ঔষধি ও সে উপায়,—প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা।

অদ্যাবধি যদি কুসংস্কারের এরূপ বল থাকে, তাহা হইলে ত্রিংশং বৎসর পূর্ব্বে ইহার কিরূপ বল ছিল, সহজে অনুভব করা যায়। সামান্য লোকে এরূপ অবস্থায় হতাশ হইত;—কৃতসংকল্প ঈশ্বরচন্দ্র হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা ও ভণ্ডামি,—অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের হৃদয়-শূন্যতা, নির্জ্জীব জাতির নিশ্চলতা,—অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির বল, উপধর্ম্মের উৎপীড়ন, অপ্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্মের অত্যাচার, গণ্ডমূর্খ ও স্বার্থপর ভট্টাচার্য্যদিগের মত, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জ্জীব, নিশ্চল, তেজোহীন বঙ্গসমাজ,—অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আমাদিগের নির্জ্জীব বঙ্গ সমাজে এরূপ ব্যাপার বড় অধিক দেখা যায় নাই,— পবিত্রনামা রামমোহনের সময়ের পর এরূপ তীব্র যুদ্ধ, এরূপ সামাজিক দ্বন্দ, এরূপ সঙ্কল্প, এরূপ অনুষ্ঠান, এরূপ সিংহবীর্য্য বড় দেখা যায় নাই। পুরুষ-সিংহের সম্মুখে সমাজের মূর্খতা, জড়তা ও স্বার্থপরতা হটিয়া গেল, সামাজিক যোদ্ধা অসি হস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আইন জারি করাইলেন; বিদ্যাসাগরের গৌরবে দেশ পূর্ণ হইল, বিদ্যাসাগরের বিজয় লাভে প্রকৃত হিন্দু সমাজ উপকৃত হইল।

আর একটী মহৎ কার্য্যে ঈশ্বরচন্দ্র হস্তক্ষেপ করেন। আমাদের প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে সন্তানাদি না হইলে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের বিধান আছে, নচেৎ ইচ্ছানুসারে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্য দেহের সৌন্দর্য্য, বল, তেজ ও গৌরব সমস্তই যেরূপ মৃত্যুর পর লোপ প্রাপ্ত হয়, এবং অবয়ব খানি বিকৃত ও পূতিগন্ধ পূর্ণ হয়,—জাতীয় জীবন লোপ হইলে জাতীয় ধর্ম্মও সেইরূপ সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও উপকারিতা হারাইয়া নানা রূপ জঘন্য আচার ব্যবহারে পরিবৃত হয়। দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের কারণ ও আবশ্যকতা বিস্মৃত

হইয়া এক্ষণকার স্বার্থপর বিলাস লালসা-পরায়ণ পুরুষগণ ইচ্ছানুসারে বহু বিবাহ করাই হিন্দু আচার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং ভণ্ড ধর্ম্মব্যবসায়ীগণ এই কুপ্রথাই ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এই রূপেই আমাদের দেশের, আমাদের জাতির, আমাদের ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যাহা কিছু সরল পবিত্র ও সমাজের উপকারী ছিল, তাহা বিকৃত বা বিলুপ্ত বা জঘন্য আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং মনুষ্য জীবন বহির্গত হইলে পূতিগন্ধপূর্ণ শব লইয়া আহার-প্রিয় কীটের যেরূপ উল্লাস হয়, জাতীয় জীবন-শূন্য হিন্দুদিগের বিকৃত আধুনিক অহিন্দু আচরণ ও রীতিগুলি পয়সা-প্রিয় ভণ্ডগণের সেই রূপ উল্লাসের কারণ হইয়াছে। কোন সংস্কার আরম্ভ হইলেই তাহাদিগের একচেটিয়া রোজ-কারের উপায় হ্রাস হয়,—সুতরাং "ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল" বলিয়া চিৎকার আরম্ভ হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় আইন দ্বারা বহু বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাহাতে বিফল-প্রযত্ন হইলেন। আমাদিগের বিদেশীয় রাজা সত্যই বলিলেন, "যদি তোমাদের সামাজিক কোনও কুপ্রথা উঠাইবার ইচ্ছা থাকে, সমাজ সে বিষয়ে যত্ন করুক,—আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। কেবল দণ্ডনীয় অপরাধ মাত্র আমরা নিষেধ করিতে পারি।" রাজা এ বাক্য প্রতিপালন করিয়াছেন,—পাশব অপরাধ দুই একটী আইন দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন, নচেৎ সামাজিক আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর ক্রমশঃ হীনবল হইতে লাগিল। আমি ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম। পরে আজি ছয় বৎসর হইল যখন রাজকীয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় কিছুদিন বাস করিয়া ঋগ্বেদসংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করি, তখন সর্ব্বদাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপদেশ লইতে যাইতাম এবং তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় হইল। বলা বাহুল্য যে তাঁহার উদারতা, তাঁহার সহৃদয়তা, তাঁহার প্রকৃত দেশ-হিতৈষিতা, ও তাঁহার প্রকৃত হিন্দুযোগ্য সমদর্শিতা যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে লাগিলাম। তাঁহার সুন্দর পুস্তকালয় তিনি আমাকে দেখাইলেন, তাঁহার সংস্কৃত পুঁথি গুলি বসিয়া বসিয়া ঘাঁটিতাম, অনেক বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাঁহার নিকট উপদেশ চাহিতাম। বাঙ্গালী মাত্র ঋগ্বেদের অনুবাদ পড়িবে, এ কথা শুনিয়া যাহারা হিন্দু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পয়সা আদায় করে, তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল! ধর্ম্ম-ব্যাপারিগণ ঋগ্বেদের অচিন্তিত অবমাননা ও সর্ব্বনাশ বলিয়া গলাবাজী করিতে লাগিল,—গলা-বাজীতে পয়সা আসে! ধর্ম্মের দোকানদারগণ অনুবাদ ও অনুবাদককে যথেষ্ট গালিবর্ষণ করিতে লাগিল,—গালিবর্ষণে পয়সা আসে! এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে যে কথা গুলি বলিলেন, তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইবনা। তিনি বলিলেন, "ভাই,—উত্তম কাজে হাত দিয়াছ, কাজটী সম্পন্ন কর। যদি আমার শরীর একটু ভাল থাকে, যদি আমি কোন রূপে পারি, তোমার সাহায্য করিব।" পাঠকগণ প্রকৃত

হিন্দুয়ানী ও হিন্দু ধর্ম্ম লইয়া ভণ্ডামির বিভিন্নতা দেখিতে পাইলেন? নিঃস্বার্থ দেশোপকার এবং দেশের নাম লইয়া পয়সা উপায়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারিলেন? সর্ব্ব সাধারণকে প্রকৃত হিন্দু শাস্ত্রে দীক্ষিত করা,—এবং হিন্দু শাস্ত্রসিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার নাম লইয়া রোজকারের উপায় উদ্ভাবন করার মধ্যে কি বিভিন্নতা, অবগত হইলেন?

আজি সে মহাপ্রাণ হিন্দু অবতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর নাই,—সমস্ত দেশের লোকে তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে, তাঁহার জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলা হইতে আমিও এক বিন্দু অশ্রুবারি মোচন করিলাম। কিন্তু আমাদের রোদন যদি অশ্রু বিন্দুতেই শেষ হয়, তাহা হইলে আমরা বিদ্যাসাগরের নাম উচ্চারণ করিতেও অযোগ্য। তাঁহার জীবন হইতে কি কোনও শিক্ষা লাভ করিতে পারি না? তাঁহার কার্য্য পরম্পরা অলোচনা করিয়া কি কোন প্রকার উপকার লাভ করিতে পারি না?

ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি সকলের ঘটেনা। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় ওজস্বিতা, মানসিক বল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সকলের সম্ভবে না। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় জগৎগ্রাহী সহৃদয়তা, বদান্যতা ও উপচিকীর্ষাও সকলের হইয়া উঠেনা। কিন্তু তথাপি ঈশ্বরচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া আমরা বোধ হয় একটু সোজা পথে চলিতে শিখিতে পারি,—একটু কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে উদ্যম করিতে পারি,—একটু ভণ্ডামি ত্যাগ করিতে পারি। যেটী সমাজের উপকারী, যেটী প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের অভিমত, সে প্রথাটী যেন ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিতে শিখি। যেটী সমাজের অপকারক, যেটী প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের অনভিমত, সে প্রথা যেন ক্রমে ক্রমে বর্জ্জন করিতে শিখি। প্রাচীন শাস্ত্রে ও সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে যেন আস্থা হয়। উপনিষদাদি প্রাতঃস্মরনীয় গ্রন্থ পাঠে যেন অনাদি অনন্ত ব্রহ্মের পূজা দেশে প্রচারিত হয়,—প্রস্তর ও মৃত্তিকার পূজা যেন বিলুপ্ত হয়। আর্য্য সন্তানগণ যেন প্রাচীন আর্য্যের ন্যায় নিজের দেবকে স্মরণ করিয়া নিজে আহুতি দিতে শিখেন;—ধর্ম্মানুষ্ঠানে কালীঘাটের পাণ্ডাকে মোক্তার নামা দিবার আবশ্যক নাই। এবং মনুর সন্তানগণ যেন মনুর আদেশ অনুসারে নারীকে সম্মান করিতে শিখেন, যোগ্য বয়সে কন্যার বিবাহ দেন, অল্প বয়স্কা বিধবার পুনরুদ্বাহ প্রথা প্রচলিত করেন, বহু বিবাহ প্রথা বর্জ্জন করেন, এবং পাশব আচরণ বিস্মৃত হইয়া মনু-সন্তানের নামের যোগ্য হয়েন। হত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, পরস্ত্রীগমন, এবং পাপীর সংসর্গ, এই গুলি মনুর মতে মহাপাতক। এই দোষের জন্য যদি সমাজ দোষীকে দণ্ডিত করিতে শিখেন, তবেই সমাজ আর্য্য নামের যোগ্য হইবে, এবং ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে।

সমাজ কাহাকে বলে? মনুষ্য জড় হইয়াই সমাজ হয়। যদি আমরা প্রত্যেকে একটু করিয়া সৎপথে যাইতে প্রয়াস করি, ভণ্ডামির কথা না শুনি, অসৎ কার্য্যে বিমুখ হই, তাহা হইলে সমাজ উন্নতির পথে চলিবে। সে দিন রথ যাত্রা হইয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড রথ, তাহাকে টানে কোনও মনুষ্যের সাধ্য নহে। কিন্তু শত শত লোকে দড়ী ধরিল, সকলে একটু একটু করিয়া টানিল, রথ হড় হড়

করিয়া চলিল।” আমরা সকলে যদি আমাদিগের ক্ষুদ্র বল ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া হিন্দু সমাজকে সনাতন প্রশস্ত পথে চালিত করি, সমাজ সেই দিকেই চলিবে। যদি আমরা সে টুকুও না করিতে জানি, তবে আমাদিগের শিক্ষা বৃথা, আমাদিগের হিন্দু নামের অভিমান বৃথা,—এবং প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর বৃথাই আমাদিগের মধ্যে জন্ম ধারণ করিয়া আজীবন আমাদিগের জন্য শ্রম করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

শোকোপহারঃ।

ভীমা কালনিশীথিনীব নিবিড়া শোকান্ধকারাবলী
দিক্‌চক্রং কবলীকরোতি নিখিলং চৈতন্যশূন্যং জগৎ।
ইত্থং ঘোররসাতলান্তরইব প্রক্ষিপ্য সর্ব্বান্ জনান্
বিদ্যাসাগর! ভারতাম্বরমণে! কুত্র ত্বয়া প্রস্থিতম্॥ ১॥

বিদ্যা সাপগতা গতা চ বিলয়ং সালৌকিকী বীরতা
ধর্ম্মঃ সোঽপি গতঃ সুখঞ্চ গলিতং তন্নামশেষং যশঃ।
সর্ব্বং ভারতমেব তেঽদ্য বিরহে জাতং শ্মশানং মহৎ
ঘোরাঃ শোকচিতাগ্নয়ো দিশি দিশি জ্বালাবলীং তন্বতে॥ ২॥

আকাশং স্ফুটতীব হন্ত শতধা হাহারবৈঃ সর্ব্বতঃ
বাহিন্যঃ প্রবহন্তি হন্ত শতশো দীনাশ্রুধারাশতৈঃ।
ছিন্নঃ কল্পতরুর্মহীতলগতঃ শুষ্কো দয়াসাগরঃ
হা লুপ্তা পরদুঃখমোচনকথা দেশোঽশরণ্যোঽধুনা॥ ৩॥

(অনুবাদ)

ঘোরতর শোকান্ধকার, ভয়ঙ্করী কালরাত্রির ন্যায় দিঙ্মণ্ডলকে গ্রাস করিয়াছে, সমস্ত জগৎ চৈতন্য-শূন্য। এইরূপে লোকসকলকে যেন তমোময় রসাতল-গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া, হা ভারত-সূর্য্য বিদ্যাসাগর! তুমি কোথায় গেলে! ।১।

ভারতের সে বিদ্যার গৌরব লোপ পাইল, সে অলৌকিক বীরত্ব ফুরাইল, সে ধর্ম্মানুরাগ লয় পাইল, সে সুখসম্পদ্ শেষ হইল, সে কীর্ত্তির শুধু নামমাত্র রহিল। আজি তোমার বিরহে সমস্ত ভারতবর্ষ মহাশ্মশান! যে দিকে চাই, দেখি কেবল ভীষণ শোকাগ্নির চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। ২।

চারিদিকে হাহাকারে আকাশ যেন শতচীর হইতেছে, দীন-দরিদ্রের অজস্র অশ্রুধারায় শত শত নদী বহিতেছে; পৃথিবীর কল্পবৃক্ষ আজি ছিন্ন হইল, দয়ার সাগর শুখাইল, হায়! আজি পরদুঃখমোচনের কথা লোপ পাইল, দেশ নিরাশ্রয় হইল। ৩।

সর্ব্বেষাং করুণাময়ী গতবতী মাতাদ্য যাতঃ পিতা
পুত্রঃ সোঽপি গতো গতোঽপি চ সুহৃদ্ ভ্রাতাপি যাতোঽধুনা।
সর্ব্বস্বং বিগতং দিশশ্চ সকলা জাতা নিরালম্বনাঃ
আপন্নাভয়দানদীক্ষিত! দিবং হাহা ত্বয়ি প্রস্থিতে॥ ৪॥

প্রাণানুত্‌ক্রমণোন্মুখান্ ধৃতবতী লব্ধ্বা ত্বমেকং সুতং
সারং রত্নমিবাব্ধিমন্থনভবং বিশ্বম্ভরাগৌরবম্।
নো জানে ত্বয়ি সাম্প্রতং নিপতিতঃ কোবাভিশাপাশনিঃ
হংহো ভারতভূমি ভাগ্যরহিতে! সোঽপি ত্বয়া হারিতঃ॥ ৫॥

বাল্মীকেঃ কবিতা যথা হিমগিরের্গঙ্গা যথা পাবনী
ক্ষীরাব্ধেঃ কমলা যথাজনি তথা বঙ্গস্থ ভাষা যতঃ।
হাহা তাদৃশপুত্ররত্নমতুলং দিব্যং মহাভূষণম্
ত্যক্‌ত্বাদ্যাপি করালকালকবলে মাতঃ কথং জীবসি॥ ৬॥

ত্রৈলোক্যে প্রতিকূলতামপি গতে যো ধর্ম্মবীরাগ্রণী-
রেকাকী হতভাগ্যবালবিধবাত্রাণায় চক্রে বিধিম্।
দুর্নীতিং বহুদারসংগ্রহকরীং হর্ত্তুঞ্চ সর্ব্বাত্মনা
যো যেতে নরবিগ্রহঃ সহি মহাদেবো দিবং প্রস্থিতঃ॥ ৭॥

আজি সকলের দয়াময়ী মাতা চলিয়া গেলেন, সকলে পিতৃহীন হইল, পুত্রশোক পাইল, সকলের ভাই বন্ধু গেল। হা বিপন্নগণের অভয়দানে দীক্ষিত! বিদ্যাসাগর! তুমি স্বর্গারোহণ করায় আমরা সর্ব্বস্ব হারাইলাম, দশদিক্ শূন্য দেখিতেছি। ৪।

হায় রে অভাগা ভারতভূমি! তুমি যে একমাত্র পুত্র লাভ করিয়া অন্তিম প্রাণবায়ু ধারণ করিয়াছিলে, তোমার যে পুত্র সাগরছাঁচা সার মাণিক, বসুন্ধরার গৌরব, তুমি সেই শেষ রত্নটীও হারাইলে! জানি না, তোমার উপর বিধাতার কি ভয়ানক অভিশাপ! কি নিদারুণ বজ্রাঘাত!। ৫।

যেমন বাল্মীকি হইতে কবিতা, হিমালয় হইতে ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা, এবং সুধাসাগর হইতে লক্ষ্মী জন্মলাভ করেন, তেমনি যাঁহা হইতে আমাদের পরমারাধ্যা বঙ্গভাষা জন্মলাভ করিয়াছেন, হায়! সে হেন অনুপম দিব্য ভূষণ অমূল্য রত্নকে আজি করাল কাল-কবলে বিসর্জ্জন করিয়া, মা জন্মভূমি! কেমন করিয়া প্রাণ ধরিতেছ?। ৬।

ত্রিভুবন যাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেও, ধর্ম্মবীরগণের অগ্রগণ্য যে মহাত্মা একাকী ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, হতভাগ্য বালবিধবাগণের বৈধব্যযন্ত্রণামোচনের উপায় বিধান করিয়াছিলেন; যিনি বহুবিবাহরূপ ঘৃণিত দেশাচার নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন; হায়! আজি সেই নররূপী মহাদেব দেবলোকে প্রস্থান করিয়াছেন!। ৭।

দুর্ব্ব্যাখ্যাবিষমূর্চ্ছিতং মুনিমতং প্রোজ্জীবয়ন্ যঃ পুনঃ
সদ্ব্যাখ্যামৃতসেচনেন মনুজান্ প্রাবর্ত্তয়দ্বর্ত্মনি।
যশ্চক্রে প্রথমং স্বদেশকৃতিভিঃ সর্ব্বোচ্চশিক্ষাপথং
পুণ্যশ্লোকধুরন্ধরঃ স ভগবান্ হা প্রস্থিতঃ সাগরঃ॥ ৮॥

কারুণ্যসিন্ধো বত দীনবন্ধো! হা ক্বাসি মূর্ত্তে! ভুবি মাতৃভক্তেঃ।
হাহা তবৈকস্য বিয়োগশোকাৎ নির্জ্জীব এষোঽখিলজীবলোকঃ॥ ৯॥

ভগ্নৌ তবাঙ্ঘ্রী হৃদয়ঞ্চ ভগ্নং ত্বগ্নং ললাটঞ্চ শিরোঽপি ভগ্নম্।
কিং বা ন ভগ্নং তব জন্মভূমে! তং সাগরং সংহরতা বিধাত্রা॥ ১০॥

অস্মাকং লোচনপথাৎ ত্বয়ি যাতেঽপ্যদর্শনম্।
অদর্শনং তু হৃদয়ান্ন কদাপি গমিষ্যসি॥ ১১॥

নির্ব্বাণেঽপি চিতাগ্নৌ তে পুণ্যে ভাগীরথীতটে।
লোকস্য হৃদি শোকাগ্নিশ্চিরমেব জ্বলিষ্যতি॥ ১২॥

উপাগতেঽপি বিলয়ং শরীরে তব ভৌতিকে।
অক্ষয়ঃ কীর্ত্তিকায়স্তে প্রলয়েঽপি ন লেষ্যতে॥ ১৩॥

সনাতন ঋষি-শাস্ত্র, বিকৃত ব্যাখ্যারূপ বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছিল, যিনি তাহাতে সদ্ব্যাখ্যারূপ অমৃত সেচন করিয়া পুনর্জীবন দান করিয়াছেন; যিনিই প্রথমে স্বদেশীয় কৃতবিদ্য দ্বারা স্বদেশের উচ্চশিক্ষার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; হায়! সেই পুণ্যশ্লোক-গণের অগ্রগণ্য ভগবান্ বিদ্যাসাগর আজি প্রস্থান করিয়াছেন!। ৮।

হা কৃপাসিন্ধো! হা দীনবন্ধো! হা মাতৃভক্তির অবতার! তুমি কোথায় গেলে! হায়! হায়! আজি একমাত্র তোমারি বিরহশোকে সমস্ত জীবলোক যেন জীবনশূন্য হইয়াছে!। ৯।

হা জন্মভূমি! বিধাতা সেই সাগরকে হরণ করিয়া তোমার পা ভাঙ্গিয়াছেন, তোমার বুক ভাঙ্গিয়াছেন, তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছেন, তোমার মাথা ভাঙ্গিয়াছেন, তোমার কি না ভাঙ্গিয়াছেন? । ১০।

তুমি আমাদের নয়নপথ হইতে চলিয়া গেলেও, আমাদের হৃদয় হইতে চলিয়া যাইতে কস্মিন্কালেও পারিবে না। ১১।

পুণ্য জাহ্নবী-তটে তোমার চিতার আগুণ নিবিলেও, লোকের হৃদয়ে এ শোকের আগুণ কোনও কালেই নিবিবে না। ১২।

তোমার পঞ্চভূতের কায়া লয় পাইলেও, তোমার অক্ষয়-কীর্ত্তি-কায়া, প্রলয়কালেও লয় পাইবার আশঙ্কা নাই। ১৩।

সর্ব্বথা ত্বমশোচ্যোঽসি বিশোকং লোকমাশ্রিতঃ।
বয়মেব হি হা শোচ্যাস্ত্বামেকং শরণং বিনা॥ ১৪॥

পুণ্যশ্লোকং ধর্ম্মরাজং পুণ্যশ্লোকং যথা নলম্।
প্রাতস্ত্বাং কীর্ত্তয়িষ্যন্তি তথা সর্ব্বে যুগে যুগে॥ ১৫॥

আমরা তোমার জন্য শোক করি না, তুমি এখন শোকের অতীত, যে স্থানে শোক নাই, তুমি সেই আনন্দধামে গমন করিয়াছ, আমরা নিজের জন্যই শোক করিতেছি, কেন না, আমরা তোমা হেন আশ্রয়ে বঞ্চিত হইলাম! ।১৪।

যেমন প্রাতে উঠিয়াই লোকে পুণ্যশ্লোক নল যুধিষ্ঠিরের নাম করে, তেমনি যুগে যুগে সকল লোকে প্রভাতে তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে। ১৫।

শোক-সঙ্গীত।

কে জাগিস্ তোরা, আয়, আয়, আয়,
দেখ্ পুনঃ অই ভীম দরশন!
ভারত শ্মশানে, জ্বলন্ত চিতায়,
কে জানি আবার দিলরে ইন্ধন!
ঘুমাস্‌নেরে আব; আঁধার শ্মশানে
ঘোরতর বহ্নি জ্বলিল আবার;
অই যে গর্জ্জিছে, গগন বিদারি'
চিতানল শিখা দহি'চারি ধার!
দেখ্ চেয়ে দেখ্, গেছে বুঝি হায়
শেষ ধ্রুবতারা ভারত গগনে!
অই থানে ছিল, কই—কই—কই?
দেখ্ ভাল করি ত্যজিয়া স্বপনে।
নাই বুঝি তবে, গেছে তবে খসে'
জ্যোতির্ম্ময় তারা কালের কবলে;
কি স্বপনে তবে, রয়েছিস্ ভোর
এখন (ও) নিদ্রিত ঘোর দাবানলে?
শ্মশান-বহ্নির লাগেনি কি তাপ?
তবু কি গলে না এ পাপ তুষার?

ধিক্‌রে তোদেরে, আজি এ জীবনে
নাহি যদি ছোটে অশ্রু পারাবার,
ওঠ্ তবে আজ, আয়, আয়, আয়,
কাঁদ্ একবার খুলিয়া পরাণ,
জাগা তবে আজ নিদ্রিত সবারে
ঘোর রবে তুলি' ক্রন্দনের তান।
কোথা মা দুঃখিনী, ভারত-জননী
দেখ একবার খুলি শোক-আঁখি,
দেখ একবার, একি সর্ব্বনাশ!
আর কি তোমার রয়েছে বাকী!
সহি' দুর্ব্বিষহ, নব নব শোক
রয়েছ জননী মূর্চ্ছা-অচেতন;
দেখ দেখ মাতঃ হল বুঝি আজ
শ্মশানে শোকের ব্রত উদ্‌যাপন!
যার মুখ পানে, আছিলে চাহিয়া
ভুলিয়া অতীত শোক শত শত
সেই সে তোমার জ্যোতির্ম্ময় তারা
কক্ষভ্রষ্ট হয়ে কোথায় পতিত!

দারুণ কালের ভীষণ বিদ্রূপ
অভাগিনী বলে, চাহিল না ফিরে,
উঠ, উঠ, মাতঃ দেখ দেখ অই
আশা ডুবে গেল কালসিন্ধুনীরে!
কে ডাকেরে অই, আজি এ নিশীথে?
কা'র কোলাহল, কেরে কাঁদে হায়?
একিরে! একিরে! শেষ আলো রেখা
মিশিলরে কোন্ কালের সীমায়?
অতীত শোকের গভীর বেদনে
মূরছার ঘায় ছিনু বিচেতন;
শ্মশান শয্যায় থাকি অচেতন
আছিনু দেখিতে ভীষণ স্বপন!
বিদ্যা, দয়া, প্রেম, গুণের সাগর
তনয় আমার শ্মশানের ফুল,
এসেছিল কাছে মাগিতে বিদায়
যাইতে অনন্ত সাগরের কূল!
কেন হাহা রব? কেরে তোরা হায়?
কেনরে আমায় করিলি চেতন?
শূন্য বক্ষ কেন? গেছে তবে চলে
আঁধার করিয়া ভারত-গগন?
কণ্টক আকীর্ণ উদ্যানে আমার
শেষ ফুল মোর অই ঝরে গেল;
নিদাঘ-বিদগ্ধ নিষ্ঠুর ভারতে
দয়ার সাগর অই যে শুকাল!
কে কাঁদিস্ তোরা, মৃদুরবে আজ?
এযে শোক হায় ক্রন্দন-অতীত!
কাঁদ্ তবে যদি, পারিস্ কাঁদিতে
ক্রন্দনে ত্রিলোক করিয়া কম্পিত,
কেমনে পারিবি? নিষ্ঠুর ভারতে
কে আছেরে আর জানে যে কাঁদিতে?
ও যেরে তোদের মায়ার ক্রন্দন
কপটের অশ্রু দেখা'তে জগতে!
বিলাসিতা পাশে দরিদ্র-চিৎকার
দেখিয়া যাদের কাঁদে না হৃদয়,
অসাম্য নীতির ঘোর নিপীড়ন
হেরিয়া সম্মুখে তবু চুপ রয়;
বাল বিধবার ম্লান কচি মুখ
দেখিয়াও যা'রা পারেরে হাসিতে;
অজ্ঞান তিমিরে শত শত নারী
দেখিয়াও স্থির পারেরে থাকিতে;
স্বার্থ যাহাদের উপাস্য দেবতা
ব্যভিচার যেথা আত্মবিসর্জ্জন,
সেথা কে জাগিবে "ঈশ্বরের" তরে
প্রাণ খুলি আজ করিতে ক্রন্দন?
চলে' গেছে সে যে, কাঁদিত যাহার
উন্মুক্ত পরাণ আকাশের মত;
দরিদ্র, বালিকা বিধবার তরে
দিতে যে পরাণ নহে পরাহত।
করুণা যাহার ঝরিত সতত
ভারতে প্রাবৃট ধারার প্রায়।
উঠিত যাহার ক্রন্দনের রোল
বিমান ভেদিয়া ত্রিদিব সীমায়।
অধীন ভারতে, স্বাধীন পরাণ
উপেক্ষি তোদের তুচ্ছ যশোমান
আছিলরে সেযে তীব্র জ্যোতি শিখা,
ত্রিদিব জ্যোতিতে চির জ্যোতিষ্মান!
ধরা কক্ষভ্রষ্ট, চন্দ্র ভূপতিত,
হলেও কদাপি সূর্য্য বিচূর্ণিত,
অন্যায়াচরণে ও গর্ব্বিত শির
কভুও তো যার হতো না নমিত,
বিশ্বব্যাপী তার স্নেহ, ভালবাসা,
ছিলনা আবদ্ধ তুচ্ছ জাতিভেদে,
উন্মুক্ত উদার মলয়ের মত
বহিত সে স্নেহ পীড়িত ভারতে।
কি বুঝিবি তোরা, তার সে মহিমা
নিষ্ঠুর তোদের পাষাণ পরাণ;
না হ'তে দুদিন বিকট হাসিস্
আবার মুছিয়া বিকৃত নয়ান!

জানিতিরে যদি কাঁদিতে তেমন,
তবে কি ভারত দুঃখিনী জগতে,
আজ তবে হেথা, দেখিতে দেখিতে।
শত মন্দাকিনী ছুটিত ভারতে
জানিতিরে যদি কাঁদিতে তেমন ;
প্রতি আঁখি যদি ঢালে অশ্রুজল,
পারে নাকি তবে, কোটী, কোটী আঁখি
নিভা'তে মায়ের চির চিতানল ?
একি নিদারুণ—হায়-হায়-হায়
বুঝিনা বিধাত্মা তোমার বিধান,
"কেশবের" শোক না ফু'রাতে আজ
দয়ারসাগরে করিলে আহ্বান !
লও তবে তারে স্নেহ-হস্তে তুলি
স্বর্গীয় কুসুমে নন্দন আলয়,
অমৃত সিঞ্চনে করগো প্রসন্ন
পর-দুঃখ-ক্লিষ্ট বিষণ্ণ হৃদয়।
নিষ্ঠুর ভারতে বুঝেনি উহারে ;
লও তারে দেব, তাঁহাদের পাশে
যেথায় মানব দুঃখেতে কাতর
স্বর্গীয় আত্মারা মৃদু মৃদু হাসে।

আয়—আয়—আয়—আলোকের শিশু
প্রিয় সুসন্তান আয় কাছে আয়,
দেখা দেখি আজ ত্রিদিব মেলায়,
কিরে এনেছিস্ দেখা'তে আমায় ?
ধরা হ'তে তুই কিরে নিয়ে এলি
দেখারে খুলিয়া ত্রিদিব-বাসীরে ;
পিতার ক্রোড়েতে বসিয়ারে আজ
দেখারে সকলে খুলিয়া সুধীরে।
একি এনেছিস্ ? প্রিয় সুসন্তান !
ধূলি ভস্মরাশি দেহেতে মাখিয়া ?
দরিদ্রের তরে অশ্রুর মুকুতা
রেখেছিলি যাহা হৃদয়ে গাঁথিয়া !

ভারত-শ্মশান-ভস্মরাশি মাঝে
দরিদ্র কাঙ্গাল শত নর নারী
আছিল পড়িয়া চাহে নাই ফিরে,
তৃষার্ত্তেরে কেহ দেয় নাই বারি।
তুলিয়া তাদেরে ধূলিরাশি হতে
নিয়ে ছিলি বাছা ক্রোড়েতে আপন,
তাই ভস্মরাশি হয়েছেরে তোর
অই শরীরের প্রিয় আবরণ ?
দেখারে হেথায় ত্রিদিব মেলায়
পৃথিবীর অই ধূলিরাশি দাগ,
ত্রিদিব আলয়ে অই ধূলি রাশি
প্রিয়প্রিয়তর কুসুম পরাগ।
দরিদ্রের তরে অই অশ্রুজল
দেখারে সন্তান ত্রিদিববাসীরে,
হবে সবে স্নাত অই প্রিয় জলে
তুচ্ছ করি পূত মন্দাকিনী নীরে।
এস এস আজ যত সুসন্তান
এস হেথা আজ এস ত্বরা করি,
এসেছেরে অই ভাই তোমাদের
কর্ত্তব্য পালিয়া মর্ত্ত্য পরিহরি !
কোথা শ্বেত-ভূজে কোথা বীণাপাণী ?
আসিছে তোমার অই প্রিয়তম,
লহ লহ অই লহ হাতে ধরি
জুড়াও হেরিয়া রূপ নিরুপম।
অভাগী ভারত ! কেঁদনাকো আর
পিতার ক্রোড়েতে এসেছে কুমার,
জাগাও সুষুপ্ত কোটী তনয়েরে
দেখায়ে পবিত্র দৃষ্টান্ত উহার।

আর কি আমার আছে গো বিধাতঃ
শোক-নিপীড়িত নয়নের জল ?
এযে শোক মোর ক্রন্দন-অতীত
সয়ে' সয়ে' আজ হয়েছি বিকল।

দেখ্‌রে সন্তান কোটি আঁখি খুলি
দেখ্‌ আজি এই ত্রিদিবের শোভা,
স্বরগেতে আজ বাজিছে দুন্দুভি
দেখ্‌ মহা মেলা রূপ মনোলোভা।
কাঁদ্‌ তবে যদি পারিস্‌ কাঁদিতে
ত্রিদশ আলয় করিয়া কম্পিত,
অশ্রুর তরঙ্গ উঠিয়া সেথায়
দেখাক্‌ দেবেরে ন'স্‌ তোরা মৃত!
গারে মহা গান মৃত-সঞ্জীবনী
কোটী কণ্ঠে আজি মিলাইয়া তান,
শোণিত অক্ষরে দেখারে লিখিয়া
"আজ হতে মোরা হব সুসন্তান।"
বল্‌ তবে আজ "লব কোলে তুলি'
পতিত দরিদ্র জনেরে সবায়;
"বিধবার অশ্রু মুছাব এবার
রবে না রমণী অজ্ঞান নিশায়।"

বল্‌রে হুঙ্কারি এ প্রতিজ্ঞা আজ
ত্রিদশ আলয় করিয়া মথিত;
"ঈশ্বর" সেথায় শুনিয়া সে ধ্বনি
উঠিবে মাতিয়া হয়ে পুলকিত।
প্রস্তরের মূর্ত্তি গড়িয়া উহার
রাখিবি ভারতে নাহি ক্ষতি তায়,
কিন্তু বল আজ শপথ করিয়া
জীবন্ত মূরতি রাখিবি হিয়ায়।
না পারিস্‌ যদি করিস্‌নে বিকৃত
ভগ্ন বক্ষ মোর পাপ অশ্রু জলে;
প্রস্তরের মূর্ত্তি বাহ্য ক্রীড়া সব,
একে একে তবে ডুবারে অতলে।
পারিস্‌রে যদি নব ভাবে আজ
তার প্রেম-শিক্ষা শিখাতে সবারে,
তবেই রহিবে দেবতা-বাঞ্ছিত
কীর্ত্তিস্তম্ভ তার প্রতি ঘরে ঘরে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন ঘোষ।

শোকোচ্ছ্বাস।

নিপীড়িতা ভারতমাতা, অশেষ কষ্ট যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়াও, কয়েকটি মাত্র মাতৃভক্ত সুসন্তান অঙ্কে ধরিয়া অপার শান্তিলাভ করিতেন, কিন্তু দুর্ভাগিনীর দুর্ভাগ্যের অবধি কি? বার্দ্ধক্যের সম্বল, বিপদের ভরসাস্থল সন্তানগণের মধ্যে জননীর কৃতকর্ম্মা জ্যেষ্টপুত্রের বিয়োগ হইয়াছে। অভাগিনী জননীর হৃদয় শূন্য করিয়া, সে হৃদয়ে গভীর ক্ষত সঞ্চার করিয়া দিয়া মাতৃভক্ত সুসন্তান চিরদিনের মতন বিদায় লইয়াছে পুত্র শোকাতুরা জননীর হৃদয়ে যে শোকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, জগতে এমন কি পদার্থ আছে, যাহা বিষাদিনীর হৃদয়ের সে তীব্রজ্বালা নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম? জননীর বিষাদ-মলিন মুখশ্রী যাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ শত বৃশ্চিক দংশনের যাতনা অনুভব করাইয়া দিয়া জননীর সে মলিনমুখে আনন্দের রশ্মি বিকাশ করিতে অসাধ্য-সাধনে অগ্রসর করিত; জননীর দুঃখ দূর করিতে কৃত-প্রতিজ্ঞ হইলে ঝটিকান্দোলিত সমুদ্রতরঙ্গ-লীলা যাঁহার নিকট, বিভীষিকা ত দূরের কথা, প্রকৃতই বাল্যলীলা বলিয়া বোধ হইত; যাঁহার নিকট একদিকে সংসারের ধন-জন-মান, ঐশ্বর্য্য-সুখ-সম্পদ, আর একদিকে জননীর একবিন্দু উষ্ণ অশ্রুজল যৎকালে পরস্পর তুলাদণ্ডে পরিমিত হইয়া ঐ মাতৃ অশ্রুবিন্দু ভারাবনত হইয়া

একদিকে হেলিয়া পড়িত, আজ তেমন সন্তানের বিয়োগে জননীর আর কয়টি সন্তান বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যাঁহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আদর্শ করিয়া জননীর অশ্রুজল নিবারণে তেমনি ভীষণ সমুদ্র-তরঙ্গভঙ্গি উপেক্ষা করিবে? সংসারের ধন-মান ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব সুখভোগের মনোরম সুখ-শয্যা, মাতৃ অশ্রুবিন্দুর তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া, কঠোর সাধনে অগ্রসর হইবে, জননীর তেমন কৃতকর্ম্মা সন্তান আর কয়টি বর্ত্তমান, ইহাই এ সাংঘাতিক দিনের গভীর জিজ্ঞাসা।

পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে যে ঘোর ক্রন্দনরোল উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা ভ্রাতৃস্নেহের দৃষ্টান্তস্থল, তৎপক্ষে সন্দেহ কি? বঙ্গ-সন্তান শোকে মুহ্যমান হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা অকর্ম্মণ্য বৃথা শোক-বিহ্বলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ক্রিয়াবিহীন হইয়া, কর্ত্তব্যবিচ্যুত হইয়া, আত্মজনের জন্য যে ক্রন্দন, হইতে পারে, তাহা শোকাগ্নির তপ্ত-অশ্রুবিন্দু, কিন্তু কদাপি কর্ত্তব্যপরায়ণ হিতৈষণার লক্ষণ নহে। জন্মদাতা পিতার মরণ-মুহূর্ত্তে, উপযুক্ত হিন্দুসন্তান, যদি পিতার কর্ত্তব্য পালন না করিয়া, অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করে, হইতে পারে, তাহা পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা, কিন্তু কখনই কর্ত্তব্যপরায়ণতার লক্ষণ নহে। পতিবিয়োগ-বিধুরা রমণী যদি পতি-বিয়োগে, পতির প্রাণপ্রিয় পদার্থ গুলির প্রতি অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া তৎপ্রতি হতাদর দেখায়, পতি ভক্তির পরিবর্ত্তে বরং তাহা পতির প্রতি অনাদর। পণ্ডিত পিতার অভাবে সন্তান যদি পিতার সযত্ন-সঞ্চিত মূল্যবান পুস্তক গুলির প্রতি অযাত্মিক হইয়া—পিতার জন্য ক্রন্দন করিয়া বেড়ায়, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যও যদি গ্রহণ করে; হইতে পারে, অবিসম্বাদিত রূপে তিনি পিতৃভক্ত, কিন্তু কদাপি কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তান নহেন। আজ দুর্ভাগ্য দেশের এ দুর্ভাগ্য সময়ে, দুর্নীতি, দুরাকাঙ্খা ও ঘোর বাহ্য চাক্‌চিক্যের কালে, এ গভীর কর্ত্তব্য সাধনরূপ প্রশ্নের কে যথাযথ উত্তর দিবে? সভা-সমিতি, নাট্যলীলা ও রঙ্গ-ভঙ্গির পরিবর্ত্তে, ভারতমাতার এ সাংঘাতিক দুর্দ্দিনে, এ ভয়াবহ সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে নিভৃত-নির্জ্জনে বসিয়া কঠোর কর্ত্তব্য সাধনের উদ্‌যাপনা কে করিবে? চাপল্য-চঞ্চল তরুণগণের হস্ত ধারণ করিয়া, মহাপুরুষের প্রকৃত কল্যাণকামী হইয়া অমরাত্মার শান্তি বিধানের ব্রত গ্রহণ করিতে কে আত্ম বলিদান করিবেন? ইহাই এ দগ্ধ দেশের প্রতি প্রাণের প্রশ্ন।

বিদ্যাসাগর, তাঁহার ভালবাসার সামগ্রী বঙ্গীয়দিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, শেষ জীবনেও সমাজ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত, অনাথা বাল বিধবাগণের অশ্রু মুছাইতে গিয়া কঠোর সমাজের তীব্র বিষাক্ত শরে বিদ্ধ হইয়া যেন যাইবার সময় হতাশ হইয়াই বলিয়া গেলেন,—"দেশের কিছু হইলনা, পাপদেশ পুণ্য কি, কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিলনা।" এমন যে মহাপুরুষ; নিপীড়িতের আশ্রয় প্রদানে, অনাথের অভয়দানে, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা দিতে এমন যে দেবতা, হায় বঙ্গবাসি, নাট্যলীলাতেই কি তাঁহার পর্য্যবসান? সভা সমিতিতেই কি তাঁহার চূড়ান্ত? যদি তাঁহার জন্য অভুক্ত থাকিয়া মরিয়া যাও, ক্রমাগতঃ যদি তাঁহার জন্য ক্রন্দন কর,

তবেও দেশের কিছুই উপকার হইবেনা। কোটী ভ্রাতার অজস্র অশ্রুজল সে মহাপুরুষের আত্মায় ক্ষণেকের জন্যও শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম হইবে না। যে কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া বীর চূড়ামণি আপন জীবনকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, অনাথিনী বাল-বিধবার মর্ম্মাশ্রুজল মুছাইতে গিয়া সিংহ বিক্রমে যিনি দুর্দ্দান্ত সমাজ-শক্তির সম্মুখে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কি জানি কোন্ দেবতার অভিসম্পাতে অকৃতকার্য্য হইয়া মরণেও যিনি শান্তি পান নাই, মরণ-মুহূর্ত্তের সে হতাশ-পীড়িত দৃশ্য যে একটিবার দেখিয়াছে,—প্রাণ কি চায়, সে দৃশ্য দেখিয়াও, পিতৃস্থানীয় মহাত্মার সে মঙ্গলেচ্ছা, সে দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অলীক কল্পনায় পরিণত হয়! বঙ্গ-সন্তান যদি তাহা বুঝিত, বুঝিয়া যদি মহাপুরুষের মহদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে সাধনাক্ষেত্রে দ্বিগুণিত তেজে অগ্রসর হইত, তবে বুঝিতাম, বিদ্যাসাগরের মৃত্যু, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক শোকের গভীর ঝটিকান্দোলন উত্থাপিত করিয়াছে। অন্যথা বুঝিয়াছি, ইহা শরতের মেঘগর্জ্জন; ধরিত্রী-প্রাণ সুশীতল জল ইহা হইতে বহুদূরে।

বিদ্যাসাগর যে কার্য্যে প্রাণোৎসর্গ করিয়া সমাজের নিকট উৎপীড়িত হইয়া নীরবে তাহা সহ্য করিয়াছেন, যে কর্ত্তব্যের সাধানায় সে দিব্যকান্তি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন; শয়নে, স্বপনে, জাগরণে যাঁহার মাতৃভূমির মঙ্গলকামনা ব্যতীত দ্বিতীয় কামনা কিছু ছিল না, কোন্ প্রাণে বলিব, হায়! বিদ্যাসাগর অভাবে তাঁহার স্নেহের অনাথা কাহার মুখপানে চাহিবে, উৎপীড়িত কোথায় লুকাইবে, বাল-বিধবা কোথায় দাঁড়াইবে? সত্য বটে সে মহাত্মা আমাদিগকে অপার দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর ত বঙ্গবাসী; আর কি তাঁহার বঙ্গবাসী ভ্রাতা নাই, যাঁহার প্রাণে সে মর্ম্মান্তিক শ্মশান দৃশ্য এমন শক্তি সঞ্চার করে, যাহাতে অগ্রজের সে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কনিষ্ঠ, সেই নিপীড়িতের, সেই অনাথার, আর সেই দুঃখিনী বাল-বিধবার অশ্রুজল মুছাইয়া দেয়? ভীমা প্রকৃতি ভীমস্বরে প্রতিধ্বনি দিতেছে,—তাহা কৈ!!

সভা-সমিতি, বিজ্ঞাপন বক্তৃতা, আমাদের পাশ্চাত্য অনুকরণ; কিন্তু দুঃখের বিষয় সে দেশের সসার অনুকরণ এ হতভাগ্য দেশে কদাচিৎ। যে কার্য্যে সামান্য মাত্র আত্মোৎসর্গের ও আত্মসুখ বলিদান আবশ্যক, কাপুরুষ বঙ্গবাসী তাহাতেই পশ্চাৎপদ! বর্ত্তমান জগতের শিক্ষা-গুরু ইউরোপীয় নীতি, তাহা নহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা রুদ্ধ নহে; আত্মোৎসর্গের, স্বার্থ-বলির, অমানুষিক সহিষ্ণুতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত নিচয় ঐতিহাসিক পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক সভ্যদেশে ইহাই দেখিতে পাই, প্রতিভাসম্পন্ন কোন একটি মহাপুরুষের জীবিতাবস্থায় যত ক্রিয়া না হয়, তদভাবে, তাঁহার জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যু যে শক্তি-সঞ্চার করে, তাহা মাতৃভূমিকে যেন এক নবজীবনে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গে তাহার বিপরীত! চপলার ক্ষণক্রীড়ার ন্যায় বঙ্গাকাশের উদীয়মান প্রোজ্জ্বল নক্ষত্রালোক দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তেই বিলীন হইয়া যায়, পরদিন আর

তাহা ফিরিয়া আসে না। মহম্মদের মৃত্যু, মুসলমান-জগতে যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাতে একদিন পৃথিবী আলোড়িত হইয়াছিল। নিভৃতসাধক দেবতা যীশুর দেহ যৎকালে দুর্দ্দান্ত য়িহুদীদিগের পাপ কোপাক্রোশে ছিন্নশির হইয়া সংসার হইতে বিদায়গ্রহণ করিল, সেই দিন—সেই মৃত্যু, সেই শোণিতবিন্দু খ্রীষ্টীয় জগতে যে মহাপ্রাণতার শক্তিসঞ্চার করিল, তাহা অসাধ্যকে সাধ্য করিল, শত্রুকে পরম মিত্র করিল, দুর্দ্দান্ত অবিশ্বাসী সেণ্টপলের সুদৃঢ় হৃদয়কে মেষ শাবকের ন্যায় নিরীহ করিয়া দেবতা গড়াইয়া দিল। ভারতেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে সমগ্র ভারত যৎকালে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাৎকালিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মস্তকোপরি বৌদ্ধধর্ম্মের খরকীরণ যৎকালে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ইহার পূর্ব্বেই দেবতা শাক্যসিংহ কতিপয় মাত্র শিষ্য পরিবৃত হইয়া বৃক্ষতলে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহের কঠোর সাধনা সিদ্ধি লাভ করিল, তাঁহার দেহাবসানের পরে। রাজ প্রাসদোপরি সুবর্ণনির্ম্মিত খট্টোপরি কত কত সার্ব্বভৌম সম্রাটের জীবনবায়ু শেষ হইয়া গেল, কিন্তু সেইদিন, সেই দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে সামান্য বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় শয়নে থাকিয়া যে দেবতার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, তাহা ক্রমে ভারত হইতে সুদূর চীন-ব্রহ্মের আমূল কাঁপাইয়া দিল।

তাই নিরাশময় প্রাণে আবার কুহকিনী আশার ক্ষীণ রশ্মিরেখা উদিত হইয়া স্বতঃই যেন জিজ্ঞাসা করে, দরিদ্রের সখা, অনাথের বন্ধু, বিষাদ-প্রতিমা বাল-বিধবার মঙ্গলময় পিতা, স্নেহের কন্যাগুলিকে অনাথা করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন; আর ঐ মহম্মদের মতন, ঐ শাক্য সিংহের মতন, দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক তাঁহার সেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নবীনতেজে উজ্জীবিত হইয়া ভারতক্ষেত্রে তাঁহারই বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিবে না? দুর্দ্দান্ত সন্তানের ভীষণ ভ্রূকুটি, সুখসম্পদ লালসার সুকোমল পুষ্পশয্যার প্রলোভন, প্রকৃত ইন্দ্রিয়জয়ী বীরের ন্যায় পদদলিত করিয়া যদি বঙ্গীয় সন্তান, কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোর সাধনায় অগ্রসর হইতে পারেন, তবেই বুঝিব, ঈশ্বরচন্দ্রের নামে ক্রন্দন করা বঙ্গবাসীর স্বার্থক। অন্যথা কেবলই ক্রন্দন, কেবলই কর্ম্মবিহীন ভাবোচ্ছ্বাস! হিন্দু-সন্তান, পিতৃমাতৃ বিয়োগে তাঁহাদের আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনায় পিণ্ড-প্রদানে মনে করেন আত্মা শান্তি লাভ করিল। কিন্তু ভাই! যে মহাপুরুষ আজ বঙ্গবাসীকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া গিয়াছেন, সামান্য পিণ্ডপ্রদানে সে আত্মা শান্তিলাভ করিবার নহে। তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান মহত্ব, সর্ব্বপ্রধান পুণ্য, সর্ব্বপ্রধান পবিত্র বাল-বিধবার অশ্রুজল মোচনে বঙ্গবাসী যদি কৃতপ্রতিজ্ঞ হয়, সে আত্মা চির শান্তিলাভ করিবে। স্বর্গ হইতে দেবগণ, ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত নৃত্য করিতে করিতে বঙ্গবাসীকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,—সে আশীষে বঙ্গের চিরসঞ্চিত পাপ-কলুষ-কালিমা অনেক প্রক্ষালিত হইবে।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

বীর-পূজা।

যে মহাপুরুষের জীবনী লইয়া আজ বঙ্গের সর্ব্বত্র গভীর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, আজ অনুরুদ্ধ হইয়া সেই মহাপুরুষের জীবন-সম্বন্ধে আমি দুই একটী কথা বলিতে উদ্যত হইলাম। বলা বাহুল্য, সেই মহাপুরুষের নাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যাঁহারা কোন মানবকে দোষস্পর্শশূন্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত অন্ধ। তাঁহাদিগের সহিত আমার মত-ভেদ আছে। যাঁহাদের শরীর রক্ত মাংসে গঠিত, তাঁহারা পূর্ণ অপাপবিদ্ধ হইতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। সুতরাং কাহারও জীবনী লিখিতে গেলে, তাঁহার দোষগুণ—উভয়েরই উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু দোষের উল্লেখ করা অপেক্ষা গুণের উল্লেখ করায় সুখ অধিক, এবং তাহাতে জগতের অধিকতর মঙ্গল সংসাধিত হয়। মহাপুরুষগণের দোষ উল্লেখ করিলে সাধারণ লোকে সহজে সেই দোষেরই অনুকরণ করিয়া ফেলে, গুণের অনুকরণ করা অতি কঠিন বলিয়া তাহার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এই জন্য আমার মতে মহাপুরুষগণের চরিত্রের উজ্জ্বল অংশ টুকুই লোকসাধারণের গোচর করা উচিত। দোষভাগের অস্তিত্ব অস্বীকার না করিয়া, শুদ্ধ তাহার পরিহার করাই শ্রেয়ঃ। আমি এখানে সেই পথই অবলম্বন করিলাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যশোগান করিতে এত লোক আসরে নামিয়াছেন যে, আমার এ উদ্যম অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও হইতে পারে। কিন্তু প্রাণের ব্যাকুলতায় ও বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া আমায় আজ এই সংকীর্ত্তক দলের সহিত যোগ দিতে হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের জাতি আজও বীরপূজা শিখে নাই। যে দেশে বীরপূজা প্রচলিত নাই, সে দেশে জাতীয় সঞ্জীবন-কার্য্য আরব্ধ হয় নাই। ইংলণ্ডে ক্রমওয়েল্, আমেরিকায় ওয়াসিংটন্, ফ্রান্সে নেপোলিয়ন, ও ইতালীতে গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি বীরবৃন্দ যেরূপ পূজা পাইয়াছেন, আমাদের দেশে আজও সেইরূপ পূজা কেহই পান নাই। এ দেশে রাজনৈতিক বীর নাই, সুতরাং সে পূজা রাজনৈতিক বিভাগে সম্ভবপর নহে। আমরা লর্ড রিপণ ও ব্রাড্‌ল প্রভৃতি বৈদেশিক মহাপুরুষগণের পূজা করিয়াছি বটে, কিন্তু সে পূজার অভ্যন্তরে যেন একটু দাসভাব আছে বলিয়া বোধ হয়। বিজিত জাতি যখন কোন বৈদেশিককে উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া পূজা করে, তখন তাহার হৃদয়ের সাম্যভাব বিনষ্ট হয়। বিজেতৃজাতির সহিত তাহার যে দূরত্ব, তখন যেন পূর্ণমাত্রায় তাহার উপলব্ধি হয়। কিন্তু আমাদের একজনকে আমরা যদি পূজা করি, তাহাতে আমাদের হৃদয়ের সাম্যভাব নষ্ট হয় না। তাহাতে আমরাই গৌরবান্বিত হই। আমাদের মনে হয় যে চেষ্টা করিলে আমরাও সেইরূপ হইতে পারি, এবং এরূপ বীর-পূজার অধিকারী হইতে আমাদের কাহারও বাধা নাই। ইহাতে প্রত্যেক পূজকের

চিত্ত সম্পূর্ণরূপে সম্প্রসারিত হয়, এবং মনে সাধু প্রতিদ্বন্দিতার ভাব সমুদিত হয়। আজ বিদ্যাসাগরের পূজায় এই জন্য সকলেই একবাক্যে যোগ দিতেছেন, এবং এই বীর-পূজায় আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতায় সকলে সর্ব্বত্র এই বীরপূজার বিরাট্ আয়োজন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমার মনে গভীর আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, এতদিনে জাতীয় সঞ্জীবন-কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। এতদিন আমরা চৈতন্যহারা হইয়া পড়িয়া ছিলাম, তাই পূর্ব্ববর্ত্তী বীরবৃন্দের পূজা করিতে পারি নাই। আজ আমাদের মৃতদেহে জীবন লক্ষণ প্রথম দেখা দিয়াছে—তাই আমরা এই বিরাট্ বীরপূজায় যোগ দিয়াছি।

যাহার হৃদয় দেশের জন্য সর্ব্বদা কাঁদিতেছে, সে আজ কোন্ প্রাণে এই জাতীয় কান্নায় যোগ না দিয়া থাকিবে? তাই আজ ব্যক্তিগত মনঃ-ক্ষোভ ভুলিয়া আমি এই জাতীয় শোকোচ্ছ্বাসে যোগ দিলাম। যাঁহার জন্য আজ সকলে কাঁদিতেছে, তিনি যে মহাপুরুষ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যিনি এত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় যে বিশাল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সাগর না হইলে কে আর স্রোতস্বিনীসকলকে নিজাভিমুখিনী করিতে পারে? তাঁহার সহিত বঙ্গবাসীর প্রাণের যোগ ছিল বলিয়া তাঁহার বিয়োগে আজ সকলে এত বিয়োগবিধুর! তাঁহার করস্পর্শে বঙ্গবাসিমাত্রেরই হৃদয়তন্ত্রী বাজিত বলিয়াই, সে করের চৈতন্যাভাবে বঙ্গবাসীর হৃদয়তন্ত্রী আজ নীরব। যেন সকলেই আজ চৈতন্যহারা হইয়া পড়িয়াছেন। পথে, ঘাটে, মাঠে, বিদ্যালয়ে, বিপণিতে, বিচারালয়ে—যেখানে যাইবে—কেবল বিদ্যাসাগরের কথা। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিল, রঙ্গালয়ে অভিনয় বন্ধ হইল, এবং বিদ্যালয়-সকলে দুই এক দিনের জন্য পাঠনা স্থগিত হইল। শিক্ষক ও ছাত্র শোকচিহ্ন ধারণ করিলেন। যে দিকে তাকাও, দেখিবে, ছাত্র ও শিক্ষকগণ নিরাবৃত পদে গমন করিতেছেন, রঙ্গালয়ে বিদ্যাসাগরের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাসব্যঞ্জক নাট্যগীতি অভিনীত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে সভাসমিতিতে তাঁহার গুণকীর্ত্তন হইতেছে। সংবাদ পত্রের স্তম্ভ সকল তাঁহার গুণানুবাদে ভরিত হইতেছে। প্রতি মুদ্রাযন্ত্রে তাঁহার কীর্ত্তিশ্লোক মুদ্রিত হইতেছে। বঙ্গমহিলা ও বঙ্গীয় ছাত্র সকল তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত করিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে চাঁদা তুলিতেছে। সমস্ত বঙ্গসমাজ আজ যেন আমূল আলোড়িত হইতেছে। বঙ্গে এরূপ বীরপূজা পূর্ব্বে আর কেহ পান নাই, আবার যে কবে কে পাইবেন, তাহাও বলিতে পারি না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, কি গুণে লোকে বিদ্যাসাগরের প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছে। যে দেশের লোক নিন্দাপ্রবণ, সহজে কাহারও ভাল দেখিতে পায় না, যে দেশে বীরপূজা বহুদিন হইতে উঠিয়া গিয়াছে—সে দেশে বীরপূজার এত আড়ম্বর কি কারণে? কোন্ গূঢ় মন্ত্রবলে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পতিত জড়প্রায় জাতিতে এই অভাবনীয় জীবন সঞ্চার করিলেন? তিনি

গোঁড়া হিন্দু, গোঁড়া খ্রীষ্টান, গোঁড়া মুসলমান, বা গোঁড়া ব্রাহ্ম—ইহার কিছুই ছিলেন না—অথচ কেন সকল সম্প্রদায়ের লোক একবাক্যে তাঁহার পূজায় যোগ দিতেছেন? এই প্রশ্নের একই উত্তর—তাঁহার দানশীলতা। তিনি দানবীর ছিলেন—সুতরাং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে মুক্তহস্তে দান করিতেন। তাঁহার নিকট দুঃখ জানাইয়া অতি অল্প-লোকেই বিমুখ হইতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি বড় খিট্‌খিটে হইয়াছিলেন, সুতরাং কখন কখন ভিক্ষার্থী দেখিলে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত বটে, কিন্তু তিনি জীবনের বহুদিন পর্য্যন্ত দানশীলতায় বঙ্গে অদ্বিতীয় ছিলেন।

নব্যসম্প্রদায় যাবনিক শিক্ষায় হিন্দু-মাহাত্ম্য ভুলিয়া অতিশয় স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছেন। এই বিশ্বজনীন স্বার্থপরতার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে আর্য্যোচিত দানশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সাধারণ গৌরবের বিষয় নহে। যখন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই আপন আপন পরিবারবর্গের সুখ সম্বর্দ্ধন করিতে একান্ত ব্যস্ত, অন্যের মুখের দিকে তাকাইবার তাঁহার ইচ্ছা বা অবসর নাই, তখন পরের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অকাতরে অর্থ বিসর্জ্জন করিয়াছেন—ইহা অল্প মাহাত্ম্যের কথা নহে। পুরাকালে যখন ইহকালের সুখসচ্ছন্দতা লোকে পরকালের জন্য অনায়াসে বিসর্জ্জন করিত, তখন দাতাকর্ণ, হরিশ্চন্দ্র বা বলিরাজা সম্ভবপর হইতেন। কিন্তু এই বিশ্বাসবিরহিত নিরীশ্বর সময়ে বিদ্যাসাগরের দানশীলতা যে এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইবে—ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? যে সময়ে দিগ্বিজয়ী সম্রাট্‌গণ দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়া সর্ব্বস্বদক্ষিণাযজ্ঞে সর্ব্বস্ব আহুতি দিতেন, যে সময় ঋষিগণ রাজ্যের প্রকৃত রাজা হইয়াও বিষয়-সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া নির্জ্জন অরণ্যে কেবল ভগবানের উপাসনা করিতেন, যে সময় গৃহস্থগণ স্ত্রী-পুত্রাদি দিয়াও অতিথির তৃপ্তি বিধান করিতেন—সে সময়ে বিদ্যাসাগরের দানশীলতা বোধহয় সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর ন্যায় অলক্ষ্যে বিলীন হইয়া যাইত, কিন্তু এই ক্ষতিলাভগণনার কালে—এই বণিক্ রাজার রাজত্বে—বিদ্যাসাগর একটী অপূর্ব্ব জীব, এবং তাঁহার দানশীলতা অতি বিরল দৃশ্য। এই জন্যই প্রধানতঃ লোকে তাঁহার জন্য এত কাতর। কাতর হইবারই কথা। তাঁহার বিয়োগে অনেক অনাথা গ্রাসাচ্ছাদনে বঞ্চিত হইয়াছে!—অনেক পরিবার নিরন্ন হইয়াছে! এরূপ মহাপুরুষের বিয়োগে আমরাই বা না কাঁদিব কেন? কোন্ প্রাণে না কাঁদিয়া থাকিব?

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁহার গ্রন্থনিচয়। যে সময়ে বাঙ্গলাভাষা শৈশবসুলভ বসনে ভূষিতা ছিল—তখন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বিদ্যাসাগর, ও অক্ষয়কুমার দত্ত—এই তিন মহাত্মা দুঃখিনী দীনা বঙ্গভাষাকে নূতন সাজে সাজাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই তিন জনের মধ্যে এই কার্য্যে অধিক দিন খাটিয়াছেন—এবং অধিক ফল প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই—তাঁহার নামই এত উদ্ঘোষিত। তাঁহার বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, ও সীতার বনবাস তাঁহার বিশুদ্ধ রচনা-শক্তির সবিশেষ পরিচয় দিতেছে।

তাঁহার পাঠ্যপুস্তকাবলীও জাতীয় চরিত্র সংগঠিত করিতেছে। বাঙ্গালা দেশে বোধ হয় এমন লোক নাই, যিনি তাঁহার কোনও না কোন পুস্তক কখন পাঠ করেন নাই। লেখকের জীবন সচরাচর দারিদ্র্যজড়িত ও দুঃখপূর্ণ। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এমনই সৌভাগ্যবান্ পুরুষ যে, তিনি এই দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পুস্তকের আয় হইতে বৎসর বৎসর প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা লাভ করিতেন। তিনি যদি সাধারণ সংসারী হইতেন, তাহা হইলে তিনি এই অতুল সম্পত্তিতে একজন প্রধান ধনশালী ব্যক্তি হইতে পারিতেন। নিজের সুখে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। অতি সামান্য আহার ও পরিচ্ছদে তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। নিজের ও পরিবারগণের ভরণ-পোষণ করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, তাহা হইতে তিনি কোনও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান বা দান করিতেন। এরূপ মহাপুরুষ লেখক-মাত্রেরই আদর্শ স্থল। যিনি অতুল ধনের অধিকারী হইয়াও সন্ন্যাসী, তিনিই প্রকৃত বীরসন্ন্যাসী। এরূপ মহাপুরুষের নিকট আমরা আজ নতশির হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি—যেন আমরা তাঁহার মত আত্মত্যাগ করিতে শিখি।

তাঁহার তৃতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁহার মেট্রোপলিটান্ বিদ্যালয়াবলী। এই মহাপুরুষ সর্ব্ব প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, ইংরাজের শিক্ষা ও ইংরাজের সাহায্য ব্যতীতও এ দেশে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অতি স্বল্প ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থাও সর্ব্ব প্রথম তিনি করিয়াছেন। এ পথ তিনি না দেখাইলে উচ্চশিক্ষা বোধ হয় এত দিন অতি অল্পসংখ্যক লোকে আবদ্ধ থাকিত। তাঁহার মেট্রোপলিটান্ হইতে বৎসর বৎসর অসংখ্য ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজ আমাদের দেশের যত উপকার না করিয়াছে—বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান্ বিদ্যালয় তাহা অপেক্ষায় দেশের অধিকতর উপকার সাধন করিয়াছে। আইস আমরা এই মহোপকারকের চরণে প্রণিপাত করি।

বিদ্যাসাগরের শেষ ও অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁহার বিধবা-বিবাহ-প্রচার। সকল মহাপুরুষের জীবনের এক একটী লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্য সাধনের জন্যই ভগবান্ তাঁহাদিগকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগরের ইহলোকে আবির্ভাবের মূল কারণ বিধবা-বিবাহ-প্রচার। ভারতের আড়াই কোটী হিন্দু বিধবার নীরব ক্রন্দনে ভগবানের আসন টলিয়াছিল—তাই তিনি হিন্দু বিধবাদের দুঃখ মোচন করিবার জন্য বিদ্যাসাগরকে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে এই গুরুতর কার্য্যের উপযোগী সমস্ত গুণে বিভূষিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অনন্ত দয়া, অবিচলিত অধ্যবসায়, অটল সাহস, নির্ভীক সরলতা, এবং সুদৃঢ় দেহ-সংস্কার-কার্য্যের উপযোগী এ সমস্ত গুণে বিধাতা তাঁহাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন। যে দেশে যুবতী কন্যাকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিতে উপদেশ দিয়া, পিতামাতা পার্শ্বের ঘরে সুখে রাত্রি যাপন করিতে কুণ্ঠিত হন না—

তাহাকে নিরামিশ ভোজন করিতে উপদেশ দিয়া আপনারা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়াদি ভোজন করা অসঙ্গত মনে করেন না;—তাহাকে নিরাভরণা ও গৌরিক-বসনা করিয়া নিজেরা বসন বা ভূষণে ভূষিত হইতে লজ্জা বোধ করেন না—সে দেশে বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিধবার দুঃখে কাঁদিল কিরূপে? ভগবদনুপ্রেরণা ব্যতীত ইহার মীমাংসা করিব কিরূপে? নিশ্চয়ই হিন্দু-বিধবার দুঃখ দূর করিবার জন্য এ হৃদয় শূন্য—কপটাচারী—নিরীশ্বর ও নির্জ্জীব ভারতে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থ এই ভগবদুদ্বোধনার ফল, সন্দেহ নাই। ইহার প্রতি ছত্রে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, অখণ্ড্য যুক্তি, ও অসীম বিশাল-হৃদয়তা মাখান রহিয়াছে। তাঁহার কোনও পুস্তক ইহার মত মূল্যবান নহে। যদি সুলেখক ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া কোনও পুস্তকের দ্বারা তিনি অধিক পরিচিত হইয়া থাকেন ত সে এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থ দ্বারা ভারতে একটী যুগ-পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে তদানীন্তন্ ব্যবস্থাপক সভা প্রীত ও চালিত হইয়া বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেন। বিধবা-বিবাহের প্রতিপক্ষগণ ইহা পাঠ করিয়া বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্র-সম্মত, তাহা স্বীকার করেন। কিছু দিন বিধবা-বিবাহের স্রোত এরূপভাবে চলিয়া আসিতে লাগিল যে, বোধ হইল যেন বিধবাগণের দুঃখ চিরদিনের জন্য অন্তর্ধান করিবে।

কিন্তু যাহাদের কপাল পাষাণ-চাপা—বিদ্যাসাগর তাহাদিগের কি করিতে পারেন? তাহাদের ভাগ্যদোষে মহাত্মা ম্যালথসের মত নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হইল। লোকসংখ্যাবৃদ্ধিনিরাসের জন্য ম্যাল্থস্ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহাতে অধিক সন্তান না হয়, সকলেরই সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া চলা উচিত। নব্য সম্প্রদায় আপনারা সংযত হইতে পারিবেন না দেখিয়া অভাগিনী বিধবাগণের স্কন্ধে সেই মত প্রচারের ভার অর্পণ করিলেন। বিধবা-বিবাহ প্রচার হইলে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে—সুতরাং বিধবা-বিবাহ দেওয়া হইতে পারে না—তাঁহারা এই ধূয়া ধরিয়া উঠিলেন। এই ধূয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিধবা-বিবাহের স্রোত রুদ্ধ হইল। সেই অবধি বিধবাগণের ভাগ্য-লক্ষ্মী আবার তাহাদিগের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। সুশিক্ষিত দলের এই অনার্য্য আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ-প্রচারে ক্রমেই শিথিল-যত্ন হইলেন। যাঁহারা এই মহদনুষ্ঠানে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও দলপতির ভগ্নহৃদয়তায় ব্যথিত হইয়া নীরবে সমস্ত কষ্ট সহিয়া অনুকূল কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আশা না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। আশাই সর্ব্বফলপ্রসূ। আমি আমার "প্রাণোচ্ছ্বাস" নামক পদ্যগ্রন্থে বিদ্যাসাগর ও বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগরের প্রতিমূর্ত্তি প্রতি গৃহে প্রতিস্থাপিত হইবে—এবং তখন লোকে বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী করিতে চেষ্টা করিবে। আজ সেই দিন আসিয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার হৃদয়গগনে যে আশাসূর্য্যের আভা দেখা গিয়াছিল, আজ

সেই আশাসূর্য্যের পূর্ণজ্যোতিঃ আমার হৃদয়গগনকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। এই দেশব্যাপিনী বীরপূজার অভ্যন্তরে—এই দেশব্যাপী শোকোচ্ছ্বাসের অভ্যন্তরে আমি যেন দেখিতে পাইতেছি যে, জাতীয় হৃদয় বিধবার দুঃখে আবার গলিত হইয়াছে। প্রচারের প্রতি বিদ্বেষ থাকিলে প্রচারকের প্রতি এত ভক্তিপ্রদর্শন সম্ভবপর নহে। বিধবার দুঃখ নিবারণের ইচ্ছা বলবতী না হইলে—বিধবা-বিবাহ-প্রচারক বিদ্যাসাগরকে বঙ্গবাসী কথনই এত পূজা করিত না। বোধ হইতেছে, নব্যসম্প্রদায় এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহারা বিধবা-বিবাহ কার্য্যে যোগ না দিয়া বিদ্যাসাগরের প্রতি—এ মহদনুষ্ঠানের প্রতি—অতিশয় অবিচার করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহারা গতানুশোচনায় অনুদিগ্ধ। তাই তাঁহারা আজ এই বিরাট্ বীরপূজার অনুষ্ঠান করিতেছেন। ভারতের ভ্রাতা ভগিনীগণ! আসুন্ আজ আমরা সাম্প্রদায়িকতা ও পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি ভুলিয়া—বিদ্যাসাগর-প্রচারিত মহানুষ্ঠানের পুনরনুষ্ঠান করিয়া—বিরাট্‌ভাবে আবার তাহার প্রচার করিয়া—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, এবং তৎপ্রচারিত মহদনুষ্ঠানের প্রতি সুবিচার করিয়া—আমাদের জীবনের ও সুশিক্ষার সার্থকতা করি। বৃথা আন্দোলন করিয়া বেড়াইলে কিছুই হইবে না। শুদ্ধ বাক্‌পটুতার অনুশীলন করিয়া নিজের স্বার্থের দ্বার উন্মুক্ত করিলে চলিবে না। কপটাচারী হইয়া শূন্যগর্ভ ভক্তি দেখাইলে চলিবে না। আমাদের কপটাচারের জন্য আমরা জগতে ঘৃণিত, সভ্যজগতে বিনিন্দিত। আসুন্ আমরা সেই বদ্ধমূল কপটাচারকে উন্মূলিত করিয়া বিদ্যাসাগরের পথে অগ্রসর হই। যে কার্য্যসাধনের জন্য ভগবান্ তাঁহাকে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন এবং আমাদের সহকারিতা না পাওয়ায় যে কার্য্য তিনি আরব্ধমাত্র করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আসুন আমরা ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সে কার্য্য সুসম্পন্ন করি। শুদ্ধ অসার বক্তৃতা করিয়া আমরা আর কত কাল কাটাইব? বক্তৃতার কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের সময়! এখন কাপুরুষের ন্যায় ভয়বিহ্বল হইয়া অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাকিলে চলিবে কেন? আমরা সামাজিক সংস্কার-কার্য্যে সামান্য আত্মত্যাগ করিতে ভীত হইলে, রাজনৈতিক সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিব কেন? সমাজ-সংস্কারে আমাদের বল পরীক্ষা হইলে, আমরা অকুতোভয়ে রাজনৈতিক সংস্কারে ব্রতী হইতে পারিব। আমরা যদি সমাজের কোন অংশের স্বাধীনতা হরণ করি, তাহা হইলে বৈদেশিক জাতির নিকট কোন্ মুখে আমাদের স্বাধীনতা ভিক্ষা করিব? যোগ্যতা না দেখাইলে স্বাধীনতা চাহিলেই বা তাঁহারা দিবেন কেন, আর ভগবান্‌ই বা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন কেন? অতএব আসুন্ আমরা আজ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহতী কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী করিবার নিমিত্ত, "কপটাচারী" বলিয়া আমাদের যে দুর্নাম আছে, তাহা ক্ষালিত করিবার জন্য, এবং ভবিষ্য জাতীয় সঞ্জীবনের যোগ্য হইবার জন্য, বিদ্যাসাগর-গৃহীত মহাব্রতের উদ্যাপনা করি। ইহাতে বিদ্যাসাগরের আত্মা আমা-

দিগের উপর প্রসন্ন হইবেন—এবং ভগবান্‌ও আমাদিগের প্রতি—এই চিরপদদলিত পতিত জাতির প্রতি—কৃপাকটাক্ষপাত করিবেন। আসুন্! আর বিলম্ব করিবেন না। শুভকার্য্যে বিলম্ব অশুভজনক। তাই বলিতেছি, ভারতবাসী ভাইভগিনী-গণ আসুন্, আমরা সকলে একবাক্যে সেই মহদনুষ্ঠানের পুনরনুষ্ঠান করি। আর কালবিলম্বে কাজ নাই—আসুন্!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

স্বর্গারোহণ।

(৺ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের)

১

কাল সাগরে আলোক ভাতিল অনন্ত উঠিল হাসি।
আঁধার তীরে দাঁড়া'য়ে ঈশ্বর— মণ্ডিত মহিমা রাশি।
খর্ব্ব আকৃতি বিপ্র মূরতি অঙ্গে উত্তরী ঢাকা।
দীর্ঘ ললাটে গৌরব-পূর্ণিমা অধরে করুণা মাখা।
হেরিছে পশ্চাতে অনন্ত নয়ন ধরণীর তীরে, বঙ্গে—
কঙ্কাল রূপিনী দাঁড়া'য়ে জননী অনাথ কাঙাল সঙ্গে।
কাতর ঈশ্বর কাঁদে শিশুসম, নয়নে বহিছে ধারা।
ডাকিছে অনন্ত— "আইস ঈশ্বর," ঈশ্বর শ্রবণ-হারা।

২

কাল-তরঙ্গে ফুটিয়া উঠিল বিশ্বপুরিয়া বাণী—
"সম্বর ঈশ্বর ধরণী বিস্মর, নহ রে ধরার প্রাণী,
হৃদয় ভরিয়া, বিধাতা তোমারে, প্রাণ ঢালিয়া দিলা,
বুকে যত প্রাণ, দান করি তত, অনন্তে করহ লীলা।
অনিত্য নাশিতে সৃজন আমার, সত্যে পালন তার,
তুমি মহাপ্রাণী— সত্যস্বরূপ— মানব-জীবন-সার।
তুমি সে জানহ সত্য ধরিতে বুকে কেমন আকুল প্রাণ,
অনিত্যবাহী— প্রবাহে আমার করহে চরণ দান।"

৩

বধির ঈশ্বর, হেরে বঙ্গমাতা— দূর ধরণী তীরে।
সহসা পারশে, চন্দ্রবরণা, দাঁড়ায় অমরী ধীরে।
অঙ্গুলি পরশে, ফিরিল ঈশ্বর, নয়নে বহিছে ঝারা,
সে মুখ নিরখি, অমরী নয়নে, উথলে সলিল ধারা।
কহিলা অমরী "বড় দুখ পাইলি— ছাড়িয়া দুখিনী বঙ্গে,
প্রাণের পুতলি— অনাথ কাঙাল আনিতে নারিলি সঙ্গে।

মুছরে নয়ন, ভুলরে ধরণী, আইস স্বরগ বাসে
দুখ নাহি তথা— হেরিবি আনন্দ— অনন্ত ভরিয়া হাসে !"

৪

"কে তুমি রমণী" কহিলা ঈশ্বর, "আমারে কি হেতু মায়া ?"
কহিলা অমরী "আমি সে করুণা, জগতে বিতরি দয়া।"
ক্রোধে কম্পিত ঈশ্বর থর থর, কঠোর বচনে কহে—
"তুমি সে পাষাণী— কোথা রহ তুমি— বিষাদে ধরণী দহে ?
"হা অন্ন" "হা অন্ন" সদা ওষ্ঠে রব, বধির শ্রবণ তায়,
তুমি দয়াময়ী স্বরগে বসিয়া কৃপা বিতর কায় ?
অবলা বালিকা— ননীর পুতলি, দানব আচারে তায়,
তিল তিল করি বধিছে নিয়ত, দয়া তুমি কর কায় ?"

৫

"ধরার দুখিনী বঙ্গ জননী, দুর্ব্বল সন্তান তার,
সদা রোগে শোকে— ক্ষীণ কলেবর— কণ্ঠে শৃঙ্খল ভার,
নৃশংস আচারে চরণে দলিছে বলিষ্ঠ নিয়ত আসি,
তুমি দয়াময়ী ত্রিদিবে বসিয়া ঢালিছ করুণা রাশি !
কৃপা ল'য়ে তুমি স্বর্গে যাও ফিরি, আমি ফিরে যাই বঙ্গে,
ভ্রমিব চিরদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনাথ কাঙাল সঙ্গে।"
অমরী কহিলা— "ধন্য ঈশ্বর ধন্য জীবন তোর,
হৃদয় ভরিয়া ধরিলি করুণা, সাধ না পুরিল তোর।"

৬

"পরদুখ-পাগল— তুমি রে ঈশ্বর, ঘুচে কি ধরার দুখ ?
যুগ যুগ ধরি বিতরি করুণা ভরিয়া প্রাণীর বুক,
যে দুখ সে দুখ আজো সে ধরায়, নাহি তিল হ্রাস তার,
বিশ্ব-রচয়িতা দুখ বিধাতা, বুঝিবে শকতি কার !
আমার কেবলি— বুকে করি তাপ— নিয়ত রোদন সার !
বলরে ঈশ্বর আমার মতন কে আছে অভাগী আর !
আইস তোমারে স্বরগে রাখিয়া, যাইব জীবের পাশে।
তোমার মতন খুঁজে প্রাণী কোন পশিব হৃদয় বাসে।"

৭

"কোথা সে বিধাতা ?" কহিলা ঈশ্বর "কোথা মিলে দেখা তার ?
শোক তাপ রচি কি সুখ তাহার দেখি আমি একবার।"
অমরী কহিলা "অদৃশ্য বিধাতা কেবলি অনুমেয় প্রাণে
স্বরগে বসিয়া করহ সাধনা হেরিবে ঈশ্বরে ধ্যানে।

আইস" বলিয়া চলিলা করুণা, ঈশ্বর পশ্চাতে ধায়;
পদে পদে ফিরি সজল নয়নে সুদূর ধরায় চায়।
কাল তরঙ্গ উঠিল নাচিয়া ঈশ্বর চরণ চুমি।
অনন্ত ভরিয়া ফুটিল বচন, "ধন্য হে ঈশ্বর তুমি।"

৮

উতরি স্বরগে নেহারে ঈশ্বর মদনমোহন দ্বারে,
অক্ষয়, মধু, চরণ পরশি সম্ভ্রমে লইলা তারে,
দীন বন্ধু আসি বন্দিল চরণ "গুপ্ত" ছুটিয়া আসে,
ভারত, প্রসাদ, সহাস বদনে দাঁড়ায় আসিয়া পাশে,
হেরে কাশিদাস, হেরে কীর্ত্তিবাস, ধীরে মুকুন্দ আসে,
হেরে বিদ্যাপতি, হেরে চণ্ডীদাস, গোবিন্দ তাঁহার পাশে,
দেখিতে দেখিতে উঠিল পুরিয়া সম্মুখে সুদূর ভূমি
উচ্চে কহে সবে "বঙ্গসুত-কুলে ধন্য হে ঈশ্বর তুমি।"

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাস্ত্র ও দেশাচার।

(বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবলম্বিত সংস্কার-প্রণালীর চিন্তন)।

এদেশীয় একটী ভদ্রলোক একবার আমাকে একটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"রাম মোহন রায় যখন এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; বেদ বেদান্তের অনুবাদ করিয়া এবং বহুল পরিমাণে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, একেশ্বরবাদ এদেশের প্রাচীন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। আপনারা সে পথ কেন পরিত্যাগ করিলেন? আপনারা কেন শাস্ত্রীয় বচনাবলি উদ্ধার করিয়া আপনাদের মত সকল স্থাপন করেন না?" তখন তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলাম, তাহা এই—"শাস্ত্রার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত হইতে যে সময় ও শ্রমের প্রয়োজন, তাহা ব্যয় করিতে বিশেষ উৎসাহ হয় না; কারণ যদি জানিতাম, দেশের লোক শাস্ত্রীয় বচনের অপেক্ষাতে বসিয়া আছেন, শাস্ত্রীয় বচন প্রাপ্ত হইলেই তাঁহারা আপনাদের পুরাতন ভ্রম বর্জ্জন করিয়া নবীন সত্য গ্রহণ করিবেন ও তদনুসারে আচরণ করিবেন, তাহা হইলে না হয় ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিতাম ও ভূরি ভূরি ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিবাদক বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের নিকট ধরিতাম, কিন্তু যখন দেখিতেছি যে বিচারকালে লোকে শাস্ত্রের দোহাই দিক, আর যাহাই করুক, ফলে কার্য্যকালে দেশাচারকেই মান্য করিয়া চলে, তখন আর শাস্ত্রীয় বচন অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি থাকে না। দৃষ্টান্ত. স্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়। বিধবার পুনর্ব্বিবাহের

শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি কি না ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত বিধবা-বিবাহ-প্রতিপাদক গ্রন্থ তাঁহার অদ্ভুত পরিশ্রম ও অদ্ভুত শাস্ত্রার্থ-বিচার-শক্তি, এই উভয়েরই প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। এমন শাস্ত্রীয় মীমাংসা রামমোহন রায়ের পরে কেহ কখনও দেখে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসিদিগের যেরূপ প্রাচীন শাস্ত্রে অনুরাগ, তাহাতে তিনি শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা বিধবা বিবাহের বৈধতা প্রতিপাদন করিলেই লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথে গমন করিবে। কিন্তু তাঁহার এই আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি তর্কযুদ্ধে প্রবল প্রতিদ্বন্দীদিগকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে অতি অল্প সংখ্যক লোকেই অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। অতএব দেখিতেছি, কেবল শাস্ত্রীয় বচনে কুলাইতেছেনা ; আরও এমন কিছু দিতে হইবে, লোকে লোকভয় অতিক্রম করিতে যাহাতে পারে।"

এই কথোপকথনের পর অনেকবার এবিষয়ে চিন্তা করিয়াছি। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত বিধবা বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের উপসংহারের নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি চক্ষে পড়িল,—"ধন্যরে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায়ান্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিক রক্ষাগুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে ; আর দোষ-স্পর্শ-শূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিক রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন।"

দেশাচারের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে এই গভীর মর্ম্মভেদী আক্রোশ, ইহার কারণ এই যে, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অনুভব করিলেন, দেশাচারই তাঁহার পথে পাষাণ-প্রাচীরের ন্যায় পথ আবরণ করিয়া দণ্ডায়মান।

মানুষ স্বভাবতঃই রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতা নানা কারণে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ—প্রাচীনের প্রতি লোকের একটা প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি থাকে। প্রাচীনের কীর্ত্তিকলাপ স্মৃতিতে জাগরূক থাকিয়া প্রাচীনকে সর্ব্বদাই কল্পনার চক্ষে এক অপূর্ব্ব বর্ণে মণ্ডিত করিয়া রাখে। বর্ত্তমানে যেমন দুট দশটা ভাল বিষয় দেখিতেছি, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে কত পাপ তাপ, কত রোগ শোক, কত যুদ্ধবিগ্রহ, কত দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ, কত চাতুরী, শঠতা, প্রবঞ্চনা দর্শন করিতেছি, সুতরাং বর্ত্তমানের প্রতি অবিচলিত আস্থা জন্মিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানের সহিত তুলনাতে

ভূতকাল সততই সুন্দর দেখায়; কারণ ভূতকালের কীর্ত্তিকলাপ গ্রন্থে নিবদ্ধ। তৎতৎ কালের পাপ তাপ, রোগ শোক, শঠতা প্রবঞ্চনার বিবরণ বিস্মৃতিজলে ডুবিয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া অতীতের সেই সুন্দর ছবির প্রতি কাহার না ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা করে? এই প্রাচীনানুরাগ সাধারণ মনুষ্যের মনে স্বভাবতই প্রবল। সুতরাং যখন কোন নূতন পন্থা প্রদর্শিত হয়, তখন প্রিয় বস্তুর প্রতি আঘাত করিলে যেমন প্রাণে লাগিয়া থাকে, সেইরূপ সাধারণ মনুষ্যের প্রাণে লাগে। প্রাচীনের প্রতি প্রেম যত প্রবল, নবীনের প্রতি বিতৃষ্ণা সেই পরিমাণে প্রগাঢ় হয়। এই বিরক্তিতে মানুষ নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে, আর নবীনের প্রতি ফিরিয়াও দেখিতে চায় না! এই ত গেল অনুরাগ-সম্ভূত রক্ষণ-শীলতা।

আর এক কারণেও মানুষ রক্ষণ-শীল হয়। যখন কোনও নূতন পথ প্রদর্শিত হয় বা নূতন সত্য প্রস্তাবিত হয়, তখন লোকে সহসা সে পথ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায় না। সমাজ যেরূপে ও যে ভাবে চলিতেছে, তাহা তাহারা জানে ও বেশ বোঝে। প্রাচীন বন্দোবস্ত অনুসারে কোথায় কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা তাহারা জ্ঞাত আছে। সেই পথে চলিয়া তাহারা অভ্যস্ত হইয়াছে, এখন চলিতে ক্লেশ হয় না; ভাবিতেও হয় না। কিন্তু এই যে নূতন সামাজিক রীতি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, ইহা উপকারজনক কি না? সমাজের কল্যাণকর হইবে কি না? এই বিতর্ক মানবের মনকে বারবার আন্দোলিত করিতে থাকে। বিতর্ক ও সংশয়ের অবস্থা মানবচিত্তের পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর অবস্থা। এরূপ অবস্থাতে মানব-মন সহজে প্রবেশ করিতে চায় না এবং যদিও বা প্রবেশ করে, সে দোলায়িত ভাব অধিককাল সহ্য করিতে পারে না। ইহার উপরে আবার নানাপ্রকার আশঙ্কা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিতে থাকে। মনে হয়, এই নবীনপথে হয়ত সমাজের মহৎ অনর্থ ঘটিবে, সমাজ-স্থিতি ভগ্ন হইয়া যাইবে, সামাজিক শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইয়া যথেচ্ছাচারের দ্বার উন্মুক্ত হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল আশঙ্কা উদিত হইয়া সন্দেহজনিত চিত্তের ক্লেশকর অবস্থাকে আরও ঘনীভূত করে। সুতরাং আর প্রশান্তভাবে নবীনের আলোচনা করিবার ধৈর্য্য থাকে না। সেই প্রস্তাব ও প্রস্তাবকর্ত্তাদিগের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। এস্থলেও লোক নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে; নবীনের প্রতি একবার ফিরিয়াও চায় না। ইহা বিতর্ক ও আশঙ্কাজনিত রক্ষণ-শীলতা।

কিন্তু আর এক প্রকার রক্ষণশীলতা আছে, তাহা লোকভয়-জনিত। মেলার স্থলে যেমন প্রত্যেকে অপরকে দেখিতে আসে, জনসমাজে তেমনি প্রত্যেকে অপরকে ভয় করে। সমাজ মাত্রেই একে দশের মুখাপেক্ষা করিয়া চলে; দশের ভয় রাখিয়া কার্য্য করে। আমরা প্রত্যেকেই প্রতিবেশীর আত্মীয়তা, সাহায্য ও সমবেদনাকে যে মূল্যবান জ্ঞান করি, এই লোকভয় তৎসম্ভূত, সুতরাং স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষে এই লোকভয়, এই একের উপর দশের শক্তি অতিশয় প্রবল। জাতিভেদ প্রথা তাহার প্রধান কারণ। এই প্রথা নিবন্ধন দশের হস্তে এমন শক্তি

আছে, যাহা প্রয়োগ করিলে দশে মিলিয়া একককে এক মুহূর্ত্তেই পিষিয়া ফেলিতে পারে। জাতীয় পঞ্চায়েতের এক নির্দ্ধারণেই এক ব্যক্তির সামাজিক মৃত্যু ঘটিতে পারে। আবার যে জাতি-ভেদ প্রথা মানুষকে এক সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করে, তাহা অপর কোন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে দেয় না; কারণ সকলেরই দ্বার বন্ধ। সুতরাং যে দশজন কর্ত্তৃক বর্জ্জিত, সে জনসমাজে সম্পূর্ণ একাকী দাঁড়াইল। সংসারে এপ্রকার অবস্থাতে দাঁড়াইতে পারে, এরূপ হৃদয়ের বল কয়জনের থাকে? সুতরাং সকলেই ভীত, সকলেই সমাজ শক্তির পদানত, সকলেই লোকভয়ে জড় সড়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, জাতিভেদ প্রথাতে সর্ব্বপ্রধান অনিষ্ট কি করিয়াছে? আমি বলি, এই অনিষ্ট করিয়াছে যে, মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিয়াছে, চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতার পথে অর্গল দিয়াছে, জাতীয় প্রতিভাকে মলিন করিয়া রাখিয়াছে।

যে কারণেই হউক, লোকভয়টা এ দেশে অতিরিক্ত; এই জন্যই দেশাচারের এত প্রবলতা। প্রথমোক্ত দুই কারণ বশতঃ যে রক্ষণশীলতা উৎপন্ন হয়, যদিও তাহার তীব্রতা, অসহিষ্ণুতা, ও তিক্ততা অধিক, তথাপি তাহাতে মানবাত্মার তত ক্ষতি করে না, যত ভয়-জনিত রক্ষণ-শীলতাতে করিয়া থাকে। প্রথমোক্ত উভয় স্থলে মানব নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে, সুতরাং আশা করা যায় যে, একদিন যখন নয়ন খুলিবে, দেখিবে ও বুঝিবে, তখন নবীনের প্রতি বিরক্তি চলিয়া যাইবে; কিন্তু শেষোক্ত রক্ষণশীলতা চক্ষু খুলিয়াই আছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের কিছুই ত্রুটী নাই, কেবল নড়িবার শক্তি নাই, এই মাত্র প্রভেদ। যে জাগিয়া ঘুমায়, তাহার অবস্থা অতিশয় নিরাশজনক।

তবেই চিন্তার উদয় হইতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দেশাচারের প্রতি এত আক্রোশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার নিগড় হইতে, তাহার দুশ্ছেদ্য পাশ হইতে লোকের মনকে উদ্ধার করিবার উপায় কি? আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, মানবকে ঈশ্বরাদেশের উপরে দণ্ডায়মান করা আবশ্যক। যাহা কর্ত্তব্য জ্ঞান-সম্মত, তাহাই ঈশ্বরের আদেশ ও তাহা লঙ্ঘন পাপ—এই মহামন্ত্রে দেশবাসিদিগকে দীক্ষিত করিতে হইবে। কেবল ঈশ্বর-প্রীতিই, অর্থাৎ প্রবল ধর্ম্মানুরাগই মানব মনকে লোকভয় হইতে উত্তীর্ণ করিতে পারে। মানবের হৃদয়টা ফিরাইয়া সত্যের সত্য যিনি তাঁহার সহিত লগ্ন করিয়া দেও, দেখিবে, তাহা হইতেই সমুদয় সংস্কার, সমুদয় নীতি, সমুদয় সদনুষ্ঠান প্রসূত হইবে।

অতএব শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার অপেক্ষা এই হৃদয় ফিরাইবার ব্যাপারটাতে অধিক মনোযোগী হইতে হইবে। তবে কি প্রাচীনকে সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া নবীনকে সমুপস্থিত করিতে হইবে? তাহাও নহে। ভূতকালের স্মৃতিকে মানব-হৃদয় হইতে ভগ্ন বা বিলুপ্ত না করিয়া তাহার সাহায্য লইয়া নবীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতে হইবে। তবে এই মাত্র দেখিতে হইবে যে, প্রাচীন যেন নবীনের আবরক ও গতিরোধক না হইয়া ভ্রম-সংশোধক ও পথ-প্রদর্শক হয়। এ প্রাচীন ও নবীনের একত্র সমাবেশেই মানব-সমাজের

গতি নিয়মিত হইয়া সুফল উৎপন্ন করে। নতুবা চীন-সমাজ এবং ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের ন্যায় যেখানে প্রাচীনানুরাগ অতিরিক্ত, সেখানে সামাজিক বদ্ধভাব ও উন্নতি-বিমুখতা দৃষ্ট হয়; আবার নব অভ্যুদিত আমেরিকার ন্যায় যে সমাজে প্রাচীনের অধিপত্য কিছুই নাই, নবীন অপ্রতিহত ভাবেই রাজত্ব করে, সেখানে নবীনের উৎসাহে লোক দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ভ্রমের গর্ত্তে পতিত হয়।' এই প্রাচীন ও নবীনের সমাবেশই প্রার্থনীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবলম্বিত সংস্কার-প্রণালী হইতে এই সার উপদেশ টুকু লাভ করা যাইতে পারে। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

শোকাশ্রু।

ভারতাকাশের পূর্ণচন্দ্র, বাঙ্গালার শিক্ষাগুরু, অনাথের আশ্রয়, সরলতা সাধুতা ও তেজস্বিতার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে, দেশে বিদেশে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে, শোকের উচ্ছ্বাস উঠিতেছে, কোটী কণ্ঠ এক হইয়া বিদ্যাসাগরের জন্য বিলাপ করিতেছে। এ শোকের উচ্ছ্বাস কবে প্রশমিত হইবে, জানি না। যত মনে করি, শোকের আবেগ কেবল বাড়িয়া যায়, এ শোকের নবীনতা আর কমিতেছে না! হৃদয় অধীর হইয়া উঠে, হস্ত অবসন্ন বোধ হয়, ভাষায় কুলায় না, এ সময়ে কি লিখিব!

যাও বিদ্যাসাগর, দয়ারসাগর, জ্ঞানের সাগর, অবলার বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-দাতা, আমাদিগের জ্ঞান-দাতা পিতা, যাও দেব, দেবলোকে, অমরাত্মাদিগের পবিত্র সহবাসে চিরশান্তিতে অবস্থিতি কর। হে পবিত্র চরিত্র পুণ্যবান্ পুরুষ, সেই পুণ্যলোকে থাকিয়াও তুমি আশীর্ব্বাদ কর, ভারত-নারীর দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাউক, দেশময় জ্ঞানের জ্যোতি বিস্তৃত হউক, আমরা দয়া-ধর্ম্ম ও সাহস সামর্থ্যে সমুন্নত হইয়া তোমার পদানুসরণ করি। যাও দেব, এই গভীর বিষাদের সময়ে এ শোকের অন্ধকার মধ্যে এ দীনের সামান্য "শোকাশ্রু" দিয়াই তোমাকে বিদায় করিতে হইল। যদি কখনও সুসময় হয়, যদি তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার পুণ্যময় জীবনচরিত কীর্ত্তন করিবার সুযোগ পাই, তখন প্রাণ খুলিয়া তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া হৃদয় ও লেখনী পবিত্র করিতে প্রয়াস পাইব।

১

হায় হায় কি হইল, একি সমাচার!
রজনী প্রভাত হতে,
একি শুনি চারিভিতে,
বিলাপের কোলাহল ঘোর হাহাকার!
বহিছে পবন একি বিষাদের ভার!!

২

পরাধীন ভারতের বড় অলঙ্কার,
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র,
শরতের পূর্ণচন্দ্র,
ভারত আকাশে লুপ্ত হলেন এবার!
আঁধার ভারত বক্ষ আঁধার আঁধার!!

৩

দয়ার সাগর আহা বিদ্যার সাগর ;
পিতৃহীনের পিতা তুমি,
মাতৃহীনের জননী,
অনাথের বন্ধু হেন কেবা আছে আর ?
তোমার বিহনে আজ দেশ অন্ধকার !

৪

দুঃখিনী বিধবা বালা পতি পুত্র হীনা,
ভারত-শ্মশানে হায়,
জীবন্মৃত যাতনায় !
কে বুঝিবে তাঁদের সে প্রাণের বেদনা ?
কে বুঝিবে হায় সেই দয়াসিন্ধু বিনা !

৫

দুঃখের সঙ্গিনী ওই কলীন কুমারী,
বহু বিবাহের পাপে,
পুড়িতেছে মনস্তাপে,
ঝরিতেছে দিবানিশি নয়নের বারি !
কে চাবে তাদের মুখে এত দয়া করি ?

৬

অভাগিনী বঙ্গভাষা, পিতৃব্য তাহার
গত আজি, সেই দুঃখে
কাঁদিছে মলিন মুখে ;
তাহারে এমন স্নেহ কে করিবে আর ?
কে সাজাবে অঙ্গ দিয়ে এত উপচার !

৭

শিক্ষিত বাঙ্গালী আজি কাঁদে সমস্বরে ;
যাঁহা হতে জ্ঞানোদয়,
উচ্চশিক্ষা দেশময় ;
সেই শিক্ষাগুরু আজি তাহাদের ছেড়ে
স্বর্গবাসী, বঙ্গবাসী কাঁদে সমস্বরে !

৮

কেঁদোনা দেখনি, আর কাঁদিয়া কি হবে ?
বিধির বিধান যাহা,
বল কে খণ্ডাবে তাহা ?
অনিত্য মানব দেহ এ অনিত্য ভবে ?
নিত্যধামে একদিন যেতেই ত হবে !

৯

যাও তবে যাও সাধু ভারত সন্তান,
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র,
শরতের পূর্ণচন্দ্র,
মানব কুলের রত্ন মহা মূল্যবান্,
মহাজ্ঞানী মহাসাধু মহা তেজীয়ান।

১০

যেই শান্তিময় দেশে দেবতার স্থান,
দয়াধর্ম্ম ন্যায় ক্ষান্তি
প্রীতি ভক্তি সুখ শান্তি
সশরীরে সদা যথা করে অবস্থান,
লভ গিয়ে সেই দেশে অনন্ত সম্মান।

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

স্বর্গারোহণ। *

(১৩ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১২৯৮)

সময় নিশীথ—স্থান পৃথিবী এবং স্বর্গ।

গম্ভীর নিশীথ, সুষুপ্ত মেদিনী,
আঁধারে ঘিরেছে ধরা।
শ্রাবণের মেঘ ঢেকেছে আকাশ
পলায়েছে শশি-তারা।

---

* এই পদ্যটী লেখক আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, কিন্তু অনুসন্ধানে জানিলাম যে, ইহা সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। মিলাইয়া দেখিলাম, স্থানে স্থানে ইহাতে অনেক নূতনত্ব আছে। সুতরাং প্রকাশিত হইল। ন, স।

থাকিয়া থাকিয়া, চমকে দামিনী,
বায়ু বহে ঘোর স্বনে।
উন্মাদ অশনি বিদারি আকাশ,
ছুটিছে আপন মনে।
সহস্র কামান জিনি ঘোর রবে
মাঝে মাঝে জলধর।
উঠিছে গরজি, ভয়ে বসুমতী
কাঁপিতেছে থর থর।
যেন কোন রাজা উর্দ্ধলোকে আজ
করিবেন আগমন।
পূজিতে তাঁহারে তাই সেথা হেন
মহা ঘোর আয়োজন।
নিম্নে বসুন্ধরা ভাবী বিষাদের
দুরূহ ভাবনা ভরে।
যেন বা নীরবে কাঁদিছেন, তাই —
বৃষ্টি ছলে আঁখি ঝরে।
এ হেন নিশীথে নগরের মাঝে
একটি প্রাসাদ পরে,
নরদেব কেহ মুমূর্ষু শয্যায়
সংজ্ঞাহীন মোহ ভরে।
সুত, সুতা, সখা, আত্ম পরিজন,
বিষাদে ঘিরিয়া তাঁর।
দাঁড়ায়ে নীরবে স্পন্দহীন সবে
পাষাণ-মূরতি প্রায়।
সকলের আঁখি সেই মুখপানে
চাহি সুধু অনিমিকে।
নাসার নিশ্বাস না সরে কাহার,
স্পন্দ নাই, কারো বুকে।
অতি সাবধানে করতুলি তার
ভীষক লইলা করে।
শুকাইল মুখ, "একি গতিহীন"
কহিলা কাতর স্বরে।
এ হেন সময় কি যেন আলোকে
ভরিল সকল স্থল।
যেন বা কাহার গুরু পদভরে
কাঁপিল সে গৃহতল।
অপূর্ব্ব সৌরভে ভরিল ভুবন
বহিল মধুর বায়।
স্বর্গ সঙ্গীত কে যেন বহিয়া
শ্রবণে ঢালিল হায়।
সহসা কে যেন বিচিত্র শরীরী
জ্যোতির মুকুট ভালে।
অতি সসম্ভ্রমে প্রণমি রোগীরে
দাঁড়াইল পদতলে।
মুমূর্ষুর মুখে উথলিল হাসি
আঁখি হ'ল বিস্ফারিত।
কি অমৃত ধারা পান আসে যেন
ওষ্ঠ দুটি প্রসারিত।
দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্ম্ময় বপু
একটি পুরুষবর।
হইলা বাহির বিদারিয়া বলে
মুমূর্ষুর কলেবর।
শিরোদেশে তাঁর জ্যোতির মুকুট
জ্যোতির বসন গায়।
দেখিতে দেখিতে সে গৃহ ছাড়িয়া
উঠিলা আকাশে হায়!
সহসা সে গৃহে ক্রন্দনের রোল
উঠিল গভীর স্বরে।
"কোথা যাও" বলি ছিল যারা সেথা
ডাকিলা সে নরবরে।
না শুনি সে কথা সে পুরুষবর
দেবদূত সনে সুখে।
ম্লানা বসুধায় ডুবায়ে তিমিরে
ধাইলেন উর্দ্ধমুখে।
ভেদি মেঘলোক সঙ্গে ল'য়ে তাঁরে
দেবদূত শূন্যে ধায়।
অঙ্গুলি হেলায়ে ধরণীর ছবি
দেখায় যতনে তাঁয়।

ওই দেখ চেয়ে পদতলে তব
বাসগৃহ পৃথিবীর!
ওই সে জাহ্নবী রজ রেখাপ্রায়
ওই হিমাচল ধীর।
এই মেঘলোক ছাড়াইনু দূরে
এই মহাশূন্য-তল।
পদতলে তব স্ফুরিছে দামিনী,
গর্জ্জিছে জলদদল।
হের চন্দ্রলোক রহিল পশ্চাতে,
ওই রবি তেজোময়।
গ্রহ, উপগ্রহ, লুকাইছে সব
অদৃশ্য তারকাচয়।
বিস্ময়ে স্তম্ভিত সে পুরুষবর
বাক্য নাহি সরে মুখে—
দেবদূত পানে অবাক হইয়া
চান সুধু অনিমিকে।
দেখিতে দেখিতে কি অপূর্ব্ব জ্যোতি
ভরিল সে শূন্যদেশ।
নাহি গ্রহতারা তবুও কিরণে
সকলই উজ্জ্বল বেশ।
সে অপূর্ব্ব জ্যোতি আসে কোথা হতে
কেহ না বুঝিতে পারে।
নাহি বায়ু সেথা, তবুও সৌরভ
ছুটিতেছে চারিধারে।
অপূর্ব্ব সঙ্গীতে পূরে দশদিক,
না জানি কে গায় গান।
কে বাজায় বীণা না পাই দেখিতে,
শূন্য হ'তে উঠে তান্।
জ্যোতির্ম্ময় বপু কত নর নারী
সেথা চারিদিকে ধায়।
অঙ্গের সৌরভে আমোদিত দিক,
আলোক উথলে গায়।
কারো হাতে বীণা, বেণু কারো হাতে,
দাঁড়াইয়া পথ পাশে।

সে পুরুষ বরে জয় মাল্য দিয়া
কহে সবে মধুভাষে।
"জয় জয় দেব স্বাগত এ ধামে
জয় জয় নরবর।
তব কীর্ত্তি গীতে পূর্ণ আজি ধরা
ধন্য তুমি গুণধর।"
মুকুতার মালা গাঁথিয়া যতনে
কেহ বা পরায় গলে।
বিচিত্র কুসুম তুলি কোন জন
সোহাগে চরণে ঢালে।
চামর লইয়া অতি সযতনে
ঢুলাইছে কোন জন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কেহ পূজে পদ,
কেহ করে আবাহন।
বিস্ময়ে সম্বোধি দেব দূতে তবে
সুধেন সে নরবর।
"কে ইঁহারা সবে করিছেন মোরে
কেন হেন সমাদর?
এ মুকুতা মালা কেন কণ্ঠে মোর?
কেন এ কুসুমচয়?
দেব দেবী যদি ইঁহারা সকলে
কেন গান মোর জয়?
ওই বহু দূরে কে গাইছে গান
বীণায় ঝঙ্কার দিয়া?
যেন বা কোথায় শুনেছি এ গীতি
তনু উঠে শিহরিয়া।
কোথা হতে আসে এ অপূর্ব্ব জ্যোতি?
কোন ফুলে এ সুবাস?
কোন দেব কণ্ঠে ঝরে এ সঙ্গীত
মহিমার পরকাশ?
বুঝিতে না পারি এ কোন প্রদেশ;
কেবা তুমি, কেন হায়,
আনিলে আমারে এ অপূর্ব্ব দেশে
কিবা তব অভিপ্রায়?"

হাসিয়া তখন　　কহে দেবদূত
'এই স্বর্গ নিকেতন।
নিজ কর্ম্ম ফলে　　তোমারই এ দেশ
এরা তব পরিজন।
বিদ্যার আলোক　　ছড়ালে যা দেশে
তারই জ্যোতি উথলিত।
বাল বিধবার　　অশ্রুধারা এই
মুক্তাদামে পরিণত।
নহে বীণা ধ্বনি　　এ অপূর্ব্ব গীতি
শুনিছ যা বহুদূরে।
কুলীন বালার　　করুণ বিলাপ,
উঠে শূন্য ভেদ করে।
অনাথ শিশুরে　　অন্ন বস্ত্র দিয়া
পেলেছিলে সমাদরে!
বিশুষ্ক অধরে　　ফুটিল যে হাসি,
আজ পুষ্পরূপ ধরে।
গভীর নিশীথে　　রোগ শয্যা পাশে
ব্যজনিলে যা সবায়।
ওই তারা সব　　যতনে তোমারে
চামর লয়ে ঢুলায়।
দেব কণ্ঠ হ'তে　　নহে এ সঙ্গীত
তোমারই মহিমা গান,
দীন দুঃখী তাপী　　আজ সবে মিলি
গাইছে খুলিয়া প্রাণ।
কুসুম সৌরভ　　নহে যা বহিছে,
তোমারই সুযশ রাশি;
পৃথিবী হইতে　　সৌরভ আকারে
পূরিতেছে দশ দিশি।
ভুলিলে কি মোরে　　ভাগ্যহীন আমি
আছিলাম মর্ত্ত্যদেশে।
ব্যাধিতে পীড়িত,　　মল মূত্র মাখা
পড়েছিনু পথ পাশে।
বুকে লয়ে মোরে　　কতই যতনে
বাঁচাইয়া ছিলে প্রাণ।
বিশ্বনাথ তাই,　　আনিতে তোমারে
দিলা মোরে আজ্ঞা দান।
কর্ম্মক্ষেত্র ধরা,　　বিধির কৌশলে
যে যা করে ধরাধামে।
ত্যজি ভব তল　　এ লোকে আসিয়া
লভে তাহা পরিণামে।
চল প্রভু তবে,　　চল সেই লোকে
যেখানে তোমার তরে।
হরিশ্চন্দ্র, শিবি,　　শ্রীচৈতন্য আদি,
আছেন অপেক্ষা করে।
নরের ব্য'ভারে　　জ্বলিয়া, পুড়িয়া,
শুষ্ক হয়েছিল প্রাণ।
আজ নিজকরে　　অমৃধের ধারা
পিয়াবেন ভগবান।
পৃথিবীর খেলা　　শেষ হ'লো তব
আজ তব সুপ্রভাত।
লইবেন তোমা　　হৃদয় মাঝারে
নিজে আজ বিশ্বনাথ।"
"এই কিসে স্বর্গ"?　　বিস্ময়ে তখন
সুধিলা সে নরবর।
"হেন সুধাভুলি　　বিষয় গরলে
কেন মজে ভ্রান্ত নর!
এই স্বর্গ যদি　　কোথা মা আমার
কোথা পুত্র-পালিনী।
দেখিতে কি তাঁরে　　পাবনা এদেশে
কহ দূত কহ শুনি।"
না ফুরাতে কথা　　সহসা অমনি
সে দৃশ্য মিলায়ে গেল।
ছায়াবাজী প্রায়　　দেব দেবী যত,
কে কোথায় পলাইল।
গম্ভীর নির্ঘোষে　　পূরিল জগৎ
বিস্ময়ে পুরুষবর।
দেখিলা সম্মুখে　　দাঁড়ায়ে জননী
ধরি দিব্য কলেবর।

বিশ্বমাতা আজি মাতারূপে তাঁর
দাঁড়াইয়া পুরোদেশে।
মহাশূন্য ভেদি ব্যাপিয়াছে তনু
রসাতল পদ পাশে।
তারকার মালা শোভে কেশ জালে,
কণ্ঠে মণি সুমিহির।
গঙ্গা গোদাবরী পবিত্র সলিলে
ঝরিছে স্তনের ক্ষীর।
শত গিরি,নদী, বন, উপবন,
শোভিত সে দেহময়।
রেণুরূপে তাঁর শোভে পদতলে
শত বিন্ধ্য, হিমালয়।
চরাচর প্রাণী সে বিশাল হৃদে
শিশুরূপে করে খেলা।
নাহি হিংসা, দ্বেষ, কলহ, বিবাদ,
আনন্দের মহামেলা।
জলবিম্ব যথা উঠি জলতলে
জলে লুকাইয়া যায়।
তেমতি সে হৃদে শত শত বিশ্ব
উদি পুন লোপ পায়।
আর কিছু নাই, যা ছিল জগতে
সকলই লুকায়ে গেছে।
কেবলই সন্তান, কেবলই জননী,
এই মাত্র সেথা আছে।
বিস্ময়ে স্তম্ভিত সে পুরুষবর
চাহি জননীর পানে।
বিশ্বরূপে আজ আত্মাহারা যেন
মগন জননী-ধ্যানে।
না পড়ে নিমেষ, নাহি মুখে ভাষা,
স্মৃতি, ধৃতি, মতি, জ্ঞান।
বিলুপ্ত সকল, মহামন্ত্রে যেন
আজ সংজ্ঞাহীন প্রাণ।
ভাঙ্গিল চমক মুহূর্ত্তেক পরে
"কোথা মাগো ছিলি ভুলে?"
এত বলি বেগে সে পুরুষবর
ছুটিলা মায়ের কোলে।
জননী অমনি প্রসারিয়া বাহু
সন্তানে লইলা বুকে।
জলবিন্দু যেন সিন্ধু মাঝে আজ
নিমগন হ'ল সুখে।
দেখিতে দেখিতে জননীর দেহে
দেহ তাঁর হ'ল লয়।
মার কোলে আজ লুকাল সন্তান
গাও সবে জয় জয়।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু।

সংক্ষিপ্ত বিদ্যাসাগর-জীবনী।

যে মহাত্মার চরিত্র-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ আজ ধন্য হইতেছেন, তাঁহার জীবন কাহিনী জানিতে অনেকেরই ইচ্ছা হইতে পারে। এজন্য,আমরা "সহযোগী" হইতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলিয়া দিলাম।

বিদ্যাসাগর হুগলী জিলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতি সামান্য আয়ের দ্বারা পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যখন ৮।৯ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। পিতার দরিদ্রতা নিবন্ধন বিদ্যাসাগরের যে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

বিদ্যাসাগরের পিতা বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজ ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই বালকের অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। বাস্তবিক জগদীশ্বর তাঁহাকে আশ্চর্য্য মানসিক তেজ ও প্রতিভা দিয়া জগতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যে শ্রেণীতে উঠিতেন, সেই শ্রেণীতেই বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইতে লাগিলেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রে ও কার্য্যে ভাবী মহত্ত্বের ছায়া উপলব্ধি হইতে লাগিল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলেজের পাঠ সমাপন পূর্ব্বক যশস্বী হইয়া বাহির হইলেন। সেই সময় সিবিলিয়ান

সাহেবদিগের শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নামে একটী কলেজ ছিল, তিনি সর্ব্ব প্রথমে পঞ্চাশ টাকা বেতনে সেই কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। এবং সেই বৎসরই সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হন, কিন্তু বৎসরান্তেই সে কার্য্য ত্যাগ করেন। এই স্থানে কার্য্য করিবার সময় "বেতাল পঞ্চ বিংশতি" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ, ফেব্রুয়ারী মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৮০, টাকা মাহিয়ানায় প্রথম কেরানীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। এবং পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে ৯০, টাকা মাহিয়ানায় সংস্কৃত কলেজের প্রফেসার নিযুক্ত হইলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১৫০, টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে জীবনচরিত, বোধোদয়, উপক্রমণিকা প্রভৃতি আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ সময় সহজে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য উপায় করিলেন। উপক্রমণিকা ও কৌমুদীব্যাকরণ প্রণীত হইল। ইহার কিছু দিন পরে তিনি হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলার স্কুল ইন্স্পেক্টরের পদ পাইলেন। যে দরিদ্র বিদ্যাসাগরের লবণ ব্যতীত ভাত খাওয়ার অন্য উপকরণ মিলিত না, সেই বিদ্যাসাগরের ৫০০, শত টাকা মাহিয়ানা হইল। এই সময় তাঁহার চেষ্টাতে উক্ত কয়েকটী জেলার পল্লীগ্রামে বালক এবং বালিকাদের জন্য অনেক স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। একদিকে তিনি যেমন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন, আর একদিকে বালকদিগের সুপাঠ্য গ্রন্থ সকল রচনা করিতে লাগিলেন। বর্ণ পরিচয়, কথামালা, চরিতাবলী প্রভৃতি প্রচারিত হইল।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কাজ করিবার সময় ১৮৫৪ খ্রীঃ হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত কি না, এই প্রশ্ন তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়।

বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ কি না, ইহা দেশে প্রচলিত করা উচিত কি না, এই গভীর চিন্তাতে তাঁহার মনের শান্তি গেল। আহার নিদ্রাবন্ধ হইল। সেই সময় তাঁহার পরিশ্রম যাহারা দেখিয়াছে, তাহারাই জানে, কি পরিশ্রমের সহিত বিদ্যাসাগর হিন্দু-শাস্ত্র মন্থন করিয়াছিলেন। তিনি কলেজের পুস্তকালয়ে বাসা করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কি প্রাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাত্রে সকল সময়েই তাঁহাকে শাস্ত্র পার্শ্বে গভীর অধ্যয়নে নিযুক্ত দেখা যাইত। এখন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সময়ে রাশীকৃত হাতের লেখা পুথি পড়িয়া তাঁহাকে এক একটী বচন সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিয়া ১৮৫১ খ্রীঃ তাঁহার বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ, প্রমাণ হইল। গ্রন্থ প্রকাশে দেশের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। চারিদিকে হুলুস্থূল। হাটে বাজারে, পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে এই চর্চ্চা। এ দিকে প্রাচীন সংস্কার যাহাদের মনে প্রবল ছিল, তাহারা বিদ্যাসাগরকে পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, দেশের শত্রু, ধর্ম্মের উচ্ছেদ-কর্ত্তা বলিয়া কত কটূক্তি করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড ঝড় দেশ মধ্যে বহিতে লাগিল। সকলে কাঁপিয়া গেল। যে তাঁহার পক্ষ ছিল, সে গা ঢাকা দিল, যে সহায় ছিল, সে দূরে পলায়ন করিল। অনেকে গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিল। দ্বারে দ্বারে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল, যে বিদ্যাসাগরের সহিত আহার করিবে, অথবা তাহার মতে যোগদান করিবে, তাহাকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। সকলে কাঁপিলেন, কিন্তু একটী লোক কাঁপিলেন না। একটু নুইলেন না; একবার দমিলেন না। মুখে একটু ভীতি চিহ্ন দেখা গেল না। ইনি আমাদের বীর বিদ্যাসাগর। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা বিবাহ করেন। সে দিনের ব্যাপার কি

ভয়ানক হইয়াছিল! বিদ্যাসাগরকে দুই হাত অন্তর পাহেড়া রাখিতে হইয়াছিল। এমন বীরপুরুষ অতি অল্পই দেখা যায়। এই বৎসরেই তিনি গবর্ণমেণ্ট দ্বারা বিধবা বিবাহের আইন প্রচলন করেন। ১৮৭১ সনে বহু বিবাহ নিবারণের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে এ কুরীতি নিঃসন্দেহে দেশ হইতে সমূলে উৎপাটিত হইত।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে তিনি অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। যে মনুষ্যত্বের অগ্নি তাঁহার মনে নিরন্তর জ্বলিতেছিল, তাহার নিকট ধন সম্পদ তৃণ অপেক্ষাও হীন। ডিরেক্টার ইয়ং সাহেবের অধীনে বিদ্যা-সাগর কার্য্য করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বিশেষ চিনিতেন না। তিনি তাঁহার প্রতি কিছু অপমানসূচক বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের তেজস্বী অন্তরে সেই ব্যবহার শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। তিনি ৫০০্ শত টাকার চাকুরীকে সামান্য বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ করিলেন। সাংসারিক লোক কত ভয় দেখাইল,—খাবে কি? চলিবে কিরূপে? তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না; কিন্তু দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত গ্রন্থ রচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বীয় পরিশ্রমে শেষে এমন আয় দাঁড় করাইয়াছেন যে, মাসে ৫০০্ শত টাকা দিয়া একজন লোক নিজের চাকর রাখিতে পারিতেন।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের দয়ার সম্বন্ধে কত গল্প আছে, তাহার সীমা নাই। কত দুঃখী পরিবার তাঁহার দ্বারা প্রতি-পালিত হইত, ইহার আর ইয়ত্তা নাই। শেষ জীবনে মেট্রপলিটান বিদ্যালয়াবলীর উন্নতি সাধনেই ব্যাপৃত ছিলেন। এইরূপ দেশের সেবাতে বিদ্যাসাগরের জীবন শেষ হইল। তিনি ১৩ই শ্রাবণ, ১২৯৮, মঙ্গলবার রাত্রি দুই ঘটিকার সময় সংসারের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া দিব্যধামে আশ্রয় লইয়াছেন।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **অমর সিংহ।**—সিপাহী বিদ্রোহ মূলক উপন্যাস, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। আজ কাল এ দেশে নানারূপ কদর্য্য উপন্যাসের বড় ছড়াছড়ি পড়িয়াছে। কিন্তু এই উপন্যাসখানি সে রকমের নয়। ইহাকে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বলা যাইতে পারে না বটে; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আনা যায়। লেখা মন্দ নয়। তবে লেখক স্থানে স্থানে প্রণয় চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া যে অশ্লীলতা ও কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থখানিকে একেবারে মাটী করিয়াছে। এই এক দোষেই ইহার সব গুণ ঢাকিয়াছে।

২। Our Shastras and the Age of Consent Bill by B. K. Magumdar. সম্মতি বিল ও হিন্দু শাস্ত্র। আদ্য ঋতুতে গর্ভাধান ও স্ত্রী সহবাস যে হিন্দু শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে; তাহা অকাট্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে এবং পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি যে শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া স্বদেশবাসীদিগকে ভ্রমে ফেলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তিকা প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির একবার পড়িয়া দেখা উচিত।

৩। **মহদ্বাক্যাবলী।**—শ্রীজলধর সর-কার সঙ্কলিত, মূল্য ৵১০ আনা। কতক-গুলি উপদেশ পূর্ণ বাক্য বঙ্গ ভাষায় অনু-বাদ করিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন। বাক্যগুলি ভাল, অনুবাদও মন্দ নহে; কিন্তু চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী। উপদেশ অনুসারে কাজ করে কয় জন?

৪। **কনে বউ।**—সামাজিক উপন্যাস।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ। লেখা মন্দ নয়। চিত্রগুলি খুব উজ্জ্বল না হইলেও চলন-সই বটে। তবে গল্পের plot নাই বলিলেই হয়। রসিক মোহনের গার্ডেন পার্টিতে বেশ্যা ও বাবুদের কথা বার্ত্তা কুরুচিপূর্ণ। ঐ চিত্র না আঁকিলেও গল্পের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। এই কুরুচিপূর্ণ দেশে অশ্লীলতার রাজত্বের সময়ে নীতি-চ্ছলেও অশ্লীলতার অবতারণা অমার্জ্জনীয়।

৫। শান্তি বা সামাজিক নাট্যরঙ্গ।—শ্রীহরকুমার চৌধুরী প্রণীত। এ মাথা মুণ্ডু না লিখিলেই কি নয়? গ্রন্থকার জানিয়া শুনিয়া "গ্রন্থ প্রণয়নরূপ সংক্রামক ব্যাধিতে" আক্রান্ত হইয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এ রোগে যদি কেবল গ্রন্থকার মরিতেন, হানি ছিল না। বঙ্গীয় পাঠকের যে সর্ব্বনাশ হইল! বিধাতা কবে এই সাহিত্য-দ্রোহীদের সুবুদ্ধি দিবেন।

৬। প্রার্থনাষ্টক।—মূল্য /০ আনা। পদ্যে ভগবৎস্তোত্র। ভাব ভাল হইলেও কবিতায় রসমাধুরী নাই।

৭। গোসানিমারীর বিবরণ।—অথবা রাজা কান্তেশ্বরের রাজধানী কমতা-পুরের ভগ্নাবশেষ। দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। ইহাতে কামরূপ রাজ্যের প্রাচীন বিবরণ ও কোচবিহার রাজ্যের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন কমতাপুরের ভগ্নাবশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে। ইহাতে অনেক প্রাচীন-কাহিনী পাঠ করিয়া সুখী হইলাম।

৮। আঁখিজল।—গ্রন্থকারের নাম নাই। আঁখিজল ফেলিতে ফেলিতে নব্য কবি ভগ্ন হৃদয়ের কয়েকটী ভাব কবিতা সূত্রে গাঁথিয়াছেন। কবি দুই শ্রেণীর; এক স্বভাব-কবি, অপর কষ্ট-কল্পনার কবি। কথায় বলে, 'উঠ্‌ছে গাছ পাতায় চেনা যায়,' স্বভাব কবিও সেইরূপ। একটী কথা কাণে গেলেই স্বভাব-কবি কিনা, জানা যায়। আঁখিজলের কবি স্বভাব-কবি নহেন। তবে মাজিতে ঘসিতে থাকিলে কালে একজন কষ্ট-কল্পনার কবি হইতে পারেন।

৯। প্রথম নীতিপুস্তক।—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ, বি, এল প্রণীত। চন্দ্রনাথ বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন মহারথী। এই নীতি পুস্তকের লেখা তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির ভাব সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে আমাদের সহিত মতদ্বৈত থাকিলেও হিন্দুর চক্ষে উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু এই স্বাধীনতার ও সভ্যতার যুগে একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের নীতি এবং পঞ্চ পাণ্ডবের এক স্ত্রীতে আসক্তির উদাহরণ বালকদিগের মনে ধরিবে কিনা, ঘোর সন্দেহের বিষয়। গ্রন্থখানিকে সাধারণ নীতিপুস্তক বলা যায় না; হিন্দু বালক বালিকাদিগের জন্য নীতি পুস্তক বলিলে অধিক সঙ্গত হইত। বিবেচনা হয়, গ্রন্থকর্ত্তাও সেই উদ্দেশ্যেই ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন।

১০। বিকাশ।—শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। লেখকের নাম অপ্রকাশিত। নবীন কবি বোধ হয় লজ্জা ও সঙ্কোচে সাহিত্য-বাজারে আত্ম পরিচয় দিতে নারাজ। কিন্তু ভয়ের কোন কারণ ছিল না। তাঁহার ফুলগুলির বাস্তবিক সুগন্ধ আছে। সুধু সুগন্ধ নয়, স্থানে স্থানে ভাবমাধুরী পূর্ণ উচ্ছ্বাসও আছে। খুব সুখী হইলাম।

১১। নব কবিতা কুসুম।—শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কবিতা-গুলি মন্দ নয়। কিন্তু স্থানে স্থানে ভাব অস্পষ্ট।

১২। ভাব্ লহরী।—শ্রীপ্রসন্নকুমার গুহ প্রণীত। এ স্থির জলের লহরী, উচ্ছ্বাস নাই। চলিত ভাবে চলিত কথায় চলিত রকমের কবিতা। ঐরূপ গ্রন্থের উপকারিতা বড় বেশী নয়।

১৩। বরাহনগর হিন্দু বিধবা আশ্রম।—মূল্য /০। শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, বি, এ, ইহার লেখক। শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত উপরোক্ত আশ্রমের বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আশ্রমের বিবরণ পাঠে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। শশিবাবু যে এই দুর্ভাগা সমা-

ক্তের একজন যথার্থ হিতানুষ্ঠানে ব্রতী, কেনা স্বীকার করিবে? স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি-মাত্রেরই এই কার্য্যে উৎসাহ দান করা উচিত। এই বিবরণী খানি আমরা পাঠক-দিগকে এক একবার পড়িতে অনুরোধ করি।

১৪। শক্তিসম্ভব কাব্য।—অর্থাৎ মহিষাসুর বধ। শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥০। মহাকবি মধুসূদনের মেঘনাদ বধ ও হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর বধ কাব্যের অনুবৃত্তিতে কবি এই গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃত কবিত্ব অতি কম; দোষের ভাগই অধিক। এরূপ কাব্যে বঙ্গসাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল হইবে না। নকল জিনিস কদাচিত ভাল হয়।

১৫। সংযুক্তা—উপাখ্যান। শ্রীঅঘোর-নাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কনোজাধিপতি জয়চন্দ্র মুসলমান্ সৈন্যা-ধ্যক্ষের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপে পৃথি-রাজকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন যবন করে অর্পণ করেন ও জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তা দেবীকে পৃথিরাজা যেরূপে সয়ম্বর সভায় বিবাহ করেন, খণ্ড কাব্যাকারে এ গ্রন্থে তাহাই লিখিত হইয়াছে। রাজ-স্থানের ইতিহাসে তো এ সব ঘটনাই লিপিবদ্ধ আছে। তবে গ্রন্থকর্ত্তা "গদ্য কি পদ্য তাহা চোদ্দোয় চেনা যায়" রকমের কবিতা লিখিয়া কেন যে কবিতার বাজারে এ মাল আমদানি করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

১৬। উপাখ্যানসার—শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। নীতি বিষ-য়ক দুইটী গল্প;—'দুই ভাই' ও 'ভাই বোন'। আনন্দ বাবু একজন সুদক্ষ লেখক। তাঁহার লিপি-চাতুর্য্যে গল্প দুইটী খুব মনো-হর হইয়াছে। 'ভাই বোন' অপেক্ষা 'ভাই ভাই' গল্পটী আমাদের নিকট আরও সুমিষ্ট লাগিল। এরূপ নীতিপুস্তক শিক্ষা বিভাগে প্রচলিত হওয়া প্রার্থনীয়।

১৭। গৃহশিক্ষাসার।—অর্থাৎ মিত-ব্যয়, সঞ্চয়, পরোপকার ও সময়ের সদ্ব্য-বহার প্রভৃতি বিষয়ক উপদেশ। শ্রীআনন্দ-চন্দ্র মিত্র প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। রূঢ় উপদেশ অপেক্ষা কথোপকথনচ্ছলে দৃষ্টান্ত দিয়া কথা বলিলে যে বেশী ফলদায়ক হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আনন্দবাবু সেই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। লেখা সরল ও সহজবোধ্য।

১৮। অপচয় ও উন্নতি।—শ্রীবিষ্ণু-চন্দ্র মৈত্র প্রণীত। মূল্য ১ টাকা। এই পুস্তকে মানুষের কর্ত্তব্য, মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক অপচয় ও উন্নতির বিষয় কয়েকটী অধ্যায়ে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থ-খানি গবেষণা ও চিন্তা পূর্ণ। লেখাও ভাল। এই গ্রন্থ উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গলা স্কুলে অধীত হইবার যোগ্য।

১৯। অমরকীর্ত্তি।—অথবা ফাদার দামিয়নের জীবন-চরিত। বৈদ্যনাথ দেওঘরের যোগীন্দ্রনাথ বসু-দ্বয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুণ্যাবতার দামিয়নের পুণ্যচরিত্র মর-লোকে বাস্তবিকই অমর-কীর্ত্তি। লেখক-দিগের লেখার পারিপাট্যে গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। দামিয়নের লিখিত পত্রগুলি হৃদয়স্পর্শী; পড়িতে পড়িতে গাত্র কণ্টকিত হয় ও এই নশ্বর জীবনের দুঃখ কষ্টকে মনে স্থান দিতে ইচ্ছা হয় না। মানুষে যদি দেবত্ব দেখিতে চাও, তবে হে বঙ্গীয় পাঠক, এই গ্রন্থ একবার পাঠ কর। এই গ্রন্থ প্রকাশে বসু-যুগলের একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে। ভূমিকায় তাহা সুন্দর রূপ বিবৃত হইয়াছে এবং পরে সংবাদ পত্রে তাহা বিঘোষিত হইয়াছে। বৈদ্যনাথে কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা ইহাদের উদ্দেশ্য। এই সাধু সঙ্কল্প যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিরই সে চেষ্টা করা উচিত। বিধা-তার নিকট প্রার্থনা করি, বসু-যুগলের মনো-রথ পূর্ণ হউক।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪৫)

প্রয়াগে—রূপানুগ্রহ।

প্রয়াগে আসিয়া শ্রীচৈতন্য সঙ্গীগণ সহ মকর যাত্রায় ত্রিবেণী স্নান করিয়া পূর্ব্ব-পরিচিত এক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বাসাটী অতি মনোহর স্থানে অবস্থিত। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম স্থান ত্রিবেণী ঘাটের উপর পরিষ্কার একখানি ঘর; সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান। শ্রীচৈতন্য সেই ঘরে বাসা নির্দ্ধারণ করিলেন। প্রাতে ত্রিবেণী ঘাটে স্নান করিয়া বিন্দুমাধব দর্শন, নৃত্য কীর্ত্তন ও সৎপ্রসঙ্গে পরম সুখে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার গুণের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে লাগিল; হরিনামের ও হরিপ্রেমের বন্যায় প্রয়াগ নগর ভাসিয়া গেল। তিনটী প্রবল নদীর সম্মিলিত তরঙ্গপ্রবাহে যে নগরকে ডুবাইতে পারে নাই, চৈতন্যের প্রেম-বন্যায় আজ তাহা ডুবিয়া গেল। একদিন বিন্দু-মাধবের প্রাঙ্গনে গৌর প্রেমোন্মত্ত হইয়া মহা নৃত্য করিতেছেন, লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকটে যাওয়া দুষ্কর এবং দর্শকমণ্ডলী গৌরের ভাবাবেশ দর্শনে অবাক্ হইয়া চিত্রপুত্তলীর ন্যায় স্থির রহিয়াছে। এই লোকারণ্যের বাহিরে দীনবেশে দুইটী অপরিচিত পুরুষ, ভিড় ঠেলিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া যাইতে না পারিয়া নৃত্যান্ত অপেক্ষা করিতেছে। লোক দুইটীর মলিন মুখশ্রী ও মলিন বেশ হইলেও মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন ইহারা কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়, কি কারণে মলিন বেশে প্রয়াগে আসিয়াছেন ও কাহাকে যেন খুঁজিতেছেন। অনুরাগ, উৎসাহ ও বৈরাগ্য যেন মুখ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে গৌরচন্দ্রের ভাবাবেশ কমিয়া আসিল, নৃত্য কীর্ত্তন থামিল, লোক ভিড় আস্তে আস্তে কমিতে লাগিল। গৌর স্থৈর্য্যলাভ করিয়া বন্ধুগণসহ বাসায় আসিলেন। আগন্তুক দুইজনও তাঁহার অনুগমন করিয়া নীরবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। গৌর উপবিষ্ট হইলে তাহারা তাঁহার পদ-তলে পড়িয়া দণ্ডবৎ লুণ্ঠন করিলেন। গৌরচন্দ্র চিনিতে পারিয়া আনন্দভরে 'কে, রূপ? এসো এসো' বলিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? শ্রীরূপ উত্তর করিলেন, আমার কনিষ্ঠ, নাম শ্রীঅনুপম মল্লিক। শ্রীচৈতন্য তাহাকেও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, দেখ রূপ, কৃষ্ণ কেমন দয়াল, বিষয়-কূপ হইতে তোমাদের উদ্ধার করিলেন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, রাম-কেলিতে সাক্ষাতের সময় রূপ সনাতনের জিজ্ঞাসা মত শ্রীচৈতন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ বিষয় হইতে তোমাদের অতি সত্বর উদ্ধার করিবেন, এখন রাজদরবারে ফিরিয়া গিয়া অন্তরে বৈরাগ্য লইয়া বাহিরে বিষয় সেবা করগে।" দুই ভাই গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তীব্র বৈরাগ্যের উত্তেজনায় নিভৃতে বসিয়া বিষয় ত্যাগের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন এবং আস্তে আস্তে

সম্পত্তি আদি ও পরিজনদিগকে কতক চন্দ্রদ্বীপের বাটীতে ও কতক ফতেয়াবাদে পাঠাইয়া দিলেন। রাজা বা রাজ অনুচরবর্গ তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল না। কথিত আছে, বিষয় বাসনার শেষ গ্রন্থি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহারা ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ করাইলেন এবং হৃদয়ের গতি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। রূপের কর্ম্ম স্থান মফস্বলে। সুতরাং তিনিই প্রথমে মনস্কামনা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলেন। বহু ধন সম্পত্তি ও নগদ টাকায় দুইখানি নৌকা সাজাইয়া তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার কালে দশ হাজার টাকা গৌড়ের কোন বিশ্বস্ত বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গেলেন, উদ্দেশ্য এই যে, আবশ্যক হইলে সনাতন তাহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। বাড়ী আসিয়া রূপ দুইজন বিশ্বস্ত চর নীলাচলে পাঠাইয়া উপদেশ দিয়া দিলেন যে, শ্রীচৈতন্য বনপথে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেই তাহারা যেন সংবাদ তাঁহাকে দেয়। কিছু দিনান্তরে চর দুইজন প্রভুর বৃন্দাবন যাত্রা জ্ঞাপন করিলে, রূপ অগ্রজ সনাতনকে গৌড় নগরে এক পত্র লিখিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে "প্রভু বৃন্দাবনে গিয়াছেন, আমরা দুই ভাই তাঁহার নিকট চলিলাম। আপনি যে কোন উপায়ে হউক শীঘ্র আসুন। টাকার প্রয়োজন হইলে—বণিকের নিকট সন্ধান লইবেন। বল্লভ বা অনুপমকে সঙ্গে লইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ও পরিজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রূপ মল্লিক কন্থা করঙ্গ সার করিলেন। স্বর্গে জয় জয় শব্দ হইল, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি-বিধা পূর্ণতা লাভ করিতে চলিল এবং সংসারাশক্তি ও সুখ বিলাসের দুর্গের উপর বৈরাগ্যের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান্ হইল।

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রূপ, সনাতনের সংবাদ কি?' রূপ উত্তর করিলেন, 'শুনিয়াছি, তিনি রাজদ্বারে বন্দী। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আসিয়াছি। বিশেষ সংবাদ কিছু বলিতে পারি না। তুমি কৃপা করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার না করিলে তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। শ্রীচৈতন্য হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'তাঁহার উদ্ধার হইয়াছে; শীঘ্রই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।' ইহার পর গৌর, রূপ, অনুপম ও আর আর বন্ধুগণ লইয়া ত্রিবেণীর ঘাটে মধ্যাহ্নাদি সমাপন করিলেন। বলভদ্র পাক করিলে শ্রীচৈতন্য আহার করিলেন। রূপ ও অনুপম সেদিন তথায় প্রসাদ পাইলেন। শ্রীচৈতন্যের বাঁসার পার্শ্বে ঘাটের উপর তাহাদের বাঁসা নির্দ্দিষ্ট হইল।

এদিকে শ্রীরূপের রামকেলি পরিত্যাগের পর সনাতন মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'বাদসাহ আমাকে যে অত্যন্ত প্রীতি করেন, সেই আমার বন্ধনের কারণ। কোন প্রকারে যদি তাঁহার বিরক্তিভাজন হইতে পারি, তবেই মঙ্গল। তাহা হইলেই বিষয়-জাল ছিন্ন করিতে পারিব।' এই ভাবিয়া অস্বাস্থ্যের ভাণ করিয়া রাজদরবারে গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিবানিশি সাধন ভজন ও সৎপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর রাজমন্ত্রীর পীড়ার সংবাদে রাজকীয় বৈদ্য পাঠাইয়া দিলেন। চিকিৎসক দেখিয়া-শুনিয়া রিপোর্ট করিলেন, মন্ত্রীর কোন পীড়া নাই। একদিন সনাতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে

প্রবৃত্ত আছেন, হঠাৎ নকিব ফুকরাইয়া উঠিল ; অনুচরবর্গের সহিত গৌড়েশ্বর সনাতনের বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত। দবীরখাস সসম্ভ্রমে উঠিয়া রীতমত অভ্যর্থনা করিয়া রাজা-অতিথিকে বসিতে আসন দিলেন। রাজা বলিলেন, 'হকীম সাহেব রিপোর্ট দিয়াছেন, তোমার কোন অসুখ নাই। তবে ব্যাপার খানা কি ?'

সনাতন বিনীত ভাবে বলিলেন 'শরীরের অসুখ ত কিছু নহে, মনে সুখ নাই, কিছু ভাল লাগে না। তাই রাজদরবারে যাইতে পারি নাই।

গৌড়েশ্বর উত্তর করিলেন, সামান্য মানসিক অসুখের জন্য কাজ কর্ম্ম বন্ধ করা কি ভাল হয় ? দেখ, তোমার হাতেই আমার সব কাজ। তুমি কাজ ছাড়িলে যে আমার সব নষ্ট হয়ে যায়। তার কি বল ? তোমার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। খুলে বল, সেই মত বন্দোবস্ত করি।

সনাতন তখন সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, জাঁহাপনা। অপরাধ মাপ করিবেন। আমার উপর আপনার অনুগ্রহ অসীম। এখন মনে হয়, এ অধমকে এত দয়া না করিলেই ভাল করিতেন। বলিতে কি, আমার মনের যে অবস্থা, তাহাতে বিষয় কার্য্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অধীনকে বিদায় দিয়া অধীনের স্থলে আর একজনকে নিযুক্ত করিলে নফরের প্রতি বিশেষ মেহেরবানি হয়। আপনার দয়া ও অনুগ্রহ এ অধীন এ জীবনে কখনই ভুলিবে না।"

গৌড়েশ্বর এসব কথা শুনিয়া প্রথমে কিছু বিস্মিত হইলেন ও অধীনস্থ কর্ম্মচারীর এরূপ গোস্তাকী ক্ষমার্হ নহে ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'এদিকে তোমার ছোটভাই চাক্‌লা সব ফেরার করিয়া দিলে ; জীব, পশু মারিয়া ডাকাতের ন্যায় সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া পলাইল ; আর তুমি কাজ কামাই করিয়া সব নষ্ট করিতেছ।'

পাতসা রূপকে ডাকাত বলায় সনাতন মনে মনে বিরক্ত হইলেন, তাঁহার এখন যে অবস্থা, তাহাতে মানুষকে আর ভয় নাই। সকল ভয়ের ভয়, ভয়ানকের ভয়ানক যিনি, তাঁহাতে যে প্রাণ সঁপিয়াছে, সে কি বাদসাহ হইতে ভয় পায় ? তাই তিনি ধীর ও গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, 'হুজুর ! আপনি স্বাধীন রাজা। অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান্।

গৌড়েশ্বর এই কথায় আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না ; অনুচরবর্গকে ইঙ্গিত করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সিকদারগণ অমনি সনাতনের হাত কড়ি দিয়া বন্দী করিয়া লইয়া গেলে, তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি রাজসরকারে জব্দ হইল। পৃথিবীর ধন, মান, পদগৌরবের দশাই এই প্রকার। ইহা জানিয়া শুনিয়াও লোক বিষয়মরীচিকায় এত লুব্ধ হয় কেন, বুঝা যায় না। এই সময়ে উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে উৎকল রাজের সহিত গৌড়েশ্বরের তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল। যুদ্ধের ভীষণ সংবাদ পাইয়া রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া পরামর্শ স্থির করিলেন। এবং সনাতনকে বন্দীশালা হইতে আনিয়া মিষ্টভাষায় সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করিলেন, 'হুজুর ! দেবতা ব্রাহ্মণে দুঃখ দিতে যাইবেন ; আমি সঙ্গে থাকিয়া কিরূপে তাঁহার সাহায্য

করিব? এ বিষয়ে বান্দা নিতান্ত অক্ষম জানিবেন।'

এই কথায় বাদসাহের ক্রোধের সীমা থাকিল না। কিন্তু সনাতন তাঁহার নিতান্ত প্রিয়; কি কারণে মাথা গরম হইয়া মস্তি-ভ্রান্তি হইয়াছে বিবেচনায় কোন অত্যা-হিতের আজ্ঞা না দিয়া তাহাকে বন্দীশালায় পাঠাইয়া দিয়া যুদ্ধ সমরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যাইবার সময় সনাতনকে যত্নে রাখিবার জন্য গোপনে কর্ম্মচারীকে আদেশ দিয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে আসিয়া এই সব সংবাদ বিশ্বস্ত চর মুখে পূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছিলেন।

প্রয়াগের অদূরে যমুনাপারে আম্বলী-গ্রাম। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বল্লভভট্ট নামে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় বাস করিতেন। ভট্ট একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, ভাগবতে তাঁহার নাকি খুব বিদ্যা ছিল। ইতিপূর্ব্বে লোক পরম্পরায় মহাপ্রভুর গুণচরিত্র শ্রবণ করিয়া ইনি তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া-ছিলেন। এখন প্রভু প্রয়াগে আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া বল্লভভট্ট শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে হরি কথা হইতে লাগিল। বল্লভ ভট্ট শ্রীচৈতন্যের প্রেমচেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্য রূপ ও বল্লভের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। দুই ভাই ভট্টকে প্রণাম করিলে ভট্ট তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। 'আমরা নীচজাতি, ছুঁইও না' বলিয়া তাঁহারা পলাইয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্য কৌতুক করিয়া হাসিয়া ভট্টকে বলিলেন, 'ইহারা অতি হীন জাতি; তুমি মহা কুলীন বৈদিক ব্রাহ্মণ; ইহাদের ছুঁইও না।' বল্লভ ভট্ট প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেন, যখন ইহাদের জিহ্বাগ্রে হরি নাম বর্ত্তমান্, তখন চণ্ডাল হইলেও ইহারা পূজ্যতম। ভগবানের নাম যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারাই তো বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ। শ্রীচৈতন্য ভট্টের এই কথায় পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং প্রেমা-বেশে শাস্ত্রীয় শ্লোক পাঠ করিয়া বলিতে লাগিলেন, সম্ভক্তিরূপ প্রদীপ্তাগ্নি দ্বারা জাতি-জনিত দুষ্কৃতি ভস্মীভূত হইয়া হৃদয় পবিত্র হয়। পণ্ডিতেরা এরূপ চণ্ডালেরও সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভক্তিহীন হইলেও তাঁহাদের নিকট সম্মান পায় না। প্রাণহীন পুত্তলিকাকে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করা যেমন বিড়ম্বনা মাত্র, তেমনি ভক্তিহীন ব্যক্তির সৎকুলে জন্ম, পাণ্ডিত্য, রূপ, পুরশ্চরণ সকলই বৃথা। বল্লভ ভট্ট ইহার পর গণ-সহিত গৌরচন্দ্র ও রূপ বল্লভকে নিমন্ত্রণ করিয়া নৌকায় আরোহণ করাইয়া স্ব গৃহে লইয়া চলিলেন। যমুনার সুচিক্কণ নীল জল দেখিয়া প্রভুর ভাব-লহরী উথলিয়া উঠিল। তিনি আত্মহারা হইয়া মধ্য যমু-নায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সঙ্গীগণ ভয়-বিহ্বলচিত্তে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নৌকায় উঠাইলেন এবং বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমাবেগ তখনও থামে নাই। তিনি নৌকার উপর নাচিতে লাগিলেন। নৌকা টলমল করিতে লাগিল। এইরূপে আম্বলীর ঘাটে নৌকা পৌছিলে বল্লভ ভট্ট মধ্যাহ্ন করাইয়া অতিথিদিগকে গৃহে লইয়া

গেলেন। এবং সকলকে নূতন বস্ত্র বহির্বাস কৌপীন, পাদ্য অর্ঘ্য, পুষ্প চন্দন, মাল্য দিয়া পূজা করিলেন এবং ভট্টাচার্য্য দ্বারা পাক করাইয়া পরিতোষ রূপে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে শ্রীচৈতন্য বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে রঘুপতি উপাধ্যায় নামে এক পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। রঘুপতি ত্রিহুত দেশের লোক, মহা পণ্ডিত এবং ভক্তি-পিপাসু পরম বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্য তাঁহার পরিচয় লইয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, 'আপনি কৃপা করিয়া আমাকে কিছু কৃষ্ণ-কথা শুনান্।' উপাধ্যায় স্বরচিত শ্লোকাবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন :—

"সংসার তাপে সন্তাপিত হইয়া কেহ নির্গুণ ব্রহ্মের, কেহ বা ঐশ্বর্য্যশালী ঈশ্বরের, কেহ বা পুরাণাদি সম্মত সাকার রূপের উপাসনা করিতেছেন ; আমি কিন্তু সৌভাগ্যশালী নন্দের শরণাপন্ন হই ; কারণ তাঁহার প্রাঙ্গণে পরব্রহ্ম লীলা বিহার করিতেছেন।"

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, আর কিছু বলুন। রঘুপতি আর একটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, পূর্ণ ব্রহ্ম গোপবধূদিগের অনশ্চোর রূপে বিরাজ করিতেছেন, একথা কাহাকেই বা বলি, কেইবা বিশ্বাস করে। উপাধ্যায় একজন প্রেমিক ভক্ত, কৃষ্ণলীলার নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝেন মনে করিয়া শ্রীচৈতন্য ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। রঘুপতি ব্যাখ্যা করিলে গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, রূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি ? রঘুপতি উত্তর দিলেন, 'শ্যামরূপ।'

চৈতন্য। কেন ?

রঘুপতি। শ্যামরূপের ন্যায় স্নিগ্ধ, সুন্দর ও আনন্দপ্রদ আর কোন্ রূপ আছে ? কালরূপ বিভীষিকা উৎপন্ন করে, উজ্জ্বল শ্বেত, গৌর, কি অন্য রূপে চক্ষু ঝল্সাইয়া দেয় ; উহা তেজ ও তীব্রতা ব্যঞ্জক হইতে পারে। কিন্তু নবজলধর শ্যামরূপ স্বতই মাধুর্য্যময়, আনন্দপূর্ণ, স্নিগ্ধ। সেরূপে যে না ডুবেছে, তাহার জন্মই বৃথা।

শ্রীচৈতন্য। আহা ! কি সুন্দর। আচ্ছা বলুন্ দেখি, শ্যামরূপের নিবাসভূমি কোথায় ? কোন্ পুরী শ্রেষ্ঠ ?

রঘুপতি। তাও কি আবার বলিতে হবে ? মাধুর্য্যপূর্ণ, সুখপূর্ণ ও রসপূর্ণ মধুপুরীই শ্যামরূপের অধিষ্ঠান ভূমি, সকল ধামের শ্রেষ্ঠ ধাম। শক্তি ধামে, ঐশ্বর্য্য ধামে, ভয়ানক ধামে লীলাবৈচিত্র্য থাকিলেও মাধুর্য্য ধামের কাছে কেহ নয়। শ্যামরূপই মধুপুরী বা মধুপুরীতেই শ্যামরূপ।

শ্রীচৈতন্য। কৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরাবস্থার মধ্যে কোন্টী শ্রেষ্ঠ ?

রঘুপতি। কৈশোর লীলার ন্যায় আর কি আছে ? যৌবন সমাগমের পূর্ব্বাবস্থার নাম কৈশোর। কৈশোরে সকলই নূতন ; অন্তরে নিত্য নবরস অঙ্কুরিত, বাহিরে নিত্য নবভাব বিকসিত। সে যে কি অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন, তাহা নবকিশোর না হইলে জানা যায় না। আর জানে সে, যে নবকিশোরে মজিয়া যায়। মাধুর্য্যময় শ্যাম রূপই নবীন কিশোর, চির নূতন ও উপাদেয়, সহস্রবার দেখিলেও পুরাতন হইবার নহে।

শ্রীচৈতন্য প্রেমোন্মত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কোন্ রস শ্রেষ্ঠ, যাতে মজিলে এ লীলা স্ফূর্ত্তি হয় ?

রঘুপতি। যাতে আত্মসমর্পণ করায়,

লাজ, কুলে জলাঞ্জলি দিয়া উন্মত্ত করিয়া তুলে, সেই মধুর রসই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য রসে কৃষ্ণের নিকট কিছু না কিছু সঙ্কোচ থাকিয়া যায়, আদি রসে সঙ্কোচ ভয় থাকিতে পারে না। থাকিলে আত্ম সমর্পণ অসম্ভব। আমি ভাল হই আর মন্দ হই, পাপী হই বা পুণ্যবান হই, কুৎসিত হই বা সুন্দর হই, তোমারই নাথ তোমারই; এই আমাকে লও, আত্মসাৎ কর, মধুর রসের ইহাই পরিণতি। এই কথায় শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। আত্মহারা হইয়া উভয়ে কোলাকুলি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। বল্লভ ভট্ট ও অন্যান্য দর্শকগণ স্তব্ধ হইয়া গেলেন। গ্রামের লোক শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক কথা শুনিয়া আসিয়া সাক্ষাৎ করিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল এবং সকল লোক হরিপ্রেম লাভ করিয়া বৈষ্ণব হইয়া গেল। ক্রমে জনতা বাড়িতে লাগিল দেখিয়া ভট্ট শ্রীচৈতন্যকে প্রয়াগে লইয়া আসিলেন। ত্রিবেণী ঘাটের বাসায় লইয়া আসিলেন। ত্রিবেণী ঘাটের বাসায় দিন দিন লোকের ভিড় বৃদ্ধি ও সাধন ভজনের ব্যাঘাৎ উপলব্ধি করিয়া চৈতন্যদেব দশাশ্বমেধে যাইয়া নির্জন স্থানে বসতি করিলেন এবং এইখানে দশদিন পর্য্যন্ত শ্রীরূপ গোস্বামীকে তত্ত্ব উপদেশ দিয়া নিজ নিজ শক্তি সঞ্চার করিলেন। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর উপক্রমণিকায় শ্রীরূপ একথা স্বীকার করিয়াছেন, "অতি ক্ষুদ্র হইয়াও আমার হৃদয় যাঁহার প্রেরণায় রসবর্ণনে সমর্থ হইতেছে, সেই চৈতন্যদেবের বন্দনা করি।" যাহা হউক, পূর্ব্বে রায় রামানন্দের মুখে মহাপ্রভু যে সব তত্ত্ব শুনিয়াছিলেন, রূপকে সেই সব তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব কত তত্ত্বই তাঁহার শ্রীমুখে স্ফূরিতে লাগিল। রূপ গোস্বামী কৃতার্থ হইয়া গেলেন। পূর্ব্ব জীবনে বাদসাহের চাকুরীতে যে অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন, এখন তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে অপুতাপ করিতে লাগিলেন, জীবনের পূর্ব্বভাগ কি অপকর্ম্মেই কাটাইয়াছেন। হীরক পাইলে কাহারই বা কাচে আগ্রহ হয়? শ্রীরূপের হৃদয়ে নানা জিজ্ঞাসা উঠিতে লাগিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন, জীবের স্বরূপ কি? ভক্তিরস কাহাকে বলে?

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'শুন রূপ' ভক্তি রসসিন্ধু গভীর অনন্ত, তাহার সকল কথা বলা যায়না। আচ্ছা তোমাকে তার এক বিন্দু আস্বাদন করাইতেছি। প্রথমে জীব লক্ষণ বলিতেছি। ভগবানের অনাদ্য-নন্ত চিচ্ছরূপের অতি স্বল্প হইতে স্বল্পতর অংশ জীব। কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া তাহাকে শত সহস্র অংশ করিলে যেমন ক্ষুদ্র হয়, জীবের স্বরূপ তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম। অনেকে জীবকে অপরিমিত, নিত্য সর্ব্ব-ব্যাপী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা কল্পনামাত্র। জীব সকল শরীরধারী, জনম মরণ ধর্ম্মশীল। সে স্বভাব পরিহার না করিয়াও কি সে আপনি আপনার নিয়ামক হইতে পারে? শাস্ত শাসকের ধর্ম্ম কিরূপে পাইবে? শ্রুতি বলিয়াছেন, যে মনে করে আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি, তাহার কিছুই জানা হয় নাই। ব্রহ্ম এমনি অনাদ্যনন্ত মহান্ ও পূর্ণ। ক্ষুদ্র অপূর্ণ জীব কি কখন তাঁহার সমান

হইতে পারে? জীব বলিতে আমি স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় সৃষ্টি প্রকৃতিকে নির্দ্দেশ করিতেছি। সকলই পূর্ণ চিচ্ছরূপের অত্যল্প চিৎকণ মাত্র। স্থাবর বাদ দিলে জঙ্গমকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তির্য্যক্, জলচর ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মানুষের সংখ্যা আবার অতি অল্প। মানুষের মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধই অধিকাংশ। অতি অল্প সংখ্যক বেদনিষ্ঠ। বেদনিষ্ঠের মধ্যে অধিকাংশই মুখে বেদ মানিয়া থাকে মাত্র, কার্য্যে তাহারা ধর্ম্মের ধার ধারে না, কিছুই মানে না। ধর্ম্মাচারীর মধ্যে আবার অধিকাংশই কর্ম্মনিষ্ঠ, বাহিরের আড়ম্বর পূর্ণ অন্তঃসার শূন্য যাগযজ্ঞে রত। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে একটী জ্ঞানী পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। জ্ঞানিগণের মধ্যে জীবন্মুক্তের সংখ্যা অতি অল্প। আবার কোটি কোটি মুক্ত পুরুষ খুঁজিলে একটী ভক্ত পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এক্ষণে বুঝিলে ভক্তি কেমন দুর্ল্লভ জিনিষ?

বলিতে বলিতে গৌরের প্রেমাবেগ উচ্ছ্বসিত হইল, তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, শুন রূপ! যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণ কৃপায় ভক্তিলতার একটী অতি ক্ষুদ্র বীজও লাভ করিতে পারেন ও শ্রবণ কীর্ত্তন জলে নিয়ত তাহা সেচন করিতে পারেন, তবে অবশ্যই তাহা বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া উঠিবে। পরব্যোম, ব্রহ্মলোক ও আসক্তি-শূন্য বিরজা ক্ষেত্রও তাহাকে আট্কাইতে পারিবেনা। কিন্তু গোড়াতে নিয়তই শ্রবণাদি জল ঢালিতে হইবে, বিরাম দিলে লতাটী শুকাইয়া যাইবে। সাবধান সাধু অপরাধ হাতিমাতা যেন না জন্মে, তাহা হলে তোমার লতা মারিয়া ফেলিবে; আরও ভয় আছে, জল সেচন পেয়ে লতার গায়ে উপ-শাখা বাড়িতে পারে, ভুক্তি মুক্তি-স্পৃহা, সন্দেহ কুটিনাটী, লাভ প্রতিষ্ঠা-বাঞ্ছা ইত্যাদি বহুবিধ আগাছা বাড়িতে পারে। সাবধানে সে সব উন্মূলিত না করিলে ভক্তিলতা বাড়িবে না। কিন্তু এই লতা একবার বাড়িয়া উঠিলে আপনিই প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়া কৃষ্ণ চরণ কল্প বৃক্ষে জড়াইয়া ধরিবে। তখন উহাতে কত সুন্দর ফুল ফুটিবে, ফলভরে অবনত হইবে ও ফল আস্বাদন করিয়া মালী শ্রম সার্থক মানিবে। অবশেষে এই লতা ধরিয়াই মালী কল্পবৃক্ষে উঠিতে পারিবে। এই ফলের নাম কি জান? প্রেম। ইহার নিকট চতুর্ব্বর্গ অতি তুচ্ছ। গৌরচন্দ্র আত্ম সংবরণ করিয়া বলিলেন, কথায় কথায় অবান্তর কথা আনিয়াছি, কি বলিতেছিলাম?

শ্রীরূপ উত্তর করিলেন, ভক্তির লক্ষণ ব্যাখ্যা করিবেন, বলিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য কহিলেন "হাঁ, অন্যবাঞ্ছা পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য লইয়া একাগ্রচিত্তে ও পবিত্র ভাবে যে ভগবদনু-শীলন করা যায়, তাহার নাম ভক্তি। অথবা ভগবানের গুণ চরিত শ্রবণাদি হইতে সাগরাভিমুখী নদীর গতির ন্যায় তাহাতে যে অবিচ্ছিন্না মনোগতি উৎপন্ন হয়, তাহাকেও ভক্তি বলা যাইতে পারে। এই ভক্তি সাধন করিতে গেলে সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে হইবে যেন ভক্তি মুক্তি স্পৃহা হৃদয়ে না থাকে।"

শ্রীরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন 'এই ভক্তি হইতে কিরূপে প্রেম প্রকাশ হইতে পারে?

শ্রীচৈতন্য উত্তর দিলেন, ভগবৎ কৃপায়

মানব হৃদয়ে স্বভাবতই কতকগুলি সুকোমল ভাবের বীজ নিহিত আছে। সেই গুলিকে হৃদয়ে উদ্দীপন করার নামই সাধন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন দর্শনাদির দ্বারা এই সাধন করিতে হয়। এই অবস্থায় ভক্তির নাম সাধন ভক্তি। সাধন ভক্তি আবার দুই প্রকার, বৈধী ও রাগানুগা। অনুরাগ-বিহীন হৃদয়ে কেবল শাস্ত্র ও গুরূপদেশ ধরিয়া যে ভাব সাধন করা যায়, তাহার নাম বৈধী ভক্তি। আর অভিলষিত বস্তুতে শ্রবণ কীর্ত্তণাদি অনপেক্ষিত স্বাভাবিক প্রেমময় প্রগাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগময়ী ভক্তি।

শ্রীরূপ। অনুরাগ-বিহীন ব্যক্তির ভাব সাধন কেমন করিয়া সম্ভবে?

শ্রীচৈতন্য। কেবল মাত্র শ্রদ্ধার উদয় হইলে হইতে পারে। শ্রদ্ধা ও অনুরাগে অনেক প্রভেদ। শ্রদ্ধা অর্থ ভাল বলিয়া অনুমোদন করা। উহা হইতে সাধু সঙ্গ করিতে ইচ্ছা জন্মিতে পারে, সাধু সঙ্গ হইতে শ্রবণ কীর্ত্তনে মনোনিবেশ হয়। তাহা হইতে ক্রমে নিষ্ঠা, শ্রবণাদিতে রুচি, ও অবশেষে আসক্তি ও রতি জন্মে। রতি হইতে প্রেমলাভ হয়।

শ্রীরূপ। প্রেমের স্থায়িভাব কি?

শ্রীচৈতন্য। ভগবানে স্নেহ, মান, প্রণয়, অনুরাগ, সখ্যতা প্রভৃতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমের স্থায়িভাব রসলীলা হইতে পারে।

শ্রীরূপ। এ সকলের কি কোন শ্রেণী বিন্যাস নাই?

শ্রীচৈতন্য। আছে বৈকি? শুন নাই কি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতি ও রস যাই বল, প্রেমের স্থায়িভাব এই পাঁচ প্রকার অবস্থায় প্রকাশ হইয়া থাকে। এই পাঁচটী স্থায়িরসে আগন্তুক বা আকস্মিক কারণে যদি হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস সাতটী গৌণরসের যোগ হয়, তাহা হইলে ভক্তের প্রাণে অনন্ত রস ভেদ ও লীলা বৈচিত্র্য প্রকাশ হইতে পারে। উহাতে সাধককে কখন হাসায়, নাচায়, কাঁদায় রাগায়, মৌনী করে এবং কত ভাবতরঙ্গে ভাসাইয়া ডুবাইয়া দেয়।

শ্রীরূপ। রতির যে পাঁচটী স্থায়িভাব বলিলেন, তদ্ভিন্ন আর কোন রূপ বিভাগ আছে কি না?

শ্রীচৈতন্য। আছে। দুই প্রকার ভক্তির প্রকৃতি ভেদে রতি দুই প্রকার। বৈধী ভক্তি যোগে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান শ্রম ও রাগময়ী ভক্তিতে কেবলারতি উৎপন্ন হয়। যে রসেরই ভক্ত হউন না কেন, ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা রতিতে প্রীতি সঙ্কুচিত হয়। ভয় বা সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয়। যেমন বাৎসল্য রসে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে প্রণাম করিলে তাঁহাকে ঈশ্বর বোধে পিতা মাতার মনে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল; সখ্য রসে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের সখ্য প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া মনে সম্ভ্রম ও ভয়ের উদয় হইয়াছিল এবং মধুর রসে কৃষ্ণ পরিহাসছলে রুক্মিণীকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া রুক্মিণীর ত্রাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু কেবলারতিতে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে না, কেবল শুদ্ধ প্রেমের উদয় হয়। নন্দ যশোদা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া সামান্য আত্মজ জ্ঞানে বাৎসল্য করিতেন, শ্রীদাম আদি

রাখালগণ সখা জ্ঞানে তাঁহার কাঁধে চড়িতেন ও গোপাঙ্গনারা সামান্য নায়ক বিবেচনায় কত কত ভাল বাসিতেন। এক স্থানে ভয় বা সম্ভ্রমযুক্ত প্রীতি, অপর স্থানে ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা ভুলিয়া গিয়া নিতান্ত আত্মীয় জনের ন্যায় ব্যবহার, দুই প্রকার রতির এই দুই প্রকার প্রকৃতি। কেবলারতিতে দাস্যভাব থাকিলেও তাহা ঐশ্বর্য্য জ্ঞান-জনিত নহে, প্রেমজনিত সেবায় দাসত্ব; স্বামীকে যেমন স্ত্রী দাসীর ন্যায় সেবা করে, পুত্রকে পিতা মাতা যেমন স্নেহ সেবা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ।

শ্রীরূপ। পঞ্চরসের প্রকৃতি কি, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন্।

শ্রীচৈতন্য। ভগবানে নিষ্ঠা বুদ্ধির নামই শম বা শান্তরস। ইহার দুইটী গুণ, যথা বাসনা ত্যাগ ও কৃষ্ণে একাগ্রতা। আকাশের শব্দগুণ যেমন সকল ভূতেই বিদ্যমান, সেইরূপ শান্তরসের এই দুই গুণ পর পর সকল রসে থাকা অবশ্যম্ভাবী। ইহা ভিন্ন অন্যান্য রতি সম্ভবে না। কিন্তু কেবল শান্ত রসে ঈশ্বরে গাঢ় মমতা হয় না, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ লীলাময় পুরুষরূপে প্রতীয়মান হয় না। শান্ত ভক্তের নির্ম্মল অন্তঃকরণে কেবল মাত্র ব্রহ্ম ও স্বরূপ বা স্বত্বা জ্ঞান প্রতিভাত হয়। তারপর দাস্য রতিতে শান্তের বাসনা ত্যাগ ও একাগ্রতা; অধিকন্তু প্রভু জ্ঞান বা ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হেতু সম্ভ্রম ও গৌরব জনিত-সেবা। তৃতীয় সখ্য রতি—উহাতে শান্তের গুণ ও দাস্যের সেবার উপর পূর্ণ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস ঈশ্বরসত্বায় বিশ্বাস নহে; বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যেমন বিশ্রম্ভ ভাব, অগৌরব, অসঙ্কোচ এবং মমতা যুক্ত বিশ্বাস তেমনি। চতুর্থতঃ বাৎসল্য—শান্ত, দাস্য, ও সখ্যের গুণ ব্যতীত ইহাতে স্নেহের ভাব অর্থাৎ ভক্ত আপনাকে পালক ও শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং তাড়ন, ভৎর্সন, লালন, ও সেবা করিয়া আপনার বাৎসল্য রতি চরিতার্থ করেন। অবশেষে মধুর রতিতে প্রথমোক্ত চারি রসের সমস্তগুণ ও তদ্ব্যতীত আত্ম সমর্পণ হইয়া রতি লীলা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। যেমন আকাশের শব্দগুণ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ গুণ, অগ্নির শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ স্পর্শ, রূপ ও রস গুণ, সমস্তই পৃথিবীতে বিদ্যমান। অধিকন্তু শব্দগুণ তাহার বিশেষত্ব; তেমনি শান্ত দাস্যাদির সমস্ত গুণ ও অধিকন্তু আত্মসমর্পণ মধুর রসে বিদ্যমান। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রতি। ইহার পর আর রস নাই। এই সংক্ষেপে ভক্তি রসের বিষয় তোমাকে বলিলাম। ইহার বিস্তার বলিতে সময়ও নাই, শক্তিও নাই। ভগবান হৃদয়ে থাকিয়া তোমাকে সব বুঝাইয়া দিবেন। তখন তুমি এ সব তত্ত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হইবে। কৃষ্ণ-কৃপায় অতি মূর্খও মহা পণ্ডিত হয়; অজ্ঞও ভবসিন্ধু পারে যায় এবং অন্ধ আতুর তরিয়া যায়। দশ রাত্রি পর্যান্ত শ্রীচৈতন্য এই রূপে শ্রীরূপকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, আমি কল্য প্রাতে বারাণসী যাত্রা করিব।

শ্রীরূপ উত্তর করিলেন, 'যদি আজ্ঞা হয় আমিও সঙ্গে আসি। তোমায় ছাড়িয়া কোথায় যাইব ও কেমন করিয়াই বা থাকিব?'

শ্রীচৈতন্য রূপের মস্তকে হাত দিয়া

বলিলেন, আমার আদেশ পালন করা তোমার কর্ত্তব্য। যদি আসিয়াছ, তবে যাহাতে তোমার হিত হয়, তাহা করা আমার কর্ত্তব্য। এখন দুই ভাই বৃন্দাবনে যাও, তাহার পর বঙ্গদেশ দিয়া নীলাচলে আমার সহিত মিলিত হইবে। শ্রীরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত হইলেন।

শ্রীচৈতন্য প্রভাতে নৌকারোহণে বারাণসী যাত্রা করিলেন। শ্রীরূপ ও বল্লভ অন্য দিকে মাথুর ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস রজপুতের সঙ্গে মথুরাভিমুখে গমন করিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

উদ্ভ্রান্ত।

১

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
সে তো ফোটে ঘোর পাঁকে,
কার মুখ চেয়ে থাকে?—
যে রাজ বিরাজে নিতি আকাশের গা'য়।
যাহার পরশে নিত্য,
বসুধা প্রফুল্ল চিত্ত,
বাতাস আতরে মাখা লতা গহনায়!
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়!

২

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
থাকিয়া আঁধার কোণে
কার মুখ ভাবে মনে?—
দিগন্ত উজ্জল, যার বরাঙ্গ আভায়।
নাই লাজ নাই ভয়,
মন খুলে কত কয়,
মুখোমুখি, পোড়ামুখী চখে চখে চায়!
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়!

৩

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
কোথা নভঃ কোথা জল,
তবু হেন ঢল ঢল,
পাশাপাশি, ছোঁয়াছুঁয়ি, যেন দুজনায়!—
শত বছরের পথ,
তবু পূর্ণ মনোরথ—
পরাণ জড়ানো তবু পরাণের গা'য়,
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়!

৪

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
এত যে হৃদয় জ্বলে,
ভাসে বুক অশ্রুজলে,
সারারাতি পোড়ে প্রাণ কত যাতনায়;
তবুও সে বোকা মেয়ে,
পূব দিকে আছে চেয়ে,
কখন ফুটিবে প্রিয়, সোণালী ছটায়,
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়!

৫

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
পাগল পাগল পারা,
ভাল বেসে হ'ল সারা,
পরাণ দিয়েছে ঢেলে সেই দেবতায়,
সে যেন যোগিনী মত,
ধেয়ানে রয়েছে রত,
নিষ্কাম, নিষ্ক্রিয়, এই মহা সাধনায়!—
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়!

৬

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
সে যেন গো "রাঙ্গা পায়"
বুক চিরে দিতে চায়,
সে যেন দেবেনা ছেড়ে, দিন যায় যায়!

চখে চখে চেয়ে রবে,
মনে মনে কথা ক'বে,
সে যেন রাখিবে বেঁধে অমর আত্মায় ;
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায় !

৭

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
এমন অবোধ ভাই,
আর বুঝি কোথা নাই,
সাধে কি দশের কাছে গালাগালি খা'য় ?—
পারে না বসিতে কাছে,
কয় না কি সাধ আছে,
শত বছরের পথ, দূর দুজনায় ;
কেবা সে এমন মেয়ে,
মরে বাঁচে চেয়ে চেয়ে,
আঁধারে কে ভালবাসে,ডোবে জ্যোছনায় !
নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় আশা,
অমর সে ভালবাসা,
ভাসিতে জানেনা বুঝি, নীরবে তলা'য় !
আমি তো বুঝিনে ছাই,
হেসে হেসে মরে যাই,
এত কি অমৃত ভরা মোহ মদিরায় ?—
গভীর অক্ষয় প্রেম, ডুবানো আত্মায় !

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

ঢাকার পুরাতন কাহিনী। (৫)

সেনরাজগণ। *

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পূর্ব্ব বঙ্গে এক অভিনব হিন্দু রাজবংশ দক্ষিণাপথবাসী কর্ণাটরাজবংশীয় বিজয়সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলে, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের প্রবল সংঘর্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় সাধিত হইয়া পাল বংশের অধঃপতন সংঘটিত হয়। হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র সেনবংশের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়। ঢাকা জিলার বর্ত্তমান বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রামপাল নগরীতে সেন বংশের রাজধানী স্থাপিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই সেনরাজগণের শাসন-প্রভাব প্রথমতঃ আরম্ভ হইয়া, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, গৌড় ও ত্রিহুত পর্য্যন্ত অনতিবিলম্বে বিস্তৃত হয়। সেনরাজগণের যে সকল শাসনপত্র ও প্রস্তরলিপি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে, প্রথমে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান পূর্ব্বক সেনবংশীয় নরপতিদিগের সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। নিম্নে তিন খানি তাম্রশাসনপত্র ও তিন খানি লিপির মর্ম্ম বিবৃত করিব, এবং রাজা প্রথম লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত একখানি তাম্র শাসনের সম্পূর্ণ মূল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করি। বিজয়সেনের নামাঙ্কিত রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ প্রস্তরলিপির শ্লোকগুলি ১৮৬৫ খ্রীঃ এসিয়াটিক সোসাইটীর সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিষয়িনী যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহা এক্ষণে নিকটে নাই বিধায় পাঠকবর্গের সমক্ষে প্রকাশ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ইদিলপুর পর-

* এই প্রবন্ধটী বহুদিন পাইয়াছি। স্থানাভাবে এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গের অদ্বিতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত স্বর্গীয় রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের জীবিত কালে ইহা প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। ন, স।

গণার জনৈক কৃষক ভূমি চাষ করিবার কালে দৈবাৎ এক খণ্ড তাম্রফলক প্রাপ্ত হয়। ইদিলপুরের তাৎকালিক জমিদার কানাইলাল ঠাকুর তাহা হস্তগত করিয়া, তাহার লিখিত বিবরণের মর্ম্ম উদ্ধারার্থ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রেরণ করেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ব-বিৎ জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেব বহু আয়াসে তাহার মর্ম্ম উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালার সেনরাজগণের এই প্রথম বিবরণ প্রকাশ করেন। এই দানপত্র দ্বারা রাজা কেশব সেন বিক্রমপুরের অন্তর্গত বাগুলি প্রভৃতি গ্রামে কিছু ভূমি বেদবিৎ ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে প্রদান করেন। ইহাতে রাজা কেশব সেনের শাসিত রাজ্যের নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও রাজধানীর নাম বিক্রমপুর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন—কেশবসেনের উত্তরোত্তর পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, লক্ষ্মণসেন দক্ষিণে পুরী ও পশ্চিমে প্রয়াগ পর্য্যন্ত আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। বিদ্যাপতি পুরুষপরীক্ষায় লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণসেন এক সময়ে বারাণসী আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণসেনের প্রধানা মহিষী বসুদেবীর গর্ভে কেশব সেন জন্মগ্রহণ করেন। এই শাসনপত্রে রাজা কেশব সেন—সোমবংশ প্রদীপ, সঙ্কর (শঙ্কর) গৌড়েশ্বর, অশ্বপতি, গজপতি ও নরপতি রাজাগণের অধিপতি, পরম সৌর—এই চারিটী বিশেষণে বর্ণিত হইয়াছেন। এই দানপত্রের যে স্থলে কেশব সেনের নাম লিখিত আছে, সেই স্থলটী কর্ত্তিত দেখিয়া বিজ্ঞবর প্রিন্সেপ সাহেব আবুলফাজলের আইনি আকবরীতে সেনরাজবংশাবলীর মধ্যে মাধব সেন নাম দৃষ্টে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে—মাধব সেন নামে কেশব সেনের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ; তিনি কেশব সেনের অব্যবহিত পূর্ব্বে অতি অল্প কাল রাজত্ব করেন ; এই দানপত্র মাধব সেনের নামে তাঁহার রাজত্বকালে লিখিত হয়, কিন্তু দান কার্য্য সম্পাদনের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে কেশব সেন সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া মৃত জ্যেষ্ঠভ্রাতার নামের পরিবর্ত্তে স্বীয় নাম অঙ্কিত করাইয়া ভূমিদান সম্পন্ন করেন। পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ চতুষ্টয় দ্বারা রাজা কেশব সেনকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ গৌড়পতি, উড়িষ্যা-বিজেতা ও সূর্য্যোপাসক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'সঙ্কর' পাঠ থাকিলে তাহা সেনবংশের মিশ্র-জাতীয়ত্বের পরিচায়ক বলিয়া বৈদ্যগণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন। এই দানপত্রে বিক্রমপুরের উল্লেখ আছে।

১৮৩৬ খ্রীঃ প্রিন্সেপ সাহেব বৌদ্ধগয়ার এক বৌদ্ধমন্দিরের দ্বারদেশস্থ যে প্রস্তর-লিপি প্রকাশ করেন, তাহাতে সেন-বংশীয় রাজা অশোকচন্দ্র দেবের নাম অঙ্কিত দেখা যায়। প্রায় বাঙ্গালা অক্ষরের ন্যায় অক্ষরে এই লিপি অশোকচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দশরথের কোষাধ্যক্ষ সহস্রপাদ ভট্টাচার্য্যের আদেশে 'সেন-বংশীয় রাজা প্রথম লক্ষ্মণ সেনের স্থাপিত লক্ষ্মণাব্দের ত্রিসপ্ততিতম (কৈলাস বাবুর মতে ৫৩ তম) বর্ষের ১২ বৈশাখ বৃহস্পতি-বার লিখিত হয়। সহস্রপাদ ভট্টাচার্য্য আপনাকে মহামহাত্মক ঋষিব্রহ্মের পুত্র ও চাটব্রহ্মের পুত্র বলিয়া পরিচিত করি-

য়াছেন। যে মন্দিরের দ্বারদেশে এই প্রস্তরলিপি পাওয়া যায়, উহা সহস্রপাদের আদেশে নির্ম্মিত হয় বলিয়া কৈলাস বাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সহস্রপাদ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, তাঁহার বৌদ্ধমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। নতুবা হিন্দুরাজার সময়ে হিন্দু কর্ম্মচারীর পক্ষে হিন্দুদেবদেবীর মন্দির ভিন্ন বৌদ্ধ-মন্দির নির্ম্মাণ বা জীর্ণসংস্কার করা, সম্ভবপর বোধ হয় না। এই শাসনলিপির অক্ষর লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত তর্পণদিঘীর তাম্রশাসন ও কেশবসেনের প্রদত্ত ইদিল-পুরের তাম্রশাসনের অক্ষর অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বিজ্ঞবর ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ও শাসনলিপিতে লক্ষ্মণাব্দের স্পষ্ট উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অশোকচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও কেশব সেনের পর সেনরাজ-গণের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রস্তরলিপি হইতে ইহা অনুমান হয় যে, অশোকচন্দ্রের সময়ে তাঁহার শাসনপ্রভাব পশ্চিমে অন্ততঃ বৌদ্ধগয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং পশ্চিমাঞ্চলের ভার তাঁহার ভ্রাতা দশরথের প্রতি অর্পিত হয়। এই অনুমান সত্য হইলে বিহারের পালরাজ-বংশ অশোকচন্দ্রের পদানত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়—ইহা বলা যাইতে পারে। স্থানান্তর হইতে উক্ত প্রস্তর নীত হইয়া বৌদ্ধগয়ার মন্দিরের দ্বারদেশে সংলগ্ন হওয়া বিচিত্র নহে। অথবা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সহস্রপাদের বৌদ্ধগয়ায় যাওয়া ও তাহা স্মরণার্থ উক্ত লিপি উৎকীর্ণ করা অসম্ভব নহে।

১৮৩৭ খ্রীঃ প্রিন্সেপ সাহেব ভবদেব ভট্টের নামাঙ্কিত যে প্রস্তরলিপি প্রকাশ করেন, তাহা উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরের নিকটবর্ত্তী অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের দ্বারদেশে উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং বিন্দুসরোবরের তীরস্থিত প্রকাণ্ড মন্দিরে সংলগ্ন করিয়া বাঙ্গালীর নির্ম্মিত সুপ্রাচীন অক্ষয় কীর্ত্তি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মভূমি উড়িষ্যার তীর্থযাত্রীদিগের নিকট ঘোষণা করিতেছিল। ইহাতে লিখিত আছে যে, ভবদেব ভট্টের মন্ত্রণা অনুসারে হরি ব্রহ্মদেব দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন এবং গৌড়েশ্বর হইতে ভবদেব রাঢ় দেশে শত-সংখ্যক গ্রাম দান প্রাপ্ত হন। ইহাতে গোবর্দ্ধন, আদিদেব, বুধ, অত্যঙ্গ, রথাঙ্গ—সাবর্ণগোত্রজ ভবদেবের উত্তরোত্তর পূর্ব্ব-পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কৈলাস বাবু অনুমান করেন যে, ভবদেবের পিতামহ আদিদেব মহারাজ বল্লাল সেনের মন্ত্রী এবং পিতা গোবর্দ্ধন রাজা প্রথম লক্ষ্মণসেনের সভাসদ পঞ্চপণ্ডিত-রত্নের অন্যতম ছিলেন। প্রস্তরলিপির নির্দ্দেশ অনুসারে বুধের পুত্র আদিদেব গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন সুকবি ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বন্দ্য-বংশীয় সঙ্গোকার গর্ভে গোবর্দ্ধনের যে পুত্র জন্মে, তিনিই ভবদেব ভট্ট নামে প্রসিদ্ধ। ভবদেব ভট্ট বিন্দুসরোবর তীরে প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে অনন্ত, বাসুদেব ও নৃসিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রস্তরলিপি ভবদেবের বন্ধু বাচস্পতি শর্ম্মা দ্বারা ৩২ সংবতে (কৈলাস বাবুর মতে লক্ষ্মণাব্দে) রচিত হয়। কয়েকখানি কুলজী গ্রন্থে ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রণীত রাজাবলীতে কেশব সেনের পর

পর যে নয় জন রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে হরি সেন এক জন। ইহা হইতে কৈলাস বাবু কেশব সেনের পর হরিব্রহ্মের রাজত্ব কাল অনুমান করেন। এই শাসনলিপির অবিকল মূল প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে তাঁহার অনুমানের বলাবল পরীক্ষা করিবার অবসর প্রদান করা কৈলাস বাবুর উচিত ছিল। তিনি তাহা না করিয়া—গুপ্ত, কেশরী, মিত্র, পাল প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের কতিপয় রাজবংশাবলীর উল্লেখ করিয়া আপনার ঐতিহাসিক জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইয়াছেন এবং হরিব্রহ্ম রাজার নামের পশ্চাৎ সেন শব্দ সংযুক্ত না থাকায় আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। হরিব্রহ্ম দেবের অস্তিত্ব যে মূল প্রমাণের উপর নির্ভর করে, তৎসম্বন্ধে অধিক বাক্য ব্যয় করা বা তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। তিনি সেন রাজদিগের বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের শাসনলিপিগুলির মূল অনুবাদ পরিশিষ্টরূপে প্রদান করাও উচিত বোধ করেন নাই।

কেশব সেনের শাসনপত্রে তাঁহার কর্ত্তৃক উড়িষ্যার 'অশ্বপতি, গজপতি, ও নরপতি' রাজাদিগের পরাজয় দ্বারা উড়িষ্যায় সেনবংশীয় গৌড়েশ্বরগণের আধিপত্য স্থাপন সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, উড়িষ্যাবক্ষে এই প্রস্তরলিপির সহিত অনন্ত বাসুদেবের মন্দির বিদ্যমান থাকিয়া সেই উক্তি সমর্থন করিতেছে। হরিব্রহ্মদেবের সম্বন্ধে কৈলাস বাবুর অনুমান সত্য বলিয়া অবধারিত হইলে, ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে—যেমন গুরব মিশ্র ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পুরুষানুক্রমে বৌদ্ধ পালরাজগণের মন্ত্রীত্ব পদে বৃত ছিলেন, সেইরূপ ভবদেব ভট্ট ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণও হিন্দু সেনরাজাদিগের অমাত্যের সম্মাননীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮৬৫ ঃশ্রী রাজা বিজয়সেনের নামাঙ্কিত সুপ্রসিদ্ধ প্রস্তরলিপির বিবরণ ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। জিলা রাজসাহীর অন্তঃপাতী গোদাগাড়ি থানার অধিকারভুক্ত দেওপাড়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী বরিন্দা (উচ্চভূমি) নামক স্থান এক প্রাচীন পুষ্করিণীর তটে এই প্রস্তরফলক মেটকাফ সাহেবের প্রযত্নে আবিষ্কৃত হয়। পূর্ব্বকালে পদ্মা হইার প্রান্তদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত, কিন্তু এক্ষণে পদ্মা এই পরিত্যক্ত পল্লীর ৬ মাইল দূরে প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত পুষ্করিণীর মধ্যে পূর্ব্বে যে দুই একখানা প্রস্তর দেখা যাইত, জলমগ্ন হইয়া এক্ষণে তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। ইহার অনতিদূরে ৬৫০ বৎসরের প্রাচীন এক প্রস্তর নির্ম্মিত মসজিদ বিদ্যমান আছে। এই প্রস্তরলিপিতে লিখিত আছে যে, গৌরেশ্বর বিজয়সেন দেব একটী প্রস্তরময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় প্রদ্যুম্নেশ্বর নামে শিবমূর্ত্তি সংস্থাপিত করেন। বিজয়সেনের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ভগ্ন করিয়া মুসলমানদিগের পক্ষে মন্দিরের প্রস্তর দ্বারা উক্ত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করা অসম্ভব নহে। এই প্রস্তরলিপির শ্লোকাদি উমাপতি নামে জনৈক রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক রচিত হয়। এই প্রস্তরলিপিতে বীরসেন, সামন্তসেন ও হেমন্তসেন বিজয়সেনের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সেনবংশীয় রাজগণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট

ও প্রামাণিক আর কোনও বিবরণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

ভগবান্ চন্দ্রমা সেনবংশের আদিপুরুষ। সেনরাজগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়া-যোগসার খণ্ডে সেনবংশীয় রাজা সুষেণকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহার প্রমাণরূপে ডাক্তার মিত্র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রায় ৩০০ বৎসর গত হইল তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থকার তারানাথ বাঙ্গলার সেন-রাজগণকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া লিখিয়াছেন।

তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে।
ভবেদ্ রাজা সুষেণাখ্যঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ॥

এই চন্দ্রবংশে দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বীরসেন জন্মগ্রহণ করেন। সেনবংশ দক্ষি-ণাপথ হইতে আসিয়া গৌড়রাজ্যে আপ-নাদের অধিকার বদ্ধমুল করেন। এই বংশে ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুলের শিরোমণি সামন্তসেন নামে যে রাজা জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি কর্ণাটরাজ্যের লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্ত শত্রুদিগকে দমন করেন *।

সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সামন্তসেন বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অদ্বিতীয় বীর হেমন্ত-সেন মহাদেবের প্রিয় উপাসক শৈব ছিলেন। রাজমহিষী যশোদেবীর গর্ভে হেমন্তসেনের যে পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম বিজয়সেন। বিজয়সেন গৌড়, মদ্র, কামরূপ ও কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। অনুগাঙ্গ প্রদেশ বিজয়ের নিমিত্ত তিনি রণতরী প্রেরণ করেন।

এই প্রস্তরলিপির নির্দ্দেশ অনুসারে বোধ হইতেছে যে, বিজয়সেনই গৌড়রাজ্য জয় করিয়া বাঙ্গলায় সেনবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ভুজবীর্য্যবলে মদ্র, কলিঙ্গ ও কামরূপ দেশ পর্য্যন্ত আপনার অধিকার বিস্তার করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ বীরসেন, সামন্তসেন ও হেমন্তসেন সম্ভবতঃ দক্ষিণাপথের সুপ্রসিদ্ধ কর্ণাট রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। অথবা কাঞ্চীপতি চোলরাজগণের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহও যে গৌড় রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিয়া-ছিলেন, প্রস্তরলিপি দৃষ্টে এমত বোধ হয় না এবং এই প্রকার কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজসাহীর প্রস্তরলিপির ন্যায় ইদিলপুরের তাম্রশাসনের ষষ্ঠ শ্লোকেও বিজয়সেন কর্ত্তৃক গৌড়দেশের বিজয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কৈলাসবাবু সর্ব্ব প্রথম

---

* সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কৈলাস বাবুর 'সেনরাজগণ' নামক পুস্তিকা হইতে প্রস্তর-লিপির তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা আমাদের নিকট সম্প্রতি নাই বিধায় উহার সমস্ত ঐতিহাসিক অংশ উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

বংশে তস্যামরস্ত্রী-বিত-রত-কলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেনপ্রভৃতিভি-রভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তা-পরিচয়-শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণ-পরিসর-প্রীণনায় প্রণীতাঃ॥ ৪
তস্মিন্সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাম্ অজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লোলশীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষ্বপ্সরোভির্দ্দশরথতনয়স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ॥ ৫
ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং,
শ্রুত্বান্যথামননরূঢ়-নিগূঢ়-রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদ-অপাকৃত-কামরূপ-
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥ ২০

এই সম্বন্ধে ডাক্তার মিত্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তী বিজ্ঞবর রাজকৃষ্ণ বাবুর মত যে স্বকপোলকল্পিত ও ভ্রমাত্মক, তাহা প্রদর্শন করিয়া নির্ভীকতা ও স্বাধীন গবেষণার পরিচয় প্রদান করেন।

১৮৭৩ খ্রীঃ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন স্বরচিত 'বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য' নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে, বাঙ্গলা অক্ষরের সময় নির্ণয় প্রসঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসনের উল্লেখ করেন, এবং উহা দেবনাগর হইতে বাঙ্গলা অক্ষর উৎপত্তির সন্ধিকালে লিখিত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, বাঙ্গলা অক্ষর যে অন্ততঃ সহস্র বৎসরের প্রাচীন, তাহা প্রতিপন্ন করেন। ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্ত্তী সুন্দরবনের কোনও মাঠে এক কৃষক তাহা দৈবাৎ প্রাপ্ত হইয়া, কলিকাতার দক্ষিণস্থ জয়নগরের কোন জমীদারকে প্রদান করে। ত্রিবেণীর হলধরচূড়ামণি বহু আয়াসে উহার লেখা পাঠ করিয়া, অবুদ্ধ স্থলের লিপি স্বয়ং যোজনা করিয়া দেন। এইরূপে ইহার রচনা নানাস্থলে বিকৃত হইয়া অস্পষ্ট হইয়া উঠে। মজীলপুরের জমিদার হরিদাস দত্ত বাঙ্গলা অক্ষরে তাঁহার যে ভ্রমপূর্ণ প্রতিলিপি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন, উহা তিনি অবিকল উক্ত সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের শেষভাগে প্রকাশ করেন। তৎপরে 'মিত্রোদয়' পত্রিকায় তাহার সম্পাদক হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় এই সনন্দের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশ করেন। পশ্চাদুক্ত তর্পণদীঘির তাম্রশাসন দৃষ্টে চতুর্থখণ্ড 'ভারতী' পত্রিকায় কৈলাস বাবু যথাবুদ্ধি সংশোধন পূর্ব্বক সুন্দরবনের এই তাম্রশাসন প্রকাশিত করেন। নিজের বিদ্যাবুদ্ধির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের ন্যায় সম্মাননীয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতকে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ শাসনলিপি প্রকাশের জন্য বিদ্রূপ করা এবং তাঁহার অপেক্ষা কৈলাস বাবু যে অধিক সংস্কৃত জানেন, তাহা প্রদর্শন করিতে বিশেষ গর্ব্বের সহিত যত্ন করা—কৈলাস বাবুর পক্ষে উচিত হয় নাই। কৈলাস বাবুর স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, ১৮৭৫ খ্রীঃ বিজ্ঞবর ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক দিনাজপুরের জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে ইংরেজি অনুবাদ সহ তর্পণদিঘীর তাম্রশাসনের মূল প্রকাশ না করিলে, সংস্কৃতবিৎ কোনও পণ্ডিতের সাহায্য ভিন্ন সুন্দরবনের শাসনলিপির মর্ম্ম সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা কৈলাস বাবুর পক্ষে কতদূর সম্ভবপর হইত। ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, কৈলাস বাবুর লেখনী পদেপদে নিজের বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে এত ব্যস্ত হয় কেন, অনর্থক প্রতিপক্ষকে অন্যায়রূপে নিন্দনীয় ভাষায় আক্রমণ ও গালিবর্ষণ করে কেন, কথায় কথায় বাগাড়ম্বরের সহিত সময় সময় এত গরল উদ্গীরণ করে কেন—বিজ্ঞলোকের অযথা নিন্দাবাদে আপনাকে কলঙ্কিত করে কেন, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বন্ধুভাবে দোষ প্রদর্শন করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ যদি নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে কৈলাস বাবু এই ক্ষুদ্র লেখককে যেন ক্ষমা করেন।

এই শাসনপত্র দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দের ১০ই মাঘ রাজধানী বিক্রমপুর হইতে প্রচারিত হয়। ইহার দ্বারা পরম বৈষ্ণব রাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন দেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের অন্তর্গত

খাড়ীমণ্ডলিকা পরগণার মধ্যবর্ত্তী মেণ্ডল গ্রামে বার্ষিক পঞ্চাশৎ পুরাণ (কাহন কড়ি) রাজস্বের তিন দ্রোণ ভূমি কৃষ্ণধর দেবশর্ম্মাকে প্রদান করেন। দানগৃহীতা কৃষ্ণধর গার্গ্যগোত্রজ জগদ্ধরের প্রপৌত্র, নারায়ণধরের পৌত্র ও নরসিংহধরের পুত্র—ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ বলিয়া শাসনপত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন যে, তাম্রশাসনে উল্লিখিত খাড়ীপরগণা ও গ্রাম অদ্যাপি সুন্দরবনে বর্ত্তমান আছে। এই শাসনপত্রের শীর্ষদেশে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র তাম্রফলকে উৎকীর্ণ সেনরাজগণের কুলদেবী ভগবতী দশভূজার মূর্ত্তি কীলক দ্বারা আবদ্ধ ছিল।

১৮৭৪ খ্রীঃ দিনাজপুরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সুবিজ্ঞ ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেব, দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত প্রাচীন বাণেশ্বরবাটী ও দেবকোটের নিকটবর্ত্তী তর্পণদিঘীর উত্তরস্থ ক্ষুদ্র একটী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার সময়ে রাজা লক্ষ্মণসেনের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়, তাহার বিবরণ ১৮৭৫ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। প্রদত্ত ভূমির সীমাদি ও দানগৃহীতার সবিশেষ পরিচয় ভিন্ন ইহা সর্ব্বাংশে পূর্ব্বোক্ত সুন্দরবনের শাসনপত্রের অনুরূপ। ইদিলপুর ও সুন্দরবনের তাম্রশাসনের ন্যায় ইহারও শীর্ষদেশে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র তাম্রফলকে উৎকীর্ণ ভগবতী দশভূজার মূর্ত্তি সংলগ্ন ছিল। এই দানপত্র সপ্তম লক্ষ্মণাব্দের ৩রা ভাদ্র রাজধানী বিক্রমপুর হইতে প্রচারিত হয়। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সান্ধিবিগ্রহিক (মন্ত্রী বা অমাত্য) নারায়ণ দত্ত, এই শাসনপত্র অনুসারে দানগৃহীতাকে উৎসর্গীকৃত ভূমিতে অধিকার দেওয়াইতে প্রেরিত হন। কৈলাস বাবু এই নারায়ণ দত্তকে মৌদ্গল্য গোত্রজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক সম্মানিত কায়স্থ জাতীয় কুলীন পঞ্চের অন্যতম এবং বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের মহাসান্ধিবিগ্রহী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই শাসনলিপির দ্বারা পরমবৈষ্ণব লক্ষ্মণ সেন দেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের অন্তঃপাতী বারেন্দ্র অঞ্চলের বিলহিষ্টী গ্রামে বার্ষিক একশত পঞ্চাশ পুরাণ পরিমিত আয়ের ভূমি আচার্য্য ঈশ্বর শর্ম্মাকে চিরকালের জন্য প্রদান করেন। দানগৃহীতা ভরদ্বাজগোত্রজ ঈশ্বর দেবশর্ম্মা সামবেদীয় কৌথুমশাখাধ্যায়ী হুতাশনের প্রপৌত্র, মার্কণ্ডেয়ের পৌত্র ও লক্ষ্মীধরের পুত্র বলিয়া ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কৈলাস বাবু অনুমান করেন যে, লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত উভয় শাসনপত্রের দানগৃহীতা ব্রাহ্মণই বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। রাজা বিজয়সেনের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণাপথ হইতে বাঙ্গলায় আগমন করেন। ঋগ্বেদীয় শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের সংখ্যা বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমান কালে অধিক না থাকিলেও, রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে সামবেদীয় কৌথুমশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ অনেক আছেন। অতএব কৈলাস বাবুর কল্পিত অনুমান বিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত এই উভয় শাসনপত্রেই সেনরাজগণকে চন্দ্রবংশীয় এবং লক্ষ্মণসেনকে হেমন্ত সেনের প্রপৌত্র, বিজয়সেনের পৌত্র ও বল্লাল সেনের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কর্ণাটের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ কাঞ্চী নগরীতে হেমন্তসেন রাজত্ব করিতেন বা কাঞ্চীর রাজবংশের কনিষ্ঠ শাখা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। এই উভয় দানপত্রেই

লক্ষ্মণসেনের শাসিত রাজ্যের নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও রাজধানীর নাম বিক্রমপুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গৌড় নগরী রাজা লক্ষ্মণসেনের দ্বারা স্থাপিত হইয়া লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত হইলেও, তথায় কোন কালে সেনবংশের রাজধানী ছিল বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পরমবৈষ্ণব শব্দ দৃষ্টে বোধ হয়, রাজা লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণব ছিলেন। ভগবতী দশভূজা বোধ হয় সেনরাজগণের কুলদেবতা ছিলেন। *

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী গবেষণায় সেনরাজগণের নামাঙ্কিত যে সকল প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিব-

* ঢাকার ইতিহাসের সহিত সেনরাজগণের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল বিধায়, আমরা সুন্দরবনের তাম্রশাসনের রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত মূলের সহিত মিলাইয়া তর্পণদিঘীর প্রসিদ্ধ তাম্রশাসনের মূল সংস্কৃতজ্ঞ ও কৌতুহলাবিষ্ট পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম। অষ্টম শ্লোকটী সুন্দরবনের শাসনপত্রের প্রতিলিপিতে দৃষ্ট হয় না।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বিদ্যুদ্ যস্য মণিদ্যুতিঃ ফণিপতে র্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং।
বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাস-সমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে,
ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ সপর্য্যাম্বুদঃ ॥১

আনন্দোঽম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যন্তিকী,
কহ্লারেঽহতমোহতারতিপতাবেকোঽমেবেতিধীঃ।
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশু প্রকাশাজ্জগ—
ত্যন্তের্ধ্যানপরম্পরাপরিণতং জ্যোতি স্তদাস্তাংমুদে ॥ ২

সেবাবনম্রনৃপকোটি-কিরীট-রোচিরম্বুল্লসৎ-পদ-নখ-
দ্যুতি-বল্লরীভিঃ।
তেজোবিদ্বয়মুষো দ্বিষতাং মভূবন্ ভূমীভুজঃ স্ফুট
মথৌষধিনাথ-বংশে ॥ ৩

আকৌমার বিকস্বরৈ র্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভি র্দোর্যশঃ-
প্রালেয়ৈ-ররিরাজকন্নলিনস্নানীঃ সমুন্মীলয়ন্।
হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেন-জনন-ক্ষেত্রৌঘ-পুণ্যাবলী—
শালি-শ্লাঘ্য-বিপাক-পীবরগুণ স্তেষাম্ভুদংশজঃ ॥ ৪

যদীয়ৈ রদ্যাপি প্রচিত ভুজ-তেজঃসহচরৈঃ
যশোভিঃ শোভন্তে পরিধিপরিণদ্ধাঃ ইব দিশঃ।
ততঃ কাঞ্চী লীলাচতুর চতুরম্ভোধি লহরী
পরিতোর্ব্বী ভর্ত্তাঽজনি বিজয়সেনঃ স বিজয়ী ॥ ৫

প্রত্যূহঃ কলিসম্পদাং অনলসো বেদায় নৈকাধ্বগঃ
সংগ্রামঃ শ্রিত জঙ্গমাকৃতিঃ, অভূদ্ বল্লালসেন স্ততঃ।
যশ্চেতো যমমেব শৌর্য্যবিজয়ী দল্লোষধং তৎক্ষণাৎ (?)
কক্ষীণা রচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ং ॥ ৬

—সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগুণগুণাভোগপ্রলোভাদ্দিশাং
ঈশৈবংশসমর্পণেন ঘটিত-স্তত্তৎপ্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুষ্মক্ষপিতারিসঙ্গররসো রাজন্যবর্ম্মাশ্রয়ঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন, ভূপতি রতঃ সৌজন্যসীমাঽজনি ॥ ৭

—শঙ্খ-দবন্ধভয়াৎ বিমুক্তবিষয়া স্তম্ভাত্রনিষ্ঠীকৃত
স্বান্তা যান্ত কথং ননাম রিপব স্তস্য প্রয়োগাল্লয়ং।
যৈরাত্মপ্রতিবিম্বিতেঽপি নিপতৎ তত্রেঽপি
চক্ষুৎতৃণে (?)
ঽপ্যদ্বৈতেন যত স্ততোঽপিসপরোদেব! পরংবীক্ষ্যতে ॥৮

স খলু শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়-স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-শ্রীবল্লালসেনদেব-পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বর-পরমবৈষ্ণব-পরম ভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনদেবঃ কুশলী, সমুপাগতাশেষ-রাজরাজন্যক-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র -রাজামাত্য -পুরোহিত -মহা-ধর্ম্মাধ্যক্ষ - মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত—অন্তরঙ্গ—বৃহদুপরিক—মহাক্ষপটলিক—মহাপ্রতীহার—মহাভোগিক মহাপীলুপতি—মহাগণস্থ—দৌঃসাধিক—চৌরোদ্ধরণিক—নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজা-বিকাদিব্যাপৃতক—গৌল্মিক—দণ্ডপাশিক—দণ্ডনায়ক—বিষয়পত্যাদীন্ বন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষপ্রচারোক্তান্ ইহা কীর্ত্তিতান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিচ।—

মতংঅস্তভবতাং—যথা শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন-

রণ সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এই সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ সর্ব্বপ্রথম লেখনী ধারণ করিয়া স্বাধীন-ভাবে ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা পূর্ব্বক বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত সেনরাজগণের বিবরণ বিষয়ক পুস্তিকা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত কি, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইয়া থাকিলেও, তিনি বিশেষ আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রবন্ধ অবলম্বনে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের বাঙ্গলা ও সেনবংশীয় রাজ-

---

ভুক্ত্যন্তঃপাতি-বরেদান। পূর্ব্বে বুদ্ধবিহারী-দেবতানিকরদেয়াস্মণ-ভূম্যাঢ়াবাপ পূর্ব্বালিঃ সীমা, দক্ষিণে নীচদহ নিচড়হার-পুষ্করিণী সীমা, পশ্চিমে নন্দিহরিপাকুণ্ডী সীমা, উত্তরে মোল্লাণখাড়ী সীমা। ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্তত্রত্যদেশব্যবহার-মলিনদেব-দেবগোপথাদ্যসারভবহিঃ পঞ্চোন্মানাধিক বিংশত্যুত্তরাঢ়াবাপশতৈকাত্মকঃ সংবৎসরেণ কপর্দ্দক-পূরাণ-সার্দ্ধশতৈকোৎপত্তিকো বিলঃ-হিষ্টীগ্রামীয়-ভূভাগঃ সমাঠ-বিটপঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোষরঃ সগুবাকনারিকেলঃ সহদোষাপরাধঃ পরিহৃতরর্ব্বপীড়োঽ চট্টভট্টপ্রবেশো ঽকিঞ্চিৎগ্রাহ্য স্তৃণযতিগোচরপর্য্যন্তঃ হুতাশন-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় মার্কণ্ডেয়-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় লক্ষ্মীধর-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভারদ্বাজ-সগোত্রায় ভারদ্বাজ আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-প্রবরায় সামবেদ-কৌথুমশাখাচরণানুষ্টায়িনে হেমাশ্বরথ-মহাদানাচার্য্য-শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদ্ উদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ-ভট্টারকং উদ্দিশ্য মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযাশাঽভিবৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্বরথ-মহাদানে দক্ষিণাত্বেন উৎসৃজ্য আচন্দ্রার্ক-ক্ষিতি-সমকালো যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। তদ্ ভবদ্ভিঃ। সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং, ভাবিভরপি নৃপতিভিঃ, অপহরণে নরকপাতভয়াৎ, পালনে ধর্ম্মগৌরবভয়াৎ পালনীয়ং।

ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদাভূমি, স্তস্য তস্য তদাফলং॥
ভূমিংব প্রতিগৃহ্লাতি, যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ, নিরতং স্বর্গগামিনৌ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং।
স বিষ্টায়াং কৃমি র্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং,
শ্রিয়ং অনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ,

সকলমিদং উদাহৃতং চ বুদ্ধা,
ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনো নারায়ণদত্ত—সান্ধিবিগ্রহিকং।
ইহ ঈশ্বর—শাসনদানে দূতং ব্যধত্ত নরনাথঃ॥
সং ৭, ভাদ্রদিনে ৩। শ্রীনিমহাসানি।

এই দানপত্রের অনুবাদ করিতে হইলে, টীকা টীপ্‌পনীরূপে অনেক কথা লিখিতে হয় এবং তন্নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখার প্রয়োজন হয়। বাহুল্যভয়ে এখানে তাহা হইতে নিরস্ত রহিলাম।

রাজা লক্ষ্মণসেন এক সময়ে যে স্বর্ণ, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দানগৃহীতা ঈশ্বর দেবশর্ম্মা সেই উপলক্ষে রাজার পুরোহিতের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই দান ব্যাপারের দক্ষিণাস্বরূপ পুরোহিতকে বিলহিষ্টী গ্রাম নিষ্কর উপভোগের নিমিত্ত প্রদান করেন। ইহার বার্ষিক আয় ১৫০ কাহন কড়ি। ১২৫ আঢ়ক (কাঠার প্রায় তুল্য) ধান্য বীজ দ্বারা বৎসর বৎসর তাহার উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হইত। বীজ দ্বারা ক্ষেত্রের পরিমাণ নির্দ্দেশ, কাছাড় ও শ্রীহট্টে এবং বাঙ্গলার নানা স্থানে প্রচলিত ছিল ও আছে। প্রাচীন কাল হইতে সেনরাজগণের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র মুদ্রার পরিবর্ত্তে যে কড়ি মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত, এই শাসনপত্র তাহার স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে।

গণ সম্পর্কে গবেষণার ফল সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় স্বীয় মন্তব্যের সহিত সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার প্রশংসা করিতেছি। আবিষ্কৃত শাসনলিপি ও জনপ্রবাদাদির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বংশাবলী দ্বারা সেনরাজগণের নামমালা প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

চন্দ্রবংশীয়-বীরসেন—দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কর্ণাটের (?) রাজা। তাঁহার সময় নির্দ্দেশ অসম্ভব।

সামন্ত সেন—কর্ণাট-লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন ও পরাভব করেন।

হেমন্ত সেন + যশোদেবী—পত্নী। তিনি বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কাঞ্চীপতি বলিয়া লক্ষ্মণ সেনের শাসন পত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি শৈব ছিলেন।

(অনুমান ১০৩০-৬৫খ্রীঃ) (১) বিজয় সেন দেব—সম্ভবতঃ আদিশূরের স্থাপিত বংশের কোন রাজতনয়াকে বিবাহ করেন। পালবংশীয় কোন বৌদ্ধরাজাকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাজ্যে ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সেনবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। গৌড়েশ্বর বিজয় সেনের অধিকার মদ্র, কলিঙ্গ ও কামরূপ রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

(খ্রীঃ ১০৬৬-১১০৪) (২) বল্লাল সেন দেব—বল্লাল সেন স্বরাজ্যকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। আদিশূরের সময়ে উপনিবিষ্ট পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সন্ততিগণের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেন।

(খ্রীঃ ১১০৪-৩০) (৩) (প্রথম) লক্ষ্মণ সেন দেব—মিথিলা বিজয়ের পর লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং লক্ষ্মণাব্দ স্থাপন ও কৌলীন্য প্রথা সম্বন্ধে নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিয়া তাহা সম্প্রসারিত করেন। প্রয়াগ হইতে পুরী পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল বলিয়া বর্ণনা আছে। পত্নীর নাম বসুদেবী। বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। বিক্রমপুরে রাজধানী ছিল।

(খ্রীঃ ১১৩০) (৪) মাধবসেন দেব (১১৩১-৩৫ খ্রীঃ) (৫) কেশবসেন দেব—উড়িষ্যা পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। সূর্য্যোপাসক ছিলেন। বিক্রম?পুর তাঁহার শাসিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের রাজধানী ছিল।

(খ্রীঃ ১১৩৬-৫০) (৬) হরিব্রহ্ম (সেন) দেব—ইঁহার মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ সুকবি গোবর্দ্ধনের পুত্র ? ছিলেন এবং তাঁহার পিতামহ আদিদেব বল্লালের মন্ত্রী ছিলেন।

(খ্রীঃ ১১৫০-১২৬০) (৭) অশোকচন্দ্র (সেন) দেব—ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম দশরথ। দক্ষিণবিহারে বৌদ্ধগয়া পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তৃত হয়। পালরাজগণ মুঙ্গের

(খৃঃ ১১৮০-১২০৩) (৮) দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন দেব—১২০৫ খ্রীঃ বক্তিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ অধিকারের পর পূর্ব্ববঙ্গে পৈতৃক রাজধানী ? রামপালে পলায়ন করিয়া স্বাধীনভাবে আমরণ রাজত্ব করিয়া থাকেন।

সুষেণ দেব—পদ্মপুরাণে সোমবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ডাক্তর বুকা-? ননের মতে এই রাজা নিঃসন্তান ছিলেন। দৈবঘটনায় পরিবারবর্গের মৃত্যুতে তিনি আত্মহত্যা করেন।

সুর সেন—জনপ্রবাদ মতে সেনবংশীয়রাজা বলিয়া। ? ডাক্তর ওয়াইজ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দনুজ রায়—১২৮০ খ্রীঃ দিল্লীশ্বর সম্রাট ঘিয়াসুদ্দিন বলবনকে বিদ্রোহী মগিসুদ্দিন তোগরলের ? দমনার্থ সাহায্যদানে সম্মত হন। ইনিই চন্দ্রদ্বীপ (বাকলা) রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা দনুজমর্দ্দন দে নামে খ্যাত হন বলিয়া ডাক্তর ওয়াইজ অনুমান করেন।

দ্বিতীয় বল্লাল সেন দেব—জনপ্রবাদ মতে মুসলমান রাজা পীর আদম সাহিদের হস্তে নিহত হইলে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান প্রভুতা খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সংস্থাপিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে আমরা সেনরাজগণের শাসনলিপির বিবরণে পুনঃ পুনঃ লক্ষ্মণাব্দের উল্লেখ করিয়াছি। এই লক্ষ্মণাব্দ বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, স্বীয় নামে রাজত্বের আরম্ভকাল হইতে এই অব্দ রাজ্য মধ্যে প্রবর্ত্তিত করেন। এই লক্ষ্মণাব্দের সময় নিরূপিত হইলে, রাজা লক্ষ্মণসেনের পূর্ব্বতম ও পরবর্ত্তী সেনরাজগণের আনুমানিক সময় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ইহা সেনরাজগণের সময় নির্দ্ধারণের প্রধানতম উপায় বলিয়া ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অব্দ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত থাকিয়া, মিথিলা যে এক সময়ে বাঙ্গলার পদানত ছিল, নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাহা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। মৈথিল পণ্ডিতদিগের গণনা অনুসারে ১১৮৪ শকাব্দের মাঘ (১১০৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী) মাস হইতে এই অব্দ প্রচলিত হয় বলিয়া ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে ১১০৮ খ্রীঃ এই অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক্তর বুকানন মিথিলা হইতে বৌদ্ধ পালরাজগণের উচ্ছেদের সময় হইতে এই অব্দ লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া, ১১০৪ খ্রীঃ ইহার আরম্ভকাল অবধারণ করিয়াছেন। এই অব্দের সাঙ্কেতিক চিহ্ন "লসং"।

আমরা এস্থলে এই অব্দ কিরূপে

প্রথমত আবিষ্কৃত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান করিয়া সেনরাজগণের কালনির্ণয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ১৭৯৮ খ্রীঃ, নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের অন্যতম জজ বহুবিদ্যাবিশারদ সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রুক সাহেব স্বপ্রণীত 'হিন্দুব্যবস্থাবলী' নামক গ্রন্থের ভূমিকায়, রাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ন্যায়সর্ব্বস্ব-প্রণেতা হলায়ুধের পরিচয় প্রদানকালে, সর্ব্বপ্রথম এই লক্ষ্মণাব্দের উল্লেখ করেন এবং লক্ষ্মণাব্দের ৬৯২ বৎসর গত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৮১০ খ্রীঃ পূর্ণিয়া জিলার প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ উপলক্ষে ডাক্তর বুকানন সেনবংশীয় তৃতীয় রাজা প্রথম লক্ষ্মণসেনের মিথিলা বিজয় হইতে বিজয়ী নরপতি কর্ত্তৃক ১১০৪ খ্রীঃ এই অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া স্থানীয় লোকের মুখে অবগত হন। লক্ষ্মণসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী বল্লাল সেন বা আদিশূরের নাম মিথিলাবাসীগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত দেখিয়া, তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রথম লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃকই বাঙ্গলার সীমান্তভাগ মিথিলার পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। এবং মিথিলা বিজয়ের পর গৌড়রাজ্যের রাজধানী সোণারগা হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণাবতী (গৌড় বা লক্ষ্ণৌতী) নগরে আনীত হয়। প্রথম লক্ষ্মণসেনের বিজয়িনী গতি নিরোধার্থ দিল্লীশ্বর ত্রিহুতের সীমান্তভাগে সেরাইগড়ের দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হন। ডাক্তর বুকাননকে লক্ষ্মণাব্দের প্রকৃত আবিষ্কারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে কোনও ক্রমে অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ডাক্তর বুকাননের এই আবিষ্ক্রিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অপ্রচারিত থাকে। ১৮৩৭ খ্রীঃ বৌদ্ধগয়ার অশোক চল্ল দেবের নামাঙ্কিত প্রস্তরলিপির অন্তে "শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেবপাদানাং অতীতরাজ্যে সং ৭৪ (৫৩?) বৈশাখবদি গুরৌ" এই বাক্য দেখিয়াও পণ্ডিতবর প্রিন্সেপ সাহেব লক্ষ্মণাব্দ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। ১৮৭৩ খ্রীঃ সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র "সদূক্তিকর্ণামৃত" নামে যে এক খানি হস্তলিখিত সুবিস্তীর্ণ সংস্কৃত কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রাপ্ত হন, তাহা ১৫০০ শকাব্দে লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের শেষ ভাগে সংগ্রহকারের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে

শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেত দশশতে শরদাং।
শ্রীমলক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্যখ রসৈকবিংশে ॥

গ্রন্থরচনার কাল ১১২৭ শকাব্দ (১২০৫খ্রীঃ) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। গ্রন্থকার শ্রীধরদাস রাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের বিশ্বস্ত অমাত্য ও সেনাপতির বটুদাসের পুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করেন। ডাক্তার মিত্র শেষভাগের ভ্রমপূর্ণ পাঠে সন্দিগ্ধ হইয়া, তৎকালে কিছুই নিশ্চয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৮৭৭ খ্রীঃ পণ্ডিত রামনাথ তর্করত্ন হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় ও নূতন পুস্তকের বিবরণ সংগ্রহের নিমিত্ত ডাক্তর মিত্র কর্ত্তৃক ত্রিহুতে প্রেরিত হন। তথায় তিনি ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত পুস্তকালয়ের জন্য সম্পূর্ণ নূতন যে কয়খান ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ক্রয় করেন, তন্মধ্যে মৈথিল নৈয়ায়িক মধুসূদন ঠকুর প্রণীত "অনুমানালোক টীকা" ও মহেশ ঠক্কুর রচিত "প্রত্যক্ষলোকদর্পণ" প্রাপ্ত হনর

প্রথমোক্তগ্রন্থ ৪৫৯ লক্ষ্মণাব্দে ও শেষোক্ত গ্রন্থ ৪৮৪ অব্দে

'বেদাষ্টনিগমৈর্ যুক্তে ভূপলক্ষ্মণসম্মতে'

লিখিত হইয়াছিল বলিয়া পুস্তকের শেষভাগে উল্লিখিত ছিল। ইতিমধ্যে ১৮৭৪ খ্রীঃ "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র সম্বন্ধে এমন একটী গবেষণাপূর্ণ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যে, ১৮৭৫ খ্রীঃ বোম্বের সুবিখ্যাত ভারতীয় পুরাতত্ত্বালোচক (Indian Antiquary) নামক মাসিক পত্রিকায় উহার সংক্ষিপ্তসার ইংরেজিতে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ খ্রীঃ ১২৮২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় বাঙ্গলার আদিকবি বিদ্যাপতি ঠাকুর সম্বন্ধে আরও একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই দুই প্রবন্ধের লেখক সুবিজ্ঞ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাহাতে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করেন যে, লক্ষ্মণাব্দ ৭৬৭ বর্ষ অতীত হইল রাজা লক্ষ্মণসেন কর্তৃক বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হয়। উহা মিথিলায় বর্ত্তমান কালেও প্রচলিত আছে। তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন "লসং" (লক্ষ্মণসেন সংবৎ)। ত্রিহুতের রাজা শিবসিংহ ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে (১৪০০ খ্রীঃ) বাপসী নামে যে গ্রাম পুরস্কার স্বরূপ আপনার সভাসদ সুকবি বিদ্যাপতিকে প্রদান করেন, অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ সেই গ্রামে বসতি করিতেছে। বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি। মিথিলার প্রামাণিক ইতিহাস "পঞ্জী" ১২৪৮ শকাব্দ হইতে লিখিত আরম্ভ হয়। এই পঞ্জীর মতে শিবসিংহ ১৩৬৯ শকাব্দে (১৪৪৭ খ্রীঃ) পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। শিবসিংহের পিতা অতি দীর্ঘকাল (৬১ বর্ষ) রাজত্ব করেন। অতএব রাজ্যপ্রাপ্তির ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে পিতার জীবদ্দশাতে শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বাপসী গ্রাম প্রদান করেন। শিবসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন প্রধানা মহিষী জ্যেষ্ঠানুক্রমে মিথিলায় রাজত্ব করেন। রাজমহিষী পদ্মাবতী দেড় বৎসর, লখিমা দেবী ৯ বৎসর এবং কনিষ্ঠা বিশ্বদেবী ১২ বৎসর কাল, রাজা শিবসিংহের মৃত্যুর পর মিথিলা শাসন করিতে থাকেন। এইরূপে রাজকৃষ্ণবাবু মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের সময় খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়া অবধারণ করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহার রচিত "বাঙ্গলার ইতিহাস" নামক ক্ষুদ্রকায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থে সেনরাজগণের বিবরণে এই লক্ষ্মণাব্দের ব্যবহার করিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত করিতে থাকেন। কোলব্রুক ও বুকাননের আবিষ্কৃত লক্ষ্মণাব্দ ব্যবহার ও প্রচারের জন্য বঙ্গদেশ ও বাঙ্গলা সাহিত্য চিরকাল সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

সেনরাজবংশ কোথা হইতে কিরূপে বাঙ্গলায় আগমন করিয়া রাজত্ব লাভ করেন, ডাক্তার মিত্র, রাজকৃষ্ণবাবু বা ডাক্তার হারনলি, ইহাদের কেহই তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই এবং এই সম্বন্ধে কোনও কথা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ "সেনরাজগণ" নামক গবেষণাপূর্ণ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ ডাক্তর বুকানন, বার্ণেল ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রকাশিত বিবরণের প্রতি নির্ভর করিয়া এই সম্পর্কে তাঁহার নিজের মত স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এবম্বিধ গুরুতর বিষয়ে সংক্ষেপে তাহার বক্তব্য শেষ না

করিয়া, যে সকল প্রমাণের উপর আপনার মত ঐতিহাসিক তত্ত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার বিস্তীর্ণ বিবরণ ও সমালোচনা প্রদান পূর্ব্বক পাঠককে তাঁহার অনুমানমূলক সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের অবকাশ দেওয়া উচিত ছিল। আত্ম অনুমানের পরিপোষক যথেষ্ট প্রমাণ, সুযুক্তি ও সুবিচারের সহিত প্রদর্শন না করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে তিনি নানা অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা দ্বারা আপনার গম্ভীর ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় দিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। যে ঘটনার উপর তাঁহার আনুমানিক সিদ্ধান্ত অবস্থিত, তাহার সময় নির্ণয়, কি ঘটনাসংস্পৃষ্ট ব্যক্তিত্রয়ের আবির্ভাব কাল ও বিশেষ বিবরণ তিনি অতি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এস্থলে তাঁহার মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা যথাবুদ্ধি উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কৈলাস বাবুর উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাঁহার উপযুক্ত সিদ্ধান্ত সম্যকরূপে প্রমাণিত হইয়া উঠে নাই। দীর্ঘকাল ইতিহাসের আলোচনা করিয়াও কৈলাস বাবু যে তৎপ্রণীত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বমতের পরিপোষক প্রমাণ সংগ্রহে সক্ষম হন নাই, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। যে পর্য্যন্ত তিনি পুস্তকোল্লিখিত প্রমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শনে সমর্থ না হইবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার উদ্ভাবিত অভিনব মত বঙ্গীয় পাঠকসমাজে সত্য ও সারবান বলিয়া গৃহীত হইবে কি না, সন্দেহ স্থল। এক্ষণে আমরা কৈলাস বাবুর মতের সারাংশ পাঠকের নিকট তাঁহারই লিখিত ভাষায় উপস্থিত করিয়া, তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

"আদিশূরের তিরোধানান্তে পালরাজগণের অভ্যুদয়। পালবংশীয় দ্বাদশজন নরপতি কিঞ্চিদূন সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী বাঙ্গলা দেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় মহীপাল দেবের শাসন কালে প্রবলবিক্রম চোলারাজ কুলতুঙ্গার সাহায্যে দক্ষিণাপথ-নিবাসী বিজয় সেন দেব বাঙ্গলা দেশ অধিকার করেন। ইনিই বাঙ্গলায় সেনবংশের স্থাপনকর্ত্তা।" (নব্যভারত, অষ্টম খণ্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা)। "রাজসাহী ও মন্দরগিরির প্রস্তরলিপি এবং কুলতুঙ্গার শাসনপত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হইতেছে, বিজয়সেন চোলারাজ বংশের সেনাপতি বা আত্মীয় রাজপুত্র। তিনি কুলতুঙ্গার দ্বারা গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনিই বাঙ্গলায় সেনবংশের স্থাপয়িতা। তাঁহার পিতৃপুরুষগণ বঙ্গে পদস্থাপন করেন নাই।" (সেনরাজগণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৯—১০ পৃষ্ঠা)। বিজয় সেন যে চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গের দ্বারা দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি যে চোলরাজবংশের সেনাপতি বা আত্মীয় রাজপুত্র ছিলেন—এই দুইটী নবাবিষ্কৃত বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত কৈলাস বাবু কি কি প্রমাণ ও যুক্তিসংগ্রহ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, পাঠক একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। (১) "চোলারাজগণ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মের মূল উৎপাটন করেন। কোন কোন লেখক বলেন

যে, বৈদ্যনাথের শিবমন্দির চোলারাজগণের নির্ম্মিত। মিত্র মহোদয় দেওঘরের দেবমন্দির সমূহ হইতে যে সকল প্রস্তরলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার দুই খণ্ডে চোলারাজগণের উল্লেখ আছে। বৈদ্যনাথের মন্দিরগাত্রে খোদিত ২ নং উৎকীর্ণলিপিতে 'চোলরাজ' শব্দ দৃষ্ট হয়।—বিজয় সেনও শিবোপাসক। রাজসাহীর প্রস্তরফলকের মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিতি হয় যে, মহারাজ বিজয় সেন দেব একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।—সুতরাং শৈব নরপতি বৌদ্ধরাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া জনৈক শৈব ব্যক্তিকে গৌড়ের রাজাসনে (?) স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন বলিয়া সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে। (২) ডাক্তর বার্ণেল কুলতুঙ্গাকে চোলারাজবংশের সর্ব্বপ্রধান নরপতি লিখিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ পালরাজগণের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার জন্য শৈব নরপতি বাঙ্গলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। চোলরাজকুলতিলক কুলতুঙ্গার শাসনপত্রে লিখিত আছে, এই রাজা বাঙ্গলা ও তদ্দেশাধিপতি মহীপালকে জয় করিয়াছিলেন। বিজ্ঞবর উইলসন বলেন যে, এইরূপ কথিত আছে যে, চোলারাজ অর্ণবপোতারোহণে যাত্রা করিয়া কলিঙ্গ, বঙ্গ ও গৌড় জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ভ্রমক্রমে কুলতুঙ্গার পরিবর্ত্তে তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র চোলাকে বাঙ্গলা আক্রমণকারী লিখিয়াছেন। মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে জনৈক ভিন্নদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক জলপথে বাঙ্গলা আক্রমণের কথা কর্ণেল উইলফোর্ডও লিখিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণদেশীয় কোন নরপতি দ্বারা একবার বাঙ্গলা বিজিত হইয়াছিল, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। (৩) দক্ষিণাপথনিবাসী চোলরাজগণ একসময়ে (?) অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহাদের ভুজবলে এক সময় (?) সমগ্র ভারত আলোড়িত হইয়াছিল। তাঁহারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ (?) জয় করিয়া তাহাদের আত্মীয় ও অনুচরবর্গকে সেই সেই প্রদেশের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করার কথা ডাক্তার বকনন লিখিয়া গিয়াছেন। কোন কোন চোলা নরপতি যে গঙ্গাসৈকতে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক সত্য। অদ্যাপি বাঙ্গলার প্রান্তভাগে চোলরাজগণের কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদিগের বাঙ্গলা আক্রমণের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। চোলরাজ বলভদ্র মন্দরপর্ব্বত শিখরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বরাহমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরের দ্বারস্থ প্রস্তরলিপিতে চোলরাজ আদিত্যসেন সম্বন্ধে অনেক কথা রহিয়াছে। আদিত্যসেন তিনটী অশ্বমেদ যজ্ঞ ও এক সহস্র তুলাব্রত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ডাক্তার বকনন বলেন, চোলরাজ আদিত্য সেন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছিলেন।—কিঞ্চিদুন এক শতাব্দী পূর্ব্বে বকনন, মেকেঞ্জি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া যে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, খোদিত লিপি সমূহ আবিষ্কৃত হইয়া অদ্য তাহার উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল-

তন্নরূপে ঐতিহাসিক সত্য ঘোষণা করিতেছে। চোলরাজগণের বাঙ্গলায় আগমনের প্রত্যক্ষ (?) প্রমাণ ইহা হইতে কি অধিক সংগ্রহ করা যাইতে পারে? এই সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া আমরা কুলতুঙ্গার শাসনপত্রের লিখিত বাক্য সত্য বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব।" সেন রাজগণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৭-৯ পৃষ্ঠা)

(৪) "চোলরাজ বাঙ্গালা আক্রমণকালে কলিঙ্গ জয় করিয়া গৌড়ে উপনীত হইয়াছিলেন। কেশরী বংশ লোপের পর বাসুদেব বাণপতি নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারী দক্ষিণদেশ হইতে গঙ্গাবংশকে আহ্বান করিয়া উড়িষ্যায় আনয়ন করেন। ফলতঃ এই সময়ে একটী বিপ্লব উপস্থিত হইলে দক্ষিণদেশীয় একটী রাজবংশ আসিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।"

আমরা কৈলাস বাবুর নিজের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কথাগুলি একত্রিত করিয়া উপরে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, কৈলাস বাবু স্বমতের পরিপোষক প্রমাণ সংগ্রহে কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিরূপ যুক্তি-তর্কের উপর তাঁহার অনুমিত মত স্থাপিত হইয়াছে। কুলোত্তুঙ্গের সেনাপতি বা আত্মীয় রূপে বিজয়সেন যে বাঙ্গলার রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এই অনুমান 'চোলরাজগণের বাঙ্গালায় আগমনের' এই সকল অনির্দ্দিষ্ট ও অতিরঞ্জিত বিবরণ এবং 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ' দ্বারা কি পর্য্যন্ত প্রমাণিত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। স্বমতের পরিপোষক প্রমাণ যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ না করিয়া তিনি চোলরাজগণের বিজয়কাহিনী কেন বর্ণনা করিতে গেলেন, বুঝিতে পারিতেছি না। চোলরাজবংশের রাজত্বকাল সহ প্রত্যেক রাজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান পূর্ব্বক কুলোত্তুঙ্গের সময় অবধারণ না করিয়া, এক সময় 'তাঁহাদের ভুজবলে সমগ্র ভারত আলোড়িত হইয়াছিল'—একসময়ে যে তাঁহাদের 'বিজয় বৈজয়ন্তী গঙ্গা-সৈকতে উড্ডীন' হইয়াছিল—এক সময়ে 'সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে' যে তাঁহাদের 'জয়ডঙ্কা' বাজিয়াছিল—এই সকল অপ্রমাণিত, অবিশ্বাস্য ও অতিরঞ্জিত কথার অবতারণা দ্বারা কিরূপে যে আপনার মত কবিকল্পনার সাহায্যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ইতিহাসের আলোচনায় এবম্বিধ কবিকল্পনার যে কি প্রয়োজন এবং কিরূপ যুক্তি প্রমাণের দ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় কৈলাস বাবু আমাদের অপেক্ষা তাহা অবশ্যই অধিক জানেন। তিনি আপনার আবিষ্কৃত যে নূতন মতকে এত সহজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উঠিলেন, আমরা তাহা অসার, অমূলক ও কাল্পনিক বলিতে বাধ্য হইতেছি। কুলোত্তুঙ্গের বাঙ্গলা আক্রমণ এবং বিজয়সেনের দ্বারা বাঙ্গলায় সেনবংশের প্রতিষ্ঠা,—এই দুই ঘটনা যে এক কারণ হইতে এক সময়ে উদ্ভূত হইয়াছে—বা উভয় ঘটনার মধ্যে যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে—পূর্ব্বোক্ত যুক্তি তর্ক ও প্রমাণের বলে কৈলাস বাবু তাহা প্রদর্শনে অকৃতকার্য্য হইয়া আপনার বিজ্ঞতা প্রকাশার্থ ব্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। গৌড়ের রাজাসন কোথায় অবস্থিত

ছিল এবং কোন্ সময়ে কুলোতুঙ্গ বাঙ্গলা আক্রমণ পূর্ব্বক পালবংশীয় কোন্ বৌদ্ধ নরপতিকে পরাজিত করিয়া বিজয় সেনকে তাঁহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি সেন-রাজগণের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া এই সকল প্রশ্নের অবতারণা ও মীমাংসা করা আবশ্যক মনে করেন নাই। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকাদি, ভারতীয় পুরাবৃত্তবিষয়ক পুস্তক কলিকাতা ভিন্ন অন্যত্র যে নিতান্ত দুর্ল্লভ ও অপ্রাপ্য, এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলে কৈলাস বাবু স্বরচিত পুস্তক ও প্রবন্ধে সেই সকল দুষ্প্রাপ্য পত্রিকাদির উপর পাঠককে এত অধিক পরিমাণে বরাত দিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। একেত বাঙ্গলা ভাষায় ইতি-হাস-লেখক ও আলোচকের সংখ্যা অঙ্গুলি গণনা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; ডাক্তার মিত্র ও রমেশ বাবুর ন্যায় যাঁহারা বিশেষ ধীরতা, বিজ্ঞতা ও মনস্বিতা সহকারে ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনা করিতেছেন, বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে—বাঙ্গালীর নিকট যথোচিত সাহায্য ও পুরস্কার প্রাপ্তির অভাবে—তাঁহারা কেবল ইংরেজি ভাষায়ই গ্রন্থ প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন ও হইতেছেন—তাহাতে আবার যে দুই চারিজন মাতৃভাষায় ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি এইরূপ সংক্ষেপে দুষ্প্রাপ্য ইংরেজি গ্রন্থ প্রবন্ধাদির উপর বরাত মাত্র দিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করেন, তবে বাঙ্গলা ভাষার ও ইতিহাসের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনা ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? কৈলাস বাবু যে সকল প্রবন্ধ হইতে আপনার আনুমানিক সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে এস্থলে দুই একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। ১৮৬৫ খ্রীঃ পণ্ডিতবর রাজেন্দ্র লাল মিত্র বিজয়সেনের নামাঙ্কিত রাজসাহীর প্রস্তরলিপির প্রতি-লিপি সহ যে বিবরণ প্রকাশ করেন, ইতি-পূর্ব্বে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ১৮৮৩ খ্রীঃ তিনি সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরের সুপ্রসিদ্ধ বৈজনাথ (বৈদ্যনাথ) শিবমন্দির ও অন্যান্য মন্দির সমূহের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে বিস্তীর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই নাই। কৈলাস বাবুর পুস্তক দৃষ্টে বোধ হয় চোলরাজ আদিত্যসেনের নাম তাহাতে উল্লিখিত আছে। কৈলাস বাবুর উল্লিখিত মন্দর-গিরির প্রস্তরলিপির বিবরণ কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেন নাই। ১৮৩৫ খ্রীঃ প্রিন্সেপ সাহেব ভাগল-পুরের নিকটবর্ত্তী মন্দরগিরির একখানি শাসনলিপি প্রকাশ করেন, তাহাও আমরা দেখিতে পাই নাই *। কৈলাস বাবুর

---

* ডাক্তার হাণ্টার সাহেব ভাগলপুরের বিবরণে (Statistical Account of Bengal vol. 14, P. 95-102) মন্দরগিরির যে বিস্তীর্ণ বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সংক্ষেপে দুই একটী কথা এস্থলে লিখিত হইল। মন্দরগিরির সবিশেষ মাহাত্ম্য 'বরাহপুরাণে' বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু দুর্ব্বৃত্ত মধুকৈটভকে এখানে নিহত করিয়া মধুসূদনরূপে এখানে অবস্থিতি করিতেছেন, মথুরার কৃষ্ণ, নাসিকের রামচন্দ্র, পুরীর জগন্নাথের ন্যায় মন্দরের মধুসূদন সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া, হিন্দুদিগের নিকট বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছেন। ভাগলপুরের ৩০ মাইল দক্ষিণে মন্দরগিরি অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ৭ শত ফুটেরও অধিক। এখানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন বিদ্যমান

প্রধান অবলম্বন ডাক্তার বার্ণেলের প্রকাশিত কুলোত্তুঙ্গের শাসন পত্র। ১৮৭৬খ্রীঃ এসিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক কার্য্যবিবরণীতে (১০৭ পৃষ্ঠা) ডাক্তর বার্ণেল ১০৯৩ খ্রীঃ চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গের বাঙ্গলা আক্রমণ ও রাজা মহীপালের পরাজয় বৃত্তান্ত মূলক কুলোত্তুঙ্গের এক খানি শাসনপত্র প্রকাশ করেন। কৈলাস বাবু চোলরাজগণের বিজয়কাহিনী বর্ণনা দ্বারা স্বরচিত গ্রন্থের তিনটী পৃষ্ঠা পূর্ণ করিলেন, কিন্তু তাহার কোনও স্থলে ডাক্তর বার্ণেলের উল্লিখিত সময় (১০৯৩ খ্রীঃ) নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত প্রকাশ করিবার অবকাশ পাইলেন না—ইহা বড়ই লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। তিনি অতি যত্ন ও সাবধানতার সহিত ডাক্তর বার্ণেলের উল্লিখিত চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গের বাঙ্গালা আক্রমণের কাল গোপন করিয়া আপনার সত্যানুরাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক পবিত্র ইতিহাসের সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিয়াছেন! অতি দুঃখ, লজ্জা ও বিস্ময়ের সহিত আমরা কৈলাস বাবুর এবম্বিধ অন্যায় আচরণের তীব্র ও কঠোর প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার নিকট হইতে এই প্রকার অসঙ্গত ব্যবহার কখনও প্রত্যাশা করি নাই। এরূপ অতি গর্হিত ও নিন্দ-

আছে। ইহার পাদমূলে বাউসী গ্রামের চতুর্দ্দিকে অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি, প্রাসাদ ও জলাশয় দৃষ্টে—পূর্ব্বকালে এখানে যে এক সমৃদ্ধিশালী নগরী অবস্থিত ছিল, ইহা অনুমিত হয়। প্রবাদ মতে কালাপাহাড়ের আক্রমণে এই নগর বিধ্বস্ত ও জনশূন্য হয়। প্রবাদ অনুসারে এখানে ৫২ বাজার, ৫৩ গলী ও ৮৮টী জলাশয় ছিল। এক বৃহৎ প্রস্তরগৃহে প্রদীপ রক্ষার উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, প্রতি বৎসর দীপাবলী-উৎসবের রাত্রে এই প্রাসাদের প্রাচীর লক্ষ প্রদীপ দ্বারা আলোকময় হইত। নগরবাসী প্রতি ব্যক্তিকে এক একটী করিয়া প্রদীপ প্রজ্জলিত করিতে হইত। ইহার ২০০ হাত দূরে চোলরাজের নির্ম্মিত প্রস্তরময় প্রাসাদের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। নিকটে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যে বিজয়দ্বার আছে, ১৫২১ শকাব্দে (মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে) বিজয়ী ছত্রপতি তাহা নির্ম্মাণ করিয়া মধুসূদনের নামে উৎসর্গ করেন বলিয়া এক প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পর্ব্বতের শিখরদেশে যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা মুসলমানদিগের (কালাপাহাড়) দ্বারা বিনষ্ট হইলে জয়স্তম্ভের নিকটে বর্ত্তমান মন্দিরে মধুসূদন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সবলপুরের জমিদারবংশ এই ছত্রপতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পৌষ সংক্রান্তির দিনে এখানের মেলায় অন্যূন চল্লিশ হাজার লোক সমবেত হয়। এই মেলা ১৫ দিন কাল স্থায়ী থাকে। কাঞ্চীপুরের কোন চোলবংশীয় রাজা কর্ত্তৃক এই মেলা স্থাপিত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। রাজা চোলা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া ভারতবর্ষের নানা তীর্থ দর্শন করেন। অবশেষে মন্দর পর্ব্বতস্থ 'মনোহর কুণ্ডে' পৌষ সংক্রান্তির দিনে স্নান করিয়া তিনি কুষ্ঠমুক্ত হন। কুণ্ডের পরিসর বৃদ্ধি করিয়া তাহার নাম 'পাপহারিণী' রাখেন। কুণ্ডতীরে রাজধানী স্থাপন করিয়া, সীতাকুণ্ডের উত্তর তীরে মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় মধুসূদনের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রস্তরময় দেবমন্দির ও প্রাসাদাদি গৃহ নির্ম্মাণ এবং দ্বাদশটী জলাশয় খনিত করাইয়া মন্দরগিরির শোভা সবিশেষ বৃদ্ধি করেন। সীতাকুণ্ড হইতে নিম্নভাগে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে বাসুকীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করেন।

ষীয় উপায় অবলম্বন দ্বারা তিনি আপনার বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যাভিমানের প্রতি চিরকালের জন্য দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

যদি (ডাক্তর হারনলির নির্দ্দেশ অনুসারে) কুলোত্তুঙ্গের বাঙ্গলা আক্রমণ ও গৌড়েশ্বর মহীপালের পরাজয় কাল ১০৯৩ খ্রীষ্টীয় অব্দ বলিয়া ডাক্তর বার্ণেল পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে স্বীয় অভিমত স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গের সেনাপতি বা আত্মীয়রূপে তাঁহার সাহায্যে বিজয় সেনের বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠে। ডাক্তার মিত্রের মত অনুসারে সুপ্রসিদ্ধ আবুলফাজেলের লিখিত ১০৬৬ খ্রীষ্টীয় অব্দ বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের রাজ্যাভিষেকের কাল বলিয়া কৈলাস বাবু স্বয়ং তাঁহার পুস্তকে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিজয় সেনের মৃত্যুর পর বল্লাল সেনের রাজত্বপ্রাপ্তির ২৭ বৎসর পরে যে ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহার সহিত বিজয় সেনের কোনরূপ সম্বন্ধ কবিকল্পনা বা বিকৃত অনুমানের সাহায্যেও সংস্থাপিত হইতে পারে কি না, ভরসা করি কৈলাস বাবু তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং স্বীয় অসার, অমূলক ও কাল্পনিক অনুমানকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার ভ্রম সংশোধন করিবেন, অথবা স্বমতের পরিপোষক যাবতীয় যুক্তি প্রমাণ বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করিয়া তাঁহার নবাবিষ্ক্রিয়াকে ঐতিহাসিক তত্ত্বের উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ডাক্তার বার্ণেলের উল্লিখিত কুলোত্তুঙ্গের বাঙ্গলা আক্রমণ সময় খ্রীষ্টাব্দ না হইয়া সংবাতাব্দ বলিয়া অনুমান করিলে, কৈলাস বাবুর অপ্রমাণিত মত অনুসারে ১০৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কুলোত্তুঙ্গের সাহায্যে বাঙ্গলায় বিজয়সেনের আধিপত্য প্রতিষ্টিত হয়—ইহা একপ্রকার অনুমিত হইতে পারে।

যাহা হউক, বিজয় সেনের পূর্ব্বপুরুষগণ যে দক্ষিণাপথে রাজত্ব করিতেন এবং বিজয় সেনই যে কোনও অজ্ঞাত কারণে দক্ষিণাপথ হইতে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে আগমন করিয়া সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন—রাজসাহীর প্রস্তরলিপির এই সকল কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। তাঁহার যে তিন জন পূর্ব্বপুরুষের নাম শাসনলিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁদের মধ্যে কেহও যে গৌড় কি বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং কোথায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানি না। সুন্দরবন ও তর্পণদীঘির শাসনপত্রের পঞ্চম শ্লোকে কর্ণাট রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী কাঞ্চী নগরীর নাম দৃষ্টে বোধ হয় যে, হেমন্ত সেন কর্ণাটের রাজবংশের কনিষ্ঠশাখা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবেন। [কাঞ্চী চোলরাজ্যের রাজধানী ছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই কাঞ্চীনগরী শাস্ত্রচর্চ্চা ও বিদ্যাবিষয়ক গৌরবের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করে। দ্রাবিড় জাতীয় অনার্য্য চোলরাজগণ আর্য্য হিন্দুদিগের নিকট হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সভ্যতা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। বিজ্ঞবর উইলসন সাহেবের মতে খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন দশম ও ডাক্তর কলডোয়েলের মতে ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীতে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতা দক্ষিণা-

পথে প্রবিষ্ট হয়। দক্ষিণাপথের ইতিহাস আমরা এ পর্য্যন্ত কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মহাত্মা এলফিনষ্টোন স্বপ্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে চোলরাজগণের সম্পর্কে যে দুই একটী কথা উইলসনের প্রবন্ধাদি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এস্থলে তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল।

তামিল ভাষা ও সাহিত্য দক্ষিণাপথের অন্যান্য (তেলেগু, কানারী, তুলুব ও মালয়লিম) দ্রাবিড়ীয় আনার্য্য ভাষা হইতে সৌন্দর্য্য, মনোহারিত্ব ও প্রাচীনত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ ভাগে এই ভাষা প্রচলিত থাকিয়া প্রাচীন কাল হইতে বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করে। এখানে দুইজন কৃষক খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে পাণ্ড্য ও চোল নামে দুইটী অতি পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপন করেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই দুই রাজ্য একত্রিত হইলে, তামিল ভাষার সীমা চোলরাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। নবম শতাব্দীতে এই দুই রাজ্যের পরস্পর সম্মিলন ভঙ্গ হইয়া উভয়ের মধ্যে প্রবল বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। অষ্টম শতাব্দীতে কর্ণাট ও তেলিঙ্গানার অধিকাংশ চোলরাজ্যের অধিকার ভুক্ত হয় এবং গোদাবরীর তীর পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তৃত হয়। চোল নৃপতি রাজেন্দ্রের সময়ে চোলরাজ্যের ক্ষমতা উন্নতির চরম সীমায় অধিরূঢ় হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজ্যের আয়তন হ্রাস হইয়া পূর্ব্বতন সীমায় আবদ্ধ হয়। ইতিমধ্যে ১০৮৮ খ্রীঃ বর্ত্তমান হাইদারাবাদের ৮০ মাইল দূরে উত্তর পূর্ব্বদিকে তেলিঙ্গানার অন্ধ্র বংশীয় ককটী নামে এক বীরপুরুষ ওয়ারঙ্গলে ককটীয় নামে এক অতি পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপন করেন। তিনি কল্যাণনগরের চালুক্য রাজপুত বংশীয় * নরপতিদিগের একজন

* খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আরম্ভে চালুক্য রাজপুতবংশীয় জয়সিংহ দক্ষিণাপথে আপতিত হইয়া পল্লবজাতীয় রাজা ত্রিলোচন দ্বারা পরাজিত হন। জয়সিংহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বিষ্ণুবর্দ্ধন কুন্তল রাজ্যের রাজধানী কল্যাণ নগর (বর্ত্তমান হাইদরাবাদের ১০০ মাইল পশ্চিম) অধিকার করিয়া পল্লবদিগের উপর আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পৌত্র পুলকেশীর যে শাসনপত্র ব্রিটিস মিউজিয়ামে রক্ষিত হইতেছে, তাহা ৪১১ শকাব্দ (৪৮৯খ্রীঃ) লিখিত হয়। পুলকেশীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা ও তদনন্তর কনিষ্ঠ পুত্র মঙ্গলীশ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তৎপর কীর্ত্তিবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যাশ্রয় রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। হাইদরাবাদের জৈনগুরুর নিকটে ৫৩৪ শকাব্দের (৬১২ খ্রীঃ) লিখিত এই সত্যাশ্রয় বল্লভের একখানি শাসনপত্র ছিল বলিয়া ১৮৭০খ্রীঃ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সত্যাশ্রয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের রাজধানী বেঙ্গিপুর অধিকার করিয়া যে প্রাচ্য চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত গঞ্জাম হইতে নেলোর পর্য্যন্ত সমস্ত পূর্ব্ব উপকূল ভাগে তাঁহারা রাজত্ব করিতে থাকেন। পরে তাহা চোলরাজবংশের সর্ব্বপ্রধান নরপতি রাজেন্দ্রের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয় এবং দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ওয়ারঙ্গলের কুকটীয়বংশের হস্তগত হয়। বেঙ্গিপরম, শ্রীকাকোল ও রাজমহেন্দ্রীতে যথাক্রমে তাহাদের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে বা দশম শতাব্দীর আরম্ভে কল্যাণের চালুক্যবংশ অধিকারচ্যুত হয়। পলাতক রাজার পুত্র অনহলবারা পত্তনের চৌরবংশীয় রাজ-

সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারই ভুজবীর্য্যে কল্যাণরাজ চেলিবংশীয় নৃপতিদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়া তাহাদের ক্ষমতা সবিশেষ খর্ব্বীকৃত করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই ককটীয় রাজবংশের ক্ষমতা কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী যাবতীয় ভূভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩২৩ খ্রীঃ দিল্লীশ্বর ঘিয়াসুদ্দিন তোগলকের সময়ে তাহার পুত্র জুনাখাঁ ওয়ারঙ্গল বহু আয়াসে গ্রহণ করিয়া কিছু কালের জন্য তাহা দিল্লীশ্বরের অধিকারভুক্ত করেন। ১৩৪৪ খ্রীঃ ওয়ারঙ্গল পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিয়া, ১৩৪৭ খ্রীঃ বাহমণী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হাসন গঙ্গকে সৈন্য সামন্ত দিয়া বিশেষ সাহায্য করে। ১৪২২ খ্রীঃ আলাউদ্দিনের পৌত্র প্রথম আমেদ সাহের দ্বারা ওয়ারঙ্গল বিধ্বস্ত ও বিনিষ্ট হয়। ১৩৩৬ খ্রীঃ ওয়ারঙ্গলের অন্ধ্রবংশীয় (এলফিনষ্টোনের মতে কর্ণাটের যদুবংশীয় বল্লালরাজপুত) বুকরায় ও হরিহর নামে দুই রাজকুমার তাঁহাদের মন্ত্রী সুবিখ্যাত মাধবাচার্য্য বা মাধববিদ্যারণ্যের সাহায্যে ও পরামর্শে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্ত্তী বিজয়নগরে যে প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, চোলরাজ্য তাহার হস্তগত ও অধীন হইয়া উঠে। বেল্লারির ২৯ মাইল উত্তর পশ্চিমে হাম্পি নামক স্থানে বিজয়নগরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। ১৪৯০ খ্রীঃ নরসিংহ বিজয়নগরে যে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, ১৫৬৫ খ্রীঃ সেই বংশের ষষ্ঠ রাজা কৃষ্ণরায়ের জামাতা রামরাজ কৃষ্ণানদীর তটবর্ত্তী তালিকোটে দক্ষিণাপথের সমস্ত মুসলমান রাজন্যবর্গের সহিত ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে সুপ্রসিদ্ধ বিজয়নগর চিরকালের জন্য উৎসন্ন হয়। ১৪৭৭ খ্রীঃ বাহমণী বংশীয় ত্রয়োদশতম রাজা দ্বিতীয় মহম্মদ সা রাজমহেন্দ্রী, কোণ্ডপিল্লি ও মছলিপটম অধিকার পূর্ব্বক সুপ্রসিদ্ধ কাঞ্চী নগরী লুণ্ঠন করিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

কুমারীকে বিবাহ করিয়া ৯৩১ খ্রীঃ গুজরাটে যে রাজবংশের স্থাপনা করেন, ১১৪৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সেই বংশের হস্তে গুজরাটের শাসনভার ন্যস্ত থাকে। ৯৭৩ খ্রীঃ তৈলপ দেব কল্যাণে চালুক্যবংশকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১১৮৯ খ্রীঃ কালভুরিয় বংশের প্রতিষ্ঠিতা বিজ্জল দেব দ্বারা চালুক্যবংশের আধিপত্য উৎসন্ন হয়। সার আর্থার ফেয়ার পেগুর ইতিহাসে লিখিয়াছিলেন যে, রাজমহেন্দ্রীর পূর্ব্বোক্ত চালুক্য রাজপুতগণ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। আরাকান উপকূলে চেদুরদ্বীপে এই বৈষ্ণব রাজবংশের (অনুমান খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর) কতিপয় বরাহ স্বর্ণমুদ্রা সাগরতীরের অনতিদূরে আবিষ্কৃত হয়। তাহার এক পৃষ্ঠে বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল এবং অপর পৃষ্ঠে প্রাচীন তেলেগু অক্ষরের লেখা ছিল। খ্রীষ্টের অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের করমণ্ডল উপকূল হইতে তৈলঙ্গ, কলিঙ্গ ও কর্ণাটের বণিকগণ প্রাচীন হংসাবতীর (পেগু) সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া তাহার উপকূল ভাগে রামবাই (রামরী দ্বীপ); রামপুর (মৌলমিন), সুবর্ণভূমি (পেগুর প্রাচীন রাজধানী থাটুন) সংস্থাপন করেন। থাটুন বর্ত্তমান মার্টাবানের ৪৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

জননীর স্মৃতি।

১

কোথায় রয়েছ মাগো জননি আমার!
বৎসর—ত্রিতয় গত, দেখিলাম কতশত,
নরনারী হিতকারী, প্রেমের আধার,
কোথাও নাহিক কিন্তু তুলনা তোমার।

২

পেটের জ্বালায় মাগো চির পরবাস,
নদনদী গিরিবন, পার হয়ে অগণন,
ফিরিয়া বেড়াই দুঃখী, অপরের দাস,
হাটের চালায় অন্ন, বৃক্ষমূলে বাস।

৩

ভয়াল ব্যাঘ্রের ভূমি—শ্বাপদ নিলয়
কুৎসিত কদন্নাহারী, অজ্ঞান অমিতাচারী,
নরদেহধারী সব যে রাজ্যেতে রয়,
লয়েছি জননি! সেই দেশের আশ্রয়।

৪

যদ্যপি এতেক ক্লেশ—ললাট লিখন—
তবুও কখনো মোর, ভাঙ্গেনি ঘুমের ঘোর
অবিরত দেখিয়াছি সুখের স্বপন।
উন্মুক্ত হৃদয় মাঝে প্রেম-প্রস্রবণ।

৫

অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি বিরাজিত ঘরে—
ছিলেগো জননি যবে, মহা মহোৎসব তবে,
ভাবিতাম দিবা নিশি সংসার—ভিতরে;—
ধ্রুব তারা যেন মাগো জ্বলিতে অন্তরে।

৬

কোথায় মৃত্যুর ভয়? কোথা দুঃখ ঘোর?
কোথা ছিল শোক জ্বরা, অনন্ত ঔদাস্য ভরা,
বিষণ্ণ হৃদয় ভাব, আশাহীন ঘোর?
উৎসাহ উৎফুল্ল চিত্ত আনন্দে বিভোর।

৭

প্রেমময় ভাবিতাম নিখিল সংসার।
সকলি প্রেমের ছবি, প্রেমচন্দ্র প্রেমরবি,
তারাগণ গগনেতে প্রেম অবতার;—
প্রেমভরা যেন ধরা, অনন্ত অপার।

৮

মধুমাখা দেখিতাম প্রকৃতির মুখ
নিবিড় বৃক্ষের ডালে, নাচিয়া বিবিধ তালে,
গাইত বিহঙ্গকুল, ঘুচাইত দুঃখ;
এখন হইল কেন সকলে বিমুখ?

৯

বৃক্ষতলে শোভাময় দেখিতাম কত?
ফুটিত বিবিধ ফুল, মধুমত্ত অলিকুল,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া তদুপরি কত শত,
উঠিত পড়িত যেন মাতালের মত।

১০

বহিত মলয়ানিল সুগন্ধ শীতল—
আকুল করিত প্রাণ, বসন্তে কোকিল গান,
পালন করিত যত পাদপের দল;—
নীল পত্র রাশি শিরে নিবিড় কুন্তল।

১১

কমল ভূষণ-পরা অমল সরসী—
সান্ধ্য সমীরণ পেয়ে, নেচে নেচে ধেয়ে ধেয়ে,
উর্ম্মিমালা ছড়াইত, দেখিতাম বসি;—
শুভ্র বসনে তার ঢাকিত গো শশী।

১২

কতই উৎসাহ দেবি! সুখের স্বপন!
কত শক্তি কত আশা, কতই যে ভালবাসা,
কবির কল্পনাময়—চিত্ত বিনোদন;—
হৃদয়ে উদয় মম হইত তখন!

১৩

কোথায় সে ভাব আজি, গেল গো জননি?
শুষ্ক মরুভূমি প্রায়, হৃদয় হইল হায়!
সংসার সকল যেন কঠিন অশনি;—
এক টানা দুঃখ, ব্যাপি দিবস রজনী।

১৪

প্রসূন নিচয় কেন সৌন্দর্য্যবিহীন?
মল্লিকা সুগন্ধ হারা, গোলাপ কেমন ধারা,
বকুল, মালতী, জুঁই, শেকালিকা দীন;—
কমল সরসী বক্ষে ভাসিছে মলিন!

১৫

পাদপ নিচয় যারা ভুবনমোহন—
আজি কেন সমস্বরে, সকলে ক্রন্দন করে,
উদাস করিয়া দেয় অভাগার মন।
কেন বা হইলে তারা শ্রীহীন এমন ?

১৬

আকাশে ভাস্কর যেন শোকমগ্ন হায় !
শীতরশ্মি উষ্ণকর, বিতরেন নিরন্তর,
নিষ্প্রভ তারকাকুল, খদ্যোতের প্রায়—
বিষাদ-কালিমা মাখা মিটি মিটি চায়।

১৭

যুবক যুবতী প্রেম-পবিত্রতা-ময়
তাহার সে ইন্দ্রজাল, কেমনে হরিল কাল,
এখন তেমন মন-মুগ্ধকর নয় ;
সরলতা-শূন্য দেখি শিশুর হৃদয়।

১৮

সকল নীরস মাগো ! বিরহে তোমার—
অশনে নাহিক সুখ, বসন ভূষণে দুখ,
শয়নে সুনিদ্রা নাহি হয় মম আর ;
চারিদিকে দেখি সুধু অকূল পাঁতার।

১৯

দুঃখের সঙ্গিনী বটে, গৃহিনী আমার—
পুত্র কন্যা আদি যারা, সকলে মিলিয়া তারা,
প্রাণপণে চাহে ঘুচাইতে দুঃখ ভার ;
পাসরিতে নারি কিন্তু প্রতিমা তোমার।

২০

আর কি দেখিব মূর্ত্তি ভুবন-মোহন ?
হাসি হাসি মুখখানি, সুধাসিক্ত মৃদুবাণী,
করুণা পূর্ণিত সেই সুন্দর নয়ন ?
জননী সন্তানে পুনঃ হইবে মিলন ?

২১

অপত্য-বৎসলা দেবি ! তোমার সমান—
কে আছে জগতে আর ? পূজিব চরণ যাঁর,
ভক্তিভাবে, যতদিন থাকিবে এ প্রাণ ;—
করিব মনের সাধে যাঁর গুণগান।

২২

কোথায় বসতি করে পরলোকবাসী ?
মনে হয় ছুটে যাই, যদি তব দেখা পাই,
একবার গোটা দুই কথা কয়ে আসি ;—
কেমনে বলিব মাগো ! কত ভালবাসি ?

২৩

সুন্দর তোমার দেহ, ভস্মরাশি যথা
সেই জাহ্নবীর তীরে, বেড়াইলে ঘুরে ফিরে,
না দেখে তোমায় বাড়ে অন্তরের ব্যথা ;
কাহার নিকটে কব মর্ম্মভেদী কথা ?

২৪

গভীর গঙ্গার জলে নিবাস তোমার—
হয়েছে কি এবে মাতঃ ?বুঝিতে না পারি তাত,
পুনঃ ভাবি অসম্ভব এ চিন্তা আমার,
বলগো জননি, কোথা আছ একবার।

২৫

ওই যে আকাশে তারা ঝিকিমিকি করে—
একবার নিবে যায়, আবার উজল কায়,
রয়েছ কি এবে তুমি উহার ভিতরে ?
চাহিলে উহার পানে প্রাণ মন হরে—।

২৬

সূর্য্যে, চন্দ্রে, কি আকাশে, নক্ষত্র-মণ্ডলে,
গভীর সমুদ্রতলে, অথবা নদীর জলে,
পর্ব্বতে, বিপিনে কিম্বা কুসুমের দলে ?
হাসিছ বসিয়ে কিগো ! জ্বলন্ত অনলে ?

২৭

কিছুই না বুঝি মাগো কোথা তব বাস !
বায়ুর রাশিতে পশি, শূন্যসিংহাসনে বসি,
লুকায়ে দেখিছ বুঝি, কি করিছে দাস ?
তাহাওত পাপ মনে না হয় বিশ্বাস।

২৮

নিভে কি মানব তবে দীপ শিখা প্রায় ?
সকলি ফুরায় তার, কিছুই থাকেনা আর,
প্রলয়ের নিদারুণ কোলেতে লুকায় ?
স্মরিলে নিষ্ঠুর কথা শোণিত শুখায় !

২৯

এতেক আশার নাকি এই পরিণাম ?
এত লীলা এত খেলা, এত যে সুখের মেলা,
এত প্রেম ছড়াছড়ি, জ্ঞান, বুদ্ধি, কাম,
অভাবে সকলি কিগো লভিবে বিরাম ?

৩০

তা নয়, তা নয় দেবি ! তা নয়, তা নয় ;
আমার আত্মার লয়, কখনো নাহিক হয়,
"রহিয়াছ তুমি," মম জ্বলন্ত প্রত্যয় ;—
আবার দেখিব তব চরণ নিশ্চয়।

৩১

আবার গলেতে ধরি, চুম্বিব সে মুখ ;—
শিশু সন্তানের মত, আদর করিবে কত,
অশ্রু অশ্রু মিশাইবে, দূরে যাবে দুখ।
এহেন আশায় মাগো বাঁধিয়াছি বুক।

৩২।

না হলে কি সহা যায় বিচ্ছেদ তোমার
জ্বলন্ত অনল প্রায় ? অন্তর দহিছে যায়,
হৃদয়ের গ্রন্থি সব হয় ছার খার ;—
বাঁচিয়া কি সুখ বল জননি আবার ?

৩৩।

বজ্রাঘাত সম বার্ত্তা পেলেম যে দিন
আমারে হইয়ে বাম, গিয়াছ অমর ধাম,
ত্যজিয়ে পাপের ভরা, সংসার মলিন ;—
জনমের মত মোরে করে মাতৃহীন !

৩৪।

শোকেতে অধীর হয়ে কাঁদিলাম কত,
যেন পাগলের পারা, হারায়ে নয়ন তারা,
হৃদয় হইল খালি আকাশের মত—
সুখের তপন মম চির অস্তগত।

৩৫।

একের অভাবে কেন সব শূন্যময় ?
বুক যেন খালি খালি, মিছা যেন গৃহস্থালী,
সদাই মনেতে হয়, কিছু কিছু নয়,
দুঃসহ যাতনা প্রাণে কতই বা সয় ?

৩৬।

মহাতীর্থে যেই দিন করিব প্রয়াণ,
আত্মীয় স্বজন সবে, কাঁদিয়া আকুল হবে,
কোলেতে কি তুলে লবে আপন সন্তান ?
মৃত্যুর সকল জ্বালা হবে অবসান।

শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

সাঁওতালের বিবাহ প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিবাহের দিন বা তিন দিন বা পাঁচদিন পূর্ব্বে উভয় বাড়ীতে এক একটী মাড়োয়া (মণ্ডপ) প্রস্তুত হয়। যে যেমন ভোজ দিতে সমর্থ, সে ততদিন পূর্ব্বে মণ্ডপ করে। গ্রামের যুবকেরা মণ্ডপ প্রস্তুত করে। মণ্ডপের মধ্যস্থলে একটী বড় খুঁটী দিতে হয়। যাহারা মণ্ডপ প্রস্তুত করে, যোগমাঝী তাহাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া দেয়। কাজ শেষ হইলে তাহারা ভোজ পায়। তাহার পর সন্ধ্যাকালে মুস্তাজির, পরামাণিক, নায়েকী (পুরোহিত) যোগমাঝী এবং অন্যান্য লোকেরা তেল হলুদ মাখে। তেল মাখিবার জন্য যোগমাঝী তিনটী কি পাঁচটী কুমারী একত্র করে। প্রথমে সপত্নীক পুরোহিতকে খড়ের আঁটীর উপর বসাইয়া তেল হলুদ মাখাইয়া দেয়, অন্য লোককে চেটাইয়ের উপর বসাইয়া মাখাইতে হয়। নায়েকীর পর সস্ত্রীক মুস্তাজির, তাহার পর সস্ত্রীক

পরামাণিক, তাহার পর সস্ত্রীক যোগমাঝী, তাহার পর গ্রামের ছ চারিজনকে মাখাইয়া বরের পিতাকে মাখাইতে হয়। তাহার পর পরিবারের অন্যান্যকে, সর্ব্বশেষে বরকে মাখাইতে হয়। এইদিন অবধি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন বরকে তেল হলুদ মাখাইতে হয়। কন্যা গৃহেও এইরূপ হয়, যে দিন বরের গায় হলুদ হয়, সেই দিনই কন্যার গায়ে হলুদ দিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। অবস্থানুসারে কন্যার পিতা বরের পূর্ব্বে বা পরে গায় হলুদ করিতে পারে। গায় হলুদের কয়দিনই খুব নাচ গান হয়।

বর যাত্রার পূর্ব্বে বরকে সাজাইতে এবং নিমন্ত্রণ খাইতে গ্রামের সকল লোক একত্র হয়। সে কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে বা পরে জলবিবাহ (জল সওয়া) করিতে হয়। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা একত্র হইয়া কেহ তরবারি এবং কেহ ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া যোগমাঝীকে সঙ্গে লইয়া কোন জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হয়। এবং সেখানে একটী ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া তাহার তিন কোণে তিনটী তীর পুতিয়া পাঁচ সাত বা নয় খেয়া সুতা দিয়া সেই তীরগুলি ঘিরে। অনন্তর স্ত্রীলোকেরা তিন বার সেই গর্ত্ত প্রদক্ষিণ করিয়া আপন আপন হস্তের অস্ত্র দ্বারা জলে আঘাত করে। তাহার পর দুইটী কলসীতে জল লইয়া অন্য জলাশয়ের জলে কলসী পূর্ণ করিয়া দুইটী কুমারী গাইছড়া বাঁধিয়া কলসী দুইটী মাথায় লয় ও গা ঠেকাঠেকি করিয়া ফিরিয়া যায়; স্ত্রীলোকের কেহ কেহ বরের দোলায় চাপিয়া যায়, অন্যে হাটিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য গীত ও বাদ্য থাকে। জলের কলসী লইয়া কুমারীরা মণ্ডপের মধ্য স্তম্ভের নীচে রাখিয়া দেয়। যাহারা বরকে হলুদ তেল মাখাইয়াছিল, এ দুটী কুমারী তাহাদের অন্তর। যে কাপড় পরাইয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে হয়, জলের কলসী দুটী সেই কাপড় দিয়া ঢাকিয়া আনিতে হয়। মণ্ডপে কলসী রাখিয়া সেখানেও তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। সেই জলে বরকে স্নান করাইতে হয়। স্নানের সময় বরকে দুইটা জোয়ালের উপর বসিতে হয়। বরের পিতা সোজা করিয়া এক খানি তরবারি লইয়া দাঁড়ায়। যোগমাঝী সেই তরবারির অগ্রভাগে জল ঢালিয়া দেয়, সেই জল তরবারি বাহিয়া বরের মাথায় পড়ে। তাহার পর রীতিমত স্নান করাইতে হয়। তখন সকলে ভোজন করিয়া বরকে সাজায়। বরের মাথায় পাগ্ড়ী এবং ফুলের মালা থাকে। কেহ কেহ পাগ্ড়ীর পরিবর্ত্তে (মাড়) টোপর পরে। বরের সঙ্গে কোন অস্ত্র শস্ত্র রাখিতে হয় না।

বর যাত্রার পূর্ব্বে কন্যার বাড়ীতে যাইয়া আহার করিবার জন্য বরকর্ত্তা যথেষ্ট আহার্য্য পাঁচ হাঁড়ী মদ ও একটা পাঁটা এবং দোলা করিয়া লবণ তৈল ও হরিদ্রা পাঠাইয়া দেয়। বরযাত্রীর সঙ্গে চারিখানি কাপড় যায়, (একখানি কন্যার হলুদ মাখান, একখানি কন্যার মার ডোরওয়ালা ও দুইখানি মাতামহী ও পিতামহীর পাড় ওয়ালা) এবং সিন্দুর যায়। এই সকল জিনিস্ একটী ডালায় করিয়া লইতে হয়। বিবাহক্ষেত্রে কন্যাকে সেই ডালায় বসাইয়া ভাসুর পক্ষীয়েরা কাঁদে করিয়া কন্যাকে তোলে, তখন বরকন্যার মাথায় সিন্দুর লাগাইয়া দেয়। সে কথা পরে বলা যাইবে। বর

পক্ষের মত কন্যা পক্ষেও মণ্ডপ প্রস্তুত হয়। কিন্তু সিন্দুর দিবার কিছু পূর্ব্বে জল সওয়া হইয়া থাকে, আগে হয় না। বরযাত্রার সমস্ত আয়োজন হইলে এবং বর সজ্জা শেষ হইলে বরের মা খুড়ি বা পিতামহী বরকে কিছু গুড় খাওয়ায়। গুড় খাওয়া শেষ হইলে যে গুড় খাওয়ায়, সে বরের মুখে একটী টাকা গুঁজিয়া দেয়। সে টাকা মুখে লইয়া বর আপন মাতার স্তন পান করে। স্তনে মুখদিয়া টাকাটী ফেলিয়া দিতে হয়। স্তনকে সাঁওতালী ভাষায় নুনু বলে। এই টাকাকে নুনুটাকা বলা হয়। টাকা দেওয়া হইলে, মা জিজ্ঞাসা করে, "বেটা তুমি কোথা যাইতেছ?" পুত্র বলে, "মা, তোমার চাকরাণী আনিতে যাইতেছি।" বাঙ্গালী ও সাঁওতালদের এই অদ্ভুত প্রথা একরূপ। তখন মা পুত্রকে চুম্বন করে, পুত্র মাকে প্রণাম করে। ডান হাতে ডান পায়ের সামনে মাটীতে ছোঁয়াইয়া মস্তক অবনতকরিতে হয়। সম্বন্ধ বিশেষে সাঁওতালের অভিবাদন ভিন্ন। পিতা মাতা পিতামহী প্রভৃতি মুখে চুম্বন করে, কিন্তু অন্য লোকেরা কেবল কপোলে চুম্বন করিতে পায়। বর যাত্রার সময় বরের সঙ্গে একটী বালক থাকে, (বাঙ্গালীর মিতবর) এবং সম্মুখে একটী পরিহাস-যোগ্য কুটুম্ব থাকে, তাহাকে বাঁবিণে (ব্রাহ্মণ) বলে। এই তিনজন একত্র হইয়া গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে যায়। সকল বড়ীতেই তাহাদের গুড় খাইতে দেয়। অবশেষে গ্রামের প্রধান মুস্তাজিরের বা মাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হয়। মুস্তাজিরের বাড়ীর সম্মুখে একটী মাজীথান থাকে। গ্রামের প্রকৃত মাজী বা প্রধান দেবতা, মাজী তাহার প্রতিনিধি মাত্র। মাজীর বাড়ীর সম্মুখে সেই গ্রাম্য দেবতার একটী মন্দির থাকে। তাহাকে মাজীস্থান বা মাজীথান বলে। মাজীর বাড়ীতে গুড় খাইয়া মাজীথানে প্রণাম করিয়া বর দুই মিত্র সঙ্গে লইয়া গ্রামের বাহির হয়। যাহার অবস্থা যেমন, কেহ চতুর্দ্দোল বা পালকীতে যায়, কেহ বা হাঁটিয়া যায়। গ্রামের মধ্যে গুড় খাইয়া বেড়াইবার সময় যোগমাঝী-নির্ব্বাচিত কুমারীরা কখন কখন তিন মিত্রকে কোলে করিয়া লইয়া যায়।

বরযাত্রীরা কন্যার গ্রামে উপস্থিত হইয়া গ্রামের প্রবেশ মুখে খুব বাজনা বাজাইয়া অবস্থান করে। বাজনার শব্দ পাইয়া কন্যাগ্রামের লোকেরা সেইখানে উপস্থিত হইয়া বর পক্ষের সহিত ঠেলাঠেলী (যুদ্ধ) আরম্ভ করে। কন্যার মাথায় সিন্দুর দিবার পূর্ব্বে এইরূপ আর একবার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শেষ হইলে কন্যা-গ্রামের যোগমাঝী পাতের উপরে একঘটী জল লইয়া বরযাত্র প্রত্যেকের নিকট আসিয়া অভিবাদন করে। কন্যাপক্ষের কয়েকটী কুমারী হলুদ তেল লইয়া এবং অন্য কয়েকজন স্ত্রীলোক গুড় লইয়া আসে। কুমারীরা সকলে বরকে তেল হলুদ মাখায় এবং স্ত্রীলোকেরা গুড় খাওয়ায়। তদনন্তর বর মিত্রদ্বয় সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী ছাড়া কন্যাগ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে গুড় খাইয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে সকলকে লইয়া উপস্থিত হয়। বাসস্থান গ্রামের বাহিরে নির্দ্দিষ্ট হয়। গুড় খাইতে খাইতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া যায়। সাঁওতালের বিবাহ রাত্রে হয় না। বাসায় পৌছিয়াই বরপক্ষীয়েরা আহারাদি সম্পাদন করে। ইতি মধ্যে কন্যাপক্ষ সমস্ত অয়োজন

করিয়া তেল হলুদ ও জল লইয়া বরকে স্নান করাইবার জন্য বরের বাসায় উপস্থিত হয়। সঙ্গে অন্য স্ত্রীলোক ও যোগমাঝী থাকিলেও বরকে তেল হলুদ মাখাইবার কার্য্য (তেভরী কুড়ী) কুমারীদিগকেই করিতে হয়। সেই কুমারীদিগের সঙ্গে কন্যার জ্যেষ্ঠা ভগিনী থাকে। প্রথমে কন্যার মা একটী থালায় আলোচাল ও দুর্ব্বা লইয়া বরকে বরণ করে ও তাহার গালে একটু তেল হলুদ ছোঁয়াইয়া দেয়। তাহার পর কুমারীরা ভাগ করিয়া তাহাকে তেল হলুদ মাখায়। কন্যার ভগিনী বরকে কামাইয়া ও স্নান করাইয়া দেয়। স্নান করা কাপড় শালী পায়। এই সময়েই জ্যেষ্ঠ শালী ভগিনীপতিকে তামাসা করিতে পারে। আর কখনও পারেনা। এমন কি ভগিনীপতির সম্মুখে বসিতেও পারে না। এই কাপড়খানি বরের কুমার অবস্থার শেষ কাপড় বলিয়া শালী ভগিনীপতিতে খুব তামাসা হয়। কামাইয়া দিবার জন্য শালী তেল লুণ, একসের চাউল ও একআনা পয়সা এবং এক হাড়িয়া মদ পায়। পূর্ব্বে সাঁওতাল রমণীরা সুরা পান করিতনা। এখন অনেকেই পান করে। অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকেও এক হাঁড়ি মদ দিতে হয়। বরকে স্নান করাইয়া কাপড় ও একটী জামা পরিতে দিয়া সকলে ফিরিয়া গিয়া জল সইতে যায়। এই কাপড় পরিয়া বিবাহ হয়। জল সইবার জলে কন্যাকে স্নান করাইতে হয়। কন্যার স্নান সমাপন হইলে যোগমাঝী পঞ্চ পল্লবিশিষ্ট আম্র পল্লবযুক্ত একঘটী জল লইয়া বরযাত্রদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে, এখন আসুন সিঁদরা দান (সিন্দুর আদান) করিতে আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। সংবাদ পাইয়া বরপক্ষ বাজনা বাজাইয়া কন্যার বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয়, এই সময় ঠেলাঠেলী যুদ্ধ কিছু বেশী হয়। যুদ্ধে লাঠী ঢাল ও তরবারি ব্যবহৃত হয়। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর বাবণে বরকে কাঁদে করিয়া তুলে, অন্যদিকে আর একজন কন্যার ভাইকে সেইরূপ করে। দুইজন লোক উভয়ের মধ্যে একখানি চাদর লম্বা করিয়া ধরে। পঞ্চপত্রের পল্লবে ঘটী হইতে জল লইয়া বর পাঁচবার শালার মাথায় ছিটা দেয়, শালা সেইরূপ পাঁচবার বরের মাথায় ছিটা দেয়। ঘটী দুটী উভয় পক্ষের যোগমাঝী ধরিয়া থাকে। জল-সেকের পর সম্বন্ধীকে একটী পাগড়ী পরাইয়া দেয়। এই সময় উভয়ের মুখে কিছু চাউল থাকে। পাগড়ী পরাইবার সময় বর সম্বন্ধীকে চুম্বনের ছলে সেই চাউল সম্বন্ধীর মুখে থু করিয়া ফেলিয়া দেয়, সম্বন্ধীও তাহার প্রতিদান করে। তখন সম্বন্ধী বাড়ী চলিয়া যায়। পণের টাকা যত হয়, ততগুলি কুমারকে বরপক্ষীয় যোগমাঝী নির্ব্বাচন করিয়া লয়। ইহারা বরের ভাই হইলে ভাল হয়। ডালার উপর কন্যার কাপড় লইয়া ঘটক এই কয়েকটী যুবককে সঙ্গে লইয়া কন্যার বাড়ীতে প্রবেশ করে। সেখানে যুবকেরা কিছু মদ খায়, সেই অবসরে কন্যা বিবাহের কাপড়খানি পরিয়া লয়। কাপড় পরা শেষ হইলে কন্যা সেই ডালায় বসে। যুবকেরা যখন কন্যাকে ডালার উপরে কাঁদে লইয়া বাহির হয়, তখন বাবণে বরকে কাঁদে তুলে। কন্যা পশ্চিম মুখে ও বর পূর্ব্বমুখে থাকে। উভয়ের মধ্যে আবার একখানি চাদর ধরা হয়। দুই যোগ-মাঝী পল্লবযুক্ত জল লইয়া উপস্থিত হয়।

বর পাঁচবার কন্যার মাথায় ও কন্যা পাঁচবার বরের মাথায় পূর্ব্বমত জল ছিটাইয়া দেয়। জল দেওয়া হইলে যোগমাঝীরা পল্লব দুটী আপন আপন পক্ষে চাহিয়া লয়। তখন বরকর্ত্তা সিন্দুর লইয়া বরকে দেয়। বর বাঁহাতে সিন্দুর লইয়া ডান হাতের কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধ অঙ্গুলি একত্র করিয়া সিন্দুর লইয়া প্রথম বার ভূতলে নিক্ষেপ করে, তাহার পর কন্যার মাথায় দেয়, শেষে সমস্ত সিন্দুর কন্যার কপালে ঘসিয়া দেয়, তখন উপস্থিত সকল লোকে চিৎকার করিয়া বলে "হবি-বোল, সিঁদরা ধান"। তখন বর মাটীতে নামিয়া স্ত্রীকে কোলে করিয়া ডালা হইতে নামায়। এই সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত ভগিনী আসিয়া কন্যাকে বরের দক্ষিণদিকে দাঁড় করাইয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেয়। তখন কন্যার মা কিম্বা খুড়ী গুড়, জল, চালের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, গোবরের গুলি এবং প্রদীপ লইয়া আসে। উভয়কে গুড় খাওয়াইয়া সিন্দুর পরাইয়া দেয়, তখন কন্যাও তাহাদিগকে সিন্দুর পরায়। তখন বর কন্যাকে হলুদ তেল মাথায় এবং প্রদীপের সেক দেয়। বরকন্যা তাহাদিগকে হলুদ তেল লাগাইয়া দেয়, তখন কন্যার মা পাতায় করিয়া আগুন আনিয়া বর কন্যার সম্মুখে রাখিয়া দেয়, চালের গুঁড়ী গুলি বরযাত্রদিগের দিকে ফেলিয়া দেয়, গোবরের গুলি গুলি নিজের বাড়ীর দিকে ফেলে। তখন সম্বন্ধী একটী মুষল (সাগাট) আনিয়া তাহার মুখে পাতা বাঁধিয়া দেয়। আগুনকে তিনজন স্ত্রীলোক প্রত্যেকে তিনবার বরণ করে। শেষবারে সেই সাগাট দিয়া আগুন পিসিয়া দেয়। তদনন্তর বর কন্যাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যায়, যেই সময় কন্যার ছোট ভগিনী দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়, (দ্বারবন্ধী) বর তাহাকে এক আনা পয়সা দিলে দ্বার খুলিয়া দেয়। ঘরের মধ্যে চেটায়ের উপর বর কন্যা উপবেশন করে। এই সময় সেই কুমারীরা তাহাদের দুই জনকে তেল হলুদ মাথায় এবং চিড়া দই খাওয়ায়। বাঙ্গালীর কড়ি খেলার পরিবর্ত্তে সাঁওতালের আহার। আহারান্তে গাঁটছড়া খুলিয়া দেয়, তখন বর কন্যা বিভিন্ন হয়। যখন বরকন্যা ঘরে প্রবেশ করে, তখন বরযাত্রীরা মণ্ডপে প্রবেশ করে, বরকন্যা চেটায়ে বসিবার সময় বর যাত্রীরা মণ্ডপে খড় বিছাইয়া বসে। তখন অবশিষ্ট কাপড় ডালায় করিয়া ঘটক সেই প্রধান খুঁটীর নীচে রাখিয়া দেয়। সেই সময় বরযাত্রীরাও সেইখানে পাঁঠা, একহাড়ী মদ, তিন সের চাউল, লবণ হলুদ, তেল তামাক রাখিয়া দেয়। তখন ঘটক কন্যাপক্ষের যোগমাঝীকে ডাকিয়া বলে, বাবা দেখ সব আছে কিনা। সে যাইয়া সব দেখে, কাপড়গুলি মাপিয়া লয়। স্ত্রীলোকেরা আসিয়া আর একবার মাপে ও বুকের উপর দিয়া পরে। পণের অবশিষ্ট টাকা হইতে একটাকা এই সময় যোগমাঝীকে দিতে হয়। সে সেই টাকা লইয়া ও স্ত্রীলোকেরা সেই কাপড় পরিয়া বরযাত্রদিগকে নমস্কার করে এবং প্রত্যেককে দু তিন দোনা মদ খাইতে দেয়। কন্যাকর্ত্তা ভোজ দিতে চাহিলে এই সময়ে বরযাত্রদের দ্বারা একটী খাসি কাটিয়া লয়। নতুবা তাহাদের বিদায় দেয়। তাহারা বাসায় গিয়া ভোজন করে। খাসি কাটিতে হইলে মণ্ডপের কোন স্থানে গোবর দেয়, পাতায় করিয়া আলোচাল আনে, তাহাতে এক দোনা মদ ঢালিয়া দেয়, তখন পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম উচ্চারণ করিয়া সেই

চাল খাসিকে খাওয়ায়। তখন বরযাত্রীরা খাসিটীর গলা একটু কাটিয়া দেয়, কন্যা পক্ষেরা সম্পূর্ণ করে।

সন্ধ্যার সময় বর বরণ হয়, সেখানে বরকর্ত্তা ও অন্যান্য দু একজন বরযাত্র উপস্থিত থাকে। একটা ডালায় দূর্ব্বাঘাস ও আলোচাল লইয়া বর কন্যাকে বরণ করিতে হয়। কন্যার কুটুম্বিনীগণের কিছু দিবার ইচ্ছা থাকিলে এই সময় কন্যাকে দেয়। বরণ স্ত্রীলোকেরাই করে। বরণের সময়ে গান হয়। বরণ শেষ হইলে একজন বধূকে লইয়া বরযাত্রদের নিকটে যায়। বধূ বাটীতে করিয়া সকলকে মদ খাইতে দেয়। তাহারা বধূকে কোলে বসায়, অলঙ্কারাদি যাহা দিবার দিয়া শেষে চুম্বন করিয়া বিদায় দেয়। বিদায়ের পূর্ব্বে বধূ আর একবার মদ খাইতে দিয়া প্রণাম করিয়া যায়। এই বার বরকর্ত্তা ও অন্য দু একজন বধূর বাড়ীর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঘর দেখিতে যায়। যেখানে মদ খায় এবং গান করিয়া পরস্পর জাতি ও বংশের পরিচয় দেয় এবং আপন আপন মর্য্যাদা গান করে এবং বলে, পূর্ব্বে তৃষ্ণা পাইলে নদী বা গর্ত্তের জল পান করিয়াছ, অতঃপর জল পানের জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিবে, আমার ঝাঁটীর ছায়া (ক্ষুদ্র কুটীর) ও তুম্বরু (কুমড়ার) জল স্মরণ করিবে ইত্যাদি। অনন্তর আহার্য্য প্রস্তুত হইলে যোগমাঝী আবার পাতার উপর জলের ঘটী লইয়া বরযাত্রদিগকে আহার করিবার জন্য ডাকিতে যায়। কন্যাগৃহে সকলে উপস্থিত হইলে সকলের পা ধুইয়া দিতে হয়। মণ্ডপে সকলে ভোজনের জন্য বসে। পরিবেশন হইলে কন্যাগ্রামের মুস্তাজিরের সহিত বর পক্ষের প্রীতি সম্ভাষণ হয়। আহারান্তে বর পক্ষ আপন শিবিরে ফিরিয়া যায়। যে দিন সিঁদরাধান হয়, সেই রাত্রে ভোজ হয়। পর দিবস বরযাত্রীরা একঘটী টাটকা মদ ও এক ঘটী খারাপ মদ ও একটী টাকা লইয়া কন্যাগ্রামের মাজীর নিকট উপস্থিত হয়। গ্রামের লোক শুনিতে পাইয়া সেখানে উপস্থিত হয়। টাটকা মদ মাজী ও পরামাণিকের স্ত্রীকে এবং খারাপ মদ অন্যস্ত্রী-লোকদিগকে ভাগ করিয়া খাইতে হয়। মাজীও বরপক্ষকে মদ খাইতে দেয়। মদ খাওয়া হইলে বরকর্ত্তা একটী টাকা ঘটকের হাতে দেয়। ঘটক সে টাকা লইয়া সকলকে প্রণাম করিয়া মাজীকে দেয়। মাজী সে টাকা পাইয়া বার সের চাউল, পাঁচসের ডাল লবণ তেল, এক খাছা খাড়ু বা এক আনা পয়সা, দুখানা হলুদ এক হাড়ী মদ ও এক পাত তামাক বরযাত্রদিগকে দেয়। ইহার একসের কন্যাগ্রামের যোগমাঝী পায়। তখন সকলে কন্যার মাতামহীর ঘর (ঢাক) দেখিতে যায়। সে গৃহের লোক একঘটী জল লইয়া আসিয়া অভ্যাগতদিগকে প্রণাম করে এবং পা ধুইয়া বসাইয়া মদ খাওয়ায়। বিদায়ের সময় বুড়ী বরযাত্রদিগকে একহাঁড়ী মদ, একটী হাঁসলী, না হয় এক আনা পয়সা এবং যত টাকা পণ মিলিয়াছিল, তত সের চুড়া দেয়। অনন্তর প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া সেখান হইতে বিদায় হয়।

বিদায়।

বিদায়ের পূর্ব্বে বর কন্যাকে তেল হলুদ মাখাইয়া কুটুম্বেরা পরস্পরকে অভিবাদন করে, বর কন্যা সকলকে প্রণাম করে।

তখন কন্যাকর্ত্তা বলে, কুমারের বার পণের মধ্যে আপনারা একটী হাঁড়ী ক্রয় করিয়াছেন, একবার বাজাইয়া দেখিয়া লউন, ঠিক আছে কি না। আমরা অতি যত্নে পবিত্র রাখিয়াছিলাম, এখন আপনাদের হাতে গিয়া রাঙ্গ, পিতল, কি সোণা হইবে, জানি না। আমরা উহার ছায়া ও অস্থি আপনাদিগকে বিক্রয় করিয়াছি, কেবল মাথার ও কাণের রক্ত বেচি নাই। যদি সে ভাত কি তরকারী পোড়ায়, একটা লোক পাঠাইবেন, লোক না থাকিলে একটা লাঠী পাঠাইবেন, লাঠী না মিলিলে একটা কুকুর পাঠাইবেন। এই বলিয়া কন্যাকে বর গ্রামের মুস্তাজিরের হাতে সমর্পণ করে। কন্যার ভাই, মাতামহী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাহার সঙ্গে যায়, ভাইয়েরা একটী সামাট (মুষল) লয়। গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত হইলে নৃত্য গীত আরম্ভ হয়। সংবাদ পাইয়া বরগৃহ হইতে কেহ এক কলসী জল আনিয়া সকলকে পান করিতে দেয়, সেইখানে ধূল জানোড়ী (ধূল ঝাড়া) হয় অর্থাৎ কিছু খাওয়া দাওয়া হয়। তাহার পর বরের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা গুড় জল লইয়া বর কন্যাকে খাওয়ায়। তাহার পর সকল বাড়ীর গুড় খাইয়া বরকন্যা গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়। সেখানে তাহাদের পা ধুইয়া দিয়া আবার গুড় জল খাইতে দেয়। ধান দূর্ব্বা, চাউল গুঁড়ীর গুলি, হলুদ গুলি ও গোবর গুলি, তেল সিন্দূর ও চিরুণ লইয়া বরের মা সেখানে আসে, বরের মুখে তেল মাখাইয়া তাহার দুইগালে ও কপালে তিনফোঁটা সিন্দূর লাগাইয়া দেয়, তাহার পর বহুকে সেইরূপ করে। বধূ শাশুড়ীকেও সিন্দূর দেয়, তাহার পর বরকন্যাকে হলুদ মাখায়, বরকন্যাও তাহাকে হলুদ মাখাইয়া দেয়। মার পরে দুই খুড়ী সেইরূপ করে। তাহার পর একটী থালে ধান দূর্ব্বা দিয়া বরণ করে ও শেষে সেগুলি পিছন দিকে ফেলিয়া দেয়। চালের গুলি গুলি বাহিরদিকে ও গোবরের গুলি গুলি বাড়ীরদিকে ফেলিয়া দেয়। তাহার পর পূর্ব্বের মত আগুন আনিয়া বরকন্যার সম্মুখে রাখিয়া কন্যাগৃহের সেই সামাট লইয়া তিনজনে তিন তিন বার আগুনেক বরণ করিয়া আগুন পিশিয়া তাহাতে জল দেয় ও সামাটটী গৃহে লইয়া যায়। তখন বর কন্যা গৃহে যায়, ননদ আসিয়া দ্বার বন্ধ করে, কন্যাকর্ত্তা এক আনা পয়সা বা খাড়ু দিলে দ্বার খোলা হয়। একটা চেটায়ের উপর বসিলে বরের মা একটু তেল হলুদ দেয়, তখন তেতরী খুড়ীরা তাহাদিগকে ভাল করিয়া মাথায় ও সিন্দূর দেয়। তাহার পর তাহারা কন্যাগৃহের স্ত্রীলোকদিগকে সেইরূপ করে। তাহার পর বর কন্যার পা ধুইয়া এক জন কন্যার পা চাপিয়া ধরে, সে এক খানা খাড়ু বা এক আনা পয়সা পাইলে পা ছাড়িয়া দেয়। ইহার পর বর কন্যা ও কন্যাগৃহের স্ত্রীলোকেরা ভাত খাইতে বসে। বধূ স্বামীর বাম পার্শ্বে বসে। স্বামী দু এক গ্রাস খাইলে উচ্ছিষ্ট বধূকে খাইতে দেয়। বধূর অনুচ্ছিষ্ট অন্ন স্বামী খায়। ইহাকে বহু আঁঠা (এঁটো) বা বহুভাত বলে। বর কন্যা মদ পায় না কিন্তু কন্যাগৃহের কুটুম্বিনীরা মদ খাইতে পায়। আহারান্তে বর কন্যা ভিন্ন হয়। এ রাত্রে বর কন্যা একত্রে শয়ন করে না। তাহার পর তেতরী কুড়ীরা কন্যার ভাইদিগকে জল তামাক দেয়। তাহার পর

যুবকেরা তাহাদের পা ধুইয়া দেয় ও আহার করিতে দেয়। তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার যোগমাঝীর। পর দিন যোগমাঝী ছেলেদের ও তাহার স্ত্রী কন্যাগৃহের মেয়েদের স্নান করায় এবং বরের বাড়ীতে আনিয়া দু দোনা মদ ও জল পান খাওয়ায়। তাহার পর গ্রামের চৌকীদার থাসি কাটিবার জন্য গ্রামের সকলকে ডাকে। যে যে আসে, দু দোনা করিয়া মদ পায়। মুস্তাজিরের ও পরামাণিকের অনুমতি লইয়া পূর্ব্ব মত কন্যার ভাইদের দ্বারা থাসি কাটান হয়। কেবল আলো চালের পরিবর্ত্তে উষণা চাউল ব্যবহার হয়। গৃহৎ (গৃহস্থ বরকর্ত্তা) পাঠাকে চাউল খাওয়ায়। যোগমাঝী মুস্তাজির ও অন্যান্য দিগকে প্রণাম করিয়া ছেলেদের হাতে একখানি তরবারি দেয়। ভাইদের মধ্যে এক জন পাঁঠাটা খানিক কাটিয়া ফেলে, বর পক্ষীয় কেহ সম্পূর্ণ করে। তাহার পর পৃথিবীর উপর একটু মদ ফেলিয়া দু দোনা করিয়া মদ খাইয়া তাহারা কুটুম্ব ও গ্রামের প্রধানদিগকে প্রণাম করে। সকলেই আবার দু দোনা করিয়া মদ পায়। ইহার পর কন্যাপক্ষীয় সকলকে ভাল ভাত খাওয়ান হয়। অনন্তর সকলে চলিয়া যায়। তাহার পর বরের ভগিনী কি ভ্রাতৃজায়া মণ্ডপের প্রধান খুঁটীর পাশে আলিপানা দেয় এবং বরণ দেখিবার জন্য চৌকীদার (গোড়াইত্) গ্রামের সকলকে ডাকিয়া আনে। যাহারা আসে, তাহারা দু দোনা করিয়া মদ পায়। তখন একজন এক ঘটী জল, একজন ধান দুর্ব্বার ডালা, এক জন জল সইবার কলসী লইয়া আসে। এই সময় বাজনা বাজে। বাজনার তালে তালে তাহারা তিন জন নাচিতে নাচিতে আসে। বর কন্যা তেল হলুদ ও সিন্দুর মাখিয়া পূর্ব্বেই আসিয়া সেই খুঁটার সম্মুখে চেটায়ের উপর উপবেশন করে। স্ত্রীলোকেরা সেই সমস্ত জিনিষ আনিয়া বর কন্যার সম্মুখে রাখে। ঘর হইতে আসিবার সময় বর কন্যার গাঁটছড়া বাঁধা হয়। তখন বরের ভগিনী বহুর হাত ধরে। বর তাহার পশ্চাতে, তাহার পশ্চাতে কুমারীগণ, এইরূপে সেই খুঁটাটিকে তিন বার প্রদক্ষিণ করে। তখন মাঝীর স্ত্রী জল সওয়ার কলসিটী তিনবার বরণ করিয়া বর কন্যাকে বরণ করে, বরণ পূর্ব্বের মত হয়। বরণের পরে বহুকে হাসলি পরায় ও চুম্বন করে। বহু প্রণাম করে। এই সময়ে বর কন্যার সম্মুখে দুই থানি থালা থাকে, যাহার যাহা ইচ্ছা হয়, সে তাহাতে দেয়। হাসলি দিতে না পারিলে সেই থালায় পয়সা দিতে হয়। সে টাকা কড়ি লইয়া বাবণে ও বরণকত্রীর টানাটানি উপস্থিত হয়। বরণ করিয়া বর কন্যার পা ধুইয়া দিবার সময় বরণকারিণী কন্যার পা চাপিয়া ধরে। একটী হাসলি পাইলে পা ছাড়িয়া দেয়। তখন সেই খুঁটাটিকে আবার তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ঘরে চলিয়া যায়। সেখানে গাঁট ছড়া খুলিয়া দেয়। স্ত্রীলোকেরা আর একবার আসিয়া আর তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া জলসওয়া কলসীটা লইয়া যায়। প্রদক্ষিণ নাচিতে নাচিতে হয়। সন্ধ্যার সময় গৃহস্থ মাঝী পরামাণিক প্রভৃতিকে ডাকিয়া আনিয়া ভোজের আয়োজন করে। পরিবেশন মর্য্যাদার পর্য্যায়ক্রমে হয়, যথা, প্রথমে মাঝীকে দিতে হয়। পরিবেশন শেষ হইলে গৃহস্থ মাঝীকে সম্বোধন করিয়া বিনয় পূর্ব্বক

বলে, পূর্ব্বে লোকেরা চেটায়ে ধান শুখাইত, এখন আমরা কুটুম্ব শুখাই। মাঝী বলে, না আয়োজন করিতে ত সময় লাগে, আয়োজন না করিলে আত্মাকে (আৎমা) কি করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ কথা বার্ত্তা হইলে সকলে ভোজন করে।

কন্যাযাত্রের বিদায়।

তৃতীয় দিবস প্রভাতে যোগমাঝী ও গ্রামের পাঁচজন প্রধানলোক কন্যার ভাইদিগকে স্নান করিতে লইয়া যায়। যাইবার সময় একটা বাছুর দেখাইয়া বলে, এই বলদটী তোমাদের, তাহার ইচ্ছামত সেটী বাঁ তাহার মূল্য লয়। মূল্য একটাকা। ভাই বাছুরটীকে স্পর্শ করিয়া দেয়। হাত দিয়া স্পর্শ করিলেও হয়, অথবা গোবরের গুলি করিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া মারিলেও চলে, তাহার পর বলদটীকে প্রণাম করে। বরকন্যাও তখন সকলকে প্রণাম করে। তখন বিনয় করিয়া বলিতে হয়, পূর্ব্বে উইঢিবির উপর চড়িয়া বলদের কাঁদে জোয়াল দিতে হইত, এখন উইঢিবিতে চড়াইয়া জোয়াল দিতে হয়, বলদ এত ছোট হইয়া গিয়াছে। আপনারা এই বলদটী লইতে সম্মত কি না? তাহারা সম্মতি প্রকাশ করে। তখন বলদটী লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কন্যাযাত্রেরা দু চারি দিন রাখিবার অনুরোধ করে, বরপক্ষ বলে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক ননদী কত আছে, বলদ মরিবে কি থাকিবে, আমরা জানিনা। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইলে যোগমাঝী দাঁতন ও তেল লইয়া ছেলেদের একঘাটে এবং তাহার স্ত্রী মেয়েদের অন্যঘাটে স্নানের জন্য লইয়া যায়। স্নান করিয়া ঘরে যাইলে তাহাদিগকে জলপান করান হয়। ইহার পর মণ্ডপে বরকন্যাকে স্নান করান হয়। দুখানি জলচৌকীতে দুজনে বসিলে বর বাঁহাতে মাথা ঘসিবার মাটী লইয়া বধূর মাথায় লাগাইয়া দেয়। বধূও স্বামীকে সেইরূপ করে ও রীতিমত স্নান করাইয়া দেয়। বরণকারিণী বধূকে স্নান করায়। তখন বরকন্যা তাহাকে প্রণাম করে। অতঃপর বধূ মাঝী পরামাণিক শ্বশুর শ্বাশুড়ী ও অন্যান্য কুটুম্বদের পা ধুইয়া দেয়। ভাসুর ও দেওরের পা ধুইবার সময় পয়সা বা খাড়ু পায়। অন্যান্যেরা পিতৃস্থানীয়, তাহারা কিছু দেয় না। ভাসুর ও বধূ এই সময়ে পরস্পরের পায় জল ছিটাইয়া দেয়। জলছিটান স্পর্শ দোষ দুর করিবার জন্য। যখনই ভাসুর কার্য্য গতিকে বধূকে স্পর্শ করে, তখনই এইরূপে জলছিটায়। ভাসুর ও বধূ পরস্পরের নাম ধরে না। গাত্র স্পর্শ করে না। এবং অতিসঙ্কোচে সম্মুখে যায় ও কথাবার্ত্তা করে। বধূ সর্ব্বশেষে বরণকারিণীর পা ধুইয়া দেয় ও তাহার নিকট পয়সা আদায় করে। সেও এইরূপ করে। অনন্তর বরকন্যা কন্যাগৃহের কুটুম্বদিগকে ভোজন করায়। পরিবেশনে কন্যার পশ্চাতে বর থাকে, কন্যা দুদোনা করিয়া প্রত্যেককে মদ খাইতে দিলে বরও দুদোনা করিয়া দেয়। বরকন্যাও তদনন্তর তাহাদের সঙ্গে উপবেশন করে। এই সময়ে গ্রামের প্রধানেরা বরকন্যাকে উপদেশ দেয়। উপদেশ এইরূপ—আমাদের পাঁচজনেও (চাঁদো) ঈশ্বর আজ হইতে তোমাদিগকে এক করিয়াছেন, বিবাহের পূর্ব্বে তোমরা যথেচ্ছাচার করিয়াছ, এখন আর তাহা পারিবে না। আমোদপ্রমোদে

তোমরা কেহ অতঃপর একাকী যাইতে পারিবে না। রোগে পরস্পর সাহায্য করিবে, বধূর পীড়া হইলে স্বামীকে জানাইবে, রাত্রিকালে স্বাভাবিক কার্য্য (বাহ্য প্রস্রাব) সম্পাদন করিতে বাহিরে যাইতে হইলে স্বামীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। বর এতদিন যথেচ্ছা আহার বিহার করিয়াছ—"যাঁহা রাম লক্ষ্মণ তাঁহা অযোদানা" বনবাসেও রামলক্ষণ অযোধ্যার সুখলাভ করিয়াছিলেন। তুহিও এতজিন সেইরূপ করিয়াছ, একাকী বলিয়া কোন ভাবনা কর নাই। এখন আর তাহা হইবে না। দিনে যেখানেই থাক, রাত্রে ঘরে ফিরিতে হইবে। আমরা আজ গরুর গলায় ঘণ্টার মত মূল্যবান ঘণ্টা কিনিয়া তোমার গলায় বাঁধিয়া দিয়াছি, এখন তুমি বাজাইয়া বাজাইয়া বেড়াইতে পারিলে হয়। শীকারে কেঁদ বা পিয়াল পাইলে (যাহা সঞ্চয় করিবে) অর্দ্ধেক বধূকে ও অর্দ্ধেক মা বাপকে দিবে। মহাজন, সৌ, হিত, মিতরৌ (মিত্র) কুটুম্ব, ঠাকুর প্রভৃতি সকলের ভার তোমাদের হাতে পড়িল।

অনন্তর সঙ্গীত হয়।

"পুরব সে গেলে আয়ো পশ্চিম সে আএলা
কোন নাহি পাওআলাং কেঁউঝরিরে ফুল
পূর্ব্ব পশ্চিম সবত দেখিলাম
কোথা হইতে এ সুন্দর ফুল (বহু) আসিল
পুরব সে গেলে আয়োপশ্চিমে সে আএলা
বাবাহি পাওআলাং কেঁউঝরিরে ফুল।"
(বাবা এফুল আনিয়া দিয়াছেন)

গানে ক্রমে খুড়া মামা প্রভৃতির নাম করা হয়। আবার গান হয়।

"ধীরে চল ধীরে চল আমকি দেবর
থালা থালা পার সাহু আমকি দেবর
য়োরে পাড়িহি বৈসালা সাতরে ভাইয়া
সওর ভাই পাঁতি করিয়া বসিয়াছে
বধূ ধীরে চল এবং বাটী ভরিয়া পরিবেশন কর।
ছামাকে ছামাকে পাতা পাতি
পারা সাহু আমকি দেবর
য়োরে তুমি দেখ নয়নে জুড়ায়।
পাতে পাতে এমন দেও যেন তোমাকে
দেখিয়া নয়ন জুড়ায়।" আবার গান হয়—
"আগু আগু কুলীন ঘোড়ী চটকে বাজিল
য়োরে ফল না (বরের নাম) রেয়া
উহি দেখ তোহারা ঘোড়ী।"

গান শেষ হইলে বধূ মদের হাত ধুইয়া ভাত পরিবেশন করে, বর তরকারী দেয়। ভোজনের পর কন্যা যাত্রের বিদায় হয়। বিদায়েব সময় বহু পিতামহীকে চারিটী চিড়া ও এক আনা পয়সা পাঠাইয়া দেয়। পাঁচ দিনের পর কন্যাকে পিতৃগৃহে লইয়া যাইবার নিয়ম। ঘটক কন্যার বড় ভাইকে লইয়া বর কন্যা লইতে আসে। বর কন্যার যাইবার সময় পাঁচ সের চিড়া, এক আনা পয়সা ও এক গাছা থাড় লইয়া যায়। শ্বশুর বাড়ী পৌছিলে বড় শালী বরের পা ধুইয়া দিয়া সেই পয়সা বা থাড় লয়। এই সময়ে গ্রামের সকলকে ডাকিয়া মদ খাওয়ায় ও সেই চিড়া সকলকে ভাগ করিয়া দেয়। তখন বরকন্যা সকলকে প্রণাম করে। প্রথমে মাজীকে প্রণাম করিতে হয়। ঘটক এই দিন কন্যাকর্ত্তার নিকট ছয় আনা পয়সা পায়। শ্বশুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলে বরের বাড়ীতেও এইরূপ হয়। এখানে ঘটক আট আনা পয়সা পায়। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ।

(অষ্টম খণ্ড, ৫৫৯ পৃষ্ঠার পর)

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ।

বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণ মূলে এক পিতার সন্তান। মহারাজ বল্লাল সেন দেব কায়স্থদিগের যেরূপ শ্রেণীবিভাগ করেন, তাহা সমভাবে বঙ্গ ও দক্ষিণরাঢ়ে প্রচলিত ছিল। রাজা দনুজমর্দ্দনদেব তাহা পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া বঙ্গজ কায়স্থদিগকে যেরূপ সামাজিক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। রাজা দনুজমর্দ্দনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তৎকনিষ্ঠ, বিখ্যাত পাঠান সুলতান হুসন সাহের রাজস্ব-মন্ত্রী বসুবংশজাত গোপীনাথ (পুরন্দর খাঁ) দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থসমাজ পুনর্ব্বার নূতনভাবে গঠন করিয়াছেন। তৎকাল গুহবংশীয়গণ দক্ষিণরাঢ়ে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। এজন্য গুহবংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঘোষ, বসু এবং মিত্র এই তিন ঘর কুলীন শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন। নারায়ণ দত্তের উত্তরপুরুষ মৌদ্গল্য দত্তগণ তৎকালে দক্ষিণরাঢ়ে ছিলেন না, এজন্য ভরদ্বাজ দত্তদিগকে সেইস্থলে গণনা করিয়া তাহাদিগকে সন্মৌলিক শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। এইরূপে দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে গুহ ও মৌদ্গল্য দত্ত কৌলিন্য-চ্যুত হইয়াছিলেন।

উল্লিখিত পঞ্চবংশ ব্যতীত তৎকালে দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে সেন, দাস, কর, পালিত, সিংহ এবং দেববংশীয় কায়স্থ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। এজন্য গুহ এবং দত্তবংশীয়দিগকে তাহাদের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়া তাহাদিগকে সিদ্ধ মৌলিক আখ্যা প্রদান করা হয়। অন্যান্য কায়স্থগণ সাধ্য মৌলিক আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইলেন। গণনায় ৭২ বংশীয় কায়স্থ সাধ্য শ্রেণীতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এজন্যই তাঁহারা "বাহাত্তুরে কায়েত" বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

গৌড়েঽষ্টৌকীর্ত্তিমন্তশ্চিরবসতিকৃতা মৌলিকা যেহিসিদ্ধাঃ
তেদত্তাঃসেনদাসাঃ করগুহসাহিতাঃ পালিতাঃসিংহদেবাঃ ॥
যেবাপাদ্যাভিমুখ্যাঃ স্থিতিবিনয়জুষঃ সপ্ততিস্তেদ্বিপূর্ব্বা।
হোড়াদ্যাবীক্ষ্য রাজ্ঞাচরণ গুণযুতা মৌলিকত্বেন সাধ্যাঃ ॥
হোড়ঃ স্বরধরধরণীবানআইচ সোমঃ পৈস্বরসামঃ
ভঞ্জোবিন্দো গুহবল লোধঃ শর্ম্মা বর্ম্মা হুই ভুই চন্দ্রঃ।
রুদ্রো রক্ষিত রাজাদিত্যোবিষ্ণুর্নাগঃ খিল পিল গূতঃ
ইন্দ্রোগুপ্তঃ পালো ভদ্র ওমশ্চাক্কুর বঙ্কুরনাথঃ ॥
শাঁই হেশশ্চমনো গণ্ডোরাহ' রাণা
রাহুত সানা দাহা দানাগণ উপমানা।
খামঃ ক্ষোমো ঘর বৈত্তধো
বীদস্তেজশ্চর্ণৈব আশঃ ॥
শক্তিভূতো ব্রহ্মঃ শানঃ ক্ষেমো হোম বর্দ্ধনরঙ্গঃ।
গুইঃ কীর্ত্তির্যশঃ কুণ্ডুর্নন্দী শীলোধমুণ্ডুপঃ ॥

দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

এই সকল সাধ্য মৌলিকগণ মধ্যে পাল, নাগ, অর্ণব, সোম, রুদ্র, আদিত্য, আইচ, রাহা, ভঞ্জ, হোড়, তেজ, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, নন্দী, রক্ষিত এবং চন্দ্র প্রভৃতি ষোড়শবংশীয় কায়স্থ সৎসম্বন্ধ দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পাল বংশের নারায়ণ, নাগবংশের কলাধর, অর্ণববংশের রাজ্যধর, সোমবংশজ্ভূত বলভদ্র, রুদ্রবংশীয় শিবানন্দ, আদিত্যবংশের গোপাল, আইচবংশসম্ভূত সদানন্দ, রাহাবংশজ বুদ্ধিমন্ত, ভঞ্জবংশীয় রাজীব, হোড়-

বংশধর হরি, তেজবংশীয় বসন্ত, ব্রহ্মবংশজাত মুকুন্দরাম, বিষ্ণুবংশীয় গৌরিকান্ত, নন্দী-বংশজ নন্দী খাঁ, রক্ষিতকুলজ রাজেন্দ্র, চন্দ্রবংশের খিসিমা, কুলকার্য্য দ্বারা স্ব স্ব বংশের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ঘোষ, বসু ও মিত্রবংশীয় কুলীন সন্তানদিগের মধ্যে যাঁহারা অপসম্বন্ধ দ্বারা কুলচ্যুত হইয়াছেন, তাহারা বংশজ আখ্যাপ্রাপ্ত হন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদিগের শ্রেণীবন্ধনকালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসনিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যথা—

ঘোষবংশীয় কুলীনদিগের দুই সমাজ, আকনা ও বালী। প্রভাকর ঘোষ আকনা এবং নিশাপতি ঘোষ বালী সমাজের আদি পিতা। (১) বংশজ ঘোষদিগের ছয়সমাজ—খুনিয়া, দীর্ঘাঙ্গ, আমরেশ্বর, করাতি, শাঁকরালি, শেয়াখালা।

বসু কুলীনদিগের দুই সমাজ, বাগাণ্ডা ও মাহীনগর। শুক্তি বাগাণ্ডা ও মুক্তি মাহীনগর সমাজের আদি পিতা। (২)

(১) ঘোষ বংশ।
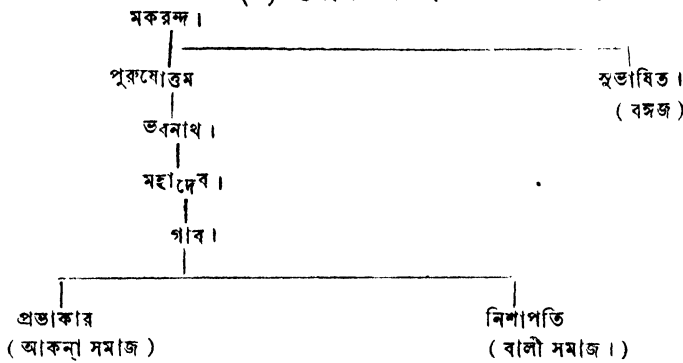
এই বংশাবলী সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। পুরন্দর খাঁর সমসাময়িক পাঠকগণ যৎকালে কুলীনদিগের বংশাবলী সংগ্রহ করেন, তৎকালে তাঁহারা "গোঁজা মিলন" দিয়া এই সকল অসম্পূর্ণ বংশপত্রিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কারণ কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশাবলীগণনা দ্বারা আদিশূরের সহিত বল্লালের ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫ পুরুষ অন্তর দৃষ্ট হইতেছে। আর কুলীন কায়স্থদিগের বংশাবলী দ্বারা আদিশূরের সহিত বল্লালের ২ কিম্বা ৩ পুরুষ মাত্র অন্তর দৃষ্ট হয়। পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধর পুরুষানুক্রমে সকলেই অল্পায়ু হইয়াছিলেন। আর পঞ্চকায়স্থের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে সকলেই দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এই কারণেই আমরা বংশাবলীর বিশুদ্ধতা স্বীকার করিতে অক্ষম হইয়াছি।

(২) বসুবংশ।
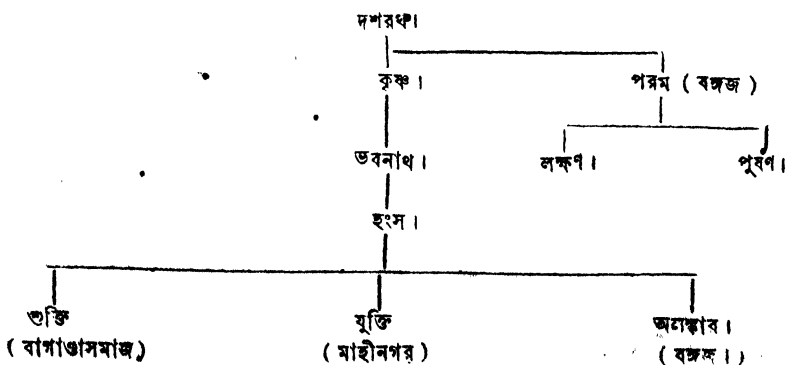
বংশাবলী সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না, কারণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

বংশজ বসুদিগের ছয় সমাজ—চিত্রপুর, পঙ্কমূলী, দীর্ঘাঙ্গ, গোহরি, নিমার্কা, শালমূলী।

মিত্র কুলীনদিগের দুই সমাজ—বড়িসা ও টেকা। ধুঁই মিত্র বড়িসা ও গুঁই টেকা সমাজের আদি পিতা। (৩) বংশজ মিত্রদিগের ছয় সমাজ—চাকলাই, দাঁতিয়া, চাঁদড়া, দাব্‌ড়াকুপি, কুমারহট্ট, বালিয়া।

সিদ্ধ মৌলিকদিগের সমাজ।

দত্ত বংশীয়দিগের ত্রিশটী সমাজ—বালী, চাকলাই, নেওদা, আমলহাড়া, দীর্ঘাঙ্গ, কোদালে, পাঁচনৌর, আটিসাড়া, বটগ্রাম, খোপাপুর, বরাটী, নীলপুর, জটগ্রাম, মৈদগ্রাম, বিজুর, জেজুর, চুপঙ্গলা, দেড়্যাটান, হাড়গ্রাম, লোপা, বেওড়া, দেওড়া, বিঘাটিয়া, কোণা, কেওটা, সুগন্ধ্যা, কলিঙ্গনগর, সেনেটী, গৃহিনী, এবং কোন্নগর।

দেবগণের ত্রয়োদশ সমাজ—কর্ণসোণা, গৌরিহট্ট, চাগা, চিত্রপুর, বৈরাটী, নীলপুর, ভূষালী, আন্দুল, কর্ণপুর, দেবগ্রাম, চৌরগাঁ, ইন্দ্রাণী ও গৌরিপুর।

করদিগের দুই সমাজ—পাণীহাটী, বন্দীপুর।

পালিতগণের দুই সমাজ—কোণা, বড়য়া।

সেনদিগের দুই সমাজ—কোণা, দীর্ঘাঙ্গ।

সিংহবংশীয়দিগের অষ্ট সমাজ—আন্দুলে, চৌলা, বৰ্দ্ধমান, বেলুন, আকনা, পাঁচনৌর, মহানাদ, পাটনা।

---

(৩) মিত্রবংশ।
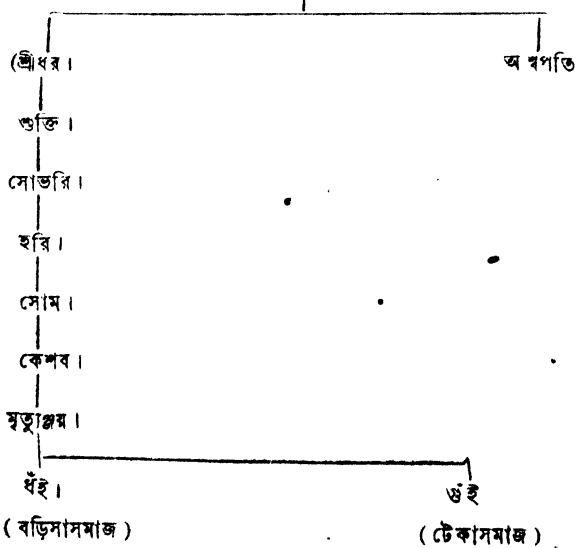
বংশাবলী সম্পূর্ণবিশুদ্ধ বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না, কারণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

দাসগণের সপ্ত সমাজ—শাঁকরাল, হরিপুর, শাটসেওড়া, কালীঘাট, সেদগ্রাম, মূড়াগাছা, সেওড়া।

গুহবংশীয়দিগের কোন সমাজের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, ইহা দ্বারাও আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিপোষক হইতেছে। অর্থাৎ দক্ষিণরাঢ়ী সমাজ বন্ধন কালে গুহবংশীয় কোন প্রধান ব্যক্তি তথায় ছিলেন না এবং এই ঘটনার পর দশরথ ও তাঁহার ভ্রাতাগণের উত্তরপুরুষগণ রাঢ় দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দক্ষিণরাঢ়ী ঘটকদিগের মতে মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে এই সকল সমাজ বিভাগ হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মেল বন্ধনের পরে কায়স্থদিগের সমাজ বন্ধন হয়। দেবীবর ও পুরন্দর খাঁ উভয়ে এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং পুরন্দর দেবীবরের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া ঘটকদিগের সাহায্যে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থদিগের সমাজ বিভাগ করেন। এই সময় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কুলবিধি যেরূপ নির্ণীত হয়, তাহা প্রকাশিত হইল।

পাঁচটী মূল ও চারিটী শাখা এইরূপে নয়টী কুল তথা, মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, (ষড়ভ্রাতা), মধ্যাংশ ও তেয়জ (তুর্য্যক) এই পাঁচটী মূল। ইহারা ক্রমানুসারে সম্মানিত হইয়া থাকেন। * কনিষ্ঠের দ্বিতীয় পুত্র, ছভায়ার দ্বিতীয় পুত্র, মধ্যাংশের দ্বিতীয় পুত্র এবং তেয়জের দ্বিতীয় পুত্র এই চারিটী শাখা কুল। †

মুখ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্ম দ্বারা মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হন, এজন্য তাঁহাকে "জন্মমুখ্য" বলা যায়। তদ্রূপ মুখ্যের দ্বিতীয় পুত্র জন্মকনিষ্ঠ, তৃতীয় পুত্র জন্মমধ্যাংশ, চতুর্থ পুত্র জন্মতেয়জ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মুখ্য কুলীনের অন্যান্য পুত্রগণ মধ্যাংশের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। মুখ্য কুলীনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র দান ও গ্রহণ দ্বারা বাড়িমুখ্যত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন। মুখ্য কুলীনের চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্র দান ও গ্রহণ দ্বারা কনিষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন। ঐরূপ দান ও গ্রহণ দ্বারা ষষ্ঠ ও সপ্তম পুত্র মধ্যাংশ এবং অষ্টম ও নবম পুত্র তুর্য্যকত্ব প্রাপ্ত হন।

কনিষ্ঠ কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র জন্ম দ্বারা ছভায়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু উপযুক্ত কুলে দান ও গ্রহণ দ্বারা কনিষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন। কনিষ্ঠ কুলীনের অন্যান্য পুত্রগণ কনিষ্ঠের দ্বিতীয় পুত্র আখ্যা প্রাপ্ত হন।

ছভায়ার জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মদ্বারা মধ্যাংশ হইয়া থাকেন, কিন্তু উপযুক্ত কুলে দান ও গ্রহণ দ্বারা ছভায়া আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

মধ্যাংশের জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মদ্বারা মধ্যাংশ আখ্যা প্রাপ্ত হন। অন্যান্য পুত্রগণ মধ্যাংশের দ্বিতীয় পুত্র পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তেয়জের জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মদ্বারা তেয়জ হইয়া থাকেন, তেয়জের অন্যান্য পুত্রগণ তেয়জের দ্বিতীয় পুত্র আখ্যা প্রাপ্ত হন।

কনিষ্ঠ ও মধ্যাংশের দ্বিতীয় পুত্র উপযুক্ত কুলে দান ও গ্রহণ দ্বারা তেয়জের পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মুখ্য কুলীন তিন প্রকার, প্রকৃত, সহজ ও কোমল। পুরুষানুক্রমে জ্যেষ্ঠপুত্র প্রকৃত

* আদৌ মুখ্যস্তদনু কনিষ্ঠঃ ষড়ভ্রাতা সৌতদনু গরিষ্ঠঃ।
মধ্যাংশোঽং তুর্য্যকনামা কুলজাশ্চৈতে বহুসম্মানাঃ॥

† কনিষ্ঠস্য দ্বিতীয়োপি পুত্রঃ ষড়ভ্রাতুরেব চ।
মধ্যাংশস্য দ্বিতীয়শ্চ তথা তুর্য্যক পুত্রকাঃ॥

মুখ্য। প্রকৃত মুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র বাড়ি সহজ মুখ্য। সহজের প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র বাড়ি সহজ মুখ্য, তৃতীয় পুত্র কামল মুখ্য হইবেন।

প্রকৃত মুখ্য প্রকৃত মুখ্য কুলে দান ও গ্রহণ করিলে শৌর্য্য (উত্তম) কার্য্য হয়। সহজ ও কোমলের সহিত সম্বন্ধ করিলে প্রকৃত মুখ্যের গৌরব নাই, কিন্তু তদ্বারা সহজ ও কোমলের গৌরব বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সহজ ও কোমল, জন্ম মুখ্য হইলে তিনি শ্রেণী হইতে গ্রহণ ও দান করিতে পারেন। এইরূপ সম্বন্ধ উচ্চ শ্রেণীর সহিত হইলে শৌর্য্য, সমশ্রেণীতে সমাবেশ ও নিম্ন শ্রেণীতে নিন্দার কার্য্য হইয়া থাকে। অন্যান্য কুলীনদিগের সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এইটি যে, উচ্চ শ্রেণীর সহিত কার্য্য করিলে গৌরব বৃদ্ধি ও সমশ্রেণীতে কার্য্য করিলে গৌরব রক্ষা এবং নিম্ন শ্রেণীতে কার্য্য করিলে গৌরবের হ্রাস হইয়া থাকে।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলবিধাতাগণ পর্য্যায় লইয়া আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার করিয়াছেন। "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা!" যাঁহাদের বংশাবলী আগা গোড়া ভ্রমাত্মক, তাঁহাদের আবার পর্য্যায় লইয়া গান বাদ্য কেন? এই পর্য্যায় গণনার কৃপায় যে কত দুগ্ধপুষ্য বালিকা বৃদ্ধের হাতে পতিত হইয়া দীর্ঘ কাল বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন এবং হতভাগ্য বঙ্গভূমি কলুষ-সাগরে প্লাবিত করিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

কায়স্থ সমাজের আর একটি ভীষণ কলঙ্ক "আদ্যিরস।" এই জঘন্য ও ঘৃণিত কার্য্যের নাম শ্রবণ করিলে আমাদের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠে। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ কুলীন কন্যাগ্রহণ করত কুল রক্ষা করিলেই ধনবান মৌলিকগণ প্রচুর অর্থ সহ সেই বরে কন্যা সম্প্রাদন করিয়া দরিদ্র কুলীন কন্যার সর্ব্বনাশ ও আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন। এবং এই প্রকার ঘৃণিত ও কুকার্য্য দ্বারা তাঁহারা "গোষ্ঠীপতি" প্রভৃতি গৌরবাত্মক উপাধি লাভ করিতেন। ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই সকল কুকার্য্য ক্রমে সমাজ হইতে দূর হইয়া যাইতেছে। কুলবিধির কৃপায় এক সময় আমাদের দেশে কুলীনের নির্গুণ ও কদাকার পুত্র কন্যাগণ বহু মূল্যে বিক্রয় হইত। এক্ষণ তৎপরিবর্ত্তে কায়স্থ সমাজে "পাসকরা ছেলে" বিক্রয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে! যদিচ আমরা পাসকরা ছেলে বিক্রয়ের প্রথাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি, তথাপি ইহা যে পূর্ব্ব-প্রচলিত প্রথা হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব। মৌলিককে কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে এবং মৌলিকের কন্যাকে কুলীনের কনিষ্ঠ পুত্রে সম্প্রদান করিতে হইবে, এই বাঁধাবাঁধি নিয়মটি উঠিয়া গেলেই প্রকৃত পক্ষে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে। বিশেষত ঘোষ, বসু ও মিত্র বংশজ হইলেই যে কুলীন হইবে, এরূপ কোন বিধি নাই। সেই সেই বংশীয় অধিকাংশ ব্যক্তিই এক্ষণ কুলজ বা বংশজ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রকৃত কুলীন অতি বিরল। সুতরাং এই সকল বংশজের সহিত সম্বন্ধ করিবার জন্য মৌলিকগণ যে কোন এতদূর লালায়িত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থদিগের গোত্র প্রবর এস্থলে লিখিত হইল।

বংশ।	গোত্র।	প্রবর।
ঘোষ।	সৌকালীন। *	সৌকালীন,আঙ্গিরস,বার্হস্পত্য,জামদগ্ন্য, নৈধ্রুব।
বসু।	গৌতম।	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
গুহ।	কাশ্যপ। †	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
মিত্র।	বিশ্বামিত্র।	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।
দত্ত।	মৌদ্গল্য।	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	শাণ্ডিল্য।	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	ভরদ্বাজ।	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	কৃষ্ণাত্রেয়।	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস।
	পরাশর।	পরাশর, শক্ত্রি, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ।	(পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।)
	আলম্যান।	অলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
	বশিষ্ঠ।	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।
	সৌপায়ণ।	সৌপায়ণ, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	ঘৃতিকৌশিক।	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
	ঘৃতিকুশিক।	ঘৃতকৌশিক, কৌশিক, বন্ধুল।
নাগ।	সৌকালীন।	(পূর্ব্বেলিখিত হইয়াছে।)
নাথ।	কাশ্যপ।	(পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।)
সেন।	আলম্যান।	" "
	কাশ্যপ।	" "
	ধন্বন্তরি।	ধনন্তরি, অপ্সার, নৈধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য
	বাসুকি।	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।

বংশ।	গোত্র।	প্রবর।
সিংহ।—	বাৎস্য।	ঔর্ব্ব,চ্যবন,ভার্গব,জামদগ্ন্য, [আপ্নুবৎ।
	সাবর্ণ।	
	ভরদ্বাজ।	(পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।
	শাণ্ডিল্য।	ঐ
	ঘৃতিকৌশিক।	ঐ
	গৌতম।	ঐ
দাস।—	কাশ্যপ।	ঐ
	আলম্যান।	ঐ
	ঘৃতকৌশিক।	ঐ
	শাণ্ডিল্য।	(পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে)
	মৌদ্গল্য।	ঐ
	আত্রেয়।	আত্রেয়, শতাতপ, সাঙ্খ্য।
	গৌতম।	(পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।
দেব।—	আলম্যান।	ঐ
	বাৎস্য।	ঐ
	শাণ্ডিল্য।	ঐ
	ভরদ্বাজ।	ঐ
	কাশ্যপ।	ঐ

* শাণ্ডিল্য ও বাৎস্য গোত্রীয় ঘোষগণ কৌলীন্য প্রাপ্ত হন নাই।

† কক্ষীস ও কশ্বিব গোত্রীয় গুহগণ বাহাত্তরে কায়স্থ।

মৌদ্‌গল্য। (পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে)
গৌতম। ঐ
বশিষ্ঠ। ঐ
পরাশর। ঐ

কর।—কাশ্যপ। ঐ
মৌদ্‌গল্য। ঐ
আলম্যান। ঐ
গৌতম। ঐ
জামদগ্ন্য। জামদগ্ন্য, ঔর্ব্ব্য, বশিষ্ঠ।

পালিত।—ভরদ্বাজ। (পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে)
শাণ্ডিল্য।

দাস।—ভরদ্বাজ। ঐ
শাণ্ডিল্য। ঐ

চন্দ্র।—কাশ্যপ। ঐ
মৌদ্‌গল্য। ঐ
ভরদ্বাজ। ঐ

পাল।—কাশ্যপ। ঐ
ভরদ্বাজ। ঐ
শাণ্ডিল্য। ঐ

রাহা।—শাণ্ডিল্য। ঐ

ভদ্র।—ভরদ্বাজ। ঐ
আলম্যান। ঐ
চন্দ্রঋষি। চন্দ্রঋষি, পরাশর, দেবল।

নন্দী।—কাশ্যপ। (পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।
আলম্যান। ঐ

ধর।—কাশ্যপ। ঐ

কুণ্ড।—কাশ্যপ। ঐ
গৌতম। ঐ

সোম।—লৌহিত্র। ঐ
কাশ্যপ। ঐ

রক্ষিত।—মৌদ্‌গল্য। (পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে)
বাৎস্য। ঐ

অঙ্কুর।—কাশ্যপ। ঐ
ভরদ্বাজ। ঐ

বিষ্ণু।—শাণ্ডিল্য। ঐ
গৌতম। ঐ
ভরদ্বাজ। ঐ
বৈয়াঘ্রপদ্য। (সাঙ্কৃতি।

আদ্য।—কাশ্যপ। (পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।
(আঢ্য) শাণ্ডিল্য। ঐ
মৌদ্‌গল্য। ঐ

নন্দন।—কাশ্যপ। ঐ
গৌতম। ঐ

হোড়।—মৌদ্‌গল্য। ঐ

ভঞ্জ।—আলম্যান। ঐ

আদিত্য। ঐ ঐ

রাহুত। ঐ ঐ

রুদ্র।—কাশ্যপ। ঐ

গুপ্ত।—আলম্যান। ঐ

বল।— ঐ ঐ

রাণা।—কাশ্যপ। ঐ
হংসল। হংসল, বাসল, দেবল।
দালব্য। *

হংসল, কোশল, দালভ্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, দেব, অলকঋষি ও হংসঋষি প্রভৃতি সাতটি গোত্র কেবল ক্ষত্রিয়জাতির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এই সকল গোত্রজ কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় বংশজাত, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

* স্কন্দপুরাণ, রেণুকা মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য।

মহা তীর্থযাত্রা।

(ULTIMA THULE)

"The Northern Sun, creeping at midnight at the distance of five diameters along the horizon, and the immeasurable ocean in apparent contact with the skies, form the grand outlines in the sublime picture presented to the astonished spectator. The incessant cares and pursuits of anxious mortals are recollected as a dream; the various forms and energies of animated nature are forgotten; the earth is contemplated only in its elements, and as constituting a part of the Solar system." *Travels to the North Cape.—Acerbi.*

"While all the nations of the Earth are sleeping, you here stand in the presence of that greatpower which will wake them all." *Carlyle.*

"All the charms of Norway are outweighed by the strange weird beauty and grandeur of the neighbourhood of the North Cape. I know of nothing that comes within the range of tourist experiences that will make a more lasting inpression on the memory than a day or two in the region of the midnight Sun."

"Each traveller has some new poetic thought to register. For myself the midnight Sun has a solemnity which nothing else in Nature has. Midnight is solemn in the darkness; it is a hundredfold more solemn in the glare of sunlight, rether than ever is seen under tropical skies. This the "silence of death"; not the hum of a bird, not the buzz of an insect, not the distant noise of a human being. Silence palpable. You do not feel drowsy, though it is midnight; you feel a strange fear creep over you as if in a nightmare, and dare not speak; you think what if it should be time that the world is in its last sleep, and you are the last living ones, yourselves on the verge of the Eternal Ocean.

To some standing on the highest part of the plateau a thousand feet above the sea, and looking away to that great unknown Arctic ocean; it has seemed as if they had come to the end of the earth that they were gazing upon the confines of the eternal regions; that they saw in the distance of the outlines of the land of which it is said "there is no night there."

A Traveller.

"And then uprose before me,
Upon the water's edge,
The huge and haggard shape
Of that unknown North Cape
Where form is like wedge."

Longfellow.

প্রথম দিন—১লা জুলাই ১৮৯১ তারিখে ৯ টার পর দিবা সূর্য্যালোকে নরউইজীয় জাহাজ "ওলাফ ক্যুরে" (Olaf Kyrre) আরোহণ করিয়া ট্রঞ্জেম (Trondhjem) হইতে রওনা হই।

২য় দিন—প্রাতে নামসস্ ফিয়র্ড (Namsos Fiord) ও নামসস্ নগর। বেলা ৪ টার সময় তরঘাটেন (Torghatten) দ্বীপস্থ পাহাড় ও প্রাকৃতিক প্রকাণ্ড টনেল দেখিতে যাই। ৮০০ ফুট উচ্চে উঠা নামা করিয়া সকলে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া ৬॥ টার সময় জাহাজে ফিরি। সন্ধ্যার সময় "সাত ভগ্নীর পাহাড়" হইয়া অর্দ্ধরাত্রিতে আর্কটিক কেন্দ্র (Arctic circle) পার হই। এই সময়ে সূর্য্য বেশ দেখা যায়, অর্দ্ধস্তিমিত; কিন্তু ইহা প্রতিফলিত (refracted) দৃশ্য মাত্র।

৩য় দিন—প্রাতে লফোডেন দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাই ও তথা হইতে আগমন করি। অতি বিচিত্র দৃশ্য। তাহার পর হেনিংস্‌ভর (Henningsvœr) একটী প্রধান কডমৎস্য ধরার আড্ডা। বসন্তকালে এখানে ২০০০০ হাজারের অধিক ধীবর জমা হয়। বেলা ৪ টার সময় অতি মনোহর রাফ্‌টস্থণ্ড (Raftsund)। রাত্রি ১১॥ টার সময় বাহির সমুদ্রে ছোট ছোট তিমি মৎস্যের খেলা দেখা গেল। অদ্য ঠিক মধ্য রাত্রিতে উজ্জ্বল রবির দৃশ্য অতি রমণীয়। কাপ্তেন এক ঘণ্টা আগে জাহাজ বাহির সমুদ্রে লইয়া থামাইয়াছেন। সকলে সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া। উত্তর পশ্চিম হইতে সূর্য্যদেব ক্রমে উত্তরে চলিলেন। ঠিক ১২ টার সময় জাহাজ হইতে কামান ছোড়া হইল, সূর্য্য খাড়া উত্তরে, তার পরেই ক্রমে উত্তর পূর্ব্বে গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। আমাদের দেশে শীতকালে বেলা ৯॥ কি ১০ টার সময় সূর্য্য যেখানে থাকেন, ঠিক ১২ টার সময় ঠিক তত উচ্চে। কামান ছুড়িবামাত্র

কাপ্তেন সমস্ত জাতীয় পতাকা উড়াইলেন। সর্ব্বোপরি আমেরিকান পতাকা; কারণ ঐ সময় ৪ঠা জুলাই আরম্ভ হইল, সেই দিন আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। মার্কিনগণ সকলে টুপি খুলিয়া হুলুধ্বনি করিলেন ও কাপ্তেনকে তাঁহার বিবেচনা জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

রাত্রিতে কাহারও ঘুম নাই। ঘুম বাস্তবিক পায় না, তবে নিয়মাধীন হইয়া জোর করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আতসপাথরে রাত্রিতে ঘনীভূত সূর্য্যালোকে অনেক যাত্রীর জিনিসপত্র পোড়াইলাম। আমরা দুইজন মাত্র আতসপাথর আনিয়াছি, সুতরাং আমাকে অনেকক্ষণ এই কাজ করিতে হইল, আমিও আনন্দের সহিত এ সম্বন্ধে মহিলা ও ভদ্রলোকদিগের সেবা করিলাম; জীবনে যতবার তাঁহারা ঐ জিনিসগুলি দেখিবেন, এই দাসানুদাসকে ততবার স্মরণ করিবেন, ইহা আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। মহাতীর্থের যাত্রী আমরা ৬৫ জন স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা, ১১ দেশের লোক—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হলাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, জর্ম্মনি, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ও ভারতবর্ষ। আমিছাড়া সবাই শ্বেতাঙ্গ, আমেরিকান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; ইহারা বিশেষ পর্য্যটক জাতি। দুইটী মহিলা ভারত পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন, দুইজন পুরুষ আগামী শীতে যাইতেছেন। যাত্রীগণ মধ্যে ৪।৫ জন মার্কিন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া শেষ তীর্থ নর্থকেপ সারিয়া দেশে যাইতেছেন।

মধ্যরাত্রির সূর্য্য দর্শন।

স্থান।	প্রথম দর্শন।			শেষ দর্শন।		
	উপরিভাগ	মধ্যভাগ	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	মধ্যভাগ	উপরিভাগ
উত্তরান্তরীপ	১১ মে	১২ মে	১৩ মে	৩০ জুলাই	৩১ জুলাই	১ আগষ্ট
হামরফেষ্ট	১৩ মে	১৪ মে	১৬ মে	২৭ জুলাই	২৮ জুলাই	২৯ জুলাই
বাদসো	১৫ মে	১৬ মে	১৭ মে	২৬ জুলাই	২৭ জুলাই	২৮ জুলাই
ট্রমজো	১৮ মে	১৯ মে	২০ মে	২২ জুলাই	২৪ জুলাই	২৫ জুলাই
বোডো	৩০ মে	১ জুন	৩ জুন	৮ জুলাই	১০ জুলাই	১৫ জুলাই

সুতরাং উত্তরান্তরীপে ১১ মে হইতে ১ লা আগষ্ট পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন দিন। আমরা পূর্ণ ছয় দিন অনবরত সূর্য্যালোক সম্ভোগ করিলাম।

৪র্থ দিন—প্রাতে ট্রমজো (Tromso) পঁহুছিয়া দেশের ভিতর চিরতুষারাবৃত পাহাড়ের উদয়-দেশ দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া ট্রমসডাল (Tromdsal) গ্রামে লাপ্‌দের আড্ডা দেখিতে

গেলাম। লাপগণ (Lapps) আমাদের দেশের ভ্রাম্যমান বেদিয়াদের মত টোল ফেলিয়া বেড়ায়। লাপদের কুটীরের বল্‌গা-হরিণের পাল, কুকুর ইত্যাদি বড় বিচিত্র। ট্রম্‌জো নগর হইতে ফটোগ্রাফরগণ আমাদের সঙ্গে গিয়া লাপকুটীরে আমাদের ছবি তুলিলেন। ৪ ঘণ্টাকাল ভ্রমণ করিয়া সমুদ্রতীরে আসিলাম। তারপর নৌকাযোগে ট্রম্‌জোনগর দেখিতে গেলাম। সন্ধ্যা ৬টার সময় রওনা হইয়া রাত্রি ১০ টার সময় স্কারনে (Skaran) পঁহুছিয়া ডাঙ্গায় গিয়া তত্রস্থ তিমি তৈলের কারখানা ও ৪টা মৃত তিমি দেখিলাম।

৫ম দিন—প্রাতে হামর্‌ফেষ্ট (Hammerfest)। পৃথিবীর উত্তর সীমান্ত প্রদেশের এই শেষনগর, ইহার পর আর জনপদ নাই। ইহাপেক্ষা ১৫ ক্রোশ উত্তরে একটী দুর্গ আছে মাত্র। তীরে নামিয়া মেরিডিয়ন স্তম্ভ (Meridian Column) দেখিয়া আসিলাম। স্তম্ভের উপরে একটী ভূগোলক ও একদিকের গাত্রে লাটিন ও অপর দিকে নরউইজীয় ভাষায় লেখা। লাটিন দিকে

Terminus Septentronolis
Arcus Meridian 25.20
quem
in de ab Oceano Arctico
per
Norvegiam Succiam et Rosseam
Jussu et anspicus
Reges Augustessum
Ascar 1
et Imperatorum Augutsissunorum
Alexandri 1
atque
Necolai 1
Annis MDCCCXVI ad MDCCCLII
Continud labore emensisum
trium gentium geometrœ
Latitudo 70. 40′. 11″. 3‴ E.

নরউইজির দিকে

Det Nordendliche
Ende
punct af en Meridienbue paa 25..20′ fra det Nordlige Ocean til Donan Floden igjennem Norge, Sverige, og Rusland efter Foranstaltning of Hages Magestaet
Oscar 1
og
Kaeserene Alex ander 1, Necolaus 1 ved uafbrudt arbende fra 1816 til 1852 udmaalt af de tre Nationer geometrer Brede 70. 40.11″3 m.

অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন ও রুশিয়া তিন জাতির জ্যামিতিক পণ্ডিতগণ একত্র হইয়া নরওয়ের রাজা প্রথম অস্কার ও রুশিয়ার সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডর ও প্রথম নিকলাসের রাজত্বকালে ও অনুমত্যনুসারে, ক্রমাগত ১৮১৬ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনবরত পরিশ্রম দ্বারা আর্কটিক মহাসাগর হইতে দানুব নদী পর্য্যন্ত জরিপ করিয়া এই মেরিডিয়ন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বেলা ১১টার সময় এখান হইতে রওনা হইয়া "প্রায় নিযুত পক্ষী বিশিষ্ট" পক্ষী পাহাড় দেখিয়া (জাহাজ থামাইয়া কামানের আওয়াজে পাখিগুলিকে উড়ান হইল।) সন্ধ্যা ৭ টার সময় উত্তরান্তরীপে পঁহুছিলাম। দ্বারকা যাইবার পথে পুরীতে উপনীত হইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে দূর হইতে চূড়া দেখিয়া যাত্রীগণ "দ্বারকানাথ কি জয়! মিরাবাই কি জয়! মহারাজ কি জয়!" ধ্বনি করিয়া পুরীর চূড়া দর্শনানন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন; সেই এক ভক্তি বিশ্বাসের প্রীতি সম্ভোগ করিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম, মনে হইলে এখনও চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকিতে

পারি না, আর আজ ৬ টার কিছু পূর্ব্বে দূর হইতে কেপ দেখিতে পাইয়া যাত্রীগণ "কেপ, কেপ" বলিয়া পরস্পরকে ডাকিয়া জাহাজের সম্মুখে দৌড়িলেন, ইহা এক মহানন্দ। আমিও সকলের সঙ্গে গিয়া একবার উত্তর কেন্দ্রের অনন্ততার দিকে তাকাইয়া অন্তরীপস্থ সমুদ্রগর্ভোত্থিত পাহাড় দেখিলাম। হৃদয়া ফুলিয়া উঠিল, বন্ধুগণকে ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন কাবিনে গেলাম, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলাম, বলিলাম "নাথ হে! আর ত পারি না, এ ক্ষুদ্র ভাণ্ডে আর ধরে না, উথলিয়া পড়িতেছে, এত করুণা এই নরাধমের প্রতি! কোথায় তিমিরাবৃত ভারতমাতার ক্রোড়ে অন্ধকারে দিন যাপন করিতেছিলাম, কোথায় চিরসূর্য্যের মধ্যে আনিয়া অনন্ত কাল-সাগরের দ্বারের ছবিস্বরূপ এই উত্তর কেন্দ্রের সম্মুখে আনিলে। জীবনে অনেক করুণা সম্ভোগ করিয়াছি, কিন্তু নাথ, এবারকার করুণা সকলকে ছাড়াইয়া অনেক উচ্চে উঠিয়াছে। এই মহা মহা তীর্থ দর্শন ভাগ্যে আছে, এ কথা দুই মাস পূর্ব্বেও একবার ভাবি নাই। হঠাৎ তুমি গলায় ধাক্কা দিতে দিতে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছ, এ জীর্ণ তনু দ্বারা ইহা কখনই সম্ভব নয়, ইহা কেবল তোমার ধাক্কার জোরে। ধন্য তোমার দয়া, আর ধন্য তোমার কীর্ত্তি। আমি তোমার কৃপার নিকট পরাস্ত হইয়াছি।" তারপর উপরে আসিয়া দেখি, কেপ ক্রমে নিকটস্থ। সম্মুখে যখন জাহাজ লাগিল, ভয়ানক শীত, ভারবোঝা হইবে বলিয়া বেশী গরম কাপড় আনি নাই, সুতরাং কাপ্তেন অনুগ্রহ করিয়া উপরের গরম বস্ত্র দিলেন। এখন ভাবনা হইল, হাজার ফুট খাড়া চড়াই বরফের মধ্য দিয়া কি প্রকারে উঠিব। রাত্রি ১০ টার সময় জয় দয়াময় বলিয়া আর সকলের সঙ্গে নৌকায় উঠিলাম। যাহারা সাহস করিলেন না, তাঁহারা অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে গলা ধাক্কা, বারণ শুনে কে? ১০ জন স্ত্রীলোক দুই দিকে দুই জন করিয়া খালাসির সাহায্যে ও আমরা ৩১ জন পুরুষ। একজন দিনামার ও একজন ফরাসি বারকতক আছাড় খাইয়া অনেক পথ চারি হাত পায় চলিলেন, একটী স্থূলকায় পর্য্যটক মার্কিন রমণী বড়ই বিপন্ন, তবুও খালাসির সাহায্যে চলিতেছেন, ধন্য তাঁহার উদ্যম। প্রায় ১৷৷ ঘণ্টা পরে উপরে পঁহুছিলাম। পরে প্রায় দেড় পোয়া সোজা পথে হাঁটিয়া রাজমনুমেণ্টের নিকট উপনীত হইলাম। মনুমেণ্টের গায়ে লেখা

Kong
Ascar II
Besleg
Nord kap
a 9 Juli
1873

অর্থাৎ রাজা দ্বিতীয় অস্কার ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুলাই তারিখে নর্থ কেপ দর্শন করেন। এখানে একটী গোল কাঠের ঘর প্রস্তুত হইতেছে। শাম্পেন ও কেপের ফটোগ্রাফ বিক্রয় হইতেছে। পাহাড়ে পর্ব্বতে সর্ব্বত্র এইরূপ দুগ্ধ, লেমনেড ও স্থানীয় ফটোগ্রাফ প্রত্যেক স্থানে। তরঘাটনে উঠিবার পথে বোধ হয় ৭।৮ জায়গায় একটী করিয়া ছোট টেবিলের উপর জিনিস সাজাইয়া বালিকাগণ বিক্রয় করিতেছে। এখানে বোধ হয় মিস্ত্রিরা

দোকান রাখিয়াছে। রাত্রি ১ টার সময় নীচে নামিলাম, অবতরণ আরোহণাপেক্ষা বিপজ্জনক।

ষষ্ঠদিন অতি প্রত্যূষে প্রত্যাবর্ত্তন। বিখ্যাত রমণীয় লিঙ্গেন ফিয়োর্ড (Lyngen fiord) দর্শন। ২।৩।৪।৫ হাজার ফুট সমুদ্র হইতে খাড়া পাহাড়, চূড়া হইতে অগণ্য জলপ্রপাত। পাহাড়গুলি গ্লেসিয়াল যুগে(glacial Epoch)গ্লেসিয়র glacier দ্বারা যেন করাত দিয়া কাটা, এক অদ্ভুত দৃশ্য। এখানে পাহাড়ের গাত্রে অনেক ভৌতাত্ত্বিক প্রমাণ (geological evidence) দেখিতে পাওয়া গেল। রাত্রি ১১টার সময় অনেক-গুলি তিমি ফুৎকার করিয়া ছুটাছুটি করিতে দেখা গেল। স্কোরাণ কারখানার "Duncan grey" তিমি-জাহাজ (whaler) আমাদের সম্মুখে একটী তিমিকে টেঁটা মারিয়া ধরিল। কাপ্তেন আমাদের জাহাজ থামাইলেন, পরে আহত তিমিকে শিকলে বাঁধিয়া লইয়া "ডনকান" জাহাজ আমাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। স্কোরাণ কার-খানায় অধিকারীর পত্নী আমাদের জাহাজে ট্রম্সো হইতে স্কোরাণে আসেন, এই "ডানকন" জাহাজে তাঁহার স্বামী ও তিনি ছিলেন, তাঁহার দরুণে আমাদের দেখিবার অনেকটা সুবিধা হইল। তাঁহারা উভয়ে নৌকা করিয়া আমাদের জাহাজে আসিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। আজ শেষ মধ্যরাত্রির পূর্ণ সূর্য্য দর্শন, সুতরাং প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ ও ডেকের উপরে সকলে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ হইল।

৮ম দিন প্রাতঃকালে স্বারটিসনে (Svartisen)। ১০টার সময় পৃথিবীর একটী প্রধান গ্লেসিয়ার glacier দেখিয়া আসিলাম। ২২ ক্রোশ দীর্ঘ ৬ হইতে ১৩ ক্রোশ প্রস্থ ৪০০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বত প্লাটো (mountain plateau) ব্যাপিয়া স্থানে স্থানে ৩০০ ফুট ঘন একখানি বরফের চাঁই। ইহার নাম গ্লেসিয়র। সমুদ্রতীর হইতে দৃশ্য যে কিরূপ মনোহর, অথচ ভয়ঙ্কর, তাহা বাক্যে বলা যায় না। কতকাল হইতে এই ভাবে আছে, পৃথিবী ভিন্ন আর কেহ তাহার সাক্ষী দিতে পারে না। সম্ভবত হৈমযুগ (glacial epoch) হইতে বিদ্যমান। স্থানে স্থানে গভীর গহ্বর সূর্য্যালোকে সুন্দর নীলবর্ণ আভাযুক্ত। এইরূপ গ্লেসিয়ার সমূহের সমুদ্রাভিমুখে গতি দ্বারা পাহাড় কাটিয়া এই ফিয়োর্ডগুলি খ্যাত হইয়াছে। এবিষয়ে বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। অদ্য রাত্রিতে অতি অল্পক্ষণ মাত্র অদৃষ্ট থাকিয়া সূর্য্যদেব পুনরায় উঠিলেন।

৯ম দিন মধ্যাহ্নে ট্রম্সোয়ে প্রত্যাবর্ত্তন। এখনও জাহাজে বসিয়া লিখিতেছি। যেরূপ সুখে এই তীর্থযাত্রা অতিবাহিত হইল, এরূপ সুখ জীবনে আর কখন সম্ভোগ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এই সার্ব্বভৌমিক প্রকাণ্ড পরিবারের ছাব হৃদয়ে প্রস্তরাঙ্কিত রহিল। এ যাত্রা শেষ না হইত,এইরূপ ইচ্ছা হইতেছে। ৬৫ জনের মধ্যে এক ব্যক্তিও এরূপ নাই, যাঁহার সহিত একত্রে বসিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল না হয়, সবাই প্রফুল্ল, সর্ব্বদা হাসি খুসি। সুখী পরিবার আর কাহাকে বলে? পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের ৬৫ জন এই কয়দিনের জন্য একত্রে পান ভোজন, একরূপ মতিগতি, এক ধ্যান এক জ্ঞান, ইহা অপেক্ষা প্রীতিপ্রদ ব্যাপার সংসারে আর কি সম্ভবে? কয়দিন যে কোথা দিয়া গেল, কিছু টের পাইলাম না। যে

অল্পটুকু ঘুমাইয়াছি, তাহাতে লোকসান বোধ হইয়াছে। একদণ্ড যে বসিয়া লিখিব, তাহার সময় পাই নাই। একদৃশ্য না ফুরাইতে ফুরাইতে আর একটা। তারপর যেখানে যেখানে তীরে গিয়া দেখিতে হইবে, ২।৩ ঘণ্টা আগে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। মানচিত্রে দেখিয়াছেন, নরওয়ের পশ্চিমকূলে ক্রমাগত দ্বীপ ও ফিয়োর্ড, যাইবার সময় একখাড়ি দিয়া, আসিবার সময় আর এক পথে ফিয়োর্ডের মধ্যে যাতায়াত ইত্যাদি ঘুরাফিরাতে বিস্তর দেখা হইল। বরাবর সমুদ্র নিথর, তবু মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় জাহাজ থামে, আরামের কোন প্রকারে ত্রুটি নাই, পানাহার যে কত রকম, তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না, "রাজার হাল স্বর্গে বাস", যে বলে, তাহা এই জাহাজে খওাইয়া গেল। গত রাত্রিতে কার্ড বিনিময় কালে প্রাণ যেন কেমন করিতে লাগিল। যাহা হউক, বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়া এখন বিদায় হই।

ট্রঞ্জেম হইয়া ক্রিষ্টীয়ানিয়া, তারপর সুইডেন, রুসিয়া প্রভৃতি উত্তর ও মধ্যে ইউরোপ ভ্রমণের কথা পরে পরে লিখিব।

এ পথের অনেক কথা বাকী রহিল, পরে জানাইব। বড় তাড়াতাড়ি, সময় নাই।

শ্রীচন্দ্র শেখর সেন।

প্রার্থনা।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

(১)

দেওমা পরায়ে, কোপীন কটীতে,
কমণ্ডলু করে, দেওমা আমার।
গৈরিক বসনে, অথবা অজিনে,
আবৃত করমা, আমার শরীর!
অথবা ব্যাঘ্রের কর্কশ চর্ম্মেতে,
আবৃত করমা, দেহ অধমের।
পরায়ে দেওমা, গলেতে আমার,
রুদ্রাক্ষের মালা, আর তুলশীর!
আমি যোগী হয়ে রব বড় সাধ আছে মনে!

(২)

দক্ষিণ করেতে ত্রিশূল, বামেতে পলাশের দণ্ড,
দেওমা আমার!
অঙ্গেতে দেওমা মাখায়ে বিভূতি,
তদুপরি রজঃ শ্রীবৃন্দাবনের!
শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মেতে দীক্ষিত হইয়ে,
করিব আমি গো প্রচার
ব্রহ্মময়ী মাগো! অসীম অজ্ঞেয়, অব্যক্ত অপার,
মহিমা তোমার;
বড়সাধ করেছি মনে মা! তুমি এক অদ্বিতীয়—
বুঝাইব সর্ব্বজনে।

(৩)

দেওমা বসায়ে, তৃতীয় লোচন, জ্যোতিঃপুঞ্জময়,
ললাটে আমার,
সদাশিব সম করমা আমারে! অতি কৃপাকরে,
বৈরাগ্যাবতার!
করমা আমারে, করুণা করিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ সমান
তত্ত্ব জ্ঞানাধার!
উভয়ের ন্যায়, কর দয়া করে, আমারে অনন্ত
প্রেমের ভাণ্ডার।
তাদের মতন বিলাইব প্রেম,
হয়েছে বড়ই সাধ মনে আমার।

(৪)

তুলনা দেখিনা জগতে দোঁহার, দোঁহে গো
সকলে গুণের আধার!
রূপে গুণে দোঁহে দোঁহার সমান, কে বলে
কে কার নীচে গো! মহিমা অপার!
তাইমা তোমার চরণ ধরিয়ে,মিনতি করিগো
দেহ এই বর—
উভ-রূপ-গুণ যেন একাধারে মাগো এজনমে
দেখি একবার।
দেখিলে সেরূপ,জুড়াবে জননী পরাণ আমার।

(৫)

মূরতি দোঁহার, নয়ন মোহন, বিশ্ববিমোহন,
যেন একবার,
দেখিয়ে করিমা! বহু পুণ্যে লব্ধ,মানব জনম,
সার্থক আমার!
দুজনে মিশিয়ে, একই হইয়ে, যেন ধরাধামে,
আসেন একবার!
তাবিনে কলির, কখন উদ্ধার,হবেনা হবেনা,
বিশ্বাস আমার!
তাবিনে দেশের নাহি রক্ষা আর!
উপায় দেখিনা! দেখিনা!

(৭)

প্রেমের জ্ঞানের,ভারতে বড় মা! হয়েছে অভাব,
দেখ একবার।
ওমা ব্রহ্মময়ী, নয়ন ফিরায়ে, দেখ একবার,
দুর্দ্দশা ধরার!
তু বিনে তাহার,কে করে উদ্ধার! পাঠাও তাইমা,
সে যুগ্মে একবার!
সে যুগ্ম আসিয়ে,পতিত ভারতে,প্রেম ও জ্ঞানের,
যুগল প্রভাব, আনুন আবার!
ভবের ত্রিতাপ, তা'হলে ঘুচে যাবে মা!

(৭)

মাগো বড় সাধ হয়েছে মনে!—
দুজনার পদে, সঁপিয়ে পরাণ, করিব সার্থক,
জীবন আমার!
দয়ার আধার জননী আমার! দয়াকরে মোরে,
দেহ এই বর।
(যেন মা) ধবল শ্যামল সবল অমল রুদ্র
কমনীয়, দেখিয়া দোঁহার—
সেই অপরূপ সৌম্যরূপ একাধারে,সার্থক নয়ন,
হয়গো আমার!
আর কিছু চাইনা! চাইনা! সেরূপ হেরিতে
কেবল বাঞ্ছা করিমা!

৮

সেরূপ হেরিতে, সক্ষম হইতে, আমি মা!
করিব সাধনা গভীর!
অতি সাধনার ফল বিনে কেহ মাগো,
হেরিতে না পারে রূপ অন্ততর!
উভয়ের রূপ,হেরিব কেমনে,বল একাধারে,
হ'লে সাধনার, অভাব আমার!
তাই বলি মাগো করুণা করিয়ে যুগ্ম বেশে দেহ
সাজাও আমার!
যুগল বেশেতে, সে যুগ্ম মূর্ত্তির, করিব দর্শন,
বড়সাধ মনে!

৯

(যখন) যুগল মূর্ত্তিতে, কালি উদ্ধারিতে,
আসিবে দুজনে, ভারত মাঝার,
মুক্তি সেনা ল'য়ে,আমরা সকলে,আগমনী-গান
গাহিব দোঁহার!
প্রেমের পতাকা,তত্ত্বজ্ঞান ধ্বজা,থাকিবে দুকরে
যুগল মূর্ত্তির!
আমরা সকলে শান্তির নিশান,ধরিয়ে পশ্চাতে,
যাইব দোঁহার!
ডঙ্কা মেরে ঘোষিব নব যুগের আবির্ভাব মা!

১০

আধ গো ত্রিশূলী,আধ বনমালী,সেরূপ মাধুরী
প্রেমের আধার!
দেখিয়া হৃদয় হইতে যাইবে,অপ্রেমের কালী,
ভারতবাসীর!

প্রেমে ঢুলু ঢুলু, জ্ঞানে আলু থালু,
নবীন-প্রবীন-নীরদ আকার!
দেখিয়া সে রূপ, হইবে মোদের,
হৃদয়ে উদিত, প্রেম গাঢ়তর!
আমরা সেরূপ হেরে বিশ্ব প্রেমে পাগল হব মা!

(১১)

যাইবে সকল, অপ্রেমের ভাব, পাইব বিদ্বেষ
হইতে নিস্তার!
দেখিয়া পরের, একটু পাতক, নাসিকা কুঞ্চন,
করেছিনু মাগো! হায় কতবার!
ঘৃণায় ঠেলেছি, চরণে তাহায়! সে দর্প এখন,
নিশ্চয় স্খলিত, হইবে আমার!
কারণ জননি! সে রূপ-মাধুরী সহ তুলনায়,
ন্যক্কার-জনক শরীর আমার!
ঘৃণা গিয়ে প্রেম ঢুলু ঢুলু মোর হইবে হৃদয়!

(১২)

এই দেহ মম, পূর্ণ শোভাহীন! সহ তুলনায়,
সে যুগ্ম মূর্ত্তির!
দোঁহার গুণের,সহিত তুলনা,হইতে পারে না,
কখন আমার!
তথাপি কদাপি,ঘৃণার উদ্রেক,হইতে শুনিনি,
হৃদয়ে দোঁহার!
বিদিত পুরাণে, কৃষ্ণ সদাশিব, প্রেমের আকর,
জ্ঞানের ভাণ্ডার!
সে প্রেম সাগরে, ডুবিয়ে মরিব, করেছি,
স্থির মা মনে!

১৩

আধ ঢুলু ঢুলু, আধ বেঁকা বেঁকা, নয়নযুগল,
দেখিলে যুগ্মের,
হৃদয় হইতে, বিদ্বেষ অনল, চির দিন তরে,
নিভিবে আমার!
(তখন) পরাণ ভরিয়ে, জগৎবাসীরে,
ভাল গো বাসিয়ে, জুড়াব অন্তর!
প্রেমের জ্ঞানের, ভাণ্ডার বিলায়ে,
করিব ভারত উজ্জ্বল আবার!
ভাণ্ডার হইতে আমি গো লইয়ে,
প্রেম বিলাইব জগত ভিতর!

১৪

কবে গো সেদিন আসিবে ভাবিয়া,
আকুল হয়েছে পরাণ আমার,
সহেনা বিলম্ব,একদিন তরে,দ্রুত করে মাগো
পাঠাও তাঁদের।
পিপাসু চাতকে,বারি দান করে,সার্থক কর মা,
বাঞ্ছাকল্পতরু সুনাম তোমার,
বিলম্ব করিলে,সোণার ভারত,হইবে তোমার,
হায় ছারখার।
দয়া করে মাগো পূরাও এ প্রার্থনা আমার!

১৫

মা তুমি ত স্বয়ং,কখন আসনা,পাঠাইয়া থাক
তব অবতার!
জগৎ রক্ষণে প্রলয় সাধনে, সদাশিব কৃষ্ণে,
পাঠাও বরাবর!
যুগপৎ রক্ষণ, প্রলয় সাধন, প্রয়োজন মাগো
হয়েছে এবার!
যুগল মূর্ত্তিতে, পাঠালে দুজনে, যুগপৎ দুকাজ
হইবে উদ্ধার!
তাই মাগো! বিলম্ব না করে পাঠাও তাঁদের!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

শকাব্দ। (২)

(নবম খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠার পর।)

শককাল।

আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি যে, শকাব্দ সম্বন্ধে প্রোফেসার ওল্‌ডেন্‌বার্গ * ও তন্মতানুগামী ত্রৈলোক্য বাবু (১) যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা (ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে) অপ্রামাণিক, অর্থাৎ শকাব্দ কাশ্মীরাধিপতি কনিষ্ক কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সেই প্রসঙ্গে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তবংশ (২) স্থাপিত হয়; এবং কনিষ্ক গুপ্তবংশ স্থাপনের সমকালে বা তৎসমীপবর্ত্তী কালে প্রাদুর্ভূত হন। এই প্রস্তাবে আমরা শকাব্দ সমন্ধে আরও কয়েকটী কথা বলিব।

শকাব্দের প্রবর্ত্তক কে? এবং কোন ঘটনাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য ইহা প্রবর্ত্তিত হয়? এ বিষয়ে সাধারণের মতের সহিত পুরাতত্ত্ববিৎগণের মতের ঐক্য নাই। দাক্ষিণাত্যের জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, একদা দাক্ষিণাত্যের পরাক্রান্ত নৃপতি শালিবাহনের সহিত উজ্জয়িনী-অধিপতি বিক্রমাদিত্যের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সংগ্রামে বিক্রমাদিত্য পরাজিত হন, এবং সেই সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাকে চিরস্থায়ী করিবার জনাই প্রতিষ্ঠানাধিপতি মহারাজ শালিবাহন 'শকাব্দ' প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু সম্বৎ (প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য) ও শকাব্দের (প্রবর্ত্তক শালিবাহনের) মধ্যে ১৩৫ বৎসরের অন্তর থাকায়, গ্রাণ্টডফ্ ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এই কিম্বদন্তী প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করেন না। বোম্বাই (৩) সেণ্টজেভিয়ার কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর রাজারাম রামকৃষ্ণ ভাগবত মহোদয়, এই কিম্বদন্তীর স্বপক্ষে একটী যুক্তি দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, যাঁহারা এই কিম্বদন্তী অমূলক বলেন, তাঁহারা জানেন না যে 'বিক্রমাব্দ' দুইটী ছিল। রাজতরঙ্গিনী অনুসারে কাশ্মীর দেশে প্রচলিত বিক্রম অব্দের সহিত শকাব্দের কোনও পার্থক্য নাই। এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বিক্রমাদিত্য

* গতবারে লিপিকর প্রমাদ বশতঃ "ওল্‌ডেন্‌বার্গ" এর পরিবর্ত্তে "ওল্‌ণ্ডেবার্গ" লিখিত হইয়াছিল।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ওলডেন্‌বার্গের মতানুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার ভাণ্ডারকরের ন্যায় অধ্যাপক মোক্ষমূলারও এই মতের বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন " We now come to the question, whether the Saka era, 78 A D. can be identified with the inauguration of the king Kkanishka the great Saka king. * * * I confess, I feel doubtful on that point, I always thought it possible that, while the years of Kanishka's reign were purely historical, the years of the Saka era, though beginning about the same time, may, like the Vikram era have been fixed originally by chronological computation," F. M. Muller's What can India teach us?

(২) সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ হণ্টার ও শ্রীযুক্ত বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তবংশ স্থাপনের কাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(৩) ইহার মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণ "মুম্বই"। পোর্টুগীজগণ ইহার সুন্দর উপকূল দেখিয়া ইহাকে Bom-bay বলিত।

কোনও নৃপতি বিশেষের নাম নহে। ইহা একটী রাজবংশের নাম (১)। বিক্রমাদিত্য একজন নয়, সাত জন। তন্মধ্যে ১ম বা সম্বৎপ্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য ৫৭ পূঃ খ্রীঃ রাজা হন। ৫৭ পূঃ খ্রীঃ যে বিক্রমাদিত্য সম্বৎ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহারই বংশে, তাঁহার ১৩৫ বৎসর পরে হর্ষ নামক জনৈক নৃপতি উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি হর্ষ বিক্রমাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। এই হর্ষ বিক্রমাদিত্য কাশ্মীর দেশ জয় করত তত্রস্থ রাজসিংহাসন লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে আনয়ন করেন , এবং কাশ্মীরে স্বীয় নামে একটি অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। এইরূপে জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া হর্ষ বিক্রমাদিত্য মহারাষ্ট্র দেশ আক্রমণ করেন। প্রতিষ্ঠানাধিপতি মহারাজ শালিবাহন মরাঠা (মহারাষ্ট্রীয়) সেনার পরাক্রমে কাশ্মীরবিজেতা হর্ষ বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে 'শকাব্দ' (২) প্রবর্ত্তিত করেন। কথিত আছে, ইতিপূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে সম্বৎ ব্যবহৃত হইত। অতএব অধ্যাপক ভাগবতের মতে শালিবাহন যে বিক্রমাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি বিক্রম বংশের আদি পুরুষ সম্বৎপ্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য নহেন ; তিনি উক্ত বংশোদ্ভব হর্ষ নামক জনৈক নৃপতি। তিনি ৭৮ খ্রীঃ কাশ্মীর জয় করিয়া তথায় বিক্রম নামে একটী অব্দ প্রচলিত করেন ; এবং পরিশেষে শালিবাহন কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

মার্শম্যান সাহেব প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, শালিবাহন বিক্রমাদিত্যকে স্বীয় পরাক্রমে নিহত করিয়া দাক্ষিণাত্য জয় পূর্ব্বক এত রাজ্য বিস্তার করেন যে, ঐদেশ হইতে বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ উঠাইয়া দিয়া আপন নামে 'শক'স্থাপন করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা প্রণীত "রাজতরঙ্গে" লিখিত আছে যে, বিক্রদিত্যের সাম্রাজ্যাবধি ১৩৬ বৎসর পরে শালিবাহন রাজার সন্তানেরা তাঁহার "শক" প্রবর্ত্তিত করেন।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে 'শকাব্দ' সম্বন্ধে সাধারণের বিশেষতঃ হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, আলবিরুণীর গ্রন্থ পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। আলবিরুণী বলেন যে, শক নামক জনৈক নৃপতি সিন্ধুনদ ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যভাগে তাঁহার বাসস্থান ছিল। হিন্দুগণ তাঁহাকে শাক্যবংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করিতেন না। কেহ কেহ তাঁহাকে শূদ্রবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। আবার কাহারও মতে তিনি পাশ্চাত্য দেশোদ্ভূত ছিলেন। সে যাহা হউক, প্রজাগণ তাঁহার অত্যাচারে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। অবশেষে তাহাদের উদ্ধারার্থে পূর্ব্বদিক হইতে সাহায্য আসিল। বিক্রমাদিত্য শক নৃপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা

(১) "বিক্রম" একটী বংশের নাম কিনা, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। তবে আমরা এইমাত্র জানি যে, "বিক্রমাদিত্য" নামধারী কয়েকজন নৃপতি বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রাদুর্ভূত হন। মহারাষ্ট্র দেশে ৪জন বিক্রমাদিত্য জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব চৌলুক্য বংশে দুইজন (একজন ৬৮০ খ্রীঃ অঃ ইহলোক পরিত্যাগ করেন,ও অন্য একজন ৭৩৩ খ্রীঃ হইতে ৭৪৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন) এবং উত্তর চৌলুক বংশে দুই জন (১০০৮ খ্রীঃ হইতে ১০১৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ও ১০৭৬ খ্রীঃ—১১২৬ খ্রীঃ) প্রাদুর্ভূত হন॥

(২) ডাঃ হণ্টার বলেন, খ্রীঃ ৭৮ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ সোমবারে শকাব্দ আরম্ভ হয়।

করিলেন। পঞ্জাব ও মুলতানের মধ্যবর্ত্তী "করুর" (কুরুক্ষেত্র?) নামক প্রদেশে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে শক নৃপতি বিক্রমাদিত্যের হস্তে নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জন সাধারণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, বিক্রমাদিত্যকে "শ্রী" উপাধি প্রদান করিল; এবং এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য জ্যোতির্ব্বিদগণ এই সময় হইতে অব্দ-গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অব্দই 'শকাব্দ' নামে বিখ্যাত। শকাব্দকে হিন্দুগণ 'শককাল' বলেন। ইহা বিক্রমাব্দের ১৩৫ বৎসর পরে প্রবর্ত্তিত হয়। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, আলবিরুণীর মতে শকাব্দ-প্রবর্ত্তক এই বিক্রমাদিত্য ও উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য এক ব্যক্তি নহেন। (১)

ভাস্করাচার্য্যের "করণ কুতূহল" নামক (খ্রীঃ ১২ শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত) গ্রন্থের "সোধল" কৃত টীকার ৪ শত বৎসরাপেক্ষা প্রাচীন একটি লিখিত হস্ত পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহাতে লিখিত আছে যে, যে দিন বিক্রমাদিত্য 'শক' নামক ম্লেচ্ছজাতির বিনাশ সাধন করেন, সেই দিন হইতে যে অব্দ প্রচলিত হয়, তাহা "শকাব্দ" নামে প্রসিদ্ধ। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎ সংহিতার টীকাকার ভট্ট উৎপলও বিক্রমাদিত্যকে শকাব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

শকাব্দ সম্বন্ধে যে কয়েকটী কিম্বদন্তী উদ্ধৃত হইল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারা যায় না। সুতরাং অন্যত্র অনুসন্ধান আবশ্যক। আলবিরুণী বলিয়াছেন যে, হিন্দুগণ শকাব্দকে 'শককাল' বলিত। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা ভাস্করাচার্য্য শকাব্দকে "শক-নৃপ-সময়" (২) এবং বরাহমিহির (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে) উহাকে "শক ভূপকাল" ও "শকেন্দ্রকাল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৩) সোধল ও ভট্ট উৎপল প্রভৃতি টীকাকারগণ যাহাই বলুন না কেন, 'শককাল', 'শকনৃপসময়', 'শকভূপকাল' ও 'শকেন্দ্র-কাল' এই কথাগুলির অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে পূর্ব্বোদ্ধৃত কিম্বদন্তীগুলির অলীকতা প্রমাণিত হইয়া, এক অভিনব তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। সেই অভিনব তত্ত্ব এই যে, শালিবাহন বা বিক্রমাদিত্য শক জাতির সংহার করিয়া যে অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা শকাব্দ নহে; প্রকৃতপক্ষে শক জাতীয় নৃপতিগণ যে অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাই শকাব্দ। তাই বরাহমিহিরাদি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাকে 'শকভূপকাল' (শকরাজার প্রবর্ত্তিত অব্দ বা শকজাতীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এবং হিন্দুগণ কালক্রমে প্রকৃত ঘটনা ভুলিয়া গিয়া এ বিষয়ে নানাবিধ অলীক কিম্বদন্তী রচনা করিলেও, ইহাকে "শককাল" বলিতেন।

(১) অধ্যাপক মোক্ষমুলার প্রণীত "What can India teach us?" নামক গ্রন্থের ২৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২) ভাস্করাচার্য্য স্বকৃত গোলধ্যায়ে লিখিয়াছেন:—"রসগুণপূর্ণমহীসমশকনৃপসময়ে ভবন্মমোৎপত্তিঃ"। অর্থাৎ শকরাজার ১০৩৬ বৎসরে আমার জন্ম হয়।

(৩) অধ্যাপক মোক্ষমুলার প্রণীত "What can India teach us?" নামক গ্রন্থের ২৯৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সার্দ্ধ ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্ব্বে মহামতি বরাহমিহির যে তত্ত্বের আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। গার্গ্যসংহিতা একটী অতি প্রাচীন জ্যোতিগ্রন্থ, ইহা খ্রীঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে বা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় (১)। এই গ্রন্থে ভবিষ্যৎবাণীচ্ছলে কথিত হইয়াছে যে, মৌর্য্য বংশের অধঃপতনের পর দুষ্ট যবনগণ অযোধ্যা, পঞ্চাল, (বর্ত্তমান রোহিলখণ্ড) কুসুমধ্বজ (বর্ত্তমান পাটনা) ও মথুরা প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করিবে (২) যবন নৃপতিগণের পর শকজাতি ভারতে রাজ্য বিস্তার করিবে। পুরাণেও যবন, শক ও তুখারাদি অনার্য্যজাতি কর্ত্তৃক ভারতাধিকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (৩)

কালাদগী জেলার (এখন বিজাপুর জেলার) অন্তর্গত "বাদামী" গ্রামে চালুক্য (চৌলুক্য) বংশীয় 'মঙ্গলীশ' নামক জনৈক নৃপতির একটী প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, 'শক' রাজার রাজ্যাভিষেকের ৫ শত বৎসর পরে উক্ত প্রস্তরলিপি খোদিত হয়। "শক নৃপতিসম্বৎসরেম্বতিক্রান্তেষু পঞ্চসু শতেষু ইত্যাদি" এবং "শকনৃপকাল সম্বৎসরে"। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রস্তরলিপিতেও শকাব্দকে 'শকনৃপকাল' ও 'শকোপনামক (শকজাতীয়) রাজার রাজ্যাভিষেক কাল' বলা হইয়াছে। অধুনাতন কালের প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহেও শকাব্দের পরিবর্ত্তে "শকনৃপতেরতীতাব্দঃ" লিখিত থাকে। ইহা হইতে নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, শকাব্দ শালিবাহন বা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক শকজাতির ধ্বংশের পর

---

(১) অধ্যাপক কের্ণ গার্গ্যসংহিতা ৫০ খ্রীঃ পূঃ রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে ভবিষ্যৎকথনচ্ছলে শকজাতির ধ্বংশের উল্লেখ থাকায়, অধ্যাপক মোক্ষমূলার এই গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত অধ্যাপক কের্ণের মতই অধিক প্রামাণিক বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপক কের্ণের মত সত্য হইলে গর্গসংহিতোক্ত শকজাতির ধ্বংশবিষয়ক বাক্যটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হয়।

(২) মৌর্য্যবংশের অধঃপতনের পর ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকগণ খ্রীঃ পূঃ ২য় ও ১ম শতাব্দীতে ভারতে প্রবেশ করিয়া উড়িষ্যা পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে। উল্লিখিত গর্গবাক্য এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে, বোধ হয়। পতঞ্জলি (১৫০ খ্রীঃ পূঃ) স্বকৃত মহাভাষ্যেও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। যথাঃ—"অরুণদ্‌যবনঃ সাকেতম্" অর্থাৎ যবনগণ অযোধ্যা অবরোধ করিয়াছে। "অরুণদ্ যবনো মাধ্যমিকান্" অর্থাৎ যবনগণ মধ্যদেশ বাসিদিগকে অবরোধ করিয়াছে।

(৩) "ততঃ ষোড়শ শকভূভুজো ভবিতারঃ। ততশ্চাষ্টৌ যবনাঃ চতুর্দ্দশ তুখরাঃ॥" ইত্যাদিঃ বিষ্ণুপুরাণ ৪। ২৪। ১৪। কেহ কেহ বলেন, লিপিকর প্রমাদে বিষ্ণুপুরাণে "তুখার" এই অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃত পাঠ "ভুখার" হইবে। ভুখারেব (বোখারার) অধিবাসিদিগকে "ভুখার" বলা যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, গ্রীকগণের পর তুরেনীয়ান্ (তুরস্ক) সিথিয়াম, শক, হুন, ও সত্রপাদি অনার্য্যজাতি খ্রীঃ পূঃ ১ ম ও খ্রীঃ ১ ম শতাব্দী হইতে খ্রীঃ ৫ ম শতাব্দী পর্য্যন্ত পশ্চিম ভারতে রাজ্য বিস্তার করে। ৫৪০ খ্রী অঃ করূরের যুদ্ধে বিক্রমাদিত্য শকাদি অনার্য্য জাতিকে পরাজিত করেন।

প্রবর্ত্তিত হয় নাই; বরং ভারতে শক-জাতির অভ্যুদয়কালে শকজাতীয় নৃপতি বিশেষের দ্বারা ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

শকজাতির ভারতাক্রমণ নূতন ঘটনা নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারত-বর্ষকে মধ্য এসিয়াবাসী ভ্রমণকারী শক (তাতার) জাতির আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে। মহাভারতে দেখা যায়, নকুল পশ্চিম দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলে, তাঁহাকে পঞ্জাবের পশ্চিম প্রান্তস্থিত শক (Scythian), পহ্লব (Parthians) (১) ও কিরাতাদি (২) অনার্য্য জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। (৩) রামায়ণেও শক জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তখনও তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে নাই। তখন তাহারা ভারতের প্রান্তভাগে—হিমালয়াদি পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিত। সীতান্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ কালে, বানরপতি সুগ্রীব পূর্ব্ব, দক্ষিণ, ও পশ্চিমদিক্-গামী বানর বৃন্দকে যে ভৌগোলিক বিবরণ বলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে শক জাতির উল্লেখ নাই। কিন্তু শতবলকে উত্তরদিকে যাইতে আদেশ করিয়া তিনি যেরূপ ভৌগোলিক বৃত্তান্ত বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে শক জাতি তৎকালে হিমালয়াদি প্রদেশে বাস করিত, বোধ হয় (৪)। সুতরাং রামায়ণের সময়ের অনেক পরে ও মহাভারতের সময়ের অনেক পূর্ব্বে শক জাতি ভারতে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল।

শকজাতি বহুবিধ শাখায় বিভক্ত ছিল। শকজাতির শাখাবিশেষ পুরাণাদিতে নাগ-বংশ নামে অভিহিত ও বর্ণিত হইয়াছে, বোধ হয়। মহাত্মা দিয়োদোরস্ (৪৪ পূঃ খ্রীঃ) শকজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকটিত করিয়াছেন, পুরাণবর্ণিত নাগোৎপত্তির বিবরণের সহিত তাহার অনেকাংশ ঐক্য দৃষ্ট হয়। তৎপ্রকটিত বিবরণানুসারে "টিলা" নাম্নী অর্দ্ধমানুষী ও অর্দ্ধসর্পরূপিণী জনৈক রমণীর গর্ভে শকদিগের উৎপত্তি হয়। এই অদ্ভুত রমণী পৃথিবীর দুহিতা ছিলেন। জুপিটার তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া তদ্গর্ভে শীথেশ নামক একটী পুত্র উৎপাদন করেন। শীথেশের সন্তান সন্ততিগণ সিথীয়ান্ নামে অভিহিত হন। আরক্সেশ (সীহুন নদী) নদের বিশাল তীরভূমিই শকদিগের আদিম আবাস স্থান। সে যাহা হউক, কালক্রমে সিথীয়ান্ জাতি এতদূর প্রবল হইয়া উঠে যে, তাহারা স্বীয় ভূজবলে এসিরীয়া ও

(১) পহ্লব—অপর নাম পারদ। ভারত-বর্ষ ও পারস্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ইহাদের বাসস্থান।

(২) বর্ত্তমান কিরান্তি জাতি। প্রাচীন কালে গঙ্গার বদ্বীপ পর্য্যন্ত ইহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে ইহারা নেপাল রাজের অধীনে সামান্য প্রজার ন্যায় বাস করে। এই জাতির বিস্তারিত বিবরণ "The Wild Tribes of India" নামক গ্রন্থে (pp 135-37) দ্রষ্টব্য। গ্রীক ইতিহাসবেত্তা এরিয়ান (১৪০ খ্রী.) এই জাতিকে কিরাডি (Kirrhadoe) টলেমী কিরাদিয়া (Kirra-dia) ও মেগেস্থিনিস্ স্কিরিতাই (Skyritai) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(৩) Indo-Aryan. Vol. p.p. 12 By Late R. L. Mittra.

(৪) কাম্বোজযবনাংশ্চৈব শকানাং পত্তনানিচ। অন্বীক্ষ্য বরদাংশ্চৈব হিমবন্তং বিচিন্বথ॥ কিষ্কিন্ধা—৪৩ সর্গ।

মীডিয়া (১) রাজ্য অধিকার করে। শীগেশের রোপিত বিশাল বংশতরু হইতে অনেকগুলি রাজবংশ সমুদ্ভূত হয় (২) শকজাতি বর্ত্তমান স্বাধীনতাহার ও চীন-তাতারে বাস করিত। বর্ত্তমান কালের তাতার জাতিই প্রাচীন শকজাতি।

শক, শকি (Sacœ) বা সীথীয় জাতির আদিম বাসভূমির নাম শাকদ্বীপ (Scythia); গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ইহাকে শাকতাই ও সীথীয়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। পুরাণে ইহা জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণের এই বর্ণনা অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান কালের চীনতাতার, স্বাধীন তাতার ও সাইবীরিয়ার দক্ষিণাংশ প্রভৃতি কাশ্যপ হ্রদের পূর্ব্বভাগস্থিত সমুদায় প্রদেশ পুরাকালে সীথীয়া (Scythia) নামে পরিচিত ছিল। (৩) মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, শাকদ্বীপে যে সকল নদ নদী আছে, তাহার মধ্যে একটীর নাম "ইক্ষুস্" (ইক্ষুঃ) নদী

(১) পারস্যের উত্তরে ও কাশ্যপ হ্রদের দক্ষিণে মীডিয়া রাজ্য এবং মীডিয়া ও পারস্যের পশ্চিমে আসিরীয়া রাজ্য অবস্থিত ছিল।

(2) Tod's Rajasthan, vol 1, p.p. 62

(৩) ইহা ষ্ট্রাবোর মত। ঐতিহাসিক জষ্টীন্ (৫০ পূঃ খ্রীঃ) এর মতে কৃষ্ণ সমুদ্র (Black Sea) সীথীয়ার পশ্চিম সীমা ছিল। কিন্তু লেম্প্রীয়ার সাহেবের মতানুসারে "Sythia comprehended the modern kingdoms of Tartary, Russia in Asia, Siberia, Moscovy, the Cremea, Poland, part of Hungary, Luthuania the northern parts of Germany, Sweden, Norway etc." Lemprier's Classical Dictionary. p.p. 614.

(১)। সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ষ্ট্রাবো (২০ খ্রীঃ পূঃ অঃ) বলেন, যে, সীথীয়া প্রদেশের নদী সমূহের মধ্যে "অক্ষুস্" (Oxus) একটী প্রধান। "ইক্ষুস্" শব্দের অপভ্রংশে যে "অক্ষুস্" নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এদিকে মহাভারতে দেখা যাইতেছে যে, ইক্ষু, (বা ইক্ষুমতী) নদীতীরে ও উত্তর কুরুতে (চীনতাতারের উত্তরাংশে) নাগগণ বাস করিতেন। (২) আবার নাগগণের ও শকগণের উৎপত্তি বিষয়ক আখ্যায়িকায়ও পরস্পর অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, শকজাতির শাখা বিশেষ পুরাণে নাগনামে অভিহিত ও বর্ণিত হইয়াছে।

নাগ শব্দের অভিধানিক অর্থ—ক্রূরাচারী বনচর মনুষ্য; সর্পাকৃতি লাঙ্গুল বিশিষ্ট মনুষ্যাকার জীব বিশেষ। (শব্দকল্পদ্রুম নাগশব্দ দেখ) তাহাদের এই সর্পাকৃতি লাঙ্গুলকল্পনা রূপক মাত্র। শকগণের জাতীয় পতাকায় বোধ হয়, সর্পচিহ্ন অঙ্কিত থাকিত এবং তাহারা সর্পচিহ্ন বিশিষ্ট ও বিষসংযুক্ত অস্ত্রাদি ব্যবহার করিত বলিয়া পুরাণে স্থানে স্থানে রূপকচ্ছলে তাহাদিগকে নাগ বলা হইয়াছে। (৩) নাগ (শক)

(১) "ইক্ষুশ্চ পঞ্চমী জ্ঞেয়া তথৈবচ পুনঃ কস্থ।" মৎস্যপুরাণ।

(২) মহাভারত, আদিপর্ব্ব ৩য় অধ্যায়।

(৩) এক্ষণে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই নাগগণ যদি শকজাতির একটী শাখা হইত, তাহা হইলে পুরাণে স্থানে স্থানে তাহাদিগকে সর্প, পন্নগ, ভুজঙ্গ, ফণীধর, প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে কেন? উত্তর—একটু ধীরভাবে

জাতির সহিত সময়ে সময়ে আর্য্যদিগের ভয়ানক যুদ্ধ হইত। আবার উভয় জাতির মধ্যে আদান প্রদানও প্রচলিত ছিল, দেখা যায় (১) আদিপর্ব্বের পৌষ্যপর্ব্বাধ্যায়ে নাগগণের যে স্তব আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তৎকালে, অমরলোকে অর্থাৎ উত্তর কুরুতে (চীনতারের উত্তরাংশে) ও ইক্ষুমতী নদী তীরে (oxus) কতকগুলি নাগ (শক) বাস করিত, তাহারা অত্যন্ত যুদ্ধপটু ছিল। পর্ব্বতগুহায় কতকগুলি, গঙ্গার উত্তরকূলে (হরিদ্বারের নিকট) কতকগুলি, খাণ্ডবপ্রস্থে ও কুরুক্ষেত্রে কতকগুলি এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে কতকগুলি নাগ (শক) বাস করিত। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের পূর্ব্বে ভারতের মধ্যভাগে নাগগণের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিলনা। তাঁহার পরে, তাহারা ক্রমে প্রবল হইয়া ভারতের মধ্যভাগস্থিত কোনও কোনও রাজ্য অধিকার করিয়া আপনারা শাসন করিত। গরুড় পুরাণাদি মহাভারতের পরবর্ত্তী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে শক জাতি ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম দিকেও বসতি বিস্তার করিয়া ছিল, যথা—

"অম্বষ্ট দ্রাবিড়ালাটাঃ কম্বোজাঃস্ত্রীমুখাঃ শকাঃ
আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়া দক্ষিণ পশ্চিমে।" (১)

গরুড়পুরাণ—পূঃ খণ্ড—৫৫ শ অঃ

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত শক জাতির আক্রমণে যেরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিল, অতি পূর্ব্ব কালেও সময়ে সময়ে সেইরূপ উৎপীড়িত হইত।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সহিত অর্থবাদ ও অলঙ্কারবাদ দিয়া পুরাণাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাণের মৌলিকস্তরে শকজাতির শাখা বিশেষকে রূপকচ্ছলে কেবল মাত্র নাগ (পূর্ব্বোক্ত আভিধানিক অর্থে) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী লেখকগণ ও স্বার্থপর প্রক্ষিপ্তকারগণ, এই রূপকের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে না পারিয়া, স্বীয় স্বীয় কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতে গিয়া অথবা কারিগিরী ফলাইতে গিয়া নাগ (শক) গণকে সরীসৃপ জাতীয় করিয়া ফেলিয়াছেন!

(১) যেমন অর্জ্জুনের সহিত নাগকন্যা উলুপীর হরিদ্বারে বিবাহ। বাসুকি * নাগের ভগিনীর সহিত জরৎকারুর বিবাহ। নাগগণের মধ্যে কেহ কেহ অতিশয় ধার্ম্মিক ও সৎকর্ম্মপরায়ণও ছিলেন।

* অনেকের ধারণা, এই পৃথিবী বাসুকি নাগের মস্তকে অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। অনেকে আবার বাসুকি ও শেষকে এক বা অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ ভুল। পুরাণানুসারে পৃথিবী শেষনাগের মস্তকের উপর রহিয়াছে। এই শেষনাগ কি, নবজীবনে চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। (নবজীবন, প্রথম বর্ষ)

(১) কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত মহাভারতের রাজকীয় সংস্করণের ২৯ পৃঃ নাগজাতি সম্বন্ধীয় সুদীর্ঘ টিপ্পনিতে এবিষয় আরও বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে তাহারই সারাংশ পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

সংস্কার ও সামঞ্জস্য। *

সংসারে সকল বস্তুরই, পুরাতন হইলে, সংস্কারের প্রয়োজন হয়;—সংস্কারের গুণে পুরাতন ও নূতন শ্রী-সংযুক্ত হইয়া অধিকারীর সম্যক্‌রূপে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া থাকে। নূতন ক্রয় করিবার উপযোগী যথেষ্ট অর্থাগম সত্বে মহা ধনশালী ব্যক্তিও পৈতৃক পুরাতন দ্রব্যটী অশ্রদ্ধার সহিত একেবারে দূরে নিক্ষেপ করেন না—সংস্কারের দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয়তা সাধন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, পুরাতনের এমনই গুণ ও আকর্ষণী শক্তি যে, তাহা নষ্ট করিতে কোন মতেই ইচ্ছা হয় না; ফলেও পুরাতনের দ্বারা উদ্দেশ্য টুকু যে পরিমাণে সাধিত হইত, নূতনের দ্বারা সকল সময়ে, সে উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় সম্পন্ন হয় না। আমরা দীনাদপি দীন—ধনীর কথায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই; সংস্কার বলে পুরাতনটী কার্য্যোপযোগী করিতে পারিলে আর আমরা কোন মতেই নূতনের চেষ্টায় ফিরি না। অতএব, নূতন অপেক্ষা সংস্কৃতই আমাদিগের পক্ষে অধিক আদরণীয়।

আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজে এই সংস্কারের আন্দোলন কিন্তু কিছু অধিকমাত্রায় বাড়িয়াছে। আমাদিগের বহু পুরাতন সমাজ কাল সহকারে অবশ্যই কিছু বিমলিন হইয়াছে, এবং আবশ্যক মত তাহার সংস্কার সাধন করাও অযথা কার্য্য নহে। কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা পুরাতনকে অক্ষত ও অভ্রান্ত ভাবিয়া তাহাতেই চিরসংসক্ত থাকিতে ভাল বাসেন। নূতন অপেক্ষা পুরাতন যে, অনেক স্থলে, অধিকতর ফলোপধায়ক, তাহাতে সন্দেহ কি?—কিন্তু যত অমূল্য ও উপাদেয় পদার্থই হউক না, যত সুদৃঢ় ভাবেই কোন কার্য্যের ভিত্তি স্থাপিত হউক না, কালসহকারে তাহাতে যে আবর্জ্জনা জড়িত হয়, সে ভিত্তিও শ্লথ হইয়া পড়ে—একথা বিশ্বাস না করিলে ইতিহাসের অনাদর করা হয়। সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে সমাজ যে নিয়মে, যে উপাদানে বা যে উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা যে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা হইতে একপদ স্খলিত হইলে যে আর পরিত্রাণের আশা থাকিবে না—এরূপ শিক্ষা ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব বোধ হয় না। অতএব, বর্ত্তমানের প্রয়োজনানুসারে পুরাতনের কিয়ৎপরিমাণে সংস্কার সাধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সংস্কারের পথেও নানা ব্যাঘাত। সংস্কারক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই অমিতব্যয়িতা সংশ্লিষ্ট ঐশ্বর্য্যমদে গর্ব্বিত; পুরাতনটায় তাঁহাদিগের আদৌ রুচি নাই,—নূতন সংগ্রহোপযোগী যথেষ্ট সঙ্গতি না থাকা সত্বেও তাঁহারা একেবারে আমূল পরি-

---

* ১২৯৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে তদানীন্তন প্রকাশিত ক্ষুদ্রকায় মাসিক পত্রিকা "আদরিণী"র মধ্যে "স্থিতিবাদ ও উন্নতিবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রস্তাবের সূচনা হয়। কালসহকারে উক্ত পত্রিকার অকালবিয়োগ ঘটায় এ প্রস্তাব পুনরুত্থাপিত করার সুযোগ ঘটে নাই। উপস্থিত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে তাহারই পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বঙ্গীয় পাঠক ও সমাজসংস্কারকগণ আমাদিগের এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

বর্ত্তনের পক্ষপাতী। আবার কেহ কেহ নিকর্ম্মা—অন্য কাজ না থাকায় সমাজ-সংস্কার ব্যাপারটাই একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহারা ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া অপ্রয়োজনীয় অংশেরও সংস্কার সাধনে সচেষ্ট—অক্ষত স্থানের সংস্কার করিতে গিয়া, অনেক সময়, উপকার সাধন করা দূরে থাকুক, বিষম প্রমাদ ঘটাইয়া বসেন। আবার কেহ বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ছিদ্রস্থলে ছত্রধারণ না করিয়া আপনারাও ক্লেদসিক্ত হয়েন, সমগ্র সমাজটাও ছিদ্রময় বলিয়া বাতুলের ন্যায় ধুয়া তুলিয়া বেড়ান।

সংস্কারের এইরূপ আন্দোলন ও আস্ফালনের পূর্ব্বে বুঝা উচিত—প্রয়োজনই কার্য্যের মূলসূত্র এবং উদ্দেশ্য সাধনই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। বিনা অভাবে কার্য্যের অবতারণ করা সময় ও পরিশ্রমের অসদ্ব্যবহার মাত্র; আবার প্রকৃত অভাবের সময় সেই অভাব পূরণোপযোগী উপকরণ নির্ণয় না করিয়া ভ্রান্তভাবে তাহার অনুসরণ করাও ততোধিক অকিঞ্চিৎকর। যাঁহারা প্রকৃত সমাজ-হিতৈষী, তাঁহাদিগের পক্ষে সমাজের কোন্ বিষয়ের যথার্থ অভাব, সে অভাব মোচনের সুসঙ্গত উপকরণ কি, এবং সে উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত কোন্ পথ অবলম্বনীয়—এই সকল বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিয়া সংস্কার ব্রতে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য। সমাজের অবস্থোপযোগী সামঞ্জস্য বিনা সংস্কার কার্য্যে রত হওয়া সমাজবিপ্লবেরই কারণ হইয়া উঠে, এবং যিনি সে কার্য্যে রত হয়েন, তিনি সমাজসংস্কারক হইলেও, সমাজের পরম শত্রু। সমাজের যে অংশ শিথিল বা ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, পুরাতনের প্রতি অযথা অনুরাগভরে তাহার সংস্কারে বিমুখ থাকা যেরূপ ভ্রান্তি, সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সেই সকল অংশের সংস্কারে ব্যাপৃত হওয়াও ততোধিক বিড়ম্বনা।

সামাজিক কয়েকটী বিষয় লইয়া আমরা এই সংস্কার ও সামঞ্জস্যের মাত্রা নির্দ্ধারণ করিতে ইচ্ছা করি। এরূপ গুরুতর সমস্যায় হস্তক্ষেপ করা আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতা; তবে জাতীয় চরিত্রের উন্নতিবিধান প্রসঙ্গালোচনায় সকলেরই ন্যূনাধিক অধিকার আছে, সেই সাহসে এ সম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য দুই-চারি কথায় বলিতে ইচ্ছা করি। আমরা দুই নৌকায় পা দিতেছি—শ্যামও ছাড়িতেছি, কুলও রাখিতে পারিতেছি না; এরূপ অবস্থায় উভয় পক্ষ হইতেই অজস্র গালিবর্ষণ হইবে—ইহাও বুঝি; কিন্তু স্বদেশের, স্বীয় সমাজের মঙ্গল কামনায় মনোগত সত্যভাব প্রকাশ করিয়া সে গালিবহনেও আমরা ক্ষুব্ধ হইব না। কোন উদ্ভট উদ্ভাবনা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে;—সমাজকে শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতাও আমাদিগের নাই;—তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা এবং সহৃদয় ব্যক্তিগণের সৎপরামর্শ লাভ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য;—শিক্ষা দিবার ছলে কেহ আমাদিগের কথার প্রতিবাদ করেন, অবনত মস্তকে তাহা শুনিতে আমরা প্রস্তুত।

স্ত্রী-শিক্ষা।—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"—এই শ্লোকার্দ্ধের ধুয়া ধরিয়া, আজকাল অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। পুত্র কন্যা জনক-জননীর সমান স্নেহের পাত্র—বিশ্ব-সৃষ্টির একই নিয়মে প্রসূত। পুত্রের পালন ও শিক্ষার জন্য পিতামাতা যে পরিমাণে প্রয়াস পাইয়া

থাকেন, কন্যার পালন ও শিক্ষার জন্যও যে সেই পরিমাণে যত্ন করিবেন—তদ্বিষয়ে সংশয় কি? পুত্র কন্যার মধ্যে স্নেহ-যত্ন বা মায়া-মমতার পার্থক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন—এমন পিতা-মাতা সংসারে বিরল। বঙ্গীয় সমাজে পুত্রের জন্মাপেক্ষা কন্যার জন্মে কোন কোন পিতামাতার আনন্দের মাত্রা কতক পরিমাণে কম দেখিতে পাওয়া যায় বটে। সে নিরানন্দের হেতু নির্ণয় করা দুরূহ নহে; কন্যাভার বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে বড়ই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সৎপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে গিয়া অনেক পিতাকে পৈতৃক "বাস্তু" খানি পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে হয়। এরূপ অবস্থায় কন্যার জন্মেই অসচ্ছল পিতামাতার অন্তরে তাহাকে পাত্রসাৎ করার ভবিষ্যচ্চিন্তা উদিত হইয়া দারুণ ভীতিসঞ্চার করে, এবং তন্নিবন্ধন সন্তানোৎপত্তিজনিত আনন্দের বেগ শ্লথ হইয়া পড়ে। কিন্তু, তাই বলিয়া, কন্যার প্রতি পিতামাতার আন্তরিক স্নেহের ভাব কখনই বিলুপ্ত বা বিমলিন হয় না। তবে অভিযোগের বিষয় কি?—অভিযোগ এই যে, পিতা পুত্রকে যে মাত্রায় শিক্ষা দান করেন, কন্যাকে সেই মাত্রায় শিক্ষিতা করেন না। একথার যাথার্থ্য অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষা শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। উপদেশার্থক "শিক্ষ" ধাতু হইতে শিক্ষা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; বস্তুতঃ উপদেশ দেওয়াই শিক্ষা শব্দের মৌলিক অর্থ এবং উপদিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান উদ্দীপন করাই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কি পুত্র, কি কন্যা—সন্তানের হৃদয়ে এই জ্ঞানোদ্দীপক শিক্ষাদান রূপ অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্মে কি কোন পিতা বা অভিভাবক একেবারে উদাসীন?—তাহা কখনই হইতে পারেনা। বরং প্রত্যেক পিতাই আপনাপন সন্তানকে সমাজের ব্যবহারোপযোগী বিষয়ে সাধ্যানুরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন—ইহাই সভ্যসমাজের ধারাবাহিক নিয়ম।

এ কথায় এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। উপরে যেরূপ শিক্ষার আভাস দেওয়া গেল, তাহা কার্য্যতঃ অর্থকরী শিক্ষা, জ্ঞানকরী নহে। প্রত্যেক কার্য্যের অভিজ্ঞতাই জ্ঞানপদবাচ্য হইলেও, এখানে জ্ঞানের কিছু প্রকৃষ্ট ভাব গ্রহণ করা যাইতেছে। অভিযোগকারীরা বলিতে পারেন, অক্ষরশিক্ষা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অধ্যয়নাদি ব্যতিরেকে মনুষ্যের প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ হয় না। বিদ্যাশিক্ষা ভিন্ন যে জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ লাভ হয় না, তৎপক্ষে সংশয় কি? কিন্তু এরূপ প্রস্তাবে দুই কথা উঠিতে পারে।—প্রথম, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি কালি যে ভাবে অক্ষরশিক্ষা করিতেছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে অর্থকরী না জ্ঞানকরী; দ্বিতীয়, বাস্তবিক অক্ষরশিক্ষা বিনা জ্ঞানলাভ একেবারে অসম্ভব কি না। মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য যাহা—তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভই আমাদিগের প্রকৃষ্ট জ্ঞান বুঝিতে হইবে; অতএব, ধর্ম্ম ও নীতিই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং চরিত্র সংগঠনই তাহার অন্যতম অঙ্গ। বস্তুতঃ যে শিক্ষায় ধর্ম্মে আস্থা নাই, বা নীতিপথে রুচি নাই, যে শিক্ষায় চরিত্রের বিকাশ দেখিতে না পাই, সে শিক্ষা লাভ করা অপেক্ষা আজীবন গণ্ডমূর্খ থাকাও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে কি সেই ধর্ম্ম ও নীতি বা চরিত্রসংগঠন শিক্ষা হইতেছে? আজকাল অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অক্ষর বিদ্যায়

অসাধারণ বিশারদ হইতেছেন, কিন্তু তন্মধ্যে সচ্চরিত্রের নিদর্শন বা নৈতিক উন্নতি কতটুকু লক্ষিত হয়? সমাজতত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন,—মাদকের মত্ততা, অহং-জ্ঞানের দাম্ভিকতা, গুরুজনে অভক্তি প্রভৃতি নীতিধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যও ঐ সকল ক্ষেত্রে নিতান্ত বিরল নহে। ইহার প্রধান কারণ, নীতি শিক্ষা দেওয়া, আমাদিগের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যই নহে; * মহামতি কটন সাহেব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, শিক্ষা-বিভাগের অধ্যাপকেরা আপনাপন 'চাকরি বাজাইয়া' চলিয়া যান,—বিদ্যার্থীর অন্তরে নীতিশিক্ষা দেওয়া, তাহাদিগের চরিত্রসংগঠন করা বা তাহাদিগের কুবৃত্তি সকল দমন করার পক্ষে আদৌ চেষ্টা করেন না। † তবেই দেখা যাইতেছে যে, অক্ষরশিক্ষার সর্ব্বোচ্চমন্দিরেও জ্ঞানকরী শিক্ষা হইতেছে না। প্রত্যুত, সে শিক্ষা অর্থকরী ভিন্ন আর কিছুই নহে—কিসে উকিল হাকিম হইব, কিসে ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারী করিব, কিছু না মিলে ত—কিসে অন্ততঃ মাষ্টারী বা অধমতারণ কেরাণিগিরি করিয়া খাইব, বিদ্যালয় হইতে বাহির হওয়ার পর প্রত্যেকেরই উহাই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। অধিক কি, শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং চন্দ্রমুখী বসুও অক্ষরশিক্ষা শেষ করিয়াই অর্থোপার্জ্জনের জন্য এক একটা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বসিলেন।

পক্ষান্তরে, অক্ষরশিক্ষা ব্যতিরেকেও ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান লাভ করিতে দেখা যায়;—স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়, ভক্ত-চূড়ামণি রামপ্রসাদ সেন, প্রভৃতি মহাত্মারা অক্ষরশিক্ষায় অশিক্ষিত ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু তাঁহাদিগের ন্যায় জ্ঞানী মনস্বী ও ভক্ত আজিকার দিনে অক্ষরবিদ্যাবিশারদদিগের মধ্যে কয়টা দেখিতে পাওয়া যায়? আর এখনও যে এইরূপ অনেক নিরক্ষর পরমহংস ও ভক্ত-প্রবর বিদ্যমান নাই—কে বলিতে পারে?

এতদ্দ্বারা দেখা গেল, অক্ষর শিক্ষাই শিক্ষার চরমোৎকর্ষ নহে; বরং আজি কালিকার অক্ষরশিক্ষা সর্ব্বাংশে জ্ঞানকরী না হইয়া অর্থকরীই হইয়া থাকে। এখন অভি-যোগের মূলে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক,—পুত্রবৎ কন্যার শিক্ষাসাধনে পিতামাতা কি পরিণামে নিশ্চেষ্ট, এখন তাহারই আলো-চনা করা যাউক। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, পুত্রের অক্ষরশিক্ষা পক্ষে পিতা যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কন্যাকে সে পরিমাণে, কেহ কেহ আদৌ, অক্ষর শিক্ষায় শিক্ষিতা করেন না—তাহার শিক্ষার জন্য পৃথক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবহারে পিতা যথা-কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী করেন কি না—এখন তাহাই বিবেচ্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রয়োজনই কার্য্যের মূলসূত্র এবং উদ্দেশ্য সাধনই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। কন্যাকে অক্ষর শিক্ষা দানের প্রয়োজন কি এবং তদ্দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে—তাহা একবার চিন্তা করা উচিত। পুত্রকে ঐরূপ শিক্ষা দিয়া পিতা তাহার উপার্জ্জনের পথ প্রসারিত করিয়া দেন,—জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে

*নীতিশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃ-পক্ষীয়গণের সম্প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি পড়িয়াছে। উহা কতদূর কার্য্যে পরিণত হয়, এবং তদ্দ্বারা কিরূপ ফল দর্শে, দেখিবার নিমিত্ত আমরা উদ্গ্রীব হইয়া আছি।

† Cotton's "New India"—Pop. Ed. p-p-146.

সে কিরূপে সচ্ছন্দতা, সুতরাং সম্ভ্রমের সহিত চলিতে পারিবে—তাহারই প্রকৃষ্ট অবলম্বন স্থির করিয়া দেন। অক্ষর শিক্ষা দ্বারা তাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি যে আদৌ পরিচালিত হয় না—আমরা এমন কথা বলিতেছি না, বরং জ্ঞানোপার্জ্জনের সহায়তা সাধন পক্ষে উক্ত শিক্ষাও অন্যতম উপকরণ; কিন্তু সে বৃত্তি পরিচালনের জন্য শিক্ষার পৃথক্ প্রকরণ অবলম্বন করিতে হয়—বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষায় তাহা সংসাধিত হয় না। অর্থকরী শিক্ষা কন্যার পক্ষে একবারে নিষ্প্রয়োজন; আমাদিগের সমাজে স্ত্রীজাতি উপার্জ্জন করিয়া পুরুষের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবে—এরূপ অবস্থা কখন হয় নাই, সংস্কারের সম্যক্ স্ফূর্ত্তিতেও সে অবস্থা কখন দাঁড়াইবে—এরূপ বোধ হয় না। অতএব, কন্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ভূষণে ভূষিতা না করায়, বা তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়িক পদ্ধতিতে আদৌ শিক্ষা না দেওয়ায়, পিতা-মাতার কর্ত্তব্য-পালন-পক্ষে কোনরূপ প্রত্যবায় ঘটিতে পারে না।

সাংসারিক জীবনে পুরুষের পক্ষে অর্থোপার্জ্জন যেরূপ প্রয়োজনীয়, স্ত্রীজাতির পক্ষে গৃহ ধর্ম্ম প্রতিপালন সেইরূপ বা ততোধিক আবশ্যক। পুরুষ ভূতগত পরিশ্রম পূর্ব্বক সংসারোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, স্ত্রী যদি তাহা সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণ বা সামঞ্জস্যের সহিত সদ্ব্যয় না করেন, তবে সংসারের শুভ কোথা? বস্তুতঃ, বাহিরের ব্যাপারে পুরুষের যাদৃশ তত্ত্বাবধারণ করা কর্ত্তব্য, গৃহের সৌকর্য্য সাধন রমণীর পক্ষে তাদৃশ চিন্তার বিষয়। শ্বশুর ভাশুরে ভক্তি, ননদ ভাযে প্রীতি, শাশুড়ীর পরিচর্য্যা, রোগীর রুগ্ন শয্যা, ক্ষুধিতে অন্নদান, নিপীড়িতের শান্তিবিধান, কাতরে দয়া, সন্তানে মায়া, অতিথির সৎকার, আশ্রিতে সদাচার, প্রভৃতি বঙ্গগৃহ-মহিলার অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম; আবার গৃহ-পশুর সেবায়, পাচিকার পাকশালায়, নারায়ণের মন্দিরে, * প্রাণপতির বিলাসপুরে, তাঁহার সমান তত্ত্বাবধারণ আবশ্যক। একাধারে যে স্ত্রীচরিত্রে এই সমস্ত গুণের সমাবেশ, তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপা, তাঁহার সংসর্গে সংসার শান্তির বৈকুণ্ঠধাম। আজ কাল বিশ্ববিদ্যালয়িক উচ্চ শিক্ষা বা কুশিক্ষার (?) দোষে এই সমস্ত মোহন চিত্র আমরা দেখিতে পাই না। আজ কাল রমণী কর্ত্তা, পুরুষ তাঁহার সহচর বা ক্রীড়নক। বিবাহ-বিভ্রাটের বিলাসিনীর চিত্র যতই অতিরঞ্জিত হউক, উচ্চশিক্ষিতা মহিলা মহলে সেইরূপ চরিত্রের আভা আমরা অনেক স্থলে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। তাঁহারা বুট-মোজা-পরিহিতা, কামিজ-শেমিজ-সংবৃতা, বিলাসিতাময় বিকচ মূর্ত্তিতে বহির্জগতের বৈষয়িক ব্যাপারে বাহির হ'ন,—সাংসারিক সুশৃঙ্খলার ভার ভৃত্য-বর্গের উপরেই বিন্যস্ত হইয়া থাকে; বাস্তবিক বিদ্যাবলে তাঁহাদিগের মানসিক বৃত্তি মহত্তর পথে প্রধাবিত হওয়ায়, সাংসারিক জঞ্জাল তাঁহাদের মনোমধ্যে স্থান পায় না, গৃহস্থালীর কার্য্য তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত বলিয়া বোধ হয়। অশেষ দাস-দাসী-পরিবৃত ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ব্যবহার কোন বিঘ্নোৎপাদন না করিতে পারে; কিন্তু গরিব গৃহস্থের পক্ষে গৃহিণীর গৃহকার্য্যে এইরূপ উপেক্ষিত

* ব্রাহ্মবন্ধুগণ এস্থলে "উপাসনা বা সমাজ-মন্দিরে" এরূপ পাঠান্তর করিতে পারেন।

ভাব নিতান্তই নিগ্রহের কারণ হইয়া উঠে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, 'গরিব' লইয়াই সমাজের মূল ভাগ সংগঠিত; অতএব, গরিবের গৃহ-বিশৃঙ্খলা সমাজ-বিধ্বংসেরই কারণ হইয়া থাকে। সহৃদয় সাম্যবাদিগণ বলিতে পারেন যে, যখন স্ত্রী ও পুরুষের জ্ঞানান্বেষণী বৃত্তি প্রায়ই একরূপ, তখন পুরুষকে শিক্ষিত করিয়া, স্ত্রীজাতিকে সেইরূপ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখা নিতান্ত পক্ষপাতের পরিচয়। স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য যদি তাঁহারা নাও স্বীকার করেন, তথাপি উভয়কে একই লক্ষ্যে ধাবিত করা যে সমাজের পক্ষেও পরম অমঙ্গলকর—ইহা তাঁহাদিগের সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য; তাঁহাদিগের বুঝা উচিত, পুরুষ ও রমণীর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ব্যতিরেকে সংসারের বন্ধনী দৃঢ় হইতে পারে না;—আপন আপন কর্ত্তব্য পথ অনুসরণ করা ভিন্ন কর্ম্মের পূর্ণতা সম্পাদিত হয় না,—একের কর্ম্ম অন্যের দ্বারা সাধিত হইলে অনেক স্থলেই তাহা বিকৃত হইয়া পড়ে। গৃহিণীর মুখে বিজ্ঞানের দু'টা কূটতর্ক, গীতিকাব্যের একটু ছন্দোলালিত্য বা বক্তৃতার ঈষৎ বচন-ছটা শুনিয়া সংসারের কি উপকার সাধিত হয়, আমরা বুঝিতে পারি না; কিন্তু তাঁহার হস্তে সন্তানের যথারীতি লালন-পালন, বৃদ্ধা জননীর উচিতমত সেবা-শুশ্রূষা, গৃহাঙ্গণের সুন্দর অঙ্গসৌষ্টব, বা আহারোপযোগী রুচিকর অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সম্পন্ন হইলে, দরিদ্রের সংসারে যে নিরাবিল শান্তিসুখ উপভোগ করা যায়, ইহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। বস্তুতঃ, গার্হস্থ্য সুখ-সচ্ছন্দতার উৎকর্ষ সাধন করাই স্ত্রীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষণীয় সামগ্রী;—স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী পাশ্চাত্য চিন্তাশীল লেখক Sydney Smith ও ভিন্ন ভাষায় এই মর্ম্মই প্রকাশ করিয়াছেন;—তিনি বলিয়াছেন—

"The great use of her knowledge will be that it contributes to her private happiness."*

এতদ্দ্বারা দেখা গেল যে, পুরুষ ও রমণীর শিক্ষা প্রণালী একই প্রকারে সংসাধিত হইলে, সমাজের উন্নতি না ঘটিয়া সমাজ-বিপ্লবের হেতু হইয়া উঠে; সুতরাং সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন পক্ষে পুরুষের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষা এবং রমণীর জন্য গৃহস্থালী শিক্ষাই বিধেয়। পুরুষের শিক্ষা প্রকরণ যে স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রযুজ্য নহে, এতৎসম্বন্ধে আমরা আর একটী কারণের উল্লেখ করিব। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি কঠোর চর্চ্চা যাহা পুরুষ সচরাচর করিয়া থাকেন, তাহাতে বিশেষ চিন্তাশীলতার প্রয়োজন; ঐ সকল বিষয় অনুশীলন করিতে হইলে স্ত্রীজাতিরও ততোধিক না হউক, তৎপরিমাণে চিন্তাশীল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে "মানসিক পরিশ্রম করিতে হইলে, স্ত্রীজাতির নৈসর্গিক ধর্ম্ম [illegible]নের ব্যাঘাত ঘটে।" আজ কাল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মত ভিন্ন কোন কথাই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের যোগ্য নহে; তাই উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম-প্রণেতা মনস্বী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "স্ত্রী-চরিত্র" নামক গ্রন্থে সম্প্রতি এই সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মত সংগ্রহ করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি—

"Women who exercise the mental

---

* A Paper on *Female Education* contributed to the *Edinburgh Review*.

organs severely and continually are in most cases barren, while in others they become subject to serious accidents in pregnancy, because they carry all their powers towards the brain and deprive the sexual organs of their natural energy,"*

দর্শন বিজ্ঞানাদি কঠোর শাস্ত্রানুশীলন যে স্ত্রীজাতির পক্ষে অমঙ্গলকর, ইহাপেক্ষা তৎসম্বন্ধে আর কি গুরুতর হেতু হইতে পারে? যদি সমগ্র রমণী সমাজ পুরুষের ন্যায়, ঐ সমস্ত দুরূহ বিষয়ালোচনায় নিবিষ্ট হয়েন, তবে কালক্রমে সৃষ্টি-বিপর্য্যয় ঘটা অসম্ভব নহে। অতএব, যে দিক দিয়াই দেখা যায়, পুরুষ ও রমণীর একরূপ শিক্ষা পদ্ধতি সমাজের পক্ষে শুভকর বোধ হয় না।

তবে কি স্ত্রীশিক্ষার আদৌ প্রয়োজন নাই? পূর্ব্বতন ঋষিরা যে "কন্যাদপি * * শিক্ষণীয়া" বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কি অশ্রদ্ধেয়?—কখনই নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৃহ-ধর্ম্ম-প্রতিপালন স্ত্রীজাতির শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ সামগ্রী। হিন্দু বালিকার বাল্য লীলাতেই আমরা এ শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত দেখিতে পাই; শিশু প্রাণের শিশু-খেলাইতেই সংসারের সুন্দর শৈশব চিত্র—বালিকা রাঁধিতেছে, বাড়িতেছে,—তাহার কেহ পুত্র, কেহ কন্যা, কেহ শ্বশুর, কেহ অতিথি, কেহ অভ্যাগত—সকলকে সযত্নে শাকান্ন দিয়া পরিতুষ্ট করিতেছে, কখন তাহার প্রাণপ্রিয় পুত্রস্থানীয় কাষ্ঠ পুত্তলিকাটিকে সস্নেহে চুম্বন করিতেছে,—সংসারিক জীবনের সুবিমোহন ভাব তাহার সেই ক্রীড়ারঙ্গে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িত। ইহা সাম্যোপদেশকের শাস্ত্রগত theory শিক্ষা নহে, বৈষম্যবাদী হিন্দুর জীবন্ত কর্ম্মময় practice শিক্ষা। ইহাতেও কে বলিবে, হিন্দু পিতামাতা তাঁহাদিগের কন্যাকে শিক্ষাদান করেন না? আবার তাহার বাল্যজীবনের সুবিমল কৈশোর ব্রত—তাহার "পুণ্যপুকুর পুণ্যমালা," সাত ভ্রাতার ভগিনী—সাবিত্রী সমান হইবার সাধ; তাহার সুন্দর "দশপুত্তল" রামের ন্যায় পতি, লক্ষ্মণের ন্যায় দেবর না হইবার প্রার্থনা; তাহার "কার্ত্তিকে কুমারী ব্রত," "বীরত্ব ও বীর্য্য—বিনয় ও বশ্যতা—সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তির চরম আদর্শ কুমারের অনুরূপ পুত্র পাইবার" আকাঙ্ক্ষা। ক্রীড়াচ্ছলে সরল প্রাণে এরূপ "ধর্ম্মানুষ্ঠান ও কার্য্যকুশলতা শিক্ষা" এরূপ "উচ্চ আদর্শে আত্মগঠন" শিক্ষা, হিন্দু পিতামাতা ভিন্ন অপর কে আপন কন্যাকে দান করিয়া থাকেন? আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা দিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে; কিন্তু কন্যা সন্তানকে ইহাপেক্ষা আর কি সন্নীতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, আমরা ভাবিয়া পাই না। পাশ্চত্য পণ্ডিত স্ত্রীশিক্ষার সারসংগ্রহ করিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন—

"Give to women, in early youth something to acquire, of sufficient interest and importance to command the application of their mature faculties, and to excite their perseverance in future life"*

কথাগুলি অতি সুন্দর; হিন্দু এই সূত্রে, এই প্রণালীতেই, কন্যার শিক্ষা সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহার কন্যা বাল্যশিক্ষার কার্য্যকারিতা যৌবনাবস্থায় বিলক্ষণ প্রদর্শন করে,—দরিদ্রের সংসার শান্তির বৈকুণ্ঠধামে

* Dr. Walkers on *Inter-marriage.*

* Mr. Sydney Smith on Female Education.

পরিণত করিতে তাঁহাপেক্ষা আর কে অধিকতর কৌশলী ও চেষ্টাশীল?—নিষ্কামভাবে সংসারের সুমঙ্গল সাধনে তাঁহাপেক্ষা কে পারদর্শী?—আর ভবিষ্য জীবনে সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে হিন্দুমহিলা জগতে অতুলনীয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিধবা হিন্দুনারী সংসারের সকল সুখ হইতে নির্লিপ্তা, তথাপি তিনি আপনা ভুলিয়া অকপটচিত্তে সংসার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা, আর পরলোকগত স্বামীর সত্বা ও স্বামীর স্বামী বিশ্বস্বামীর স্বরূপ ধ্যানে অনুক্ষণ তৎপরা। এ সকল কথা অলঙ্কারের ছন্দোলালিত্যময় বাক্‌চাতুর্য্য নহে—প্রত্যেক হিন্দুর অন্তঃপুরে এইরূপ স্বর্গীয় চিত্র জলন্তভাবে দেদীপ্যমান।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকাল পাশ্চত্যশিক্ষা-বিকার-গ্রস্ত পিতা বা অপর অভিভাবকগণ আপনাপন কন্যাদিগকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চরমশিক্ষায় শিক্ষিতা না করিলেও, দুই-এক বৎসরের জন্য 'গুরু-মা'র হস্তে সমর্পণ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই, ইঁহাদিগের নিকট শিক্ষা, বর্ণপরিচয়ে বা বানান নির্ণয়ে দাশরথীর পাঁচালীতে বা উদ্ভট হেঁয়ালিতে, রসের নাটকে বা নভেলের চটকে, 'প্রাণনাথ' লেখায় বা পরের পত্র দেখায় পর্য্যবসিত হয়। বাস্তবিক, এ শিক্ষার ফল অন্যবিধ হওয়া সম্ভব নহে; মহাজনোক্ত "Little learning is a dangrous thing"—এই মহাবাক্যের ফল অবশ্যম্ভাবী,—কার্যতঃও এই কুশিক্ষায় ঘোরতর অনিষ্টই সংঘটিত হইয়া থাকে। Zenana Mission-নির্গলিত একটু ইংরাজির বুক্‌নি-কাটা, একটু বিলাতী সুরে মালা গাঁথা, একটু খ্রীষ্টিয়ানী ধর্ম্ম-পুস্তকের আত্মা, কুসুম কোমল কন্যার হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে বিষবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হয়; কালক্রমে, অনেকস্থলে যে সেই বিষবৃক্ষের বিষময় ফল হইতে দরিদ্র হিন্দুসংসার জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়ে,—শান্তির বিনোদক্ষেত্র, শ্মশানের মরুস্থলীতে পরিণত হয়,—তাহা হিন্দুসমাজতত্বজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত উচ্চশিক্ষা সমাজের পক্ষে যাদৃশ অনুপযোগী, এই অল্পশিক্ষাও ততোধিক অশান্তিপ্রদ এবং অমঙ্গলকর। আমরা তাই বলি, এই উভয়বিধ শিক্ষাই বঙ্গীয় রমণীসমাজের সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। কন্যাকে মূর্খ—সর্ব্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ—রাখিওনা; তাহাকে, পুত্রের ন্যায়, যত্ন সহকারে পালন কর, শিক্ষা দাও, কিন্তু ভ্রান্তভাবে যথেচ্ছা শিক্ষা দিওনা। উপাদানে ও অধিকরণে সামঞ্জস্য রাখিয়া, হেতু ও ফল নির্ণয় করিয়া, কার্য্য ও তাহার উপযোগিতা স্থির করিয়া, সংশিক্ষা দাও আমাদিগের বিবেচনায় ইংরাজি বা অপর পাশ্চাত্য শিক্ষায় কোন প্রয়োজন নাই; পাশ্চাত্য শিক্ষাবলে পুরুষের মস্তিষ্কই অনেক স্থলে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে *, আবার দরিদ্র হিন্দুসংসারের রমণীকুলের মস্তিষ্ক সেই শিক্ষায় বিকৃত করিয়া কাজ নাই; "বাগর্থ প্রতিপত্তি"র পর, গৃহ-ধর্ম্ম-প্রতিপালন, শিশু-সন্তানের লালন-পালন, সংসারের সংস্করণ, সচ্চরিত্র সংগঠন, প্রভৃতি বিষয়ক সুখপাঠ্য পুস্তক পাঠ করাও, সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্বন্ধে কার্য্যকরী শিক্ষা (Practical training) দাও, স্ত্রী-শিক্ষার সুফল ফলিবে, "শিক্ষ-

* ১২৯৬ সনের অষ্টম সংখ্যক নব্যভারতে মাতৃভাষা প্রবন্ধে আমরা একথার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি।

ণীয়াতি যত্নতঃ”—এই মহাবাক্যের মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে। সীতা, সাবিত্রী, পতিব্রতা দময়ন্তী, ইদানীং দুর্গাবতী, প্রভৃতি সতী ও বুদ্ধিমতী মহিলাকুলের জীবন-কাহিনী পড়িতে দাও,—পূর্ব্বোল্লিখিত প্রণালীতে শিশুকাল হইতেই কন্যাদিগকে সদাচার-প্রণোদিত সদ্ব্রতে দীক্ষিতা কর, তোমার কন্যার, তোমার পরস্ত্রীর, তোমার সোহাগের স্বর্ণলতার, মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, তোমার গৃহে গৃহ-লক্ষ্মী অচলা থাকিবেন।

স্ত্রীজাতির আর একটী বিশেষ শিক্ষণীয় সামগ্রী—শিল্প। একজন রসজ্ঞ সুলেখক লিখিয়াছেন—“সুন্দরীর সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের সৃষ্টি; আর শিল্পের সৌন্দর্য্য সুন্দরীর সৃষ্টি।” বাস্তবিক, রমণী ব্যতিরেকে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি যেরূপ অপূর্ণ হইয়া পড়িত, রমণীর হস্ত-প্রসূত শিল্প ব্যতিরেকে গৃহাঙ্গনের শোভাও সেইরূপ অপূর্ণ হইয়া থাকে। এই জন্য কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন, কি সভ্য কি অসভ্য—সকল সমাজেই স্ত্রীজাতির মধ্যে ন্যূনাধিক শিল্পচর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। বালিকা বয়স হইতেই, শিল্পশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। ‘গুরুমা’র গণ্ডীর মধ্যে বা সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়ে যে শিল্প-শিক্ষা হয় না, আমরা এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু সেখানে কার্পেটের কারুকার্য্য, বা সামান্য মাত্রায় সেলাই ভিন্ন অন্যবিধ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছি—উদ্দেশ্য-বিহীন চেষ্টা এবং সিদ্ধি-শূন্য কার্য্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; কার্পেটের কমনীয়তা আপাত-মনোহর নয়নরঞ্জক হইতে পারে, কিন্তু দরিদ্রের সংসারে তদ্দারা কোন উদ্দেশ্যই সংসাধিত হয় না। ধনকুবেরদিগের কন্যারা কার্পেটের কারুকার্য্য শিখিবেন—শিখুন; কিন্তু মধ্যবিধ গৃহস্থের কন্যা যেন নিরবচ্ছিন্ন তাহাতেই কালক্ষেপ না করেন। স্বগৃহে বৃদ্ধা জননীর নিকট, পাড়ার পদ্মপিশির নিকট, দত্তদের দিগম্বরী দিদির নিকট, আলেপন-বিলেপন, ‘খয়েরের বাগান’ গঠন, জীর্ণবস্ত্রে সূচীকরণ, প্রভৃতি বঙ্গ গৃহোপযোগী যে সমস্ত সহজ শিল্প শিক্ষা করা যাইতে পারে, ‘গুরুমার’ গৌরবময় কারিগরি অপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক। আজকাল বর্ষে বর্ষে বেথুন-বিদ্যালয়ে ‘সখি’দিগের সমিতি হইয়া থাকে, শুনিয়াছি, তাহাতে কাগজের কচ্ছপ, ক্ষীরের ফুলশয্যা, মাটীর ঘর, পাথরের ছাঁচ, দড়ির শিকা, পুঁথীর পাকা, কাপড়ের ফুল, বড়ির গহনা, আলিপনার চিত্র প্রভৃতি শিল্পের সুন্দর নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়া থাকে, ‘সখি’গণ ‘সখ্’ করিয়াও যে এই সমস্ত গ্রাম্য শিল্পের অনুশীলন করিয়া থাকেন, ইহা নিরতিশয় আনন্দবর্দ্ধক। আমাদিগের কুসুম-কোমল বালিকাগণ পশমের সঙ্গে পতিত ভারতের এই সমস্ত সহজ শিল্পেও শিক্ষিতা হয়, স্ত্রী-শিক্ষা-প্রয়াসী সহৃদয় ব্যক্তিগণের তৎপক্ষে লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য। আমাদের ভদ্রাভদ্র সকল পরিবারেই মহিলাগণ স্ব স্ব গৃহে সাধ্যমত ন্যূনাধিক বস্ত্রবয়ন করিয়া থাকেন; তদ্দারা তাঁহারা ম্যাঞ্চেষ্টারের সম্মুখে সদর্পে আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন। একযোড়া কার্পেটের জুতা বা একটী কম্ফটার অপেক্ষা কি এই স্বাধীন শিল্পের মর্য্যাদা অধিক নহে? বঙ্গবালাগণকে এ মর্য্যাদার মাত্রা নির্দ্ধারণে বঞ্চিত রাখা বাতুলতার নামান্তর মাত্র।

রন্ধন, শিল্প বা বিজ্ঞান—কিসের অন্তর্ভূত, আমরা অবধারণ করিতে অক্ষম।

যাহাই হউক, উহাও যে বঙ্গমহিলার অবশ্য শিক্ষিতব্য সামগ্রী,—এ সত্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। সংস্কারক সম্প্রদায় এবং আধুনিক শিক্ষিতা সুন্দরীগণ আমাদিগের এ কথায় নিশ্চয়ই ভ্রূকুঞ্চন করিবেন। একখানি অভিনব হাস্যনাটে বিবাহার্থী বর বেচারা তাঁহার ভাবী প্রণয়িনীর বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বুঝিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি চাল্-তার অম্বল রাঁধ্‌তে পার?" কন্যার ভগিনী বিদুষী; এই লোমহর্ষণ প্রশ্নে তিনি শিহরিয়া বলিলেন—"আপনার বাবুর্চ্চীর প্রয়োজন আছে নাকি?" বর বেচারা অগত্যা বিষম বিপদগ্রস্ত। আমরাও সেই বাবুর্চ্চিগিরির বিধান দিয়া বিদুষী ভগিনীগণের বিশেষ বিরাগভাজন হইব, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিণীতা পত্নীর "পাক্ প্রণালী"তে অপরিপক্বতা নিবন্ধন কত দুর্ভাগ্য ভ্রাতাকে যে ভোজনের কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। যদি স্ত্রীশিক্ষার গুণে জীবনধারণের প্রধান উপকরণ ভোজ্য দ্রব্যের জন্যও পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়, তবে এই অধঃপতিত ভারতভূমি হইতে সে শিক্ষা যত শীঘ্র বিলুপ্ত হয়, ততই সমাজের পক্ষে শুভকর। আমাদিগের বিবেচনায়, রসনা-সুখকর রন্ধনের রীতি বাল্যকাল হইতেই কন্যাদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; আজকাল পাক-প্রণালী, পাক্‌প্রবন্ধ, পাক্-রাজেশ্বর প্রভৃতি নানাবিধ পাকের গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে- বালিকা-বিদ্যালয়ে অম্লযান যবক্ষারযানের দুই চারি কঠিন যুক্তি বুঝাইবার পরিবর্ত্তে ঐ সমস্ত গ্রন্থ পঠিত হওয়া অধিকতর উপকারী বোধ হয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের (Experiment) প্রয়োজন হইয়া থাকে; রন্ধনের রীতি শিক্ষার ভার স্বগৃহের গৃহকর্ত্রীর উপরেই সহজে বিন্যস্ত হইতে পারে।

আমরা বোধ হয়, গার্হস্থ্য জীবনোপযোগী স্ত্রী-শিক্ষার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করিয়াছি। সচরাচর বালিকা-বিদ্যালয়ে সংসারোপযোগী শিক্ষাই দেওয়া হইয়া থাকে—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়া হয় না। আর স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী সংস্কারকদলও এই বৈষয়িক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনেই ব্যতিব্যস্ত। যখন সেই সংস্কারের সামঞ্জস্য নির্ণয় করাই আমাদিগের আলোচ্য, তখন এই স্থলেই বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিলে চলিত। তবে নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। ভগ্নহৃদয়া বঙ্গ-পুর-মহিলা মহলে অনেকেরই বড় সংকীর্ণ হৃদয়; সমগ্র সংসারকে ভাল বাসিবার, আত্ম-পর সমভাবে দেখিবার, চিত্তপ্রশস্ততা অতি অল্প ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহাদিগের স্নেহ-মমতা, প্রেম-বাৎসল্য, আপন স্বামী পুত্র কন্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পুরুষের এ অপরাধ নাই—আমরা এমন কথা বলিতেছি না। তবে স্ত্রীজাতির এই সংকীর্ণহৃদয়তা প্রযুক্ত সংসারের অনেক অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিচ্ছেদ, অধিক কি জননীর প্রতি অশ্রদ্ধা, এই অমঙ্গলের অন্তর্ভূত। উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদিগের দ্বারা এ অমঙ্গল সূচিত হয় কি না—বলিতে পারি না; তবে উচ্চশিক্ষা প্রসাদাৎ তাঁহারা যে স্বামীর বাস্তভূমি পরিত্যাগ করিয়া, কেহ বা স্বামী-সহবাস পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া, স্বাধীনভাব অবলম্বন

করিয়া থাকেন—এ তত্ত্ব আমরা অবগত আছি। অর্দ্ধশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতাদিগের দ্বারা, এতটুকু না হউক, গৃহ-বিচ্ছেদ যে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে,—ইহাও নিশ্চয়। পুরাতন-পক্ষপাতী পণ্ডিতেরা আপত্তি করিতে পারেন যে, প্রাচীনাদের মধ্যে এ ভাব ছিল না; এ কথাতেও সম্যক্ ঐকমত্য প্রকাশ করিতে পারি না। বিগতজীবনা বহুপ্রাচীনাদিগের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আজি কালিকার প্রাচীনাদিগের মধ্যে অনেকেই যে পুত্র-বধূ অপেক্ষা কন্যার প্রতি অধিকতর অনুরাগিনী, কেহ কেহ বা পুত্রবধূর প্রতি অযথা ক্লেশদায়িনী—এ কথা আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি। বঙ্গমহিলা-দিগের আর এক মহদ্দোষ—তাঁহারা অনেকেই বড় কলহ ও পরকুৎসাপ্রিয়া; সাংসারিক কার্য্যকলাপ সমাধানের পর কিঞ্চিৎ অবসর পাইলেই তাঁহারা পরস্পর মিলিতা হইয়া অনুপস্থিতাদিগের দোষ-গুণ-সমালোচনে ব্যাপৃতা হ'ন এবং তৎ-পক্ষে মতদ্বৈধ ঘটিলেই কলহে সেই 'সখি-সমিতি'র উপসংহার সাধন করেন। বালিকা বয়স হইতেই এই সমস্ত দোষ বর্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক; বাল্যে যে ভাব অঙ্কুরিত হয়, যৌবনে তাহার বিকাশ ঘটে, বার্দ্ধক্যে তাহা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; রমণী-হৃদয়ে যাহাতে এই সমস্ত কলুষিত ভাব অনুপ্রবিষ্ট না হয়,—বালিকা-বিদ্যা-লয়ের অভ্যন্তরেই তদ্বিষক বাল্য-নীতি শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আর গৃহিণী অবস্থায় গার্হস্থ কার্য্যাবসানে গৃহকর্ত্রীগণ, অনর্থক পরচর্চ্চায় সময়ক্ষেপ করা অপেক্ষা, যাহাতে সদ্গ্রন্থ পাঠ করেন ও সমাগতা সঙ্গিনীগণ তাহারই শ্রোত্রী-স্থানীয়া হন—গৃহকর্ত্তাদিগের তৎপক্ষে সদুপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি পরিচালনার প্রকরণ সম্পূর্ণ পৃথক্। পুরুষ ও রমণীর পক্ষে এজন্য একই পথ অবলম্বনীয়, বোধ হয়। এ পথ প্রদর্শন পক্ষে আমরা সম্পূর্ণ অনু-পযুক্ত। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, পাশ্চাত্য ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তে, রামায়ণের কমনীয়তা, ভাগবতের আধ্যাত্মিকতা, 'গীতা'র একটু ধর্ম্মগাথা, প্রভৃতি হিন্দু-শাস্ত্র পুরাণাদি-কথিত দু'টা তত্ত্বকথা হিন্দুমহিলাদিগকে শুনান অধিকতর ফল-প্রদ। হিন্দুনারীগণ যাহাতে ইহা হইতে বঞ্চিতা না হয়েন, স্ত্রীশিক্ষাপ্রয়াসী সহৃদয়-গণের তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। যদি সময় ও সুযোগ ঘটে, বারান্তরে অন্যান্য প্রস-ঙ্গের আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

হিন্দুসমাজে গুণ-গত জাতিভেদ কি সম্ভব? *

হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণজাতি সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহার পর বৈদ্য, তাহার পর কায়স্থ। সাধারণ ভাষায় ভদ্রলোক বলিলে এই তিন জাতীয়

* বর্ণভেদ ও বর্ণধর্ম্ম—শ্রীসচ্চিদানন্দ দেবশর্ম্মা প্রণীত। শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী এণ্ড কোং দোকানে প্রাপ্তব্য।

লোক বুঝায়। ইহাদের নিম্নে তিলি, তাম্বুলি, বারুই, কামার, কুমার, সদ্গোপ প্রভৃতি দ্বাদশব্যবসায়ে লিপ্ত "বারশ্রেণী"। ইহাদিগকে আচরণীয় হিন্দু বলে, কারণ ব্রাহ্মণাদি ভদ্রলোকেরা ইহাদের স্পৃষ্টজল আচরণযোগ্য মনে করেন। ইহাদের নীচে কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতি। বাঙ্গালার ভদ্র হিন্দুরা তাহাদের জলাদি আচরণ করেন না, এজন্য ইহারা অনাচরণীয় নামে খ্যাত। এই অনাচরণীয় শ্রেণীর মধ্যে সুবর্ণবণিক্, যুগী, ও নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে অর্থে বশীভূত করিয়া, কেহ কেহ আচরণীয় হিন্দুমধ্যে গণ্য হইয়াছেন, কেহ বা গণ্য হইতে উদ্যোগ করিতেছেন। অনাচরণীয় শ্রেণীর চেষ্টা সফল হউক।

এইরূপ উদ্যোগ দেখিয়া আচরণীয় শ্রেণীভুক্ত একজন শিক্ষিত বারুই "বর্ণভেদ ও বর্ণধর্ম্ম" নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া প্রথমতঃ হিন্দুর জাতিভেদ গুণগত এবং দ্বিতীয়তঃ বারুইজাতির উৎপত্তি নিরূপণ পূর্ব্বক কায়স্থজাতি অপেক্ষা বারুই জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় যে, বারুই মহাশয় স্বনাম লুক্কায়িত রাখিয়া "শ্রীসচ্চিদানন্দ দেবশর্ম্মা" নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দেশে ব্রাহ্মণেরা 'শর্ম্মা' ও কুলীন ব্রাহ্মণেরাই 'দেবশর্ম্মা'। বারুই মহাশয় এত শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া কেন প্রকারান্তরে নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, আমি তাহার বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার ঈদৃশ ব্যবহারে যে বারুই জাতির নৈতিক-ভীরুতার পরিচয় পাইতেছে, তিনি বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বারুইজাতীয় লোক বলিয়া হউক আর যে কারণেই হউক, আমি কিন্তু বারুইজাতিকে বড় শ্রদ্ধা করি। বাঙ্গালার বারুই বা বেহারে কৈড়ীর সমান চাষী নাই। আক্ষেপের বিষয় অনেক বারুই চাষ ছাড়িয়া চাকুরি বৃত্তির জন্য লালায়িত হইতেছেন। কারণ চাষী বলিলে যে গালি দেওয়া হয়!

হিন্দুয়ানি অনুসারে জাতিভেদ বংশগত। আর মুসলমানি ও খ্রীষ্টানি অনুসারে জাতিভেদ গুণকর্ম্মগত। শ্রীসচ্চিদানন্দ বলেন যে "একবর্ণ আসীৎ পুরা।" পূর্ব্বে আর্য্যেরা একবর্ণভুক্ত ছিলেন; পরে গুণ ও কর্ম্মানুসারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বারুই, তেলী, গোয়ালা, প্রভৃতি জাতিতে বিভক্ত হয়েন। কিন্তু একবার বিভক্ত হইলে বংশানুসারে জাতিভেদ চলিতে থাকে। ভারতবর্ষের সকল ব্রাহ্মণই যে এক জাতিভুক্ত, তাহা নহে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্পৃষ্টজল পান করেন না, উৎকলব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কন্যাগ্রহণ করেন না। এইরূপে গুণকর্ম্মানুসারে যত নূতন জাতি, উপজাতি ও অনুপজাতির উদ্ভব হইয়াছে, সকলেই অবশেষে বংশগত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। পুরোহিত ও বেদাধ্যাপক মহাশয়েরা ব্রাহ্মণ হইলেন, দেশরক্ষক ব্যক্তিরা ক্ষত্রিয় হইলেন, রাজস্ব-নিরূপক ও রাজকীয় দলিল-পত্রাদির লেখক মহাশয়েরা করণ বা কায়স্থ হইলেন; চিকিৎসকেরা বৈদ্য হইলেন। কিন্তু এই জাতিভেদ-পত্তনের পর যদি কোন করণ-সন্তান চিকিৎসাবৃত্তি আরম্ভ করিলেন, তিনি আর বৈদ্যজাতিভুক্ত হইতে পারিলেন না; যদি কোন

বারুই-সন্তান পর্ণলতা পরিত্যাগ করিয়া দরখাস্তনবিস ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলেন, তিনি আর কায়স্থ হইতে পারিলেন না; যদি কোন গোপ গোচারণ ও গো রক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কুম্ভনির্ম্মাণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলেন, তিনি আর কুম্ভকার শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারিলেন না; যদি কোন সূত্রধর নৌ-নির্ম্মাণ পরিত্যাগ করিয়া পণ্য-বিক্রয়ে রত হইলেন, তিনি আর বণিক্ হইতে পারিলেন না।

গুণ ও কর্ম্মানুসারে আর্য্যেরা নানা জাতিতে বিভক্ত হইলে, যেদিন হইতে জাতি-ভেদ বংশ-গত হইল, সেইদিন হইতে ভারতবর্ষে আর্য্যজাতি বা দ্বিজ জাতির ধ্বংস হইয়া হিন্দুজাতির অভ্যুদয় হইল।

শ্রীসচ্চিদানন্দ বলিতেছেন, "দ্বিজ সন্তান কেহ যজ্ঞের গো রক্ষা করিতেন, এই জন্য তাঁহার নাম গোপ হইল; কিন্তু তিনি গো রক্ষণ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে কেন গোপ রহিবেন, তাহা বুঝা যায় না। কেহ পর্ণ বা পানের ব্যবসায় করাতে বারুজীবী বা বারুই নামে খ্যাত হইলেন, কিন্তু তিনি পানের ব্যবসা পরিত্যাগ করিলে কেন বারুই রহিবেন, তাহা বুঝা যায় না। যে যে ব্যবসায় না করে, তাহাকে তদ্দ্বারা আখ্যাত করিলে 'কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন' রাখার ন্যায় হয়। মহারাণী স্বর্ণময়ীর পূর্ব্বপুরুষেরা তৈল বিক্রয় করিতেন, এই জন্য তেলী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বংশজেরা সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিলেও কেন তেলী নামে আখ্যাত হইবেন?"

এই সকল প্রশ্ন পাঠ করিয়া, কেহ কেহ মনে করিবেন যে, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রাহ্মসমাজ বা খ্রীষ্টসমাজ ভুক্ত লোক। আমি প্রশ্ন-কারকে জানি, তিনি অতি গোঁড়া হিন্দু বলিয়া আত্ম পরিচয় দেন, এবং তদীয় বন্ধুবর্গও তাঁহাকে গোঁড়া হিন্দু বলিয়াই জানেন। তিনি সম্মতি আইনের মহা বিরোধী।

শ্রীসচ্চিদানন্দের প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। গুণ ও কর্ম্মানুসারে জাতিভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল, হিন্দুরা তাহা অস্বীকার করেন না। কিন্তু একবার জাতিভেদ সৃষ্টি হইলে, চিরকাল তাহা বংশগত হইয়া চলিবে, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুশাস্ত্রের গুণ ও কর্ম্মানুসারে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে, স্বীকার করিলাম। কিন্তু এমন কথা কোথায় আছে যে, দুই এক শত বৎসর অন্তর কোন্ হিন্দুর কোন্ জাতিভুক্ত হওয়া উচিত, গুণ ও কর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া তাহার বিচার হইবে, অথবা ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন পণ্যবিক্রয়ী বণিক্-জাতি-ভুক্ত হইবে, আর বণিক্-বংশোৎপন্ন বিচারক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় ভুক্ত হইবে! যখন আর্য্যদের আর্য্যত্ব যায় নাই, দ্বিজদের দ্বিজত্ব যায় নাই, তখন গুণ ও কর্ম্মানুসারে জাতিনির্ণয় হইত, স্বীকার করি। কিন্তু সে যে অনেক দিনের কথা। হিন্দু ও আর্য্যে এই প্রভেদ যে, আর্য্যের জাতি গুণগত, আর হিন্দুর জাতি বংশগত। খ্রীষ্টের দেবত্ব না মানিয়া খ্রীষ্টানি, মহম্মদের প্রতিনিধিত্ব না মানিয়া মুসলমানি, আর বংশগত জাতিভেদ না মানিয়া হিন্দুয়ানি, একই পদার্থ। যদি বংশগত জাতিভেদ প্রথা না মানিবে, তবে বল যে, তুমি হিন্দু নও, তুমি

"আর্য্যধর্ম্মী" বা "দ্বিজধর্ম্মী" বা অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বী।

গ্রামে বাস না করিয়াও অর্থাৎ "মালী" না হইয়াও জমিতে প্রজার "মালিকী" সত্ব থাকিতে পারে, পর্ণচাষ পরিত্যাগ করিলেও পর্ণবংশোদ্ভব বলিয়া পর্ণজীবী নাম অক্ষত রহিতে পারে। আজ অন্ততঃ ছয় সাত শত বৎসর হইতে এই প্রকার বংশগত জাতিভেদ প্রথা লইয়া হিন্দু সমাজ চলিয়া আসিয়াছে। অনেকের পক্ষে এই প্রথা অসহ্য হইয়াছে। এইজন্য আজ বাঙ্গালাদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

যদি বংশগত জাতিভেদ উঠিয়া যায়, তবে হিন্দুয়ানি উঠিয়া গেল। গুণ ও কর্ম্মানুসারে আবার কি জাতিভেদের সংশোধন হইতে পারে? কে বা সংশোধন করে, কেইবা তাহার কথা শুনিয়া চলে। বেদজ্ঞান দূরে থাকুক, সামান্য বর্ণপরিচয় শূন্য ব্রাহ্মণেরাও স্বেচ্ছায় তাঁহাদের উচ্চপদ পরিত্যাগ করিবেন না। অনেক বৈদ্য ও কায়স্থ ব্রাহ্মণপদবীর আকাঙ্খী; কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে গ্রহণ করা যাইবে? কত তেলি ও বারুই শুধু কায়স্থ পদবাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বৈদ্য, এমন কি ব্রাহ্মণপদ আকাঙ্ক্ষা করিবে। কি প্রমাণ ও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া এই জাতি-সংস্কার করা যাইবে?

বাস্তবিক কথা, এই বংশগত জাতিভেদ প্রথা পরিত্যাগ করিয়া গুণগত জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতিতে বাঙ্গালা দেশে উপবীত ধারণ করে না। আচরণীয় ও অনাচরণীয় সকলেই উপবীত ধারণ করুক; তাহাতে জাতিভেদ বংশগত না হইয়া গুণগত হইল না। স্পৃষ্ট জল, পক্ক অন্ন সম্বন্ধে যে সকল জাতি নিষেধ রহিয়াছে, তাহা দূর হউক; তাহাতেও কিন্তু বংশগত জাতিভেদ গুণগত হইল না। বংশগত জাতিভেদ প্রথা পরিত্যাগ করিলে, হিন্দু ও ব্রাহ্মে কি পার্থক্য রহিল? হিন্দু সমাজের পক্ষে বংশগত জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া গুণগত জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত করা কি সম্ভব? সকলেরই যে উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা। বিশেষতঃ এই শতবৎসরে বিদ্যাবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থে কোনও বিভিন্নতা নাই। ইঁহারা কি এক জাতিভুক্ত হইয়া আদান প্রদানে সম্মত হইবেন? আর শিক্ষিত ধনাঢ্য বারুই-তেলী-বেণে মহাশয়েরাই কি কায়স্থের সমান পদবী লাভ না করিয়া নিরস্ত হইবেন? ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বারুই, তেলি প্রভৃতি জাতির মোহরের ও কেরাণি মহাশয়দিগকে কোন্ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া নূতন কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত করিব? অথবা সকল জাতির ডাক্তার, কবিরাজ ও কম্পাউণ্ডারদিগকে বাঁধিয়া কিরূপে নূতন চিকিৎসক জাতি সৃষ্টি করিব? যে যাহাই বলুক, বংশগত জাতিভেদ প্রথা পরিত্যাগ করিয়া গুণগত জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হিন্দু সমাজের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। হয় ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায় জাতিভেদ একেবারে উঠাইয়া দিতে হইবে, না হয় জাতিভেদ বংশগত হইয়া চলিতে থাকিবে।

জাতিভেদ বংশগত হইলে ও পূর্ব্বকালে যেমন প্রতিলোম ও অনুলোম প্রণালীতে আদান প্রদান চলিত, এখনও তদ্রূপ আদান প্রদান চলিতে কোন

আপত্তি দেখি না। একজন ব্রাহ্মণ-ডাক্তারের কন্যার সহিত একজন ব্রাহ্মণ-দোকানদারের পুত্রের বিবাহে কোন আপত্তি নাই। তবে একজন কায়স্থ ডাক্তারের কন্যার সহিত একজন ব্রাহ্মণ ডাক্তারের পুত্রের বিবাহের আপত্তি কেন? বিবাহের সঙ্গে কন্যার গোত্রান্তর হয়। অসবর্ণ বিবাহেও বিবাহের সঙ্গে কন্যার গোত্রান্তর ও জাত্যন্তর হইবে, এই মাত্র প্রভেদ। বাঙ্গালা দেশের হিন্দুরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

১। ব্রাহ্মণ।
২। বৈদ্য ও কায়স্থ (ক্ষত্রিয়?)
৩। আচরণীয় তৈলিকাদি (বৈশ্য?)
৪। আচরণীয় কৈবর্ত্তাদি (শূদ্র?)

প্রথম শ্রেণীর বরেরা দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে, দ্বিতীয় শ্রেণীর বরেরা তৃতীয় শ্রেণী হইতে, এবং তৃতীয় শ্রেণীর বরেরা চতুর্থ শ্রেণীর হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এইরূপ অনুলোম বিবাহ দূষণীয় হইবে না। পিতার জাতি অনুসারে অসবর্ণা-বিবাহ-জাত সন্তানের জাতি নির্ণয় হইবে। এই বিবাহ সূত্রে সমগ্র হিন্দু-জাতি গ্রথিত রহিবেন।

বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম মতে বিবাহ চলিবে। অসবর্ণা জাত সন্তান পিতার জাতিভুক্ত হইবেন।

তৈলিক্, বারুই, কামার, প্রভৃতি আচরণীয় জাতির মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম মতে বিবাহ চলিবে। অসবর্ণাজাত সন্তান পিতার জাতিভুক্ত হইবে।

কৈবর্ত্তাদি অনাচরণীয় জাতির মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম মতে বিবাহ চলিবে। সন্তান পিতার জাতি * প্রাপ্ত হইবেক।

বাঙ্গালাদেশে জাতিসমূহকে এই বর্ণ বা শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়া যদি ঘনিষ্টতম দুই শ্রেণীকে অনুলোম ক্রমে এবং একশ্রেণী-ভুক্ত সমস্ত জাতিদিগকে অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে বিবাহ ও পক্কান্ন গ্রহণ করিতে অনুমতি দেওয়া হয়, তবে বংশগত জাতিভেদের যে সকল অনিষ্ট রহিয়াছে, তাহা অনেকাংশে নিবারিত হয়। কিন্তু অনুমতি দেয় কে? ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় দ্বারা এই কাজ হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহারা যে নিতান্তই অন্ধ। ২০৲ টাকা দেও, মহামহোপাধ্যায় মহাশয় পাতি দিবেন যে, সুগী জাতি ব্রহ্মার গ্রীবাদেশ হইতে জাত, সুতরাং গ্রীবাদেশে উপবীত ধারণে সমর্থ। আজ বাঙ্গালাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ১৮০ লক্ষ, আর হিন্দুর সংখ্যা ১৭০ লক্ষ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এই অর্থগৃধ্নুতা পরিত্যাগ না করিলে আর ৫০ বৎসরের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৩০০ লক্ষ এবং হিন্দুর সংখ্যা ৭০ লক্ষ মাত্র হইবে। পণ্ডিত সমাজের সমবেত চেষ্টা ও নিঃস্বার্থপরতার উপর হিন্দু সমাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে।

আধুনিক আচার ব্যবহার মাত্রই শাস্ত্র-সম্মত, মধ্য ও নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দুদের এই কুসংস্কারই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আধিপত্যের মূল কারণ। এই সংস্কার যাঁহারা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীসচ্চিদানন্দের ন্যায় জন্মগত জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া গুণগত জাতিভেদ প্রচলিত করিতে

---

* যেহেতু মনু বলেন "জাতোনার্য্যাম্ অনার্য্যায়াম্ আর্য্যাদ্ আর্য্যোভবেদ্ গুণৈঃ।"

চাহেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা কি এতই অহম্মক যে, এই কুসংস্কার উৎপাটন করিয়া নিজের জীবিকা ও ব্যবসায়ের পথ একেবারে বন্ধ করিবেন? যদি বৈদ্য-কায়স্থে, অথবা বারুই-তেলিকে বিবাহ হইতে পারে, তবে যে সমস্ত হিন্দুয়ানিতেই লোকের অবিশ্বাস জন্মিবে। আজ কায়স্থ-তনয় বৈদ্য-দুহিতা বিবাহ করিলেন, কাল শাস্ত্রজ্ঞানের অভিমান করিয়া ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিতে চাহিবেন। একবার প্রবৃত্তি জন্মিলে তাহা কি প্রকার নিবৃত্ত হইবে? প্রচলিত আচার ধর্ম্মশাস্ত্র-সঙ্গত, এই বিশ্বাস একবার শিথিল হইলে, নূতন বিশ্বাস কোথায় দাঁড়াইবে, কে বলিতে পারে? তৈলিক মহাশয় আজ কায়স্থ-পুত্রকে কন্যা দান করিলেন; কাল আবার স্বীয় পুত্রের জন্য কায়স্থকন্যার অন্বেষণে বাহির হইবেন। দেশাচারের উপর হিন্দুসমাজ চলিতেছে—একবার যদি এই দেশাচার পরিবর্ত্তিত হয়, এই পরিবর্ত্তনের সীমা কে নির্দ্দেশ করিবে? রাজা স্বধর্ম্মী নহেন যে, আমরা সকলে বসিয়া যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলাম, তিনি তাহা পাশব বলে বজায় রাখিবেন। যে শ্রেণীবিভাগের কথা বলিলাম, অধিকাংশ হিন্দুর যে তাহাতে সম্মতি হইবে, এখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। বৈদ্য-কায়স্থের, বা বারুই-তৈলিদের বিবাহে যাজক ব্রাহ্মণ মেলা দুষ্কর হইবে। কায়স্থ-তৈলিকের বিবাহ অনেক দূরের কথা। যদি হিন্দুরা বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইতে না পারেন, তবে নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা ক্রমশঃ মুসলমান সম্প্রদায়ে, আর উচ্চশ্রেণীস্থ লোকেরা ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজের পনর আনা পৌনে ষোল গণ্ডা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতীয় লোক। এই তিন জাতি ঐশ্বর্য্য বিদ্যাবুদ্ধিতে সমকক্ষ, এবং সর্ব্ববিষয়ে একবর্ণ বা একশ্রেণী ভুক্ত হইবার যোগ্য। তবে যে আমি ভবিষ্যৎ হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণদিগকে বৈদ্য ও কায়স্থ হইতে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছি, তাহার কারণ এই যে, অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির এখনও হ্রাস হয় নাই। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ পৌরাহিত্য কার্য্য করিলে অশিক্ষিত লোকের বিশ্বাস ভক্তি অটল রহিবে না। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ভক্তির হ্রাস হইতেছে, আর নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা সাম্যের ধর্ম্ম মুসলমানি গ্রহণ করিতেছে। এত ঘৃণা, অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া নমঃশূদ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি কৃষিজীবী ও নাবিক শ্রেণী কেন হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরে পড়িয়া রহিবে? কৌলীন্যের অত্যাচার সহ্য ও কন্যাদায়ের গুরুভার বহন করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ অনেকে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করিতেছেন। বস্তুতঃ হিন্দু সমাজের উভয় সঙ্কট উপস্থিত। হিন্দুয়ানি পরিত্যাগ ও আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অনুলোম বিবাহ সূত্রে সমগ্র হিন্দু-জাতিকে একতায় বদ্ধ করিলে, তথাপি কথঞ্চিৎ ভরসা আছে। কিন্তু নিশ্চল হইয়া রহিলে মৃত্যু নিশ্চয়।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

আত্ম-সম্ভ্রম।

তোমরা ভারতবর্ষকে কোন্ দেশের মত করিয়া তুলিতে চাও, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করি। যদি ইংলণ্ডের মত করিতে চাও, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু হিমালয়ের নাম স্নোডন ও গঙ্গার নাম টেম্‌স রাখিলে কি তোমার উন্নতি হইবে? ধুতি চাদর ফেলিয়া হ্যাট কোট্, পরিলে কি তোমার নেটিভত্ব ঘুচিবে? হাতে করিয়া থালা হইতে ভাত খাওয়া ছাড়িয়া প্লেট হইতে কাঁটা চাম্‌চা দিয়া রুটী মাংস খাইলে কি তোমার অধীনতা যাইবে?

আমার বিশ্বাস নাই যে, ইংলণ্ডের গৌরব হ্যাট কোটে, মদের গ্লাসে কিম্বা কমোডে নিবদ্ধ;—তুমি হুকা ফেলিয়া চুরট ধর, তোমার চুরট ধরাই সার হইবে, সাহেব হইতে পারিবে না। কথামালার বক ও হংসের গল্প পড়িয়াছ, পঞ্চতন্ত্রে সারমেয়ের গল্প পড়িয়াছ, তাহা আমার সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নূতন বেশে, নূতন আকারে তুমি সভ্য হইতে পার, কারণ সভ্যতা রূপভেদে শতবিধ, কিন্তু সাহেব হওয়া দুষ্কর। সম্মান একটা মহামূল্য জিনিস, তাহা তুমি স্বদলে ভিন্ন কোথাও পাইবে না, যাহাকে অনুকরণ করিয়াছ, সে তোমায় দেখিলেই চটিবে, তবে যদি তোমায় তুষ্ট রাখাতে তাহার কোন স্বার্থলাভের আশা থাকে, তবে প্রকাশ্যে বলিবে না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে গভীর রূপে ঘৃণা করিবে। যে দেশে বাস কর, সে দেশের শ্রদ্ধা ত পাইবেই না, কারণ তুমি সে দেশের আচার ব্যবহারের নিন্দুক, তবে এ বহুরূপী সাজের ফল, মটনচপের উদ্দেশ্য?

ইংরেজের গৌরব সাহসে, উদ্যোগে, শ্রমশীলতায় ও স্বদেশ-বাৎসল্যে। এ সকল গুণ কি তোমার অতি মহৎ বলিয়া বোধ হয়, অনুকরণ করিতে সাহস হয় না? যদি কাজের বিষয় ধরিতে ভয় হয়, তবে উহার আহার পরিচ্ছদ ছাড়, এলবার্ট কায়দায় চুল ছাঁটিও না, হ্যাট কোট্ পরিও না, মদ মাংস খাইও না। যাহা কেবল অর্থসাধ্য, তাহা সাধনে ব্যক্তিগত গুরুত্ব কি? ঐ কুলিকে ডাকিয়া তোমার বেশটা পরাইয়া দেও, দেখিবে, এই মুহূর্ত্তে সে তোমার মত হইবে। গুণের অনুকরণ যেমন শ্রমসফলজনক, তেমনি সম্ভ্রমপদ, যদি তোমাতে পদার্থ থাকে, অগ্রে গুণভাব গ্রহণ কর। যখন তুমি উহার ন্যায় সাহসী, উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও স্বজাতি-প্রেমিক হইবে, তখন তুমি হ্যাট কোট পরিলে হাসিব না, রুটি মাংস খাইলে বকিব না, ভাই বলিয়া কোলে লইব, সব আব্দার সহিব।

আহারে পরিচ্ছদে সমগ্র ভারতবাসীর ইংরেজ হওয়ার অনেক বাধা আছে প্রথমতঃ জলবায়ুতে সহে কি না, তাহা বলা যায় না, দ্বিতীয়তঃ উহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। একটা প্রবীণ জাতিকে এরূপ মৌলিক ভাবে পরিবর্ত্তিত করা তোমার ন্যায় ক্ষমতাশূন্য আদর্শ দাতার সাধ্যায়ত্ত নহে; এবং মিতব্যয়ী জাতিকে অতিব্যয়ী করিলে তাহাতে মোটের উপর মঙ্গল হয় বলিয়া বিশ্বাস করি না। তবে এ পতিত ধূলি-বিলুণ্ঠিত জাতির প্রথা তোমার ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তির রুচিসঙ্গত না হইলে, তাহার দায়ী এ জাতি নহে, তুমি নিজে;

দেশে দেশে আত্মদেশের অপবাদ ঘোষণা করিতে প্রবৃত্তি হয়, পরকীয় ব্যবহার লও, স্বদেশীর নিকট পর হইয়া যাও।

কৃতজ্ঞতাবশে, কি অধীনতায়, কি শিক্ষাভাবে, জানি না, তোমরা আজকাল একেবারে বিদেশীর উপাসক হইয়া দাঁড়াইয়াছ, বিদেশী যাহা লেখে, তাহা বেদ; যাহা বলে, তাহা গুরু-বাক্য। যে হিন্দু চিরকাল ব্রাহ্মণকে মান্য করিয়া আসিয়াছে, সে আজ ব্রাহ্মণের বিদ্বেষী; ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া তাহার চক্ষের ঠুলি ভাঙ্গিয়াছে, সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতা দেশ অধঃপাতে যাইবার একমাত্র কারণ। বল্কল পরিহিত ফল-মূল-ভোজী ঋষি অরণ্যে পর্ণকুটীরে থাকিয়া নিঃস্বার্থপরতা চর্চ্চা করিত, তাহা ইংরেজী পুস্তকে লেখা নাই; এবং যাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অপহরণ করিয়া আজ সমগ্র সভ্য জগৎ জ্ঞানী, সেই গণিত, দর্শন, জ্যোতিষ, বেদ, ও সঙ্গীতের আদি উদ্ভাবক যে ঋষিরা, তাহাও সে পুস্তকে লেখা নাই। কেবল স্বার্থপর অনুবাদ ভূয়োভূয়ঃ লিখিত আছে। কাজে কাজেই ব্রাহ্মণ এক্ষণ জাতি সাধারণের নিকট হেয়। দেশের একটা প্রধান জাতিকে তদ্দেশীয় সাধারণের নিকট শ্রদ্ধাশূন্য করিতে পারিলে বিদেশীর কোন লাভালাভ আছে কি না, বলিতে চাই না, তবে এই দোষে সমস্ত ভারতবাসী যে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, তাহা দেদীপ্যমান। ঋষিরা যে এখন নাই, তাহা নহে, তবে তাঁহারা ইহ লোকের ঘটনাবলীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না; যোগশাস্ত্র যে পচিয়া গিয়াছে, তাহা নহে, লোকের অজ্ঞাত বলিয়া তাহার গৌরব নাই। বিলাসে নূতন জাতিরা যখন পরিতৃপ্ত হইবে, আধিপত্যের নশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন বুঝিবে, ঋষিরা দেবতা কি মনুষ্য ছিলেন।

মেকলে লিখিয়াছেন, ভারতবাসী অলস, ধূর্ত্ত, ভীরু; গুরু বাক্যের মত তাই বিশ্বাস করিয়াছ, তাহাকে অদ্বিতীয় বক্তা বলিয়া মানিয়া লইয়াছ। ক্লিপ্ট বলে, আমরা পৌত্তলিক, তুমি অমনি বুঝিয়া গিয়াছ, আমরা তাই। যদি আমরা বিনা বেতনে নিন্দুকদিগের উকীল ও প্রচারক হই, তাহা হইলে আমাদিগের জগতের নিকট হেয় হইতে বিলম্ব হইবে কেন? শ্বেতের কথায় মন্ত্রমুগ্ধ না হইয়া একবার ভাবিয়া দেখিলে ক্ষতি কি যে, আমরা বাস্তবিক গাধা কি না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুর নিকট গৌরব করিতে পারে, এরূপ জাতি ভূতলে নাই। হবিস্যান্ন-ভোজী, একাহারী ব্রহ্মচারীও হিন্দু, জাতিভেদ-পরিশূন্য সর্ব্বভুক পরমহংসও হিন্দু; গো-খাদক মুচি, শূকরখাদক চণ্ডাল, বিধবা-বিবাহী বৈষ্ণব, হিন্দু। শুদ্ধাচারী হরি কালী দুর্গাদির মূর্ত্তি পূজক হিন্দু; পুষ্প ধূপাদি-বর্জ্জিত মলমূত্রাদিযুক্ত যোগীও হিন্দু; অধিক কি, ঘোর নাস্তিক চার্ব্বাকও একজন ঋষি। এইরূপ অশেষ শাখাযুক্ত ধর্ম্ম আর কাহার আছে?

ভারতবর্ষ নূতন দেশ নহে; ভারতবাসী নূতন জাতি নহে; ইংরেজ কালকার জাতি, কাল এ দেশে আসিয়াছে। ভীরু হইলে ভারতবাসী এত দিন চীন প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত জাতির সম্মুখে কেমন করিয়া স্বাধীনতা রাখিয়াছিল? গ্রীক পর্য্যটক মেগ্যাস্থিনিস বলিয়াছেন, "আমি ভারতবর্ষে ১১৮টী রাজ্য দেখিয়াছি. তাহারা

প্রত্যেকে স্বাধীন, অথচ পরস্পর ঐক্য, সমগ্র দেশে কেহ মিথ্যা কথা বলে না, রাত্রিকালে গৃহদ্বার অর্গল রুদ্ধ করিবার প্রথা নাই।” এ কথা গুলি ব্যাস বশিষ্ঠের লেখা হইলে তুলিতাম না। কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত মিথ্যা কথা নাই, ইহা এই অলস, ধূর্ত্ত পৌত্তলিকদিগের শাসন প্রণালীর ফল; কিন্তু ইউরোপ বল, আমেরিকা বল, কোথাও ত এরূপ রাজ্য দেখিলাম না, যেখানে রাত্রে দরজায় খিল দেয় না, কি মিথ্যা কথা বলে না।

যদি আমরা সত্য সত্যই অলস, ধূর্ত্ত ও ভীরু, তাহা হইলে ইংরেজই বা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমাদিগের নিকট আসে কেন? আমরা উহাদিগকে ডাকি নাই, উহারা মনুষ্যভোজী নহে। যদি উহাদিগের আসিবার কোন কারণ থাকে, তবে সে আমাদিগের শ্রমজ দ্রব্যের লোভে। যদি তীর্থ ভ্রমণ কি পরোপকার করিতেই আসিবে, তবে এত তুলা পাট তিসি গম লইয়া যায় কেন? এ দেশের শ্রমফল না হইলে কি প্রকারে পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য তন্তুবায় হইত? যদি আমাদিগের কতকলোক সৈন্য হইয়া উহার জন্য যুদ্ধ না করিত, তাহা হইলেও কি এদেশে প্রবেশ করিতে পারিত?

যে সকল যুদ্ধে ইংরেজ জয়লাভ করিয়াছে, তত্ত্ব লইয়া দেখ, সত্য ইতিহাস পড়িয়া জান, দেখিবে, তাহাতে কোন না কোন প্রকারে এদেশীয় লোকের বিশেষ সাহায্য আছে। প্রবঞ্চনায় যেখানে জয়ী হইয়াছে, সেখানে এ দেশের বুদ্ধির সাহায্য আছে; সম্মুখ যুদ্ধে যেখানে কৃতকার্য্য হইয়াছে, সেখানে এ দেশের বলের সাহায্য আছে। এ বুদ্ধি বলের বিষয় জ্ঞাত না থাকিলে, এমন করিয়া যেখানে যাহা খাটে, সেখানে তাহা খাটাইয়া, ফললাভ করিতে পারিতনা। তবে যে বলিবার বেলা বলে না, লিখিবার বেলা লেখেনা, তাহার কারণ এই যে, তোমার প্রতি তোমার সম্ভ্রম জন্মিলে তাহার কার্য্যের অসুবিধা হয়। অসুবিধাটা বুঝা তত কঠিন নহে, ভাব, তুমি যদি তোমার ভৃত্যকে বল “বাপু তোমার দ্বারা আমার দিনপাত হইতেছে, তুমি নইলে আমি মরিয়া যাই,” তাহা হইলে পর দিবস সে তোমাকে অর্দ্ধচন্দ্র দেয়; সেইরূপ ইংরেজ যদি তোমায় বলে “আমি তোমার নিকট অনেক সাহায্য পাইতেছি, তোমার দ্বারা রুসিয়াকে ভয় দেখাইয়া সাইপ্রস লইয়াছি, তোমার বলে আরাবিকে বন্দী করিয়াছি, ব্রহ্মদেশ গ্রাস করিয়াছি, তোমার তুলা পাট তিসি গমের ব্যবসায় করিয়া মহীতলে কুবের হইয়াছি, তোমায় ভয় করাতেই তোমার বন্দুক লইয়াছি,” তাহা হইলে তোমার ভক্তি ও ভয়পূর্ণ মনে তরঙ্গ উঠে নাকি? এই কারণে মেকলে প্রভৃতি স্বজাতিবৎসল শ্বেতাঙ্গেরা বিপদ জানিয়াও তোমাদিগকে চতুষ্পদ রূপে ব্যখ্যাত করিয়াছে।

মোটা কথায় বলে, ‘যাক প্রাণ, রোক মান,’ তোমরা একথার সারবত্তা স্বীকার কর না।* হীন হইয়া জীবন ধারণ কর, একরূপ পরের মোট বহন করার তুল্য। যে উচ্চ, হীনতা তাহার নিকট অসহ্য, হীনের পক্ষে হীনতা কোন মানহীন নহে। তুমি দেশের জমিদার, চতুঃপার্শ্বের লোক রাজা বলিয়া তোমায় সম্মান করে, ডিক্রুজ সাহেব চাপরাসি লইয়া ডাকিলে

* “বঙ্গবাসীর ক্ষমা প্রার্থনায় এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ; বারান্তরে তাহা দেখাইব। ন, স।

যাও কেন, তাহার সেক্‌হ্যাণ্ড পাইয়া প্রফুল্ল হও কেন? ইহাতে আমি ডিক্রুজকে অসভ্য বলিব, কি তোমায় ছোটলোক বলিব? আমার মতে, তুমিই ছোট লোক, কারণ তুমি চাপরাসীর ডাকে অপমান বোধ করিলে না, তার পর হাজির হইয়া সম-ব্যবহার-ব্যঞ্জক সেকহ্যাণ্ড পাইয়া কৃতার্থ হইলে। ইহাতে ইহাও অনুমান হয় যে, তুমি গেলে "ঘণ্টাভর বাহারমে রহেদেও" বলিয়া দুইঘণ্টা স্ত্রীর সহিত কথোপকথনের পর বাহিরে আসিয়া তোমার সহিত সেকহ্যাণ্ড করিলেও তোমার চিত্তবিকার হইত না।

তুমি বলিবে, না গেলে আমার বিষয় যায়, ভিক্ষা মাগিয়া খাইতে হয়। ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় না কি যে, মান অপেক্ষা তোমার বিষয়-মমতা অধিক?—রাজা অপেক্ষা বেণিয়া শব্দ তোমার যোগ্যতর? যে প্রকৃত মানী, মান-হানির স্থলে তাহার বিষয়ের কথা মনে হয় না; তাহার সমস্ত সংসার প্রাণ একদিকে, মান আর একদিকে; বিষয় বিভব প্রাণ আগে যাইবে, পরে মান যাইবে। অপমানিত হইলাম, এই ভাবনায় সে আগুন হইয়া উঠিবে, যদি তৃপ্তি পায় বাঁচিবে, নতুবা মরিয়া যাইবে। ভাব দেখি, মানের জন্য প্রাণ দেওয়া ভাল, কি তস্করের ন্যায় অদ্ধমৃত দেহে জীবনধারণ করা ভাল। জীবন ত অনন্তকাল থাকে না; শত অপমান সহ ত একদিন যাইবেই, তবে ভেদ-বমনে না গেল, মান রক্ষার্থে যাউক, লোকে বলিবে, একটা লোক ছিল। যে সম্পত্তির জন্য তুমি সর্ব্বংসহ হইয়া দাঁড়াইয়াছ, উহা সঙ্গে যাইবে না, তবে উহার জন্য মাথা হেট কেন কর; লোক সমাজে কেন কাপুরুষ হও?

রাজা, নবাব, রায়বাহাদুর, খাঁবাহাদুর হইতে তোমাদিগের লোভের সীমা নাই। পৈতৃক সম্পত্তি দেনায় ডুবুক, বাসের বাড়ী সংস্কার অভাবে ভগ্ন হইয়া যাউক, সহধর্ম্মিণীর চিকিৎসা না হইল, শিক্ষাভাবে পুত্র মূর্খ হউক, তোমার উপাধি পাওয়া চাই! উপাধি ত একটা কথা, তাহা কিনিতে এত ব্যগ্র কেন?

যে আপিসে অপমানিত হইয়া বাড়ীতে আসিয়া ল্যাভেণ্ডার মাথে, চিনের বাড়ীর জুতা পরিয়া বাবু সাজে, সভায় আত্ম-সম্ভ্রমের বক্তৃতা শুনিলে কি তাহার চৈতন্য হয়? তাহার সংস্কার এই যে, আমার আপিসের অপমানের বিষয় কেহ জানে না, সাজিতে পারিলে অনায়াসে সাধা-রণের নিকট বাবু বলিয়া গৃহীত হইব। সে নিজে মানী লোক নহে, এই জন্য তাহার লোকের চক্ষে ধূলা দিবার প্রবৃত্তি; মানী হইলে সেই মুহূর্ত্তে ভর্ৎসকের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িত, মান ছাড়িত না।

আত্মসম্ভ্রম-জ্ঞান সর্ব্বদাই ক্ষমতার অনু-পাতিত। যাহার ক্ষমতা অল্প, তাহার মান-বোধও অল্প; কিন্তু অভ্যাসে বাহকের কাঁধ যেমন স্থূল হয়, আন্তরিক বৃত্তি নিচয়েরও ক্রমশঃ সেইরূপ অসাড়তা জন্মে। পিপীলিকা দংশনে যে উত্যক্ত হয় না, কালে তাহার বৃশ্চিক দংশন সহিয়া যায়। আজ শালা গাল সইয়া আসিলে কাল চাবুক সহিবে, কথা সরিবে না। এই জন্যে বলি, নিজের মান সাবধানে রাখা উচিত; রাখ থাকিবে, ছাড়, ক্রমে নাম্বিতে নাম্বিতে কুক্কুর হইয়া যাইবে।

মান হারাইবার আর একটা সূত্র

আছে, তাহা কথঞ্চিৎ সূক্ষ্ম, এই জন্য সকলের চক্ষে পড়ে না, অথচ অলক্ষিত ভাবে একটী দেশব্যাপী জালের ন্যায় ক্রিয়া করিতেছে। দেশের কি ছোট কি বড়, সকলেই সেই জালে সর্ব্বতোভাবে মুগ্ধ। তুমি যাহার কাপড় পরিয়া আরাম পাও, যাহার হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া পুলকিত হও, যাহার রেল গাড়ী ও টেলিগ্রাফ দেখিয়া চমকিয়া যাও, যাহার পমেটম ল্যাভেণ্ডার মাথায় দিয়া কৃতার্থ মনে কর, যাহার ফেটিঙে চড়িয়া স্বর্গসুখ লাভ কর, যাহার জাহাজ কামান তোমার দেবকীর্ত্তি বোধ হয়, তাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ থাকুক বা থাকুক, তাহার গোলাম তোমাকে হইতেই হইবে।

যে পূর্ব্বে লক্ষ টাকার মণিমুক্তা পরিয়া কতগৌরবে বেড়াইত, সে আজ ৫০০ টাকার চেইন ঘড়ী ঝুলাইয়া হাজার টাকার একখানা ব্রুহ্যাম চড়িয়া কত প্রফুল্ল; দেশীয় পালদিগের শিরাদি-রহিত মৃৎপুত্তলির পরিবর্ত্তে পোর্সেলেনের ভ্রূভঙ্গ্যাদি সংযুক্ত পুত্তলি পাইয়া কত হৃষ্ট! যাহার ব্যূহরচনা দেখিয়া তোমার প্রাণ ক্ষুদ্র হইয়া যায়, যাহার শিল্প কৌশলকে তোমার পদে পদে নমস্কার করিতে হয়, সে কিম্বা তাহার শ্যালক দরিদ্র বা ক্ষীণবপু হইলেও তাহার প্রতি তোমার ভয়ের সঞ্চার অনিবার্য্য।

শিল্পের পতনোদ্গমে জাতির যে কত উন্নতি ও অধোনতি হয়, তাহা সহজে অনুমান হইতে পারে। যে দেশীয় পণ্ডিত অর্থব্যবহার উত্তমরূপে পড়িয়াছেন, এমন কি আপনাকে অর্থশাস্ত্রের জন্মদাতা বলিয়া গৌরব করেন, তিনি উর্দ্ধ কল্পে এই বলিবেন যে, বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহারে দেশের ধন হানি হয়; একথা মিথ্যা নহে; কিন্তু অর্থহানিটাই গুরুতর হানি নহে, গুরুতর হানি আমার মতে এই যে, ঐ দ্রব্য ব্যবহারে নির্ম্মাণকারী জাতির প্রতি সম্মান জন্মিয়া ব্যবহারকারী তাহার নিকট একেবারে তেজোহীন মেষ হইয়া যায়।

তুমি বলিবে "বাদিয়া কিম্বা বাঁশ, কোঁড়েরা উত্তম ডালা চেঙ্গারী করে, তেমন আমরা করিতে পারি না; তাহাতে কি, তাহাদিগের নিকটত ক্ষুদ্র হইয়া যাই না!" সে যাও না এই জন্যে, তোমার বিশ্বাস হয় যে একটু চেষ্টা করিলেই তাহা শিখিতে পার। শিল্পের জয় পতাকা সেই স্থলে উড়ে, যেখানে ব্যবহারকারী তাহার সন্ধান পায় না, সাধ্যায়ত্ত বলিয়া বোধ করে না। সাপুড়িয়া ভেল্কি দিয়া সাপ খেলায়, বাজিকর বাজি করে, তাহা আপাততঃ আশ্চর্য্য হইলেও লোকে তাহা অসাধ্য মনে করে না, তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেয়।

ইংরেজের শিল্প সম্বন্ধে আমার এ বিশ্বাস অটল যে, তাহার এ দেশের অর্দ্ধেক আধিপত্য (ইংরাজীতে যাহাকে প্রেষ্টিজ বলে) রেল ও ষ্টীমার হইতে হইয়াছে; কারণ সাধারণে এইগুলি সর্ব্বদা দেখিয়া থাকে ও বিস্ময়জনক মনে করে, সুতরাং ইহাতেই নিজের নিজের বল, সাহস ও অভিমান হারায়।

পরকীয় শিল্প-ব্যবহারজনিত দাসত্ব, এ জাতির শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছে; ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবার কোন চেষ্টাই হইতেছেনা, হইবে কি? স্প্রিংএর পুতুল কিনিয়া যখন তুমি আহ্লাদে আটখানা হও,

তখন তুমি নিজের দাসত্বের বিষয় নিজেই জাননা। এরূপ পুতুল দেখিয়া শিক্ষা বিষয়ে বৈদেশিকের নিকট পরাস্ত হইলে, এই খেদে যদি কাঁদিতে পারিতে, তাহা হইলে বুঝিতাম, তোমার মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ। এক পয়সায় একটা দেসলাই কিনিবার সময় তোমার স্মরণ হয় কি যে পয়সাটী দোকানীকে দিতেছ না, সে শ্বেতদ্বীপবাসী জনবুলকে দিতেছ ? তোমার হাত হইতে নির্গত হইবা মাত্র পয়সাটী উল্কার ন্যায় তাড়িত বেগে সাত সমুদ্র তেরনদী পার হইয়া চলিয়া যায়, আর ফিরেনা। যে বিস্কুট তুমি ৸৹ করিয়া টিন কিনিয়া থাক, উহাতে কতটুক্ ময়দা চিনি থাকে, জান ? তোমার দেশের চিনি ময়দা জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডে যায় ; তথায় থলিয়া হইতে বাহির হইয়া সাজ সাজিয়া টিনের খাপে প্রবেশ করে, তদনন্তর তোমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া সেই আদ্‌সের ময়দা এক ছটাক চিনি ৸৹ হইয়া দাঁড়ায়, তুমি বোকা, তাই এমন জিনিস কিনিয়া কৃতার্থ হও।

নৈসর্গিক ক্রিয়ানুসারে এ অলক্ষিত দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে বহুকাল লাগিবে। তালপাতার ছাতার মাথায় কাপড়ের ছাতা উঠিল, কিছুদিন প্রথম প্রথম চমক ঘুচিতে চলিয়া যায়, দোষ দেখিতে শিখাটা প্রথমব্যক্তির জন্মে ঘটেনা। দ্বিতীয় পুরুষে চমক থাকে না, কিন্তু স্বজাতির শিল্পহীনতা জন্য যে সঙ্কোচ, তাহা তাহাতেও বিদ্যমান থাকে। যখন নিজের জাতির মধ্যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হউক, তদ্রূপ ছাতা প্রস্তুত হইতে দেখিবে, তখন তাহার প্রকৃত মুক্তি লাভ হইবে।

এই প্রকার যে লক্ষ বিষয়ে তুমি পর-মুখাপেক্ষী, তাহার প্রত্যেকটীই তোমার স্বাধীন বৃত্তির ক্ষয়কারী। যদি উচ্চ ও স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত হইতে চাও, তাহা হইলে এই সকল অলক্ষিত শৃঙ্খল ছিন্ন হইলে হইতে পার ; তৎপূর্ব্বে যদি জোর করিয়া উঠ, অপরিণত শিশু যেমন দাঁড়াইতে পড়ে, তুমিও সেইরূপ পড়িয়া যাইবে।

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
ত্রিদিবে তোমার দেবে, আনন্দেনন্দনে সেবে,
অর্পিয়া চরণে শত সোণার মন্দার !
কেন সে ফেলিয়া পূজা, প্রাণমরি শ্বেতভূজা,
মর্ত্ত্যের মানবে দয়া আবার তোমার ?
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

২

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
অনল শিখার মত, তব প্রেম অবিরত
জ্বালা'য়ে পোড়া'য়ে প্রাণ করি ছারখার,
নিবিয়া গিয়াছে কবে, বলনা প্রেয়সি তবে,
সেই ভস্ম—সেই ছাই---সে দগ্ধ অঙ্গার,
দেখিতে বাসনা কেন,---কি দেখিবে আর ?

৩

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
দেখিতে আছে কি বাকি, এতদিন বুকে রাখি
দেখিয়া দেখার আশা মিটেনি তোমার ?
উলটি পালটি কত, দেখিয়াছ অবিরত
পেষিয়া ঘষিয়া বুকে ভেঙ্গে চু'রে হাড়,
দেখিয়াছ রেণুকণা,---কি দেখিবে আর ?

৪

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
লাগাইয়া জিবে জিবে, অমৃত দ্রাবকে কিবে,
গলা'য়ে চুষিয়ে নিলে হৃদয় আমার !
আশ্বাসে দিছিনু এনে, নিশ্বাসে নিয়েছ টেনে,
হায় হায় বিশ্বাসের এই পুরস্কার !
দেবি, কি দেখিবে আর ?

৫

দেবি! দেখিবে কি আর?
বিচূর্ণ বালুকা সম, যে চূর্ণ হৃদয়ে মম
আলিঙ্গনে পড়েছিল যে দাগ তোমার,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ঝড়ে, তাই নিয়ে খেলা করে,
ব্যাপিয়ে মরম-মরু ঘোর অন্ধকার!
দেবি, দেখিবে কি আর?

৬

দেবি! দেখিবে কি আর?
কোন যুগে নিয়েছিলে, কোন যুগে দিয়েছিলে,
আর্দ্র অলক্তক-চিহ্ন চুম্বনে তোমার!
রমণী ছুঁইলে ঠোঁটে, ধুইলেকি নাহি ওঠে?
দেখিবে কি ধু'য়েছে কি আখি জলধার,
সে বীরত্ব জয়চিহ্ন গৌরব তোমার?

৭

দেবি! কি দেখিবে আর?
শুনেছি বাঘিনা বনে, খেলে হরিণের সনে,
ভাঙ্গিয়ে কোমল গ্রীবা করিয়ে সংহার!
বুঝিতে নাহি যে পারি, তেমনি তুমি কি নারী,
খেলিতে এসেছ সেই খেলা অবলার!
দেবি, দেখিবে কি আর?

৮

দেবি! দেখিবে কি আর?
একি সে স্নেহের দেখা, আঁখি জলে চিঠী লেখা?
এ শুধু মুখের কথা মুখে বলিবার!
এ নহে ধরিয়া গলে, এ নহে সে আমতলে,
এত শুধু দূরে দূরে ঘৃণা উপেক্ষার!
দেবি! দেখিবে কি আর?

৯

দেবি! দেখিবে কি আর?
যে দেখা নয়ন কোণে, কেহ নাহি দেখে শোনে,
এ দেখা কি দেখা সেই প্রীতি মমতার?
একি সে প্রাণের টান? একি নহে অপমান?
একি নহে উপহাস শুধু হাসিবার?
দেবি, দেখিবে কি আর?

১০

দেবি! দেখিবে কি আর?
যদিগো আগের মত, দেখিতে বাসনা তত
সত্যই সরলা প্রিয়ে থাকিত তোমার,
তবে কি "ভেরণ" গাছে, অত পাতা উঠিয়াছে?
দেখিতাম পথে আগে পাতা ভাঙ্গা তার!
দেবি! দেখিবে কি আর?

১১

দেবি! দেখিবে কি আর?
সেদিন গিয়েছে কবে, আর কি সেদিন হবে,
দু'জনে দুপুর বেলা পাশে দু'জনার!
আঙ্গিনা ভাঙ্গিয়া মেয়ে, না আসিতে ঘরে ধেয়ে,
আগে গিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেতে তার,
বুঝিতনা সে বালিকা চাতুরি তোমার!

১২

দেবি! দেখিবে কি আর?
তোমার বিরহানলে, কেমনে হৃদয় জ্বলে,
কেমনে নয়নে আজ বহে শত ধার,
তাই কি দেখিয়া সুখী, হ'তে চাও বিধুমুখি?
কাটা ঘায়ে নুন দিয়ে তামাসা তোমার!
দেবি! দেখিবে কি আর?

১৩

দেবি! দেখিবে কি আর?
নয়ন করিয়ে খালি, সকলি দিয়েছি ঢালি,
দিয়েছি সে শ্যামালতা ভিজায়ে তোমার!
দেখ গিয়ে পাতে পাতে, শুকায়ে রয়েছে তা'তে,
আঁখি জলে মাখা আহা কত হাহাকার!
দেবি! দেখিবে কি আর?

১৪

দেবি! দেখিবে কি আর?
কোথায় দাড়িম গাছে, দেখ গিয়ে রহিয়াছে,
আলিঙ্গন ফিরে দিছি সকলি তোমার!
রাখিয়াছি ফুলে ফুলে, তোমারি চুম্বন তু'লে,
ভাঙ্গা বুকে রাঙ্গা চুমা নহে রাখিবার!
দেবি! দেখিবে কি আর?

১৫

দেবি! দেখিবে কি আর?
আমি যে পাপিষ্ঠ অতি, তুমি অতি পুণ্যবতী,
চাহিলে লাগিবে পাপ নয়নে তোমার!
শত গঙ্গাজল দিয়া, দেও যদি ধোওয়াইয়া,
তবু এ পাপের দাগ নহে যাইবার!
দেবি! দেখিবে কি আর?

১৬

দেবি! দেখিবে কি আর?
কেন সে নিষ্ঠুর খেলা, ভাঙ্গাবুক ভেঙ্গে ফেলা,
কেন সে স্বপন পুনঃ দেখাও আবার?
লইয়া শ্মশান বুকে, মহা নিদ্রা যাই সুখে,
দয়া'করে ক্ষমা কর জাগায়োনা আর!
রমণি, তোমার নামে শত নমস্কার!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার। (১)

আর্য্যদের ধর্ম্মগত প্রাণ। তাঁহাদের ধর্ম্মে আঘাত লাগিলে তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠেন। প্রাচীন কালে যখন চার্ব্বাক-প্রমুখ নাস্তিকদের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল, ঋষিগণ দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা করিয়া তাহাদের কুতর্কজাল ছিন্ন করিয়াছিলেন। পরে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করিল, আর্য্যগণ তাঁহাদের প্রিয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিল। সুতরাং ইহাকে হীনবল করিবার জন্য বিশেষরূপ আয়োজনের আবশ্যক হইয়াছিল। প্রথমে মহা পণ্ডিত কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ মতের প্রতিবাদ করিয়া গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন। তাহার পর অসামান্য প্রতিভাশালী শঙ্করাচার্য্য তর্কবলে বৌদ্ধমত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া শৈব ধর্ম্ম বিস্তার করেন। কিন্তু বৌদ্ধদিগের মূল মন্ত্র—অহিংসা পরম ধর্ম্ম—আর্য্যদিগের মধ্যে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছিল যে, এই মন্ত্র-পোষক আর একটী মতের আবশ্যক হইল। অবশেষে রামানুজ আচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিলেন। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত এই আচার্য্যদ্বয়ের মতের পোষকতা করিয়া কতকগুলি পুরাণ প্রকাশ করিলেন। এই সকল গ্রন্থ বহুল রূপে প্রচার হইয়া হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড়াইয়াছিল। এতদ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে যে, আর্য্যগণ স্বকীয় ধর্ম্মের প্রতি বিশেষরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিলেও, অপর ধর্ম্মে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেই সাম্প্রদায়িক ভাব দেখা যায়। সুতরাং, হিন্দুধর্ম্মে এরূপ ভাব থাকা আশ্চর্য্যজনক নহে। তথাপি আর্য্যদিগের মধ্যে উদারতা আছে। সময়ে সময়ে মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া বিরুদ্ধ মত সকল সামঞ্জস্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পরম বৈষ্ণব চৈতন্যদেব আদ্যাশক্তি ও বিষ্ণুর একত্ব দেখাইবার জন্য ব্রজলীলা অভিনয় করিতে করিতে নিজে আদ্যাশক্তির বেশ ধরিয়া সিংহাসনে বিরাজ করিতেন। মহাশাক্ত রামপ্রসাদ সেন ছাগ বলির বিরুদ্ধে নিজ ভাব প্রকাশ করিয়া প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। পূর্ব্বে শাক্ত ও বৈষ্ণবে মধ্যে মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইত। কিন্তু এখন আর সে ভাব দেখা যায় না। বলিতে কি, কে শাক্ত, কে বৈষ্ণব, তাহা এখন স্থির করা কঠিন। এক জন আর্য্যকে প্রত্যহ বিষ্ণু ও শিব পূজা করিতে হয়। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যগণ পঞ্চ-উপাসক।

বৌদ্ধদিগের আন্দোলনের পর খ্রীষ্টীয় প্রচারকদের দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম আঘাত পাইল। কেরি, মার্শম্যান্ এবং ওয়ার্ড প্রভৃতি প্রচারকগণ বক্তৃতায় ও সাময়িক পত্রিকায় হিন্দুদের ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে ভারত আকাশে একাকী মাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র দীপ্তি পাইতেছিলেন— ইনি মহাত্মা রামমোহন রায়। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত সমাচারদর্পণে হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইলে, মহাত্মা

রামমোহন রায়, "ব্রাহ্মণ সেবধি" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাঁহা খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যায়, তিনি বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে উৎকৃষ্ট ভাব আছে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় পুরাণ ও তন্ত্র প্রতিপাদিত ধর্ম্ম সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে বিশদরূপে দেখাইয়াছেন যে, এক ঈশ্বরের উপাসনা বিধিবদ্ধ করাই হিন্দু শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তবে যাঁহারা নিরাকার ভাবে পরমেশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না,—তাঁহাদের জন্যই প্রতিমূর্ত্তির দ্বারা তাঁহার উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা রামমোহন রায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতা বাইবেলের পৌত্তিলকতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু, হিন্দুশাস্ত্রের মতে পরমেশ্বর এক, তবে যাঁহারা তাঁহাকে নিরাকার ভাবে ধারণা করিতে অক্ষম, তাঁহারা কোন প্রতিমা অবলম্বন করিয়া পূজা করিতে পারেন; কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান্‌দের ধর্ম্ম শাস্ত্র তিনটী দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে। দুঃখের বিষয় এই যে, এমন উজ্জ্বল রত্নকে সে সময়ের হিন্দুগণ চিনিতে পারিল না। তিনি যে প্রকৃতপক্ষে দেশ-হিতৈষী ছিলেন, তাহা কেহ হৃদয়ঙ্গম করিল না। তাঁহার কোন কোন সামাজিক ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হিন্দুগণ তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল। কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে তিনি যে একজন প্রকৃত তত্ত্ব-দর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা আর কোন হিন্দুর প্রতীতি জন্মিল না; ইহা কিছু বিচিত্র নহে। লোকের তখন শাস্ত্রজ্ঞান ছিলনা, সুতরাং, যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম যে কি, তাহা তাহারা জানিত না। বাহ্যিক অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহার পর, মহামনা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখা দিলেন। তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি অগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার যত্নে, তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া বঙ্গদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে লাগিল। শাস্ত্র সকল বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হওয়াতে, লোকের তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল, এবং পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রবন্ধাদি লিখিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। সে সময়কার সাময়িক পত্রিকার মধ্যে তত্ত্ববোধিনী শীর্ষস্থান অধিকার করিল। সুবিজ্ঞ রাজনারায়ণ বাবু মহাশয়ও "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" "সেকাল আর একাল" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া হিন্দুদিগের কাছে সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিলক্ষণরূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন হিন্দু যুবক খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল; তখন হিন্দুদিগের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দু সমাজের নেতাগণ ভীত হইলেন। পাদরি সাহেবের তর্কজাল ছিন্ন করিতে পারেন, এমন একজন ধর্ম্মবীরের আবশ্যক হইল—উপযুক্ত সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন দেখা দিলেন। তিনি তখন আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকদের সহিত ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের একে একে পরাস্ত করিতে লাগিলেন। হিন্দু যুবকগণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা বুঝিতে পারিয়া আর সে দিকে অগ্রসর হইল না। পাদরি

সাহেবেরা উদ্যম ও আশাহীন হইলেন। হিন্দু সমাজের এই মহা উপকার সাধন করাতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ দুই হাত তুলিয়া কেশবচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রতি পণ্ডিত মহাশয়দের এরূপ ভাব অধিক দিন থাকিল না। কেশবচন্দ্র যখন হিন্দুদের আচার ব্যবহারের প্রতি আক্রমণ করিতে লাগিলেন, যখন হিন্দু যুবকগণ আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটাইয়া, পিতা মাতাকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া, ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে আরম্ভ করিল, তখন হিন্দুদের চক্ষু ফুটিল, তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করার ও ব্রাহ্ম হওয়ায় কোন প্রভেদ নাই। ক্রমে ব্রাহ্মগণ কিছু বাড়াবাড়ি করিতে লাগিলেন। যাঁহারা হিন্দু পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইলেন, তাঁহারা তাঁহাদের পৌত্তলিক আত্মীয়দের সংশ্রব একেবারে ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের কোন প্রকার সাহায্য দান করা ধর্ম্ম-বিগর্হিত বলিয়া স্থির করিলেন। পাছে তাঁহাদের টাকা কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হয়, এই আশঙ্কায় পিতা মাতাকে আনুকূল্য দানে পরাঙ্মুখ হইলেন। এরূপ ব্যবহারে যে হিন্দুগণ ব্রাহ্মদিগকে বিদ্বেষ ভাবে দেখিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। হিন্দুগণ তাঁহাদের খ্রীষ্টীয়ান পুত্রদের কাছে বরং সাহায্য পাইতে পারিতেন, কিন্তু ব্রাহ্ম পুত্রদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। যদ্যপি ব্রাহ্মগণ জ্ঞানবৃদ্ধ দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়দের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের সমধিক উপকার করিতে পারিতেন। বলিতে কি, তাহা হইলে আর হিন্দুসমাজ কয়েক জন সৎপুত্রকে হারাইয়া হীনবল হইত না। তাহা হইলে, ব্রাহ্ম বলিয়া একটী সম্প্রদায় হইত না। সকলেই হিন্দু আখ্যা ধারণ করিতেন। তবে কেহ নিরাকারবাদী হিন্দু, কেহবা সাকারবাদী হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছু নূতন ধর্ম্ম নহে। হিন্দুশাস্ত্ররূপ মহাসাগর মথিত করিয়া এই অমূল্য রত্ন বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণগণ ইহাকে বাহ্যানুষ্ঠানের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় তাহা প্রকাশ করিলেন। শাস্ত্রের যাহা আদেশ, রাম মোহন রায় তাহাই বিবৃত করিলেন। জ্ঞানীর পক্ষে ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবে উপাসনা, জ্ঞানহীনের পক্ষে কোন প্রতিমা অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা;—শাস্ত্রের ইহাই অভিপ্রায়, এবং রাম মোহন রায় ইহাই প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার শিষ্য বলিয়া আপনাদিগকে শ্লাঘা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি খাঠাইতে গিয়া, হিন্দু সমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিলেন। দুর্ব্বল হিন্দু সমাজকে আরও অধিক বলহীন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে এক জন মহা পণ্ডিত দেখা দিলেন। ইনি সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে লাগিলেন। হিন্দু মাত্রেরই সন্ন্যাসীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। তাঁহার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিতে তাহারা সর্ব্বদাই উৎসুক থাকে। সুতরাং পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের মুখ-নিসৃত কথা শুনিবার জন্য অনেকেই তাঁহার কাছে গমন করিতে

লাগিল। কিন্তু যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, পণ্ডিত মহাশয় তাহাদের প্রিয় দেবতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তখন আর তাহারা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে পারিলনা। বিশেষতঃ যখন তিনি তাহাদের পূজ্যগুরু ও পুরোহিত মহাশয়দের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের অনুরাগ ঘৃণাতে পরিণত হইল,—তাহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। তবে সরস্বতী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের প্রভাবে কতকগুলি হিন্দু তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল, এবং তাহারা একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। কয়েকটী স্থানে তাঁহার মতাবলম্বীগণ আর্য্যসমাজ নামে সভা প্রতিষ্ঠিত করিল। ধর্ম্ম প্রচারকের ধৈর্য্য থাকা বিশেষ আবশ্যক। অপরের ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিতে হইলে বিনম্র ভাবে প্রকাশ করা উচিত। ক্রোধপরায়ণ হইয়া কাহারও প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা অতীব অন্যায়। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে, সরস্বতী মহাশয় মধ্যে মধ্যে ক্রোধান্ধ হইয়া বর্ত্তমান আচরিত হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিতেন। কেবল নিন্দাবাদ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না; হিন্দুগণ যে দেবতাকে ভক্তি ভাবে পূজা করিত, সরস্বতী মহাশয় সেই দেবতাকে অতি মন্দ বাক্যে অভিহিত করিতেন। প্রচারকগণ ন্যায়সঙ্গত প্রণালীর দ্বারা অপরের অবলম্বিত মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন; কিন্তু যাহাতে কাহারও মনে আঘাত লাগে, এরূপ ভাবে কোন মতের সমালোচনা করা উচিত নহে।

বঙ্গদেশে দয়ানন্দ সরস্বতীর মত অবলম্বিত হয় নাই বটে, কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তাহা সমাদর পাইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য্য সমাজ উভয়কেই হিন্দুগণ বিষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। হিন্দুগণকে স্বধর্ম্মপরায়ণ রাখিবার জন্য বঙ্গদেশে চেষ্টা হইল। কলিকাতায় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত হইল, এবং অন্যান্য স্থানেও এবম্প্রকার কয়েকটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। কোন কোন সংবাদ পত্র বিশেষতঃ ঢাকার হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকা হিন্দু ধর্ম্ম পরিপোষক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিল। এই ভাবে কিছু কাল গত হইল। ক্রমে কেশব চন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্মগণ এবং দয়ানন্দ সরস্বতী ও তাহার শিষ্যগণ অতীব উৎসাহের সহিত নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে অনেকগুলি ব্রাহ্ম সমাজ এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও পাঞ্জাবে কয়েকটী আর্য্য সমাজ সংস্থাপিত হইল। মুঙ্গের ব্রাহ্মদিগের একটী পীঠ স্থান হইয়া উঠিল। এইস্থানে ব্রাহ্মগণ ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিল। এই আন্দোলনে আমাদের যুবকগণের মতি গতি ফিরিতে লাগিল। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হইয়া তাহারা ব্রাহ্মদল ভুক্ত হইতে লাগিল। হিন্দুদিগের এ প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া জামালপুরের রেলওয়ে আফিসের এক জন সামান্য কর্ম্মচারীর মন ব্যথিত হইল। তিনি দেখিলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃতরূপে প্রচার না হওয়াতে, হিন্দুগণ ধর্ম্ম ও আচার-ভ্রষ্ট হইতেছে এবং প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত না হওয়াতে বর্ত্তমান-প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মকে অসার বিবেচনা করিয়া তাহারা একে একে ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজ ভুক্ত হইতেছে। এই

ক[illegible] বয়ক্রম অতি অল্প এবং তাঁহার ক্ষমতাও অল্প। তাঁহার দ্বারা কি কোন কার্য্য হইতে পারে? কে তাঁহার কথা শুনে, কে তাঁহাকে গ্রাহ্য করে? কিন্তু ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সামান্য সামান্য ব্যক্তির দ্বারাই মহৎ কার্য্য সম্পাদন হইয়াছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মবলে বলীয়ান, তাহার দ্বারা কোন্ কার্য্য সমাধা না হয়! স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার সহায়। এই যুবাপুরুষটীর নাম শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন। ইনিই বর্ত্তমান ধর্ম্ম আন্দোলনের মূল। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা এস্থলে আবশ্যক হইতেছে।

"সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়"। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন, মুঙ্গেরের শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বালক হইলেও তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ-বাক্য গুলি অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইল। আর্য্য-ধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। কালেকটারের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুঙ্গেরের ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়, জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত বাবু রাম প্রসাদ দাস, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাইরাম অগ্নিহোত্রি এবং প্রধান মুন্‌সেফ প্রভৃতি মহোদয়গণ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অবশেষে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৭৫) মাঘমাসে, মুঙ্গেরে আর্য্য ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন উৎসাহের সহিত হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্যমপূর্ণ বক্তৃতাগুলি সুফল উৎপাদন করিতে লাগিল। অনেকের মন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এমন কি, যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা বিজৃম্ভিত বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তাহাদেরও মন পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বিহার প্রদেশ কার্য্যভূমি হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নকে হিন্দি ভাষায় উপদেশ দিতে হইত। তাঁহার হিন্দি বক্তৃতা এত উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল যে, সে প্রদেশের লোক সকল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার উপদেশ বাক্যগুলি শুনিতে লাগিল। কিছু কাল পরে, কাশিমবাজারের জমীদার রায় অন্নদা প্রসাদ রায় বাহাদুরের ভূতপূর্ব্ব সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় আর্য্য সভায় প্রবেশ করিলেন। শুভক্ষণে মণি-কাঞ্চনের যোগ হইল। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের নানাপ্রকার সদ্ভাব পূর্ণ বক্তৃতা এবং চূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দু শাস্ত্রের নিগূঢ় অভিপ্রায় সম্বন্ধে উপদেশ, হিন্দু সমাজকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। মুঙ্গের বাসীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন শ্রদ্ধার পাত্র হইলেন। তাহারা তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল বক্তৃতার দ্বারা কোন স্থায়ী ফল ফলিবেনা। যাহাতে লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে, তৎ পক্ষে তিনি যত্নবান হইলেন। এবং এই নিমিত্ত সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। মুঙ্গেরের একজন ধনী ব্যক্তি সংস্কৃত বিদ্যালয় ও সভার কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য তাঁহাকে একটী গৃহ প্রদান করিলেন এবং বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কেহ২ অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগলেন। অবশেষে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন আরো দেখিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বালকেরা প্রকৃত রূপে উপদেশ পায় না। ইংরাজী ভাষার অনুশীলন করাতে তাহাদের মধ্যে আর্য্য ভাব স্থান পায় না। বালকদের এই গতি ফিরাইবার জন্য তিনি একটী সুনীতি সঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া এই সভার অধিবেশন হইত। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বালকদিগকে শাস্ত্র-অনুমোদিত নীতি কথা সকল শুনাইতেন। বালকগণকেও প্রতি অধিবেশনে নীতি বিষয়ক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইত। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন এই প্রবন্ধটীর উপর নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন।

একখানি সাময়িক পত্রিকা ব্যতীত উত্তমরূপে ধর্ম্ম প্রচার হইতে পারে না। এই বিবেচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ধর্ম্মপ্রচারক নামক বাঙ্গালা ও হিন্দি উভয় ভাষায় লিখিত এক খানি মাসিক পত্রিকা ১২৮৬ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নসেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে লাগিল। চূড়ামণি মহাশয়ের শাস্ত্রীয় উপদেশও ইহাতে প্রকাশিত হইত। সংসারে লিপ্ত থাকিলে পাছে ধর্ম্ম প্রচার পক্ষে ব্যাঘাৎ জন্মে, এই আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বিবাহ করিলেন না, কিন্তু তাহার আর একটী বাধা রহিল। ইহা রেলওয়ে কোম্পানির অধীনে চাকরী। সময়ে এ বাধাটীও দূর হইল। তিনি চাকরীটী পরিত্যাগ করিবেন।

এত কাল বিষয় কার্য্য করিতে ২ যখন অবকাশ পাইতেন, তখন ধর্ম্ম সভার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। মধ্যে ২ দীর্ঘ কালের জন্য অবসর লইয়া স্থানে ২ ধর্ম্ম প্রচারার্থে যাত্রা করিতেন। এখন বিষয় কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে অবসৃত হইয়া অদম্য উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ সুফল প্রসব করিল। যাহারা এতকাল হিন্দুধর্ম্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহাদের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্র-অনুমোদিত সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে লাগিলেন। বলিতে কি, কোন ২ ব্রাহ্ম পুনরায় হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয় লইলেন। স্থানে ২ আর্য্যসভা, হরি সভা ও সুনীতি সঞ্চারিণী সভা সকল সংস্থাপিত হইতে লাগিল।

পুণ্যভূমি কাশীধাম ধর্ম্ম প্রচারের মূল স্থান হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া, এবং তথায় শাস্ত্রাধ্যাপক ও সাধুগণের সাহায্য পাইবার আশায় ১২৯০ সালের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার কার্য্যালয় মুঙ্গের হইতে কাশীধামে লইয়া যাওয়া হইল। মুঙ্গেরের সভাটী শাখা সভা রূপে পরিণত হইল। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধর্ম্ম সভার সহায়তা করিতে লাগিলেন। পাকুড়ের রাজা মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিবার জন্য অর্থ প্রদান করিলেন। কাশীধামে ধর্ম্মামৃত নামে একটী যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইল।

ইহার পর, ১২৯১ সালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহোদয় কলিকাতায় আগমন করত বক্তৃতা ও উপদেশের দ্বারা নগর আন্দোলিত করিয়া তুলিলেন। অনেকের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিল। বলিতে কি, লোকের মনের ভাব পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ধর্ম্ম কথা ব্যতীত কেহ কোন কথা শোনে না। ধর্ম্ম গ্রন্থ ব্যতীত কেহ কোন গ্রন্থ পড়েনা এবং

যে নাটকে ধর্ম্ম ঘটিত আখ্যায়িকা নাই, সে নাটকের অভিনয় কেহ দেখে না। সুযোগ পাইয়া, কোন ২ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হিন্দুধর্ম্ম পরিপোষক বক্তৃতাদি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার গ্রন্থ-কর্ত্তার অভ্যুদয় হইল, যাহারা ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক সকল প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্থির করিলেন এবং রঙ্গ ভূমির অধ্যক্ষগণ নিমাই সন্ন্যাস, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিলেন, ও তাহার সঙ্গে ২ তাঁহাদের আয় বৃদ্ধিও হইতে লাগিল। যদিও কয়েকজন স্বার্থপর ব্যক্তি দেখা দিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আন্দোলন হইতে কয়েকটী উত্তম ফল ফলিল। কয়েক জন প্রকৃত দেশ-হিতৈষী বঙ্গানুবাদ সহ হিন্দু শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিলেন। ইহাদের মধ্যে বঙ্গবাসী পত্রিকার অধ্যক্ষগণ এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল মাহাশয় শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই আন্দোলনের আর একটী ফল এই যে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বঙ্কিম বাবু, যিনি উপন্যাস লিখিয়া বঙ্গবাসী-দের মোহিত করিয়াছেন, তিনি হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরিত, ভগবদগীতার ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ, নবজীবন ও প্রচার নামক দুই খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ হইয়া হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিতে লাগিল।

এই সময়ে একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছিল। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত চূড়ামণি মহাশয় এবং নব্যদলের নেতা শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু একত্রিত হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে তৎপর হইলেন। উভয়েরই লেখা নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশ হইতে লাগিল। এই মিলন হইতে অনেকেই উৎকৃষ্ট ফল পাইবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ আশা ফলপ্রদ হইল না। ইহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। চূড়ামণি মহাশয় এবং তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণের মত এই যে, হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও রীতি নীতিতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা নাই, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুগণ প্রাচীন কালের প্রবর্ত্তিত পথ পরিত্যাগ করাতেই হিন্দুসমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এখন তাহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া সেই পথে লইয়া যাওয়া উচিত। বঙ্কিম বাবু এবং তাঁহার মতস্থ ব্যক্তিগণ বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে, কতকগুলি আবর্জ্জনা পড়িয়া ইহাকে মলিন করিয়াছে, ইহা ধৌত করা উচিত। তাঁহারা আরো বলেন যে, যে সকল নিয়ম প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইতে পারে না। তাহার কোন ২ অংশ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। কিছু দিন পরে বেদব্যাস নামক এক খানি পত্র প্রকাশ আরম্ভ হইল। তাহাতে চূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার সম্বন্ধে এখন কি করিতেছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু চূড়ামণি মহাশয় এখনো উপদেশ আদির দ্বারা হিন্দুদিগকে অবলম্বনীয় পথ দেখাইয়া দিতেছেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে দুইটী সভা হইতে দুইটী কার্য্যের সূত্রপাৎ হইয়াছিল। রাজ-সাহী ধর্ম্মসভা প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে,

ম্লেচ্ছান্ন-ভোজীদের সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করা হয় এবং সেই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সভ্যগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানজেলার অন্তর্গত দাঁইহাটস্থিত হরি সভা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয় যে, হিন্দুসমাজের বন্ধন দৃঢ় করা উচিত এবং তাহার সঙ্গে ২ ব্রাহ্মণদের পদগৌরব রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বঙ্গবাসী পত্রিকায় এই দুইটী বিষয়ের সমালোচনা হইয়াছিল, এবং ইহার পরিপোষক কয়েকটী প্রবন্ধ তাহাতে প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু, আজ কাল সে সম্বন্ধে কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে এই দুইটী প্রস্তাব কতদূর পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করা যায়, তাহা একবার আলোচনা করা যাউক।

হিন্দু সমাজকে শাসনে রাখা উচিত বটে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, কি প্রকার শাসন আবশ্যক! রাজসাহী ধর্ম্ম সভার সভ্যগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে,। ম্লেচ্ছ অন্ন-ভোজীদের সহিত আহার ব্যবহার ত্যাগ করিবেন; কিন্তু, আমরা দেখিতেছি যে, এ প্রতিজ্ঞাটী রক্ষা করা সম্ভব নহে। আমরা আপনারাই যখন ম্লেচ্ছদের খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ করিতেছি, তখন আমরা অপরকে কি প্রকারে শাসন করিব? ভিন্ন দেশজাত দ্রব্য মাত্রই হিন্দুদের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু, বিলাতি আলু, কোপী, কাবুলি মেওয়া প্রভৃতিও এখন বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মুড়ি মুড়কী পাইলেই বালকেরা তুষ্ট থাকিত। এখন পাঁওরুটী বিসকুট নইলে তাহাদের জলখাবার চলেনা। কেবল বালক কেন, বৃদ্ধেরাও এই সকল পথ্য স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন বটে যে, এ সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণের দোকানের, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, অনেক স্থলে, ব্রহ্ম-চারী * কর্ত্তৃক তাহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভাল, না হয় স্বীকার করা গেল যে, পাঁওরুটী ও বিসকুট ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত করা, কিন্তু সোডা লিমনেড্, বরফ প্রভৃতি যে প্রকাশ্যরূপে হিন্দু সমাজে প্রচলিত। এ সমস্ত যে স্পষ্ট যবন ও ম্লেচ্ছদের হাতের জল।

শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, হিন্দু মাত্রেরই তাহার অনুষ্ঠান করা অনুচিত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, কোন ২ ব্যবহার শাস্ত্রের শাসন বাক্য অতিক্রম করিয়া অনায়াসে চলিয়া আসিতেছে! পলাণ্ডু ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এমন কি, শাস্ত্রে এরূপ শাসন আছে যে, যে ব্রাহ্মণ ইহা ভক্ষণ করিবে, সে পতিত হইবে। পরে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া গব্য পান করিলে তবে সে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে ইতর জাতি পর্য্যন্ত সকলেই পলাণ্ডু ভক্ষণ করিয়া থাকে। যবনকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, কিন্তু বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতবর্ষের অপর অংশের হিন্দুগণ মুসলমানদের সহিত একত্রে বসিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যাইতে পারে। যে স্থানে লৌকিক ব্যবহার শাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়াছে, সে স্থলে কি করা কর্ত্তব্য? সমাজকে শাসন করিতে হইলে, শাস্ত্রকে, না, প্রচলিত ব্যবহারকে গ্রাহ্য করিতে হইবে?

বর্ত্তমান সমাজে আমাদের অবস্থার

* দাড়িওয়ালা মুসলমান।

পরিবর্ত্তন জন্য কত শাস্ত্র অনুজ্ঞা মত আমরা কার্য্য করিতে পারি না। যজ্ঞ উপবীত হইবার পর আমাদিগকে অন্যূন বারো বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত শাস্ত্র আলোচনা এবং গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। পরে গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এ পদ্ধতি অনুসারে কে কার্য্য করিয়া থাকে? দুঃখের কথা কি কহিব, যিনি গুরুদেব, তিনিই আপনার পুত্রকে শাস্ত্র আলোচনার পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষা শিখাইতেছেন। ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয়, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আফিসে চাকরী করেন, তাঁহারা কি প্রকারে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সমাধা করিতে পারেন?

হিন্দু সমাজের দলপতিগণকে ন্যায় মত বিচার করিতে দেখা যায় না, এবং অধ্যাপক মহাশয়দের মধ্যেও শাস্ত্রীয় কথা সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। যাঁহারা ধনী এবং দেশমান্য, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রবিপরীত কার্য্য করিলেও পতিত হয়েন না, কিন্তু মধ্যবিৎ ব্যক্তিদের ত্রুটী লইয়া যত আন্দোলন। আবার কতকগুলি অধ্যাপক মহাশয় কোন বিষয় সম্বন্ধে যে প্রকার শাস্ত্রীয় মীমাংসা করেন, অপর কতকগুলি পণ্ডিত তাহার বিপরীত ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। জ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত যাঁহারা ইউরোপ ও আমেরিকায় গমন করেন, তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করা হয়, কিন্তু যাঁহারা হোটেলে গিয়া অথবা নিজ বাটীতে বসিয়া বিজাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের প্রতি কেহ লক্ষ্য করে না। তাঁহারা বিশুদ্ধ হিন্দুর ন্যায় সমাজ মধ্যে বিরাজ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা হিন্দুয়ানী বজায় রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং যাঁহারা অনাচারী হিন্দু দিগকে শাসন করিবার জন্য সমুৎসুক, তাঁহাদিগকেই অত্যাচার করিতে দেখা যায়। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি;—বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে নানা প্রকার শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে, এবং এতদ্দারা সাধারণের যে যথেষ্ট উপকার হইতেছে তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষদের ইহা একটী মহাকীর্ত্তি, এবং এজন্য বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ। কিন্তু আজ কাল যে ভাবে ধর্ম্ম আন্দোলন চলিতেছে, অত্যাচারীদের শাসনে আনিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টিপাৎ করিলে, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষগণ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন। এই যে শাস্ত্রীয় বাক্য—বেদবাক্য সকল, স্ত্রী, শূদ্র, বলিতে কি, যবন ও ম্লেচ্ছদের গোচর হইতেছে, ইহা কি হিন্দু ধর্ম্মের অনুমোদিত। অধিক কি বলিব, বৈদিক সন্ধ্যাও তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে। ফল কথা এই যে, এক সময়ে ভারতবর্ষে যাহা প্রচলিত ছিল, তাহা যে আবহমান কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিবে, এরূপ হইতে পারে না। অবস্থার পরিবর্ত্তন সহ তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষে এপ্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের পূজনীয় ঋষিগণই কত বিষয় পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষেরা শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া ভালই করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে, স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতিকে শাস্ত্রীয় জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করা যে অন্যায়, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

এখন তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে উদারতা দেখান, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

আমরা হিন্দুসমাজের শাসন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এখন ব্রাহ্মণদের পদগৌরব রক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিব। এখন প্রশ্ন এই, ব্রাহ্মণ কে? ইহার প্রকৃত উত্তর এই, যিনি ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। এখন দেখা যাউক, ব্রাহ্মণের কি ২ কর্ত্তব্য? পরাশর-নিরূপিত ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই জন্য আমরা পরাশর-সংহিতাকে অবলম্বন করিব। এই সংহিতায় দ্বিজগণের এই কয়েকটী কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, দেবতার অর্চ্চনা এবং বৈশ্বদেব ও অতিথির পরিচর্য্যা (১)। ইহাতে এইরূপ শাসন বাক্যও আছে, যাঁহারা বৈশ্বদেবের বলি না দিয়া ভোজন করেন, তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, এবং তাঁহারা নিরয় গামী হয়েন (২)। কদাচারী ব্রাহ্মণকে এক স্থলে চোর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, যথা;—কোন গ্রামে, অনৃতাচারী ও অধ্যয়নবিহীন দ্বিজগণ ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে, রাজা গ্রামস্থ লোকদিগকে দণ্ড দিবেন, যেহেতু তাহারা ভিক্ষা দিয়া চোরকে প্রতিপালন করে (৩)। বর্ত্তমান সময়ে উল্লিখিত কর্ত্তব্যগুলি প্রতিদিন সমাধা করেন, এমন ব্রাহ্মণই বা কোথায় এবং কদাচারী বিপ্রগণকে শাসনে রাখেন, এমন দণ্ডকর্ত্তাই বা কে? ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পদযোগ্য কার্য্য করুন। আপামর সাধারণকে সদুপদেশ প্রদান করুন, অবশ্যই তাঁহারা সম্মান লাভ করিবেন।

এখন আর একটী বিষয়ে মীমাংসা করা আবশ্যক হইয়াছে। ব্রাহ্মণত্ব কি জাতির উপর নির্ভর করে? এ সম্বন্ধে প্রাচীন কালের আর্য্যমহানুভবগণ কি বলিয়াছেন, তাহা একবার আলোচনা করা যাউক— মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির অজাগর কর্ত্তৃক প্রদত্ত দুইটী প্রশ্নের এই রূপে উত্তর দিয়াছেন;—

প্রশ্ন। ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি?

উত্তর। সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া যাঁহাতে লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ।

প্রশ্ন। যদি কোন শূদ্রে এই সকল লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে সেও, কি ব্রাহ্মণ হইতে পারে?

উত্তর। ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব হইলেই যে কেহ ব্রাহ্মণ হইবে, তাহা নহে; আর শূদ্র বংশে জন্মিলেই যে কেহ শূদ্র হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। কিন্তু যাহাতে উল্লিখিত আচরণ সকল দেখা যায়, তিনিই ব্রাহ্মণ।

মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মে বর্ণিত আছে যে, একদা মহর্ষি ভরদ্বাজকে, ব্রহ্মর্ষি ভৃগু বলিয়াছিলেন, হে তপোধন! মনুষ্যলোকে জাতি বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। সমুদায় জগতই ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়া মনুষ্যগণ ক্রমে ২ স্ব ২ কর্ম্মের দ্বারা ভিন্ন ২ জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

এই পর্ব্বের আর এক স্থানে ব্যাসদেব তাঁহার পুত্র শুকদেবকে যে উপদেশ দেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে; যাহার মানেও হর্ষ নাই, অপমানেও ক্রোধ

(১) প্রথম অধ্যায় ৩৮ শ্লোক।

(২) প্রথম অধ্যায় ৪৮ শ্লোক।

(৩) প্রথম অধ্যায় ৫৬ শ্লোক।

নাই এবং যিনি সকল জীবের অভয়দাতা, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন। যিনি স্তুতি ও নমস্কারে সুখ বোধ করেন না এবং যিনি সকল বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন।

নিরালম্ব উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা ভরদ্বাজ মুনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কো ব্রাহ্মণঃ; ব্রাহ্মণ কে? ইহার প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

এক সময়ে ভৃগুমুনি ভরদ্বাজকে বলিয়াছিলেন ;—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥

মহাভারত মো, ধ, ১৪।১০

অর্থাৎ, বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। এই জগতে, পূর্ব্বে সকলেই ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল। ক্রমে ২ তাহারা কর্ম্মভেদে নানা বর্ণে পরিণত হইয়াছিল।

এক বর্ণভুক্ত লোক অন্য বর্ণ প্রাপ্তি হইবার বিধিও শাস্ত্রে আছে, যথা :—

শূদ্রেচৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

মহাভারত মো, ধ, ১৫।১৮

অর্থাৎ যদ্যপি কেহ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় লক্ষণ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে শূদ্র রূপে গণ্য হইবে এবং যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে জন্ম হইয়াও ব্রাহ্মণদের লক্ষণ যুক্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

মনু, ২।১৬৮।

অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাদি লাভে যত্নবান হয়েন, তাঁহারা জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

অগ্নিকার্য্যাৎ পরিভ্রষ্টাঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতাঃ।
বেদঞ্চৈবানধীয়ানাঃ সর্ব্বে তে বৃষলাঃ স্মৃতাঃ॥
তস্মাদ্বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অধ্যেতব্যোঽপ্যেকদেশো যদি সর্ব্বং ন শক্যতে॥

পরাশর ১২শ অধ্যায়, ২৯।৩০।

অর্থাৎ যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিকার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, যাহারা সন্ধ্যা উপাসনা আদি করে না এবং যাহারা বেদপাঠে বিরত, তাহাদিগকে বৃষল বলা যায়। অতএব যাঁহাদের বৃষল হইবার আশঙ্কা আছে, তাঁহাদের উচিত যে সমগ্র বেদ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলেও তাহার একাংশ মাত্রও অধ্যয়ন করেন।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাত্তবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

অর্থাৎ, জন্ম কালে সকলেই শূদ্র থাকে, উপনয়ন আদি সংস্কার হইলে তাহাদের দ্বিজ বলা হায়, বেদ অভ্যাস করিলে তাহারা বিপ্র হায় এবং ব্রহ্মকে জানিলে তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়।

অত্রি সংহিতায় আছে :—

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত না হইয়া ব্রহ্মসূত্র ধারণ জন্য গর্ব্বিত, তিনি সেই পাপের নিমিত্ত বিপ্র-পশু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আমরা দেখিলাম যে, যাঁহারা ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সকল পালন করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যাঁহারা তৎপক্ষে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা পতিত এবং ব্রাহ্মণোচিত সম্ভ্রম ও বৃত্তি লাভে বঞ্চিত। প্রাচীন

কালে রাজ শাসন ছিল; সুতরাং কদাচারী দ্বিজগণ যে দণ্ডিত ও সমাজচ্যুত হইতেন, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া গুণের প্রভাবে উচ্চশ্রেণী ভুক্ত হওয়া সহজ কথা নহে। আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা দেখাইলাম বটে যে, ব্রাহ্মণত্ব জাতির উপর নির্ভর করে না এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। এখন দেখা যাউক. নিম্ন-শ্রেণীস্থ ব্যক্তি গুণের প্রভাবে উচ্চ-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছেন কি না।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ঋষভের এক শত পুত্রের মধ্যে একাশীতি জন কর্ম্ম-তন্ত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, এবং কবি হবিঃ প্রভৃতি নয় জন পরমার্থ নিরূপক মুনি হইয়াছিলেন। এতদ্‌গ্রন্থের নবম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; দুরিতক্ষয়ের তিন পুত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। এই অধ্যায়েতেই আছে যে, মুদ্গল হইতে ব্রাহ্মণ জাতির মৌদ্‌গল্য গোত্র সম্ভূত হয়। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের একবিংশ অধ্যায়ের শেষে বিবৃত হইয়াছে যে, যে বংশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের উৎপাদক এবং যে বংশ রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত, সেই বংশ কলিযুগে ক্ষেমক নামক রাজাতেই শেষ হইবে। হরিবংশের অন্তর্গত হরিবংশ-পর্ব্বের একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র পূর্ব্বে বৈশ্য ছিলেন, কিন্তু কালে তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। শূদ্র জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিও যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। বশিষ্ঠ-পত্নী অক্ষমালা এবং কণাদের জননী উলকী পূর্ব্বে শূদ্রা ছিলেন, এবং বলিতে কি, ভগবান ব্যাসদেবের জননী শূদ্রা ছিলেন। যখন পরশুরাম সমুদ্র তীরে বাস করেন, তিনি কতকগুলি ধীবরকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়া তাহাদিগকে উত্তর কোকণে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে, এই সকল ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যে, কোকণস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত।

শূদ্রাদি নিকৃষ্ট বর্ণের অন্তর্গত বংশ, ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে বদ্ধ হওয়াতে, উচ্চ বর্ণ প্রাপ্ত হইবার প্রমাণ আছে। যথা মনুসংহিতায়;—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্ যুগাৎ॥১০।৬৪
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥১০।৬৫

অর্থাৎ বিবাহিতা শূদ্রাতে ব্রাহ্মণের ঔরস জাতা পারশব নাম্নী কন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে, এবং এই প্রকার ব্রাহ্মণ সংসর্গ যদ্যপি ধারাবাহিক সাত পুরুষ পর্য্যন্ত চলে, তাহা হইলে সপ্ত জন্মে উপরোক্ত পারশবাখ্য বর্ণ, বীজের উৎকর্ষতা জন্য, ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং এই পদ্ধতি ক্রমে যেমন শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও শূদ্র হয় এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহার দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীন কালে আর্য্য-সমাজ অতি উদারভাবে সঞ্চালিত হইত।

জাতি-বিভাগ অনিষ্টের কারণ না হইয়া সমাজকে পবিত্রভাবে রক্ষা করিত। যেমন এক দিকে আপন আপন সৎকার্য্যের প্রভাবে হীন জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ বর্ণের অন্তর্গত হইতেন, তেমনি অপর দিকে, ব্রাহ্মণ আদি উৎকৃষ্ট বর্ণ ভুক্ত ব্যক্তি-গণ আপন আপন কর্ত্তব্য না করিলে পতিত অথবা হীন জাতি প্রাপ্ত হইতেন। প্রাচীন আর্য্য সমাজে আর একটী উদারভাব দেখা যায়—প্রথম তিনটী বর্ণের মধ্যে আহার ব্যবহার চলিত। ক্ষত্রিয় রাজাগণ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন, এবং তাঁহারা আনন্দের সহিত ভোজন করিতেন। মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পাণ্ডবদের বনবাস কালে দ্রৌপদী স্বয়ং রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন। এতৎ সম্বন্ধে পরাশর সংহি-তায় একটী উদার ব্যবস্থা দেখা যায়, যথা ;—

ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ॥১১। ১৩

অর্থাৎ, যদ্যপি কোন ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য শুদ্ধাচার ও সৎকর্ম্মশীল হয়েন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা সকল সময়ে দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে তাঁহার বাটীতে ভোজন করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের কথা কি কহিব, বর্ত্তমান সময়ে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই কত দল দেখা যায়।

বঙ্গদেশে, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামেও দুটী প্রধান শ্রেণী আছে। আবার এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত কত বিভাগ আছে। এতদ্ভিন্ন বৈদিক, সপ্তশতী প্রভৃতি কত ছোট ছোট বিভাগ রহিয়াছে। এই সকল বিভাগেও বঙ্গসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আবার তাহার উপর কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত হইয়া আমাদের দুরবস্থার একশেষ করিয়াছে। একশ্রেণীর কিম্বা এক বিভাগের ব্রাহ্মণ ও অন্য শ্রেণী বা বিভাগের ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিবেই না। দুঃখের কথা কি বলিব, একজন বড় কুলীন ছোট কুলীন কিম্বা কুলহীনের বাটীতে ভোজন করিবেনা। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দেখা যায় যে, তথাকার সমাজ দোবে চোবে প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত এবং এক বিভাগের লোক অন্য বিভাগের লোকের সহিত ভোজন করে না। বলিতে কি, এ অঞ্চলে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র চৌকা। দাক্ষিণাত্যেও এই ভাব। কোকণস্থ, দেশস্থ প্রভৃতি কয়েকটী ভাগে এখানকার সমাজ বিভক্ত। কিন্তু অন্য প্রদেশ অপেক্ষা আমাদের বাঙ্গালা দেশের অধিক দুর্দ্দশা দেখা যাইতেছে। বড় বড় প্রত্ন-তত্ত্ববিৎগণ স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গের কায়স্থগণ শুদ্র নহেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। কিন্তু, ব্রাহ্মণদের এতদূর আধিপত্য যে, তাঁহাদিগকে শূদ্রের ন্যায় অবস্থিতি করিতে হইয়াছে। উপাধির পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে "দাস" শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, সভাতে তাঁহাদের বসিবার স্থান স্বতন্ত্র হইবে, এবং কোন বাটীতে নিমন্ত্রিত হইলে, ব্রাহ্মণদের ভোজন হইলে পর তাঁহারা ভোজন করিতে পারিবেন। দাক্ষিণাত্যও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণে পরিপূরিত—এখানেও এপ্রকার কঠোর নিয়ম নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাক, ব্রাহ্মণগণ এক ঘরে শূদ্রের সহিত ভোজন করিয়া থাকে, তবে পঙক্তি মাত্র ভেদ—ব্রাহ্মণদের এক পঙক্তি এবং শূদ্রদের আর এক পঙক্তি। এ অঞ্চলে কত ব্রাহ্মণ ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন,

কিন্তু কাহাকেও সমাজচ্যুত হইতে দেখা যায় না। অবশ্য তাঁহারা শাস্ত্রীদিগের আজ্ঞামত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এ সম্বন্ধে যে প্রকার উৎপীড়ন হইয়া থাকে, এদেশে তাহার কিছুই দেখা যায় না। ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণ অতীব সংকীর্ণ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা যে তাঁহারা দেশের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। নানা কারণে আমাদের দেশের লোককে ইউরোপ কিম্বা আমেরিকায় যাইতেই হইবে এবং ক্রমে ক্রমে এই সকল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এখন দম্ভের বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিতে পারেন, কিন্তু যখন তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হইবে, তখন তাঁহারাই হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন। নিম্ন বর্ণভুক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতিও ব্রাহ্মণ মহাশয়দের উদারতা দেখান উচিত। আজকাল ব্রাহ্মণেরা আপন আপন কর্ত্তব্য সাধনে বিরত, আবার তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কদাচারী। এ অবস্থায় তাঁহাদের নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের সমক্ষে লজ্জায় মস্তক নত করা উচিত। কিন্তু এরূপ করা দূরে থাক্, তাঁহারা অপর জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এবং যদ্যপি কোনরূপে মর্য্যাদার ক্রটী হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকেনা। তাঁহারা নিজে সম্মান পাইবার যোগ্য নহেন, অথচ অপর কেহ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান না দিলে তাঁহারা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। অধিক কি বলিব—তাঁহাদের "একটু খানি বিষ নাই কুলো পানা চক্র"। ব্রাহ্মণদের বিবেচনা করা উচিত যে, কায়স্থ ও শূদ্রদের মধ্যে এমন সকল সাধুচেতা লোক আছেন, যাঁহারা কোন অংশে তাঁহাদের তুলনায় হীন নহেন। এ সকল লোককে দাস আখ্যা দিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখা কি ব্রাহ্মণ মহাশয়দের উচিত? এই সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, এবং প্রাচীন কাল হইলে তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় একেবারে প্রাচীন কালের নিয়ম অবলম্বন করা পরামর্শসিদ্ধ নহে, এবং সেরূপ চেষ্টা করিলে সুফল প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাক্, বরং অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু, ব্রাহ্মণদের উচিত যে, নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে উদারতা দেখাইতে যত্নবান হয়েন। সর্ব্ব প্রথমে পুরুষদের নাম হইতে "দাস" এবং রমণীদের নাম হইতে "দাসী" উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এখন দেখা যায়, অনেকে গোপন ভাবে নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের বাটীতে জলযোগ করিয়া থাকেন। এ প্রকার কপটতাচরণের প্রয়োজন দেখিনা। প্রকাশ্য ভাবে ভদ্রলোকের বাটীতে মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না। এরূপ করিলে আরো উদারতা দেখান হয়, এবং তাহা হইলে ব্রাহ্মণদের সহিত অন্য শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সদ্ভাব বৃদ্ধি হয়। প্রাচীন কালে যখন ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দের বাটীতে প্রকাশ্যরূপে ভোজন করিতেন, তখন বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থদের বাটীতে "ফলাহার" করা ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য বলা যাইতে পারে না। আমরা অবগত আছি যে, ভদ্র কায়স্থ ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণদিগকে রীতিমত সম্মান করিয়া থাকেন, এবং আমরাও আশা করি, তাঁহারা এই প্রকার

ব্যবহার করিতে থাকিবেন [illegible] ব্রাহ্মণ গুণান্বিত, তাঁহারাত [illegible] হইবেনই; কিন্তু, যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের ন্যায় গুণ সম্পন্ন নহেন, দেশ পূজ্য-ঋষিগণের বংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহারাও সম্মান পাইবার যোগ্য।

—

বর্ত্তমান সময়ের বিবাহ পদ্ধতি আমাদের সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিতেছে। প্রাচীন কালে, শূদ্রবংশ হইতেও ব্রাহ্মণ আদি শ্রেষ্ঠ বর্ণভুক্ত লোক কন্যা গ্রহণ করিত, এবং এই প্রকার বৈবাহিক বন্ধনের জন্য অনেক শূদ্রবংশ ক্রমে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইত। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিলে শুভ ফল না ফলিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত এক শ্রেণীর লোকের অন্য শ্রেণীর লোকের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দুইটী প্রধান বিভাগ, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র—আছে। আবার এই দুইটী বিভাগের অন্তর্গত কত শ্রেণীই সংস্থাপিত হইয়াছে। কৌলিন্য প্রথাই বঙ্গীয় সমাজকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া আমাদের মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ইহা হইতে, বহু বিবাহের জঘন্য দৃশ্য আমাদের নয়ন গোচর হইতেছে—ইহাই শিশুবিবাহ ও কন্যা বিক্রয়কে প্রশ্রয় দিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই জঘন্য কৌলিন্য প্রথা শাস্ত্রীয় শাসনকে পদদলিত করিয়া মহা দম্ভে বিরাজ করিতেছে। শাস্ত্রের শাসন এই যে, পুষ্পবতী কন্যাকে কোনমতেই অবিবাহিতা রাখা যাইতে পারেনা; কিন্তু কুলীনগণ অনায়াসেই এ কঠোর শাসনকে অতিক্রম করিতেছেন। [illegible] কুলীন জন্য হিন্দুমাত্রকেই কলুষিত [illegible] জন্য তাহাদিগকে প্রা[illegible] কুলীন মহাশয়েরা নিষ[illegible]ন করেন, তাঁহারা পবিত্র থাকেন, এবং তাঁহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নাই। আমাদের সমাজে এই প্রকার বৈষম্য আছে বলিয়াই ত রাজপুরুষেরা আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না। এবং এত প্রতিবাদের পর ও যে, সহবাস সম্মতির আইনের পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইল, আমাদের সমাজের শিথিলতা তাহার একটী প্রধান কারণ। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমরা কিছুকাল পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, কৌলিন্য প্রথা আর অধিক দিন আধিপত্য করিতে পারিবেনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়েও অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে ইহার বশ্যতা স্বীকার করত ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতে দেখা যায়। কুপ্রথার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ইহা একবার বদ্ধমূল হইলে ইহাকে উৎপাটিত করা কঠিন হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় আমাদের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। সকলে বদ্ধপরিকর হউন। যদ্যপি কৌলীন্য প্রথাটীকে উঠাইতে ইচ্ছা না করেন, ইহাকে সংশোধন করুন। ইহার অন্তর্গত কয়েকটী মেল একত্র করুন এবং যাহাতে বহুবিবাহ প্রভৃতি আমাদের সমাজকে কলুষিত না করে, তৎপক্ষে যত্নবান হউন।

উপরে যাহা বিবৃত করা হইল, তাহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, শাস্ত্রকারগণ সামাজিক নিয়ম সকল অতি উদারভাবে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা [illegible]

না চলিয়াই কত অনিষ্টের ... করিয়াছি। আমরা ... যে, শা... রাখিয়া ব... করিয়াছেন। পরাশর সংহিতা কলিযুগের শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে লিখিত আছে—

ষট্ কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ কৃষি কর্ম্মাণি কারয়েৎ। ২। ২

অর্থাৎ ষট্ কর্ম্ম নিরত বিপ্র কৃষি কর্ম্ম করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ যে স্বয়ং ভূমি কর্ষণ করিতে পারেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই এই ব্যবস্থাটী দেখিতে পাই—

স্বয়ং কৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ
নির্ব্বপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ ॥ ২। ৭

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ স্বয়ং ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া স্বোপার্জ্জিত ধান্য দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ করিবে এবং ক্রতুদীক্ষা করাইবে।

কৃষিকার্য্য ব্যতীত ব্রাহ্মণগণ কোন কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ধন উপার্জ্জন করিতে পারেন। যথাঃ—

তিলা রসা ন বিক্রেয়া বিক্রেয়া ধান্য তৎসমাঃ।
বিপ্রস্যৈবংবিধা বৃত্তিস্তৃণকাষ্ঠাদিবিক্রয়ঃ ॥ ২। ৮

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের তিল ও রস বিক্রয় করা নিষেধ, কিন্তু, ধান্য ও তাহার সদৃশ দ্রব্য এবং তৃণ কাষ্ঠাদি বিক্রয় করিতে পারেন। তাঁহাদের এবম্প্রকার বৃত্তি দূষণীয় নহে।

আজকাল, ক্ষেত্র কর্ষণ এবং ধান্য কাষ্ঠাদি বিক্রয় অতি হেয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, অর্থ উপার্জ্জন যেরূপ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের সমাজে এ প্রকার সংকীর্ণ ভাব থাকা উচিত নহে। বিশেষতঃ এ কার্য্য ...মেত, তখন আমাদের ইহা ...রা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম আলোচনা সম্বন্ধেও শাস্ত্রকারগণ উদারতা দেখাইয়াছেন। যদিও স্ত্রী জাতি ও শূদ্রের বেদে অধিকার নাই, তথাপি তন্ত্র-শাস্ত্র অনুযায়ী সন্ধ্যা ও পূজা করিতে তাহাদের কোন বাধা নাই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে, মহাদেব পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

শূদ্র সামান্য জাতীনামধিকারোঽস্তি কেবলম্।
আগমোক্ত বিধৌ দেবি সর্ব্বসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥ ৮। ৮০

অর্থাৎ হে দেবি! শূদ্র ও অন্যান্য সামান্য জাতির কেবল তন্ত্র উক্ত বিধিতেই অধিকার আছে। তাহার দ্বারাই তাহাদের সকল প্রকার সিদ্ধি হইবে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—নাথ! তুমি বলিয়াছ যে, কলি প্রবল হইলে সমুদায় বর্ণেরই তন্ত্র অনুসারে কার্য্য করা উচিত, তবে এখন কেন ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিক ক্রিয়াতে নিয়োজিত করিতেছ। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বলিলেনঃ—

দ্বিজাদীনাং প্রভেদার্থং শূদ্রেভ্যঃ পরমেশ্বরি।
সন্ধ্যেয়ং বৈদিকী প্রোক্তা প্রাগেবাহ্নিক কর্ম্মণাম্ ॥ ৮।৮৮
অন্যথা শাম্ভবৈর্ম্মার্গৈঃ কেবলৈঃ সিদ্ধিভাগ্ভবেৎ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৮।৮৯

অর্থাৎ, হে পরমেশ্বরি! শূদ্র হইতে দ্বিজগণকে পৃথক করিবার জন্যই, তাহাদের তন্ত্র বিহিত আহ্নিকের পূর্ব্বে বৈদিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; নতুবা, বৈদিক সন্ধ্যা না করিয়াও কেবল শৈব পদ্ধতির অনুসারে চলিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। ইহা যে সত্য এবং বিশেষরূপে সত্য তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। মহাদেবের এই

বাক্যগুলির দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, দ্বিজগণের গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই মহাদেব এবম্প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর বেদের মর্য্যাদা রক্ষা করাও তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়। যে দ্বিজগণ এক সময়ে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত হইয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং ভারতবাসীদের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ বিহিত সম্মান প্রাপ্ত হয়েন, ইহা কাহার না ইচ্ছা? আর বেদের কথা কি কহিব? যে বেদ শাস্ত্রের আদেশ সকল পালন করিয়া ভারতবাসীগণ এক সময়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং বলিতে কি, মানবমণ্ডলীর শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া ছিল, যে বেদ কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও বিশেষরূপে সমাদৃত, সে বেদ কি কখন উপেক্ষিত হইতে পারে? ক্রমশঃ।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মূক বালিকা।

১

নীরবে তারকা ফুটে আঁধার রজনী-গায়;
চমকি লহরীশিরে নীরবে জ্যোছনা ভায়;
নীরবে কুসুম হাসে
লুকায়ে পাতার পাশে;
নীরবে প্রণয় জাগে হৃদি-ফুল-বিছানায়;
নীরবে ত্রিদিব-বালা
উষা, পরি ফুলমালা,
চমকি দিগন্ত রূপে নয়ন মেলিয়া চায়;
নীরবেতে শশী রবি,—
মৃদুতা প্রতাপ ছবি,—
ভাসিয়া আকাশ-মাঝে কিরণ ছড়ায়ে যায়;
নীরবে প্রকৃতি বসি
রচেন সুষমা-রাশি,
নীরব মাধুরি ধরে ঘুমন্ত শিশুর কায়;
[illegible]নী বসন্ত রেতে
প্রফুল্ল মল্লিকা হতে
পরিমল নীরবেতে আলোতে মিশায়ে রয়!

২

এরা ত কহেনা কথা, এরা ত গাহেনা গান,
শ্রবণে মদিরা ঢালি এরা না মাতায় প্রাণ;
তবু যেন মনে হয়,
কি ভাষা ইহারা কয়;
ত্রিদিব ঝঙ্কারে পূরি মরম-নিভৃত-স্থান!
বুঝিবা হৃদয়-মাঝে
সূক্ষ্মতম তন্ত্রী আছে,
রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধে বাজে যাহা অনুক্ষণ;
মধুর স্পন্দনে যার,—
নিমেষেতে কোটিবার,—
তারার সপ্তম ছাড়ি উঠে সুর আ-গগন,
শবদের স্থূলজ্ঞান
না পরশে সেই তান,
অতীত-শ্রবণ বুঝি সে সংগীত নিরুপম;
কিম্বা বাজে সে ঝংকার
শ্রবণেতে দেবতার
মাটি যার পদতলে নরের আকাশ-ভূম।

৩

তুমিও কহনা কথা, তুমিও গাহনা গান,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, অমনি উথলে প্রাণ;
কি ভাষা নীরব চোকে,
কি কথা নীরব মুখে,
ফুটেনা বচনে যাহা,—এমনি সে উচ্চতান!

হৃদয়েতে কি উচ্ছ্বাস,
মানসে কি অভিলাষ,
কিবা আশা, সুখ, দুঃখ, কি করুণা, অভিমান,
প্রাণের কি পিপাসা,
যৌবনের কি লালসা,
কি মধুর প্রেম-ব্যথা, নীরব বিষাদ-গান,—
নন্দনে মন্দার মত
ফুটে আছে পুষ্প শত
হৃদয়ের কুঞ্জবনে জুড়ায়ে নয়ন, প্রাণ;
পশে মর্ত্ত্য-হৃদি-মাঝে,
কিন্তু কাণে নাহি বাজে,
ভাসে মুখে,হাসে চোকে,আকুলি বিস্মিত প্রাণ!

৪

দেখিয়া তোমার মুখ নীরবে চাহিয়া থাকি,
গভীর উচ্ছ্বাস-ময় বিষাদে হৃদয় মাখি;
নীরবে নীরব ভাষা
বুঝিতে গো করি আশা,
বুঝি, বুঝি, করি, ভাবি, বুঝিবার আছে বাকি!
কুসুম-কাননে বসি
সুগভীর অমানিশি
সুরভি-আঁধার-মাঝে ফুল কোথা চেয়ে দেখি,
নয়নে আঁধার ঢাকে
কুসুম অদৃশ্য থাকে
ঘ্রাণে পরিচয় করি কি ফুল ধরেছে শাখী;
শ্রুতির আঁধার মাঝ,
নয়নে কাণের কাজ
করিয়া, তেমতি, বুঝি তব মর্ম্মকথা বা কি?
তেমতি, গো, অনুমানে,
প্রাণের অস্ফুট জ্ঞানে
হরষ, বেদনা তব বিচারি নিরখি আঁখি!

৫

চিত্রকর আঁকে ছবি ধরি যাদু তুলিকায়,
কল্পনে বিবিধ চারু বরণ পটের গায়;
অসরল রেখা-মাঝে,
অঙ্গের মিলন সাজে,
প্রতিকৃতি অপরূপ জনমে সুন্দর তায়;
হৃদয়ের ভাবগুলি
রেখায় পরশি তুলি;
জড়কে জীবন্ত করি সুষমার পূর্ণতায়;
কল্পনার ছবিখানি
ভাসায় পটেতে আনি,
আনন্দ বিষাদে পুরি, হাসায়, কাঁদায়, হায়!
নীরবে ধরিয়া বাঁধে
মনোমত বাছা ছাঁদে,
পরিহরি, মনোমত, কঠোরতা, ক্ষুদ্রতায়;
একটি কল্পনা-লীলা
সে পটেতে করে খেলা,—
ছবিত কহেনা কথা, কিন্তু হৃদি সে দেখায়,—
ছবিত কহেনা কথা, কিন্তু হৃদি সে মাতায়!

৬

মরতের চিত্রপটে তেমতি, গো, মনে মানি,
রচিল বিধাতা তোমা দেখাতে জগৎ-প্রাণী;
চঞ্চল নয়ন কোলে
প্রাণের মূরতি খেলে,
গালের গোলাপথরে ফুটে হৃদয়ের বাণী;
স্ফুরিত অধর ভাগে
কত প্রেম, ঘৃণা জাগে,
উরস-স্পন্দনে তব বাজে কি গভীর ধ্বনি;
ভ্রূকুটির কুটতায়,
অলকের সুষমায়,
শরীরের হাবভাবে দেখাও মরম, ধনি;
কৌমুদীর তুলিকায়
বসন্ত-উষার ভায়
রচিত কুসুম গায় তনু তব, অনুমানি;
জীবন্ত এ পটমাঝে
ক্ষণে নব চিত্র রাজে,—
তুমিত মানবী নহ, মানবীর ছবিখানি!

৭

নীরবে তারকা ফুটে, নীরবে জ্যোছনা ভায়,
নীরবে কুসুম হাসে, প্রণয় না কথা কয়,

নীরব উষার খেলা,
শশীর কিরণ মেলা,
নীরব জলন্ত জ্যোতিঃ রবির প্রখরতার,
প্রকৃতির চারুশোভা
নীরবে মনোলোভা
নীরব কোমলতা ঘুমন্ত শিশুর গায়,
মধু পূর্ণিমার নিশি
শরীরে শরীর মিশি
কৌমুদী মলয়ানিল চুমে ধীরে নিরালায়;
তুমিও নীরব, বালা,
সুষমার ষোল কলা,
তোমারই সনে ওরা প্রাণে প্রাণে কথা কয়;
পূত নীরবতা মাঝে
স্বরগ-ঝংকার বাজে,
নীরব কথার কথা,—জগৎ সংগীতময়।

শ্রীবরদা চরণ মিত্র।

মহাস্থান।

বগুড়া জেলার ৭ মাইল উত্তরে, করতোয়া নদীর পশ্চিম ভাগে দুর্গপ্রাচীর-বেষ্টিত মহাস্থান নামক প্রাচীন বৃহৎ জনপদ সংস্থাপিত ছিল।

মহাস্থান গড়ের উত্তর সীমা কোচথালী ও কাটোয়া সাগর (ইহাকে কালীদহও বলে) ও ঘাঘর দুয়ার গ্রাম। দক্ষিণে বারাণসী-খাল ও গোকুল ও পলাসবাড়ী গ্রাম। পশ্চিমে কালীদহসাগর ও গিলাতলার বিল (ইহা কালীদহের অংশ) ও মথুরা ও পলাশবাড়ী গ্রাম। পূর্ব্ব দিকে করতোয়া নদী।

মৃত্তিকা হইতে গড় সাধারণতঃ প্রায় ১৫ ফিট ও চারিটী কোন প্রায় ৩৫ ফিট উচ্চ হইবে। উত্তর দক্ষিণ দিকে গড় প্রায় ৪৫০০ ফিট দীর্ঘ ও ৩০০০ ফিট পূর্ব্ব পশ্চিমে পরিসর।

স্কন্দপুরাণে করতোয়া মাহাত্ম্যে এই স্থান শীলাদ্বীপ নামে কথিত হইয়াছে। মহাস্থান গড়ের পূর্ব্বদিকে নদী ও অপর কয়েক দিকেই বৃহৎ জলাশয় বিদ্যমান আছে। কালীদহ সাগর ও বারাণসী খাল খনন হইয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে। কিন্তু কালীদহের অবস্থা দেখিলে তাহাকে অমানুষিক কীর্ত্তি বলিয়াই বোধগম্য হয়। মহাস্থান হইতে চান্দনীয়া পর্য্যন্ত কালীদহ সাগরের দীর্ঘতা প্রায় ৫ মাইল হইবে। যদিচ এই বৎসরে ইহার জল কথক পরিমাণে বহিস্কৃত করিবার জন্য নদীর সহিত সংমিলন পূর্ব্বক প্রায় ১০।১২ ফিট গভীর একটী খাল খনন ও কিয়ৎ পরিমাণ জল বহিস্কৃত করা হইয়াছে, তথাপি আমরা বৈশাখ মাসেও ১০।১২ হাত গভীর জল দেখিয়াছি। এই স্থান চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত জন্যই দ্বীপনামে বর্ণিত হইয়াছে।

জনপদে প্রবেশ করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে দরাব সাহা ও শিলাদেবীর ঘাট ও আর একটী দ্বারের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। প্রায় দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে দরাব সাহা নামক প্রবেশ পথ। এই পথের পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূরে শিলাদেবীর ঘাট (এইস্থান হইতে করতোয়া চরের দ্বারা দূরবর্ত্তী হইয়াছে; লোকে সাধারণতঃ সেই দূরস্থ নদী তীরবর্ত্তী স্থানকেই শীলাদেবীর ঘাট বলিয়া থাকে) এবং ইহার পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ প্রায় পূর্ব্ব উত্তর কোণের

সন্নিকটে আর একটী প্রবেশ-পথের চিহ্ন। পূর্ব্বোক্ত দুইটী পথ যে ইষ্টক ও স্থানে স্থানে প্রস্তর খণ্ড দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও যথেষ্ট বর্ত্তমান আছে। শেষোক্ত প্রবেশ পথেও ইষ্টকাদি দৃষ্টিগোচর হয় বটে, কিন্তু সেই সকল অন্য কোন কিছুর কিনা, তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। পশ্চিমে তাম্র দরজার চিহ্নই স্পষ্ট রূপ বিদ্যমান আছে। দক্ষিণে বুড়ী দরজা ও উত্তরে সনাতন সাহেবের গলি নামক প্রবেশ-পথ। দরাব সা নামক প্রবেশ পথটী প্রথমতঃ পশ্চিম মুখ হইয়া ক্রমিক বক্র ভাবে দক্ষিণ দিগে সা সুলতানের কবরের দিকে গিয়াছে। এই পথটী ১০ ফিট পরিসর এবং ইহার নিম্ন ও পার্শ্ব দেশ ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত, সকল গুলি পথই নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়াছে।

আধুনিক দুর্গ সকল মৃত্তিকার নিম্নভাগে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। মহাস্থান গড় সেরূপ নহে। ইহাকে সাধারণ মৃত্তিকা হইতে উচ্চ করা হইয়াছে। এরূপ করিবার অভিপ্রায় কি, তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। তবে ইহা অনুমান হয় যে, প্রাচীন সময়ে কামানের অধিক প্রচলন ছিলনা। তীরন্দাজ ও ভল্লমধারী প্রভৃতি তদানীন্তন যোদ্ধৃগণের উপযোগীতা ও নগর রক্ষণের সুবিধা জন্যই ঐভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, জলপ্লাবন হইতে রক্ষার্থই তিনদিক হইতে মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক নগরকে উচ্চ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে যে-অনুমান করিয়াছি, তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, অপর তিনদিকের নগরভিত্তি আক্রমণ হইতে রক্ষা করণ জন্ত যে বৃহৎ জলাশয় খনন করা হইয়াছিল, তাহারই মৃত্তিকার দ্বারা নগরের নিম্নদেশ উচ্চ করা হইয়াছে।

আমরা গড়ের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ-স্থিত সা সুলতান মাহিসোওয়ারের গোরস্থান হইতে মহাস্থানের পৌরাণিক ও আধুনিক অবস্থা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

সা সুলতানের দরগায় (সাধারণতঃ আস্তানাই লোকে বলিয়া থাকে) প্রবেশ জন্য দুইটী পথ আছে। একটী দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে বুড়ী দরজা ও অপরটী পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে দরাব সা নামে অভিহিত। বুড়ী দরজার দ্বারা প্রবেশ করিলে বামদিকে একটী নমাজ খানা ও দক্ষিণদিকে কতকগুলি কবর ও সম্মুখে সুলতান সাহেবের আস্তানা। নমাজখানাটীর গাত্রে পারস্য ভাষায় লিখিত আছে যে, হিজরী ১১৩০ সনে উহা নির্ম্মিত হয়।

দক্ষিণে শেলবর্ষের জমিদারগণের কয়েকটী সামান্য গোর স্থান। সুলতান সাহেবের আস্তানটী চতুষ্কোণ বিশিষ্ট সামান্য অট্টালিকা ও অল্প উচ্চতার পরেই খিলানে আবৃত ও মধ্যস্থলে খোলা। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। চৌকাঠের বাজুর দুই পার্শ্বে দুই খানি প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। উহার প্রত্যেকে দেবনাগর অক্ষরে "শ্রীনরসিংহ দাসস্য" লিখিত আছে। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, উহা খোদার নাম। এই দরজার নিকট পশ্চিমদিকে দুইখানি গৌরীপাঠ আছে। একখানি গোলাকার ও উহার ব্যাসরেখা ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি। ইহার বাণ-লিঙ্গ-স্থানের ব্যাসরেখা ১১ ইঞ্চি। এই গৌরীপাঠে

সতেরটী ক্ষুদ্র গহ্বর আছে। কোনরূপ ধাতব কারুকার্য্য সংলগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে এই সকল গহ্বর করা হইয়াছিল, এমত সাহেবগণের ধারণা। অপর গৌরীপাঠ খানি দীর্ঘাকৃতি ও ৩ ফিট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ২ ফিট ৪ ইঞ্চি প্রস্থ।

শ্রীযুক্ত কানিংহাম সাহেব বলেন যে, এই স্থানে তিনি স্বাভাবিক পরিমাণের মনুষ্যাকৃতির অৰ্দ্ধমস্তক একখানি নীলবর্ণ প্রস্তর দেখিয়াছেন। আমরা উহা দেখি নাই বটে; কিন্তু আস্তানার উত্তর পশ্চিম কোণে একটী পুরাতন ইন্দারা, এই বৎসর পঙ্কোদ্ধার কালীন, অট্টালিকার ভিত্তির উপযোগী ৩ খানি প্রস্তর ও সেই সঙ্গে নীলবর্ণ প্রস্তরে খোদিত স্বাভাবিক আকারের মনুষ্যের অৰ্দ্ধ বক্ষঃস্থল ও কুনুই সন্ধি হইতে মণিবন্ধ পৰ্য্যন্ত বাহুর অংশ উত্তোলিত হইয়াছিল। যে সকল প্রস্তর খণ্ড ও ইষ্টক ও মৃত্তিকা ইন্দারা হইতে তুলিয়া তাহার নিকট রাখা হইয়াছে, তন্মধ্যে অপর কোন অংশ আছে কিনা, সবিশেষ অনুসন্ধান করা বহু শ্রমসাধ্য। প্রাগুক্ত দুইটী ভগ্নাবশেষ অংশ ও শ্রীযুত কানিংহামের বর্ণিত অৰ্দ্ধমস্তক ও এই সকল অংশ দ্বারা বোধ হয় যে, এই মূর্ত্তির দীর্ঘতা তিন হস্তের ন্যূন ছিল না। ইহার অপরাপর অংশ সংগ্রহ হইলে, বৌদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি কি না, মীমাংসা হইতে পারে।

সুলতান সাহেবের আঙ্গিনার মধ্যে একটী ভগ্ন প্রতিমূর্ত্তি (প্রস্তর নির্ম্মিত) বিদ্যমান আছে। কানিংহাম সাহেব বলেন যে, উহা জৈন মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটীর ক্ষত বিক্ষত অবস্থা দেখিলে বাস্তবিক দুঃখ বোধ হয়। এরূপ ভগ্নাবস্থা দৃষ্টে মূর্ত্তিটী কাহার, তাহার মীমাংসা করা সুকঠিন। এই স্থানের নিকটেই মনুষ্যাকৃতি নাগিনীর মস্তকে এক খানি পদ্ম। নাগিনী দক্ষিণ হস্তের দ্বারা পদ্ম খানি মস্তকের উপর ধরিয়া আছে। নাগিনীর কটিদেশের উর্দ্ধ মনুষ্যাকৃতি ও তন্নিম্ন সর্পাকৃতি। মূর্ত্তিটী একাদশ ইঞ্চি উচ্চ।

প্রাগুক্ত প্রতিমূর্ত্তির অথবা সুলতান সাহেবের আস্তানার পশ্চিম দ্বারের পশ্চিম ও উত্তরে কতকগুলি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। এই স্থান হইতেই দরবার সা পথ আরম্ভ হইয়াছে। এখান হইতে উত্তরে এবং এই পথের প্রায় মধ্যস্থলের উর্দ্ধদিকে কতকগুলি ইষ্টক স্তূপ ও গোলাকৃতি ইষ্টক গাথনীর মধ্যস্থলে এক খানি প্রস্তর আছে। লোকে তাহাকে "খোদার পাথর বলে"। উক্ত গোলাকৃতি ভিত্তির উপর যে একটি দেবমন্দির ছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। প্রস্তরখানি পুর্ব্বমুখী হইয়াছে। এই প্রস্তরখানি ১১ ফট দীর্ঘ ও ২ ফট ৯ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং প্রায় ১ ফুট পুরু হইবে। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ ও মধ্যস্থলে প্রায় ১ হাত ব্যবধান দুইটী ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এতদ্বারায় বোধ হয় যে, উহা কোন দেবমন্দিরের দ্বারদেশের উৰ্দ্ধ অথবা নিম্নভাগে গ্রথিত ছিল। কানিংহাম সাহেব কহেন, যে উহার ওজন প্রায় সাড়ে তিন টন হইবে। আরো কতক গুলি গ্রেনাইট প্রস্তর ও বিস্তর ইষ্টক এই স্থানে পতিত আছে।

গড়ের উত্তর দিক হইতে প্রায় ৬০০ ফিট দূরে "মানকালীর কুণ্ডি" নামক স্থান। এইখানে একটী গভীর পুষ্করণী আছে। ইহার তীরে মানকালীর মন্দির ছিল। এই মন্দিরের ইষ্টকে অনেক কারুকার্য্য দৃষ্টি

গোচর হয়। কানিংহাম সাহেব কথক-গুলি প্রতিমূর্ত্তি তদীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রাজা মানসিংহ, তদীয় ভ্রাতা তানসিংহ সহ রাজা পরশুরামের পূর্ব্বেই এই স্থানে যে কালীমূর্ত্তি ছিল, তাহার মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বীয় নামানুসারে "মানকালী" নামকরণ করেন।

মানকালী কুণ্ডের প্রায় ৬০০ শত ফিট দক্ষিণে রাজা পরশুরামের বাড়ী। ইহার ভগ্নাবশেষ স্পষ্টরূপ বর্ত্তমান আছে। এই স্থানে কতকগুলি প্রস্তর আছে। প্রসিদ্ধ "জীয়ৎকুণ্ড" এই স্থানেই স্থিত। ইহার ব্যাসরেখা ১৪½ ইঞ্চি ও গভীরতা প্রায় ৩০ ফিট। কানিংহাম সাহেব মৌচাকের জন্য ইহার গভীরতা লইতে পারিয়াছিলেন না। এক্ষণে মৌচাক নাই, এবং ইহার পঙ্কোদ্ধার করণ জন্য বগুড়ার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক উদ্যোগ হইতেছে। ইহার পঙ্কোদ্ধারের দ্বারা লোকের জলকষ্ট যতদূর নিবারিত হউক বা না হউক, কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস বিস্তর আবশ্যকীয় প্রত্ন-তত্ত্বের উদ্ধার হইবে। জীয়ৎকুণ্ডের একধারে একটী বৃহৎ কাঞ্চন বৃক্ষ হইয়াছে। কুণ্ডে নামিবার জন্য বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রস্তর খণ্ড সকল একধারে সংলগ্ন আছে। ইহার একদিকে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর আছে। সেখানি কোন অট্টালিকার বারান্দায় ছিল, এমন অনুমান হয়। কিন্তু এইস্থলে ইহার একদিক প্রায় একহস্ত পরিমাণ মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত আছে। এই স্থানের প্রায় পূর্ব্বদিকে শীলাদেবীর ঘাট। যখন নদী গড়ের পাদদেশে প্রবাহিত ছিল, সেই সময় এই স্থানে ঘাট, অথবা গড়ের উপর প্রবেশ করিবার পথ ছিল। এই পথ বা ঘাটের নিম্ন ও পার্শ্বদেশ ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত আছে। ইহার পার্শ্বে স্থানে স্থানে প্রস্তরও দেখাযায়। নিম্ন ভাগের কয়েক স্থান খনন করিয়া আমরা ইষ্টক নির্ম্মিত পথের চিহ্ন দেখিয়াছি। ইহা প্রবেশপথ ও ঘাট উভয় কার্য্য সম্পাদন করিত বলিয়াই অনুমান হয়।

মানকালী কুণ্ডের নিকট কানিংহাম সাহেব পিত্তল নির্ম্মিত গণেশ ও গরুড়ের মূর্ত্তি ও মধ্য সাময়িক নাগর অক্ষরে "নগ্রহর" শব্দ লিখিত প্রস্তরের অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অনুমান করেন যে, মানকালীকুণ্ড "অগ্রহর" বা ব্রাহ্মণকে দান করা হইয়াছিল।

এই সকল বর্ণনার দ্বারা উপলব্ধি হইবে যে, মহাস্থানগড়ে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের কোন প্রতিমূর্ত্তি এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কানিংহাম সাহেব বলেন এবং আমরাও বলি যে, এইস্থান যেরূপ বৃহৎ ও প্রাচীন ও জঙ্গলাবৃত এবং প্রচুর ইষ্টক ও প্রস্তরে পরিপূর্ণ, তাহাতে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম পূর্ব্বক দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিলে বিস্তর প্রাচীন তত্ত্বের উদ্ধার হইবে।

মহাস্থান গড়ের দক্ষিণভাগে এবং সা সুলতানের আস্তানার পশ্চিম ভাগেও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ও কয়েকখানি বৃহৎ প্রস্তর আছে। এইস্থানে রাজা মানসিংহের বাড়ী ছিল, এরূপ প্রবাদ আছে। বারাণশী সাগর হইতে নদীর দিকে যে একটী খাল গিয়াছে, তাহার নিম্নের অনেক স্থান ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত আছে। গড়ের উত্তর দিকেও কালীদহ সাগরের সহিত নদীর সম্মিলন থাকার স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান আছে। করতোয়া নদীর জল উত্তর দিক দিয়া প্রবেশ

ক্রমতঃ দক্ষিণ দিকের সংযোগ দ্বারা বহিষ্কৃত হইত, এমত জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায় এবং অবস্থাদৃষ্টে ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। সুলতান সাহেবের আস্তানার দক্ষিণে ও বগুড়াভিমুখী পথের পশ্চিমে অর্থাৎ গড়ের কোণে কিয়দ্দূর ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত আছে। নদীর স্রোতে দুর্গের ভিত্তি শিথিল না হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে ঐরূপ ইষ্টকপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

গড়ের মধ্যে নানা স্থানে ইষ্টকাদি স্তূপাকারে আছে। সেই সকল ইষ্টক দ্বারা বহুতর অট্টালিকা যে নির্ম্মিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল অট্টালিকা সম্বন্ধে বিশেষ কোন জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায় না।

পশ্চিম দিকে "তাম্বা" বা তাম্রদরজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দরাবসার ন্যায় ইহা বক্রভাবে না হইয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে সরল ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নিম্নস্থল ও পার্শ্বদেশ ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত। তাম্রদরজার পথটী পশ্চিমমুখী হইয়া মথুরা গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। উক্ত দরজা হইতে বাহির হইলেই দক্ষিণ ভাগে কিয়দ্দূর নিম্নভূমি ও তাহার পশ্চিমেই কালীদহ সাগরের অংশ। বামভাগেও কিয়দ্দূর নিম্নভূমি। উভয় নিম্নভূমিই পূর্ব্বে বৃহজ্জলাশয়ের গর্ভ ছিল। দক্ষিণ ভাগের নিম্নদেশে দুই স্থান খনন করায় একস্থানে একটী বৃহৎ ইন্দারার চিহ্ন ও অপর স্থানে অট্টালিকার তিনটী ভিত্তি দেখা গিয়াছিল। পলাশবাড়ী গ্রামেও মৃত্তিকা খননে ঐরূপ দেখা গিয়াছে। গড়ের অপর কয়েকদিক হইতে পশ্চিমদিগের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত লাল রঙ বিশিষ্ট। এই জন্য কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে, মৃত্তিকার তাম্রবর্ণ বশতঃই দরজা তাম্র দরজা নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে স্থানীয় জনশ্রুতি এই যে, উক্ত দ্বার তাম্রের দ্বারা নির্ম্মিত ছিল, কানিংহাম সাহেবের বর্ণনার দ্বারায় বোধ হয় যে, এই সম্বন্ধে তিনি অন্য কোনরূপ অনুসন্ধান আদৌ করেন নাই। তিনি বলেন যে ;—

"Closely connected with this redness of the soil is the fact that the western gate of the fort of *Mahasthan* is still known as the *Tamra Darwaza*, which, as I believe, simply refers to its red land on the west to which the gate leads in contradistinction to the light sandy soil of the eastern side of the fort." মৃত্তিকার রঙের দ্বারা যে তাম্রদরজা নামকরণ হয় নাই, তাহা স্থানীয় জনশ্রুতি সপ্রমাণ করিতেছে। যিনি মহাস্থানের ন্যায় তিনদিকে বৃহৎ পরিখাবেষ্টিত দুর্গ-নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি তাম্রের দ্বারা এক খানি দরজার কবাট প্রস্তুত না হউক, অন্ততঃ উহা মোড়াইতে বা কারুকার্য্য করিতে অসমর্থ ছিলেন, এমন অনুমান করা নিতান্তই ভ্রমের কার্য্য। কানিংহাম সাহেব এই স্থানকে সুপ্রসিদ্ধ টলেমীর (**Ptolemy's**) তাগ্মা-নগরী (Tagma Metropolis) সাব্যস্থ করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন। তাম্রদরজা প্রকৃত তাম্র ধাতুর হইলেও এই স্থান টলেমীর তাগমা-নগরী বলিয়া বিবেচিত হওয়া অসঙ্গত নহে। টলেমী লোহিত মৃত্তিকার অধিবাসীগণকে *Tameræ* নামে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্ব বরিন্দ্রের ও তন্নগরীর লোহিত মৃত্তিকা দৃষ্টে তিনি ইহাকে **Tagma metro-polis** বলিয়াছেন, এ অনুমান নিঃসন্দেহ করি-

হয় যোগ্য নহে। অপিচ শাস্ত্রাদিতে করতোয়া নদী যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান করতোয়া নদীর উভয় পার্শ্বস্থভূমি যেরূপ বালুকাপূর্ণ ও আধুনিক, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে টলেমির সমকালে, এই নদী অত্যন্ত প্রবল ও বিস্তীর্ণ ছিল। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, এই নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন ও সাগরে মিলিত হইয়াছে। স্থানীয় কিম্বদন্তী এই যে, একদা এই নদী সেরপুর মরচা হইতে দশকাহনিয়াসেরপুর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। খেয়া পারের কড়ি দশকাহন নির্দ্দিষ্ট থাকায় দশকাহনিয়া সেরপুর নাম হইয়াছে। এই নদী এবং পৌণ্ড্রখণ্ডের মাহাত্ম্য পুরাণে যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা আলোচ্য প্রস্তাবের শেষ ভাগে লিখিত হইবে।

করতোয়ানদী সম্বন্ধে শ্রীযুত বিভারিজ সাহেব যথার্থ বলিয়াছেন যে, এই নদী পূর্ব্বতনকালে কামরূপ ও বাঙ্গলার সীমা ছিল। এইক্ষণে দেখা যায় যে, এই নদী ত্রিস্রোতা বা তিস্তা হইতে সমুৎপন্ন হওত ফুলঝোড় নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকেই করতোয়ার প্রকৃত শয্যা বলা যাইতে পারে না। হিমালয়পর্ব্বতের যেস্থান হইতে বর্ত্তমান তিস্তা নদীর উৎপত্তি দেখা যায়, পুরাণের বর্ণনানুসারে তাহাই করতোয়ার উৎপত্তি স্থান। এই নদী পর্ব্বত হইতে বহুদূর নিম্নমুখী হইয়া ত্রিস্রোতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। রংপুরজেলার উত্তর পশ্চিমভাগে প্রাচীনকালে তিনধারায় বিভক্ত হইয়া আত্রেয়ী ও পুনর্ব্বহা নাম প্রাপ্ত হয়। রংপুরজেলায় সৈয়দপুর ও বগুড়া জেলা ভবানীপুর এবং পাবনা জেলায় শিবগাছী, ছাতিয়াল, নবগ্রাম হইয়া অষ্টমুনিসা পর্য্যন্ত করতোয়ার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। শেষোক্ত স্থান হইতে বাঘরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের গবেষণা করিলে ঐ সকল স্থান যে তাদৃশ প্রাচীন নহে, তাহা স্পষ্টই অনুমান হয়। সুতরাং পুরাণের "করতোয়াম্বুবাহিনী" এবাক্য স্বীকার্য্য বটে।

মহাস্থান গড়ের উত্তর সীমার বাহিরে কিয়দ্দূর ব্যবধানে পাথরঘাটা নামক একটী স্থান আছে। লোকে সচরাচর ঐ নাম বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক উহা ঘাট নহে। এই স্থানের উত্তর পূর্ব্বদিকে নদী। নদীতটে ২৫।৩০ ফিট দীর্ঘ বক্রাকৃতি প্রস্তর ভিত্তি নদীগর্ভ হইতে গ্রথিত হইয়া উত্থিত হইয়াছে। এই সকল গ্রেনাইট প্রস্তরের সম্মুখভাগে খোদিত কারুকার্য্য আছে। একসারি প্রস্তরের উপর অপরসারি প্রস্তর গ্রথিত। সচরাচর এই দুইসারি প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হয়। বৈশাখমাসে নদীর জল নিম্নস্থ প্রস্তর শ্রেণী হইতে কিছুদূরে অবস্থিত দেখিয়া প্রায় ৩ হস্ত মৃত্তিকা খনন করিয়া আরো ৩ শ্রেণী প্রস্তর দেখা গিয়াছে আরো কিছু নিম্নে খনন করিয়া আমাদিগের দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নিম্ন হইতে জল উত্থিত হওয়ায় আমাদিগের অভিলাষ সফল হয় নাই। প্রস্তর শ্রেণী যেরূপ বক্রভাবে ভিত্তি সংস্থাপনের প্রণালীতে গ্রথিত ও উহার বহির্দ্দেশ খোদিত কারুকার্য্য বিশিষ্ট, তাহাতে আমরা অনুমান করি যে, উহা কোন দেবমন্দিরের ভিত্তি হইবে। নদী স্রোত হইতে মন্দির রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই এই দিকের ভিত্তি-মূল প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত হইয়াছিল। এই সকল প্রস্তর শ্রেণীর গাঁথনীর উপরেই ইষ্টকের গাঁথনীর কথকাংশ বিদ্যমান আছে। গোবিন্দ নামক ব্রাহ্মণের

এইখানে ছিলেন, এমন প্রবাদ আছে। এইখান হইতে দক্ষিণদিকে স্কন্দনামক বাণলিঙ্গ ছিলেন। এতদুভয় একক্রোশ ব্যবধান, এরূপ পুরাণে উল্লেখ আছে। এবং এই একক্রোশের মধ্যেই হিন্দুযাত্রীগণ পৌষ নারায়ণীযোগে স্নান করিয়া থাকেন। সুতরাং গোবিন্দনামক বাণলিঙ্গ যে প্রাগুক্ত স্থানে ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কতিপয় প্রাচীন ব্যক্তির প্রমুখাৎ আমরা অবগত হইয়াছি যে, তাঁহারা এতদপেক্ষা অধিকতর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছেন। এই স্থানটী প্রায় দ্বীপের ন্যায়। সাধারণে ইহাকে গোবিন্দের দ্বীপ বলিয়া থাকে। ইহা যে বাস্তবিক এক সময়ে দ্বীপ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্ব উত্তর দুইদিকেই করতোয়া নদী। দক্ষিণভাগে কাটুয়া সাগরের (কালীদহের যে অংশ নদীর সহিত সম্মিলিত ছিল) অংশ। কালীদহের কতক জল বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য প্রায় ১০।১২ ফিট গভীর একটী খাল খনন করা হইয়াছে। এই খালের নিম্নভাগে কালীদহ সাগরের সহিত নদীর যে পূর্ব্বে সংযোগ ছিল, তাহার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। বগুড়া হইতে শিবগঞ্জ পর্য্যন্ত রাস্তাটী এই স্থান হইয়া গিয়াছে। এই স্থানটীও সাধারণ সমভূমি হইতে কুড়ী ফিট উচ্চ হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, স্কন্দ নামক বাণলিঙ্গই এই স্থানে ছিলেন। আমরা এবিষয়ে কয়েক জন শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। এসম্বন্ধে তাহাদিগেরও মতভেদ জানিতে পারিয়াছি। ইহার সিদ্ধান্ত-ভার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রতি অর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, জীয়ৎকুণ্ডের প্রায় পূর্ব্বদিকে যে প্রবেশ পথ দৃষ্টগোচর হয়, তাহাই শীলাদেবীর ঘাট ছিল। এইস্থান হইতে নদী এখন দূরে সরিয়া গিয়াছে। গড়ের পাদদেশ হইতে নদী পর্য্যন্ত যে চর আছে, তাহা বাস্তবিক যে দীর্ঘ কালের, এমন অনুমান হয় না।

আমরা যাহাকে পাথরঘাটা বলিয়াছি, এবং যে স্থানে গোবিন্দ নামক শিব ছিলেন ও শিবের মন্দিরের ভিত্তির নিম্ন অংশ যে স্থানে বিদ্যমান আছে, সেই স্থানকেই শ্রীযুত ওডনেল ও কানিংহাম শীলাদেবীর ঘাট সাব্যস্থ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ওডনেল সাহেব বলেন যে ;—"A steep part of the bank, where there is now a flight of stairs, still bears the name of Sila Devi's ghat" আবার শ্রীযুত কানিংহাম বলিতেছেন যে ;—"At the ghat there is a stone-wall from 25 to 30 feet in length, with one large carved stone which no doubt once formed part of a Hindu temple." ওডনেল সাহেব নদীর উচ্চতীরে সোপান শ্রেণী ও কানিংহাম ২৫।৩০ ফিট দীর্ঘ প্রস্তর ভিত্তি ও কোন মন্দিরের কোন অংশের একখানি বক্র প্রস্তরের কথা বলিতেছেন। সুতরাং এত দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, তাঁহারা পাথর ঘাটা বা গোবিন্দ শিবের মন্দিরের অংশকেই শীলাঘাট সাব্যস্থ করিয়াছেন। ইহা যে শীলাঘাট নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাহেবগণ বোধ হয় শীত ঋতুতে এইস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা শীত ঋতুতেও কয়েক বার এই স্থান দেখিয়াছি। তখন নদীতে বেশী জল থাকায় প্রায় প্রস্তর ভিত্তির এক শ্রেণী মাত্রই দৃষ্টিগোচর হয়।

সেই সময় কানিংহামের বর্ণিত উপরের প্রস্তর শ্রেণী মধ্যে ঈষৎ বক্র ও বহির্দ্দিকে খোদিত কারুকার্য্য বিশিষ্ট এক খানি প্রস্তর খণ্ডরূপ অবলক্ষিত হয়।

মিরসৌরদ সুলতান মাহিসোওয়ারের (ইহাই সুলতান সাহেবের প্রকৃত নাম) আস্তনাটী পূর্ব্বে রাজা পরশুরামের কালী-বাড়ী ছিল, এমত জনশ্রুতি আছে। যে দুই খানি গৌরীপাঠ দেখা যায়, সেই স্থানে শিবমন্দির ছিল, এরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। এই স্থানের মৃত্তিকা খনন ব্যতীত কোন মন্দিরের ভিত্তি উক্ত স্থানে ছিল কি না, তাহার মীমাংসা করা সুকঠিন। কিন্তু প্রাগুক্ত গৌরীপাঠ ও প্রস্তর খণ্ড সকল দৃষ্টে জনশ্রুতিকে নিতান্ত অলীক বলিয়া বোধ হয় না।

সুলতান সাহেবের মাহিসোওয়ার উপাধি সম্বন্ধে কানিংহাম বলেন যে, এই আশ্চর্য্য উপাধির মূল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমরা এই সম্বন্ধে স্থানীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও মৌলবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। মাহিসোওয়ারের অর্থ সকলেই "মৎস্য আরোহী" বলিয়াছেন। ইনি এখানে মৎস্য-মুখী নৌকাতে আগমন করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। ইনি বাল্কের সুল-তান ছিলেন। কোন কারণে বিরাগী হইয়া এদেশে আইসেন। বাঙ্গলা ভাষায় "বাল্কের সুলতান" নামক এক খানি পুস্তক আছে। এই পুস্তকখানি আমরা দেখিয়াছি। পদ্য-ছন্দে পুস্তক রচিত। ইহাতে অনেক কথা অসামঞ্জস্য ভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, সুলতান হাণ্ডিয়াল নগরে অবতরণ করেন ও তথাকার জমিদার বল-রামের লোকের সহিত যুদ্ধ হয় ও বিনোদ-রায় নামক তাহার দেবতার গৃহে প্রবেশ করেন। সুলতান মহাস্থান নগরে প্রবেশ করিলে রাজা পরশুরাম সুলতানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মান রাজা, বৈরাটের রাজা ও গোকুলের রাজা ও রাজা রাম-কৃষ্ণকে আহ্বান করেন, এমন উক্ত হই-য়াছে। সুলতানের সমকালে হাণ্ডিয়ালে বলরাম রায় নামক জমিদার বা তথায় বিনোদ রায় নামক বিগ্রহ ছিলেন না। তাড়াশের জমিদার বংশে বল রাম রায় নামক জমিদার ও বিনোদ রায় বিগ্রহ ছিলেন বটে, (বিগ্রহ এখনও আছেন) কিন্তু বল রাম রায় সুলতানের পরবর্ত্তী সম-য়ের লোক। রাজা মানসিংহ পরশুরামের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ বা নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ সুলতানের সমকালীয় নহেন। বৈরাটের বা গোকুলের রাজা কে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, সুতরাং এই সকল কথা সম্পূর্ণ উপন্যাস-মূলক অলীক, তাহাতে সন্দেহ নাই। পারস্য ভাষায় বাল্কের সুলতান নামক যে গ্রন্থ আছে, তৎ অবলম্বনে কয়েক বৎসর হইল ঐ পুস্তক অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এবং মূলের অধিকাংশ পরিত্যক্ত হইয়া পদ্য অনুবাদকের কল্পনার আশ্রয়ী-ভূত হইয়াছে।

সুলতান মাহিসোওয়ারের খানখা খরচ জন্য দুই সহস্র বিঘা ভূমি সাজিহান বাদ-সাহ কর্ত্তৃক নিষ্কর প্রদত্ত হয়। কোন কারণ বশতঃ একদা ঐ নিষ্কর ভূমি ক্রোক হইয়া-ছিল। সাহ আলমগীর ও গাজী জফর জঙ্গ গোলতাসের মহর যুক্ত হিজরী ১০৯৬ সালের (১৬৭৯ খ্রীঃ অব্দ) এক খানি ক্রোক-খালাশী পরোয়ানা আছে। এই পরোয়ানা

থানি শেরপুরের জমিদার ও সরকার বাহাদুরের কানুনগো প্রভৃতির নামে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, মহাস্থান গড়ে দুই সহস্র বিঘা ভূমি, যাহা মীর সৈয়দ সুলতান মাহিসোওয়ারের খানখা (খাদ্যখরচ) জন্য পূর্ব্বাপর ধার্য্য আছে, তাহা ক্রোক হইতে মুক্ত করা গেল। একদা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ও প্রাগুক্ত পীরপান বাজেয়াপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেরপুরের জমিদার আপত্তিকারী হইয়া প্রাগুক্ত দলীলাদি প্রদর্শন করায় পীরপান এখনও বহাল আছে।

মহাস্থানে সুলতান সাহেবের আধিপত্য বিস্তার সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, একদা তিনি সামান্য ফকির বেশে তথায় গমন করেন ও তত্রস্থ রাজা পরশুরামের নিকট নমাজে বসিবার জন্য চর্ম্মাসনের উপযুক্ত সামান্য মৃত্তিকা যাচঞা ও একবার মাত্র নমাজ করিবার প্রার্থনা করায়, অমাত্যগণের অনিচ্ছা স্বত্বেও রাজা উহাতে সম্মত হয়েন। তদনুসারে তিনি চর্ম্মাসন বিস্তার করিয়া নমাজে বসিলে পর অর্দ্ধেক নমাজ হইতে না হইতেই উক্ত চর্ম্ম সমগ্র নগরে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। তদ্দৃষ্টে পরশুরাম স্বীয় সৈন্যসামন্তগণের প্রতি ফকিরকে বধ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। সুলতানের যুদ্ধে পরশুরামের সৈন্যগণ নিহত হইতে লাগিল এবং তিনি জীয়াৎকুণ্ডের (একটী বৃহৎ ইন্দারা—স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে) জল সিঞ্চন দ্বারা সৈন্যগণকে তন্মুহূর্ত্তেই জীবিত করিতে লাগিলেন। পরশুরামের সৈন্যবল কিছুতেই লাঘব না হওয়ায়, বিশেষতঃ সুলতান পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডের বিষয় জানিতে পারিয়া (ইহা পরশুরামের সূপকার হরপালের প্রমুখাৎ সুলতান শুনিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ) একটুকরা গো মাংস কুণ্ডের জলে একটী চিলের দ্বারা নিক্ষেপ করায়, কুণ্ডের জল পবিত্রতা ও জীবনী-শক্তি হীন হওয়ায় পরশুরামের সৈন্য মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিনষ্ট হয়। পরশুরাম পরাজিত হওয়ার পর সুলতান তাঁহার সুন্দরী কন্যা (কেহ কেহ বলেন ভগ্নী) শীলাদেবীকে জয়োপহার স্বরূপ যাচঞা করেন। শীলাদেবী বিষম বিপদে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জনের সুযোগার্থ করতোয়া-স্নানের ভাণ করিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছেন। * শীলাদেবী যে স্থানে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, তাহার নাম শীলা-ঘাট হইয়াছে। প্রতিবৎসর চৈত্র-মাসীয় নব চন্দ্রোদয়ে শীলা ঘাটে একটী মেলা হয় ও স্নানার্থ অনেক লোক আগমন করিয়া থাকে।

যে সকল অমানুষিক গুণরাশি রমণী-

---

* কিছুকাল ঘোরতর সংগ্রাম হইলে পর সাহ সুলতান রাজার বক্ষঃস্থলে এমন এক গদাঘাত করিলেন যে, তাহাতে রাজা পরশুরাম গতাসুপ্রায় হইয়া কালীহ্রদে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপর রাজকন্যা শীলাদেবী রাজার নিধন সংবাদ শ্রবণ করিয়া করতোয়ায় কলেবর পরিত্যাগ করিবার জন্য একাকিনী প্রচ্ছন্নভাবে অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া করতোয়ায় গমন করিতেছিলেন, এমন সময় সাহ সুলতান এ সংবাদ শুনিয়া উহার গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে শীলাদেবী চক্র অস্ত্র দ্বারা দুর্ব্বৃত্ত যবননন্দনের শিরচ্ছেদন করিয়া করতোয়া-সলিলে দেহার্পণ করত তনু ত্যাগ করিলেন। তৎপরে সাহ সুলতানের লোকেরা মহাস্থানস্থিত লোকদিগকে ছলে বলে কৌশলে অনবরত যবন ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে আরম্ভ করিলে পর, মহাস্থানস্থিত অনেক ব্যক্তি স্থান ত্যাগ করায় নগর অরণ্যময় হইয়া পড়ে।"

সেতিহাস বগুড়া বৃত্তান্ত—৮১। ৮২ পৃষ্ঠা।

হৃদয়ে বিরাজমান থাকিলে, তিনি নারী নামে অভিহিত না হইয়া দেবী বলিয়া জগতে প্রকীর্ত্তিত ও পূজিত হইতে সমর্থা হয়েন, শীলা তত্তাবতের অন্যতম অধিকারিনী; জগৎ পূজ্য ক্ষত্রিয় জাতির বীরশোণিত তদীয় অনুপমেয় হৃদয়ে প্রবাহমান নিবন্ধন স্বদেশ ও স্বজাতির অদৃষ্ট পরিচিন্তনেও নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতেন। পিতা, ভ্রাতা, স্বামী পুত্র প্রভৃতি প্রিয়জনকে অহর্নিশি শানিত অসি হস্তে স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে দেখিলে নারী হৃদয়ও আত্ম বিসর্জ্জন-বিমুখ হইবে কেন? যে দেশের গৌরবে যে জাতির গৌরব, যে জাতির গৌরবে তাহার নারী জাতির গৌরব, সেই দেশের সেই জাতিকে পিতা ভ্রাতা স্বামী পুত্র প্রভৃতি প্রিয়জনকে সমর ক্ষেত্রের লোহিত শয্যায় শোণিতাপ্লুত কলেবরে চির নিদ্রিত দেখিয়া ভারত রমণী ব্যতীত জগতে আর কোন্ জাতীয় রমণী তেজস্বিনী ও সহাস্য আননে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, কিন্তু ভারত-মহিলার এই আত্মবিসর্জ্জনের কথা অনন্ত কাল-শরীরে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে, কিন্তু শীলা দেবী, একদা পৈতৃক প্রিয়তম জন্ম-ভূমি বিধর্ম্মী সুলতানের করতল-গত ও স্বজনবর্গের অবসাদ্ নিরীক্ষণ বিশেষতঃ সুলতানের পাণী-পীড়ন বিষয়ক কুলধর্ম্ম নাশক প্রস্তাব শ্রবণ করতঃ জাতীয় ধর্ম্ম গৌরব ও ক্ষত্র-শোণিতোপযোগী তেজস্বিতায় অনুপ্রাণিত হইয়া যেরূপে পূতঃসলিলা করতোয়া মধ্যে আত্ম-বিসর্জ্জন্ করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই কাল-স্রোতে অপসারিত হইবার নহে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এরূপ একটী আদর্শ চরিত্র অঙ্কনে বঙ্গীয় লেখকগণের মধ্যে কেহই যত্নবান হয়েন নাই।

জনশ্রুতি, সুলতান ও পরশুরামকে এক সময়ের লোক বলিতেছে। আমরা সুলতানের আগমন সময় পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং তাহাই মহাস্থানের শেষ হিন্দু রাজা পরশুরামের রাজত্বের সময় হয়, কিন্তু বাস্তবিক পরশুরাম সুলতানের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। তদ্বিষয়ে স্থানান্তরে আলোচিত হইবে।

পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণের পূর্ব্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন জনপদে যে চান্দ্রবংশীয় পুণ্ড্রের রাজধানী ও পৌণ্ড্রবংশীয় রাজাগণ রাজত্ব করেন, তাহা গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করা গিয়াছে। পুণ্ড্রের পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গের নাম শাস্ত্রাদিতে এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যাহা হউক, পুণ্ড্রের অনেক পরবর্ত্তী কালে পালবংশীয় নরপাল ও তৎপরে কতিপয় হিন্দু রাজা এই স্থানে রাজত্ব করেন। করতোয়া নদী তটস্থ মহাস্থান প্রদেশ যেরূপ প্রাচীন, তদ্দৃষ্টে এই প্রদেশ বিশেষতঃ প্রাচীন জনপদ যে পুণ্ড্রের সমকালীয় নহে, তদনুমান করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ অনুমিত্তি হয় না।

চিন দেশীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী সুপ্রসিদ্ধ-পরিব্রাজক হিয়ংসঙ ৬৫০ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামক প্রাচীন জনপদের নাম দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি বলেন যে, রাজমহলের নিকটবর্ত্তী গাঙ্গেয় প্রদেশের ৬০০ লি অর্থাৎ প্রায় ১০০ মাইল পূর্ব্বে এই জনপদ সংস্থাপিত। তাঁহার লিপি অনু-

সারে উক্ত জনপদের আয়তন ৩০ লি অর্থাৎ প্রায় ৫ মাইল। কিন্তু মহাস্থান গড়ের আয়তন তত বৃহৎ নহে। তবে ইহার তিন দিকে প্রায় ৫।৬ মাইল স্থান লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন জনপদের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এবং ইহা পূর্ব্বে একই জনপদের অংশ ছিল। এই স্থান মহাস্থান বা পৌণ্ড্র বর্দ্ধন জনপদের সমকালে সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও উহার অংশ থাকাই প্রতীয়মান হয়। এরূপ হইলে হিয়ংসঙের বর্ণিত আয়তন হওয়া অসম্ভব নহে। জনশ্রুতির প্রতি মনযোগ ও এই স্থানের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যে ইহা প্রাচীন কাল হইতেই এতদ্দেশের রাজধানী ছিল।

পরিব্রাজক হিয়ংসাঙ পৌণ্ড্র বর্দ্ধনের যে বর্ণনা করেন, তাহা অস্পষ্ট ও অতি সামান্য। তিনি বলেন, উক্ত স্থানে বৌদ্ধদিগের কুড়ীটী মঠ, তাহাতে প্রায় তিন সহস্র হীনায়ন মতাবলম্বী শিষ্যেরা অধিবাস করিতেন। এবং ইহাও উল্লেখ করেন যে, প্রায় শতাধিক হিন্দু দেবালয় ও বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা ছিল। হিন্দুর পর বৌদ্ধ, বৌদ্ধের পর হিন্দু ও তৎ পরে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরস্পর বিরোধীয় দেব মূর্ত্তি সকলের যেরূপ দুরাবস্থা ও অন্তর্ধান ঘটনা হইয়াছে, তাহাতে এইক্ষণ সেই সকল যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টিগোচর না হওয়া অসম্ভব নহে।

পরিব্রাজক পৌণ্ড্র বর্দ্ধনকে নিম্ন ও আর্দ্র স্থান বলিয়াছেন। কানিংহাম সাহেব তদ্দৃষ্টে অনুমান করেন যে, শীলবর্ষ (লোকে সাধারণতঃ শেল বরষ বলে) নামক যে পরগণায় মহাস্থান বিদ্যমান সেই পরগণা প্রাগুক্ত নিম্ন ও আর্দ্র স্থানে স্থিত জন্যই উহার শীলাবর্ষ নাম হইয়া থাকিবে। সাহেব বোধ হয় অনেক চিন্তার পর ইহা উদ্ভাবন করিয়াছেন! আমাদের শাস্ত্রে কিন্তু পৌণ্ড্রখণ্ড শীলাদ্বীপ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং মহাস্থান প্রদেশের চতুর্দ্দিকেই নিম্ন ও আর্দ্র স্থান থাকা জানা যায়। ইহা হইলে হিয়ংসাঙ যাহা বর্ণন করেন, তাহাই যথার্থ বটে। মুসলমান রাজত্বে যে হিন্দু রাজা মহাস্থান রাজধানীতে অবস্থান করিয়া রাজত্ব করিয়াছেন, তাহার রাজধানীর নামানুসারে তদীয় অধিকৃত পরগণার নাম শীলাবর্ষ বা শীলবরষ হইয়াছে। মহাস্থানের শেষ হিন্দু নৃপতি পরশুরামের ভগিনী শীলা দেবীর নামানুসারে, যাঁহারা শীলাদ্বীপ নামের অনুমান করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও ক্ষমার যোগ্য বটে। শীলাদেবীর জন্মের বহু পূর্ব্বে, এমন কি, চৈনিক পরিব্রাজকের আগমনের পূর্ব্বেই এই স্থানের নাম শীলাদ্বীপ থাকায়, পুরাণাদিতে সেই নামেরই উল্লেখ হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাস্থানের গড়ে বৌদ্ধের প্রাধান্য পরিচায়ক কিছু নাই। কিন্তু মহাস্থানের ৪ মাইল পশ্চিমে "ভাস্বত-বিহার" (ইহাকে ভাঁসোবিহার বলে) নামক একটী প্রাচীন কীর্ত্তি পূরিত স্থান আছে। হিয়ংসাঙের বর্ণিত পশি পো (Po-shi-po) নামক স্থান ও ইহা একই বোধ হয়। তিনি এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড মঠ ও তাহাতে মহায়ন পাঠী সাত শত ব্যক্তি থাকা উল্লেখ করেন। বিহার ৭০০ শত ফিট দীর্ঘ ও ৬০০ শত ফিট প্রশস্ত যে ইষ্টকাদিময় উচ্চস্থান আছে, তদুপরেই ঐ প্রকাণ্ড মঠ নির্ম্মিত ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বিহারে অবলম্বিত-

শ্বরের মন্দির ও মূর্ত্তি আছে। ইষ্টকাদি-ময় স্তূপের উত্তর দিকেই এই ভগ্ন মন্দির। কানিংহাম সাহেব বলেন যে, এই স্থানেই গিয়াসউদ্দিনের নির্ম্মিত "বসন্ত কোট" নামক দুর্গ থাকা অনুমান হয়। উপরের বর্ণিত মঠের কিয়দ্দূরেই মহারাজ অশোকের বিনির্ম্মিত স্তূপ বর্ত্তমান আছে। ইহার পার্শ্বেই বুদ্ধ দেবতাগণের নিকট স্বীয় শাস্ত্রের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বুদ্ধের চারিজন শেষ অবতার এই স্থানেই বুদ্ধের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া চির বিশ্রাম করেন। ইহাদিগের পদ-চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া পৌণ্ড্রখণ্ডে বৌদ্ধের প্রাধান্য বিঘোষণ করিতেছে।

ভাস্বতবিহারে শেলবর্ষ পরগণার জমিদারগণের একটী বাড়ী আছে। এই স্থানের নিকটেই ইষ্টকাদিময় কতকগুলি ক্ষুদ্র মৃত্তিকার স্তূপ ও শশাঙ্কের দিঘী নামে একটী বৃহৎ জলাশয় আছে। এই স্থানের মৃত্তিকাদি এ পর্য্যন্ত কেহ খনন করিয়া দেখেন নাই।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায় মধ্যে পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে। বরেন্দ্র ভূমির স্থানে স্থানে পুণ্ড্রজাতি দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে সাধারণতঃ লোকে পুঁড়া বলিয়া থাকে। মনু ইহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়াছেন। পুঁড়া জাতি আচরণীয় নহে। এইক্ষণ ইহারা কৃষি কার্য্যের দ্বারায় জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমরা পুণ্ড্র নামক যে নরপালের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তৎ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, তিনিও ম্লেচ্ছ ছিলেন। নামের সাদৃশ্য দেখিয়া ও বিশেষ কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ না থাকায়, এতদনুমান ভ্রমের কার্য্য সন্দেহ নাই।

ওয়েষ্টমেকট সাহেব মহাস্থান গড়ের ৬ ক্রোশ উত্তর দিকস্থিত বর্দ্ধনকুঠী নামক স্থানকেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন সাব্যস্থ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কাণিংহাম ও বিভারিজ মহোদয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা নিতান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। বর্দ্ধনকুঠী মহাস্থানের ন্যায় প্রাচীন বা তদ্রূপ বৃহৎ স্থান ছিল বলিয়া কোন জনশ্রুতি নাই এবং স্থানের অবস্থা দৃষ্টেও তদ্রূপ বোধ হয় না। বৃহৎ দুর্গবেষ্টিত স্থানকেই "কোঠ" বলা যায়। ইহা যে কখন এরূপ ছিল, এমন চিহ্নও নাই। বরং মহাস্থানের গড়কে "কোঠ" বলা যাইতে পারে। অপিচ কুঠি শব্দে বাড়ী বা থাকিবার স্থান বুঝায়। মুসলমান ইতিহাস লেখক মিনহাজ বলেন যে, বঙ্গবিজেতার সেনানায়ক আলীমেক "বর্দ্ধন কোঠ" হইতে সৈন্য পরিচালন করিয়াছেন *।

---

* মিনহাজের লিখিত "বর্দ্ধন কোট" ও মহাস্থান যে এক, তাহা অতি যুক্তিসঙ্গত। মিনহাজের বর্ণিত গড় ও নদী যে মহাস্থান ও করতোয়া, তাহা তদীয় অসম্পূর্ণ বর্ণনা পাঠেও প্রতীয়মান হইবে।

"Among the hills which lie between Tibet and territory of Lakhnauti there are three races of peoples. The one is called Kutch, the second Mich and the third Tiharu. * * * One of the chiefs of the tribes of Kutch and Mich, who was called "Ali Mich" had been converted to Mahamadanism by Mahamad Bakhtiar and this man agreed to conduct him into the hills. He led him to a place where there was a city called Mardhon. kot. * * * For ten days they marched on until he led them along the upper course of the river into the hills, to a place where from old times a bridge had stood over the water having about twenty (*bisto and*) arches of stone." Elliot's History of India *Vol II*, P. 309 & 310.

আমরা উপরে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিলাম, তাহাতেও প্রতীয়মান হইবে, বক্তিয়ার খিলিজীর পূর্ব্বে মহাস্থান বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজাগণের রাজধানী ও দুর্গ ছিল। এবং বারেন্দ্রের পশ্চিম সীমা করতোয়া নদী তৎকালে পূর্ণবেগবতী ও প্রাগুক্ত জনপদ ও দুর্গ প্রসিদ্ধ বিধায় সেনানায়ক যে এই স্থানে থাকিয়াই সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, ইহা স্থির করা যাইতে পারে। লালবাগের রাজবাটীকে অন্যান্য রাজবাটী হইতে পৃথক করিবার জন্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সন্নিহিত বিধায় লোকে বর্দ্ধনকুঠী বলিত। ইহাকে যিনি যেরূপই মনে করুন, বর্দ্ধনকুঠী যে পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন জনপদ নহে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা বর্দ্ধনকুঠীর রাজবংশের ইতিহাস বর্ণনে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে অভিলাষী রহিলাম।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বামনপাড়া নামক মহাস্থানের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে কয়েকটী মুদ্রা পাওয়া যায়। তাহার দুইটী বিভারিজ সাহেব কর্ত্তৃক আসিয়াটিক সোসা-ইটীতে প্রেরিত হয়। তাহার একটীর এক-দিকে পালরাজাগণের অক্ষরে শ্রীমহেন্দ্র সিংহ পরাক্রম ও অপরদিকে কুমার গুপ্ত লিখিত আছে। "সেতিহাস বগুড়ার বৃত্তান্ত" নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, "বামনপাড়া নামক গ্রামের নিকটস্থ ধান্য ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বাদশ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট একটী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ৫।৬ হাত মৃত্তিকা খনন করায় প্রকাশ পাইয়াছে। একটী ধাতু নির্ম্মিত ও স্বর্ণমুদ্রা একটী প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ স্বর্ণমুদ্রার আকার অর্দ্ধমুদ্রা হইতে কিঞ্চিৎ বড়। উহার মূল্য ১২।১৩ টাকার অধিক নহে। ঐ মুদ্রায় অক্ষরাদির কোন চিহ্ন নাই; কেবল দুই পৃষ্ঠাতেই পুত্তলিকার আকার আছে। তাহার একটী স্ত্র্যাকার ও একটী পুরুষাকার। স্ত্রী মূর্ত্তিটী পদ্মাসনে উপবিষ্টা, আর পুং মূর্ত্তিটী দাঁড়ান। ইহার পূর্ব্বে আর এক ব্যক্তি ঐ গড়ের মধ্যে ধান্যক্ষেত্রের মৃত্তিকা খনন কালীন কতকগুলিন রজত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। * *। তাহাতেও কোন অক্ষর খোদিত ছিল না। কেবল একটী ত্রিশূলহস্ত বৃষবাহন শিবের মূর্ত্তি আছে।" এইরূপ কতক-গুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার দ্বারা শেলবর্ষের অন্যতম প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী সৈয়দ আবুদল সোবান চৌধুরী অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাইয়া-ছিলেন, এমন তাঁহার ম্যানেজার বাবু গৌর-গোপাল রায়ের নিকট পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে।

মহাস্থানের শেষ হিন্দু নরপতি পরশুরাম যাঁহাকে সাহ সুলতান পরাভব করেন, তাঁহার কন্যার নাম শীলাদেবী। কিন্তু এই শীলাদেবী হইতে মহাস্থানের নাম শীলাদ্বীপ হয় নাই। পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে শীলাদ্বীপের নাম দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং এই সকল গ্রন্থের অনেক পূর্ব্বে শীলাদ্বীপ নামকরণ হইয়াছিল। জনশ্রুতি আছে যে, একদা কাশীর অধিপতির সহিত তদীয় ভ্রাতা ভৃগুরামের মনান্তর নিবন্ধন তিনি পৌণ্ড্রখণ্ডে করতোয়া তটে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক উক্ত স্থানকে কাশীর তুল্য পবিত্র ও সৌন্দর্য্যশালী করিতে যত্ন করিয়া-ছিলেন। ইহাঁর শীলাদেবী নামক কোন কন্যা বা অন্যকেহ থাকার বিষয় জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, মহাস্থান দ্বীপের ন্যায় অবস্থাসম্পন্ন ও তাহাতে কোটিশিলা (শালগ্রাম) থাকায়, উহার শীলাদ্বীপ নাম-করণ হইয়াছে। একমাত্র জনশ্রুতির বাক্যায়

ইহার বিশদ মীমাংসা অসম্ভব। তবে ইহা নিশ্চয় যে, সাহ সুলতানের সমসাময়িক পরশুরাম মহাস্থান সংস্থাপক নহেন এবং তদীয় দুহিতা শীলাদেবী পুরাণান্তর্গত শীলা নহেন। অতীত কালের দুইটী ঘটনা প্রবলতর ও অনেকাংশে সাদৃশ্য হইলে, পরবর্ত্তীকালে শেষের ঘটনাও প্রথম ঘটনার স্থানে নীত হইয়া থাকে। মহাস্থানের নিকটে বিরাট নামক একটী স্থান ও সেই স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের বিস্তর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। মহাস্থান প্রদেশের লোকদিগের বিশ্বাস যে, এই স্থানেই মহাভারতের বিরাটের রাজধানী ছিল এবং পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীসহ অজ্ঞাতবাস করেন। কিন্তু মহাভারতীয় বর্ণনা পাঠে এই স্থান প্রকৃত বিরাটনগর হইতে স্বতন্ত্র বোধ হয়। কাম্বোজ বংশীয় ও পালবংশীয় রাজন্যবর্গ এই প্রদেশে দীর্ঘকাল যাবত রাজত্ব করেন। তাঁহাদিগের রাজত্বাবসানের পরবর্ত্তীকালে যখন লোকের স্মৃতিপথ হইতে প্রকৃত ঘটনা দূরে নীত হইয়াছে, তখনই বিরাটের গোশালা, অশ্বশালা ও অর্জ্জুনের শমীবৃক্ষ ও কীচক বধের স্থান প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ঘটনা তৎপরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কালসহকারে স্মৃতির বিপর্য্যয়ে সংস্কারের এমনই পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে যে, আমরা এইক্ষণ এ প্রদেশে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস করেন নাই বলিলেই লোকে আমাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইবে।

উত্তরকালে পৌণ্ড্রখণ্ড ও তৎপার্শ্বস্থ স্থানের নাম বরেন্দ্র ভূমি হইয়াছে। বারেন্দ্র ঘটকগণের কুল-চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ পাঠে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, বরেন্দ্রশূর নামক রাজার নাম হইতেই দেশের বরেন্দ্র আখ্যা হয়। প্রদ্যুম্নশূর ইহাঁর ভ্রাতা ছিলেন। ইহাঁর স্থাপিত মন্দির যবন কর্ত্তৃক ধ্বংস হওয়ায় বরেন্দ্র ভূমি একটী প্রধান হিন্দু-কীর্ত্তি শূন্য হইয়াছে। কাণিংহাম প্রভৃতি সাহেবগণ বরেন্দ্র নামের মীমাংসা করিতে যাইয়া বিবিধ অসামঞ্জস্য কল্পনায় উপনীত হইয়াছেন। বরেন্দ্রশূর নামক পরাক্রান্ত নরপতি এদেশে একদা রাজত্ব করিয়াছিলেন জানিতে পারিলে, বোধ হয়, তাঁহারা ওরূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। পৌণ্ড্রখণ্ড সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে ;—

"করতো পশ্চিম ভাগে লোহিনী যত্র মৃত্তিকা।
মুক্তিক্ষেত্রং সমাখ্যাতং মহাপাতক নাশনং ॥
স্কন্দ গোবিন্দয়োর্ম্মধ্যে গুপ্তা বারাণসী পুরী।
তস্যারোহণ মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥
পঞ্চক্রোশ মিদং ক্ষেত্রং সমন্তাৎ পরিমাণতঃ।
তদন্তর্গতমে তত্ত্ব ক্রোশ মাত্রং মহেশ্বরী ॥
অতি গুপ্ততমং ক্ষেত্রং যত্রাস্তে ভার্গব মুনিঃ।
কোটি কোটি গুণং তত্র পৌণ্ড্র ক্ষেত্রচ সুন্দরি ॥
স্কন্দ গোবিন্দয়োর্ম্মধ্যে ভূমি সংস্কৃত বেদিকা।
বেদি মধ্যোত্তরে পার্শ্বে দেবী কালাঞ্জরী স্থিতা ॥
তদ্দক্ষিণেঽর্পিতা দেবী কোটিশ্বরীতি বিশ্রুতা।
নৈঋতে লিঙ্গ কোট্যশ্চ বসন্তি ভৃগুণার্পিতাঃ ॥
বারুণে বিজয়চণ্ডী উত্তরে ভূতিকেশবঃ।
ভূতিকেশব দেবস্য দক্ষিণে সূর্য্যমণ্ডপং ॥
বেদি মধ্যোঽর্পিত যূপঃ সংশ্লেষাবর্দ্ধতে নৃণাং।
গোবিন্দ মণ্ডপাৎ পূর্ব্বং কুণ্ডং বিষ্ণু গৃহংস্মৃতং।
স্কন্দমণ্ডপ বায়ব্যে সভা বামস্য চাদ্ভুতা।
যামদগ্নো মহাবীর্য্য স্ত্রেতাদ্যো যস্য সংস্থিতিঃ ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সুব্রতঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বাচার বিধায়কঃ।
পৌণ্ড্র কোটিশিলা দ্বীপে মহাপুণ্যেতি বিশ্রুতা ॥
করতোয়া সরিন্নীরং সন্নীরাদ্যন্ত পাবনং।
ভক্তিমুক্তি কলার্থায় যেনাকারী দ্বিজার্পণং ॥
অদ্ভুতা কারিকাবৃষ্টি কনকস্য দিনত্রয়ং।
পশোর্জ্জানং কথয়তি গুহস্তদ গৃহে তাম্রচূড়ো ॥
দৈর্ঘ্য হৈমীশটিত হুরভির্য্যাষ্টি বৃদ্ধিঃ শিলাদ্ভিঃ।
ধেয়ুছত্রং নকলতি ফনী দ্বিষরো জীবলোকঃ ॥

কোপে দ্বীপে কনকপত্তনং গৌড়ক্ষেত্রেহত্তানি।
প্রচ্ছাভূমির্ভবতি তরুণঃ স্নানতঃ কামকুণ্ডে॥
ভোজ্যো যজ্ঞো ভ্রমণ নটনং তত্রবাক্যংহিবেদঃ।
ইথং রামরচয়িতি পদং লক্ষণানূন বিংশ॥"

পদ্মপুরাণ—উত্তর পৌণ্ড্রীয় সূত-সনক-সংবাদ।

ভৃগুরামের পর বর্ণিত দেবদেবীর ও স্থানের চিহ্ন অধিকাংশই লোকের স্মৃতিপথ হইতে দূর হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট আকবরের শাসনকালে রাজা মানসিংহ কয়েকবার এদেশে আগমন করেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা ভানসিংহ মহাস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ সকল দেব-দেবীর পুনঃ সংস্থাপন করেন। আবার রাজা পরশুরামের পর ও সাহ সুলতানের সমকালীয় মুসলমানগণদ্বারা যাবতীয় দেবদেবী বিনষ্ট হওয়ায় এইক্ষণ পৌষ-নারায়ণী যোগে ঐ সকল দেবদেবীর আসন অতি ক্লেশে যাত্রীগণ নির্ণয় করিয়া লইয়া পূজাদি করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ চরণ মজুমদার।

বুদ্ধদেব।

(৺রামদাস সেন প্রণীত।)

অকালে ডাক্তার রামদাস সেনের মৃত্যু হইয়াছে, বঙ্গভাষায় উন্নতি কল্পে তাঁহার নিকট আমরা অনেক আশা করিতাম। আশা পূর্ণ না করিয়াই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু পাণ্ডিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার বিপুল সম্পত্তি, তিনি বিদ্যাচর্চ্চায় পুস্তক, চিত্র ও কারুকার্য্য সংগ্রহে এবং পণ্ডিতদিগের পুরস্কারে ব্যয় করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন। সৌম্য-মূর্ত্তি, কোমল প্রকৃতি, সদালাপী ও মিষ্টভাষী, তাঁহার পুস্তকাগারে তাঁহার সঙ্গে কত সময় অতি আনন্দে অতিবাহিত করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের সাহায্যে ডাক্তার কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, গল্পপ্রিয় অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক সে রহস্যের মর্ম্ম সংগ্রহে প্রয়াস পাইবে না। কিন্তু জ্ঞানলিপসু সহৃদয় মাত্রে ঐতিহাসিক-রহস্য, ভারত-রহস্য ও রত্ন-রহস্যের অমৃত স্বাদে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিদেশীয় ভাষায় বৃহদাকারে যে কার্য্য করিয়াছেন, ডাক্তার রামদাস সেন দেশীয় ভাষায় পরিমিতাকারে তাহাই করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা রামদাসের নিকট অধিকতর উপকার লাভ করিয়াছে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ডাক্তার সেন বুদ্ধদেব চরিত লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র মণিমোহন পিতৃপ্রীতি কামনায় পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ইহার সূচনা লিখিয়া দিয়াছেন।

ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু অবদান নামক দুইখানি পৌরাণিক বৌদ্ধ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন অবস্থায় এ দুইখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থ দুইখানিতে কবিকল্পনার পূর্ণমাত্রা দেখিতে পাওয়া

যায়। কবি কল্পনা ঐতিহাসিক সত্যের প্রখর জ্যোতি কুয়াসায় আচ্ছন্ন করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্য্য উৎপাদন করে। এজন্য পুরাণ হইতে জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করা দুষ্কর। ডাক্তার সেন আর্ণোল্ডের Light of Asiaর মত একখানি সুন্দর কাব্য-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধচরিত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিকট আমরা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দ্রব্য আশা করিয়াছিলাম। হয়ত ডাক্তার সেনের অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। হয়ত একখণ্ডে পৌরাণিক বুদ্ধচরিত সঙ্কলন করিয়া অন্য খণ্ডে প্রকৃত বুদ্ধচরিত প্রকাশ করিতেন। ললিতবিস্তর ও মহাবস্তুকে তিনি অপ্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুস্তক মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। হয়ত জীবিত থাকিলে বুদ্ধচরিতের দ্বিতীয় খণ্ড তিনি রচনা করিতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি।

হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম সংগ্রহ করা যেমন অসম্ভব, ললিতবিস্তর হইতে বুদ্ধের মত সংগ্রহ করাও তেমনি অসম্ভব। অভিধর্ম্ম ও বিনয়-পিটক প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকগুলি সূত্রগ্রন্থও প্রচারিত হইয়াছে। এখনকার দিনে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধমত বলিয়া প্রচার করা অন্যায়। বস্তুতঃ ডাক্তার সেন সে মতগুলি কতকগুলি বুদ্ধমত বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করেন নাই। কিন্তু অনভিজ্ঞ পাঠকগণ সেগুলি বুদ্ধ মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। ডাক্তার সেন জীবিত নাই। মণিমোহন বালক, এ পুস্তকে যে সকল দোষ লক্ষিত হয়, তজ্জন্য আমরা বেদান্তবাগীশ মহাশয়কেই দায়ী বলিয়া মনে করি। তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য উপযুক্তরূপে সাধন করেন নাই। ললিতবিস্তর, মহাবস্তু অবদান, Light of Asia এবং বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত বুদ্ধদেব-চরিত বিদ্যমান থাকিতে এরূপ একখানি পুস্তক ডাক্তার রামদাস সেনের লিখিবার আবশ্যক ছিল না। তাঁহার মত প্রত্নবিতের নিকট আমরা উচ্চদরের গ্রন্থ আশা করিতাম।

এক স্থানে লিখিত হইয়াছে (১০ পৃষ্ঠা) "রাজা সুজাতের পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা হইয়াছিল। পুত্রগণের নাম ও পুর, নিপুর, করকণ্ডক, উল্কামুখ ও হস্তিকশীর্ষ" কিন্তু অন্যস্থানে (২৪ পৃ) দেখা যায় "ওপুরের পুত্র নিপুর, নিপুরের পুত্র করকণ্ডক, করকণ্ডকের পুত্র উল্কামুখ ও উল্কামুখের পুত্র হস্তিকশীর্ষ।"

এক স্থানে লিখিত হইয়াছে (১০ পৃ) "আমাদের বিবেচনায় মহাবস্তু গ্রন্থখানি অন্যূন ১১১৬ বৎসর পূর্ব্বের," অন্যস্থানে লিখিত হইয়াছে, "অন্যূন সার্দ্ধেক সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মহাবস্তু অবদান।" মহাবস্তু অবদানে মুদ্রালিপির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "উহা যদি ঠিক নামানুরূপ তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, বুদ্ধদেবের অথবা তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ তিন সহস্রাধিক বর্ষের পূর্ব্বে মুদ্রালিপি প্রচলিত ছিল।" মুদ্রালিপি কখন প্রথম প্রচারিত হয়, সকলেই জানিতে ইচ্ছা করেন। এমন গুরুতর বিষয়ের এমন সহজ মীমাংসা সমীচিন নহে। যখন মহাবস্তু অবদানে মুদ্রালিপির কথা উল্লেখ আছে, তখন আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, এই গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে মুদ্রালিপি প্রচারিত হইয়াছিল। বুদ্ধ ঐ কথাগুলি

বলিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই, এবং বালকের মুখে গুরুর নিকট ওরূপ কথা বলা সম্ভব নহে। সে যাহা হউক, ঐ কথা বুদ্ধ বলিয়াছিলেন বিশ্বাস করিলেও গ্রন্থকারের মতে বুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬৯৯ বা ২৬০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তবে তাঁহার পূর্ব্বে আর ৪০০ বৎসর কিরূপে অনুমান করিয়া লওয়া হইল, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বুদ্ধের পূর্ব্বে মুদ্রালিপি প্রচলিত হইয়া থাকিলেও তাহার ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যে তাহা প্রচলিত হইয়াছিল, অন্ততঃ তাহার কোন একটা প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল।

ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল লিখিয়াছেন, যে চারিটী বৌদ্ধ-সঙ্গম হইয়াছিল।

১। বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অজাতশত্রুর রাজত্ব কালে খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে।

২। ইহার একশত বৎসর পরে কালাশোকের রাজত্ব কালে।

৩। অশোকের রাজত্ব কালে খ্রীঃ পূঃ ২৪৭ অব্দে।

৪। কনিষ্কের রাজত্ব কালে খ্রীঃ পূঃ ১৪৩ অব্দে।

ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল যে সময় অনুমান করিতেন, ডাক্তার সেন বুদ্ধের আবির্ভাব কাল তাহার অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ তিনিও বোধ হয় চারিটী বৌদ্ধ-সঙ্গমে বিশ্বাস করিতেন। পণ্ডিত বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছেন, ত্রিপেটক খ্রীষ্ট জন্মের অন্যূন ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এবং ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিন বার বৌদ্ধ সঙ্গম আহূত হয়। ইহারা সকলেই কনিষ্কের বৌদ্ধ সঙ্গমে বিশ্বাস করিতেন, হর্ষবর্দ্ধনের ও মহেন্দ্রের কথাও জানেন, তথাপি লিখিয়াছেন "খ্রীঃ পূঃ ২২২ বৎসরে ইহার (অশোকের) মৃত্যু হয়, তৎপরে ভারতবর্ষে আর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি হয় নাই।" একথা স্বীকার করিতে হইবে যে "ধর্ম্মের" উন্নতির বহু অর্থ হইতে পারে এবং এক অর্থে যে বৌদ্ধধর্ম্মের দিন দিন অবনতি হইতেছিল, ইহাও নিশ্চয়। কিন্তু গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম নূতন ক্ষেত্রে প্রচারিত হয় নাই। এ কথা সত্য নহে।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন, "বৌদ্ধধর্ম্মের মূল প্রস্রবণ এক হইলেও, তাহা আচার্য্যগণের মতের দ্বারা বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। এমন কি, শাক্য সিংহের মত কিরূপ ছিল, তাহা এখন সহজে বোধগম্য করা যায়না।" অথচ তিনিই স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "বুদ্ধদেব কপিলের ন্যায় নিরীশ্বর" এবং তাঁহার শিষ্য ডাক্তার সেন লিখিয়াছেন যে "এই বুদ্ধ বাক্য দেখিয়া অনুমিত হয়, বর্ত্তমান তন্ত্র শাস্ত্র বুদ্ধের পরে এবং স্মৃতি ও পুরাণ বুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।" "বুদ্ধদেব কিছু মাত্র নিজে উদ্ভাবন করেন নাই। তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া মোক্ষতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন ও মুক্ত হইয়াছিলেন, সে প্রণালী সমস্তই পাতঞ্জল সূত্রের প্রণালী।" "বুদ্ধের সমস্ত উপদেশ সাংখ্যের, পাতঞ্জলের ও বেদান্তের অবস্থান্তর মাত্র বা রূপান্তর। বুদ্ধের উপদেশে শব্দের প্রভেদ ব্যতীত অর্থতত্ত্বের অধিক প্রভেদ দেখা যায় না।" "বৌদ্ধেরাও নাস্তিকতার নিন্দা করে। ইহার দ্বারা বুঝুন, বুদ্ধদেব কিরূপ নাস্তিক ছিলেন।"

বুদ্ধ জাতিভেদ মানিতেন না, দেব দেবী মানিতেন না, এবং বেদপ্রোক্ত যাগ যজ্ঞের বিষম বিদ্বেষী ছিলেন। সমগ্র মীমাংসা দর্শন এ কথার প্রমাণ। পণ্ডিত বেদান্তবাগীশ বলিতেছেন, "শুনিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব নাকি বেদ নিন্দা করিয়াছিলেন। আমরা সাধ্য মত তদীয় জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার পবিত্র জীবনে উক্ত নিন্দাবাদের লেশ মাত্রও দেখিতে পাই নাই। * * * তিনি ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করিতেন কি না, এখন স্থির বলা যায় না। * * * হিংসাঘটিত বৈদিক ক্রিয়া কলাপ তাঁহার মত-বহির্ভূত। তিনি হিংসা-ঘটিত ও কামনা-ঘটিত বৈদিক কর্ম্ম করেন নাই এবং করিতে অন্যকেও নিষেধ করিতেন।" যাঁহারা বলেন, বুদ্ধ বেদের নিন্দা করিতেন, তাঁহারা কি ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী বলিয়া থাকেন? জয়দেব স্পষ্টই দেখাইয়া দিয়াছিলেন, লোকে কি অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।

নিন্দসি যজ্ঞ বিধে রহহ শ্রুতি জাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।

এ কথা সত্য বটে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম্ম নহে এবং বৌদ্ধ যোগশাস্ত্রের সহিত হিন্দু যোগশাস্ত্রের অনেক মিল আছে, কিন্তু এ কথা সত্য নহে যে, বুদ্ধদেব নিজে কিছুই উদ্ভাবন করেন নাই এবং তাঁহার প্রণালী সমস্তই পাতঞ্জল, সাংখ্য ও বেদান্তের প্রণালী। এ কথা বলিলে বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লোপ করা হয় এবং ত্রিবিধ দর্শনের বৈশেষিকত্ব অপহরণ করা হয়। "বুদ্ধ মতের হস্ত পদ হৃদয় প্রাণ মস্তক সমস্তই প্রাচীন বৈদিক মতের মধ্যে বিভিন্ন সংস্থানে লুক্কায়িত ছিল, বুদ্ধ সেইগুলি যোড়া লাগাইয়াছিলেন মাত্র"—ইহা অতি সাহসের কথা।

অযোধ্যাকাণ্ডে লেখা আছে,—

যথা হি চৌরঃ স তথাহি বৌদ্ধঃ
তথাগতং নাস্তিক মাত্র বিদ্ধি॥

ইহা দেখিয়া বেদান্তবাগীশ বৌদ্ধ মত রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এ শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও তাঁহার আশঙ্কা আছে। ভরতের সঙ্গে জাবালী আসিয়া যখন রামচন্দ্রকে অযোধ্যা ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, সেখানেও বৌদ্ধধর্ম্মের নিন্দা করিয়া অনেক গুলি শ্লোক দেওয়া আছে। এখানে আমার নিকট রামায়ণ নাই, এজন্য সেগুলি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। এই শ্লোক গুলি কেবল বৌদ্ধধর্ম্মের নিন্দা করিয়া নিরস্ত হয় নাই, শাক্যসিংহের নামও উল্লেখ করিয়াছে। এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার না করিলে, কেবল বুদ্ধমত নহে, বুদ্ধদেবকেও রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ৬৯৯ বৎসরের পরে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হয়। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রত্ন-বিদ্যা ও হিন্দুয়ানীর এই খানে একটা গোলযোগ বাঁধিয়াছি। পূর্ব্বেও যে সকল বৈপরীত্য দেখান হইয়াছে, সে গুলিও এই ঐকান্তিকতার ফল কিনা, আমরা বলিতে পারি না। শ্রীমদ্ভাগবতেও বুদ্ধদেবের উল্লেখ আছে।

বুদ্ধ নাম্না জীনসুত কীকটেষু ভবিষ্যতি।

এক স্থলে লিখিত হইয়াছে "বুদ্ধ কোনও সময়ে সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দেন নাই। সমস্তই প্রাকৃত, পালী বা তৎকালে তদ্দেশ-প্রচলিত ব্যবহার্য্য মাগধী ভাষায়

বলিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের ত্রিপেটক পালী ভাষায় রচিত। তাহাতেও লেখা আছে, বুদ্ধ বাক্য সকল প্রাকৃত ভাষায় গ্রথিত। এতদ্ভিন্ন বুদ্ধ একস্থানে বলিয়াছিলেন, "আমার বাক্য সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিও না।"

পূর্ব্বোল্লিখিত "বা" শব্দের অর্থ কি? ইহার দুইটী অর্থ হইতে পারে (১) প্রাকৃত, পালী ও মাগধী একই ভাষা [২) এ তিনটী ভিন্ন ভাষা, বুদ্ধদেব সুবিধা মত কোন একটী ব্যবহার করিতেন। প্রথমার্থে তিনটী ভাষায় একতা ও দ্বিতীয় অর্থে সম-সাময়িকতা স্বীকার করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা একও নহে, সম-সাময়িকও নহে।

বিশেষতঃ পালী ভাষায় ত্রিপেটক রচিত। ত্রিপেটক বুদ্ধ বাক্যের সংগ্রহ বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহা জনিয়া শুনিয়া ত্রিপেটক অবহেলা করিয়া ললিতবিস্তর ও মহাবস্ত হইতে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত সংগ্রহ করা কেন হইল?

ডাক্তার সেন বুদ্ধদেবকে ভক্তি করিতেন। তাঁহার প্রাসাদে প্রবেশ করিতে সম্মুখেই বুদ্ধদেবের প্রশান্ত মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আমার যেন স্মরণ হয়, তিনি তাঁহার একটী পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব। তিনি বিশেষ যত্নে পালী গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিতেছিলেন। আমার বোধ হয়, অল্প পুস্তকে পালী-গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি জীবিত থাকিলে বুদ্ধদেবের প্রকৃত জীবনচরিত প্রকাশ করিতেন। বর্ত্তমান পুস্তকে আমার তৃপ্তি হয় নাই বলিয়া এ পুস্তকখানি অনাদরনীয় নহে। অন্য লোকের লেখা হইলে এই একখানিতেই তাঁহার গৌরব হইত। মূল গ্রন্থের কবিত্ব ইহাতে সম্পূর্ণ রক্ষা হইয়াছে, কোন কোনও স্থানে আর্নোল্ডের লেখা অপেক্ষাও প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। ভাষা অতি সুন্দর হইয়াছে। এবং হিন্দু যোগশাস্ত্রের সহিত বৌদ্ধযোগশাস্ত্রের যেখানে তুলনা করা হইয়াছে, সে স্থানটী অমূল্য হইয়াছে; এই অমূল্য অংশ ডাক্তার সেন তাঁহার গুরু বেদান্তবাগীশের নিকট লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদের দুই জনের নিকটের বাঙ্গালা ভাষা কৃতজ্ঞ থাকিবে। এবং মণিমোহন পিতৃপ্রীতি কামনায় পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়া আপনিও ধন্য হইয়াছেন এবং আমাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

ঋষিচিত্র।

(উদ্বোধন।)

(১)

এসগো অমৃতময়ি জননি ভারতি,
দরশন দাও আজি দীনে দয়াবতি।
তোমাবিনা চরাচর
জীর্ণারণ্য ভয়ঙ্কর,
নীরস মানস সরঃ, মাতঃ সরস্বতি,
জীবন দুর্ব্বহ ভার কলুষ সংহতি।

(২)

যে জ্যোতি মা জ্যোতির্ম্ময়ি এ মম লোচনে,
দিয়াছিলে কৃপা করি কিশোর যৌবনে,

হারায়ে সে জ্যোতি হায়
হয়েছি মা অন্ধপ্রায়,
আর নাহি ভাতে মাগো এ মোর নয়নে
তোমার সে চারু শোভা এ বিশ্ব ভুবনে।

(৩)

হেরেছিনু একদিন, আজি পড়ে মনে,
জাগরণময় এক অমৃত স্বপনে,
হেরেছিনু—আর হায়
দেখিতে কি পাব তায় ?
সে দীপ্ত নয়ন নাই, নাই সে যৌবন,
আজি শুধু অন্তকার ছাইয়ে ভুবন।
ঊর্দ্ধে নীল নৈশাকাশ অসীম অপার,
নিম্নে সুগম্ভীর নাদী মহা পারাবার,
জ্যোস্নালোকে স্নাত ধরা
স্তব্ধ শুভ্র মনোহরা,
জিনি সে গাম্ভীর্য্য—মহা গম্ভীর উদার—
ফুটেছিল প্রাণে তব শোভার সংসার।
তোমার অমৃতস্রাবী কণ্ঠের সঙ্গীত,
(অর্ণব প্রণব গাথা যেখানে নিন্দিত)
ঘোর নাদে স্নিগ্ধ তানে
নীরবে সঞ্চরি প্রাণে
করেছিল প্রাণ মন কত পুলকিত,
মহা অপার্থিব রসে করি রোমাঞ্চিত।

(৪)

আজি বহুদিন পরে ব্যাকুলিত মনে
নিরাশার আশা তব অভয় চরণে
অনুতাপ অশ্রুজল
ঢালি হব নিরমল,
অভিনব জ্যোতি তব পদ পরশনে।
লভিব পরাণে তাই ডাকিছি সঘনে।
এস মা করুণাময়ি বিশ্বশোভা-রাণী,
বিরাজ এ প্রাণে আজি বিশ্বম্ভরা বাণী।
খুলি অতীতের দ্বার
আদিম আর্য্য সংসার—
তব আদ্য লীলাভূমি দেখাও চকিতে,
দেখি সেই পুণ্যালেখ্য হরষিত চিতে।
আর্য্যজন মুগ্ধপ্রাণে দেবাবতরণ
মহোদার পুণ্যচিত্র করি দরশন,—
লভিব বাঞ্ছিত ফল,
চিত্ত হবে নিরমল,
ভজিব ভকতি ভরে তব শ্রীচরণ,
দয়া কর দয়াময়ি, আমি অকিঞ্চন।

প্রথম দৃশ্য—দেবাবতরণ।

(সরস্বতী নদীতট—উষাকাল)

(১)

প্রশান্ত নিশান্ত কাল ; বিরাজে উজ্জ্বলে
উষার তুষার-শুভ্র ললাট-মণ্ডলে
স্বর্গের কৌস্তুবমণি শুক্র-সুশোভন,
প্রাচীর দিগন্ত পটে ছবি অতুলন।
উদীচী আকাশে দূরে মহা জ্যোতির্ম্ময়
তুষার কিরীটে রাজে গিরীন্দ্র আলয়।
অনন্ত হিমানীক্ষেত্র শুভ্র হিমাচল
ত্রিদিবের পুণ্যপুঞ্জ সম মহোজ্জ্বল ;
বিশ্বপ্রাণ-স্পর্শী আহা উষার উৎসবে,
মাতিল সুহাসময়ী দিক-বধূ সবে।
প্রক্ষালি শিশির জলে উষার চরণ,
লভিলা আশীষরূপে দিব্য আভরণ ;
জ্যোতির সিন্দূর বিন্দু, জ্যোতির বলয়,
জ্যোতির্ম্ময় অবতংশ, মালা জ্যোতির্ম্ময়।
জ্যোতির্ম্ময় পারিজাত দিগ্বধূ কুন্তলে
ফুটাইলা আচম্বিতে, উষা, কুতুহলে।
একে পূর্ণিমার নিশি, চাঁদের কিরণ
তরল রজতস্রোতে প্লাবিছে ভুবন ;
দ্যুলোক দুহিতা উষা, আবার তখন
ত্রিদিবের কামধেনু করেন দোহন।
করস্পর্শে যেন তাঁর ক্ষীর পারাবার,
উজ্জ্বল আলোক রূপে প্লাবিছে সংসার।

উছলিছে দিশি দিশি আলোক প্রবাহ;
দ্যাবা পৃথিবীর কি গো এ দৈব বিবাহ।
তরল স্বর্গীয় গীতি উষা উদ্বোধিনী
ঢালিছে ভরত (১) পুরি আকাশ মেদিনী।
উষার পরশে জাগে প্রণিপাত কার
অবনী শিশির মুক্তা-শালিনা সুন্দরী।

(২)

এহেন সময়ে পুণ্যতোয়া সরস্বতী
তীরভূমে কেগো যুবা গম্ভীর মূরতি।
দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি, সুঠাম—বিরাট—
চৈতন্যের লীলামঞ্চ নিটোল ললাট।
বিশাল লোচনযুগ আকর্ণ বিশ্রান্ত
ঝরিছে জ্যোতির ধারা তাহে সুপ্রশান্ত।
সুতীক্ষ্ণ নাসাগ্র তীক্ষ্ণ অসি অগ্র প্রায়,
হতেছে সূচিত শুভ লক্ষ্য সিদ্ধি তায়।
ওষ্ঠযুগ বাগ্দেবীর মাণিক্য সোপান,
বিশ্বকর্ম্মা বিধাতার বিচিত্র নির্ম্মাণ।
অগ্নিপ্রভ জটাজাল আজানুলম্বিত,
কৃষ্ণ রোমাবলী শ্মশ্রু আননে শোভিত।
লম্বিত আয়ত ভুজদণ্ড সুসরল,
সুবিপুল বক্ষঃ মহা ভাবলীলা স্থল।
স্বর্ণদা পুলিনে স্বর্ণ নমেরুর প্রায়,
সরস্বতী তীরে ওই কেগো শোভা পায়।
গদ্গদ শব্দেতে পদতলে অবিরল,
উপল শয়নে বহে সরস্বতীজল।
উষার উৎসবময় গগন সম্মুখে
ঢালিতেছে বাক্যতারা স্নিগ্ধজ্যোতি মুখে।
বামে দিক্‌বলয় কোলে, দীপিছে ভাস্বর
হীরক কিরীটসম হিমাদ্রি শিখর।
পশ্চাতে কুরঙ্গপূর্ণ উটজ অঙ্গন
চারিদিকে প্রসারিত পুলিন কানন।
নিশান্ত সমীর বহে নীরব শীতল,
পরশি মৃদুলে তাঁর বদন মণ্ডল।

(৩)

আলোক বেষ্টিত ওই পুরুষ পুঙ্গব
প্রজাপতি ঋষি বংশে জীবন্ত গৌরব।
হিরণ্ময় প্রভ যথা হিরণ্যাংশুমালী,
নামেতে হিরণ্য গর্ভ মহাদ্যুতিশালী। *
পুণ্য-সোমরস রূপ মাধুরী উষার
পান করি দেব ভাবে পূর্ণ প্রাণ তাঁর।
মহাপ্রেমে বিস্ফারিত বিশাল লোচন,
এমহা মাধুরীলীলা করেন দর্শন।
দেখিতে দেখিতে মহা ভাবে নিমগন,
দেখিতে দেখিতে নিমীলিত দুনয়ন।
ইন্দ্রিয় প্রতীতি ভূমি অতীত সংসারে
নিমগন মনপ্রাণ ধ্যান-পারাবারে।

(৪)

সহসা সহস্র বিদ্যুন্মহঃ পরাভবি
স্ফুরিল ঋষির হৃদে মহামৃত ছবি।
অমূর্ত্ত মুরতি আহা রূপ নিরুপম,
অনন্ত অনলব্যাপি স্থাবর জঙ্গম।
দেশ কালাতীত দৃশ্য কল্পনা অতীত,
অথচ জ্যোতির জ্যোতি নয়নাগ্রস্থিত।
দূর হতে সুদূর সে চিন্তা অগোচর,
অথচ নিকটে অতি ব্যাপিয়া অন্তর।
অশব্দ অস্পর্শ যেন অরূপ অরস
তথাপি পরম সত্য মহানন্দ রস।
নিজ মহিমায় স্থিত নিজে নিরাকার,
অনন্ত অগম্য মহা—ব্রহ্মাণ্ড আধার।
সম্মুখে পশ্চাতে আর নিম্নে ঊর্দ্ধভাগে,
অদেহী অথচ তাঁরি রূপ যেন জাগে।
কেগো সে বরেণ্য ভর্গ পরম সুন্দর,
পূর্ণ অপ্রতিম, পূরি বাহ্য অভ্যন্তর?

(৫)

আবার কল্লোলময়ী মহা সরস্বতী
স্বস্তিপূর্ণা সুগম্ভীরা বাণী ভাগবতী

(১) ভরত—পক্ষী বিশেষ (Lark)

* ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল ১২১ সূক্তের ঋষি হিরণ্যগর্ভ।

উৎসপ্রায় উৎসারিত, ভেদি হৃদিস্তর
অমৃত সুনৃত নাদে পুরে চিদম্বর।
ভবশিরে অবতীর্ণা যথা ভাগীরথী
মহানাদময়ী বিশ্ব-প্রহ্লাদিনী সতী,
তেমতি আজি এ ঋষি প্রাণে অবতরি
কি এক অমৃত বাণী যায়রে সঞ্চরি।
অশব্দ সে শব্দ ভূমা বাক্য অগোচর,
শুনিছে নীরবে প্রাণ সে নীরব স্বর।
কি জানি সে কোথা হতে বাণী বীণাধ্বনি
ঋষি হৃদি বিষ্ণুপদ পূরিল এমনি?
বিশ্বব্যাপী অস্তিত্বের ওঁকার ঝঙ্কার
সুমন্দ্র ধ্বনিতে পূর্ণ নিখিল সংসার।

(৬)

কেমনে বর্ণিব সেই ভাষাতীত ভাব,
জীবাত্মায় পরমাত্মা ভূমা আবির্ভাব।
এ নহে মর্ত্ত্যের দৃশ্য, শব্দ মরতের,
নহেত এ ক্ষুদ্র ভাব ক্ষুদ্র জগতের।
মহীয়সী মহিমার চিন্ময় বিভব,
দেখরে জগত আজি দৃশ্য অভিনব।
দেখরে দেখরে আজি অপরূপ ছবি,
চিত্রিছেন মহা চিত্রকর আদিকবি।
পরম জ্যোতির জ্যোতি দেব ভগবান
অরূপ প্রকাশে পূরি ঋষিজন প্রাণ
ভেদি যেন ব্রহ্মতালু সহসা উদিত
করিছেন ঋষি মুখ-পদ্ম বিকশিত,
বদন তুষার গৌর শোভে গৌরতর
বিমল জ্যোতির যেন প্রফুল্ল পুষ্কর।
কি মহা তাড়িত স্রোত পশি আচম্বিতে
আপাদ মস্তক ধায় ধমনী শোণিতে।
মহা পুলকেতে তনু রোমাঞ্চে পূরিত
কদম্ব কেশর সম কেশ কণ্টকিত।
উছলি প্রেমাশ্রু, পূরি নয়ন যুগল
সুন্দর কপোলে তার বহে অবিরল।
হিমগৌর হিমাচল-কপোল ঝরিয়া
জাহ্নবী যমুনা যেন যেতেছে বহিয়া।
সহসা ফুটিল ঋষি-লোচন কমল
খেলে তাহে আহা কিবা জ্যোতি সুবিমল।
বাহ্য অভ্যন্তর ভেদ আর না রহিল।
চারিভিতে মহাজ্যোতি ভাতিয়া উঠিল।
ক্ষিতি অপ্ মরুদ্ব্যোম তেজঃ একাকার
নিরখিলা ঋষিবর চিন্ময় সংসার।
মৃত জড় আজি সবি কি অমৃতময়
ব্রহ্ম নিশ্বাসেতে পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড হৃদয়।
ব্রহ্মাণ্ড হৃদয়তন্ত্রী বাজে একতানে
ওঁকার ঝঙ্কারময় মর্ম্মভেদি গানে।
চকিতে হইল ছিন্ন মর্ম্ম গ্রন্থিচয়
গম্ভীর উচ্ছ্বাসে পূর্ণ ঋষির হৃদয়।
ঋষির নিরুদ্ধ কণ্ঠ ভেদি বেগভরে
উছলিছে বাণীস্রোত কে আর সম্বরে।
ঋষি মুখ হতে বাণী গদ গদ ভাষে
বহে—সরস্বতীসম—প্রভাত আকাশে।
ত্রিষ্টভ গায়ত্রী ছন্দে গীর্ব্বান বিভব
ঢালিয়ে করেন ঋষি স্তব অভিনব।
কেমনে গাইবি ভাষা সে বাণী সম্পদ,
সেই মধুময় ছন্দ, সে অমৃত পদ?
মহা প্রেমাবেশে ঋষি ভাসি অশ্রুজলে
বক্ষে স্থাপি করযুগ বলেন বিহ্বলেঃ—

৭।

কেহে দেব দেব দেব প্রভু পরাৎপর,
কি অমৃত তেজে আজি পূরি এ অন্তর,
কি অমৃত তেজে পূরি এ মহা আকাশ
বিরাজিত বিশ্বদেব বিভো স্বপ্রকাশ।
কেহে দেব মহাদেব দ্যাবা পৃথিবীর?
দ্যুলোক ভূলোক বন্দে আনন্দে অধীর।
অমৃত যাহার ছায়া, মরণ কিঙ্কর
বন্দিছে বরেণ্য ভর্গ বিশ্ব চরাচর।

অজর অমর হোতা অগ্নি যজ্ঞকারী,
ঐরাবতে বিরাজিত ইন্দ্র বজ্রধারী,
দশদিক-ব্যাপী সদাগতি মরুৎগণ,
গগন-বিহারী সূর্য্য জলন্ত তপন,
দ্যুলোকের জ্যোতি, মিত্র, চিত্রে সুনিপুণ,
জলস্থল আবরক বরেণ্য বরুণ,
দ্যুলোক নন্দিনী ঊষা তমিস্রহারিনী,
সরস্বতী বাণীময়ী সুনৃতভাষিণী,
দিবা, বিভাবরী, মাস, ঋতু, সম্বৎসর,
বন্দিছে সকলে যাঁর পদ নিরন্তর ?
কেগো দেব মহিমা প্রদীপ্ত অনল
যাঁহার ইঙ্গিতে রাজে শ্বেত হিমাচল ;
পূজিল, ইঙ্গিতে যাঁর, পূর্ব্ব ঋষিগণ
মহাভূত চয়ে দেখি শক্তি নিদর্শন ?
একাধারে ধরি সেই ভূতশক্তি চয়ে
কেহে বিরাজিত নিজ মহিমা নিলয়ে ?

৮।

সুগম্ভীর উদীরণে এ ক্ষুদ্র পরাণে
অবতীর্ণ বাণীরূপে অদ্ভুত বিধানে।
তুমি দেব পরাৎপর প্রাণের বিধাতা,
তুমিই প্রত্যক্ষরূপী বিশ্বপিতামাতা,
এক অদ্বিতীয় প্রভু সর্ব্ব মূলাধার,
একমাত্র পরমাত্মা ব্রহ্ম নিরাকার,
জয়তে মঙ্গলময় মহামহেশ্বর।
জয়জয় সত্যরূপ পরম সুন্দর।
বিরাজ বিরাজ দেব হে অমৃতময়,
তোমারি অমৃত রূপে পুরি এ হৃদয়।
তোমারি ওঁকারময়ী বাণী, নিরন্তর
পবিত্র ঝঙ্কারে পূর্ণ করুক অন্তর।

শ্রীমধুসূদন রাও।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জাতিভেদ।

আর্য্য সভ্যতার ইতিবৃত্ত পাঠে দেখা যায় যে, একদিকে যেমন বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি ও শিল্প কৌশলের উন্নতি হইতেছিল, অপরদিকে জন্মগত জাতিভেদ প্রথার নিগড় সকল কঠিন হইয়া লোক সাধারণের স্বাধীনতা ও তেজস্বিতা তেমনি খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইল। গঙ্গা যমুনার উর্ব্বর ভূমি ও রমণীয় জল বায়ুতে ৪।৫ শত বৎসর নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে অবস্থান করিয়া আর্য্যেরা যেমন একদিকে সুসভ্য ও সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য সংস্থাপন, দর্শন, বিজ্ঞান শিল্পাদির উন্নতি সংসাধন এবং সুমার্জ্জিত আচার নীতির প্রচলন করিতে সমর্থ হইলেন, অপর দিকে অজ্ঞাতসারে সামাজিক স্বাধীনতায় যেন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক জলাঞ্জলি দিয়া জন্মগত জাতিভেদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন ; তদবধি তাঁহাদের উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল। সেই অবধি ভারতবর্ষে প্রকৃতিপুঞ্জ কদাপি রাজনৈতিক বা সামাজিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিলেন না।

দুই এক পুরুষেই যে জাতিভেদের বিষময় ফল পরিপক্ক হইল, তাহা নহে।

বৈদিক যুগের যে শেষ ভাগে ইহার বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। দ্বিতীয় যুগে তাহার পুষ্টি সাধন হইয়া অঙ্কুরিত হয়। বৌদ্ধ যুগে এই অঙ্কুর উৎপাটনের চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টা বিফল হইলে পৌরাণিক যুগে তাহা সতেজ বৃক্ষে পরিণত হইয়া তাহার বিষময় ছায়া আর্য্য উদ্যানের চন্দনতরু ধ্বংস করিতে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে আর্য্যদের তেজস্বিতা ও সজীবতা ছিল; তখন এই বিষবৃক্ষ উৎপাটনের চেষ্টাও হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় যুগে ক্ষত্রিয়েরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে পুরোহিতদিগকে অতিক্রম করিতে উপক্রম করিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানের পর পুরোহিতদিগের প্রাধান্য পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণে বৃদ্ধি পাইল। জাতি সাধারণের তেজোহানি, কুসংস্কারে যোদ্ধ্‌ পুরুষদের সাহস হীনতা, এবং সজাতি-প্রেম-খর্ব্বতা হইল। কুরুপাঞ্চালীয় যোদ্ধা ও সেকান্দর সাহের গতি-রোধকারীদের সন্তানেরা সামান্য বিজেতাদিগের নিকট পরাভব স্বীকার করিল। ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত অল্প সংখ্যক মুসলমান পঞ্চনদ হইতে বিহার পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্য জাতিকে অধীন করিয়া রাখিয়াছিল, এই কোটী কোটী লোকের মধ্যে এমন তেজঃ ছিল না যে, এই বিদেশীয় লোক কয়টাকে সিন্ধুনদ পার করিয়া দেয়। দেশে দেশে বিবাদ করিয়া প্রাচীন গ্রীসের পতন; সুখবিলাসে ও পাপাচারে রোমের পতন; আর জাতিভেদে ও কুসংস্কারে হিন্দুর পতন।

বৈদিক যুগের পুরোহিতেরা একটী ব্যবসায় ভুক্ত সম্প্রদায় হইয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। পুরোহিতের পুত্র পৌরহিত্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। এইরূপে জন্মগত পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ জাতির সৃষ্টি। যখন যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ডের আড়ম্বর ও বাহুল্য হইল, রাজা ও সম্রাটেরা এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন করা মহাগৌরবের বিষয় মনে করিতে লাগিলেন। সুতরাং যে সকল পুরোহিত এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের আড়ম্বর ও বাহুল্য করিতে পারিলেন, তাঁহাদেরই আদর অধিক হইল; এই সকল পুরোহিতের পুত্রেরাই আবার পৌরোহিত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে যজ্ঞীয়-ক্রিয়াকাণ্ড-অবগত ব্যক্তিরা অপরের আদর ও শ্রদ্ধা পাইয়া লোক সাধারণ অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিলেন। লোকেও তাঁহাদের ভিন্ন যজ্ঞাদিকার্য্যে শুদ্ধি ও শুচি হয় না, এইরূপ বিশ্বাস করিতে লাগিল। এই অবস্থায় পুরোহিত বংশ ভিন্ন অপর বংশের সহিত রক্ত মাংসের সম্পর্ক রাখা পুরোহিতের পক্ষে লজ্জাকর কার্য্য মধ্যে গণ্য হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। পুরোহিত ভিন্ন অপর বংশ হইতে পুরোহিতেরা কন্যাগ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করা নিতান্ত লজ্জার বিষয় মনে করিতেন। আধুনিক ইউরোপীয় জাতির মধ্যে এই ভাব আচারগত বটে, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে ইহা অলঙ্ঘ্য ধর্ম্ম-বিশ্বাসে পরিণত হইল।

যে কারণে পুরোহিত জাতির সৃষ্টি, তাদৃশ কারণে ক্ষত্রিয় বা রাজন্য জাতির

সৃষ্টি। পঞ্চনদে প্রাদুর্ভাবের সময় রাজপদের তত সম্মান হয় নাই। সকলেই যোদ্ধা, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, যাঁহার অধিনেতৃত্বে দেশ প্রদেশ করায়ত্ত হইত, তিনি নেতার স্বাভাবিক সম্মান পাইতেন, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু গাঙ্গ্যপ্রদেশে প্রাধান্য-লাভ-সময়ে আর্য্যদের এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। সাধারণ লোকেরা, রাজাদের আড়ম্বর এবং স্ব স্ব অবস্থা হইতে তাঁহাদের ভোগ বিলাসাদি বিষয়ে অত্যন্ত প্রভেদ দেখিয়া, তাঁহাদিগকে এক শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। এক দিকে সাধারণ লোকের অবনতি, অপর দিকে রাজাদের আড়ম্বর-প্রিয়তা, তাহার উপর পুরোহিতদিগের কল্পনা—এই তিনে মিলিয়া ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল। তখন রাজারা কোন সম্ভ্রান্ত কৃষক বা ধনাঢ্য বণিকের সহিত বিবাহ সম্পর্ক রক্ষা করা লজ্জাকর বোধ করিতে লাগিল।

ভারতবর্ষের জন্মগত জাতিভেদ প্রথার ন্যায় আচার প্রাচীন কি আধুনিক ইউরোপে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইউরোপে একবার এমন সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন লোক-সাধারণের দুর্ব্বলতা ও তেজোহীনতা হইতে জাতিভেদ প্রথা উৎপন্ন হওয়া অতি সম্ভবপর হইয়াছিল। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর অসভ্য জাতীয় লোকেরা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া অধিকার করিতে লাগিল। এই পুরোহিত ও বিজেতা জাতিদের সঙ্গে লোক সাধারণের কোনই সম্পর্ক থাকিল না। সর্ব্বত্রই পুরোহিতের আশ্রম ও ফিউডাল রাজন্যের প্রাসাদ-চূড়া শোভা পাইতে লাগিল, আর সাধারণ লোকেরা সামান্য কুটীরে কোন প্রকারে জীবন যাপন করিতে লাগিল। ইউরোপের মধ্য যুগের পুরোহিত, যোদ্ধা ও সাধারণ লোকে, আর প্রাচীন হিন্দুদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এই সাদৃশ্য অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ফিউডাল যুগে ইউরোপে পুরোহিতেরা বিবাহ করিতেন না। যোদ্ধা ও সাধারণ লোক সকলেই গুণ থাকিলে পুরোহিত হইতে পারিতেন। আর বিদ্যা, বুদ্ধি এবং অপরাপর গুণের অধিকারী না হইলে পুরোহিত হওয়া ঘটিত না। এই প্রকারে পুরোহিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোদ্ধা ও সাধারণ লোকের রক্তমাংসের সম্পর্ক ছিল। যোদ্ধাগণ ও সাধারণ লোকের মধ্যে খ্যাতি ও সাহসবীর্য্য-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সাদরে স্বশ্রেণীতে গ্রহণ করিতেন। ভারতবর্ষের সাধারণ লোকদের ন্যায় জাতিবদ্ধ ক্ষত্রিয়দের হাতে ধনপ্রাণ রক্ষার ভার সম্পূর্ণ রূপে অর্পণ না করিয়া, ইউরোপে মধ্যযুগে বণিকেরা স্ব স্ব নগরে দুর্গ প্রস্তুত, নগর রক্ষার্থ সৈন্য রচনা ও শাসন প্রণালী স্থাপন করিতেন। সুবিখ্যাত যোদ্ধৃ বংশীয় যুবকেরা এই সকল বণিক যুবকের সহিত এক রঙ্গভূমিতে সমকক্ষতা করিতে উপস্থিত হইতেন। যোদ্ধৃ সম্প্রদায় ও সাধারণ লোকে এই প্রকার একটী বন্ধন ছিল। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। ইউরোপে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতির সহিত পুরোহিত ও যোদ্ধা সম্প্রদায়ের ক্ষমতা হ্রাস হইল। আর ভারতবর্ষে পুরোহিত ও ক্ষত্রিয়ের গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বণিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের

দিন দিন স্বর্ণার্হ লোক বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

সাধারণ লোকের দুর্ব্বলতা ও তেজোহীনতাই ভারতবর্ষে জাতি প্রথা সৃষ্টির কারণ। অপরের উপর প্রভুত্ব করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া সকলেই বেড়াইতেছে। সাধারণ লোকে পুরোহিতের চরণে বিবেক বুদ্ধি অর্পণ করিয়া জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্ম চিন্তার কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিল; আবার দেহধন রক্ষার ভার ক্ষত্রিয়ের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা ঈদৃশ লোকের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবেন, তাহা অতি স্বাভাবিক। পুরোহিতেরা সাধারণ লোকদিগকে মূর্খ ও অশুদ্ধ বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন, আর ক্ষত্রিয়েরা নিস্তেজ, কাপুরুষ বণিক ও কৃষকদের রক্তসম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। পুরোহিত ও ক্ষত্রিয়ের এইরূপ ব্যবহারে সাধারণ লোকে দ্বিরুক্তি না করিয়া সহ্য করিতে লাগিল। সাধারণ লোকের নিস্তেজতা ও পৌরুষহীনতা উপস্থিত হইলেই এই প্রকার জাতিভেদের সূত্রপাত হয়, আর সাধারণ লোকের তেজোস্বিতা ও পৌরুষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের সূত্র ছিন্ন হইতে থাকে। *

জাতিভেদের যে সহজ কারণ প্রদর্শিত হইল, তাহা সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে নানা মনোরঞ্জক উপাখ্যান-জড়িত হইয়া বর্ণিত রহিয়াছে। জাতি সৃষ্টির কারণ প্রদর্শন করিতে যে সকল উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও জাতিভেদ যে ব্যবসায়-মূলক, তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, কৃতযুগে বা সত্যযুগে অর্থাৎ বৈদিকযুগে বর্ণভেদ ছিল না। পরে গুণ ও কর্ম্ম বিচার করিয়া ব্রহ্মা বর্ণভেদ সৃষ্টি করেন। "যাঁহাদের আদেশে সকলে চলিত, এবং যাঁহারা সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন, অপরকে রক্ষা করিতে পারিতেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত করিলেন। যে সকল সত্যবাদী, বেদাধ্যায়ী নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ের সহচর ছিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিলেন। যে সকল দুর্ব্বল ব্যক্তি কৃষি ও বাণিজ্যে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা বৈশ্য হইল। যে সকল দুর্ব্বল ব্যক্তিরা পরসেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইল।"

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ৭৪ সর্গে লিখিত আছে—"কৃত যুগে শুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তপস্যা করিতেন। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের প্রথম উৎপত্তি হয়; তখন বর্ণভেদের সৃষ্টি হয়।" ইহার অর্থ এই যে, বৈদিক সময়ে আর্য্যেরা এক জাতি ভুক্ত ছিলেন, এবং সকলেরই আচার ব্যবহার একরূপ ছিল। দ্বিতীয় যুগে ব্রাহ্মণ ও রাজন্যেরা পৌরহিত্য ও রাজ্যশাসক কার্য্যে একাধিকার লাভ করিয়া আপনাদিগকে সাধারণ লোক হইতে স্বতন্ত্র জাতিরূপে বন্ধনের চেষ্টা করেন।

মহাভারতেও জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক সদ্বিচার দৃষ্ট হয়। শান্তিপর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে "রক্তবর্ণ দ্বিজেরা ভোগবিলাসী,

* অল্পদিন হইল হিন্দুহোষ্টেলে সুবর্ণবণিক জাতীয় যুবকদিগকে গ্রহণ করা হইবে না বলিয়া ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা চেষ্টা করিয়াছিলেন; পরে সুবর্ণ জাতীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগে এই কুচেষ্টা বিফল হয়।

তেজস্বী, ক্রোধী, হঠকারী, বৈদিক-আচার-ভ্রষ্ট হইয়া অবশেষে ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হইল। লোহিতবর্ণ দ্বিজেরা গোচারণে ও কৃষি কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ এবং বৈদিক আচার পরিত্যাগ করাতে বৈশ্য-শ্রেণীভুক্ত হইল। কৃষ্ণবর্ণ, অশুচি, মিথ্যা-বাদী ও ক্রুরস্বভাব লোভী দ্বিজেরা নীচ উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাঁহারা শূদ্র শ্রেণী ভুক্ত হইলেন। এইরূপে গুণা-নুসারে জাতিভেদ হওয়াতে, দ্বিজেরা নানা জাতি ভুক্ত হইলেন।"

গাঙ্গ্য প্রদেশে নির্ব্বিরোধ শান্তির সময় জাতিভেদের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু ইহার বিষময় ফল হিন্দুদের পরাধীন অবস্থায়ই বিশেষরূপ দৃষ্ট হয়। মহাভারতের সময়ে কয়েকজন পুরোহিত ও রাজন্য ভিন্ন অপর সকলেই এক বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত ছিল। কায়স্থ, বৈদ্য, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তৈলিক, তাম্বুলি ইত্যাদি স্বতন্ত্র জাতি ছিল না এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্যেরা সকলেই বেদপাঠ ও স্বহস্তে যজ্ঞ সম্পাদন ও গৃহ্যাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারিত। পুরো-হিতদের বেদে একাধিপত্য এবং বৈশ্যদের নানা জাতিতে বিভাগ, এই সকল আধুনিক পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, পুরাকালের জাতিপ্রথা এক্ষণকার ন্যায় অনিষ্টকারী ছিল না, এবং হিন্দুজাতির মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ সম্পাদন করে নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বটে; কিন্তু একগুরুর নিকট শিক্ষা, এক বেদ-বেদাঙ্গ পাঠ, একই যজনপ্রণালী, একসঙ্গে আহার পান ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-মিলিত পূজনীয় প্রকাণ্ড আর্য্যজাতি সকলের নিকট দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন। এই বর্ণভেদ লোপ পাইয়া জাতিভেদ হওয়া অবধি আর্য্যজাতি সম্পর্কশূন্য অসূয়াভাবাপন্ন শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হই-য়াছে। ব্রাহ্মণেরা অন্য সকল জাতিকে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্তানদিগকে সঙ্কর বা শূদ্রজাতি প্রমাণ করিতে অনেক শাস্ত্র রচনা করিয়া তাহাদিগকে বেদাধ্যয়ন ও যজনাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের অতি অধম অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। হিন্দুগণ যতদিন জীবন ও জ্ঞানশূন্য ছিলেন, ততদিন এ চেষ্টা সফল হইয়াছিল। জ্ঞানালোকের সঙ্গে সঙ্গে এ চেষ্টা বিফল হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালে জাতিভেদের যে এত কড়াকড় নিয়ম ছিল না, ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।১৬ এবং ২।১৭) যে অব্রাহ্মণোক্ত ব্যক্তি (ব্রাহ্মণ নয় এমন ব্যক্তি) যাজন করিতে পারিত, তাহার প্রমাণ আছে। উক্ত ব্রাহ্মণের অপর অংশে (৭।২৯) দেখা যাইতেছে যে জন্মে ব্রাহ্মণ না হইয়াও লোকে গুণবলে ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিত। কোন যজ্ঞে ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট ভাগ ক্ষত্রিয় ভোজন করিতে পাইলে তাঁহার সন্তানেরা ব্রাহ্মণ গুণবিশিষ্ট হইয়া প্রতিগ্রহ-সমর্থ, সোমপিপাসু, ক্ষুধার্ত্ত, সর্ব্বত্রগামী হইতেন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাঁহা-দের সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব জন্মিত। কোন ক্ষত্রিয় যজ্ঞে বৈশ্যের অংশ ভোজন করিলে তদ্বংশী-য়েরা বৈশ্যগুণোপেত হইয়া জন্মিত, এবং রাজাকে কর প্রদান করিত; এবং তাহার

দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ বৈশ্যজাতির উপযুক্ত হইত। যদি যজ্ঞে ক্ষত্রিয় শূদ্রের অংশ গ্রহণ করিত, তবে তাহার সন্তানেরা শূদ্র গুণোপেত হইয়া জন্মিত। তাহারা পরের সেবা করিত এবং প্রভুর ইচ্ছানুসারে তাড়িত ও প্রহারিত হইত। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাহারা শূদ্র শ্রেণীর যোগ্য হইত।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, বিদেহ রাজজনক যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত উপনিষৎ-তত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করেন। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য রাজাকে বর যাচঞা করিতে বলেন। জনক উত্তর করিলেন, "আমি যাহা অভিলাষ করিতেছি, আমাকে তাহা প্রদান করুন। তদাবধি জনক ব্রাহ্মণ হইলেন।" (শতপথ-ব্রাহ্মণ।)

বিদ্যার বলে ও যশঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণকুলে না জন্মিয়াও অনেক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহার আরো অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২।১৯) ইলুষের পুত্র কাবাষকে ঋষিরা যজ্ঞীয় ভূমি হইতে এই বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন যে, দ্যূতক্রীড়াসক্ত, দাসীরপুত্র অব্রাহ্মণ কি আমাদের মধ্যে আসিয়া যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইবে? কিন্তু কাবাষ দেবতাদিগকে জানিতেন, দেবতারাও কাবাষকে জানিতেন। সুতরাং তিনি ঋষি মধ্যে গণ্য হইলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।৪) সত্যকাম জবালের যে অতি চিত্তরঞ্জক উপাখ্যান রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে প্রমাণ হয় যে, পূর্ব্বভাগে ব্রাহ্মণত্ব লাভ, সত্যপ্রিয়তা ও বিদ্যাবত্তার উপর নির্ভর করিত। আমরা এই উপাখ্যান নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

জবালার পুত্র সত্যকাম মাতাকে বলিল, "মা আমি ব্রহ্মচারী হইতে চাই, কোন্ বংশে আমার জন্ম?"

মাতা বলিলেন—"বাছা, কোন্ বংশে তোমার জন্ম, আমি তাহা বলিতে পারি না। আমি যৌবনে পরিচারিকারূপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতাম, তখন তোমাকে গর্ভে ধারণ করি। কাহার ঔরসে জন্ম, বলিতে পারি না। বৎস, আমার নাম জবালা, আর তোমার নাম সত্যকাম; তুমি সত্যকাম জবাল বলিয়া পরিচয় দিও।"

সত্যকাম গৌতম হারিদ্রুমতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি ব্রহ্মচারী হইতে ইচ্ছা করি; আমি আপনার নিকট আসিতে পারি কি?"

গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিত্র, কোন্ বংশে তোমার জন্ম?" সত্যকাম উত্তর করিল, "কোন্ বংশে আমার জন্ম, তাহা জানিনা। আমি মাতাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'বাছা, কোন্ বংশে তোমার জন্ম, আমি তাহা বলিতে পারি না। আমি যৌবনে পরিচারিকা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতাম, তখন তোমাকে গর্ভে ধারণ করি। কাহার ঔরসে জন্ম, জানি না। বৎস! আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম। সুতরাং আমি সত্যকাম জবাল, এই মাত্র জানি।"

গৌতম বলিলেন, "সত্যই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। তুমি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আন, আমি তোমাকে দীক্ষিত করিব। তুমি সত্য হইতে বিচলিত হও নাই।

এই সত্যপ্রিয় যুবক দীক্ষিত হইয়া তৎকালীন আচারানুরূপ গুরুর গোচারণ করিতে গেলেন। যাঁহারা হৃদয়-কবাট উদ্ঘা-

টন করিয়া রাখেন, প্রকৃতি নিজেই তাহাদের হৃদয়ে সত্য ও তত্ত্ব মুদ্রিত করিতে থাকেন। সত্যকামেরও তাহাই হইল। যে গো-চারণ করিতেন, যে গৃহাগ্নি প্রজ্জলিত করিতেন. যে সকল পশুপক্ষী দর্শন করিতেন, সজীব নির্জীব চরাচর সকল বস্তু হইতেই তিনি সত্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যুবক ব্রহ্মচারী গুরুসমীপে উপস্থিত হইলে গৌতম বলিলেন "মিত্র, তুমি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ। কে তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিল।" শিষ্য বলিল, আমার ব্রহ্মজ্ঞান মনুষ্য হইতে নহে।" ব্যোম, আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, উল্কা, অগ্নি চরাচর যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্ম, নবীন ব্রহ্মচারী এই তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং উপনিষদের ইহাই শিক্ষা বটে।

পাঠকগণ এই সরল উপাখ্যানটী আলোচনা করিবেন। একটী সামান্য দাসীর পুত্র, যাহার পিতার ঠিক নাই, সে সত্যকথনে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মচারী হইয়া প্রকৃতি ও গুরুর নিকট হইতে যাহা কিছু শিখিবার আছে, তাহা শিক্ষা করিয়া তৎকালীন ধর্ম্ম-গুরুর মধ্যে অতি মাননীয় স্থান অধিকার করেন। আধুনিক জাতিভেদের সঙ্গে তুলনা করিলে তৎকালীন বর্ণভেদ কিছুই নয়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও বেদ ও শাস্ত্র অধ্যাপনায় অধিকার নাই, তখনও এই আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতির প্রতিবন্ধক-প্রথা প্রচলিত হইয়া জাতীয় জীবন হ্রাসের সূত্রপাত হয় নাই।

মহাভারতীয় যুগে যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়। ইতিপূর্ব্বে উপবীত ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে (২।৪।২) লিখিত আছে, যখন সমস্ত জীব প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইল, দেবতা ও পিতৃপুরুষেরা উপবীত ধারণ করিয়া আসিলেন। কৌষিটকী উপনিষদে আছে (২।৮) সর্ব্ববিজয়ী কৌষিটকী উপবীত ধারণ করিয়া উদীয়মান সূর্য্যকে নমস্কার করেন।

প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণেই উপবীত ধারণ করিত; কিন্তু শুধু যজ্ঞ সম্পাদন সময়ে এই উপবীত ধারণ করা হইত। এই জন্য ইহাকে যজ্ঞোপবীত বলে। যজ্ঞ সম্পাদন ভিন্ন অপর সময়ে উপবীত ধারণ করিবার নিয়ম ছিল না।

এখন আর সে দিন ও সে চলন নাই। যে সকল ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে জানেন না, তাঁহারা এক্ষণে নিজ জাতির একটী চিহ্ন স্বরূপ সদা সর্ব্বদাই উপবীত ধারণ করেন। এবং যে সকল ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ যজ্ঞ কালে উপবীত ধারণ করিতেন, তাঁহাদিগের সন্তানেরা, অর্থাৎ আধুনিক কায়স্থ, বৈদ্য, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি বিদ্যাজীবী বা শ্রমজীবীগণ এখন বেদ উচ্চারণ করিতেও ভয় পান, উপাসনার সময় উপবীত ধারণ করিতেও ভয় পান। জ্ঞান, সাহস ও বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ ভীরুতা লোপ প্রাপ্ত হইবে, এবং পূর্ব্বের ন্যায় হিন্দু মাত্রই উপবীত ধারণ করিয়া হিন্দু শাস্ত্র পাঠ করিতে শিখিবেন। শূদ্র কাহারা? প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম অনুসারে সাঁওতাল, ভীল, কোল, ধাঙ্গর, ইহারাই শূদ্র,—ইহাদিগের জন্য বেদ পাঠ ও উপবীত ধারণ নিষিদ্ধ,—হিন্দুর জন্য নহে। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

ইউরোপীয় মহাদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহামেলা শেষ করিয়াও শেষ করিতে ইচ্ছা হয় না। মেলার কাল মধ্যে ফরাসি সাধারণ তন্ত্রের সভা নির্ব্বাচন হয়। সেই উপলক্ষে জনৈক ফরাসি-লেখক যে ভাবে লেখনী চালাইয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের গোচর করত মহামেলা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"The Universal Exhibition has also had, and rightly had, a great influence on people's minds. This vast enterprise was looked upon in the first instance with no little distrust. The refusal of the great European Powers to take part in it raised fears as to the success of the undertaking; the great trades and manufactures doubted how far it would be any profit to them; the small trades felt certain of suffering by it. There seemed to be something incongruous in associating a great international concourse with the celebration of a national anniversary little in harmony with the views of the old neighbouring monarchies. It needed the almost apostolic faith of its chief organizer, M. Berger, to carry the object through. He went from town to town preaching in every chamber of commerce, to every syndicate, to every manufacturer, the necessity of contributing to the success of the Exhibition. That success distanced every expectation. The new and daring beauty of the buildings themselves, where the unprecedented combination of iron, terra colta, and enamelled pottery produced an association of architectural effects hitherto unknown; the bold elegance of the Eiffel Tower; the display of wealth and splendour of our industries, which not only proved that France is not yet ruined, but showed what immense efforts and what striking progress she has made during the last few years; and, finally, the extraordinary concourse of foreigners who came from all parts of the globe to witness these marvels of our industrial activity—all this combined to make the Exhibition a subject of boundless satisfaction to our national pride. It was impossible not to attribute to the Republic something of the credit of this triumph of pacific France. Was it not the Republic that conceived, and willed, and executed this gigantic work? Was it not the Republic which so managed the undertaking as to work it at a profit from the very first day? How could any one have the face to say that the Republic had impoverished France, after such a proof of the vitality of our industries, and after hundreds of thousands of strangers had come to Paris and left more than a milliard of money behind them?

Festivities of various sorts were skilfully distributed throughout the whole time of the Exhibition—a happy mixture of festivities—industrial, patriotic, and intellectual, and all these celebrations tended, of course, to lend something of their own *eclat* to the Republican idea, while at the same time they relieved the commemoration of the centenary of 1789 of any sectarian or too exclusively national character. First on the 5th and 6th of May, there was the commemoration of the opening of the States general at Versailles, and at Paris the inauguration of the Exhibition. Then in July, came the national festival of the 14th—the centenary of the fall of the Bastille. In august came the inauguration of the new Sorboune, to which seven hundred provincial and foreign students came by invitation and 'which gave the youth of France an opportunity of displaying all their finest and most amiable qualities in entertaining the youth of the neighbouring countries. After the inauguration, seventy five meetings were held at the Sorboune; and these meetings attracted a number of the learned *elite* of all countries, who received a warm welcome from the representatives of the Government as well as from the re-

presentatives of learning. Then a little before the elections, came the banquet of the thirteen thousand mayors in the Palais de l' Industrie ; and in the same hall, magnificently decorated for the occasion, the performance of Mademoiselle Holmes' "Truimphal Ode to the Republic" sung by a thousand choristers before an audience of twenty-two thousand persons. In the interval between the two ballots, M. Carnot inaugurated M. Dalou's great monument, the Triumph of the Republic, and presided at the distribution of prizes at the Exhibition. The quietness with which the elections went off in the midst of all these festivities struck every body, * especially those strangers who had been startled by the virulence of the political passions expressed in speech ; but the festivities themselves, and the Exhibition of which they were incidents, helped to produce this calm. When every thing seemed so gay, so smiling, with such a prophecy of peace and prosperity in the air, why should the voter play into the adversaries of the Republic, and throw France into confusion once more." *G. Monod.*

Contemporary Review, November, 1889.

পত্রখানিতে যদিও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ফরাসি চরিত্রের আঘ্রাণ পাওয়া যায়, তথাচ অত্যুক্তি দোষ দিবার কারণ নাই। "বিশ্ব-প্রদর্শনী যে সদর্পে বহু বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া আশাতিরিক্ত ফল প্রসব করত বিপুল যশের সহিত দিগ্দিগান্তরের যাত্রিগণের চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছে, মহা মহা বিশ্ব নিন্দুককেও তাহা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে।

---

* আমাদের বাসার একজন মাড্‌মোজেল (কুমারী) মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "আমরা যে রাজনৈতিক নির্ব্বাচনাদি ধীর স্থির ভাবে সম্পাদন করিতে পারি, ইংরেজেরা এইবার দেখিয়া যাউক।" টেবিলে এক দিন ইংরেজের শান্ত সমাহিত ভাবের প্রশংসা করায় তিনি আমার উপর বড়ই অভিমান প্রকাশ করিয়াছিলেন ; এবং যত দিন ছিলাম, প্রায় প্রত্যহ ঐ কথা উল্লেখ করিয়া খোঁটা দিতে ছাড়িতেন না। অনেক যত্নে কতক পরিমাণে তাঁহার ব্যথা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

মহামেলার বাহিরে।

নকল স্যাঁট আঁটোয়াইন রাজপথ (Rue Saint Antoine) ও তত্রস্থ বিখ্যাত বাস্তীল কারাগার (Bastille)—প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তিন ঘণ্টাকাল এই স্থানে বাস্তীল ধ্বংশের জীবন্ত অভিনয় হইয়া থাকে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে বাস্তীল দুর্গ ভূমিসাৎ হয়। সেই সময়ের অবস্থানুরূপ যথাযথ রাস্তা পথ, বাড়ী-ঘর-দুয়ার, নানাবিধ দ্রব্যাদির ৫০ খানি রীতিমত দোকান ও তাৎকালীক আচার ব্যবহার পোশাক পরিচ্ছদ হুবহু বজায় রাখিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমে কারাগারের জানালা হইতে দড়ি ঝুলাইয়া এক জন বন্দী পলায়নের চেষ্টা করায় তাহার প্রতি প্রহরীগণ কর্ত্তৃক গুলিবৃষ্টি হয়। তদনন্তর ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত বাস্তীল ধ্বংস কালীন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে ঠিক ঠাক কার্য্য দ্বারা তাহা দেখান হইয়া থাকে। কারাগারের চতুর্দ্দিকে নিবিড় জনতা ও কোলাহল, তন্মধ্যে শতকণ্ঠের "ভিভ্‌লা নাসিওঁ" (Vive la nation—জাতির জয়) চিৎকার দুর্গের মোরচা ও বিপরীত দিকস্থ দোকানাদি হইতে কামান ছোড়াছুড়ি ; ক্রমে কারাগার অধিকার করিয়া "জয়! বাস্তীল দখল!" (Victoire! La Bastille est prise) বলিয়া সপ্তম স্বরে আনন্দ ধ্বনি ; অবশেষে সুন্দর পরিচ্ছদে কতকগুলি নর নারীর

মৃত্যু * ও ফরাসিদের প্রিয় জাতীয় সঙ্গীত প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জীবন্ত ভাবে অভিনীত হয়। এই কয় ঘণ্টা মনে হয় যেন প্রকৃতই বিপ্লব মধ্যে আমরা দাঁড়াইয়া আছি। সঙ্গে দুইটী ফরাসি ভদ্র মহিলা ছিলেন, অভিনয়ান্তে তাঁহারা বিশেষ আহ্লাদের সহিত বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "এই বিপ্লব না ঘটিলে আমরা এত উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম না।"

বাস্তীল ধ্বংসের বর্ণনা সাধ্যাতীত ব্যাপার। মহাত্মা কারলাইল (Carlyle) বলেন "To describe the Sieze of the **Bastille** (thought to be one of the **most important** in History) perhaps **transcends** the talent of mortals. Could one but, after infinite reading, get to understand so much as the planof the building !"—History of the French Revolution.

যাহা হউক, চারিশত বৎসরের ঘোর অত্যাচারের জলন্ত সাক্ষীস্বরূপ বাস্তীল কারাগার ভূমিসাৎ হওয়ার সম্বাদ যে সভ্য জগতে বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল, নিম্নে উদ্ধৃত কবি কাউপারের কয়ছত্র তাহার প্রমাণ।

"Ye horrid towers, the abode of broken hearts
Ye dungeons and ye cages of despair,
That monarchs have supplied from age to age
With music, such as suits their sovereign ears:
The sighs and groans of miserable man :
There's not an English heart that would not leap
To hear that ye are fallen at last ?" *Cowper.*

শতাব্দীর পানোরামা (Panorama) চিত্রঃ—তুলরি (Tuileries) বাগানে এই প্রকাণ্ড পট প্রদর্শিত। ইহাতে বর্ত্তমান শতাব্দীর শিল্পী, গ্রন্থকার, নট, রাজনৈতিক ও বিষয়ী পুরুষ, আবিষ্কারক ও পণ্ডিতগণের ছবি একস্থানে দেখা যায়।

বিপ্লবের মিউজিয়ম ঃ—লুভ্রে (Louvre) অট্টালিকার একাংশে এই ঐতিহাসিক মিউজিয়ম স্থাপিত। বিপ্লব সংক্রান্ত হস্তলিপি, পদক-ব্যবহার্য্য বস্তু ও অন্যান্য চিহ্ন সকল এইখানে রক্ষিত। বাস্তীলের বিখ্যাত বন্দী লাটিউড (Latude) যে দড়ির সিঁড়ি দ্বারা কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই আদত্ জিনিস এবং দাঁত, মারা, রোবস্পেয়ার প্রভৃতি অধিনায়কগণের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রতিকৃতি নানাবিধ দৃশ্য ও স্মারক দ্রব্য সকল প্রদর্শিত।

শতাব্দীর ইতিহাস ঃ—এই স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ২০ খানি পটে ১৭৮৯ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী চিত্রিত। ইহা Rue Secretan রাজপথে স্থিত।

প্রথম ছবিখানিতে বিপ্লবের ঠিক পূর্ব্বে ফ্রান্সের অবস্থা ঃ—পল্লিগ্রামস্থ একটী হতভাগা পরিবার জমীদারের খাজানা দিতে অসক্ত হওয়ায় তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতেছে ; তাহাদের কুটীরের জানালা দরজা খুলিয়া লওয়া হইতেছে ; আর সেই সময়ে সেইখান দিয়া জমীদার মহাশয় কারচোপের কাজ করা মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত চোপ্‌দার ঘোড়সওয়ার প্রভৃতি বহুসংখ্যক সহচর অনুচরবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ঘুড়ি হাঁকাইয়া যাইতেছেন।

দ্বিতীয় খানিতে বাস্তীল ধ্বংস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাবর্গের প্রতিহিংসাজনিত কার্য্য পরম্পরা।

---

* বাস্তীল ভূমিসাৎ করিবার পরদিন বহু নরনারী সমবেত হইয়া ধ্বংসাবশেষের উপর মঞ্চ বাঁধিয়া তথায় মহানন্দে নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। অভিনয়ে নকল দুর্গের অট্টালিকা বাস্তবিক ভূমিসাৎ করা হয় না বলিয়া সম্মুখস্থ একস্থানে মাঞ্চোপরি নৃত্যগীত হয়।

এক থানিতে সামন্নিক রাজা ষোড়শ লুইর (Louis XVI.) ধর্ম্মাধিকরণে বিচার।

এই প্রকারে প্রথম নেপোলিয়নের কাণ্ডকারখানা, ওয়াটারলুর যুদ্ধ, তৃতীয় নেপোলিয়নের লীলা, জর্ম্মানগণ কর্ত্তৃক আক্রমণকালীন গাম্বেটার ব্যোম-যানারোহণ প্রভৃতি দেখাইয়া শেষ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মহামেলা।

এখানে দুইটী ভয়ঙ্কর জিনিস রক্ষিত; গিলটিনে বলিদত্ত রাণী মারী আঁটোয়ানেটের রুধিরে ছোবান একখানি রুমাল ও বলিদানের পূর্ব্ব রাত্রিতে লিখিত রাজা ষোড়শ লুইর অশ্রুসিক্ত উইলপত্র। বিপ্লবের এই দুই লোমহর্ষণ নিদর্শন পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত করে। মুচি সাইমনের (Simon the Cobler) আশ্রয়ে পিতৃ মাতৃহীন রাজকুমারের (Dauphin) দুরবস্থার চিত্রও অতীব শোচনীয় ব্যাপার

পারিস।

যাবতীয় সভ্য জাতি এক মুখে স্বীকার করেন যে, বিরাট অথচ সুরম্য হর্ম্ম্যরাজী, সুগৌরবান্বিত নানা শ্রেণীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্মরণার্থ চিহ্নাদি (monuments), সুরুচিসম্পন্ন সুসজ্জিত বিপুল দোকানপাট, অধিবাসিগণের অসাধারণ প্রফুল্ল ভাব ও আমোদশীলতা, সভ্য সমাজানুমোদিত আমোদ প্রমোদের অফুরণ লহরীলীলা প্রভৃতি বিষয়ে পারিস জগৎ-শ্রেষ্ঠ রাজধানী। যদিও আয়তন, লোক সংখ্যা, ব্যবসায় বাণিজ্যাদি ও প্রকৃত ধন সম্বন্ধে লণ্ডন অপেক্ষা অনেক ছোট, তত্রাচ পৃথিবীর সকল নগর যে পারিসের নিকট এক বিষয়ে অবনত-মস্তক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই;—সকল শ্রেণীর পর্য্যটকের চিত্তরঞ্জন করত প্রাণের পর্দায় পর্দায় স্ফূর্ত্তি দিতে পারিস যেরূপ ক্ষমতা ধরে, সেরূপ আর কাহারও সাধ্য নাই। অগণ্য বিপুল-সংগ্রহ মিউজিয়ম, নানা শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহ, অসংখ্য সুশোভিত প্রমোদ কানন, রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে সুব্যবস্থিত আমোদাগার, সর্ব্বদা জনতাপূর্ণ পান ভোজন স্থান বেষ্টিত কাফে (Cafe), রাজপথ সমূহ (streets and boulevards) নগরকে দিবা রাত্রি জমজমাট করিয়া রাখিয়াছে। কাফেগুলির ভিতরে ও বাহিরে ফুটপাথের উপর গাছ তলায় সর্ব্বদা লোক জন বসিয়া পান ভোজন ও ধূমপান করিতেছে, যেন কাহারও কোন কাজ কর্ম্ম নাই,—এক অদ্ভুত দৃশ্য। পথের মাঝে নিয়মিত অন্তরে বড় বড় ঘড়ি, রাত্রিতে বৈদ্যুতিক আলো, যেন দিবা রাত্রি সমানভাবে নগর হাসিতেছে। পারিসে জনবুলের ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি নাই, সবাই গদাই লস্করি চালে আপনার মেজাজে চলিতেছে, যেন দুনিয়া অগ্রাহ্য ব্যাপার। লণ্ডনের পথে কাহাকেও কোন স্থানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলে "First turning to the right, third turning to the left, then second turning to the right" বলিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে চলিয়া যায়, আর পারিসে ওরূপ প্রশ্ন করিলে তোমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিবে, পরে তোমাকে পথ নির্দ্দেশ করিবে, হয়ত বিপরীত দিকে যাইতেছিল ফিরিয়া তোমার সঙ্গে কিছু দূর গিয়া পথ দেখাইয়া দিবে। *

---

* ফরাসিগণের ভব্যতা (politeness) ইহার অন্যতর কারণ। উঁহারা বলেন, জনবুল তিন কারণে লোকের নিকট ভব্যতা প্রকাশ করেন না;—উচ্চ

পূর্ব্ব পশ্চিমের সম্মিলন ভাব দ্বারা পারিসকে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছে। পারিসের পথে, সেইন নদীর ধারে, বা উদ্যানাদিতে দাঁড়াইয়া মনে এরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয় যেন দেহ মৃত্তিকা ছাড়িয়া আকাশে উড়িতে চায়।

পারিস গড়বন্দী প্রাচীর বেষ্টিত নগর। উহাতে রাজপথের জন্য ৫৬টি, রেলের জন্য ৯টী, সেইন নদীর জন্য ২টী এবং দুই খালের জন্য ২টী দ্বার আছে। সেইন নদী সহরের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রবাহিত। প্রাচীর মধ্যে সহর বেষ্টন করিয়া ২১ মাইল রেলপথ। পারিসের বড় রাস্তাগুলির নাম বুলভার্ড (Boulevard), দুইধারে ও মাঝখানে বৃক্ষরাজী শোভিত তিনটী ফুটপাথ। একটী বুলভার্ড প্রাচীরের (enceinte) ধারে ধারে প্রায় সহর বেষ্টন করিয়া।

পারিস ও উপনগরগুলির দৃশ্যাবলী ভাল করিয়া দেখিতে গেলে বিস্তর সময়ের প্রয়োজন। বিশেষ মহামেলাকালীন দুকুল রাখা অসম্ভব। সুতরাং সমস্ত দেখা হয় নাই, বলা বাহুল্য মাত্র। যতটুকু দেখা হইয়াছে, যথাক্রমে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

নটড়াম গিরজা—Notre Dame de Paris, ইহা একটী প্রকাণ্ড উপাসনা মন্দির। দুই পার্শ্বে দুই টাওয়ার ২২৩ ফুট উচ্চ। চারিদিকে ১১৩টা বড় বড় জানালা ও ২৯৭টা স্তম্ভ। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ঘণ্টা আছে; তন্মধ্যে দক্ষিণ টাওয়ার-স্থিত একটা ঘণ্টা ৪৪৮ মণ ওজনে, দোলকের ওজন ১৪ মণ। ফ্রান্সদেশে ইহাপেক্ষা বড় ঘণ্টা নাই। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ঢালা হয়।

১১৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গিরজার ভিত্তি স্থাপন হয়। বিপ্লবের সময় উপাসনা মন্দিরের পরিবর্ত্তে উহাকে প্রজ্ঞামন্দির (Temple de la Raison) নাম দেওয়া হয় এবং সেইরূপে ব্যবহৃত হয়। খ্রীষ্টমাতা মেরীর মূর্ত্তির স্থানে স্বাধীনতার মূর্ত্তি স্থাপন, প্রজ্ঞাদেবীর সিংহাসন স্থাপন ও তদুপরি জনৈক নর্ত্তকীকে (Maillard the ballet dancer) দেবী সাজাইয়া খুব ধুমধামের সহিত তাহার রীতিমত পূজা, চারিদিকে ভল্টেয়ার (Voltaire), রোসো (Rousseau), প্রভৃতি সাম্যবাদী পণ্ডিতগণের অর্দ্ধমূর্ত্তি (bust) স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা ১৭৯৪ সালের ১২ই মে পর্য্যন্ত এই মন্দির খুব গুলজারভাবে রাখা হয়, তদনন্তর ৮ বৎসর বন্ধ থাকে, অবশেষে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে মহাবীর নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক পুনরায় ভগবদোপাসনার জন্য খোলা হয়।

পারিসের এই প্রধান গির্জা ও ঐতিহাসিক মন্দির সেইন নদীর ধারে বা তত্রস্থ দ্বীপে * (Ile de Paris) স্থাপিত।

প্রায়শ্চিত্ত মন্দির:—La Chapelle Expiatoire. এটী একটী ক্ষুদ্র গির্জা, Rue d'Anjou St. Honore রাজপথে স্থাপিত। রাজা ষোড়শ লুই ও তাঁহার রাণীকে বিপ্লবকালে গিলটিনে বলিদান করা হয়। তাঁহাদের স্মরণার্থ এই

ব্যক্তি হইলে পাছে তিনি মনে করেন, তাঁহার খোসামোদ করা হইতেছে; সমান শ্রেণীর ব্যক্তি হইলে পাছে তিনি ভাবেন, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হইল; আর নীচু দরের লোক হইলে পাছে তিনি সমান ভাবে দাঁড়াইতে চান, এই ভয়ে কাহাকেও ভব্যতা দেখান হয় না।

* এই খানে সেইন নদী দ্বিধা হইয়া পুনর্ম্মিলিত হওয়া হেতু একটী দ্বীপ হইয়াছে।

উপাসনা মন্দির। ছিন্নমস্তক শবদ্বয় এখানে সমাহিত। এতদ্ব্যতীত পারিসে অনেকগুলি রোমাণ কাথলিক, প্রটেষ্টাণ্ট, রুষীয় ও য়িহুদি উপাসনালয় আছে। তন্মধ্যে Place de la concorde চক হাওয়াখানার (Square) অনতিদূরস্থ La Madedeine গিরজা অতি প্রকাণ্ড ও বিশেষ দ্রষ্টব্য। দুঃখের বিষয় সময়াভাবে বাহির হইতে দেখা ভিন্ন ভিতরে যাওয়া ঘটে নাই। ইহার গঠন গির্জ্জার মত নয়। ৩৩ হাত উচ্চ ও ১১ হাত বেড়ের ৫২টী স্তম্ভ-পরিবেষ্টিত কলিকাতা ইউনিভারসিটি হলের ন্যায় মন্দির।

কুশলক্ষেত্র—Place de la Concorde, হাওয়াখানা চক (Square)—অতি রম্য ও প্রশস্তস্থান, পৃথিবীর মধ্যে প্রথমশ্রেণীর মনোরম স্কোয়ারের মধ্যে ইহা একটী; অনেকের মতে ইহাই সকলের শ্রেষ্ঠ। দীর্ঘে ৩৯০ গজ, প্রস্থে ২৩৫ গজ। দক্ষিণে সেইন নদী প্রবাহিত, পশ্চিমে Champ Elysees পার্ক ও প্রমাণাড (Promenade,) উত্তরে বিচিত্র শোভাবিশিষ্ট রাজপথ Rue de Rivoli, পূর্ব্বে তুলরির বাগান (Jardin des Tuileries)। সন্ধ্যার পর এখান হইতে আরম্ভ করিয়া একটী দেড় মাইল লম্বা দুধারি-গ্যাসালোকমালা দেখা যায়। এই স্থানে মিশরের পাশা কর্ত্তৃক উপহার প্রদত্ত একটী স্তম্ভ (Obelisk) স্থাপিত। ইহা ইজিপ্টের লক্ষর নামক গ্রাম হইতে আনীত, এই জন্য ইঁহাকে Obelisque de la Louqsor বলে। উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটী বৃহৎ ফোয়ারা ব্যাপার, উহাদের মধ্যস্থলস্থ নল হইতে প্রায় ২০ হাত উচ্চে জল উঠে।

ইতিহাসের সঙ্গে এই স্থানের বিশেষ সম্পর্ক। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কোয়ারের নাম Place Louis XV ছিল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজকুমারের (পরে ষোড়শ লুই) বিবাহোপলক্ষে এখনে এমনি বাজি পোড়ার ধূম হয় যে, সেই অগ্নিক্ষেত্র মধ্যে ভিড় চাপা পড়িয়া ১২০০ হত ও ২০০০ বিশেষরূপে আহত হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগষ্ট তারিখে অর্থাৎ বিপ্লবের শৈশবে ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Assembly) আদেশে এখানকার ধাতব রাজমূর্ত্তি স্থানান্তরিত ও গলাইয়া পয়সা করা হয়; এবং তাহার স্থানে স্বাধীনতা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত হইয়া Place de la Revolution "বিপ্লবের রঙ্গভূমি" নাম প্রদত্ত হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি তারিখে রাজা ষোড়শ লুই হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে পর্য্যন্ত ভীষণ গিলটিন রাক্ষসের করাল কৃপাণ এই রমণীয় আরামভূমিতে ক্রীড়া করে। এইকাল মধ্যে রাণী, মন্ত্রীবর্গ ও অন্যান্য নরনারী সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩০০০ জীবের শোণিতপাত দ্বারা এই প্রিয়তম স্থান অপবিত্র হয়। শান্তি স্থাপনের পর রাজার হাড়িকাঠের স্থানে একটী ফোয়ারা স্থাপনের প্রস্তাব হওয়ায় মন্ত্রীবর শটোব্রিঁয়ঁ (Chateaubriaud) আপত্তি করেন এবং প্রকৃত কথাই বলেন, যে যেরূপ নির্দ্দোষী জীবগণের রক্তদ্বারা উক্ত স্থানের মৃত্তিকা দূষিত হইয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত জল আনিয়া ঢালিলেও তাহা খালিত হইবার নয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবের নাম ঘুচাইয়া পুনরায় Place de la Concorde নামকরণ হয়। পরে রাজসিংহাসন পুনঃস্থাপিত হইলে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ই এপ্রেল তারিখে

ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র করত Place Louis XV. নাম পুনঃ প্রদত্ত হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে আবার Place de la Concorde নামে ডাকা হইতেছে। প্রার্থনা করি, বর্ত্তমান সাধারণতন্ত্র ফ্রান্সে চিরবিরাজমান থাকুক, আর যেন এই মনোহর বিহারক্ষেত্রের নাম পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন না হয়। এই একটীমাত্র চকের ইতিহাস দ্বারা ফরাসি-চরিত্রের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ স্বল্প পরিমাণ স্থানের মধ্যে এরূপ বিচিত্র ঐতিহাসিক অভিনয় আর কোন জাতি কখন দেখাইয়াছে কি না, বিলক্ষণ সন্দেহ।

সৈনিকাশ্রম—Hotel des Invalides ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা চতুর্দ্দশ লুইর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ভিত্তি স্থাপন দলীলে উদ্দেশ্য এইরূপে প্রকাশিত "pour assurer une existence heureuse and militaires qui, viellards mutiles' on infirmes, se brouveraient sans ressources apris' avoir blanchi sous les drapeaux on verse leur sang pour la patrie." অর্থাৎ যে সকল সৈনিক পুরুষ দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অঙ্গহানী, অক্ষমতা বা বার্দ্ধক্য বশতঃ উপায়হীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের শেষ জীবন আরামে কাটাইবার জন্য এই আশ্রম। ৯০ বিঘা জমী ব্যাপিয়া এই স্থান। ৫০০০ ব্যক্তির জন্য ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে ৪০০ শত বই লোক নাই, কারণ অধিকাংশ বৃদ্ধ সৈনিক আপন পেন্সনবৃত্তির উপর স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে ভালবাসেন। সম্মুখের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি কামান সাজান; তন্মধ্যে আলজিরিয়া, চীন ও কোচীনচীনের জীত কয়টী কামানও আছে। দক্ষিণে ও বামে ইউরোপের ভিন্ন দেশ হইতে নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক জীত অনেকগুলি কামান রক্ষিত। এই অট্টালিকার গম্বুজ বহুদূর হইতে দেখা যায়।

ইহার পশ্চিমখণ্ডে Musee d' Artillerie শস্ত্রের মিউজিয়ম। এখানে বড় বড় কামান হইতে তীর ধনুক পর্য্যন্ত ৪০০০ রকমের অস্ত্র শস্ত্র রক্ষিত। অনেকগুলি পতাকা সাজান, তাহার মধ্যে সুবিখ্যাত বীরবালা জোন অফ আর্কের (Joan of Arc) পতাকা দ্রষ্টব্য। একটী ছোট ঘরে ঐতিহাসিক অনেকগুলি চর্ম্ম বর্ম্ম খড়্গাদি রাখা হইয়াছে।

এই স্থানের একখণ্ডে গম্বুজের নীচেই মহাবীর নেপোলিয়নের সমাধি। ২০ ফুট গভীর ও ৩৬ ফুট ব্যাস এক গোলাকার অটবে (crypt) এককালের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত সম্রাটের দেহ শয়ান। এখানে দাঁড়াইয়া শরীর লোমাঞ্চিত হইল, ভাবিলাম, আজ সমগ্র ইউরোপের মহাভয়ের কারণ শূরশ্রেষ্ঠের বলবিক্রম কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে, তত্রাচ সেই অমিত তেজের ভাব সংসার হইতে ঘুচে নাই। আমাদের দেশে "হুমো আসিতেছে" বলিলে ছেলেপিলে এখনও ভয় পায়, অথচ হুমায়ুন বাদসাহ কোন্‌কালে পরলোকগত; সেইরূপ "নেপী "ভয় অনেক দিন পর্য্যন্ত ইউরোপের বিশেষ ইংলণ্ডে শিশুকে জড়সড় রাখিয়াছিল। যেরূপ জীব, তাঁহার সমাধিও তদুপযুক্ত। উপরে ১৬০ ফুট উচ্চ গম্বুজ, নীচে অটবের গায়ে মার্বেলে অঙ্কিত যুদ্ধ ও শাসন কার্য্যাদির প্রতিকৃতি। চারিদিকে নানা দেশের জীত ৬০টী পতাকা, এক ভয়ানক গম্ভীর দৃশ্য। অটবে প্রবেশের পথ রুদ্ধ, দ্বারের শিরোদেশে সম্রাটের উইল হইতে উদ্ধৃত এই মহাবাক্য লিখিত "Je

desire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, an milieu de ce peuple francais que j'ai tant aime" অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করি যে, আমার ভস্ম (দেহ) সেইন নদীর তীরে রক্ষিত হয়, সেই সকল লোকের মধ্যে, যাহাদিগকে আমি অত্যন্ত ভাল বাসিয়াছি। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়; ১৯ বৎসর পরে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহ বিশেষ ধূমধামের সহিত উক্ত দ্বীপ হইতে আনীত হইয়া এই যথোপযুক্ত স্থানে সমাহিত হয়। নেপোলিয়ন-জীবন দোষে গুণে জগতের শিক্ষার বিষয়, সুতরাং তাঁহার সমাধি অজ্ঞাত সুদূরস্থ দক্ষিণ আট্‌লাণ্টিকের এক ক্ষুদ্রাৎক্ষুদ্রতর দ্বীপে পড়িয়া থাকিলে লোক শিক্ষার বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া বিধাতা উহা সভ্যজগতের মধ্যস্থলে নিজ লীলাক্ষেত্রের কেন্দ্রে আনিয়া রক্ষা করিলেন।

সহস্র ক্ষমতা ও গুণ সত্ত্বেও স্বার্থপরতার ন্যায় হীনভাব যে মানুষকে জোর করিয়া অবনতি ও দুঃখের দিকে টানিয়া ফেলে, এবং অধার্ম্মিক নীতিহীন (Unprincipled) জীবন যে পরিণামে নিশ্চয় সর্ব্বনাশের কারণ হয়, নেপোলিয়ন জীবন তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সকল বিষয়েরই সীমা আছে, উচ্চাভিলাষ চরিতার্থেরও সীমা আছে। যদিও মানুষে ভরপুরভাবে সন্তোষ অসম্ভব, তত্রাচ সাংসারিক উন্নতি সম্বন্ধে এমন স্থান সকলেরই আছে, যেখানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারা উচিত যে, এইখানেই আমার স্থির থাকা কর্ত্তব্য, অগ্রে পা বাড়াইলে পতনের সম্ভাবনা; আর কিছুর জন্য না হউক, অন্তত বিপদাশঙ্কা হেতুও সেই স্থানে যত্নপূর্ব্বক থামিয়া থাকা উচিত। কিন্তু নেপোলিয়ন উহা শিখেন নাই, সমগ্র ইউরোপ তাঁহার নিকট অতি ক্ষুদ্র বোধ হইয়াছিল, জীবের স্বাধীনতা তাঁহার নিকট তুচ্ছ অপদার্থ সামগ্রী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাই এতদূর উচ্চ হইতে এরূপ নিদারুণ পতনদ্বারা যাবচ্চন্দ্র দিবাকর সংসারে উদাহরণ হইয়া রহিলেন। জনৈক পণ্ডিত কয়টী সার কথায় যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"The story of Napoleon Buonaparte presents probably the most memorable example in the world of the action of great intellect and resolute will unrestrained by conscience, and shows both the possible success which may reward for a time the most unscrupulous selfishness, and also, happily, its certain ultimate failure and overthrow"

William S. R. Cates.

শ্রীচন্দ্র সেখর সেন।

ঢাকার পুরাতন কাহিনী। (৬)

(সেনরাজগণ।)

বিজয় সেনকে কর্ণাটের চোলরাজ-বংশের কনিষ্ঠ শাখা হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনুমান করিবার নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে সকল কারণের উপর আমাদের অনুমান স্থাপিত, পাঠকবর্গ তাহার সঙ্গতি ও সত্তা

বনার বিচার করিবেন। (১) রাজসাহীর প্রস্তর ফলকে "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র" বীর-সেনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সামন্ত সেনের বাহুবলে কর্ণাট রাজ্যের শত্রুকুল পরাজিত হয়। (২) সুন্দর বন ও তর্পণদীঘির তাম্রশাসনে চোলরাজ্যের রাজধানী কাঞ্চী নগরীতে হেমন্ত সেনের রাজ্য ও আবাস স্থান ছিল বলিয়া কবি বর্ণনা করিয়াছেন। (৩) 'সেন' উপাধিধারী আদিত্য সেন চোল রাজবংশের একজন পরাক্রান্ত নরপতি বলিয়া দেওঘরের মন্দির-লিপিতে বর্ণিত হইয়াছেন *। তিনি শৈব না হইলে দেওঘরের শিবমন্দিরের গাত্রে তাঁহার গুণানুবাদ কীর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর নহে। হেমন্ত সেন ও বিজয় সেন যে শৈব ছিলেন, রাজসাহীর প্রস্তরলিপির বর্ণনানুসারে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। শিব ও শক্তির উপাসনা প্রবল হইয়া বাঙ্গালার ন্যায় ভারতবর্ষের অনেকানেক স্থান হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে পদদলিত ও উন্মূলিত করে। (৪) করমণ্ডল উপকূল-স্থিত কর্ণাট, তৈলঙ্গ ও কলিঙ্গ হইতে হিন্দুধর্ম্ম বালি যাবা প্রভৃতি সুদূর দ্বীপপুঞ্জে এবং পেগু ও আরাকানের উপকূলে অতি প্রাচীন কাল হইতে বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হয়। আদিশূরের দ্বারা বঙ্গে যে হিন্দুধর্ম্ম অভ্যুদিত হয়, পালরাজগণের সময়ে তাহার উন্নতির গতি নিরুদ্ধ হয় এবং তৎপর কর্ণাট রাজবংশীয় বিজয় সেনের দ্বারা তাহা পুনর্বায় উজ্জীবিত

* চোলবংশীয় নৃপতিগণের ন্যায় 'সেন' উপাধি ভারতবর্ষীয় আরও দুই তিনটী রাজবংশের নামের অন্তে দৃষ্ট হয়। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পার্শ্বে সেনোপাধিক যে রাজবংশ রাজত্ব করিতেন, সেই বংশীয় প্রবরসেনের একখানি শাসনপত্র ১৮৩৬ খ্রীঃ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যে সময়ে উজ্জয়িনী নগরে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রাদুর্ভাব হয়, অনুমান সেই সময়ে সেনোপাধিক সূর্য্যবংশীয় বল্লভীগণ গুর্জ্জর ও সৌরাষ্ট্রদেশে এক পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রায় আড়াই শত বৎসর তথায় রাজত্ব করিতে থাকে বলিয়া সুপণ্ডিত রমেশ বাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাত্মা টডের মতে ১৪৪–৫২৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই বল্লভীবংশ গুজরাটে রাজত্ব করেন। কনক সেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মিবারের রাণাকুল কনক সেনের বংশধর বলিয়া জনপ্রবাদ রাজস্থানে প্রচলিত আছে। ১৮৩৫ও১৮৩৮ খ্রীঃ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় কনকসেন হইতে শীলাদিত্য পর্য্যন্ত বল্লভবংশীয় চৌদ্দ জন রাজার নাম তাহাদের শাসন পত্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৯ খ্রীঃ উক্ত সোসাইটীর কার্য্যবিবরণীতে ডাক্তর রাজেন্দ্র লাল মিত্র পঞ্জাব প্রদেশীয় ক্ষুদ্র কুলুরাজ্যের অন্তর্গত নির্ম্মন্দের পরশুরামের মন্দিরে প্রাপ্ত সেনবংশীয় এক নরপতির একখানি তাম্রশাসনের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন যে, এই শাসনপত্র খৃষ্টীয় ৪র্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত হইয়া থাকিবে। ইহাদ্বারা বরুণ সেনের প্রপৌত্র ও সঞ্জয় সেনের পৌত্র ও রবিসেনের পুত্র ব্রাহ্মণজাতীয় সমুদ্র সেন 'মহাসামন্ত মহারাজ' তাঁহার মাতা মিহিরলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠিত মিহিরেশ্বর নামক মহাদেবের মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত সুলিস নামে গ্রাম স্তোম নামে অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। পঞ্জাবে যে এই সময়ে শিবোপাসনা প্রচলিত ছিল, তাহার স্পষ্ট নিদর্শন ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে। শতদ্রু নদীর তীরবর্ত্তী মণ্ডি ও সুখেত নামে দুইটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যের অধীশ্বরগণের উপাধিও 'সেন'। আমরা প্রবন্ধের শেষ ভাগে এই দুই রাজ্যের অধিপতিদিগের সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা লিখিয়া তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। ইঁহাদের সহিত বাঙ্গালার সেনবংশের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

হওয়া অসম্ভব নহে। (৫) কর্ণাটের সহিত অতি প্রাচীন কাল হইতে গৌড় ও বঙ্গ দেশের বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়াত থাকা অসম্ভব ও অযৌক্তিক নহে। খ্রীষ্টের জন্মের অন্যূন পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে যে আর্য্য জাতির অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল এবং বঙ্গবাসিগণ যে সমুদ্রযাত্রা করিয়া বিদেশ জয় ও বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, সিংহলের প্রামাণিক ইতিহাস মহাবংশ তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে। বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ প্রজাপীড়ন দোষে নির্ব্বাসিত হইয়া ৭০০ অনুচরসহ অর্ণবপোত আরোহণে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন। তত্রত্য রাজাকে পরাজিত করিয়া লঙ্কাদ্বীপে সিংহবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্বীয় নাম অনুসারে অধিকৃত দ্বীপের নাম সিংহল রাখেন। কথিত আছে যে, ঠিক এই সময়ে (৫৪৩ খ্রী পূঃ) বৌদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন এবং সিংহলে বৌদ্ধশকাব্দের গণনা আরম্ভ হয়। বিজয় সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গদেশ হইতে গিয়া সিংহলের রাজাসনে উপবিষ্ট হন।—(৬) ৭৮৮-৯৫৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ১৬৯ বৎসর আরাকানে বৈশলীবংশীয় যে নয় জন শৈব নরপাত রাজত্ব করেন, 'তুঙ্গচন্দ্র' উপাধি ও শিবোপাসক দৃষ্টে তাঁহাদিগকে চালুক্যবংশীয় কালিঙ্গাধিপতিদিগের বা কর্ণাটের চোলরাজগণের সহিত কোনরূপ সম্পর্কিত বলিয়া অনুমান করা একান্ত অসঙ্গত নহে। চট্টগ্রাম নগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত নছিরাবাদ গ্রামে ১১৬৫ শকাব্দের (১২৪৩ খ্রীঃ) লিখিত চন্দ্রবংশীয় দামোদর দেবের এক শাসনলিপির বিবরণ ১৮৭৪ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এই বৈষ্ণব রাজবংশের সহিত চন্দ্রবংশীয় চালুক্য নৃপতিগণের কি বাঙ্গালার সেনবংশের কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল কিনা, তাহা নির্ণীত হয় নাই। পুরুষোত্তম দেবের প্রপৌত্র মধুসূদন দেবের পৌত্র ও বাসুদেব দেবের পুত্র বলিয়া তাম্রশাসনের দাতা দামোদর দেব বর্ণিত হইয়াছেন। সেনবংশের রাজত্বের শেষ ভাগে নবদ্বীপ পতনের ৪০ বৎসর পর এই রাজবংশ কোন্ স্থানে অভ্যুদিত হন, তাহার অনুসন্ধান হওয়া উচিত। কাঞ্চীর চোলরাজগণ আপনাদিগকে সেনোপাধিক চন্দ্রবংশজ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন কিনা, তাঁহাদের শাসনপত্র ভিন্ন ইহা নির্ণীত হওয়ার অন্য উপায় নাই। এই সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম। (৭) ষ্টার্লিং ও হাণ্টারের মতে কেশরীবংশীয় শেষ রাজা সুবর্ণ কেশরীর মৃত্যুর পর বাসুদেব বাণপতি নামে উড়িষ্যারাজের জনৈক ক্ষমতাশালী অমাত্য রাজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসনদণ্ডের পর যে কর্ণাটরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই কর্ণাটপাত চৌরগঙ্গকে কটকের সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক গঙ্গাবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

বিজয় সেন দক্ষিণাপথের চন্দ্রবংশীয় কোন ক্ষত্রিয় রাজবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুমান হয়, তিনি রামপালের আদিশূরের শেষ বংশধরের রাজতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া, অপুত্রক আদিশূর-বংশীয় নরপতির মৃত্যুর পর রামপালের রাজাগণ অধিকার পূর্ব্বক সেনবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পাল-রাজগণের কোনও শাসন পত্র পূর্ব্ববঙ্গে এ পর্য্যন্ত

আবিষ্কৃত হয় নাই। বুড়ীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে কোনও কালে পালবংশের আধিপত্য বিস্তারিত হয় বলিয়া জানা যায় নাই। যে সময়ে বাঙ্গলা দেশের পশ্চিম ও উত্তর অংশে অপ্রতিহত প্রভাবে বৌদ্ধ পালবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ পূর্ব্বাপেক্ষা হীনভাবে স্বাধীনরূপে অথবা পালবংশের সামন্তরাজের ন্যায় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। এই অনুমান কোনও ক্রমে অসম্ভব নহে। বিজয় সেন কোনও অজ্ঞাত ও অনির্দ্দেয় কারণে বা আপনার ভাগ্যলক্ষ্মী দ্বারা প্ররোচিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে উপনীত হন। রামপালের আদিশূরের বংশীয় রাজতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া, তথায় বাস করিতে থাকেন। এই রাজকুমারীর গর্ভে বিজয়সেনের যে পুত্র জন্মে, তিনিই পরে মহারাজ বল্লাল সেন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আমাদের অনুমান যে নিতান্ত অমূলক নহে, তাহা জন প্রবাদ ও কোন কোন কুলাচার্য্যের মত দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই উভয় শ্রেণীর কুলজীলেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বল্লাল সেনকে আদিশূর বংশের দৌহিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাক্তর মিত্র ও কৈলাস বাবু উভয়েই এই কথা তাঁহাদের রচিত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। কৈলাস বাবুর মতে বিজয় সেন গৌড়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সম্ভবতঃ আদিশূরবংশীয় সমতটের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আমাদের অনুমান অনুসারে পূর্ব্ব বঙ্গ হইতেই সেন বংশের আধিপত্য প্রথমত আরম্ভ হইয়া কালক্রমে উত্তর।পশ্চিম বঙ্গ এবং উত্তর বিহার (ত্রিহুত) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

আবুলফাজল স্বপ্রণীত আইনি আকবরীতে বিজয় বা সুখ সেনকেই সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আদিশূরবংশীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বিজয় সেন অপুত্রক রাজার মৃত্যুর পর পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী রামপালের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। বিজয় সেন শৈব ছিলেন। তাঁহার অভ্যুদয়ে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের আধিপত্য পুনর্ব্বার বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার পিতার নাম হেমন্ত সেন। তিনি যশোদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। যে সময়ে মহারাজ বিজয়সেন সেনবংশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়ে দক্ষিণে উড়িষ্যায় কেশরী বংশীয় হিন্দু নরপতিগণ, উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে এবং বিহারে বৌদ্ধ পালরাজগণ, উত্তরে কামরূপ, জয়ন্তিয়া ও হেরম্ব (কাছাড়) রাজ্যের হিন্দু নৃপতিবর্গ, পূর্ব্বে ত্রিপুরা ও আরাকানের রাজাগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার আক্রমণে উত্তরবঙ্গ (পৌণ্ড্রবর্দ্ধন) ও পশ্চিম বঙ্গ (গৌড়) হইতে পাল বংশীয় বৌদ্ধ নৃপতি তাড়িত হইয়া বিহারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং মুদ্গাগিরি (মুঙ্গের) তাঁহাদের একমাত্র রাজধানী হইয়া উঠে। ডাক্তার মিত্রের মতে অনুমান ১০৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় সেন গৌড়েশ্বর নয়পালকে বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন এবং সমস্ত বাঙ্গালার একাধিপত্য লাভ করেন। এই নয়পালের রাজত্বের পঞ্চদশতম বর্ষে লিখিত এক খানি শাসনপত্রের বিবরণ ডাক্তার

মিত্র কর্তৃক ১৮৪৯ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় *। ডাক্তার হায়নলি সাহেবের মতে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের উত্তরাধিকারীকে দূরীভূত করিয়া ১০৩০ খ্রীঃ বিজয় সেন বা আদিশূর বাঙ্গলায় সেনবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কৈলাস বাবুর মতে ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বতন কোনও সময়ে চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গের সাহায্যে গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত করিয়া গৌড়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এই দ্বিতীয় মহীপালের নাম তাঁহার কল্পনা প্রসূত কি অন্য কোন পুরাতত্ত্ববিদের গ্রন্থ হইতে আহরিত, তাহা বলিতে পারি না। বর্ত্তমান রাজসাহী জিলার অন্তর্গত কোনও স্থানে তিনি প্রদ্যুম্নেশ্বর নামে মহাদেবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা হইতে উত্তর বঙ্গে তাঁহার শাসন বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বৌদ্ধ পালরাজকে উত্তরবঙ্গ হইতে দূরীভূত করিয়া তাহার অনতিবিলম্বে কুলদেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইষ্টদেবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন শিরোপাসক বিজয় সেনের পক্ষে বিচিত্র নহে। তিনি অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে আধিপত্য বিস্তারিত হওয়ার পরে, তিনি কামরূপ, মদ্র (ভোটান?), উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ দেশের নৃপতিবর্গকে পরাজিত করিয়া আপনার অসাধারণ বাহুবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করেন। ইহা কবির অতিরঞ্জিত বর্ণনা কি না, নিশ্চয়রূপে বলিতে পারা যায় না। অনুমান ১০৩০ হইতে ১০৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩০।৩৫ বৎসর কাল বিজয় সেন রাজধানী রামপাল হইতে সমগ্র বঙ্গদেশ শাসন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকিবেন।

বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল সেন রামপালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়েই রাজধানী রামপাল বিক্রমপুর নামে পরিচিত হইতে থাকে। অধুনা ইহা বল্লালবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থান বর্ত্তমান মুন্সীগঞ্জ উপরিভাগ ও বজ্রযোগিনী গ্রামের অতি নিকটবর্ত্তী। বিক্রমপুরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইহা উচ্চতর স্থলে অবস্থিত। কাল-

---

* গয়ার বিষ্ণুপদের নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দির গাত্রে এই প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার অনেক স্থলের লিপি অতি অস্পষ্ট ও অবুধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই মন্দিরে সোম নামে ব্রাহ্মণজাতীয় ক্ষুদ্র সামন্তরাজা নয়পাল দেবের রাজত্বের পঞ্চশততম বর্ষে বাসুদেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পূর্ব্বপুরুষ (প্রপিতামহ?) শৈব ছিলেন। সোম 'আধিপ' শূদ্রকের পৌত্র ও বিশ্বাদিত্যের পুত্র ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। দাতার ও গৃহীতার পূর্ব্বতন তিনপুরুষ মাত্র (আমগাছির শাসনপত্র ভিন্ন) প্রায় শাসনপত্রে উল্লিখিত থাকে বলিয়া আমরা এইরূপ অনুমান করিতেছি।

শ্রীমতোঽধিপসোমস্য আত্মজন্মার্জ্জিতং যশঃ।

উৎকীর্ণং কর্ম্মণি শ্রীমদ্‌ভট্টসোমেন শিল্পিনা॥

সমস্ত-ভূমণ্ডল রাজ্যভারং আবিভ্রতি শ্রীনয়পালদেবে।

বিলিখ্যমানা দশপঞ্চসংখ্য—সংবৎসরে সিদ্ধিমৎ সাধু-কীর্ত্তিঃ॥

শাসনপত্রের রচয়িতা কবির 'সমস্তভূমণ্ডল' পদ দ্বারা বিহার কি গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন সহ দক্ষিণ বিহার অনুমান করিয়া লইতে হইবে, তাহা নিশ্চিয়রূপে বলা যায় না। ভট্ট সোম ও রাজা সোম সম্ভবতঃ দক্ষিণবিহারেরই অধিবাসী ছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পালবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পালের প্রদত্ত আমগাছির শাসনপত্রে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ থাকিত না।

ক্রমে রাজধানীর নাম হইতে সমস্ত পরগণার নাম বিক্রমপুর হইয়া উঠে। রামপালে বল্লাল সেনের বাড়ীর নানাবিধ চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকস্থ বৃহৎ পরিখা ও সুপ্রশস্ত রাজপথের চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট আছে। রাজবাটীর দক্ষিণাংশে প্রায় ৩৫০০ হস্ত দীর্ঘ ও সহস্রাধিক হস্ত পরিসর সুবৃহৎ দীর্ঘিকার চিহ্ন দেখা যায়। ইহা ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের চিহ্ন স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। এখানে দেবমন্দিরাদির বিশেষ চিহ্ন বর্ত্তমান নাই বটে, কিন্তু ভূমি খনন করিলে রাশি রাশি ইষ্টক পাওয়া যায়। একবার ৮০ হাজার টাকা মূল্যের এক খানি প্রস্তর এখানে পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র গুহের প্রণীত 'রামপালের বিবরণ' ও মুন্সীগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব সহকারী মাজিষ্ট্রেট বিজ্ঞবর আশুতোষ গুপ্তের রচিত 'রামপালের পুরাতত্ত্ব' নামক এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে পাঠকবর্গ রামপালের বিস্তীর্ণ বিবরণ অবগত হইতে পারেন।

রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে, বল্লাল সেন 'প্রায় ৫৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি সুবর্ণগ্রাম, গৌড় ও নবদ্বীপ এই তিনটী রাজধানী করিয়াছিলেন, এবং যখন যেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইত, সেই খানেই থাকিতেন। তিব্বতের ইতিবৃত্তে লিখিত আছে যে, দীপঙ্কর নামে এক জন বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই সময়ে তথায় যাইয়া বৌদ্ধদিগের মহাযান মত প্রচার করেন। সিংহলের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, রামচন্দ্র কবি ভারতী নামে এক জন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ তথায় যাইয়া এই সময়ে পরাক্রম বাহু রাজার অধীনে সমস্ত বৌদ্ধ মঠের কর্ত্তা হইয়াছিলেন।' বল্লাল সেনের রাজত্ব কাল ও রাজধানী সম্পর্কে এই অদ্ভুত ও ভ্রান্ত মত কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, বলিতে পারি না। রাজকৃষ্ণ বাবুর অমূলক ভ্রান্ত মত রমেশ বাবুর ভারতবর্ষের ইতিহাসেও গৃহীত হইয়াছে।

বল্লাল সেনকে বাঙ্গালার বিক্রমাদিত্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি উজ্জয়িনীপতি ভারত-বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বীর্য্যবান, যশস্বী, প্রজারঞ্জক ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন বলিয়া, জনপ্রবাদ তাঁহার নামের সহিত নানাবিধ অলৌকিক ও বিস্ময়জনক উপাখ্যান গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে এবং বিক্রমপুর নামে তাঁহার রাজধানী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের বঙ্গে আগমন ও রাজ্য কি উপনিবেশ স্থাপন, নিতান্ত অমূলক ও উপহাসাস্পদ কথা। প্রচলিত কিম্বদন্তী অবলম্বনে ১২৭৫ বঙ্গাব্দে বাবু অম্বিকাচরণ ঘোষ তৎ প্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাস" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে এই অপ্রামাণিক অমূলক উপকথা প্রথম প্রচার করেন। আমরা এস্থলে কৈলাস বাবু ও অম্বিকা বাবুর পুস্তক হইতে মহারাজ বল্লাল সেন সম্বন্ধে কয়েকটী জনপ্রবাদ সংগৃহীত করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। *

* কাহারও মতে আদিশূর, কাহারও মতে আদিশূরের জামাতা শ্রীধর, কাহারও মতে দিল্লীর রাজা ধীসেন, কাহারও মতে বিশ্বক সেন এবং কাহারও মতে সুখ সেন বল্লাল সেনের পিতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হই-

বল্লাল সেনের পিতার দুই জন মহিষী ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠা পত্নীর প্রতি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া, ঈর্ষাপরতন্ত্রা জ্যেষ্ঠা মহিষী জনৈক অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন উদাসীন দ্বারা স্বামিসোহাগিনী হওয়ার অভিলাষে এক যজ্ঞ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। যজ্ঞ সমাপ্তির পর সেই সিদ্ধপুরুষ যজ্ঞীয় চরু জ্যেষ্ঠা রাণীকে প্রদান করিয়া রাজাকে তাহা অজ্ঞাত ভাবে কোনও কৌশলক্রমে খাওয়াইতে পারিলে রাণীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কনিষ্ঠা রাজ্ঞী সপত্নীর চেষ্টা বিফল করিতে ব্যগ্র হইয়া, জনৈক বিশ্বস্তা দাসীর সাহায্যে ঐ যজ্ঞীয় চরু অপহরণ পূর্ব্বক তাহা রাজধানীর সমীপস্থ ব্রহ্মপুত্র নদে বিসর্জ্জন করেন। উদাসীনের মন্ত্রপূত চরুর আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে সুন্দর মানবীয় আকার ধারণ করিয়া নদরাজ ব্রহ্মপুত্র কনিষ্ঠা রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হন। কালক্রমে দেবমায়া-মোহিতা পতিব্রতা রাণীর গর্ভ সঞ্চার হইল। রাণীর চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিয়া ক্রোধান্ধ রাজা কনিষ্ঠা রাজ্ঞীকে আধুনিক ঢাকার নিকটবর্ত্তী নিবিড় অরণ্যমধ্যে নির্ব্বাসিত করেন। বনে জন্ম লাভ করিয়া বাল্যকালে লালিত পালিত হন বলিয়া, নির্ব্বাসিতা রাণীর গর্ভজাত বালক 'বল্লাল' আখ্যা প্রাপ্ত হন। ঢাকার পশ্চিম পার্শ্বস্থিত নির্জ্জন ও নিবিড় অরণ্যে অবস্থান কালে রাজকুমার বল্লাল ভক্তি ও তপস্যার বলে ভগবতী দশভূজার প্রসন্নতা লাভ করেন। তথায় নিজব্যয়ে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উত্তরকালে তন্মধ্যে ভগবতীর যে ধাতুময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা ঢাকেশ্বরী নামে আজি পর্য্যন্তও প্রত্যহ পূজিত ও সমাদৃত হইতেছে। বল্লালের প্রতিষ্ঠিত ঢাকেশ্বরী দেবীর নাম অনুসারে (কালীঘাটের কালীর নাম অনুসারে আধুনিক কলিকাতা নগরীর ন্যায়) বাঙ্গালার মোগল শাসন কালের প্রাচীন রাজধানী ঢাকা নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইতে থাকে। *

রাছে। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বে ৯০৩ খ্রীঃ তাঁহার রাজ্যারম্ভের কাল বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

* গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বের উপক্রমণিকায় লিখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান ঢাকা নগরীই প্রাচীন কালে বাঙ্গালা নামে বিখ্যাত ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই নগরী বাণিজ্যের নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। সুদূর ইউরোপখণ্ডে পর্য্যন্ত তাহার যশঃপ্রভা বিস্তৃত হয়। ঢাকার এক অংশ অদ্যাপি 'বাঙ্গালাবাজার' নামে পরিচিত থাকিয়া তাহার পূর্ব্বতন নাম প্রচার করিতেছে। ঢাকা নগরে ৫২ টী বাজার ও ৫৩ টী পল্লী ছিল, এরূপ জনপ্রবাদ তথায় প্রচলিত আছে। ইহারই নাম অনুসারে মুসলমানদিগের আধিপত্য কালে সমগ্র দেশের নাম 'বাঙ্গলা' বলিয়া উল্লিখিত হইতে থাকে। বল্লালসেনের সময়ে বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্ব ভাগ মাত্র 'বঙ্গ'নামে পরিচিত ছিল। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে চট্টবংশজ বাঙ্গাল নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। রেনেল সাহেব অনেক প্রাচীন পুস্তক ও মানচিত্রে বাঙ্গালা নগরের নাম দেখিয়াছেন। মিণ্টোল্ড্ সাহেবের পুস্তকেও বাঙ্গালা নগরের নামে দৃষ্ট হয়। মেণ্ডেলস্লো সাহেব স্বকীয় মানচিত্রে পদ্মানদীর নিকটে বেঙ্গালা নগর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রোমনিবাসী ভার্টোমেনস বেঙ্গালা নগরের যেরূপ ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বেঙ্গলার বাণিজ্য ইউরোপে সাতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। বোধ হয় ঢাকারই অন্যতম নাম বেঙ্গালা। কথিত আছে যে, বল্লাল সেন অরণ্যস্থিতা দুর্গা দেবীর প্রসন্নতা লাভ করিয়া তথায় এক মন্দির নির্ম্মাণ

কোন কোন কুলজী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সেনরাজগণ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। যে সময়ে বল্লাল সেন দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পুত্র যুবরাজ লক্ষণ সেন গৌড়ের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। বল্লাল সেনকে এক নীচ-জাতীয় রমণীর প্রণয়ে আসক্ত শ্রবণ করিয়া পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিষম বিরোধ ঘটে। সেই সময়ে লক্ষণ সেনের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার অনুগত বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণ উপবীত পরিত্যাগ পুরঃসর শূদ্রভাব ধারণ করিয়া বল্লাল সেনের সহিত সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করেন। ক্রমশঃ।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

উদ্দীপনা।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল কাওয়ালী।

(১)

ভারতের অধিবাসী সবে হ'য়ে একপ্রাণ,
একতানে কর সবে আজ হরিগুণ গান।
দীন দুঃখী ধনী রাজা, সব ভারত-সন্তান,
হরিনাম কর সবে, ত্যজি আত্ম অভিমান।

(২)

রিক্তপদে সবে এস, পরি গৈরিক বসন,
মহিমা উদ্‌ঘোষি তাঁর, আজ উড়াও নিশান;
হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্ট, শীক, সবে হ'য়ে একপ্রাণ,
ধর্ম্মের বিদ্বেষ ভুলি, সবে কর হরিগুণগান।

(৩)

পাপহারী, তাপহারী, হরি নিত্য নিরঞ্জন,
হরি নামে তরে পাপী, যদি লীন হয় মন!
অদৃশ্য নির্গুণ ব্রহ্ম, হরি হন হে সগুণ,
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় যিনি, নাহি লন উপাসন।

ও নগর স্থাপন করেন। তদবধি সেই স্থানের নাম ঢাকা হয়। বস্তুতঃ ঢাকা বলিতে ইদানীং নগরের পশ্চিম ভাগকেই বুঝায়। বল্লাল নির্ম্মিত মন্দির বিনষ্ট হওয়াতে প্রায় ১৩২ (১৮৭৫ খ্রীঃ এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়) বর্ষ অতীত হইল নবাবের এক জন হিন্দু কর্ম্মচারী তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রেনেল লিখিয়াছেন যে, এই নগর গঙ্গার কোন শাখার পূর্ব্বতটে অবস্থিত ছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ তাহা গঙ্গার গর্ভে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে। ১৮৭২ খ্রী Mookerjie's magazine পত্রিকায় এই সাগরগর্ভশায়ী নগরের এক কাল্পনিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন।

পক্ষান্তরে সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ ব্লকম্যান সাহেব ১৮৭৩ খ্রী 'বাঙ্গলার ভুগোল ও ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলা নামে কোন সমৃদ্ধিশালী নগরী বিদ্যমান থাকিলে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এবং প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন বটুটা, সিকার ফ্রেডারিক রেলফ ফিচ, ডি লেট.—এবং মানচিত্রকর বি রেরস ও ভাণ্ডেন ব্রুক অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন। ১৬৪৫-৫০ খ্রী উইলিয়ম ও জন ব্লেভ ১৬৫২ খ্রী সসন (N. Sausson) উত্তর ভারতের যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তাহাতে চট্টগ্রামের নিকট বেঙ্গলা নগরের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সামুয়েল পার্চ্চা (১৫৭৭-১৬২৮) ১৬২৩ খ্রী প্রাচীন পর্য্যটকদিগের যে ভ্রমণ বিবরণ সংগৃহীত করিয়া প্রকাশ করেন, তাহাতে রাজধানী গৌড় ও বেঙ্গালা নগরের উল্লেখ আছে। এই নগরীর নামে বঙ্গোপসাগরের নামকরণ হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

(৪)

ভজন সাধনাতীত, অবিক্রিয় উদাসীন,
বিরক্ত তাঁহাকে কেন, কর হে সাধকগণ?
যা' ইচ্ছা করোনা, তিনি কুপিত সন্তুষ্ট নন!
কিছুতে সানন্দ আর নিরানন্দ নাহি হন।

(৫)

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তাঁর অবতার তিন,
একের দুয়ের কিম্বা, কর তিনের পূজন;
তিনই একই আত্মা, তিনে মিলে একজন!
একের সাধন যদি কর পাবে তিন জন।

(৬)

হরিহর বিশেষতঃ, অভিন্ন হৃদয় হন,
হরি হরে ভিন্নভাব নাহি দেখিবে কখন!
পরম বৈষ্ণব শিব, সদা করিয়া থাকেন—
হরিগুণ গান আর, তাঁর ধ্যান ও পূজন।

(৭)

মহাজ্ঞানী সদাশিব, নারদাদি মুনিগণ
ও শনক-শুক-আদি ঋষিগণ যে যখন,
করিতেন সদাক্ষণ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
তখন না করি কেন, আমরা সামান্য জন?

(৮)

মহাযোগী বেদব্যাস, শঙ্কর শিব সমান
করিতেন সদা পুরা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন!
মহাপ্রেমী নিত্যানন্দ ও চৈতন্য মহাজ্ঞান
দুজনে প্রেমত্ত হয়ে, করিতেন হরিনাম।

(৯)

মাতিয়ে মাতায় তাঁরা, করি ধরা প্রদক্ষিণ
বেড়াতেন দুইজনে, সহ হরিভক্তগণ।
সাগর গিরি কন্দর, কাঁপায়ে সে সঙ্কীর্ত্তন
মহারোলে করিত হে প্রতিধ্বনিত গগন।

(১০)

উচ্ছ্বাস গিয়াছে চলে, নামে আছে সঙ্কীর্ত্তন,
বৈষ্ণবের দলে নাহি, সে উন্মাদ-বিজৃম্ভন!
বাহ্য অনুষ্ঠানে মৃত, হিন্দু সমাজে এখন!
কায়া নাহি ছায়া আছে, আছে শুষ্ক অনুষ্ঠান!

(১১)

বিদ্বেষ গভীর হায়, হিন্দুগণে বিদ্যমান,
সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, নাহি তাহার এখন!
আছে ধর্ম্ম-অভিমান তথা জাতি-অভিমান!
প্রেমের অভাবে হায়, হিন্দুগণ শুষ্কপ্রাণ!

(১২)

একতা-বিহীন হ'য়ে, আছে চিরপরাধীন,
আর্য্য-বংশ-ধর হ'য়ে পরে দাসত্ব লাঞ্ছন!
ছি ছি কি লজ্জার কথা, বলিতে ফাটে পরাণ!
হরি বিনে গতি নাই, কর হরিনাম গান।

(১৩)

হরি সঙ্কীর্ত্তনে হবে, অপ্রেম-পাপ-ক্ষালন!
নিরঞ্জন নামে যাবে মুছে হৃদয়-অঞ্জন,
প্রেম বিনে নাহি আশা, আমাদের হে এখন
প্রেমের সাধন তরে, কর হরি-সঙ্কীর্ত্তন।

(১৪)

সমস্ত ভারতবাসী হ'য়ে এক মন-প্রাণ
জাতীয়-বিদ্বেষ ভুলি, কর হরি-সঙ্কীর্ত্তন,
হরির কৃপায় হবে হে দুঃখের অবসান,
তাঁহার করুণাবলে, হবে সবে একপ্রাণ।

(১৫)

তাঁহার কৃপায় হয়, ভজন অসাধ্য সাধন!
ভিন্নভাষী ভিন্নধর্ম্মী, হবে এক মনপ্রাণ!
বিদ্বেষ-ভুলিয়া সবে হবে ভ্রাতার সমান,
ভারত-গৌরব পুনঃ ঘোষিবে হে সর্ব্বজন।

(১৬)

পাইবে ঐহিক সুখ, পরলোক পরিত্রাণ,
এমন হরির নাম, কেন না কর কীর্ত্তন?
সর্ব্বশুভদাতা হরি, কর হরিগুণ গান
অভীষ্ট হইবে সিদ্ধ কর সবে হরিনাম।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

"বঙ্গবাসীর" মৃত্যু।

বিধাতার কি ইচ্ছা, জানি না। তিনি বুঝি, মানবজাতির নীচ আদর্শ দেখাইতেই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ কতদূর মুখসর্ব্বস্ব হইতে পারে, মানবের অসারতা এবং দুর্ব্বলতার সীমা কোথায়, তাহা প্রদর্শন করাই বুঝি তাঁহার অভিপ্রেত। নতুবা জগতের ইতিহাসে কোথায় পড়িয়াছ, আটজন তুরুক সোয়ার আসিয়া একটা রাজ্যের রাজাকে পলায়নপর করিয়াছে, বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজ-সিংহাসন দখল করিয়াছে? পঞ্চতন্ত্রের গল্পে শুনিয়াছি, ভেকগণ আত্মবিনাশ জন্য কূপ মধ্যে সর্পকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, আর বাঙ্গালার ইতিহাসে পড়িয়াছি, অষ্টাদশ বর্ষের বালককে সিংহাসনচ্যুত করিতে দেশের সর্ব্বপ্রধান লোকেরা ক্লাইব সাহেবকে আহ্বান করিয়াছিল। কৃপাভিখারী প্রবাসী মুদী, দোকানের গদি হইতে একবারে রাজ্য দখল করিয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছে, এমন অদ্ভুত হাস্যজনক গল্প সুধু বাঙ্গালার ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

শৃগাল-ধূর্ত্ততা এবং মিথ্যা বাগাড়ম্বর করা যত সহজ, বলি, দেশ-হিতৈষী হইয়া দেশের হিতসাধন করা কি ততোধিক সহজতর মনে করিয়াছ? তোমাদের সেই দেবদুর্ল্লভ মানসিক বল এবং সাহস, আত্ম-বিসর্জ্জন এবং সত্যনিষ্ঠা কোথায়? আমরা ধর্ম্মহীন, অথচ ধর্ম্মের স্বর্গীয় জয়শ্রী আপনি আসিয়া আমাদের অঙ্কশায়ী হইবেন, ইহা ন্যায়পরায়ণ বিধাতার রাজ্যে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? পুরীষাগারে অমৃত সিঞ্চন করেন না, ইহাতে কি বিধাতার কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে? গোলাপের সুরভি, সুষমা চিতাভস্মে নাই বলিয়া কি সৃষ্টি-নিয়ন্তাকে দোষী বলিব? বাঙ্গালি, তুমি আরো সহস্রযুগ তপস্যা কর, সাধন কর, পরে কাগজে কলমে, মুখের কথায় বলিও, আমরা দেশহিতৈষী।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের একজন দেশহিতৈষী একমাস কাল "সিভিলজেলে" থাকিবার ভয়ে, কত না ক্ষমা চাহিলেন, কত না পায়ে পড়িলেন, অবশেষে ভিতি-বিহ্বল হইয়া, কত না বরফ জল পান করিয়া মূর্চ্ছার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন! জগতের লোক কি এতই মূর্খ যে, এই স্বল্প-দিনেই সেই কাহিনী ভুলিয়াছে? না। কথনই ভুলে নাই। তবে আমরা হেন আত্ম-পাসরা—আপনা-ভোলা কেন? ভাই "বঙ্গবাসি," তুমি না হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুজাতির পুনরুত্থানকামনায় আকাশে জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছ? যদিও এখন বুঝিতেছি, আমাদের সম্পূর্ণ নির্ব্বুদ্ধিতা ঘটিয়াছিল, তবুও কিন্তু আজ প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি, কিছুদিন আগেও মনে করিতাম, তোমাদের প্রাণ এবং চরিত্র নেহাতই ভুয়া নহে, তোমাদের মতের হয়তো একটা নির্দ্দিষ্ট স্থায়ী ভিত্তি আছে। মনে করিতাম, তোমাদের প্রলাপের হয়তো একটা অর্থ আছে, তোমাদের আন্দোলনে, আস্ফালনে বুঝিবা কোন অনমুমেয় লক্ষ্য নিহিত আছে। ভুলভ্রান্তি হইলে ক্ষমা করিও, কিন্তু আমাদের সরল বিশ্বাস, তোমরা

অনেক নির্দ্দোষী ভদ্র পরিবারের—ভদ্র মহিলা ও ভদ্র পুরুষের চরিত্রের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়াছ, পরনিন্দা এবং পরাপবাদ ঘোষণাকে কণ্ঠের এবং লেখনীর ভূষণ করিয়াছ, অনেক অশ্লীল, কুরুচিময়, কুসংস্কার-বর্দ্ধক বাতুলোক্তিতে দেশের ও সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছ, দেশে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংশ্রবে যে নীতি ও সাধুতার একটু একটু হাওয়া বহিতেছিল, তাহা বহুদিনের তরে প্রতিরুদ্ধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছ। তবু ভাই, তোমাদিগকে সম্পূর্ণ অসার মনে করি নাই। কিন্তু এতদিনে আমাদের ধৈর্য্যভঙ্গ হইয়াছে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক কঠিন কথা বলিলাম এবং আরো বলিব। ইহার পরিবর্ত্তে যে, আমাদিগকে তোমরা আশীর্ব্বাদ এবং পুষ্প চন্দন বর্ষণ করিবে, বাতুলের মত এরূপ আশা করিতেছিনা। কিন্তু বিনীত প্রার্থনা, উত্তেজনার প্রশমনান্তে, পারতো, একবার এই কর্কশোক্তির আবরণ খুলিয়া, ইহার ভিতরে যদি কোন রোগ-বিনাশক ঔষধ পাও, পান করিও।

মহামনা রবার্ট এমেট্ আয়রল্যাণ্ডের একজন পরমহিতৈষী সন্তান ছিলেন। দেশের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া অবশেষে তিনি রাজশক্তির অনেক সত্য দোষ ও অপবাদ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইলেন, অত্যাচার নিবারণে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। এইরূপ ব্যক্তির পরিণাম যাহা হয়, তাঁহারও তাহাই হইল। তিনি যখন রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার বাক্য প্রত্যাখ্যান করিয়া, তাঁহাকে ক্ষমা চাহিতে আদেশ করা হইল। মহাত্মা রবার্ট এমেট্ সৎসাহসিকতার প্রভূত পরিচয় প্রদান করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "জন্মভূমির হিতের জন্য কর্ত্তব্যজ্ঞানে উত্তেজিত হইয়া যাহা বলিয়াছি, প্রাণ থাকিতে তাহা প্রত্যাখ্যান করিব না, অথবা তাহার জন্য ক্ষমা চাহিব না।" কেমন উচ্চবাক্য! কেমন আকাশভেদী বজ্র-গম্ভীর ধ্বনি! এইরূপ ধ্বনি কখন মানুষের প্রাণ হইতে বহির্গত হয়? যখন বিশুদ্ধ বিবেকের আলো পথপ্রদর্শক হয়, যখন সত্য এবং ধর্ম্মের ভিত্তির উপরে মানুষ দুইখানি পা রাখিয়া সুদৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হয়, যখন বজ্র এবং ঝটিকার সমস্ত শক্তি মানুষকে টলাইতে সমর্থ হয় না, যখন ইহলোকে থাকিয়াও দেব-গৌরবে মানুষ গৌরবান্বিত, স্বর্গের প্রভায় আলোকিত, তখনই সেই স্তম্ভিত হৃদয়-ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া এই মহাশব্দ স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রতিধ্বনিত ও আলোড়িত করে, বাক্যের অমৃতগর্ভ সুফল যুগ যুগান্তর পরবর্ত্তী পুরুষগণ ভোগ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়।

মহাত্মা ম্যাট্‌সিনি এবং গ্যারিবল্‌ডী এক মহান উদার ধর্ম্মভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়াই, জগতে অতুলনীয় সাহস এবং বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অসহনীয় নির্য্যাতন এবং কষ্ট যন্ত্রণাকে তাঁহারা গৌরবের অলঙ্কার মনে করিয়াছিলেন। চিরনির্ব্বাসন-দণ্ড বা প্রাণদণ্ডের আশঙ্কা তাঁহাদিগকে একদিন, একমুহূর্ত্তের জন্যও বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। যেন দুই জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি সচল হইয়া দেশ বিদেশে অগ্ন্যুদ্গীরণ করিতে লাগিল। অগ্নিসমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ উঠিল। বহুদিনের স্তম্ভিত ইটালীয় জাতির স্ফুরিত শব সেই তরঙ্গ-

প্লাবনে নবীনতম জীবন লাভ করিয়া হুকার রবে অষ্ট্রিয়ার রাজশক্তিকে সমূলে কম্পিত করিল। এই আগ্নেয় ব্যাপারের মূল অধিনায়ক ম্যাট্‌সিনির জীবনের মূল মন্ত্র ছিল, সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায়, আর প্রেম। আজ সেই দেবপুরুষ ধর্ম্মগুরু খ্রীষ্টের সমতুল্য পদে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মানুষ প্রেতের চীৎকারে ঘৃণার সহিত চমকিত হইয়া কর্ণে হস্তার্পণ করে, মানুষ মানুষের কথাও শুনে না ; কিন্তু অমরধাম ত্যাগ করিয়া যখন জ্যোতির্ম্ময় দেবপুরুষ আসিয়া শিঙ্গাধ্বনি করেন, তখন পাহাড় পর্ব্বত টলিয়া যায়, নদী উজান বহে, প্রতিকূল বায়ু অনুকূল হয়, মানুষ সকল জাগিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আদেশ ও আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হয়। তখন রাজমুকুট সাধারণের পদতলে আপনা হইতেই অবলুণ্ঠিত হয়।

তোমার আমার কথা কে শুনিবে,—কেন শুনিবে? আমাদের যখন চরিত্র নাই, মনে বল নাই, প্রাণে সাহস নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, সত্য নিষ্ঠা নাই, তখন আমাদের কথায় সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই উৎপন্ন হয়। তুমি বঙ্গবাসী—আর্য্যধর্ম্মের পতাকাধারী—হিন্দু জাতির পুনরুত্থানকারী—হিন্দুসমাজের মুখ স্বরূপ বলিয়া পরিচয়দাতা, তোমার কার্য্য এবং কথাগুলি একবার তুমিই ভাবিয়া দেখ তো। স্থির চিত্তে ভাবিলে, আপনার নিকট আপনার মুখ আচ্ছাদন করিতে ইচ্ছা হইবে, আপনাকে আপনি জাতীয় শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারিবে। তুমি একটা প্রকাণ্ড পত্রিকা লিখ, বিশ হাজার তাহার গ্রাহক—সুতরাং লক্ষ লক্ষ লোক তাহা পাঠ করে, এইরূপ ঘোষণা করিয়াছ, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু জাতির পক্ষ হইয়া প্রতি আন্দোলনেই ঘোর কোলাহল তোল, আর তোমার প্রচারিত কথা সম্পূর্ণ সত্য-বিরোধী, অবিমৃষ্য-কারিতাপূর্ণ, হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য পাগলের প্রলাপমাত্র প্রমাণিত হইল, আপনি তাহা স্বীকার করিলে, বিদ্যালয়ের অবাধ্য দুষ্টছেলের মত আপনার কাণ আপনি মলিয়া, "আর করিব না" বলিয়া, নাকে খত দিয়া ঘরে ফিরিলে, ইহাতে কি জাতির মুখ দশ হাত উপরে তুলিয়াছ? আর কি বলিব? দুঃখে, কষ্টে, অপমানে, লজ্জায় বুক বিদীর্ণ হইতেছে। ভাষায় ধিক্কারের অধিক কঠিন কথা থাকিলে, আজ তোমাদিগকে উপহার দিয়া, কথঞ্চিৎ পরিতোষ লাভ করিতাম, অথবা তোমাদের মুখ ও লেখনী কিম্বা রুচি পাইলে তোমাদের ভাষায় আজ তোমাদিগকে অলঙ্কৃত করিতাম।

এদেশের বর্ত্তমান রাজ-শক্তির আমরা সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। এমন কি, আমরা বিশ্বাস করি, এই নিয়ন্তৃত্ব আশীর্ব্বাদ স্বরূপে বিধাতা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। ভারতে ইংরেজ রাজত্বকে তাঁহার বিশেষ বিধান ভিন্ন কিছুই মনে করিনা। এই শ্রদ্ধেয় শক্তির বিরুদ্ধে তোমরা উত্থান করিয়াছিলে বলিয়া যে তোমাদের উপরে বিরক্ত হইয়াছি, তাহা নহে। যে ভাষায় তোমরা এই শক্তিকে আক্রমণ করিয়াছিলে, তাহা বাতুলের প্রলাপাপেক্ষাও অসার। পড়িতে পড়িতে সত্য সত্যই তোমাদের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়াছিল, শরীরের রক্ত উষ্ণ হইয়াছিল। ভাষার উপরে যদিও স্পষ্ট নরকের ছায়া পতিত হইয়াছিল, তথাপি ভাবিয়াছিলাম, এই দুষ্কার্য্যের ভিতরেও হয়তো তোমাদের

প্রাণের কোন নিগূঢ় অন্ধ মত ও বিশ্বাসের কার্য্য আছে। রাজদ্বারে যখন আপনাদিগকে দোষী স্বীকার করিলেনা,—guilty plead করিলে না, তখন ভাবিলাম, তোমাদের সাহস আছে, তোমাদের সেই অন্ধ-সংস্কার হয়তো এই সাহসের ভিত্তি। কোন কোন ইংরেজ পত্রিকা-সম্পাদক লিখিলেন, "গভর্ণমেণ্ট বঙ্গবাসীর সম্পাদক প্রভৃতির বিরুদ্ধে মকর্দ্দমা করিয়া, তাহাদিগকে "দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ (Martyr) হইতে শিক্ষা দিতেছেন।" আমরাও মনে করিলাম, এবার সত্য সত্য বুঝি, তোমরা পৃথিবীর খ্যাতনামা উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মহাত্মাদের দলভুক্ত হইয়া, তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের চিরসঞ্চিত মন্দসংস্কার খণ্ডন করিবে। প্রাণে অলক্ষিত রূপে আনন্দ ও আশা সঞ্চারিত হইল। পরিশেষে তোমরা যেরূপ কাতর ভাবে, কাতর ভাষায় আপনাদিগকে অন্যায়াচারী ও প্রলাপভাষী বলিয়া ক্ষমা চাহিয়াছ, তাহা তখন মুহূর্ত্তের জন্যও মনে জাগে নাই। তোমরা যে এত দূর কপট দেশহিতৈষী এবং অমৃতভাষী, তাহা তখনও মনে স্থান পায় নাই।

তোমরা যদি সত্যসত্যই জানিয়াছিলে যে, মিছামিছি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নিজেরা অন্যায় কাজ করিয়াছ, তবে প্রথমেই দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলে না কেন? এইরূপ স্থলে আপনাদিগকে নির্দ্দোষী বলিয়া মকর্দ্দমা চালাইতে গিয়া, পরে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে কি নিজেদের ভীরুতা, মিথ্যাবাদিতা, কপটতা ও নীচতা অধিকতর প্রগাঢ় কর নাই—জগতের নিকট জাতির মুখ হাসাও নাই? আরো বলি, তোমরা মিথ্যা এবং অন্যায়কে ভিত্তি করিয়া এইরূপ গুরুতর বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লিখিতে গিয়া কি প্রমাণ কর নাই যে, তোমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম, হিতাহিত, সত্য মিথ্যা জ্ঞান আদবে নাই? বলি ভাই, সে দিন টনি সাহেব বাঙ্গালীদিগকে "মিথ্যাবাদীর জাত" বলাতে এত আস্ফালন করিয়াছিলে কেন? তোমাদের এই সব কাজদ্বারা কি মেকলে ও টনি সাহেবের কথা প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে না? দোষ করিয়া পরে বুঝিলে, আপনা হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত কাজ, তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু কোন কথা বলিয়া মহা আড়ম্বর আস্ফালনের পরে শেষটা শুধু শাস্তির ভয়ে তাহা প্রত্যাহার পূর্ব্বক মাপ চাওয়া অতি ভীরুতা ও নীচতার কার্য্য।

সম্পাদক-সভা (Press Association) বঙ্গবাসীর এই ঘৃণিত ক্ষমা প্রার্থনায় সম্মতি দিয়া দেশের কি স্বার্থ এবং আপনাদের কি গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, তাহা কিন্তু আমরা স্থূল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি নাই। বঙ্গবাসী যে ভাবে এবং যে ভাষায় ক্ষমা চাহিয়াছেন, তাহাতে যে বঙ্গবাসীর অপরাধ অপ্রমাণিত হইয়াছে, তাহাতো বুঝিলাম না। তবে পত্রিকা-সম্পাদকগণ যে স্বার্থ রক্ষার জন্য চীৎকার করিতেছিলেন, তাহা কিরূপে সংসাধিত হইল? এখন হইতে কি গভর্ণমেণ্ট পঁয়তাল্লিশ আইনের ঐ সকল ধারানুসারে অপরাধী সম্পাদকদিগকে পাকড়া করিতে পারিবেন না? এ ধারণাতো কিছুতেই আমাদের জন্মে নাই। বঙ্গবাসী মকর্দ্দমা করিয়া হারিলেও যাহা হইত, ক্ষমা প্রার্থনায়ও তাহাই ঘটিয়াছে। বঙ্গবাসী আপনার কথাতেই অপরাধী স্থিরীকৃত

হইয়াছেন। মকর্দ্দমায় বঙ্গবাসী জয়লাভ করিলেও করিতে পারিতেন। পরাজিত হইলেও, চরিত্রের মহত্ব, আত্মবিসর্জ্জনের সাধু দৃষ্টান্ত, প্রতিজ্ঞার বল, সাহস ও বীর্য্যের উজ্জ্বল আভাস প্রদান করিতে অবসর পাইতেন। তাঁহাদের সত্য-নিষ্টায় এবং সরলতায় এইরূপ কুঠারাঘাত পড়িত না। না হয়, এই মকর্দ্দমায় কয়েকজন লোকের দীর্ঘ কারাবাস হইত, খুব বাড়াবাড়ি করিয়া বলিতে গেলে না হয় দ্বীপান্তর দণ্ড হইত, তাহাতে কি আসিয়া যাইত? প্রাণদণ্ড হইলেও লাভ ছিল—পরম লাভ ছিল। উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মহাত্মাদের প্রতি রক্তবিন্দু হইতে সহস্র দেবপুরুষ—সহস্র শক্তিশালী কার্ত্তিকেয় সমুদ্ভূত হয়, ইহা কি জানিতে শিক্ষিত ইতিহাসজ্ঞ বাঙ্গালীর আজও বাকী আছে? আমরাতো দেখিতেছি, এই ঘটনায় দেশীয় পত্রিকা-সম্পাদকগণের অসারতা ও অবিমৃষ্যকারিতা পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টতররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। দেশীয় পত্রিকা সকল গভর্ণমেণ্টকে অন্যায়রূপে ও অশিষ্টভাবে আক্রমণ করেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট বহুদিন হইতে যে অপবাদ ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন, তাহা কি ইহা হইতে বিশদরূপে প্রকটিত হইল না? দেশের উচ্চ শ্রেণীর মুখপাত্র প্রবীণ "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন" এই অপকার্য্যে সহানুভূতি দেখাইয়া সত্যসত্যই জাতীয় কলঙ্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এই অপকার্য্যের উদ্যোগীগণ অল্পকাল পরেই তাঁহাদের ভ্রান্তি ও অসারতা বুঝিবার প্রচুর সুবিধা এবং অবসর পাইবেন।

ভাই, "চাচা আপনা বাঁচা"ই যদি তোমাদের জীবনের মূল মন্ত্র, তবে নিরর্থক কপট দেশহিতৈষী সাজিয়া বিপদে পড় কেন? "মজালি কনকলঙ্কা মজিলি আপনি" এ বাক্যের আর স্বার্থকতা সম্পাদন কর কেন? তোমরা ননীর পুতুল, দুই কড়ার প্রাণই তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব, তোমরা "শক্তের ভক্ত নরমের যম" ভীরুতার আদর্শ, হীনতার রঙ্গভূমি, মিথ্যার জন্ম-ক্ষেত্র, তবে আর জগতের নিকট কাল মুখ বাহির কর কেন? মড়ার উপরে খাঁড়ার আঘাত কর কেন, কাটা ঘায়ে লেবুর রস ঢাল কেন? আমরাতো মরিয়াই আছি, জগতের চক্ষে, ঈশ্বরের চক্ষে চিরদিনই মরিয়া আছি, তোমরা মধ্যে মধ্যে কপট বীর সাজিয়া আবার মড়া মানুষকে মার কেন? জাতির বর্ত্তমান অবিষ্যৎ আর অন্ধকারে ঢাকিও না। আঁধার ঘোরতর হইয়াছে, এ আঁধারে আর কালী লেপিও না। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। অদমনীয় যশলিপ্সা, হেয় অর্থলালসা কি এখনো তোমাদের চরিতার্থ হয় নাই? জাতির রক্ত মাংস, অস্থি মজ্জা সব খাইয়াছ, একমুষ্টি চিতার ছাই পড়িয়া আছে, তাহা কি ফুৎকারে না উড়াইয়া ক্ষান্ত হইবে না? ভাই "বঙ্গবাসি"—কপট দেশহিতৈষি—মিথ্যা-ধর্ম্মধ্বজাধারি, এবার নির্ব্বাপিত হও, নরকের পূতিগন্ধময় অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত কর, মরিয়াছ তো ভাল করিয়া মর। মৃত্যুর পরেও তোমার প্রেতাত্মা ধেই ধেই করিয়া ছুটিতেছে, দেখিয়া ভীত হইয়াছি। এ মরণ তোমাদের নয়, সমগ্র দেশের——সমগ্র জাতির——সমগ্র বাঙ্গালীর। তাই আজ না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রাণে বড় ব্যথা পাইয়াছি, হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছে, তাই অনেক গালাগালি দিলাম, মাপ করিও। তোমাদিগকে তাই ভাবি,

এক দুঃখিনী মায়ের সন্তান ভাবি, তোমাদের অপরাধের বিষফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে, কাজেই এ রোদনে গভীর স্বার্থ আছে।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রেমানন্দের কবিতাবলী।

মহাপ্রেম। (১)

প্রেমময় হে, তোমার প্রেমে
নৃত্য করে ত্রিভুবন,
তোমার প্রেমে ছুটে বেড়ায়
রবি শশী গ্রহগণ;
তোমার প্রেমে মত্ত হয়ে
বায়ু বহে দশ দিকে,
তোমার প্রেমে লতার কোলে
কুসুম হাসে পুলকে;
মায়ের স্নেহ সতীর প্রেম,
ভাইভগিনীর ভালবাসা,
তোমার প্রেমের আভাসমাত্র,
বাড়ায় কেবল প্রেম-পিপাসা;
জীবন, মরণ, যৌবন, জরা,
সবই তোমার প্রেমের লীলা,
প্রেম নগরে সবে তুমি
কর্চ্ছো কেবল প্রেমের খেলা;
ধূলার চাইতেও অধম আমি,
আমি তোমার কেবা হই!
আমায় কেন ডাক তুমি?
ভেবে অবাক হয়ে রই!!
না জানি কি লুকাইয়ে
প্রাণের মাঝে রেখেছ,
প্রাণটী শুদ্ধ নেবে বলে
এমনি করে ডেকেছ;
ছুটে যায় প্রাণ তোমার পানে
কোথা যাবে জানে না,
ধায় নদী সিন্ধু পানে
কোন বাধা মানে না;
বড় আশা, প্রেমময় হে,
একদিন আমি তোমায় পাব,
প্রেম-সাগরে ঝাঁপ দিয়ে এই
প্রেম-পিপাসা মিটাইব;
এস তবে, প্রেমালোকে
প্রেমের পথে নিয়ে চল,
কি বলিয়া ডাক্‌লে তোমায়
প্রাণের আশা মিট্‌বে বল?
প্রাণনাথ, প্রাণারাম,
প্রেমময়, এস এস,
প্রাণের আবেগ সইতে নারি,
প্রাণটী আমার ধরে বসো!
প্রেম-নয়নে নয়ন দিয়ে
চরণতলে পড়ে থাকি,
মনের সাধে প্রাণটী খুলে
প্রেমময় হে তোমায় ডাকি;
প্রেমময় হে, তোমায় ডেকে
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাক্,
প্রেমময় হে, নামটী তোমার
কণ্ঠে আমার লেগে থাক্!

আঁধার বঁধু। (২)

অন্ধকার হে, তুমি আমার
চিরদিনের সাধের সাথী,
তোমায় আমি ভালবাসি,
তুমিই আমার ব্যথার ব্যথী;

বাল্যকালেই দিনের চাইতে
রেতের আঁধার লাগ্‌তো ভাল,
আঁধার মাখা সবই দেখ্‌তেম
মিষ্টি মিষ্টি কাল কাল;
লক্ষ তারা দীপের মত
জ্বলতো যখন সে আঁধারে,
জোনাকিরা আলোর মালা
গেঁথে রাখ্‌তো পুকুর ধারে;
অন্ধকারে ঘরের দো'রে
ফুট্‌তো সেফালিকা ফুল,
বারেন্দ্রার এক কোণে বসে
গন্ধে হতো প্রাণাকুল;
অন্ধকারের মাঝে তখন
কি যে আলো দেখেছি,
আধ আধ ছন্দে কত
মনের কথা লিখেছি।
কাগজখানি কাল হলে
তাতে যেমন শাদা লেখা,
অন্ধকারের গায়ে তেমন
পড়্‌তো আমার ভাবের রেখা;
সে সব লেখা পড়ে আমার
প্রাণে কত ফূর্ত্তি হতো,
কোমল প্রাণের সরল রেখা
সহজেই সব মুছে যেতো।
কিন্তু যখন যৌবন এলো
আশার বায়ু ছুট্‌লো প্রাণে,
দুঃখ-মেঘমালা এসে
ঢেকেদিল প্রাণ গগনে;
তখন থেকে আঁধার আমি
তোমার মাঝেই আছি ডুবে,
"তুমি আমার আমি তোমার
আর কেহ নাই" এইটী ভেবে।
আবার কেন কুক্ষণেতে
দেখ্‌লেম আমি সে এক মুখ,
অন্ধকারে আলোর আশায়
ফুলে কেন উঠ্‌লো বুক!
"ভালবাসি" এই কথাটী
বল্লে কেন তুই এক বার?
চঞ্চলা চপলার মত
কর্‌লে দ্বিগুণ অন্ধকার!
জানি আমি জন্মদুখী
সে ধন কভু পাবনা;
অন্ধকারহে ঘাট্‌ হয়েছে,
তোমায় ছেড়ে (আর) যাব না।
এস তবে অন্ধকার হে,
তোমার কোলে লুকাই মাথা,
এস বঁধু তোমার কাছে
খুলে দিই সব প্রাণের ব্যথা;
প্রাণের কথা নিয়ে তুমি
হবে না কো অবিশ্বাসী,
গাঁটি বাঁধ আঁধার তুমি
তাতেই এত ভালবাসি;
এস তবে অন্ধকার হে,
তোমায় প্রাণে ভরে রাখি,
এস তবে অন্ধকার হে,
তোমার মাঝে ডুবে থাকি!

ফুলের রাণী। (৩)

মালতী মল্লিকা যূথী
কিম্বা যেমন শেফালিকা,
অমল কোমল অঙ্গ খানি
তেমনি তোমার মধুমাখা;
মানস সরোবরে যেমন
ভাসে স্বর্ণ শতদল,
কমলিনি তেমনি তোমার
শোভা করে বক্ষঃস্থল;
বেলফুলের মালার মত
হাত দুখানি শান্তিময়,

পরশিলে গলায় দিলে
দুঃখ জ্বালা নাহি রয় ;
পারিজাত ফুলে বিধি
গড়িয়াছে পা দুখানি,
নন্দন কাননের শোভা
হেঁটে যেতে পায় অবনী ;
কোটী গোলাপ ফুলের মত
ফুটে আছে প্রেমমুখ,
চাইলে পরে প্রাণটী ভরে
ঢেলে দাও স্বর্গসুখ ;
ফুলের বাড়া প্রাণটী তোমার
ফুলে গড়া দেহ খানি,
আদর করে তাতেই তোমার
নাম রেখেছি "ফুলের রাণী।"

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্মপ্রচার। (৩)

জন্মকথা।

মানবের বুদ্ধির অগম্য স্বর্গীয় কথা মানবের নিকটে ; বিশেষতঃ সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের কথা, কাজেই কথাটা সৃষ্টিছাড়া। সৃষ্টির পূর্ব্বকথা হইলেও সই প্রস্তাব যখন উপস্থিত, তখন অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইয়াছে যে, কোন্ স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল ! কোন্ সময়ে ? কোন্ পক্ষে কত সৈন্য সমবেত হইয়াছিল ? সৈন্যাধ্যক্ষগণের কাহার কি পদ ? কোন্ উপাধি ছিল ? যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই তাহার শত্রু ; বেদের সময়ে অসুর, পৌরাণিক সময়ে রাক্ষস, বৌদ্ধ সময়ে পিশুন, খ্রীষ্টের সময়ে ড্রেকন্, ড্রাগন্, ডেবিল্, লুসির্ফর, বিলাএল্, বীল্‌জিবব্, থিয়াবোলোস, দিয়াবলুস, ডায়েবর্ল, টিউর্ফল অর্থাৎ শয়তান বা শত্রু। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর এক মানস পুত্র সৃজন করতঃ * দূতগণকে বলিলেন, "তোমরা ইঁহার শরণাপন্ন হও।" জ্যেষ্ঠ দূত পুত্রকে মানিল না, তদর্থে ৮ লোকে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইল। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, ঈশ্বরের দূতের নাম হীব্রু ছিব্রু বা অন্য স্থানীয় নহে, রার্ফেল, মাইকেল, গেব্রিএল ইত্যাদি স্বর্গীয় নাম ছিল। যাহা হউক, মাইকেল হস্তে জ্যেষ্ঠ দূত পরাভূত হইয়া মহান্ধকার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল (১)। এখন জিজ্ঞাস্য, অন্ধকার কূপ কোথা ? সয়তানের দেহে কয় শত হস্তীর বল ছিল ? কতকাল যুদ্ধ হইয়াছিল ? উপাসকেরা ন্যায়ের ক্ষমতায় সূক্ষ্ম তর্কদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ঠিক্ তিন সেকেণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল (২)।

সেণ্ট জেরোম জানিতেন যে, প্রথমে খ্রীষ্টোপাসকেরা বিশ্বাস করিত, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী আকাশে দানব ও পিশাচ সকল বাস করে, খ্রীষ্টোপাসকদিগের এ বিশ্বাসের মূল অবশ্যই ছিল, তাহা কি, সেণ্ট জেরোম সেটী বুঝাইয়া বলেন নাই। খ্রীষ্টোপাসকেরা সয়তানকে যেমন স্বধর্ম্মের বিঘ্নকারী 'বলিয়া মানেন, বৌদ্ধদিগেরও সেইরূপ পিশুন (the wicked) বৌদ্ধধর্ম্মের মহাশত্রু বলিয়া তাঁহারা

* গীত, ২ অধ্যায়।

১। প্রকাশিত। ১২ অধ্যায়, ৭,৯ পদ।

2. Treatise on Devils Reginold Scott.

বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে পরনিরিত্বস্ অবর্ত্তিতা নামক স্বর্গ মারগণের আবাস স্থান। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবলোকের অনেক উর্দ্ধে এবং প্রথম ধ্যানের নিম্নে ইহা অবস্থিত। সুখময় স্বর্গের ছয়টী ভুবনের উপর ইহাদের আধিপত্য, যোগপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, মহাপুরুষগণকে মোহাভিভূত করিবার জন্য ইহারা নানা রূপ ধারণ করে।

বিজ্ঞ পাঠকগণ, পিশুনের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন; সয়তানের সম্বন্ধে আপনাদের কি মত, জানি না, কিন্তু পাশ্চাত্য কোন কোন বিজ্ঞ খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম উপদেশকের এ বিষয়ে কিরূপ বিশ্বাস, জানা আবশ্যক।

"Men early abandoned the plain words of Scripture and by consequence fell into the wildest extravagances and conjunctures. The more the knowledge of the original text and the exact study of it declined, the more did superstitious and unfounded notions as to this being obtain credit among mankind. The history of these absurdities is often ludicrous enough, but unfortunately the belief in supernatural agency of all kinds forms one of the darkest chapters in the history of our race."

বাইবেলের বিশুদ্ধ অর্থ বিলুপ্ত হওয়াতেই লোকে নানাপ্রকার কল্পনা এবং অনুমান বশতঃ ভূত, প্রেত, ডাইন, কুহকিনীর কুসংস্কারে জড়িভূত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই, বস্তুত এ সমস্ত কুসংস্কার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উপদেশের বহির্ভূত, মনুষ্যেরই মূর্খতার ফল। প্রাচীন হীনমতি খ্রীষ্টোপাসকেরাই কল্পনা প্রভাবে ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। সয়তানের অর্থ ভূত নহে। (২)

"ষোড়শ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে ইউরোপে উল্লিখিত বিশ্বাস অতি ভয়াবহ হইয়াছিল; ইংলণ্ডের অধীশ্বরী এলিজাবেথের সমক্ষে খ্রীষ্ট ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কালে বিশপ য়ুবেল ডাইন তত্বের কথা উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, ডাকিনী ও ডাইন সয়তানের উপাসক, তাহাদের মূলোৎপাটন করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করুন।" সেকালের ধর্ম্মযাজকের ধর্ম্মোপদেশ এই, সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। বস্তুত সে কালে দারুণ দারিদ্র্যদগ্ধ হীনভাবাপন্ন লোকেই উক্ত দোষ আরোপিত হইত এবং তাহাদের তৎকালের অবস্থার কথা চিন্তা করিলে চক্ষের জল নিবারণ করা যায় না। এদেশে এখনও ডাইন, বোকসের অপবাদ দুঃখী লোকদিগের প্রতি আরোপিত হয়। কি জঘন্য কুসংস্কার! সেই কুসংস্কার ইউরোপবাসিদিগকে অন্ধ করিয়াছিল। নানা প্রকার ভ্রান্ত মত ষোড়শ শতাব্দীতেও ইউরোপের মধ্যে প্রচলিত ছিল. অদ্যাপিও কিছু কিছু আছে। সেন্ট আণ্ডুনি, বার্নার্ড, ডোমিনিক্ প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা পুরুষেরা সয়তানের সহিত আলাপ করেন, এবম্প্রকার প্রবাদও তৎকালে লোকে বিশ্বাস করিত। প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টোপাসকগণের মহাগুরু লুথর স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি সয়তানের সহিত বাদানুবাদ করিতেন। তাঁহার মতে সয়তান বিচক্ষণ ব্যবস্থাপক।

বিগত শতাব্দীর অবসান কালে উক্ত বিশ্বাস ক্রমে অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকালাবধি সশৃঙ্গ, বরাহদন্ত, উল্কামুখ, ব্যাঘ্রপদ, সুদীর্ঘ লাঙ্গুল অবয়ব বিশিষ্ট

2. "In these treatises it is contended that the word Satan is never used in the old Tesament as a proper name to signify a fallen angel or an evil spirit really existing; and that even Diabolus in the new Testament will admit of explanations which are inconsistent with the existence of the Devil."

অদ্ভুত জন্তু পুনর্ব্বার আর লোকের নয়নগোচর হয় নাই। প্রাচীন খ্রীষ্টোপাসকেরা সয়তানকে কেবল মূর্ত্তিমান করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ওর্ফাইট নামক সম্প্রদায় মহোৎসাহে সয়তানের পূজা করিত।

কালচক্র ঘুরিয়া আসিল, ইউরোপের চক্ষু বিকশিত হইল। প্রাচীন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক বার্কার, ধর্ম্ম-যাজক হন্টিংটন, উইলিয়ম্ আস্‌ডাউন্ প্রভৃতি বিজ্ঞ লোকেরা কুসংস্কারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বাইবেলোক্ত শয়তান শব্দের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ভয়ানক কুসংস্কারাবিষ্ট লোকদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বাইবেলে সয়তান ব্যক্তি বিশেষ বলিয়া অথবা পতিত ব্যক্তি বলিয়া কুত্রাপি উল্লেখ নাই। নিউটেষ্টেমেণ্টের লাটীন ডিয়াবলুস শব্দের অর্থ ভূত প্রেত নহে। (৪) পাদ্রি স্কট্ বলেন যে, ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে সয়তান বলিয়া যে শব্দ আছে, উহা রূপক কল্পনা মাত্র, প্রকৃত কিছুই নহে। ওয়েষ্টিন, ওয়েবার, নৌডিয়স্, ওয়াগষ্টাফ, রিচ্, দাম্ম প্রভৃতি জর্ম্মান গ্রন্থকারগণ শয়তানাভিখ্যাত কোন প্রাণী বা ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসারে ইউনিটেরিয়েন মণ্ডলী শয়তানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। ডাক্তার মিড্‌লটন্ খ্রীষ্টোপাসক ও ধর্ম্ম-পুরাতত্ত্বালোচক, তিনি বলিয়াছেন, বহুতর প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মত আলোচনা এবং আমার স্বীয় গবেষণায় প্রতীতি হইয়াছে যে, মনুষ্যের স্বর্গবিচ্যুতির ইতিবৃত্ত রূপকপূর্ণ ও নীতি প্রদায়িকা আখ্যায়িকা। (৫) উপরোক্ত ধর্ম্মাত্মাগণের মতানুসারে সয়তানের পতন বাস্তবিক আরবীয়োপাখ্যান কি না, তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন, আমার সংশয় হইতেছে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত পিশুন সয়তানই হইবেক। এ বিষয় যথাস্থানে বলা যাইবে। এক্ষণে উপস্থিত প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি করি। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের কথা স্বর্গীয় লোকেরা মর্ত্ত্যে প্রচার করেন। "মায়াদেবী, বস্ত্রাভরণ শিথিল, মন উল্লাসিত, শুভ শয্যা হইতে উঠিয়া অশোককুঞ্জে গমনপূর্ব্বক রাজাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। দেবীর আহ্বান ক্রমে রাজা অশোক কুঞ্জে গমন করিলেন; কুঞ্জের দ্বারে উ[illegible]ত হইলে তাঁহার দেহ গুরুভারে তাঁহাকে নিতান্ত ব্য[illegible]ত করিল; পদ সঞ্চালনে তাঁহার কিছুমাত্র সামর্থ্য রহিল না। রাজা বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমার বীর দেহের প্রভূত পরাক্রম কে হরণ করিল? অকস্মাৎ একি অভ্যাপাত উপ-

4. "That the word Satan or devil signifies, throughout the Scriptures, an adversary; that no single text nor any number of texts in which these words occur, afford any proof of the proper personality or real existence of any such being as Satan or the devil is generally supposed to be; and that many distinct passages and the general spirit of them all, oblige us to understand these terms figuratively not of a real, but of an allegorical person.

Rev. R. Scott.

5. "From the authority of many of the ancient interpreters says Dr. Middleton and from my own reflections I have ever been inclined to consider the story of the fall of man as a moral fable or allegory in which certain doctrines are represented by a fiction of persons and facts, which has no real existence."

Middleton's Works, Vol, II P. 131.

স্থিত হইল? দেহ এরূপ ভার ক্রান্ত বোধ হইতেছে কেন? রাজা উৎকণ্ঠিত মনে যখন এতদ্রূপ চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে "শুদ্ধবাস কারিকা" নামধেয় দেবগণ নভোমণ্ডলে দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন! মহাজ্ঞান সম্পন্ন, ভগবান্ বোধিসত্ব মায়াদেবীর উদরে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব তথায় অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলি হইয়া গমন কর। রাজা অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বিনীত বেশে ও শান্ত সমাহিত চিত্তে কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন।" গমনের আর কোন বাধা রহিল না। দেবীর কি শুভাদৃষ্ট; সুপ্রভাত, ভগবান তাঁহার উদরে। সে আহ্লাদের উপমা আর কোথা হইবে? যিরুশালমে। পবিত্রব্রতা মরায়া সসত্বা রহিয়াছেন। মেরীর সামান্য সৌভাগ্য নহে, তাঁহার উদরে ভগবান্ অবতীর্ণ। "স্বর্গীয় দূত গাব্রিএল ঈশ্বরের নিকট হইতে গালান দেশের নাসরৎ নামক নগরে দায়ুদের কুলোদ্ভব যোষেফ না[illegible] পুরুষের প্রতি বাগদত্তা এক কন্যার নিকট [illegible]রিত হইলেন। ঐ দূত তাহার কাছে আসিয়া কহিলেন, ওগো মহানুগৃহীতে, মঙ্গল হউক; প্রভু তোমার সহবর্ত্তী, নারিগণের মধ্যে তুমি ধন্যা। তখন সে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার বাক্যে উদ্বিগ্ন হইয়া, এ কেমন মঙ্গল বাদ? ইহা মনে আন্দোলন করিতে লাগিল। তাহাতে দূত তাঁহাকে কহিলেন, ওগো মরিয়ম্, ভয় করিও না, কেন না তুমি ঈশ্বরের নিকট অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখ, তুমি গর্ব্ভিণী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নামে যিশু রাখিবা। তিনি মহান হইবেন।" বাইবেলের উল্লিখিত ঘটনা যে সত্য, তাহা খ্রীষ্টোপাসক মাত্রেই বিশ্বাস করেন। তাহা না করাই পাপ, কিন্তু ঘটনার প্রকৃত সময়টী স্থির হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তাহা কোন্ অব্দ, কোন্ মাস, কি বার? কোন্ সময়? পুরাতত্বজ্ঞেরা ইহার মীমাংসা করিবেন।

মেরি অলৌকিক রূপে সসত্বা হইয়াছিলেন। "তখন মোরিয়ম্ ঐ দূতকে কহিল, ইহা কিসে হইবে? আমি ত পুরুষকে জানি না।" দূত কহিলেন, "(হোলিঘোষ্ট) তোমার উপর নামিয়া আসিবেন এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে।" ইহার মর্ম্ম হোলিঘোষ্ট দ্বারা মেরী সসত্বা হইয়াছিলেন। হোলিঘোষ্ট শব্দের বাঙ্গালা অর্থ পবিত্র আত্মা বুঝিতে পারিলাম, খ্রীষ্টোপাসকেরা পবিত্র আত্মা কাহাকে বলেন, বুঝিতে পারিলাম না। স্বয়ং বুঝিতে অক্ষম, অন্যকে বুঝাইব কি? মেরী কাহা দ্বারা সসত্বা হইয়াছিলেন। যদি কেহ আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি বহু কষ্টেও তাঁহাকে বুঝাইতে পারিব না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, বৌদ্ধদিগের ত্রিরত্ন যেমন বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, গ্রীক দার্শনিকদিগের trias, ইজিপ্ট দেশীয় লোকদিগের নেফ, নিথ্, ফথা, স্কাণ্ডিনেবিয়ার মনুষ্যদিগের ওডিন্ ব্র্যাগা ও ফ্রিয়া, খ্রীষ্টোপাসকদিগের সেইরূপ ঈশ্বর, খ্রীষ্ট এবং হোলিঘোষ্ট। খ্রীষ্ট ঈশ্বরীয় প্রতিকৃতি, হোলিঘোষ্ট খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বরের প্রতাপান্বিত ইন্দ্রিয় স্বরূপ। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ কালে ধর্ম্মার্থীকে তিনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যথা, বুদ্ধ, ধর্ম্ম সঙ্ঘ; সেইরূপ খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মার্থীকে ঈশ্বর, খ্রীষ্ট এবং হোলিঘোষ্টের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু ওল্ডটেষ্টমেণ্টে হোলিঘোষ্টের নামো-

লেখ নাই। ইবিওনাইট সোসিটে, ও ইউনিটেরিয়ন সম্প্রদায় হোলিঘোষ্টের স্বতন্ত্র ঐশ্বরিক সত্বা স্বীকার করেন না। খ্রীষ্টোপাসক সমাজে হোলিঘোষ্ট সম্বন্ধে প্রভূত আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি অনেকেই ঐশ্বরিক ত্রিত্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। কারণ কি? বাইবেলে ঐশ্বরীক ত্রিত্বের বিশেষ উল্লেখ নাই। প্রেরিতগণও ত্রিত্বের উপদেশ করেন নাই। নাইসিন্ সভা কর্ত্তৃক ত্রিত্বের নিরাকরণ হয় নাই, এথানিসিয়ান্ মতেই ইহা গ্রাহ্য হইয়াছিল। সেই কারণ সমস্ত প্রটেষ্টাণ্ট মণ্ডলী ত্রিত্ব মানিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা বলেন যে, বাইবেলে হোলিঘোষ্টের উল্লেখ থাকিলেও উহা ঐশ্বরিক কার্য্যসাধিকা শক্তি বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, দ্বিতীয় খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে ওণ্ডিওক নিবাসী থিয়ফিলস্ দ্বারা ত্রিত্বের উল্লেখ হইয়াছিল। খ্রীষ্ট স্বয়ং হোলিঘোষ্টের উল্লেখ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উলঙ্গ রমণী।

১

বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি!
উদলা উজ্জ্বল বেশ, সৌন্দর্য্যের একশেষ
চৌদিকে চাঁদের শোভা উছলে যেমনি!
নাহি বিঘ্ন নাহি বাধা, অতি শুভ্র অতি সাদা,
অতি জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত দেব দেহখানি!
যে অঙ্গে যেথানে চাই, কোন আবরণ নাই,
বিতরে অনন্ত তৃপ্তি দিবস রজনী!
বিমুক্ত রূপের ডালি, বদান্ততা ভরা থালি,
কারে বলে কৃপণতা জানেনা কথনি!
অনন্ত সিন্ধুর মত, সীমাশূন্য শোভা কত,
চেয়ে চেয়ে চেয়ে চেয়ে অবশ চাহনি!
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী!

২

বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি!
গিয়াছে সঙ্কোচ ভয়, লাজ লজ্জা সমুদয়
সরল শোভার তুই শত প্রস্রবণী!
নাহি শঙ্কা নাহি ত্রাস, নাহি কোন অভিলাষ
নির্ম্মল জলন্ত রূপ যথা সৌদামিনী!
ছলনা বঞ্চনা নাই, স্বপ্রকাশ সর্ব্বদাই,
নাহি বোঝ লোকনিন্দা নাহি বোঝ গ্লানি!
সরলা আপনা ভোলা, সর্ব্ব আবরণ খোলা,
কুরুচি বলিয়া লোকে করে কাণাকাণি!
তবু তোরে ভালবাসি উলঙ্গ রমণি!

৩

আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী!
উলঙ্গ গোপিনী কুলে, কাল কদম্বের মূলে,
কালিন্দীর কালজলে কমলের শ্রেণী!
কেহ ভাসে, কেহ ডুবে, যেন চন্দ্র থুবে
নীলসিন্ধু ভেদি আহা উঠিছে এ
সে লাবণ্য মুক্তবক্ষে, কে পারে
নগন জঘনে কাম মগন
যমুনার মত ব'য়ে, কে
দেখিলে সে মোহময়
আমি বড় ভালবাসি

৪

আরো ভালবাসিতা
সামান্য লজ্জার লা
চুরি ক'রে কে

দু'দিকে দু'হাত দিয়ে, দু'কূল রাখিতে গিয়ে,
অকূলে ডুবিলি বৃথা কাঞ্চন-তরনি!
ক্ষুদ্র ও কমল পাতে, পর্ব্বত ঢাকে কি তা'তে,
বৃথা যত্ন বৃথা চেষ্টা ওরে অবোধিনি!
ঘৃণা লজ্জা মান প্রাণ, প্রেমের দক্ষিণা দান
কেননা পারিলি দিতে—কুণ্ঠিতা এমনি?
যে যাহারে ভালবাসে, সেত বুকে যায় আসে
নিশ্বাস প্রশ্বাসে তার ওরে গোয়ালিনি!
অন্তরে বাহিরে তার, কোথা থাকে অন্ধকার?
আপনি সাধিয়া সে যে সাজে উলঙ্গিনী!
হিয়ার ভিতরে তোর, নিয়া যদি মনোচোর,
দেখাতি উলঙ্গ করি হৃদয় ধমনী,
আরো ভালবাসিতাম তোরে গোয়ালিনি!

৫

আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী,
অসুর শোণিত নদে, নাচে শ্যামা রণমদে,
গৈরিক প্রবাহে যেন মত্ত মাতঙ্গিনী!
কিবা রক্ত সিন্ধু জলে, নীল বাড়বাগ্নি জ্বলে,
নিবা'য়ে গগন নীলে শত দিনমণি!
অধরে সে অট্টহাসি, মাখা দৈত্যরক্ত রাশি,
সুরক্ত চন্দনে রক্তজবা ফুল জিনি!
ত্রিবলী স্বর্গের সিঁড়ি, বুক ভরা নীলগিরি,
আরক্ত ঊষায়, রক্তে ভাসিছে তেমনি!
...রের মুণ্ডমালা, নীলবক্ষ করে আলা,
...ভে যেন নভনীলে জ্যোতিষ্কের শ্রেণী!
...সনে আছে, ফুলধনু রেখে কাছে,
...রেছে কাম, কেবলি কাহিনী।
...গ, ফুল ফোটে আগে আগে,
...গে পূর্ণিমা রজনী!
...কেনা ভোলে মোহ যায়,
...পায় পড়ে শূলপাণি!
...সি উলঙ্গ রমণী।

...শিব-সীমন্তিনি!
...প্রেমে মাতোয়ারা,

যদিও নাশিতে পাপ রণে উন্মাদিনী,
যদিও ধরার ভার, হরিতে এ অবতার,—
পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হোক,—তবু ত জননী,
ভগিনী, দুহিতা নারী, সৃজন পালন তারি,
মমতার মোম সে হে স্নেহের নবনী!
তার হাতে অসিখাড়া, দুধের ঝিনুক ছাড়া?
দু'হাতে 'অভয়' 'বর' থাকে থাক্ জানি,
প্রেমময়ী রমণীর, করে শোভে ছিন্ন-শির,
কার গো গীরিতে রাঙ্গা অবনী এমনি?
শরীর শিহরে ত্রাসে, সৌন্দর্য্য রাক্ষস গ্রাসে,
নতুবা শিবের মত ভাঙ্গা বুক খানি,
ও রূপের পদতলে, ঢালিতাম কুতূহলে,
দেখিতাম প্রাণ ভ'রে দিবস রজনী,
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী!

৭

সব চেয়ে ভালবাসি শ্মশানে রমণী,
সে লাবণ্য অতি মুক্ত, পুণ্যযুক্ত জয়যুক্ত,
চৌদিক বেড়িয়া তার উঠে হরিধ্বনি!
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ, নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ,
নির্ব্বাপিত প্রবৃত্তির প্রতিমা যেমনি!
অথবা তাহারি কাছে, ব্রহ্মাণ্ড নিবিয়া আছে,
জাগ্রত অনন্ত শক্তি আছে একাকিনী!
তপস্যা সমাধি ধ্যানে, প্রবুদ্ধ মুনির প্রাণে,
অতি মুক্ত স্বপ্রকাশ চৈতন্য রূপিনী!
অর্দ্ধেন্দু ললাটে তার, শত জ্যোতি পূর্ণিমার,
শান্তির নিলয় যেন নয়নের মণি!
প্রভাতের পদ্ম-গালে, সুধা বাড়া পুষ্প-থালে,
অমৃত-চুম্বন-চিহ্ন রয়েছে তেমনি!
কি সুন্দর রাঙ্গা ঠোঁটে, ঊষার তরঙ্গ ওঠে,
কুমুদ লুকান কোলে দশনের শ্রেণী!
বুক ভরা অপরূপ, যেন আলিঙ্গন স্তূপ,
বিরাট বিশাল উচ্চ—স্পর্শে দিনমণি!
যেন দিয়ে ক্ষুদ্র ধরা, সে বুক গেলনা ভরা,
আরো চাহে শত বিশ্ব এমনি এমনি!

নিষ্কলঙ্ক নির্ব্বিকার, যৌবনের জ্যোৎস্না তার,
নিত্য বুদ্ধ সত্য শুদ্ধ আনন্দরূপিনী!
সে মুক্ত রূপের কাছে, সৌন্দর্য্য কোথায় আছে?
লাবণ্যে ভরিয়ে গেছে আকাশ অবনী!
শ্যামের বাঁশীর গান; শিবের শিঙ্গার তান,
ডুবা'য়ে উঠিছে আরো উচ্চে হরিধ্বনি!
"বল হরি, হরি বল", কাঁপিতেছে দিঙ্মণ্ডল,
চমকি 'চিলাই' চায় ক্ষুদ্র প্রবাহিনী.

তাহার শিয়রে আসি, উলঙ্গ রূপের রাশি,
শ্মশানে শুইয়া আছে, দিগন্ত ব্যাপিনী
জ্বলিছে প্রতিভা তার, কি সুন্দর মহিমার,
নিষ্প্রভ করিয়ে যেন চিতার অগিনি!
সেই যে চিলাইর চিতা, আজো প্রাণে প্রজ্জ্বলিতা,
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে সেই উঠে হরিধ্বনি!
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪৭)

কাশীধামে সনাতন-মিলন।

শ্রীচৈতন্য বারাণসী নগরীর প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া দেখিলেন, চন্দ্রশেখর বৃক্ষমূলে বসিয়া যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। জিজ্ঞাসায় চন্দ্রশেখর বলিলেন যে, রজনীশেষে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তুমি কাশীতে আসিয়াছ, তাই প্রত্যুষ হইতে এখানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছি। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলে সকলে শেখরের ভবনে গমন করিলেন। সেখানে তপন মিশ্র ও পূর্ব্বপরিচিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া মিলিলেন। তপন মিশ্র নিমন্ত্রণ করিয়া যাত্রীদলকে আহার করাইয়া গৌরকে নিবেদন করিলেন যে, কাশীতে অবস্থিতিকালে অন্যত্র যেন নিমন্ত্রণ না লয়েন। শ্রীচৈতন্য পাঁচ সাত দিন মাত্র কাশীতে থাকিবেন বিবেচনায় এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভোজন করিতে লাগিলেন।

গৌড়ের বন্দীশালে সনাতন কারাবদ্ধ, তাঁহার হস্তে পদে লৌহশৃঙ্খল। গৌড়েশ্বর উৎকলে গিয়াছেন। এমন সময়ে সনাতন শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া কারামোচনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি কারাধ্যক্ষকে নির্জ্জনে দেখা পাইয়া অভিবাদন করিয়া বলিলেন, আপনি জিন্দাপীর, কেতাবসরিফে মহাপণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। কোরাণ সরিফে লেখা আছে, নিজধন দিয়া যদি একটী বন্দীকেও কারা মোচন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আল্লাতালা তাঁহাকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করেন। আমার দ্বারা পূর্ব্বে আপনি অনেক উপকার পাইয়াছেন। এক্ষণে আমাকে মুক্ত করিয়া প্রত্যুপকার করুন, এই আমার বিনীত প্রার্থনা। আমি আপনাকে পাঁচসহস্র টাকা দিব! আপনার পুণ্য ও অর্থ দুই লাভ হইবে। কারাধ্যক্ষ ভদ্রতা-ব্যঞ্জকস্বরে উত্তর করিলেন, 'আপনাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু দুর্দ্দান্ত রাজাকে বড় ভয় হয়।' সনাতন বলিলেন, 'রাজা দক্ষিণে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন। ফিরিয়া আসিবেন কি সন্দেহ। যদি আসেন, তাঁহাকে বলিবেন যে গঙ্গার নিকট বহির্দ্দেশে গিয়া সে শৃঙ্খল সহিত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, বহু অনুসন্ধানেও খোঁজ পাওয়া

যায় নাই। আপনার ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। কেননা, আমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। আমি এ দেশে থাকিবনা। দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইব। ইহাতেও যবনের মন উঠিল না দেখিয়া সনাতন রূপ-পরিত্যক্ত সাত হাজার টাকা আনাইয়া তাহার অগ্রে রাশীকৃত করিলেন। কারাধ্যক্ষ লোভে পড়িয়া টাকাগুলি আত্মসাত করিলেন এবং রজনী যোগে শৃঙ্খল কাটিয়া সনাতনকে গঙ্গাপার করিয়া দিলেন। বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে লইয়া প্রকাশ্য রাজপথ ছাড়িয়া রাজমন্ত্রী কাঙ্গাল বেশে পথে ধাইয়া চলিলেন। ধন্য অনুরাগ! তুমি রাজাকে পথের কাঙ্গাল, দাম্ভিককে তৃণসল নীচ এবং মানুষকে দেবতা করিতে পার। রাত্রি দিন চলিয়া চলিয়া শ্রীসনাতন পাতড়া নামক পর্ব্বতের নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে একজন ভূমিক থাকিত, সে ঘাটি ছাড়িয়া না দিলে পর্ব্বত পার হইবার উপায় নাই। এই ভূমিক দস্যু প্রকৃতির লোক। কথিত আছে, তাহার নিকট একজন গণক ছিল, সে হাত গণিয়া কাহার নিকট কত টাকা আছে বলিয়া দিত; ভূঞা তদনুসারে পথিকের প্রাণবিনাশ করিয়া উহা লুটিয়া লইত। সেই গণক কাণে কাণে ভূঞাকে বলিল যে, সনাতনের নিকট আটটী সুবর্ণ মোহর আছে। ভূঞা সনাতনকে বলিল, 'এক্ষণে স্নান ভোজন কর, রাত্রিযোগে তোমাকে দিয়া পর্ব্বত পার করিয়া দিব।' এই বলিয়া বহু সমাদর করিয়া সে সনাতনকে আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল। সনাতন স্নান ভোজন করিয়া, ভূঞার ব্যবহারে কিছু সন্দিগ্ধ হইলেন এবং ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার নিকট কিছু টাকাকড়ি আছে কি না? ঈশান এবারে মুস্কিলে পড়িল। কারণ তাহার নিকট সত্যই আটটী মোহর ছিল। সে ধন লোভ ছাড়িতে পারেনা, অথচ মনিবের নিকট একেবারে মিথ্যা বলিতেও সাহসী হইল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, তাহার নিকট সাতটী মোহর আছে। সনাতন তাহাকে অনেক ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, এই কাল যম কেন সঙ্গে আনিয়াছ? তখন ঐ সাতটী মোহর চাহিয়া লইয়া সনাতন গোঁসাই ভূঞাকে অর্পণ করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, "এই সাত মোহর আমার নিকটে ছিল, ইহা আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে পর্ব্বত পার করিয়া দিউন। আমি রাজবন্দী প্রকাশ্য সড়কে যাইতে পারি না। আমাকে উদ্ধার করিয়া দিলে আপনার পুণ্য হইবে।"

ভূঞাজী হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আপনার ভৃত্যের অঞ্চলে আটটি মোহর ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। এই মোহর আপনি না দিলে আমার লোক আজ রাত্রিতে আপনাকে মারিয়া ফেলিয়া লইত। তা আপনার সরল ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হইলাম; মোহর লইব না। চারি জন লোক দিয়া আপনাকে পাহাড় পার করিয়া দিব।

সনাতন ভূঞার কথায় কিছু ব্যথিত হইয়া বলিলেন, 'আমার মোহরে প্রয়োজন নাই; বরং সঙ্গে থাকিলে উহার লোভে কে কখন প্রাণ মারিয়া ফেলিবে। আপনি উহা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করুন।' ইহার পর ভূঞার চারি জন পাইক সঙ্গে করিয়া সনাতন রাত্রে রাত্রে পর্ব্বত পার হইলেন এবং

পর পারে যাইয়া ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্য কি আর একটী মোহর তোমার নিকটে আছে ?' সে 'আছে' কহিলে, সনাতন তাহাকে মোহর লইয়া স্বদেশ যাইবার অনুমতি দিয়া একাকী হাতে করোয়া ও স্কন্ধে ছিন্ন কন্থা লইয়া নির্ভয়ে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন। কতক দিন পরে তিনি বর্ত্তমান্ মজঃপুর জেলার অন্তর্গত হাজিপুরে আসিয়া পৌছিলেন এবং সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া একটী উদ্যানে বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন হাজিপুরে গৌড়েশ্বরের রাজ কর্ম্মচারীগণ থাকিতেন। শ্রীকান্ত নামে সনাতনের ভগিনীপতি গৌড়াধিপের জনৈক কর্ম্মচারী। তিন লক্ষ টাকা লইয়া তিনি দিল্লীতে বাদসাহকে দিতে যাইতেছেন। সম্প্রতি হাজিপুরের রাজপ্রাসাদে অবস্থিত করিতেছেন। তিনি উচ্চ প্রাসাদ হইতে ফকির-বেশী সনাতনকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া রজনী যোগে একটী বিশ্বস্ত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দুইজনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল; সনাতন স্বীয় বন্ধন মোক্ষণের বিষয় বলিলে শ্রীকান্ত তাঁহাকে বৈরাগ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু মহাপুরুষের মন কিছুতেই টলিল না দেখিয়া, শ্রীকান্ত দুইচারি দিন নিভৃতে রাজপ্রাসাদে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন তাহাতেও সম্মত না হইয়া বলিলেন,' এই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যাইব, আমাকে তুমি গঙ্গা পার করিয়া দাও। শ্রীকান্ত তাঁহার ছেঁড়া কাঁথা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং অগত্যা একখানি মূল্যবান্ ভোট কম্বল লইতে সম্মত করাইয়া বিশ্বস্ত লোক দিয়া গঙ্গাপার করাইয়া দিলেন। সনাতন অদম্য উৎসাহে শ্রীচৈতন্যের মিলনাশায় ছুটিলেন। আর কতক দিনে বারাণসীনগরে আসিয়া সনাতন গোঁসাই লোকমুখে শ্রীচৈতন্যের আগমন বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া, অনুসন্ধানে চন্দ্রশেখরের বাহির বাটীতে আসিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্য তখন ভিতর প্রকোষ্টে, বুঝিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন 'দেখতো বাহিরে একজন বৈষ্ণব বসিয়া আছে কি না ?' চন্দ্রশেখর বাহিরবাটী দেখিয়া যাইয়া বলিলেন, 'কৈ কোন বৈষ্ণবতো দেখিলাম না।' শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেহই কি নাই ?' চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন, একজন দরবেশ আছে। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, তাহাকে ডাকিয়া আন। চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিয়া আগন্তুককে ডাকিয়া লইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্র চৈতন্য দেব পিঁড়া হইতে আস্তেব্যস্তে উঠানে নামিয়া আসিয়া সনাতনের গলা ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতন প্রেমাবিষ্ট চিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। দুইজনে অনেকক্ষণ গলা ধরাধরি করিয়া রোদন করিলে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে পিঁড়ার উপরে লইয়া গিয়া নিজ পার্শ্বে বসাইয়া স্বহস্তে তাঁহার গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। সনাতন বলিলেন, 'ছি প্রভু! অস্পৃশ্য ঘৃণিত পাপীকে স্পর্শ করিও না' চৈতন্য উত্তর দিলেন, 'তোমার ন্যায় ভবজ্জনের স্পর্শে আমি আজ পবিত্র হইলাম। মহাজনগণ পরম পবিত্র তীর্থ স্বরূপ। তাঁহাদের সংস্পর্শে তীর্থস্নানের পুণ্য হয়।' (ক্রমশঃ)।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। অহল্যা।—কথাগ্রন্থ—শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ॥০। যে গল্প অবলম্বন করিয়া অহল্যা লিখিত হইয়াছে, সে গল্পটী তত নূতন নহে, কিন্তু লেখার চাতুর্য্যে ও বর্ণনার মাধুর্য্যে পুস্তকখানি যারপর নাই উপাদেয় হইয়াছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে লেখকের অসাধারণ গুণপণা প্রকাশ পাইয়াছে। অল্প কথায় ক্ষুদ্র পুস্তকের সমালোচনা করিতেছি, নচেৎ অনেক কথা বলিবার ছিল। লেখক শক্তিশালী ব্যক্তি, ভাষা তাঁহার হাতে দাসীর ন্যায় কাজ করিয়াছে। লেখক পুস্তকের শেষে যে দুটী প্রশ্ন করিয়াছেন, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য, প্রথমত, এ পুস্তক আমাদের ভাল লাগিয়াছে; দ্বিতীয়ত গ্রন্থকার এরূপ কার্য্যে সময় কর্ত্তন করিলে কালে তিনি কৃতী লেখক হইতে পারিবেন। ঘটনা পরম্পরায় গ্রন্থকার এ পথে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গালা ভাষা এবং আমাদিগের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমরা দরিদ্র গ্রন্থকারগণ সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছি, আসুন, এ ক্ষেত্র তাঁহার পক্ষে অতি উজ্জ্বল।

২। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান। শ্রীচন্দ্রশেখর কালী, এল, এম, এস, প্রণীত, মূল্য ৫। চন্দ্রশেখর একজন স্বাধীন চিকিৎসক, পাবনায় ...তার সহিত বহুদিন চিকিৎসাকার্য্য নির্বাহ করিয়া সর্ব্বসাধারণের মন আকৃষ্ট করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কয়েক মাস হইল কলিকাতা ১৫০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বটতলার থানার উত্তর ধারে বাস করিতেছেন। চিকিৎসা বিভাগে চন্দ্রশেখর বাবুর বহুদর্শিতা অসামান্য। তিনি একজন বিদ্বান, প্রতিভাশালী ব্যক্তি। বহুদিন চিকিৎসা করিয়া এ দেশের রোগীদের অবস্থা যেরূপ অবগত হইয়াছেন, এই পুস্তকে তিনি যথাসাধ্য তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার প্রথম খণ্ডে রোগের লক্ষণ ও কারণাদি সহ ঔষধ নির্ব্বাচন উপায় "ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রদর্শক" নামে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে, রোগের নাম, বর্ণনা, প্যাথলজী, রোগের চিকিৎসা "রোগানুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচন প্রদর্শক" নামে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানি কেবল ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ হইলে আমরা ইহার তত আদর করিতাম না, স্থানীয় অবস্থা, বহুদর্শিতার ফল ইহাতে ব্যাখ্যাত হওয়ায় ইহা যারপরনাই আদরের জিনিস হইয়াছে। চন্দ্রশেখর বাবু ঔষধের ডাইলিউসন সম্বন্ধে দেশ বিদেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মত জানিতে চেষ্টা করিয়া এক মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, এই পুস্তকে তাহারও সারাংশ দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি ৬০৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত; সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করা অসাধ্য। তজ্জন্য আমরা নিরস্ত হইলাম। কিন্তু ইহা না বলিলে চলে না যে, এ পুস্তকে সর্ব্বশ্রেণীর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের প্রভূত উপকার হইবে। যাঁহারা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নহেন, তাঁহারা এ পুস্তকানুসারে অবলীলাক্রমে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিবেন। এইরূপ অভিজ্ঞতাপূর্ণ পুস্তক এ দেশে অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সকলের নিকট বিশেষরূপ আদৃত হইবে, আশা করি।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন।

বৈদিক ও মহাভারতীয় যুগের প্রভেদ এই যে, বৈদিক যুগে বর্ণভেদ একেবারেই ছিলনা, আর দ্বিতীয়যুগে বর্ণভেদের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় যুগের হিন্দুরা সভ্যতা ও আচার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য অনেক নিয়ম সংস্থাপন করেন। বৈদিক সময়ে তাহা অজ্ঞাত ছিল। রাজকীয় সভা সমূহে বিদ্যার আলোচনা এবং বিজ্ঞ ও বিদ্বানের আদর ও পুরস্কার যথেষ্ট হইত। সুবিদ্বান ব্যক্তিরা বিচার কার্য্য করিতেন। এইরূপে জীবনের সমস্তকাজ নিয়মের অধীন হইল। সকল দেশেই দৃঢ় দুর্গবেষ্টিত সৌধমালা পরিপূর্ণ নগর সমূহ স্থাপিত হইল, এবং বিচারক ও শান্তিরক্ষক নিযুক্ত হইল। কৃষিকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হইত, রাজপুরুষেরা প্রজার বিরোধ মীমাংসা করিতেন, এবং তাহাদের নিকট হইতে রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতেন।

বিদেহ, কাশী ও কুরুপাঞ্চালের রাজসভাই বিদ্বমণ্ডলীর প্রধান আশ্রয় ছিল। বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক যজ্ঞসম্পাদন জন্য রাজারা বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগকে রাজসভায় স্থান দিতেন। এই সকল ঋষিদের বংশধর বা শিষ্যেরাই অনেকানেক ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ সংগ্রহ করিয়া থাকিবে। বিশেষ বিশেষ ঘটনার সময় দূর দেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী আসিয়া এক এক রাজ সভায় সমবেত হইতেন, এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন মন, আত্মার গতি, পরকাল, দেবতার প্রকৃতি, পিতৃলোক, পরমাত্মার স্বরূপ প্রভৃতি অতি গভীর বিষয় আলোচনা করিতেন।

কিন্তু শুধু রাজসভায়ই যে বিদ্যালোচনা বদ্ধ ছিল, তাহা নয়। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের পারিষদ্ (টোল) ছিল: যুবক ব্রহ্মচারিরা এই সকল পারিষদে যাইয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।২) পাঠে জানা যাইতেছে যে, শ্বেতকেতু বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঞ্চালের পারিষদে গিয়াছিলেন। আধুনিক শাস্ত্র অনুসারে একটী পারিষদে বেদ, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রভৃতি বিষয়ে সুদক্ষ একবিংশতি ব্রাহ্মণের বসতি হইবেক। কিন্তু মহাভারতীয় যুগে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়া বোধ হয়না। ঋষি পরাশরের বিচারে চারিজন, এমন কি, তিনজন বেদজ্ঞ ও বৈদিক যজ্ঞকারী পণ্ডিত হইলেই পারিষদ হইতে পারিত।

এই সকল পারিষদ ভিন্ন কোন কোন গুরু একাকী টোল সংস্থাপন করিতেন, নানাদেশাগত শিষ্যবর্গকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। শিষ্যেরা গুরুগৃহে বাস করিত, এবং গুরুর গৃহমার্জ্জন, কাষ্ঠসংগ্রহ, জলানয়ন প্রভৃতি সমস্ত গৃহকার্য্য করিত এইপ্রকার গৃহকার্য্য সম্পাদন, শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্যছিল। এই প্রকারে গুরুগৃহে বেদশিক্ষায় ও গুরুসেবায় ব্রহ্মচর্য্য

ততোধিক বৎসর অতিপাত করিয়া গুরুকে সমুচিত দক্ষিণা দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক শিষ্যেরা গৃহাগমন করিয়া দর্শনলোলুপ আত্মীয়বর্গকে পরিতৃপ্ত করিত। অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত বৃদ্ধবয়সে অরণ্যে গমন করিয়া এই প্রকার শিষ্যপরিবৃত হইয়া তাহাদিগকে বেদাধ্যাপনা করিতেন। এই সকল অরণ্য বাস হইতে দ্বিতীয় যুগের নুতন বিদ্যা আলোচনা ও নুতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়। বিদ্যার জন্য বিদ্যার এত আদর বোধ হয় পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয়না। আর্য্যদের বিশ্বাস ছিল, দানাদি সৎকাজ ও বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা পরলোকে সুখ সম্পদ হইতে পারে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন কখনই ব্রহ্মলাভ হয় না।

পারিষদেই হউক, আর গুরু বিশেষের নিকটেই হউক, নিয়মিত মত বেদাদি পাঠ করিয়া শিষ্যেরা গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিবাহ করিত এবং গৃহধর্ম্ম পালন করিতে থাকিত। শুনক্ষত্রে স্বগৃহে গৃহ্যাগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্বহস্তে আহুতি প্রদান এবং অতিথিদিগকে সমাদর প্রদর্শন করিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অর্থাৎ দ্বিজ মাত্রেরই এই কর্ত্তব্য ছিল। তখন পুরোহিতের উপর গৃহ্যাগ্নিতে আহুতি দানের ভার প্রদান করিয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা হাত গুঠাইয়া বসেন নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য সকলেই আর্য্য-সমাজ ভুক্ত ছিলেন। এই আর্য্য সমাজভুক্ত ব্যক্তিমাত্রের কর্ত্তব্য নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে।

"সত্যকথা বলিবেক। কর্ত্তব্য পালন করিবেক। বেদ পাঠ পরিত্যাগ করিবে না। গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া গৃহী হইবেক। সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। কর্ত্তব্য পথ পরিত্যাগ করিবে না। প্রয়োজনীয় কাজ করিতে শৈথিল্য করিবে না। মহত্ব লাভের প্রয়াসী হইবে। বেদপাঠ ও বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। দেব-যজ্ঞে পিতৃযজ্ঞে অবহেলা করিবে না। পিতাকে দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিবে। মাতাকে দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিবে, ও নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক কর্ম্মে লিপ্ত হইবে। আমরা এত দিন যে সকল সৎকাজের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তোমরাও তাহাই করিবে।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।২)। এই যুগের (উপনিষদাদি) গ্রন্থসমূহে এই প্রকার অনেক বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে তৎকালীয় সামাজিক অবস্থা কত উন্নত ছিল, তাহা প্রতীয়মান হয়। অশ্বমেধযজ্ঞে পুরোহিত আশী-র্বচন করিতেছেন, "এই রাজ্যের ব্রাহ্মণেরা সৎকর্ম্মান্বিত হউক। যোদ্ধারা যুদ্ধে যশস্বী হউক, গাভী সকল প্রভূত পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করুক; বলদগুলি স্বচ্ছন্দে ভার বহন করুক। স্ত্রীলোকেরা গৃহরক্ষা করুক, যোদ্ধারা বিজয়ী হউক, যুবকেরা ভদ্র ও শিষ্টাচারী হউক; পর্জ্জন্য প্রতি গৃহে ও প্রতি গ্রামে বৃষ্টি বর্ষণ করুক। ক্ষেত্র সকল পূর্ণমাত্রায় শষ্য প্রদান করুক। যেন আমরা অভীষ্ট লাভ করিয়া সুখে দিন যাপন করিতে পারি।" (শ্বেত-যজুর্বেদ ২২।২২)।

ছান্দোগ্য উপনিষদ (৫।১৩।১৭), শত-পথ ব্রাহ্মণ (৩।২।৪৮), তৈত্তিরীয় উপনিষদ (১।৫।১২) ইত্যাদি গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, তৎকালীয় লোকদের নানা প্রকারের সম্পত্তি ছিল; যথা, স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং মণিমুক্তা, রথ, শকট, গাভী, অশ্বতর ও দাস,

গৃহ অট্টালিকা ও কৃষি ক্ষেত্র, কাহার কাহার হস্তী।

স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিন্ন শ্বেতযজুর্বেদে(১৭। ১৩) অন্যান্য ধাতুর উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪। ৭। ৭) লিখিত আছে, "যেমন লবণ (borax) দ্বারা স্বর্ণ, স্বর্ণ দ্বারা রৌপ্য, রৌপ্যদ্বারা টীন, টীনদ্বারা সীসা, সীসা-দ্বারা লোহা, লোহা দ্বারা কাষ্ঠ বন্ধন রক্ষা যায়।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮। ২২) আতিশয্য সহকারে লিখিত হইয়াছে—"অত্রির পুত্র নানাদিগ্‌দেশ হইতে দশ সহস্র হস্তী ও দশ সহস্র দাস কন্যা সংগ্রহ করিয়া তাহা-দিগের গলদেশ রত্নে ভূষিত করিয়া সম্প্র-দান করিলেন।"

বৈদিক যুগের ন্যায় এযুগেও লোকে আমিষ ও উদ্ভিজ্জ উভয় আহার করিতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬। ৩। ১৩) দশ প্রকার খাদ্য শস্যের উল্লেখ আছে—যথা, ব্রীহি, যব, তিল, মাস, অনুপ্রিয় অঙ্গব, গোধুম, মসূর, খল্ব, ও খলকুল।

শ্বেতযজুর্বেদে (১৮। ১২) এতদ্ভিন্ন মুদ্গা, নীবার, ও শ্যামাকরের উল্লেখ আছে। এই সকল শস্যকে পেষিয়া এবং দধি দুগ্ধে ভিজাইয়া পিষ্টক করিয়া খাওয়া হইত। দুগ্ধ ও তদুৎপন্ন দধি প্রভৃতি চিরকালই আর্য্যদের আহার্য্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

মাংস আহারের প্রচলন ছিল; এজন্য গাভী ও বলীবর্দ্দ হত হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১। ১৫) লিখিত আছে, রাজা বা সম্ভ্রান্ত অতিথি উপস্থিত হইলে বলীবর্দ্দ বা বন্ধ্যা গাভী হনন করা হইত। পাণিনীর সূত্রে "দাশ গোঘ্নৌ সম্প্রদানে" * এই সময়কার ব্যবহার স্মরণে গ্রথিত হইয়া থাকিবে।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কোন্ কোন্ যজ্ঞে এবং কোন্ কোন্ দেবতার প্রীত্যর্থে কি প্রকার গোরু বধ করা হইবে, তাহা পর্য্যন্ত সবিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা বিষ্ণু দেবতার জন্য খর্ব্বকায় গোরু, ইন্দ্রের জন্য নিম্নাভিমুখী শৃঙ্গ বিশিষ্ট বলদ, বায়ুর জন্য স্থূলপাদ বিশিষ্ট গাভী, বিষ্ণু ও বরুণের জন্য বন্ধ্যা গাভী, পূষার জন্য কৃষ্ণবর্ণ গাভী, মিত্র ও বরুণের জন্য দ্বিবর্ণ বিশিষ্ঠ গাভী, ইন্দ্রের জন্য রক্তবর্ণা গাভী ইত্যাদি ইত্যাদি। অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় প্রকাণ্ড যজ্ঞ সমূহে অশ্ব, বলীবর্দ্দ, গাভী, ছাগ, হরিণ মিলিয়া ১৮০ প্রকার গৃহ-পালিত পশুর মাংসের প্রয়োজন হইত। কি প্রকারে গবাদি কাটিতে হইবে, এই ব্রাহ্মণে তাহার বর্ণনা আছে, আর গোপথ-ব্রাহ্মণে গাভীর কোন্ অংশ কে পাইবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট আছে। পুরোহিত গাভীর জিহ্বা, গ্রীবা, স্কন্ধ, পাদ [বস্তুত ভাল ভাল অংশ সমস্তই] পাইতেন, গৃহস্থ পৃষ্ঠদেশ পাইতেন, আর গৃহস্থের স্ত্রী জরায়ুদেশ মাত্র পাইতেন। এই গোমাংস গলাধঃকরণ করিতে প্রচুর পরিমাণে সোমরসের প্রয়োজন হইত।

শতপথ ব্রাহ্মণে (৪। ৫) একটী বন্ধ্যা গাভী হনন ও রন্ধন বিষয় অতি সুচারুরূপ বর্ণিত আছে। উক্ত ব্রাহ্মণের অপর অংশে (৩।১।২,২১) গোমাংস ভক্ষণের ঔচিত্য বিষয়ে অতি মনোহারী বিচার রহিয়াছে।

* "যে ব্যক্তির জন্য গো হনন করা হয়, তাহাকে বলে গোঘ্ন বা অতিথি।"

একব্যক্তি বলিতেছেন "সে (পুরোহিত) যেন গোমাংস না খায়।" সাধুচরিত্র, সরলচিত্ত, সদ্‌বিদ্বান্‌ যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে বলিতেছেন—"আমি তো মাংস খাইয়া থাকি, পক্ক মাংস নরম হইলেই হইল।" বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।৪।১৭,১৮) যে মাংসাহার ও নিরামিষাহারের নিম্নোদ্ধৃত ফলাফল বিচার রহিয়াছে, যাজ্ঞবল্ক্য তদ্বিষয় অবগত ছিলেন কি না, জানি না—যথা

"বিদুষী ও দীর্ঘায়ু দুহিতা জন্মগ্রহণ করুক, এই ইচ্ছা হইলে, স্বামী স্ত্রী তিল ও ঘৃতে অন্ন পক্ক করিয়া উপযুক্ত সময়ে আহার করিবে।" "কিন্তু যদি পুত্র সন্তান হউক, এমন ইচ্ছা হয়, এবং সেই পুত্র বিদ্বান, যশস্বী, সুবক্তা, বেদজ্ঞ, দীর্ঘায়ু হইবেক, এমন কামনা হয়, তবে স্বামী স্ত্রী ঘৃত ও মাংসে অন্ন পক্ক করিয়া তাহা আহার করিবেক। মাংস ষাঁড়ের মাংস হওয়া আবশ্যক।"

বৈদিক ঋষিরা যে গোমাংসাহার ও বক্তৃতা ক্ষমতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থির করিয়াছেন, এই উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার আর প্রমাণের অভাব নাই!

দ্বিতীয় যুগে হস্তিনাপুর, কাম্পিল্য ও অযোধ্যায় হিন্দুদের নিত্য দৈনন্দিন জীবন কি প্রকার ছিল, তাহা এখন পাঠকবর্গ কল্পনা করুন। নগর সমূহ প্রাচীর-বেষ্টিত, রাজপথ প্রশস্ত, রাজ পথের পার্শ্বে সুরম্য হর্ম্ম্য সমূহ বিরাজিত। নগরের মধ্যস্থলে রাজধানী অবস্থিত; তাহার নিকটে সৈন্য সামন্ত, এবং পুরোহিত ও সন্ন্যাসীর আবাস। প্রজাবর্গ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া রাজার প্রতি সমুচিত সম্ভ্রম ও অনুরাগের পরিচয় দিত। নগরের চারিদিকে প্রজাবর্গ স্বর্ণ, রৌপ্য, রথ শকট, অশ্ব গাভী, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র সমূহ অধিকার করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিত। সকলেই স্বগৃহে স্বহস্তে গৃহাগ্নিতে প্রাতঃ সন্ধ্যা আহুতি প্রদান করিত, অভ্যাগতদিগকে সমাদর করিত, রাজবিধি প্রতিপালন করিয়া চলিত, বৃহৎ যজ্ঞাদিতে পুরোহিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিত এবং জ্ঞানী বেদজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্মান করিত। আর্য্য বালক মাত্রেই অতি অল্প বয়সে শিক্ষার্থ গুরুসমীপে প্রেরিত হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই একাসনে বসিয়া একপাঠ ও একধর্ম্ম অধ্যয়ন ও আচরণ করিত। পাঠ সমাপনান্তে গুরুর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহাগত হইয়া বিবাহ করিত, এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। পুরোহিত ও সৈনিক পুরুষেরা তখন জাতি সাধারণের অন্তর্গত ছিলেন, আদান প্রদান ও আহার বিহার বিষয়ে আর্য্য সন্তানের মধ্যে আর কোন বিচার ছিল না। যে যাহার পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; কিন্তু জীবিকা হইতে তখনও বিবাহাদি জাতি বিচারের সৃষ্টি হয় নাই। সকলেই আর্য্য, জীবিকা মাত্রেই জীবন ধারণ উপায়। পুরোহিতের যজ্ঞে অর্জ্জিত গোমাংস, কৃষকের ক্ষেত্রোৎপন্ন ব্রীহিরাশি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত না। জন কয়েক লোক পৌরহিত্য ও নগর রক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল; তদ্ভিন্ন সকলেই কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্য দ্বারা জীবিকা ধারণ করিত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করা

প্রাচীন ভারতে রীতি ছিল না। চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য সভ্যতার উন্মেষ-দিন অবধি আর্য্য-রমণীরা সমাজে সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা উত্তরাধিকারী সূত্রে এবং নিজ গুণে সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারিতেন। গৃহ্যাগ্নিতে আহুতি প্রদান এবং যজ্ঞ সম্পাদনে তাঁহাদের অধিকার ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজ্যাভিষেকাদি বিশেষ বিশেষ ঘটনায় তাঁহারা প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইতেন; রাজপথে একাকিনী বা সখী-পরিবৃতা হইয়া গমনাগমন করিতে কোন বাধা ছিলনা। বিদ্যালোচনে ও দর্শনশাস্ত্রে অনেকে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, এমন কি, রাজনীতি ও রাজ্যশাসনেও যে তাঁহাদের মতামত একেবারে উপেক্ষিত হইত, তাহাও নয়।

নারীজাতির সম্মান বিষয়ে প্রাচীনশাস্ত্র হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু সম্প্রতি দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইব। যাজ্ঞবল্ক্য বনে গমন করিবেন; তদীয় দ্বিতীয় স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"১। মৈত্রেয়ি! আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, তোমাতে ও কাত্যায়নীতে একটা বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।"

"২। মৈত্রেয়ী বলিলেন—"প্রভোঃ, যদি এই সমস্ত পৃথিবী রত্নপূর্ণা হইয়া আমার হইত, তবে আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিতাম কিনা?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না, তোমার জীবন ধনী লোকদের জীবনের ন্যায় হইত; ধনের দ্বারা অমরত্ব লাভের আশা নাই।"

"৩। মৈত্রেয়ী বলিলেন—"যাহাতে অমরত্ব লাভ করিতে পারিবনা, তাহা লইয়া আমি কি করিব? যাহাতে অমরত্ব লাভ করিতে পারি, প্রভু আমাকে তাহা শিক্ষা দিউন।"

"৪। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "তুমি যথার্থ আমার প্রণয়ের পাত্রী। এস, আমার কাছে বস, আমি যাহা বলিতেছি, অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর।"

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষৎ ধর্ম্ম সহধর্ম্মিনীকে ব্যাখ্যা করিলেন, "ব্রহ্ম সকল পদার্থেই আছেন, চরাচর স্থাবর জঙ্গম সকলই ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে, ব্রহ্মেতে লীন হইবেক।"

বিদেহাধিপতি রাজর্ষি জনকের সভায় অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাগম হইয়াছে। জনক এই যজ্ঞে পুরোহিতদিগকে বহু উপহার প্রদান করিলেন। কুরু ও পাঞ্চাল দেশ হইতে ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছিলেন; উহাদের বিদ্যা পরীক্ষার্থ তিনি সহস্র গাভী আনয়ন করিলেন, এবং তাহার প্রত্যেকের শৃঙ্গদ্বয় দশ পদক স্বর্ণ মণ্ডিত করিয়া বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণগণ; আপনাদের মধ্যে যিনি বিজ্ঞতম, তিনি এই গাভী গ্রহণ করুন।" কাহারও গাভী গ্রহণ করিতে সাহস হইল না। যখন যাজ্ঞবল্ক্য জনৈক শিষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন "বৎস; এই সকল গাভী লইয়া যাও।" শিষ্য "জয়, সামের জয় হউক" বলিয়া গাভী লইয়া চলিল।

এতদ্দর্শনে সমাগত ব্রাহ্মণেরা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া, যাজ্ঞবল্ক্যকে নানা প্র[illegible] করিতে লাগিল। যাজ্ঞবল্ক্য যথোচিত উ[illegible] প্রদান করিলেন। হোতা অশ্বল[illegible]কারের আর্ত্তভাগ, ভুজ্য্য লাহ্যায়নি, [illegible] চাক্রায়ণ, কহল কৌষীটকের, উদ্দালক

আরুণি, এবং অন্যান্য অনেকে অনেক প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যকে কেহ নিরস্ত করিতে পারিলেন না।

এই সভায় একটী বিদুষী রমণী উপস্থিত ছিলেন, তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর এই প্রকার পরাভব দর্শনে অধৈর্য্যা হইয়া নিজের বেদজ্ঞতা ও পৌরহিত্য-জ্ঞানের বলে সর্ব্ব সমক্ষে দণ্ডায়মানা হইয়া জয়গর্ব্বিত যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, যেরূপ কাশী বা বিদেহের যোদ্ধৃপুত্র ধনুতে গুণ যোজনা করিয়া দুইটী সুতীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে উপস্থিত হয়, আমিও তেমনি তোমার সহিত শাস্ত্রীয় যুদ্ধ করিতে দুইটি প্রশ্নবান হস্তে করিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।" গার্গী বাচক্নবী প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য তাহার যথোচিত উত্তর প্রদান করিলেন।

এই সকল প্রাচীন শাস্ত্রে কি প্রমাণ হইতেছে? প্রাচীন আর্য্য সমাজে যেমন স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ছিল, অপর কোনও প্রাচীন জাতিতে তাহা দৃষ্ট হয় না। স্ত্রীলোকেরা শাস্ত্রজ্ঞানে স্বামীর সঙ্গিনী, ধর্ম্ম কার্য্যে অনুগামিনী, গৃহ কর্ম্মে বন্ধু ও সহায়, পার্থিব সম্পদে বিপদে অর্দ্ধভাগিণী, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রাচীন ভারতে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। মৈত্রেয়ী বা গার্গীর ন্যায় সকলেই পণ্ডিতা ছিলেন, তাহা বলি না; কিন্তু সকলেই সাধারণ সাংসারিক বিষয়ে সুবিদিতা, এবং গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা, অন্তঃপুরের অবরোধ প্রণালীর কঠোরতা [illegible]গাতা ছিলেন, এবং পূজা পর্ব্বে তামাসা বা[illegible] [illegible]ক্ষ এবং বন্ধুজন দর্শনে এবং অতিথি অভ্যা[illegible]গতের সমাদরে পরপুরুষের সমক্ষে বাহির হইতেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু তাহা নয়। স্ত্রীলোকেরা নিজের সম্পত্তির অধিকারিণী বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিত। প্রাচীন আর্য্যরমণীদিগকে আধুনিক ইউরোপীয় রমণীগণের সহিত তুলনা করা যাইতে না পারে; গ্রীস, রোম ও ভারতের ইতিহাস পাঠক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, প্রাচীন ভারতে আর্য্য রমণীর অবস্থা প্রাচীন গ্রীস বা রোমীয় রমণীর অবস্থার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, এই যুগে বাল্যকালে অর্থাৎ গুরুগৃহে পাঠ সমাপনের পূর্ব্বে আর্য্য সন্তানেরা বিবাহ করিত না। বালিকারাও যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে বিবাহ করিত না, অনেক স্থলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার স্পষ্ট নিয়ম বিধি পর্য্যন্ত ছিল। এবং যে প্রণালীতে বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইত, তাহাও নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণেরা অবাধে অপর বর্ণের বিধবা গ্রহণ করিতেন। অথর্ব্ব বেদে লিখিত আছে, "যদি কোন স্ত্রীলোকের দশজন অব্রাহ্মণ স্বামী হইয়া থাকে, আর একাদশ স্বামী ব্রাহ্মণ হয়, তবে সে ব্রাহ্মণের স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইবে।" ৫।১৭।৮

অপরাপর প্রাচীন জাতির ন্যায় প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই ইহাতে লিপ্ত হইত। আর্য্য ভারতে কথনও এক স্ত্রীর বহুপতি প্রথা ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, একস্বামীর বহুস্ত্রী হইতে পারে, কিন্তু এক স্ত্রীর বহুস্বামী থাকে না। ৩।২৩"

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

রাধাকৃষ্ণ।

রাধাকৃষ্ণ নাম—যুগল তত্ত্ব ;
কি মধুর ভাব, বিশুদ্ধ সত্ত্ব।
রাধা কি শ্রীকৃষ্ণ ! কৃষ্ণই রাধা ;
এক তত্ত্ব দুই নামেতে বাঁধা।
এক বৃন্তে যথা কুসুম দু'টী
মিশামিশি ভাবে রহয়ে ফুটি।
জলেতে তরঙ্গ যেমন চলে ;
না জল, না ঢেউ, জলই জলে।
জলীয় প্রকৃতি, জলীয় দেহ ;
জলে জল মিশে, তরঙ্গ সেহ।
রাধা কি শ্রীকৃষ্ণ ? কৃষ্ণ কি রাধা ?
এক তত্ত্ব দুই নামেতে বাঁধা।

এক তত্ত্ব দুই নামেতে বাঁধা ;
এক বস্তু দুই ভাবেতে সাধা।
পুরুষ প্রকৃতি, কপিল লিখে ;
পুরুষ ঘুমায়, প্রকৃতি জাগে।
পুরুষ ঘুমায় ? লীলা তবে কার ?
প্রকৃতি পুরুষে মিলনই সার।
পুরুষ প্রধান রসরাজ যে ;
নবীন কিশোর লীলাময় সে।
আনন্দ বিনা কি খেলা তার হয় ?
আনন্দে প্রেমেতে সদা ভোর রয়।
রসে ঢর ঢর নিতুই নব ;
আনন্দ প্রকৃতি, আনন্দ(ই) সব।
আনন্দই খেলে, আনন্দ সনে ;
উছলে আনন্দ-ধারা ভুবনে।
সে ধারা বহিল হইল বিশ্ব ;
এ তিন ভুবন, এ সব দৃশ্য।
ধারা বহি বহি নামটী রাধা ;
পুরুষ উলটি প্রকৃতি সাধা।
রাধা কৃষ্ণ বলি ভক্ত ডাকিল ;
প্রেমেতে অমনি হিয়া পুরিল।

রাধা কৃষ্ণ বলি ভক্ত ডাকিল ;
হিয়ার মাঝারে রূপ দেখিল।
লিখিল ঋষি, বর্ণিল কবি ;
এক শাখীপরে দুইটী পাখী।
ফল খায় এক, নিরখে আর ;
গলাগলি করি প্রেমে মাতোয়ার।
লীলা বৃন্দাবন—হৃদয় ধামে ;
এ মহা মিলন—কি ধুমধামে।
দেখরে নয়ন, মজরে মন,
রাধাকৃষ্ণ লীলা হৃদয় রতন।
রাধা রাধা রাধা, জয় শ্রীরাধা ;
রাধাকৃষ্ণ পদে রওরে বাঁধা।
রাধা, রাধা, রাধা, জয় শ্রীরাধা ;
আধই প্রকৃতি, পুরুষ আধা।
দেখাতে জগতে, মধুর প্রেম ;
নীলাম্বর পরে যেমন হেম।
এক তত্ত্ব এবে দু'ভাগ হলো ;
নিধুবন মাঝে বাঁশী বাজিল।
আকুল গোকুল বাঁশী শুনিয়ে ;
গোপী ছাড়ে কুল উদাসী হয়ে।
যমুনা উছলি উজান চলে ;
হম্বা রবে ধায় গাভীর দলে।
তমালে কদম্বে রাখাল দোলে ;
পাখী গায় বনে শ্রীরাধে বলে।
রাই গরবিনী মানে গর গর ;
শ্রীপদে লুটায়ে পড়ে নাগর।
প্রেমেতে কিশোরা কিশোরী ভাসে ;
রাই কানু দুই তনু বিলাসে।
প্রেমের উপরে প্রেমের জয় ;
যুগল মুরতি হ'লো উদয়।
প্রেমের উপরে প্রেমের জয় ;
যুগলে ভরল এ বিশ্বময়।

মানবী মানবে শ্রীরাধা কৃষ্ণ ;
যুগল যুগল কিবা সতৃষ্ণ।
আধই প্রকৃতি, আধই নারী ;
আধই আধই শুধুই হেরি।
মিথুনে মিথুনে জড়ে জীবেতে,
রাই রসময়ী শ্যাম কাঁদেতে।
স্থাবর জঙ্গম যুগলে ভরা ;
কানুর পীরিতি জগৎ বেড়া।
বৃন্দাবন বিলাসিনী সে শশী ;
বিশ্বময় জাগে রাই রূপসী।
চাঁদে জাগে রাই, বাতাসে রাই ;
জলে স্থলে রাই ; নাই কোন্ ঠাঁই ?
দেবের দেবীতে রাই সুমুখী ;
অপ্সরী কিন্নরীতে রাই দেখি।
ঘরে ঘরে রাই রূপের রাশি ;
ঘরে ঘরে শ্যাম প্রেমের ফাঁসি।
উথলে যুগল পীরিত খানি ;
রাধা কৃষ্ণ রূপ প্রেমের খনি।
রাধা কৃষ্ণ রূপ প্রেমের খনি ;
খুঁড়িতে খুঁড়িতে উঠেরে মণি।
মিটিল না তৃষা রাই রূপেতে ;
চাখিতে নারিল শ্যাম দেহেতে।
আধেক রূপেতে পীরিতি আধা ;
অভিন্ন স্বরূপ হইল দ্বিধা।
নারিল নারিল চাখিতে রস ;
তোলা পাড়া করি হয় বিবশ।
কোথা সে পীরিতি যুগল তত্ত্ব ;
প্রেমে মিশি মিশি হলো একত্ব।
চলো নদীয়ায় গোরার কাছে ;
সিন্ধুতে বিন্দুতে মিশিয়া গেছে।
পরমা প্রকৃতি রাইরূপসী ;
গোরার পীরিতি হেনই বাসি।
বাহিরেতে রাই হৃদয়ে কালা ;
ভাবে মহাভাব উঠিল জ্বালা।
জয় জয় গোরা হে বিনোদিয়া ;
জয় তব প্রেম, জয় নদীয়া।
রাধা কৃষ্ণ প্রেম করেছো সার ;
রাধা কৃষ্ণ রূপে দিচ্ছ সাঁতার।
এ হেন পীরিতি আমি কি পাব ?
তোমার চরণে শরণ লব।

শ্রীদীনদাস বৈরাগী।

হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার। (২)

আমরা দেখিলাম যে, ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারগণ ভবিষ্যতের অভাব বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা আরো দেখিলাম যে, তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করাতেই আমরা ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অতি হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছি। এখন জিজ্ঞাস্য এই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য ? বর্ত্তমান সময়ের আন্দোলনে লোকের যে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আস্থা জন্মিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের চারিদিকে হরিসভা, আর্য্যসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং অনেকে এই সকল সভায় যোগ দিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম পরিপোষক বক্তৃতা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছে। শাস্ত্রগ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বহুল রূপে প্রচার হইতেছে এবং অনেকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। কিন্তু কেবল বক্তৃতা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিলে

চলিবে না। হিন্দু-ধর্ম্ম যে এখন বাহ্য আড়ম্বরে পূর্ণ হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহার প্রকৃত অনুষ্ঠান অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত একখানি পুস্তিকায় লিখিত আছে—"শিক্ষা ও অনুষ্ঠান অভাবে, আর্য্য-ধর্ম্ম আজকাল আড়ম্বরের শেষ মাত্র হইয়াছে।" * * "ধর্ম্মের বাহ্য লক্ষণ ভারতবর্ষকে ভুলাইতে পারে না। কেবল বক্তৃতা, ঈশ্বর-লাভেচ্ছা শূন্য হইয়া শাস্ত্রপাঠ, কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা ভারতীয় ধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইবে না।" কি উপায়ে ভারতে প্রকৃতরূপে ধর্ম্ম প্রচার হইবে, এই পুস্তিকায় লিখিত আছে—"যে ধর্ম্মভাব প্রচারিত হইলে দেখিব যে, ভারতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি আর্য্যগণের যোগ, জ্ঞান ও ধর্ম্মাচার স্মরণ করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের গুণগানে উল্লাস-যুক্ত হইয়াছে, "ধর্ম্মাৎপরতরং নহি" বলিয়া মানবীয় কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিয়াছে, "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মঃ" বলিয়া নারায়ণকে মনোপ্রাণ সমর্পণ করিতে শিখিয়াছে, তাহাই ভারতে ধর্ম্ম প্রচার।"

উল্লিখিত পুস্তিকাখানি প্রকাশ হইবার পর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই পুস্তিকাখানিতে ১০৯টী ধর্ম্ম ও নীতি সভার একটী তালিকা সন্নিবেশিত আছে। এখন এ প্রকার সভার সংখ্যা বোধ হয় তাহার তিনগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সকল সভায় বক্তৃতা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন আদি হইয়া থাকে, এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, লোকের ধর্ম্মের প্রতি মতি হইয়াছে এবং শাস্ত্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাহাদের যত্ন আছে। শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ এখন জাগ্রত হইয়াছে। যে সমাজ কিছুকাল পূর্ব্বে অসাড় ছিল, তাহাতে এখন উদ্যমের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা যে, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকদের অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রমের ফল, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। এবং এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ দিই। কিন্তু উপরোক্ত পুস্তিকা-লেখক যে সকল আশার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সফল হইবার এখনো অনেক বিলম্ব আছে। কেবল সভাসমিতির দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইবে না। সময়ে সময়ে বক্তৃতা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে কোন বিশেষ ফল আশা করা যাইতে পারে না। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রকৃত অনুষ্ঠান করা চাই—প্রতি গৃহে পবিত্র পরিবার সংগঠন করা উচিত—পরিবারস্থ সকলের অন্তরের সহিত ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান ও আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের কথা কি কহিব, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলে হতাশ হইতে হয়। অনেকেই সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না, এবং যাঁহারা করেন, তাঁহারা উপাসনার মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাহার কারণ এই যে, যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহার তাৎপর্য্য তাঁহারা অবগত নহেন। তোতা পাখীর মত কতকগুলি কথা আওড়াইলে কি হইবে? এই জন্যই ত দেখা যায় যে, বালকগণ উপবীত সংস্কার হইবার পর কিছুকাল সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার কোন ফল দেখিতে না পাইয়া তাহা স্থগিত করেন। এই যে নানা প্রকার পূজা, ব্রত এবং কয়েকটী সংস্কার হইয়া থাকে, ইহার অন্তর্গত যে সকল মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহার তাৎপর্য্য

অনেকেই অবগত নহে। কোন গৃহস্থের বাটীতে দুর্গোৎসব হইল, কিন্তু দেবীর উপাসনায় তাঁহার বিশেষ কোন যোগ নাই। যেন ইহা পুরোহিত মহাশয়েরই পূজা। গৃহস্থ সংকল্প করিয়াই নিশ্চিন্ত। গৃহস্থের আত্মীয় স্বজন পূজার দালানে আসিতেছে, দেবীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছে, এবং তথায় বসিয়া পূজার মন্ত্র শুনিতেছে, পুরোহিত মহাশয় কত প্রকার অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা দেখিতেছে, কিন্তু সে সমুদায়ের মর্ম্ম কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। এই মহা পূজার অন্তর্গত একটী প্রার্থনা আছে, তাহাতেই কেবল সকলকে যোগ দিতে দেখা যায়। এই প্রার্থনাটী করিয়া দেবীকে পুষ্পাঞ্জলী দিতে হয়। ইহা ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য যে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এমন বোধ হয় না। পূর্ব্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ করা একটী উত্তম নিয়ম। ইহা তাঁহাদের স্মরণ করিবার এবং তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশ করিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এতদুপলক্ষে যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তাহার তাৎপর্য্য বোধগম্য না হওয়াতে শ্রাদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অধিক কি বলিব, বিবাহ উপলক্ষে, পুরুষ স্ত্রীর নিকট এবং স্ত্রীপুরুষের নিকট যে সকল প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়, তাহা সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ বলিয়া কেহই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। এরূপ ভাবে আর কতকাল চলিবে? ধর্ম্ম-প্রচারকদের ব এদিকে একেবারেই দৃষ্টি নাই!

আমরা হিন্দুসমাজের সমক্ষে একটী প্রস্তাব ধারণ করিতেছি। আশা করি, সকলে তাহার প্রতি মনোযোগ অর্পণ করিবেন, এবং যদ্যপি পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইবেন। আমাদের শাস্ত্র অগাধ। অতি অল্পলোকেই সমগ্র পড়িতে পারেন। বিশেষতঃ সমুদায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকলই বা কে পড়িয়া উঠে? যাঁহারা বিষয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন, তাঁহারাই অধ্যয়ন করিতে পারেন। কিন্তু যুবা পুরুষদিগকে ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত করা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। হিন্দুসমাজকে উন্নত করিতে হইলে, যুবকগণকে সৎপথ দেখান উচিত। কিন্তু লেখা পড়ার ব্যস্ততা এবং পরীক্ষারূপ বিভীষিকা তাঁহাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে, এ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার তাঁহাদের সময় কোথায়? অবকাশ পাইলে, যদ্যপি কেহ কোন কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়িতে যত্নবান হয়েন, কোন্ গ্রন্থ অনুসারে তিনি কার্য্য করিবেন, তাহা স্থির করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। বিষ্ণুপুরাণ পাঠ করিলে বোধ হয় যে বিষ্ণুই পরম দেবতা, এবং তাঁহারই উপাসনা করা উচিত। এইরূপে শিবপুরাণ, কালিকা-পুরাণ প্রভৃতি যে যে পুরাণ পাঠ করা যায়, সেই সেই পুরাণে শিব, কালী প্রভৃতি পরম আরাধ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আবার ধর্ম্মগ্রন্থ সকলে একস্থানে প্রতিমা পূজার বিধি দেওয়া হইয়াছে এবং অপর স্থানে তাহার নিন্দা করা হইয়াছে। অবশ্য এ সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম্ করা কঠিন। এই নিমিত্ত শাস্ত্র সকল হইতে সার সংগ্রহ

করিয়া তাহা অনুবাদ সহ প্রকাশ করা উচিত। শাস্ত্র সংগ্রহ খানিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা আবশ্যক। প্রথম ভাগে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার পূজার পদ্ধতি বিবৃত হইবে, দ্বিতীয় ভাগে শাস্ত্রীয় উপদেশ সকল সংগৃহীত হইবে। এই ভাগে, পিতা মাতার প্রতি, শ্রীপুত্রের প্রতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি এবং আপামর সাধারণের প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য সকল সন্নিবেশিত হইবে, তৃতীয় ভাগে অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রকাশিত হইবে। এই ভাগে, দশসংস্কার, এবং ব্রত নিয়মাদির ব্যবস্থা সকল থাকিবে। প্রথম ভাগে, সাকার ও নিরাকার উভয়-বিধ পূজার পদ্ধতি থাকা আবশ্যক। যাঁহার যেমন মনের ভাব, যাঁহার যেমন ধারণা, তিনি সেই মতই পূজা করিবেন। মহাদেবের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কেবল তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে চলিলে লোকের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। মহাদেব ইহাও বলিয়াছেন যে, কলিকালে তন্ত্র শাস্ত্র-উক্ত পথ ব্যতিরেকে লোকের গতি নাই (মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র, দ্বিতীয় উল্লাস)। এই আদেশটী দ্বিজ এবং শূদ্র সকলেরই অবলম্বনীয়। এখন দেখা যাউক যে কেবল মাত্র তন্ত্র হইতে গ্রহণ করিলে উল্লিখিত শাস্ত্র সংগ্রহের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করা যায় কি না? আমরা তৃতীয় ভাগের উল্লেখ করিলাম না, কারণ তাহা স্মৃতি শাস্ত্র সকল হইতে সঙ্কলিত হওয়া উচিত। মহাদেব বলিয়াছেন যে, আগম শাস্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। অতএব এই তন্ত্রে কি প্রকার উপদেশ আছে, তাহা আমরা আলোচনা করিব। এই তন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসে এই স্তোত্রটী আছে :—

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্ব-লোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥ ৫৯
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥ ৬০
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্॥ ৬১
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥ ৬২
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৬৩

অর্থাৎ—"তুমি নিত্য, তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি জ্ঞানস্বরূপ; বিশ্বের আত্মা স্বরূপ, অদ্বৈত-তত্ত্ব মুক্তিদাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমি একমাত্র শরণ্য অর্থাৎ আশ্রয়, তুমি অদ্বিতীয় বরণীয়, তুমি একমাত্র জগতের কারণ, তুমি বিশ্বরূপ, একমাত্র তুমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা এবং অন্তে সংহার কর্ত্তা, তুমি এক মাত্র পরম পুরুষ, নিশ্চল ও নানাবিধ কল্পনা-শূন্য, তুমি ভয়ের ভয়, তুমি ভয়ানকের ভয়ানক, তুমি পাপী-দিগের একমাত্র গতি এবং পাবনের পাবন। তুমি উচ্চ পদাধিষ্ঠিত ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতির নিয়ামক, তুমি শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ

দিগের রক্ষক। হে পরেশ, হে প্রভো, তুমি সর্ব্বরূপ, অবিনাশী, অনির্দ্দেশ্য এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য, কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহ। হে সত্যস্বরূপ, হে অচিন্ত্য, হে অক্ষয়, হে ব্যাপক, হে অব্যক্ত তত্ত্ব, হে জগদ্ভাসকাধীশ অথবা হে জগদ্ভাসক, হে অধীশ, তুমি আমাদিগকে অপার হইতে রক্ষা কর। সেই একমাত্র ব্রহ্মকে আমরা স্মরণ করি, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আমরা জপ করি, সেই এক জগৎ সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্মকে আমরা প্রণাম করি। সেই তুমি সৎ একমাত্র জগতের বিধান অর্থাৎ আশ্রয়-ভুক্ত, স্বয়ং নিরালম্ব অর্থাৎ আশ্রয় শূন্য; সেই তুমি ঈশ্বর, ভবসমুদ্রের পোত-স্বরূপ। আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।”

এই উল্লাসে লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম মন্ত্রই সকল মন্ত্রের সার, এবং এই মন্ত্রের উপাসকগণের অন্য সাধনের প্রয়োজন নাই। ইহাতে আরো লিখিত আছে যে, এই মন্ত্র গ্রহণে তিথি, নক্ষত্র, রাশি প্রভৃতি গণনার নিয়ম নাই, এবং এই মন্ত্রের উপাসককে দশবিধ সংস্কার করিতে হয় না। ব্রহ্মমন্ত্রটী এই:—“ওঁ সৎ ওঁ চিৎ ওঁ একং ওঁ ব্রহ্ম”। এই মন্ত্রের উপাসনা সম্বন্ধে এই প্রকার বিধি:—উপাসককে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং স্বায়ংকালে উপযুক্ত স্থলে এবং যথোচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করত একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। গায়ত্রীটী এই:—পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ। পরে “ব্রহ্মার্পণ মন্ত্র” বলিয়া জপ সমর্পণ করত এই প্রকারে প্রণাম করিতে হইবে:—ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে। নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমোনমঃ॥ ৩।৭৪

এই ব্রহ্মমন্ত্রে সকলেরই অধিকার আছে। যথা—শাক্তাঃ শৈব বৈষ্ণবাশ্চ সৌরাগাণপত্যাস্তথা। বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥ ৩।১৪২॥ অর্থাৎ—শাক্ত হউক, বা শৈব হউক, বৈষ্ণব হউক, বা সৌর হউক, অথবা গাণপত্য হউক, বিপ্র হউক কিম্বা অন্য কোন জাতীয় হউক, সকলেই এই মন্ত্রে অধিকারী। রমণী পর্য্যন্তও এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। যথা—পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৄন্ পতিঃস্ত্রিয়মা মাতুলো ভাগিনেয়াংশ্চ নপ্তৄন্ মাতামহোঽপিচ॥ ৩।১৪৭॥ অর্থাৎ পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে এবং মাতামহ দৌহিত্রকে এই মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন। ব্রহ্ম মন্ত্রের সাধকের কোন অনুষ্ঠান বা আচারের প্রয়োজন নাই। যথা—কিং তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিম্। ব্রহ্ম নিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৩।৯৭॥ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী বৈদিকাচারেই বা প্রয়োজন কি, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেই বা আবশ্যক কি? তাঁহার পক্ষে স্বেচ্ছাচারই বিধি-রূপে কথিত হইয়াছে। ইহার অভি-প্রায় এরূপ নহে যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অত্যাচার করিবেন। তাঁহার স্বভাব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই প্রকার বিবৃত হইয়াছে:—

অস্মিন্ ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ॥ ৩।৯৯

মাৎসর্য্যহীনোঽদম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধ মানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবন তৎপরঃ॥১০০

ব্রহ্ম শ্রোতা ব্রহ্ম মন্তা ব্রহ্মান্বেষণ মানসঃ।
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্॥১০১

নহিংস্যা ভাবনং কুর্য্যান্ন পরানিষ্টচিন্তনম্।
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১০২
তৎসদিতি বদেদ্দেবী প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
ব্রহ্মার্পণমস্তু বাক্যং পানভোজন কর্ম্মণোঃ॥ ১০৩
যেনোপায়েনমর্ত্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিদ্ধ্যতি।
তদেবকার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্মং সনাতনম্॥ ১০৪

অর্থাৎ হে মহেশ্বরি! এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকার-পরায়ণ, নির্ব্বিকার-চিত্ত ও সদাশয় হওয়া আবশ্যক। যিনি ইহার অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি মাৎসর্য্য-বিহীন, দম্ভ-রহিত, দয়ালু, বিশুদ্ধ-চেতা, মাতাপিতার প্রিয় কার্য্য সাধন ও তাঁহাদের সেবায় তৎপর হইবেন। তিনি ব্রহ্ম-বিষয়ক বাক্য শ্রবণ ও ব্রহ্মচিন্তা করিবেন এবং ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইবেন। তিনি সংযত-চিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইবেন এবং ব্রহ্মের বিদ্যমানতা ভাবনা করিবেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কখন মিথ্যা কথা কহিবেন না, পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না এবং পরস্ত্রী গমন করিবেন না। হে দেবি! তিনি সকল কর্ম্মের আরম্ভে "তৎ সৎ" উচ্চারণ করিবেন এবং পান ভোজনাদি করিবার সময়ে "ব্রহ্মার্পণ মস্তু" বলিবেন। যে উপায়ের দ্বারা মনুষ্যগণের উত্তমরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির তাহাই করা উচিত। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

ঈশ্বরের নিরাকার ভাব ধারণা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া, এই তন্ত্রে সাকার উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ত্রয়োদশ উল্লাসে, পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, মূল প্রকৃতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, অতএব আপনি যে মহাকালীর পূজার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা কি প্রকারে সমাধা হইতে পারে? ঘট পটাদিরই রূপ আছে, কিন্তু মহাকালীর রূপ থাকা কি প্রকারে সম্ভব? ইহার প্রত্যুত্তরে মহাদেব বলিতেছেন;—

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণ ক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্॥ ১৩।১
শ্বেত পীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে॥ ৫
অতস্তস্যাঃ কালশক্তে র্নিগুর্ণায়া নিরাকৃতে।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ॥ ৬
নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশি চিহ্নং নিরূপিতম্॥ ৭
শশি সূর্য্যাগ্নিভির্নিত্যৈরখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্॥ ৮
গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং কালরূপেণ চর্ব্বণাৎ।
তদ্রক্তসঙ্ঘো দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাষিতম্॥ ৯
সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্ব স্ব কার্য্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্॥ ১০
রজোজনিত বিশ্বানি বিষ্টভ্য পবিতিষ্ঠতি।
অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা॥ ১১
ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্।
পশ্যন্তী চিন্ময়ী দেবী সর্ব্বাসাক্ষিস্বরূপিণী॥ ১২
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥ ১৩

অর্থাৎ, হে প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। হে শৈলজে! যেমন শ্বেত, পীত প্রভৃতি বর্ণ কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেই প্রকার সর্ব্বভূতই কালীতে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই সেই নির্গুণা নিরাকারা যোগীজনের হিতকারিণী কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। নিত্যা, কালরূপা, অব্যয়া ও কল্যাণস্বরূপা কালীর ললাটে চন্দ্রমা, চিহ্ন অমৃত প্রযুক্ত কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার তিনটী নয়ন কল্পিত হইবার কারণ এ[illegible]

শিত্য স্বরূপ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা কাল-সম্ভূত নিখিল জগৎ তিনি সন্দর্শন করেন। প্রাণী সকলকে গ্রাস করেন ও কাল দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করেন বলিয়া, সর্ব্ব প্রাণীর রুধির দেবীর রক্তবসন রূপে বর্ণিত হইয়াছে। হে শিবে! সময়ে সময়ে জীবগণকে বিপদ হইতে রক্ষা করা এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করা তাঁহার বর ও অভয় রূপে কথিত হইয়াছে। হে ভদ্রে! রজোগুণ-জনিত বিশ্বে অধিষ্টান করিতেছেন বলিয়া,তিনি রক্ত পদ্মাসনস্থিতা। সেই জ্ঞানস্বরূপা, সকলের সাক্ষী স্বরূপিনী মহাদেবী, মোহময়ী সুরাপান করত, ক্রীড়াকারী কাল-সম্ভূত জগৎকে দেখিতেছেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের হিতের জন্য, উপরোক্ত গুণানুসারে সেই দেবীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, তন্ত্র শাস্ত্রে, মনুষ্যের আপামর সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কি প্রকার উপদেশ সন্নিবেশিত আছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অষ্টম উল্লাসে মহাদেব পার্ব্বতীকে এতৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥ ২৩
ন মিথ্যা ভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ॥ ২৪
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ॥ ২৫

অর্থাৎ, গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হইবে। সে যে যে কর্ম্ম করিবে, সমুদায়ই ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে। গৃহী ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিবেনা, শঠতা করিবে না, এবং দেবতা ও অতিথি পূজায় তৎপর থাকিবে। সে মাতা পিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় জ্ঞান করত, প্রযত্ন সহকারে, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সেবা করিবে।

গৃহস্তো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষধর্ম্ম সনাতনঃ॥ ৩৫
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃত ভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ না প্রিয়ং কচিদাচরেৎ॥ ৪২
অজ্ঞাত পতিমর্য্যাদামজ্ঞাত পতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাত ধর্ম্মশাসনাম্॥ ১০৭

অর্থাৎ গৃহস্থ দারাকে রক্ষা করিবে, পুত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিবে—এবং আত্মীয় বন্ধুগণকে পোষণ করিবে—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। সে ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাহার স্ত্রীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিবে, কখন তাহার অপ্রিয় আচরণ করিবে না। যে বালা পতিমর্য্যাদা জানে না, পতিসেবা করিতে পারে না, এবং ধর্ম্মশাসনে অনভিজ্ঞা, পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।

চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্‌বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥ ৪৫
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েদ্ গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তাং স্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ॥ ৪৬
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায়বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা॥ ৪৭
এবং ক্রমেণ ভ্রাতৄংশ্চ স্বস্ব ভ্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্‌গৃহী॥ ৪৮
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ॥ ৪৯

অর্থাৎ পিতা চারিবৎসর পর্য্যন্ত পুত্রের লালন পালন করিবে। তদনন্তর ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সকলগুণ শিক্ষা করাইবে। ইহার পর, পুত্র বিংশতি বৎসরের অধিক হইল তাহাকে গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। পরে তাহাকে আত্ম তুল্য বোধ করিয়া স্নেহপ্রদর্শন করিবে।

কন্যাকেও এই প্রকারে পালন করিবে এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে। পরে তাহাকে ধন রত্নে সমন্বিতা করিয়া জ্ঞানবান্ পাত্রকে সমর্পণ করিবে। গৃহীব্যক্তি, এই প্রকারে ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতষ্পুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যগণকে পালন করিবে, এবং তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। তদনন্তর গৃহস্থ স্বধর্ম্ম-নিরত একগ্রামবাসী এবং অভ্যাগত ও উদাসীনদিগকে প্রতিপালন করিবে।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কাম ক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৫
বিরক্তং পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৬

অর্থাৎ সত্য যাহার ব্রত, যাহার সর্ব্বদা দীনের প্রতি দয়া আছে, এবং কাম ও ক্রোধ যাহার বশীভুত, সেইব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে বিরক্ত, পরবস্তুতে যাহার অভিলাষ নাই, এবং যে জন দম্ভ ও মাৎসর্য্য বিহীন, তাঁহা কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার পূজার পদ্ধতি এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে কয়েকটী উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় সকলের উপলব্ধি হইবে যে, প্রস্তাবিত শাস্ত্র সংগ্রহের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ তন্ত্রশাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করা যাইতে পারে। এই সংগ্রহের তৃতীয় ভাগ সঙ্কলনে বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক। সহবান সম্মতীয় আইন লইয়া যে আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, শাস্ত্রীয় বিধি সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয়দের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। অতএব সকল সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া এরূপ ব্যবস্থা সকল সংগ্রহ করা আবশ্যক, যাহা হিন্দু মণ্ডলীর অনুমোদনীয় হইতে পারে। এ প্রকার হইলে আমাদের রাজপুরুষগণও বুঝিতে পারিবেন যে, এই শাস্ত্র সংগ্রহ আমাদের প্রকৃত ব্যবস্থা শাস্ত্র, এবং তাঁহারাও ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সক্ষম হইবেন না। আমাদের শাস্ত্রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং অত্যাচারীর শাসন সম্বন্ধে অনেক ব্যবস্থা আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নহে; ইহার অন্তর্গত কয়েকটী রহিত হইয়াছে, এবং আরো যে গুলি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, সে সকল পরিত্যাগ করা উচিত। প্রায়শ্চিত্তের জন্য কঠোর শাসন বাঞ্ছনীয় নহে। মনুসংহিতা একাদশ অধ্যায়ে পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে এই প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে।

যথা যথা নরোঽধর্ম্মং স্বয়ং কৃত্বানুভাষতে।
তথা তথা ত্বচেবাহিস্তেনা ধর্ম্মেণ মুচ্যতে ॥ ২২৯
যথা যথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম্ম গর্হতি।
তথা তথা শরীরং তৎ তেনোধর্ম্মেণ মুচ্যতে ॥ ২৩০
কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পা[illegible]ৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাৎ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা [illegible]তে তু সঃ ॥ ২৩১

অর্থাৎ অধর্ম্ম করিয়া যে ব্যক্তি তাহা লোকের সমক্ষে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, সর্প যেমন ত্বক হইতে মুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও সেইরূপ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। আর যে পরিমাণে পাপ করিয়া মন্দ মন্দ কার্য্যকে নিন্দা করিতে থাকে, সেই পরিমাণে সে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পাপ করিয়া সন্তাপ উপস্থিত হইলে, সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। আর, পুনরায় এরূপ করিব না,

এই বলিয়া মন্দ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলে সে ব্যক্তি কৃতপাপ হইতে মুক্ত হয়।

এই প্রকার উদার ভাব অবলম্বন করত ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণয়ন করিলে, তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত হইবে, সন্দেহ নাই। ফল কথা এই যে, বিজ্ঞ মণ্ডলীর সমক্ষে যে ব্যক্তি নিজ কৃত পাপ স্বীকার করিবে এবং পুনরায় তাহা করিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবে, সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করা সমাজের কর্ত্তব্য। ইহা অপেক্ষা ভদ্রলোকের পক্ষে কঠিন শাসন আর কি হইতে পারে? তবে যাহারা অতিশয় কদাচারী, উল্লিখিত প্রতিজ্ঞা করিয়াও যাহারা মন্দকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহাদিগকে প্রথমে অল্প সময়ের জন্য সমাজচ্যুত করা কর্ত্তব্য, এবং তাহাতেও কোন ফল না দর্শিলে একেবারে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

আমরা এই প্রস্তাবটী হিন্দুমণ্ডলীর সমক্ষে ধারণ করিলাম। আশা করি যে, বাঙ্গালা দেশের ধর্ম্ম সভা সকল প্রস্তাবিত বিষয় লইয়া আলোচনা করিবেন, এবং যদ্যপি ইহাকে কার্য্যে পরিণত করা পরামর্শ-সিদ্ধ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে কয়েক জন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া, তাঁহাদের উপর শাস্ত্র সংগ্রহের ভার অর্পণ করিবেন।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪৮)

বারাণশীধামে সনাতন শিক্ষা।

সনাতন বলিলেন, আমি যে অস্পৃশ্য যবন।

শ্রীচৈতন্য। চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয় না। শ্বপচ ম্লেচ্ছও ভক্তিবলে ভগবানের প্রিয় অন্তরঙ্গ হইতে পারেন। দ্বাদশগুণ-যুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁহারা কোটিগুণে শ্রেষ্ট।

সনাতন। আমি ত আর ভক্ত নই, আমি যে মহাপাপী।

শ্রীচৈতন্য। তা আমি বুঝিয়া লইব। কিন্তু সনাতন, দেখ কৃষ্ণ কেমন দয়াময়। তোমাকে মহা রৌরব হইতে তুলিয়া আনি-লেন। ধন্য শ্রীহরি! তোমার কৃপাই ধন্য। অপার গভীর তব কৃপার মহিমা আমি কি বুঝি।

সনাতন। আমি শ্রীকৃষ্ণ জানি না। তোমার কৃপাবলেই সংসারসাগর পার হইলাম, এই জানি।

তখন শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া কারামুক্তি পাইলে? সনা-তন আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে গৌর বলিলেন—'তোমার ভাই রূপ ও অনুপমের সঙ্গে আমার প্রয়াগে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও কতক দিন তাঁহাদের সঙ্গে একত্র ছিলাম। এখন তাঁহারা বৃন্দাবন ভ্রমণে গিয়াছেন। তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় করিয়া দিয়া শ্রীচৈতন্য চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, এখন ইহাকে ক্ষৌর ও স্নান করাইয়া ভদ্রবেশ করাইয়া দাও। দরবেশ-বেশ ভাল লাগে না। সনাতন গঙ্গাস্নান

করিয়া আসিলে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে নূতন বস্ত্র দিলেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না, তপন মিশ্রের নিকটে এক পুরাতন ধুতি চাহিয়া লইয়া দুইখণ্ড করিয়া কৌপীন বহির্ব্বাস করিয়া পরিলেন। সেদিন তপন মিশ্রের গৃহে সকলের ভোজন হইল, সনাতন শ্রীচৈতন্যের শেষ প্রসাদ পাইলেন। অপরাহ্নে মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় হইলে সে গোঁসাইকে মহানিমন্ত্রণ করিলেন, অর্থাৎ যাবৎ সনাতন কাশীপুরে থাকিবেন, তাবৎ তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিবেন, এই নিমন্ত্রণ করিলেন। সনাতন তাহা স্বীকার না করিয়া মাধুকরী করিয়া উদর পোষণ করিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রী পথের ভিখারী হইলেন। শ্রীচৈতন্য সনাতনের কঠোর বৈরাগ্য দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহার গায়ের বহুমূল্য ভোটকম্বল দেখিয়া মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট থাকিলেন। সনাতন তাহা বুঝিতে পারিয়া একদিন গঙ্গাস্নানে যাইয়া একজন দুঃখী কাঙ্গালীকে কম্বলখানি দিয়া তাঁহার ছেঁড়া কাঁথা লইয়া অঙ্গাবৃত করিয়া চৈতন্যের নিকটে আসিলেন। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার ভোটকম্বল কোথায়?' সনাতন আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে গৌর বলিলেন—'উহা আমি বুঝিয়াছি। ভগবান্ তোমার বিষয়-রোগ ঘুচাইয়া শেষ ভোগ কেন রাখিবেন! সদ্বৈদ্য রোগের চিকিৎসা করিয়া কি রোগ শেষ রাখিয়া দেন? মূল্যবান্ কম্বল গায়ে মাধুকরী করা কি উপহাসের বিষয় নয়? সনাতন বিনীতভাবে বলিলেন, তোমার কৃপায় যে আমার কুবিষয় ভোগের শেষ ইচ্ছাটুকু গিয়াছে, ইহাতে কৃতার্থ হইলাম।

ক্রমে ভগবৎ কৃপায় সনাতনের তত্ত্বজিজ্ঞাসা স্ফুরিতে লাগিল। দিনে দিনে তিনি শ্রীচৈতন্যকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য পাঁচ সাত দিনমাত্র কাশীতে থাকিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু সনাতনের প্রশ্ন মীমাংসায় ও সৎপ্রসঙ্গে দুই মাস কাটিয়া গেল। সনাতনের জিজ্ঞাসা ও শ্রীচৈতন্যের মীমাংসা বৈষ্ণব সমাজে 'সনাতন শিক্ষা' নামে মহা সম্মানিত। পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে শ্রীচৈতন্যে দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব বিষয়ে যে উপদেশ দেন, রামানন্দ রায়ের নিকট শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা-তত্ত্ব যাহা শ্রবণ করেন ও প্রয়াগে শ্রীরূপকে ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে সে শিক্ষা দেন, সেই সকল তত্ত্ব ও ব্রহ্মবিচার প্রভৃতি বিষয় তিনি সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ষট্ সন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে পরবর্ত্তী সময়ে রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী অতি বিস্তৃতরূপে এই সকল তত্ত্ব সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষিপ্তভাবে সনাতন শিক্ষার বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠকগণ দেখিবেন, এই শিক্ষায় চারিটী বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে। প্রথমতঃ তত্ত্ববিচার ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, দ্বিতীয়তঃ জীবতত্ত্ব; তৃতীয়তঃ জীবের কর্ত্তব্য কি? ও চতুর্থতঃ জীবের প্রাপ্য কি? জীবের কর্ত্তব্য ভগবানে ভক্তি করা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ইহাতে আনুষঙ্গিকরূপে জ্ঞানকর্ম্মাদির গৌণত্ব ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, তাহার মধ্যে আবার রাগানুগা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবের প্রাপ্য ভগবৎপ্রেম; উহা মুক্ত্যাদি চতুর্ব্বর্গ হইতেও লোভনীয়। বৈষ্ণব গ্রন্থে এই চারি বিষয়কে সাধ্য, সম্বন্ধ, অভিধেয়,

ও প্রয়োজন নামে অভিহিত করা হইয়াছে; আমরাও যথাসাধ্য ঐ ভাষা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।

সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের চরণ ধরিয়া দৈন্য বিনয় করিয়া বলিলেন, আমি নীচ জাতি, নীচ সঙ্গীতে ও নীচ কর্ম্মে দুর্ল্লভ মানব জীবন বৃথা নষ্ট করিয়াছি, যদি কৃপা করিয়া কুবিষয় গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছ, তবে আমার কর্ত্তব্য কি, বলিয়া দাও। আমি কে? কি জন্য সংসারে আসিয়াছি? আমাকে কেনই বা ত্রিতাপে জর্জ্জরিত করিতেছে? কিসে আমার মঙ্গল হইবে, আমার প্রাপ্যবস্তুই বা কি? ও আশ্রয়-দাতাই বা কে? এই সব প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া আমার উপকার কর। শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন-'শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা তোমার উপর। তুমি সকল তত্ত্বই জান। তোমাকে কি ত্রিতাপ ক্লেশ দিতে পারে? তুমি ভগবানের শক্তি ধর। সাধু জনের স্বভাবই এই, সমুদায় জানিয়াও দৃঢ় নিশ্চয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আচ্ছা আমি একে একে সব তত্ত্ব বলিয়া যাইতেছি, তুমি শুনিয়া যাও। জগতে ভক্তি প্রবর্ত্তন করিতে তুমিই যথার্থ যোগ্য পাত্র। তোমার নিকট এ সব কথা বলিব না তো আর কাহাকে বলিব! প্রথমে তত্ত্ব বিচার বলিতেছি, শ্রবণ কর :—

তত্ত্ববিচার ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

এক অখণ্ড, অব্যয় জ্ঞান বস্তুকেই তত্ত্ব বলা যায়। তিনিই সৃষ্ট্যাদির আদিকারণ, তাঁহার কারণ কেহ নাই। তাঁহার সত্ত্বাতেই জগতের সত্ত্বা, তিনি না থাকিলে কিছুই থাকে না। তাঁহার তুল্যও কেহ নাই, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। তিনি শুদ্ধ, আনন্দ, চিন্ময়। শ্রুতি সকল তাঁহার কথা উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া ও বলিয়া শেষ করিতে পারে নাই। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সকলের আশ্রয় ও কিশোর শেখর রসরাজ মূর্ত্তি। আমি তাঁহাকেই ব্রজের ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছি। এই তত্ত্ব বস্তুর অনন্ত প্রকাশের মধ্যে তিনটী মুখ্য প্রকাশ আছে। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্। ব্রহ্মস্বরূপ নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময়; ইনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তি। অনন্ত বিশ্বসৃষ্টিতে যে জ্যোতি প্রকাশিত, ইহা ব্রহ্মজ্যোতির ছায়া মাত্র। তাঁহার সত্যেতে সকলই সত্যবৎ প্রতীয়-মান্; বস্তুতঃ চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, কি অগ্নি কিছুরই দ্বারা সে জ্যোতি প্রকাশ হইবার নহে। একমাত্র বিশুদ্ধ তত্ত্ব জ্ঞানে কিঞ্চিন্মাত্র বুঝা যায়। নির্ব্বিশেষ উপাসক-গণ জ্ঞানমার্গে এই ব্রহ্ম জ্যোতিতে আনন্দে নিমগ্ন থাকেন। দ্বিতীয় পরমাত্মা। ইনি চৈতন্যময় অন্তর্যামী, অন্তরতর, অন্তরতম। হিরণ্ময়ে পরে কোষে ইঁহাকে ধ্যান করিয়া যোগীগণ নিমীলিত চক্ষে যুগযুগান্ত কাটা-ইয়া দেন। তৃতীয় ভগবান্, ইনি লীলা-বিগ্রহ। দীপশিখা হইতে যেমন তত্তুল্য দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনি ইনি কৃষ্ণের একদৈশিক প্রকাশ হইয়াও কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। লীলা ভিন্ন ভক্তি চরিতার্থের স্থান নাই। সুতরাং কেবল ভক্তি যোগেই ভগবানের বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রতীয়মান্ হইয়া থাকে। অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁহার তিনটী অবস্থা প্রধান। স্বয়ংরূপ, তদেকাত্ম রূপ ও আবেশরূপ। আনন্দঘন ও প্রেম-ঘন ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ং রূপ *। শ্রীবৃন্দা-

* বিশেষ ব্যাখ্যা রামানন্দ উৎসবে ১২৯৭ সালের পৌষমাসের নব্যভারতে ৪৮৬ পৃঃ দেখ।

বনে লীলাপ্রকাশ যোগমায়ার সাহায্যে কেবল ভক্তকে সুখদিবার জন্য; নইলে এইরূপ নিত্যলীলায় নিত্যপ্রকাশ; কখন ইহার অপ্রকটাবস্থা নাই। এই রূপ অনাদি সিদ্ধ। যে উপায়ে ইহা আস্বাদন করা যাইতে পারে, তাহা পরে বলিব। স্বয়ং রূপ দুইভাবে প্রকাশ হয়। তাহার নাম প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাস। প্রাভব-বিলাসে একই বিগ্রহ বহুস্থানে বহু পরিমাণে লক্ষিত হয়; যেমন রাসমণ্ডলে। বৈভব-বিলাসে সেই বিগ্রহ বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যেমন বলরামাদি। ভগবদাত্মায় অনুপ্রাণিত, অথচ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং রূপ হইতে বিভিন্ন রূপের নাম তদেকাত্ম রূপ। ইহার দুইটী প্রকার ভেদ, বিলাস ও স্বাংশ। তাহার মধ্যে বিলাস রূপের আবার বিলাস প্রকাশ ভেদে অনন্ত রূপ-বৈচিত্র্য প্রকটিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই চারিটী প্রধান। ইহাদিগকে ব্যূহতত্ত্ব বলে। বাসুদেব অর্থাৎ সৃষ্টিলীলার আদি সূক্ষ্ম চিত্তত্ত্ব, সঙ্কর্ষণ অহঙ্কার তত্ত্ব (Individuality), প্রদ্যুম্ন কাম অর্থাৎ প্রেমতত্ত্ব ও অনিরুদ্ধ লীলাতত্ত্ব। এই চারিতত্ত্বের সহিত জড় সৃষ্টির কোন সংশ্রব নাই। ইহা মায়াতীত ধামে ভগবানের লীলাতত্ত্ব রূপে বিলসিত হইতেছে। স্বাংশ-বিলাসে ভগবৎস্বরূপ অন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার প্রধান। যেমন উপক্ষয়শূন্য জলধি হইতে কোটি কোটি ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ বহির্গত হইয়া থাকে, তেমনি স্বত্বনিধি ভগবান্ হইতে অসংখ্য অবতার এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে। সনাতন, লীলাময় ভগবানের অবতারের কথা কি বলিব? কেহ কেহ বলে, জড়রূপা প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি রাজ্যের প্রকাশ। ইহা মূর্খের কথা। অন্ধ জড়শক্তির এমন কি ক্ষমতা আছে যে, সর্ব্বসৌন্দর্য্য, সর্ব্ব সুকৌশলপূর্ণ এই অতুলনীয় বিশ্বসৃষ্টি প্রকাশ করিতে পারে? অগ্নির শক্তিতে উত্তপ্ত হইয়া লৌহ যেমন দাহিকা শক্তিলাভ করিয়া থাকে; তেমনি জড়ই বল আর পরমাণুই বল বা প্রধানা-প্রকৃতিই বল, ঈশ্বর-শক্তিতে অনুপ্রাণিত না হইলে তাহার সাধ্য কি যে সৃষ্টি প্রকাশ করিবে? স্থূলদর্শী লোক তলাইয়া না দেখিয়াই জড়প্রকৃতিকে আদিকারণ বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছে। অনন্ত শক্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের তিনশক্তি প্রধান, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাসুদেব জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা, সঙ্কর্ষণ ক্রিয়া ও ইচ্ছার অধিষ্ঠাতা। সঙ্কর্ষণ শক্তিতেই সমস্ত সৃষ্টিলীলা প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপে যে সকল শক্তি প্রপঞ্চরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদেরই সাধারণ নাম অবতার। বিশ্বে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সে সকলই পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণবক্ষে লুক্কায়িত ছিল। এই সব অবতারের মধ্যে পুরুষাবতার তিন। কারণাব্ধিশায়ী প্রথম পুরুষ; গর্ভোদকশায়ী বা দ্বিতীয়পুরুষ। বেদে ইহাকে কখন হিরণ্য গর্ভ, সর্ব্বান্তর্যামী ও কখন সহস্রশীর্ষা পুরুষ বলিয়াছেন। তৃতীয় ক্ষীরোদকশায়ী বা মহাবিষ্ণু। ইনি পুরুষাবতার ও গুণাবতার উভয় শ্রেণীর মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। বিশ্বের আদিকারণে অবস্থিত চৈতন্যাংশের নাম কারণাব্ধিশায়ী। এই কারণকে ভগবানের

সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছা অথবা মায়া বলা যায়। মায়াই জগতের নিমিত্ত কারণ; তদ্ভিন্ন ইহার আর একটী বৃত্তি আছে, যাহার নাম প্রধান বা উপাদান কারণ। কুম্ভকারের ইচ্ছা ঘটের নিমিত্ত কারণ, আর দণ্ডমৃত্তিকাদি উপাদান কারণ। কিন্তু জগৎস্রষ্টার ইচ্ছাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ হেতু। অর্থাৎ তিনি বিনা উপাদানে কেবল ইচ্ছামাত্রে এই বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন। এই ইচ্ছা বা মায়ার অভ্যন্তরে যে পুরুষ অর্থাৎ ভগবত্ব অবস্থিত, তিনি স্বয়ং মায়াতীত হইয়াও সমুদায় মায়ার প্রবর্ত্তক। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টিবিষয়ক চৈতন্যাংশ অপূর্ণ হইলেও অপূর্ণতাজনিত অসত্য বা ভ্রান্তি জ্ঞান তাঁহাতে থাকিতে পারে না। কেননা উহা পূর্ণ পুরুষের সহিত অখণ্ডরূপে সংযুক্ত। ইনিই কারণাব্ধিশায়ী, ইহা হইতে মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে সমুদায় সৃষ্টি প্রকাশ হইয়াছে। ইনি কত বড় মহান্, তাহা এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যেমন গবাক্ষের দ্বারে ত্র্যসরেণু গমনাগমন করে, তেমনি এই পুরুষের নাসারন্ধ্র দিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন ও লয় পাইতেছে। কত কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইহার রচিত ব্রহ্মাণ্ডনিচয় শাসন করিতেছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিসমষ্টির অভ্যন্তরে পুরুষরূপী যে ভগবদংশ স্থিতি করিতেছেন, তিনি দ্বিতীয় পুরুষ। আর যে বিরাট্ পুরুষ ব্যষ্টি জীবের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রত্যেকের সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ আদি বিধান করিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি তৃতীয় পুরুষ বা মহা বিষ্ণু নামে পরিচিত। এক্ষণে লীলাবতারের কথা বলি, শ্রবণ কর। লীলার জন্য ভগবানের অসংখ্য অবতার, তাহার মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, অশ্ব, নৃসিংহ, হংশ, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও দেবতাদি প্রধান স্রষ্টা স্বয়ং সৃষ্ট রূপে লীলা করিয়া থাকেন, এ অতি অদ্ভুত রহস্য। গুণাবতারের কথা শুন। রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণে অত্যল্প মাত্র চৈতন্যাংশ বিনিয়োগ করিয়া ভববান ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে যে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন, তাহারই নাম শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিষ্ণুকে পুরুষাবতার ও গুণাবতার উভয়ই বলা গিয়া থাকে। এখন মন্বন্তরাবতারের কথা শ্রবণ কর। ব্রহ্মার একদিনে ১৪ মন্বন্তর। তাহার এক এক মন্বন্তরে এক এক মন্বন্তরাধিপ, কাজেই ব্রহ্মার একদিনে ১৪টী মন্বন্তরাবতার হইয়া থাকে। ব্রহ্মার জীবন ব্রহ্ম পরিমাণে ১০০ বৎসর। অতএব ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার হয়। বুঝিয়া দেখ, মহাকাল নাথের মহাকালে কত অবতার। এক্ষণে যুগাবতারের কথা বলি, শুনিয়া যাও। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারিযুগ। এই যুগ চতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে ভগবান্ শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীত, এই চারিবর্ণ ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং অধর্ম্ম দূরীভূত করিয়া ধ্যান ধারণা, যাগযজ্ঞ, পূজা অর্চ্চনা ও নাম সঙ্কীর্ত্তন রূপ তত্তৎ যুগের যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। এইখানে সনাতন প্রশ্ন করিলেন, কলিযুগের অবতারকে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন।

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, অন্যান্য যুগের অবতার যেমন শাস্ত্রীয় লক্ষণ মিলাইয়া বুঝিতে হয়, কলিযুগের অবতারও তেমনি শাস্ত্রদ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। পণ্ডিতগণ

লক্ষণ বিচার করিয়া তাহা স্থির করিয়া যেন। অবতার নিজে কিছু 'আমি অবতার বলেন না। আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের মহাজনানুসরণ করাই কর্ত্তব্য।

সনাতন। কি কি লক্ষণে তাহা স্থির হইতে পারে ?

শ্রীচৈতন্য। স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ লক্ষণ; কার্য্যদ্বারা যে জ্ঞান, তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ।

সনাতন। আপনি বলিলেন, কলিযুগের অবতারের পীতবর্ণ; তিনি নাম প্রেম প্রচার করিবেন। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি কে ?

কূট রাজনীতি-বিশারদ রাজমন্ত্রী সনাতন তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য এতক্ষণ যে কৌশলজাল বিস্তার করিতেছিলেন, সরলবক্তা শ্রীচৈতন্য এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিয়া – 'হাসিয়া বলিলেন, সনাতন! চাতুরী ছাড় ; এখন শক্ত্যাবেশাবতারের কথা শুন।' যাহাতে ও যেখানে ভগবচ্ছক্তি স্ফুরিত হইয়াছে, তাহাই শক্ত্যাবেশাবতার। গৌণ ও মুখ্য ভেদে তাহা দুই প্রকার। যেখানে অত্যল্পমাত্র কৃষ্ণশক্তি প্রকাশ, তাহা গৌণ ও যেখানে জ্ঞানাদি বিশেষ বিশেষ শক্তি বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকট হয়, তাহা মুখ্যশক্ত্যাবেশ। সনকাদিতে জ্ঞান শক্তি, নারদে ভক্তি, পৃথুতে পালনশক্তি ও পরশুরামে দুষ্ট দমন-শক্তি ইত্যাদি প্রকাশিত বলিয়া তাঁহারা মুখ্যশক্ত্যাবেশান্তর্গত। এইরূপে লীলাবল্লময় শ্রীকৃষ্ণ অনন্তদেশে অনন্তকালে নিত্যলীলা করিতেছেন। সে লীলার আরম্ভও নাই, শেষও নাই, বিরামও নাই। জ্যোতিশ্চক্র যেমন অবিরাম মহাব্যোমে ঘুরিতেছে; কৃষ্ণলীলাও সেইরূপ অনাদিকাল হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন ব্রহ্মাণ্ড নাই, যেখানে কোন না কোন লীলা সংঘটিত হইতেছে না। তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাই পূর্ণতম, তিনি সেখানে পূর্ণতমরূপে বিরাজিত। তদ্ভিন্ন অন্যত্রে তাঁহার লীলা পূর্ণ ও পূর্ণতর শক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম। তাঁহার তত্ত্বস্বরূপ বিগ্রহের বিষয় কিছু বলুন।

শ্রীচৈতন্য রায়রামানন্দের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, সনাতনের প্রশ্নের উত্তরে তাহাই বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিলেন। পুনরুক্তি ভয়ে আমরা তাহা এখানে লিখিলাম না। পাঠক সেই অংশ রামানন্দ উপাখ্যানে পাঠ করিয়া লইবেন।

জীবতত্ত্ব ও সম্বন্ধ বিচার।

চৈতন্য বলিলেন, এক্ষণে জীবতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যেমন অখণ্ডচিৎ বা প্রভু চৈতন্য; জীব তেমনি তাঁহার অংশাংশ ক্ষুদ্র বা অনুচৈতন্য। একটী আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত। সত্বাগত উভয়ে এক হইলেও জীবের প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। অর্থাৎ তিনি মহান্ প্রভু; মায়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না; তিনি মায়ার অধীশ। আর জীব মায়ার দাস ও মায়াভিভূত; সর্ব্বদাই সে আপন দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছে। যতক্ষণ সে মায়াভিভূত, ততক্ষণ কৃষ্ণ যে তাহার প্রভু ও আশ্রয়, তাহা বুঝিতে পারে না, বা ভুলিয়া যায়। মায়া ছাড়িতে পারিলেই সে স্বীয়স্বরূপ ও সম্বন্ধ বুঝিতে পারে।

সনাতন বলিলেন, এই মায়া বস্তুটা কি ?

মায়ার প্রবর্ত্তক কে? ও জীব মায়াভিভূতই বা হয় কেন?

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন,—শাস্ত্রকারেরা মায়ার অনেক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও করিতে গিয়া মায়া সম্বন্ধে এতই মতভেদ ও গোলোযোগ করিয়াছেন যে, সহসা তাহা হইতে তত্ত্বনির্ব্বাচন করা বড় কঠিন ব্যাপার। মায়ার সাধারণ অর্থ ভ্রান্তিজ্ঞান; যাহা যা নয়, তাহাকে তাই জ্ঞান করা। যেমন শরীরে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইয়া ঈশ্বর হইতে আমি স্বতন্ত্র এই জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, এই ভ্রম জ্ঞানের প্রবর্ত্তক কে? ঈশ্বর? না—তা বলিতে পারি না। যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি, পরম কারুণিক, তিনি কেন ইচ্ছা করিয়া মানুষকে ভ্রমে ফেলাইবেন? তবে কথা এই, পূর্ণপুরুষ পূর্ণশক্তিতে বিশ্ব সৃজন করেন নাই। এই লীলাকে এইরূপ করিবার জন্য যতটুকু শক্তিই বল আর ইচ্ছাই বল, প্রয়োজন ছিল, বিনিয়োগ করিয়াছেন মাত্র। এবং মানুষকে স্বাধীনভাবে শ্রেয়োমার্গে চলিবার জন্য উপদেষ্টা, শাস্ত্র ও বিবেক দিয়াছেন; মানুষ যদি জানিয়া শুনিয়া গুরূপদেশ, শাস্ত্র বাক্য ও আত্মা বা বিবেকের কথা না শুনিয়া মোহের পথে যাইতে চায়, সে কার দোষ? মানুষের দোষ নয় কি? তবেই দেখ, মায়ার প্রবর্ত্তক মানুষ নিজেই কি না?

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ণ পুরুষ অপূর্ণ শক্তিতে সৃষ্টিলীলা না করিলে ত মায়ার উৎপত্তি সম্ভবিত না। এক হিসাবে তাঁহাকেই ত মায়ার প্রবর্ত্তক বলিতে হয়। শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, তা বটে; সৃষ্টিলীলাই ত মায়া বা অপূর্ণ শক্তির কার্য্য। কিন্তু সনাতন দেখ, কৃষ্ণ তথাপি কেমন দয়াময়। জীব তাঁহাকে চিরদিন ভুলিয়া না থাকে, এজন্য বেদপুরাণাদি অশেষ শাস্ত্র, শুক নারদ প্রভৃতি অগণ্য উপদেষ্টা দিয়াছেন ও সর্ব্বোপরি বিবেক শক্তিতে, চৈত্য গুরুরূপে স্বয়ং প্রতিনিয়ত প্রকাশমান থাকিয়া শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইতেছেন।

মনে কর কোন পিতা অনেক ধন ঘরে পুঁতিয়া রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। পুত্র তাহা না জানাতে খুব দারিদ্র্যে পড়িল। এমন সময় সর্ব্বজ্ঞ গণক আসিয়া তাহাকে বলিল যে, তাহার ঘরে পিতৃত্যক্ত অনেক ধন আছে। সেব্যক্তি তখন সমস্ত ঘর খুঁড়িয়া ধনের উদ্দেশ করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি পাইল না। তখন সেই দয়ালু দৈবজ্ঞ বলিল, "দক্ষিণ দিকে খুঁড়িওনা, ভীমরুল বোল্‌তা আছে, দংশন করিবে, পশ্চিমে যক্ষ আছে এবং উত্তরে কৃষ্ণ অজাগর আছে; পূর্ব্বদিকে অল্প মাটী তুলিলেই ধন পাইবে।' সেইরূপ সাধুগুরু ও শাস্ত্রের কৃপায় মানুষ জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগমার্গ ছাড়িয়া ভক্তি পথে গেলেই মায়া ছাড়িয়া অমূল্য প্রেমধন পাইয়া থাকে। যেমন ধন লাভের ফল সুখ ভোগ, তেমনি প্রেমের ফল কৃষ্ণ সম্ভোগ। মায়া-ত্যাগ প্রেমের সাক্ষাৎ ফল না হইলেও কৃষ্ণ সম্ভোগ সুখোদয়ে মায়া আপনি ছাড়িয়া যায়। অপূর্ণ শক্তির আধার জীবকে মায়ার দাস করিয়াও ভগবান্ তাহাকে উহা হইতে উত্তীর্ণ করিবার জন্য দয়া করিয়া কেমন উপায় সকল করিয়া দিয়াছেন। জীব অনুচৈতন্য ও কৃষ্ণদাস, সে যখন তাহার প্রভু চৈতন্যকে জানিতে পারে, তখনই তাহার সম্বন্ধ তত্ত্বের অভিজ্ঞতা জন্মায়।

মোটের উপর শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বিষয়

কথা এই দাঁড়াইতেছে যে, এক ভগবৎসত্বা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই সত্বা অদ্বয় জ্ঞানতত্ব, যে অবস্থায় তিনি মায়াতীত স্বরূপ শক্তিতে অবস্থিতি করেন, সেই অবস্থায় তিনি পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। যখন স্বাংশ শক্তিতে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহার নাম প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণাদি ব্যুহতত্ব ও নানা অবতারগণ। ইহারা মায়াতীত হইয়াও স্বরূপ শক্তির ন্যূনতা হেতু অপূর্ণ। আর যখন এই তত্ব বিভিন্নাংশ শক্তিতে অবস্থিতি করেন, তখনই তিনি জীব। এই জীব দুইপ্রকার, নিত্য মুক্ত; তাঁহারা কৃষ্ণের লীলার সহায় ও পারিষদ্। দ্বিতীয় বদ্ধজীব, মায়ার দাস। কৃষ্ণের কৃপায় সাধু ও শাস্ত্রের প্রসাদে ও চৈত্যগুরু বিবেকের উপদেশে ইহারা মায়া মুক্ত হইয়া ভক্তিলাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম পাইবার অধিকারী।

এখন বলি, মায়াও দুই প্রকার। পূর্ণ পুরুষ পূর্ণশক্তি সঙ্কোচ করিয়া স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে লীলা প্রকাশ করায় যে অপূর্ণ জ্ঞান জন্মে, তাহাকেও একপ্রকার মায়া বলা যাইতে পারে। এ মায়া জীবের সত্বাগত। ইহাতে জীব, ঈশ্বর হইতে অভিন্ন জানিয়াও আপনার ক্ষুদ্রত্ব ও সেবকত্ব অনুভব করে। ইহা জীব প্রকৃতি হইতে অপনীত হইবার নহে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মায়া জীবের স্বকর্ম্মার্জ্জিত। ইহাকে মোহ বা ভ্রমজ্ঞান বলা যাইতে পারে। ইহা শাস্ত্র, গুরু ও ভগবানের কৃপায় অপনীত হইলে জীব কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইয়া থাকে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

প্রেমানন্দের কবিতাবলী।

কেন ভালবাসি? (৪)

কেন এত ভালবাসি
প্রিয়তমে নাহি জানি,
মনে হয় প্রাণে পুরে
রাখি ওই মুখ খানি;
জানিনা বিধাতা হায়
গড়েছেন কোন্ ছাঁচে,
জগতের যত শোভা
সকলি ওমুখে আছে;
সরলতা কোমলতা
মধুরতা পবিত্রতা,
ঘনীভূত হয়ে সব
একত্র রয়েছে তথা;
মনে হয় দিবানিশি
অনিমেষে চেয়ে থাকি,
মনে হয় বুক চিরে
হৃদয়েতে ভরে রাখি!
কিছুতেই প্রিয়তমে
মিটিলনা এ পিপাসা,
কোথা তৃপ্তি কোথা শান্তি?
কেবলি কেবলি আশা!
প্রেমময়ি তোমার ঐ
মুখ পানে যবে চাই,
স্থূল দেহ—রক্ত মাংস
এ সকল ভুলে যাই,
কেবল রূপের ছটা
দেখি এ জগতময়,
আপনা ভুলিয়া হেরি
প্রাণ মন তুমি ময়;
তোমার রূপের পাছে
আছে যেই প্রেম—রূপ,

অনন্ত অনন্ত তাহা
অপরূপ অপরূপ !!
সে মহারূপের ছটা
অনন্ত আকাশময়,
সে রূপের প্রতিবিম্ব
রবি শশী সমুদয় ;
ধরাময় সেই রূপ
গিরি সিন্ধু বনস্থলে,
প্রস্তরে ভূস্তরে জলে
লতা পত্র ফুল ফলে ;
সে মহা জীবন্ত রূপ
প্রাণী রাজ্যে পরিব্যাপ্ত,
কোটী কবি কোটী কণ্ঠে
গায় সে রূপ মাহিম্য !
রূপ যে প্রেমের দেহ
প্রেম রূপ ভিন্ন নয়,
প্রেম যে রূপের প্রাণ
পরিব্যাপ্ত বিশ্বময় ;
প্রেমানুপ্রাণিত যাহা
এ জগতে তাই রূপ,
তোমার ও মুখচ্ছবি
সে প্রেমের প্রতিরূপ ;
গোষ্পদের জলে যথা
আকাশের ছবি খানি,
তোমার ও মুখে সেই
প্রেমরূপ দেখি আমি ;
অরুণ-কিরণ সম
তোমার মধুর হাসি,
প্রসন্ন নয়ন-কোণে
সুধাংশুর সুধারাশি ;
স্নেহের আবেগে তব
কম্পিত অধর যবে,
বসন্ত-মলয়ে যেন
নাচে এ জগতে সবে ;

মধুমাখা স্বরে প্রিয়ে
তুমি যবে গাও গান,
এক প্রাণে বিশ্ব যেন
ধরে তাতে একতান ;
অনন্ত অদৃশ্য লোকে
উঠে সে গীতের ধ্বনি,
অনন্ত সংগীত স্বর
প্রাণের মাঝারে শুনি !
বিশ্বরূপ প্রাণরূপ
প্রেমরূপ যেই হয়,
সে অরূপ রূপ আমি
সদা হেরি তুমি ময় ;
তোমার শ্রীকর হায়
ছুঁই যবে ধরি শিরে,
অনন্ত প্রেম-পরশে
ভেসে যাই আঁখিনীরে ;
তোমার চরণ-পদ্ম
বড় সাধে বক্ষে রাখি,
প্রেম-সরোবর-নীরে
শান্তিসুখে ডুবে থাকি !
মৃতসঞ্জীবনী তুমি
পবিত্র প্রেমের মূর্ত্তি,
তোমারে স্মরিতে পাই
মৃত প্রাণে কত স্ফূর্ত্তি ;
কেন এত ভালবাসি
জানি না ইহার হেতু,
এই মাত্র জানি তুমি
জীবনের সুখসেতু ;
তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান
তুমি প্রাণ তুমি আশা,
তুমি সুখ তুমি শান্তি,
আর নাহি জানে ভাষা !
অবসর নাহি প্রিয়ে
বুঝিতে এ প্রেমতত্ত্ব,

ভাবিতে পারি না, ভাবে
প্রাণ মন উনমত্ত !
এক দেহে হরগৌরী
সাজাইয়া ছিল যেই,
এ প্রেমের মর্ম্ম হায়
কিছু বুঝেছিল সেই ;
আপন প্রেমের ছবি
নিজ হস্তে নিরমিয়া,
দুখানি করিলা বিধি
এক প্রাণ দুই হিয়া ;
তুমি আধা আমি আধা
তাই প্রাণ তোমা চায়,
সিন্ধু ইরাবতী যেন
উভে উভ পানে ধায় ;
এস তবে প্রিয়তমে,
দুই জীবনের নদী
এক হতে জনমিয়া
আবার মিলিল যদি,
দেহ মন প্রাণ দিয়ে
দোঁহে এক হয়ে যাই,
অনন্ত প্রেমের সিন্ধু
চল তাঁর পানে ধাই ;
এক হয়ে ডুবি গিয়া
চিরশান্তি পারাবারে,
কেন ভালবাসি প্রিয়ে
বুঝিলে তো এইবারে ?

চোকের দেখা । (৫)

অনেক দিনের পরে প্রিয়ে
সে দিন তোমায় দেখেছিলেম,
নয়ন জলে বক্ষস্থলে
পদচিহ্ন একেঁছিলেম ;
প্রেম-নয়নে মুখের পানে
সেই যে তুমি চেয়েছিলে,
কোথা হতে নয়ন-পথে
না জানি কি ঢেলে দিলে ;
অবসন্ন হলো দেহ
স্থির হইল নয়ন-তারা,
আপ্‌নি আপ্‌নি বলেছিলেম
কি যেন পাগলের পারা ;
আত্মহারা হয়ে গেলেম
অচল হলো পা দুখানি,
প্রাণের মাঝে কি যে হলো
প্রাণ জানে আর আমি জানি !
উথলিয়া উঠ্‌লো হৃদয়
দেখে তোমার বদন-চাঁদ
আর খানিকটা হলে পরে
ভেঙ্গে যেতো বুকের বাঁধ !
দূরে থেকে চোকের দেখা
দেখেই যদি এমন হয়,
স্পর্শ হলে কি যে হতো
ভেবেই আমার হচ্ছে ভয় ।
কি আর হতো পাদুখান
যদি তোমার বক্ষে পেতেম,
প্রেমের ভরে শত খণ্ড
হয়ে না হয় ভেঙ্গে যেতেম ;
মাটির দেহ পড়ে থাক্‌তো
বেড়িয়ে যেতো অমর প্রাণ,
অমরলোকে গিয়ে আমি
গেতেম তোমার প্রেমের গান ।

শকাব্দ। (৩)

(নবম খণ্ড ৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

শাতবাহন বংশ।

(৭৭ খ্রীঃ পূঃ—২১৮ খ্রীঃ)

এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাবে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে,"শকাব্দ" (যাহাকে হিন্দুগণ শককাল বলিতেন) শালিবাহন রাজার প্রবর্ত্তিত অব্দ নহে * ; বরং উহা শাক জাতীয় নৃপতি বিশেষের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, (১ম) শকাব্দ যদি শক জাতির প্রবর্ত্তিত অব্দ হয়, তবে উহা শালিবাহনের নামে প্রচলিত হইল কিরূপে ? (২) শক জাতীয় বিখ্যাত ভূপতি কনিষ্ক যদি শকাব্দের প্রবর্ত্তক না হন, তবে শকাব্দের প্রকৃত প্রবর্ত্তক কে ? এই দুইটী প্রশ্নের মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে শালিবাহন সম্বন্ধে ও শালিবাহনের সময়ে মহারাষ্ট্রদেশের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। কারণ, শালিবাহনের প্রকৃত ইতিহাস ও মহারাষ্ট্রদেশের তাৎকালিক অবস্থা জ্ঞাত হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের মীমাংসা করিতে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। এই নিমিত্ত প্রথমে তদ্বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ইতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে কাশ্মীরাধিপতি শকজাতীয় ভূপতি কনিষ্ক শকাব্দের প্রবর্ত্তক নহেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকর শালিবাহনকেও শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ, তাঁহার মতে শালিবাহনের পৃথক অস্তিত্বই প্রমাণিত হয় না। তিনি বলেন, 'শালিবাহন' কোনও নৃপতি বিশেষের নাম নহে। 'ভোঁস্‌লে', 'প্রমার', 'চালুক্য',(চৌলুক্য), 'জাধব' (দেবগিরির যাদব) প্রভৃতির ন্যায় ইহাও একটী নাম। অধ্যাপক রাজারাম রামকৃষ্ণ বংশের ভাগবত মহোদয় এই মতের পোষকতা করিয়া বলেন যে, জেসলমীর ও ভাওনগরের নৃপতিগণ আপনাদিগকে শালিবাহন বংশজ বলিয়া পরিচয় দেন। ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরে শালিবাহন বংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। সে যাহা হউক, নাশিক ও নানাঘাট প্রভৃতি স্থলের প্রাচীন প্রস্তরলিপি ও শাসনাদি পাঠ করিলে শালিবাহন যে একটী বংশের নাম, এই বিশ্বাসই দৃঢ়ীভূত হয়। শালিবাহন নামের পরিবর্ত্তে কোনও কোনও স্থলে 'শালিবান' 'শাতবাহ' বা 'শাতবাহন' নাম দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে শাতবাহন নামই বিশুদ্ধ। 'শালিবাহন' শব্দ 'শাতবাহন' শব্দের অপভ্রংশ। কারণ প্রাচীন প্রস্তরলিপি ও তাম্র শাসনাদিতে সর্ব্বত্র 'শাতবাহন' নামই দৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্রও স্বীয় ব্যাকরণে শালিবাহন শব্দকে 'শাতবাহন' শব্দের অপভ্রষ্টরূপ

* স্যার রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর সংগৃহীত "শব্দকল্পদ্রুম" নামক বৃহদাভিধানে লিখিত আছে যে, মহারাজ শালিবাহনের জন্মদিবস হইতে "শকাব্দ" আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব প্রস্তাবধৃত কিম্বদন্তী গুলির ন্যায় এটিরও কোনও মূল্য নাই।

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জিনপ্রভা সরি (খ্রী ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে) প্রণীত "কল্পপ্রদীপ" নামক জৈন গ্রন্থে শালিবাহনের পরিবর্ত্তে 'শাতবাহন' নাম ব্যবহার করা হইয়াছে। শাতবাহন নামের কারণ উক্ত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে; যথাঃ—"সনোতের্দ্দানার্থত্বাৎলোকৈঃ শাতবাহন ইতি ব্যপদেশং লম্ভিতঃ" অর্থাৎ সন্ ধাতু নিষ্পন্ন 'শাত' শব্দের অর্থ দান, তিনি দানে রত ছিলেন অর্থাৎ দান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে শাতবাহন বলে। এতদনুসারে, এবং "প্রাকৃতে শাতবাহনঃ" এই বাক্যানুসারে শালিবাহন না হইয়া শাতবাহন নাম হওয়াই উচিত এবং বিশুদ্ধ (১)। বাণভট্ট স্বপ্রণীত হর্ষচরিতে ও বাৎস্যায়ন স্বপ্রণীত কামসূত্রে শালিবাহনের পরিবর্ত্তে "শাতবাহন" নামই ব্যবহার করিয়াছেন।

শাতবাহন বংশের ইতিহাস ভারতীয় অন্যান্য প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাসের ন্যায় তমসাচ্ছন্ন হইলেও, তাৎকালিক প্রস্তরলিপি ও শাসনাদির সাহায্যে কিয়ৎ পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে। সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের স্থানে স্থানে গুহার মধ্যস্থিত দেবমন্দির, চৈত্য ও বিহারাদিতে যে সমস্ত প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদুৎকীর্ণ অক্ষর দৃষ্টে ডাক্তার ভাণ্ডারকর ঐ প্রস্তরলিপিগুলির যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং তাহা হইতে যে সকল ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাশিত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে যথাসাধ্য বিবৃত করিতেছি।

নাশিকের নিকটস্থ পর্ব্বতগুহায় একটী মন্দিরে খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর খোদিত একটী প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, সাতবাহন রাজবংশীয় 'কৃষ্ণ-রাজ' নামক জনৈক নৃপতির, নাশিকস্থ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক এই মন্দিরে নির্ম্মিত হইয়াছে (২)।

নানাঘাট (৩) পর্ব্বতের গুহায় একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরের সম্মুখস্থিত দেওয়ালে কয়েকটী প্রতিমূর্ত্তি ও তাহাদের নাম খোদিত রহিয়াছে। সেই নামগুলি এইঃ—১ রায়াসিমুক সাতবাহনো; (অর্থাৎ রাজাসিমুক সাতবাহন) ২—দেবীনায়নিকায়া রঞ্চোচ সিরি সাতকনিনো: (রাণী নায়নিকার ও রাজা শ্রীসাতকর্ণির) ৩—কুমারো ভায়া; (রাজপুত্র ভায়া) ৪—মহারঠি গনকয়িরো; (মহাবীর মরাঠা সেনাপতি অথবা মরাঠা জাতীয় মহাবীর) ৫—কুমারো হকুসিরি; (রাজপুত্র হকুশ্রী) ৬—কুমারো সাতবাহনো (রাজকুমার শাতবাহন)। ডাক্তার ভাণ্ডারকর এই লিপিকে খ্রীষ্টাব্দ প্রারম্ভের সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করেন। এই মন্দিরে একটি প্রস্তরলিপিও আছে; কিন্তু তাহা এত ছিন্ন ভিন্ন

(১) ঐতিহাসিক রহস্য। ২য় ভাগ ২০৯।১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) Vide Royal Asiatic Society's Journals (Bombay) Vol. VII এর নাশিকস্থ ৬নং প্রস্তরলিপি এবং Transactions of the Oriental Congress (1874) নামক পুস্তকের ৩৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। Quoted in Bhandarkar's History of Dekkan.

(৩) নানাঘাট—ঠানা (থানা, Tanna) সুরাটের দক্ষিণে অবস্থিত জেলার অন্তর্গত 'মুরবাড়, তালুক হইতে (পুণা জেলার অন্তর্গত) 'জুন্নর' নামক গ্রামে যাইবার রাস্তায় এই ঘাট (গিরিবর্ত্ম) অবস্থিত।

হইয়া গিয়াছে যে, পাঠ করিয়া তাহার অর্থোদ্ভেদ করা দুষ্কর।

উল্লিখিত মন্দিরে দুইজন রাজা, এক রাজ্ঞী, এক জন মরাঠা মহাবীর ও তিনজন রাজ পুত্রের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় নৃপতি শ্রীসাতকর্ণির নামের সহিত তদীয় রাজ্ঞী দেবী নায়নিকার নাম একত্রে খোদিত থাকায় ডাঃ ভাণ্ডারকর অনুমান করেন যে, যে সময়ে ঐ প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি খোদিত হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনিই রাজা ছিলেন। প্রথম নৃপতি সিমুক তাঁহারই পূর্ব্ববর্ত্তী সেই বংশীয় কোনও নৃপতি ছিলেন, অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ৪র্থ ব্যতীত, অবশিষ্ট সকলেই সাতবাহন বংশীয় তরুণ রাজকুমার ছিলেন, বোধ হয়। ৪র্থ টী তাৎকালিক বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোনও মরাঠা (মহারাষ্ট্রীয়) মহাবীর বা যোদ্ধার প্রতিমূর্ত্তি হইবে।

নাশিকের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগুহাস্থ একটী বিহারে ৪ টী প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই প্রস্তরলিপিগুলি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে খোদিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১ম টীতে যে বিবরণ উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহার সারাংশ এই:—গোবর্দ্ধন (নাশিক) প্রদেশের অন্তর্গত, এই ত্রিরশ্মি নামক পর্ব্বতের গুহায়, 'ক্ষহরাত নহপান' নামক নৃপতির জামাতা, দীনীকের পুত্র পরোপকারপরায়ণ উষবদাত এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। উষবদাত ৩ লক্ষ গাভি ও দেবোদ্দেশে ১৬ টী গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছেন। এবং বার্ণাসায়া নদীর ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি প্রতিবৎসর ১ লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। প্রভাস অর্থাৎ সোমনাথ পট্টনস্থ ৮ জন ব্রাহ্মণের ধর্ম্মার্থে নিজ ব্যয়ে বিবাহ করাইয়া দিয়াছেন। ভরুকচ্ছ (বর্ত্তমান বরোচ Broach) দশপুর (মালবের অন্তর্গত) গোবর্দ্ধন (নাশিক) ও শোর্পারগ (৪) প্রভৃতি স্থানে উদ্যান, অট্টালিকা ও ধর্ম্মশালাদি নির্ম্মাণ এবং কূপ ও তড়াগাদি খনন করাইয়া দিয়াছেন। ইবা, পারদা, দমনা, তাপী (তাপ্তী) করবেণা ও দাহনুকা (৫) প্রভৃতি নদীর উভয়তীরে পথিকগণের সুবিধার জন্য নৌযান ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ, জল-সত্র স্থাপন এবং তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিবার নিমিত্ত বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। এবং সোর্পরগ, গোবর্দ্ধন, সুবর্ণমুখ, পীণ্ডিতকাবদ ও রামতীর্থ প্রভৃতি স্থানে বেদপঠন ও পাঠনার্থ পাঠশালা ও বেদ-শিক্ষয়িতা ব্রাহ্মণগণের জন্য সহস্র মুদ্রা বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। উত্তম ভদ্র নামক ক্ষত্রিয় জাতীয় জনৈক নৃপতি, মালয়জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হইলে, উষবদাত স্বীয় প্রভুর অনুমত্যনুসারে বর্ষাকালেই তাঁহার উদ্ধারার্থ

(৪) শোর্পারগ—পেরিপ্লুস (৭০খ্রীঃ অঃ) ইহাকে "সৌপ্পর" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার পৌরাণিক নাম "শূর্পারক" বা "শোর্পারক"। শোর্পারক অপরান্ত (কোঁকণ বা কঙ্কণের (Concon) উত্তরাংশ) প্রদেশের রাজধানী ছিল। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বানুসারে পরশুরাম দক্ষিণ সমুদ্রতীরে গমন করিলে, সমুদ্র তাঁহার নিমিত্ত শূর্পারক দেশ নির্ম্মাণ করিলেন:—"ততঃ শূর্পারকং দেশং সাগরং তস্য নির্ম্মমে।" পরশুরাম আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া এদেশে স্থাপন করেন।

(৫) এই নদীগুলি ঠানা (থানা) সুরাটের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আবার সমুদ্রে পতিত হইতেছে।

যাত্রা করিলেন। উষবদাতের রণবাদ্যের শব্দ শ্রুতিগোচর হইবা মাত্র মালয়গণ ভীত হইয়া পলায়নপর হইল। উষবদাত তাহাদিগকে উত্তমভদ্র জাতির অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। তৎপরে তিনি 'পোষ্করাণি' তীর্থে গমন করিলেন এবং যথাবিধি তীর্থোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া তথায় একটী গ্রাম ও তিন সহস্র গাভী দান করিলেন (৬)।

দ্বিতীয় প্রস্তরলিপিতে উষবদাতের সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে:—৪২ অব্দে, উষবদাত, চতুর্দ্দিক্‌দেশাগত বৌদ্ধভিক্ষুগণের বাসের জন্য এই বিহার উৎসর্গ করিয়া দিলেন। গোবর্দ্ধন—(নাশিক) বাসী মহাজনমণ্ডলের নিকট, বাৎসরিক তিনশত ৭৫ "কার্ষাপণ" (৭) (কিঞ্চিদধিক দুই শত তেত্রিশ টাকা) সুদে তিনি তিন সহস্র কর্ষাপণ গচ্ছিত রাখিয়াছেন। বর্ষাকালে এই বিহারে যে বিংশতি জন বৌদ্ধভিক্ষু বাস করিবেন, ঐ গচ্ছিত টাকার সুদ হইতে তাঁহাদের বস্ত্রাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাব দূর করা হইবে, এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিবার জন্য তিনি নাশিকে একটী মহতীসভা আহূত করিয়া পূর্ব্বোক্ত আদেশগুলি প্রস্তরোপরি খোদিত করিয়া এই বিহারের দ্বারদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। ৪১ ও ৪০ অব্দে তিনি দেবোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে, বহু অর্থ দান করিয়াছেন (৮)।

তৃতীয় প্রস্তর-লিপিতে উষবদাতের পত্নী 'দখমিত্রা'র দয়া ও দান ধর্ম্মের উল্লেখ আছে (৯)। চতুর্থ লিপিটী অত্যন্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার অংশ বিশেষ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উষবদাতের দান ধর্ম্মের বিষয় চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই প্রস্তর-লিপিটী খোদিত হইয়াছিল (১০)। এতদ্ব্যতীত 'কার্লে'র (১১) নিকটস্থ একটী পর্ব্বতগুহায় উষবদাতের আরও একটী প্রস্তরলিপি আছে। তাহাতে, বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থে তাঁহার একটী গ্রাম দানের উল্লেখ আছে (১২)।

পুণা জেলার অন্তর্গত জুন্নরের নিকটস্থ পর্ব্বতগুহায় একটী মন্দিরে একটী প্রস্তর-লিপি আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, 'মহাক্ষত্রপ রাজাধিরাজ নহপানে'র অয়ম নামক জনৈক (বৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণ) মন্ত্রী

(৬) J. R A. S. (Bombay) V. VII নাশিকস্থ ১৭ নং প্রস্তরলিপি দেখ।

(৭) প্রচীন মুদ্রা বিং। ১৬ মাষা—১কর্ষ। এককর্ষ পরিমাণ রৌপ্য মুদ্রাকে কার্ষাপণ বলিত।

(৮) Vide J. R. A. S. (Bombay) Vol. VII. Inscriptions No. 18, 16 একই শাসনপত্র ঐ দুইখণ্ড প্রস্তরে খোদিত হইয়াছে।

(৯) J. R. A. S. (Bombay) Vol. VII নাশিকস্থ ১৬নং প্রস্তর-লিপির প্রথমাংশ দেখ।

(১০) J. R. A. S. (Bombay) Vol. VII নাশিকস্থ ১৪নং প্রস্তরলিপি দ্রষ্টব্য

(১১) কার্লে—বোম্বাই হইতে পুরাতন রাজপথ দিয়া পুণা যাইবার রাস্তায় এই গ্রাম অবস্থিত।

(১২) Archiological Survey of Western India No X. কর্লের ১৩নং প্রস্তরলিপি দেখ।

একটি নূতন পুষ্করিণী খনন ও একটী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন (১৩)।

নাশিকের নিকটস্থ পর্ব্বতের অপর একটী গুহায় একটী বিহার আছে। তাহাতে ৪টী প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহাতে গোতমীপুত্র শাতকর্ণি নামক সাতবাহন বংশীয় জনৈক নৃপতির সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় :—মহারাজা ধিরাজ গোতমীপুত্র শাতকর্ণী, অশিক, অশ্মক, মূলক, সুরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত, অনুপ, বিদর্ভ, অকরাবন্তী প্রভৃতি দেশের (১৪) এবং বিন্ধ্যাবৎ, পারিয়াত্র, সহ্য, কৃষ্ণগিরি, মলয়, মহেন্দ্র, চকোর ও শ্রেষ্ঠগিরি প্রভৃতি পর্ব্বতের অধিপতি ছিলেন। বড় বড় নৃপতিগণ তাঁহাকে ভয় করিতেন ও কর দিতেন। তাঁহার পশুশালার জন্তুগণ পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম, এই সমুদ্র ত্রয়ের জলপান করিত। তিনি ভীতের ও শরণাগতের আশ্রয়দাতা ছিলেন; এবং প্রজাগণের সুখে সুখী ও তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইতেন। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই পুরুষার্থত্রয়ের আলোচনার জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন; এবং নিয়মিতরূপে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও নিরূপিত সময়ে তদালোচনায় নিবিষ্ট হইতেন। তিনি বিদ্যা ও সজ্জনগণের আশ্রয় স্থান এবং কীর্ত্তি ও সদাচারের মন্দির ছিলেন। তিনি অদ্বিতীয় যোদ্ধা, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ও অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ প্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বর্ণশঙ্কর বৃদ্ধির পথ অবরুদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণের উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার বিক্রম দেখিয়া লোকে রাম (বলরাম) কেশব, অর্জ্জুন ও ভীমসেনের পরাক্রমের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। তিনি প্রতাপে নভাগ, নহুষ, জনমেজয়, সগর, যযাতি, রাম (রামচন্দ্র) ও অম্বরীষের তুল্য ছিলেন। তিনি অসংখ্য যুদ্ধে শত্রু সৈন্যের বিনাশ ও ক্ষত্রিয়গণের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। শক, যবন ও পলহ্ব জাতিকে দমন (১৫) এবং খাগারাত বংশের মূলোচ্ছেদন করেন। তিনি যে প্রাচীন সাতবাহন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সাতবাহন বংশের বিলুপ্ত কীর্ত্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

এতদ্ব্যতীত এই প্রস্তর-লিপিতে আরও লিখিত আছে যে, "বাসিষ্ঠী"র পুত্র 'পুলুমাবি' (পুলোমবি) নৃপতির রাজ্যকালের ১৯ বর্ষে গোতমীপুত্র শাতকর্ণির জননী 'গোতমী' ভদ্রায়নীয়পন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের জন্য এই বিহার উৎসর্গ করিতেছেন। এই প্রস্তর-লিপিতে গোতমীকে "মহারাজার মাতা ও মহারাজার পিতামহী" বলা হইয়াছে। এই লিপির শেষ পংক্তিতে এই বিহারবাসী ভিক্ষুকগণের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে একটী গ্রাম দানের

(১৩) A. S. W. I. No. X. জুন্নরের প্রস্তরলিপি দ্রষ্টব্য (Quoted in B's History of Deccan)

(১৪) অশ্মক ও মূলক (পৌরাণিক মৌলিক) দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত। সুরাষ্ট্র কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণাংশ। বর্ত্তমান সুরত। কুকুর—রাজপুতস্থানের অংশ বিশেষ। অপরান্ত—উত্তর কোঁকণ (কঙ্কণ Concon)। অনুপ—পুরাণানুসারে বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ। রঘুবংশানুসারে পূর্ব্ব-নর্ম্মদার তীরবর্ত্তী প্রদেশ বিং। মাহিষ্মতী ইহার রাজধানী। বিদর্ভ বেরার। অকরাবন্তী—সম্ভবতঃ মালবের পূর্ব্বাংশ।

(১৫) মূলে এই বাক্যটি "শকযবনপহ্লবনিসূদনস্ত" এইরূপ লেখা আছে।

উল্লেখ আছে (১৬)। গোতমী পুত্র শাতকর্ণির প্রধান শত্রু রুদ্রদাম জুনাগড়ের প্রস্তর-লিপিতে গোতমী পুত্র শাতকর্ণিকে "দক্ষিণাপথাধীশ" (১৭) এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন *।

দ্বিতীয় প্রস্তর-লিপিটি পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর-লিপির কিছু পরবর্ত্তীকালে ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে খোদিত। এই লিপিতে নবনরের (নগরের বা দেশের) (১৮) অধিপতি বাসিষ্ঠী পুত্র শ্রীপুলুমাযি নাশিকস্থ "সর্ব্বাক্ষদলন" নামক স্বীয় প্রতিনিধির প্রতি এই আদেশ করিতেছেন যে, ধনকটকের অধিপতি মহারাজ গোতমী পুত্র, ভদ্রায়নীয়পন্থী-বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণকে পূর্ব্বে যে গ্রাম দান করিয়াছিলেন, (যাহার উল্লেখ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর লিপিতে আছে) তাহা তাঁহাদের পছন্দমত হয় নাই, এই নিমিত্ত এই প্রস্তর খোদিত শাসনের (দানপত্রের) দ্বারা উক্ত গ্রামের পরিবর্ত্তে অপর একটি গ্রাম তাঁহাদিগকে দান করা গেল।

তৃতীয় প্রস্তর-লিপিতে ধনকটকের অধিপতি মহারাজ গোতমীপুত্র শাতকর্ণির আদেশানুসারে 'বিষ্ণুপালিত' নামক তদীয় গোবর্দ্ধনস্থ (নাশিকস্থ) জনৈক প্রতিনিধির বিজনবাসী বাণপ্রস্থাশ্রমাবলম্বিগণের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ২শত নিবর্ত্তন (১৯) ভূমি দানের উল্লেখ আছে। এই আদেশ

(১৬) A. S. W. India. NoX. Inscription no 26. দেখ।

(১৭) দক্ষিণাপথ—ভারতবর্ষের বা নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণস্থ দেশ, দাক্ষিণাত্য। সাধারণ প্রচলিত ভাষায় দাক্ষিণাত্যকে "দক্‌খন" বলে। 'দক্ষিণ এই সংস্কৃত শব্দ হইতে "দক্‌খন" (Deccan) শব্দের উৎপত্তি। "দক্ষিণাপথ" শব্দ প্রাকৃত ভাষায় "দক্‌খিনাবধ" এইরূপ উচ্চারিত হয়। পেরিপ্লুসের (৭০খ্রীঃ অঃ) গ্রন্থে ইহাকে "দখিনাবদেস" বলা হইয়াছে। দক্ষিণাপথকে কোনও কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে সংক্ষেপে "দক্ষিণ" বলা হইয়াছে। খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় পরিব্রাজক "ফাহিয়ান" বারাণশীর (বেনারসের) অধিবাসিগণের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, দক্ষিণদিকে "তথ্‌সিন" নামে এক দেশ আছে। "দক্ষিণ" এই সংস্কৃত নামই ফাহিয়ানের গ্রন্থে "তথ্‌সিন" এই অপভ্রষ্টরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বায়ু, মার্কণ্ডেয় ও মৎস্যপুরাণানুসারে চোল (তাঞ্জোর) পাণ্ড্য (মদুরা) ও কেরল (মালাবার) এই প্রদেশত্রয় দক্ষিণাপথের অন্তর্গত। কিন্তু মহাভারতের সভাপর্ব্ব (৩১ অং ১৭ শ্লো) পাঠে অনুমিত হয় যে, তৎকালে পাণ্ড্যদেশ দক্ষিণাপথের অন্তর্গত ছিলনা। আবার বায়ুপুরাণ (৪৫ অং ১০৫ শ্লোঃ) পাঠে বোধ হয় যে, তৎকালে নর্ম্মদা ও তাপী (তাপ্তী) নদী দক্ষিণাপথের বহির্ভূত ছিল। পরবর্ত্তী কালে দক্ষিণাপথ বলিলে নর্ম্মদা ও কৃষ্ণা এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ বুঝাইত। আরও পরবর্ত্তী সময়ে অপরান্ত বা উত্তর কঙ্কন, নর্ম্মদা ও তাপী নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ, (এখানে শবর ও পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ বাস করিত) ও বিদর্ভ প্রভৃতি প্রদেশ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইত না। Vide Dr. Bhandarkar's Early History of Dekkan. Part I.

(১৮) দেশ—পশ্চিমঘাট পর্ব্বত শ্রেণীর পূর্ব্বদিকের প্রদেশকে 'দেশ' বলে। দেশ—অহম্মদনগর, খানদেশ, পুণা, ভোর (পুণার নৈঋত্য কোণে অবস্থিত) সাতারা (সেতারা) অক্কলকোট, নাশিক ও সোলাপুর, প্রধানতঃ এই কয় জেলায় বিভক্ত। শ্রীপুলুমাযি এই 'দেশ' এর অধিপতি ছিলেন।

(১৯) ১ নিবর্ত্তন—৬০৫ বর্গ [illegible]।

* J. R. A. S. (Bombay Vol. VII. pp. 118 দেখ।

লিপি শ্রীপুলুমায়ির রাজ্যকালের ১৮শ বর্ষে খোদিত হইয়াছিল।

চতুর্থ প্রস্তর-লিপিতে (শাসনে) মহারাজ গোতমী পুত্র শাতকর্ণির স্ত্রী (যাঁহাকে এই লিপিতে 'রাজমাতা' বলা হইয়াছে) নাশিকস্থ রাজ প্রতিনিধির প্রতি বিজনবাসী বাণপ্রস্থাবলম্বিগণকে ১শত নিবর্ত্তন ভূমি দান করিতে আদেশ করিয়াছেন। এই শাসনপত্র শ্রীপুলুমাবির রাজ্যকালের ২৪তম বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল (২০)।

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি প্রস্তর-লিপি আছে। এগুলি রাজকীয় নহে। এইরূপ লিপি নাশিকস্থ অপর এক পর্ব্বত-গুহায় দুইটি ও কার্লের পর্ব্বতগুহায় দুইটি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই লিপিগুলির তারিখ যথাক্রমে "শ্রীপুলুমাবির রাজ্যকালের ৩য় ও ৭ম এবং ৭ম ও ২৪ বর্ষ" লিখিত আছে (২১)।

গোতমী পুত্র শাতকর্ণি ও বাসিষ্ঠী পুত্র শ্রীপুলুমাবির যে কয়েকটী প্রস্তরলিপি উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে কি কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগৃহীত হইতে পারে, দেখা যাউক। (১ম) যখন গোতমীকে এক রাজার মাতা ও আর এক রাজার পিতামহী বলা হইয়াছে, ও তাঁহার পুত্র গোতমী পুত্র শাতকর্ণির স্ত্রীকে একজন রাজার মাতা (রাজমাতা) বলা হইয়াছে, এবং যখন উল্লিখিত প্রস্তরলিপির কোনটিতেই গোতমী-পুত্র শাতকর্ণি ও বাসিষ্ঠী পুত্র শ্রীপুলুমাবি ব্যতীত অন্য কোনও নৃপতির উল্লেখ নাই, তখন,(ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে) অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, শ্রীপুলুমাবি গোতমীর পৌত্র ও গোতমীপুত্র শাতকর্ণির পুত্র ছিলেন; এবং বাসিষ্ঠী গোতমীর পুত্রবধূ ও গোতমী পুত্র শাতকর্ণির স্ত্রী ছিলেন। (২য়,) পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরলিপিতে "গোতমী এই বিহার উৎসর্গ করিতেছেন" এইরূপ বর্ত্তমান-কালবোধক প্রয়োগ আছে; সুতরাং যে সময়ে ঐ প্রস্তরলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ শ্রীপুলুমাবির রাজ্য-কালের ১৯তম বর্ষে গোতমী জীবিতা ছিলেন, সন্দেহ নাই। আবার সেই প্রস্তর-লিপিতে গোতমীকে এক রাজার মাতা ও আর এক রাজার পিতামহী বলায় অনুমিত হইতেছে যে, সে সময়ে গোতমীর পুত্র মহারাজ শাতকর্ণি ও তৎপৌত্র মহারাজ শ্রীপুলুমাবি উভয়েই জীবিত ছিলেন। (৩য়) দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তরলিপিতে গোতমী পুত্রকে "ধনকটকাধীশ" বলা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় প্রস্তরলিপিতে শ্রীপুলুমাবিকে মহা-রাষ্ট্র দেশের অধিপতি বলা হইয়াছে (১৮ নং) টিপ্পনী দেখ); সুতরাং মহারাষ্ট্রাধিপতি শ্রীপুলুমাবির রাজ্যকালের ১৮শ ও ১৯শ বর্ষের সমকালে গোতমীপুত্র শাতকর্ণি ধনকটকে (তেলিঙ্গনাতে) রাজত্ব করিতে ছিলেন; এবং স্বয়ং শ্রীপুলুমাবি পিতার অধীনে থাকিয়া মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করিতে-ছিলেন, অর্থাৎ একই সময়ে পিতা ও পুত্র দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করিতে-ছিলেন, অনুমান করা কোনক্রমেই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ডাঃ হুইলার এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে গোতমী পুত্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রীপুলুমাবি রাজত্ব

(২০) Vide A. S. W. I. No. X. Inscriptions of Nosika No. 25.

(২১) Vide. A. S. W. I. no X. Inscriptions of Nasika, Nos. 3, 27, and Inscriptions of Karle Nos. 14, 20.

করেন। ১৮৭৪ সালের Transactions of The Oriental Congress অর্থাৎ প্রাচ্য-ভাষাদিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মহাসমিতির কার্য্যবিবরণী নামক পুস্তকে এসম্বন্ধে ডাঃ ভাণ্ডারকর যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তের পরিপোষক অন্যান্য বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলে ডাঃ হুইলার স্বীয় আপত্তির অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিতে পারিবেন।

এই রাজবংশীয় আরও কয়েকজন রাজার নাম অন্যান্য প্রস্তরলিপি ও প্রাচীন মুদ্রাদিতে দৃষ্ট হয়। থানার (Tanna, থানা) নিকটবর্ত্তী কাহ্নেরীর পর্ব্বতগুহায় তিনটী প্রস্তরলিপি আছে। একটীতে "মঢ়রী পুত্র শকসেন" ও অপর দুইটীতে "গোতমীপুত্র সিরিয়ঞ্ঞ শাতকর্ণি" অর্থাৎ গোতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণির নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মঢ়রীপুত্র শকসেনের প্রস্তরলিপিতে তাঁহার রাজ্যকালের ৮ম বর্ষ ও গোতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণির প্রস্তরলিপিতে তদীয় রাজ্যকালের (সম্ভবতঃ) ১৮শ বর্ষের উল্লেখ আছে। (২২) নাশিকের নিকটস্থ একটী পর্ব্বতগুহায় গোতমী-পুত্র শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণির একটী প্রস্তর লেখা আছে; তাহাতে তদীয় রাজ্যকালের ৭ম বর্ষের উল্লেখ আছে। তেলঙ্গণে (তেলিঙ্গানাতে) শিবশ্রী নামক শাতবাহন বংশীয় জনৈক নৃপতির কয়েকটী মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুয়েরী নামক মাসিক পত্রিকার ৯ম খণ্ডের ৬৪ পৃষ্ঠায় মিঃ টমাস ঐ মুদ্রার যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তদনুসারে শিবশ্রী শ্রীপুলুমাবির সহোদর ছিলেন, বোধ হয়। কারণ, ঐ মুদ্রায় শিবশ্রীকে "বাসিঠীপুত" অর্থাৎ বাসিষ্ঠীপুত্র বলা হইয়াছে। তেলঙ্গণের রাজধানী ধনকটকের নিকটবর্ত্তী স্থানে "চন্দ্রশ্রী" নামক উক্তবংশীয় আরও একজন নৃপতির মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

কোলাপুরে একটী প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ ছিল। কয়েক বৎসর হইল, ঐ স্তূপ খনন করিতে করিতে তথায় অনেকগুলি তাম্র ও সীসক মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ মুদ্রায় উৎকীর্ণ অক্ষরগুলির সহিত পূর্ব্বোক্ত নাশিকের প্রস্তরলিপির অক্ষরের অনেকাংশে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ঐ সকল মুদ্রায় যে কয়েকটী নাম খোদিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। রঞ্ঞো বাসিঠীপুতস বিলিবায়কুরস।
(রাজা বাসিষ্ঠী পুত্রের বিলিবায় কুরের)
২। রঞ্ঞো গোতমীপুতস বিলিবায়কুরস।
(রাজা গোতমী পুত্রের বিলিবায় কুরের)*
৩। রঞ্ঞো মঢ়রীপুতস সেবল কুরস।
(রাজা মঢ়রীপুত্রের সেবলকুরের)

এই নামগুলি আমাদের নিকট অপরিচিত নহে। কিন্তু "বিলিবায়কুরস" ও "সেবলকুরস" এই দুইটী শব্দের অর্থ কি? ডাঃ ভাণ্ডারকর ব্যতীত, পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ি-

(২২) এই প্রস্তরলিপিতে যে তারিখ উৎকীর্ণ আছে, তাহা স্পষ্টরূপে পড়িতে পারা যায় না। ডাঃ ভাণ্ডারকর বিবেচনা করেন যে, ঐ তারিখ সম্ভবতঃ গোতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণির রাজ্যকালের "১৮শ বর্ষ" হইবে।

* ইনি কোন্ গোতমী পুত্র? বোধ হয় ইনি গোতমী পুত্র শ্রীযজ্ঞশাতকর্ণি হইবেন। কারণ, গোতমীপুত্র শাতকর্ণি কখনই মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করেন নাই। তিনি ধনকটকের (তেলিঙ্গনার) অধিপতি ছিলেন।

গণের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কেহই এই দুইটী শব্দের অর্থোদ্ভেদ করিতে সক্ষম হন নাই। ডাঃ ভাণ্ডারকর অনুমান করেন যে, মহারাষ্ট্রাধিপতি শাতবাহন বংশীয় নৃপতিগণের কোলাপুরস্থ প্রতিনিধিগণের "বিলিবায়কুর" ও সেবলকুর" এই উপাধি বা নাম ছিল। এইরূপ অনুমানের প্রধান কারণ এই যে, ঐ মুদ্রোক্ত ১ম ও ২য় নৃপতি এবং উক্ত বংশীয় অন্যান্য কয়েকজন নৃপতির যে কতকগুলি মুদ্রা তাঁহাদের প্রাচীন রাজধানীর নিকটে (গণ্টুর প্রদেশস্থ ধনকটকের (ধরণি কোটের) নিকটস্থ প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ঐ ঐ নৃপতিগণের মুদ্রিত নামের সহিত 'বিলিবায়কুরস' বা 'সেবলকুরস' এই নাম দৃষ্ট হয় না, এবং ঐ মুদ্রাগুলির সহিত কোলাপুরের স্তূপে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলির কোনও ঐক্য নাই। সুতরাং অনুমান করিতে পারা যায় যে, শাতবাহন বংশীয় নৃপতিগণের (মধ্যে যাঁহারা মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করিতেন, তাঁহাদের) কোলাপুরস্থ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক ঐ মুদ্রাগুলি কোলাপুরেই মুদ্রিত হইয়াছিল ; এই নিমিত্ত তাঁহারা (প্রতিনিধিগণ) ঐ মুদ্রায় স্বীয় স্বীয় প্রভুর (মহারাষ্ট্র দেশের শাসনকর্ত্তাগণের) নামের সহিত স্ব স্ব নামও মুদ্রিত করিয়াছেন। মিসর দেশীয় ভূগোলবেত্তা টলেমীর গ্রন্থ পাঠ করিলে, এই অনুমানের সত্যতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।

টলেমীর গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে মহারাষ্ট্রদেশ 'উত্তর মহারাষ্ট্র'ও 'দক্ষিণ মহারাষ্ট্র' এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর মহারাষ্ট্রে "সিরোপোলেমিওস" নামক জনৈক নৃপতি রাজ্য করিতেন। বৈঠনে (পৈঠনে বা প্রতিষ্ঠানপুরে (ক) তাঁহার রাজধানী ছিল। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র "বলেওকুরোস" এর অধীনে ছিল। "বলেওকুরোস" হিপ্পোকুরা অর্থাৎ কোলাপুরে বাস করিতেন। টলেমীর এই 'সিরোপোলেমিওস' ও পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরলিপির সিরিপুলুমাবি, (শ্রীপুলুমাবি) এবং তাঁহার বলেওকুরোসি ও তাম্রমুদ্রোক্ত "বিলিবায়কুরস" যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা দেখিতেছি যে, কেবল কোলাপুরে প্রাপ্ত তাম্র মুদ্রাতেই গোতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞের ও বাসিষ্ঠীপুত্র শ্রীপুলুমাবির নামের সহিত 'বিলিবায়কুরস' এই নাম মুদ্রিত আছে। টলেমীর বর্ণনানুসারে 'বলেওকুরোস' (বা বিলিবায়কুরস) মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ (কোলাপুর তৎচতুপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ) শাসন করিতেন, এবং তিনি কোলাপুরে থাকিতেন। অতএব "বিলিয়ায়কুর" গোতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ ও বাসিষ্ঠীপুত্র শ্রীপুলুমাবির কোলাপুরস্থ প্রতিনিধি ছিলেন, ডাঃ ভাণ্ডারকরের এই অনুমান অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

খ্রীষ্টীয় ১৬৩ অব্দে টলেমীর মৃত্যু হয়, ১৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং শ্রীপুলুমবি ১৫১ খ্রীষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করিতেছিলেন বলিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী প্রস্তাবে আমরা শ্রীপুলুমাবির সিংহাসনারোহণের নিশ্চিৎ কালনির্দ্ধারণ ও শকাব্দের সহিত শাতবাহন বংশীয় নৃপতিগণের কি সম্বন্ধ, তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

(ক) প্রতিষ্ঠানপুর বা পৈঠন মহারাষ্ট্রীয়গণের একটী অতি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। ইহা গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত।

অন্ধকার কি আলোক ? (১)

আজকাল চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই চিন্তা—ভারতের ভবিষ্যতে কি হইবে? যাঁহারা ভারতের ভবিষ্যত বিষয়ে চিন্তা করেন, তাঁহারাই সুন্দর গগনে ঘন কৃষ্ণ মেঘ দেখিতে পান—মেঘের পশ্চাতে আর দৃষ্টি চলে না। বস্তুত ভারতের পরিণাম বড়ই অনিশ্চিত, বড়ই তমসাচ্ছন্ন! পতিত ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু একেবারে ইহার অধঃপতন হইবে কি ইহা আবার উন্নতির উচ্চাসনে স্থান পাইবে, এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নহে। এই বিষম সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ দুই বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন। এক পক্ষের বিশ্বাস যে, শতবর্ষ পরেই হউক, আর সহস্র বর্ষ পরেই হউক, ভারত আবার উন্নত হইবে এবং জগতের জাতি মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে। বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় হইলেও এবং ভবিষ্যতে ইহার পতন আরও গভীর হইলেও অতঃপর ভারত আবার উন্নত হইবে। পর্য্যায়ক্রমে উন্নতির পর অবনতি এবং অবনতির পর উন্নতি সংসারের নিয়ম; সুতরাং সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আবার একদিন ভারতের উন্নত শীর হৈম মুকুটে শোভিত হইবে। পতিত গ্রীস আবার উঠিয়াছে, রোমের মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার হইয়াছে; সুতরাং ভারতও আবার উঠিবে না কেন? পক্ষান্তরের কিন্তু এ প্রকার সাহস ও উৎসাহ নাই। তাঁহারা বলেন যে, জগৎ আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের অধীন এবং সেই নিয়মের অধীনে একবার যাহার আবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার আর বিবর্ত্তন নাই; সুতরাং ভারতের লয় প্রাপ্তিই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। গ্রীস ও রোম আবার উঠিয়াছে সত্য; কিন্তু উহাদিগের অধঃপতনকালে উহারা অবনত হইলেও মৃত ও অসাড় হইয়া যায় নাই—জাতিশরীরে জাতীয় জীবন সুপ্তাবস্থায় লুক্কায়িত ছিল। ভারতের সে জীবনী শক্তি নাই, ভারত অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং ইহার লয় প্রাপ্তিই অধিকতর সম্ভব। আমরা এক্ষণে এই প্রকার পরস্পর-বিরোধী মতের মধ্যে বিচরণ করিতেছি। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের পরিণাম কি দাঁড়াইবে, তাহা ধ্রুব নিশ্চিত নির্দ্দেশ করিবার সাধ্য কাহারও নাই, সকলেই তর্কযুক্তি ও অনুমানের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন মাত্র; কিন্তু যখন মত-বৈষম্য দেখা যাইতেছে, তখন কোন্ মতটি অধিকতর সত্য, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

কি হইলে জাতি মাত্রকে উন্নত বলা যাইতে পারে, প্রথমে তাহা দেখা যাউক; কারণ উন্নতি কাহাকে বলে, তাহা না বুঝিতে পারিলে ভারতের অবনত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভারত স্বাধীন রাজ্য নহে, ইহার সিংহাসনে বিদেশীয় রাজা বসিতেছেন; সুতরাং ইহা অবনত। এ প্রকার যুক্তিতে বুঝা যায় যে, স্বাধীনতাই একমাত্র উন্নতি; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নতি কি তাহাই? জগতে এখনও এমন কোন কোন জাতি আছে, যাহার সমাজ ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন-

বিজ্ঞান কিছুই সুগঠিত হয় নাই; কিন্তু অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে। ইহাকে কি অধীন ভারতবাসী অপেক্ষা উন্নত বলিতে হইবে? কেবল মাত্র স্বাধীনতা থাকিলেই কোন জাতিকে উন্নত বলা যাইতে পারে না—কোন কোন বিষয়ে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি আজিও পতিত ভারতবাসীর বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। বলবান শরীরে জাতীয় জীবন থাকিলে স্বাধীন হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু মানস ও নৈতিক বলে অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞানে বলবান না হইলে কোন জাতিকেই প্রকৃত পক্ষে উন্নত ও সুসভ্য বলা যাইতে পারে না—যে পরিমাণে যাহার জ্ঞানের বিকাশ, সে সেই পরিমাণে সভ্য ও উন্নত। চিত্তবৃত্তির প্রস্ফুট বিকাশ এবং জড়ত্ব হইতে মনুষ্যত্বকে (চেতনত্বকে) উর্দ্ধে উত্তোলন করাই জ্ঞান বিজ্ঞানের কার্য্য; সুতরাং মনুষ্যের সমাজ ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, সুখ, সৌকার্য্য সমস্তই শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক, এই ত্রিবিধ উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। ইহাই যদি উন্নতির লক্ষণ হয়, তবে কি আমরা এই বুঝিব যে, পরাধীন হইয়াও জ্ঞান বিজ্ঞানে বলবান হইতে পারিলেই উন্নত হওয়া যায়? জ্ঞান বিজ্ঞানে বলবান হইলে জাতি মাত্র উন্নত হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বাধীনতা এমনই সামগ্রী যে, জ্ঞান বিজ্ঞানে বলবান জাতিকে আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারে না—শরীরের বল ও বিস্তর পরিমাণে জ্ঞান বিজ্ঞানের ফল। স্বাধীনতা বলিলে যে কেবল রাজসিংহাসন স্বজাতীয়ের অধিকৃত বুঝিতে হইবে, এমন নহে—চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। এমন হইতে পারে যে, রাজদণ্ড স্বজাতীয়ের হস্তে বটে; কিন্তু কোন কার্য্যেই, কি সাংসারিক, কি রাজনৈতিক, জন সাধারণের স্বাধীনতা নাই—এবম্প্রকার স্বাধীনতা পরাধীনতার রূপান্তর বা নামান্তর মাত্র। এ প্রকার স্বাধীনতা বহুদিন স্থায়ী হইতে পারে না; কারণ রাজ-শক্তির সহিত প্রজাশক্তির সহানুভূতি না থাকিলে প্রজাগণ হয় অপর কোন বৈদেশিক আক্রমণকারীর পক্ষ অবলম্বন করে, না হয় আপনারাই সিংহাসন উল্টাইয়া ফেলিয়া আপনাদিগের হস্তেই শাসন-বল্গা ধারণ করে—ফ্রান্স রাজ্যে এই শেষোক্ত প্রকারের জলন্ত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, যে রাজা জাতিমাত্রের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের স্বাধীনতা হরণ করেন, তিনি সেই জাতির শারীর, মানস ও নৈতিক উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ান; কারণ চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই মনুষ্যের উন্নতি সম্ভবপর নহে।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনের উদ্দেশ্য, শারীর, মানস এবং নৈতিক উন্নতি লাভ করা। মনুষ্যের জড় ও চৈতন্য সত্বাতে এমন গুণ নিহিত আছে যে, তাহার বিকাশ হইলেই মনুষ্য দেবতা; নতুবা তাহার অস্তিত্ব কোন ফলদায়ক নহে। এই বিকাশেই তাহার সুখ ও আনন্দ এবং এই বিকাশের উপরেই তাহার ভবিষ্যত অর্থাৎ পরকালের সুখ দুঃখ বা পুরস্কার দণ্ড নির্ভর করে; সুতরাং ইহাই তাহার উন্নতি বা উর্দ্ধে আরোহণ। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে উক্ত ত্রিবিধ বিকাশ প্রাপ্ত হইবে, সে ব্যক্তিকে সেই পরিমাণে উন্নত বলিতে হইবে। এই ত্রিবিধ উন্নতি ব্যতীত মনুষ্যের অন্য উন্নতি

নাই; সুতরাং ইহাই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। যাহা ব্যক্তি বিশেষের জীবনের লক্ষ্য এবং উন্নতির মূল, তাহাই সমস্ত জাতির লক্ষ্য এবং উন্নতির নিদান; কারণ এক একটী জলকণা লইয়া যেমন সমুদ্র, তেমনই এক একটী ব্যক্তি লইয়া সমগ্র জাতি। সংসারে মনুষ্য-কৃত কার্য্য আমরা যাহা কিছু দেখি ও শুনি, তৎ সমস্তই এই ত্রিবিধ উন্নতির ফল—ইহা হইতেই মনুষ্যের সমাজ, ধর্ম্ম, সুখ, ঐশ্বর্য্য। এই ত্রিবিধ উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্য ক্ষুদ্র কীট হইয়াও জগতে যে সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহার জন্যই মনুষ্য মনুষ্য নামের ও সৃষ্টি মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য; নচেৎ পশু হইতে তাহার পার্থক্য থাকিত না। উন্নতি-স্রোত নিয়ত প্রবাহিত হইয়া মনুষ্যকে ক্রমেই উর্দ্ধে তুলিতেছে—কালে তাহার কি অবস্থা উপস্থিত হইবে, তাহা দেখিবার জন্য চিন্তা-চক্ষু আজিও প্রস্তুত নহে।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উন্নতি লাভ করিয়া জাতিমাত্রই প্রথমে আপন সুখ সৌকার্য্যের জন্য সমাজ, ধর্ম্ম, ভাষা, রাজনীতি ইত্যাদি বাহ্যিক অবয়ব সংগঠন করে। বাহ্যিক গঠন সম্পন্ন হইলে, সেই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সজীব রাখিয়া সমস্ত জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করিবার জন্য একটী জাতীয় জীবনের আবশ্যক করে। সূক্ষ্ম সূত্র যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুমকে একত্র গ্রথিত করিয়া তাহাদিগের বিক্ষিপ্ত গন্ধকে একত্রিত করে, জাতীয় জীবনও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিক্ষিপ্ত বলকে এক কেন্দ্রে আনয়ন করে। ব্যক্তি বিশেষ যতই উন্নত হউক না, জাতীয় জীবন ব্যতিরেকে সে উন্নতির অস্তিত্ব অনুমিত হয় না। মনুষ্য জীবন যেমন এক এক দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, জাতীয় জীবনেরও সেইরূপ কোন একটা বিষয় বিশেষের দিকে প্রধান লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; নতুবা উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যিনি জ্ঞান ও বিদ্যা কামনা করেন, তিনি যেমন জ্ঞান ও বিদ্যোপার্জ্জনকেই জীবনের সার কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন, যিনি ধন কামনা করেন, তিনি যেমন ধনোপার্জ্জনেই জীবন সমর্পণ করেন, যিনি যশ কামনা করেন, তিনি যেমন যশের জন্যই জীবনোৎসর্গ করেন, তেমনই জাতি মাত্রেরও কোন এক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত কর্ম্ম করা আবশ্যক। তদ্ব্যতিরেকে জাতীয় জীবন সংগঠিত হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের দিকে ও জাতি মাত্রের লক্ষ্য থাকিবেই; কিন্তু বিষয় বিশেষকে প্রধান লক্ষ্য করিয়া না চলিলে জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব এক প্রকার অসম্ভব। যিনি ধনোপার্জ্জন করিবেন, তাঁহাকে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে নাই, এমন নহে; কিন্তু বিদোপার্জ্জন যদি তাঁহার তাঁহার জাতীয় জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে অল্প বিস্তর তাঁহাকেও তৎপ্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। জাতি মাত্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যে তাহা করিতে হইবে, আমরা এমন কথা বলি না—সেই জাতির অধিকাংশ ব্যক্তির লক্ষ্য সেই দিকে থাকিলেই হইল। যখন আর্য্যগণ জ্ঞানকে জাতীয় জীবনের লক্ষ্য করিয়া ভারতে আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তখন যে অজ্ঞান কেহ ছিল না, এমন হইতে পারে না—আরব দেশেও গর্দ্দভ জন্মিয়া থাকে; কিন্তু অধিকাংশ

লোকেই যে জ্ঞানবান ছিলেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইংরাজ জাতির ব্যবসায় বা ধনোপার্জ্জন জাতীয় জীবনের লক্ষ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগের মধ্যে যে দরিদ্র কেহ নাই, এমন নহে। জাতি মাত্রের প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য যে এক বিষয়ে হইবে, তাহা আশা করা যায় না; কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির লক্ষ্য তৎ প্রতি না হইলে তাহাকে জাতীয় জীবনের লক্ষ্য বলা যাইতে পারে না। জাতীয় জীবন ব্যতিরেকে একতা সম্ভব নহে; সুতরাং জাতীয় জীবনই যে জাতি মাত্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

একতা বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, কোন বিষয়ে সমস্ত জাতির সম্পূর্ণ মিলন ও সঙ্গতি। প্রত্যেক বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ঐক্যমত হওয়া সম্ভব নহে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চিন্তা-প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রধাবিত এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অবস্থাও বিভিন্ন প্রকার; সুতরাং সকল বিষয়েই প্রত্যেক ব্যক্তির ঐক্যমত হইয়া কার্য্য করা ঘটিতে পারে না। কিন্তু কোন একটা বিষয়কে এমন ভাবে গ্রহণ করা আবশ্যক যে, তদ্বিষয়ে কাহারও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা হইতে পারে না, করিলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত অনিষ্টের সম্ভাবনা। জাতি মধ্যে যদি জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে আর ঐক্যমত হইবার জন্য বিষয় বিশেষের অনুসন্ধান করিতে হয় না। একতাই বল এবং জাতীয় জীবন থাকিলে একতার অভাব হয় না; সুতরাং জাতীয় জীবন যে জাতীয় বলের মূল কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা কেবল শারীরিক বলের কথা বলিতেছি না; যখন যে বিষয় জাতীয় জীবনের লক্ষ্য, তখন সেই বলেই জাতিমাত্র বলবান হইতে পারে—ধন যখন জাতীয় জীবন, তখন ধনবলে সেই জাতি বলবান হইতে পারে; জ্ঞান যখন জাতীয় জীবন, তখন জ্ঞানবলে সেই জাতি বলবান হইতে পারে; শরীরের সামর্থ্য যখন জাতীয় জীবন, তখন শারীর বলে সেই জাতি বলবান হইতে পারে, ইত্যাদি।

এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে, জাতি বিশেষকে উন্নত করিতে হইলে শারীর, মানস ও নৈতিক বিকাশের আবশ্যক এবং সেই বিকাশকে সজীব রাখিবার জন্য একটী জাতীয় জীবন অবশ্য প্রয়োজনীয়। অতঃপর দেখা যাউক, ভারত কোন্ বিষয়ে উন্নত, কোন্ বিষয়েই বা অবনত এবং তাহার কি আছে, কিবা নাই।

এক দিন ভারতের সকলই ছিল এবং যাহাকে প্রকৃত উন্নতি ও সভ্যতা বলা যাইতে পারে, তাহাতে উন্নত ও সভ্য হইয়া জগতের জাতি মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে আর সে গৌরব নাই এবং সেই গত-গৌরবে গর্ব্বিত হইলে কোন উপকারই সাধিত হইবার নহে। তবে পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া যদি ভবিষ্যতের গতি স্থির করা হয়, তাহা হইলেই তাহা কার্য্যকর হইতে পারে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নৈতিক জ্ঞানই প্রাচীন হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন ছিল; সুতরাং তাঁহারা যে ইদানীন্তন জড়-জীবন ইউরোপ অপেক্ষা প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জড় জীবন কয় দিনের জন্য?

জড়ের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেই জীবনের সকল উন্নতি ফুরাইল, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি সে প্রকারে শেষ হয় না: কারণ তাহা অবিনশ্বর আত্মার উন্নতি। গৌণ ও অপ্রত্যক্ষ আত্মার উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিয়া সাংসারিক সুখ সেই কার্য্যের দিকে দৃষ্টি করিলেও জানা যায় যে, আত্মার উন্নতি জড়ের উন্নতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ মনুষ্যের জড়াংশের উন্ননিতে আত্মার যে পরিমাণ উন্নতি হয়, আত্মার উন্নতিতে জড়াংশের উন্নতি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করা যাউক যে, এক সমাজ ব্যভিচার আত্মার অনিষ্টকারী বলিয়া বিচেনা করে এবং অন্য সমাজ উহাকে কেবলই সামাজিক দোষ বলিয়া গণ্য করে। এক্ষণে কোন্ সমাজে ব্যভিচার দোষ অধিক দৃষ্ট হইবে? যে সমাজে উহা আত্মার অনিষ্টকারী, সে সমাজে ব্যভিচারের সম্ভাবনা অতি অল্প; কিন্তু যে সমাজে উহা কেবলই সামাজিক দোষমাত্র, সে সমাজে উহার খরস্রোত বহিতে দেখা যাইবে; কারণ সমাজকে লুকাইতে পারিলে ব্যভিচার দোষে দূষিত হইতে সহজে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিবে। ব্যভিচার মনুষ্যের সাংসারিক সুখের এক প্রধান বিঘ্ন; কিন্তু যে সমাজে উহা সামাজিক দোষ ব্যতীত আর কিছুই নহে, সে সমাজে ব্যভিচারের বাহুল্য হয় এবং লোকের সাংসারিক সুখেরও বিঘ্নাশঙ্কা অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির উপরই অধিক পরিমাণে মনুষ্যের জড় জগতের সুখ সৌকার্য্য নির্ভর করিতেছে। যদিও প্রসিদ্ধ দার্শনিক মিল বলেন যে, নৈতিক শাসন অপেক্ষা সামাজিক শাসনের তেজ অধিক, প্রকৃত হিন্দু তাহা স্বীকার করেন না।

বর্ত্তমানকালে ভারতের সে নৈতিক উন্নতি কোথায়? কি উপায়ে আত্মার সংস্কার করিতে হয়, তাহা কয়জন জানেন? বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, জর্ম্মানী, রুষিয়া, আমেরিকা, আসিয়া আমাদিগের শাস্ত্র লইয়া জগৎকে শিক্ষা দিতেছে, আর আমরা যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারেই আছি! যে নৈতিক জ্ঞানের উপর ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহা এক্ষণে ছিন্ন ভিন্ন। একে ত হিন্দুর ধর্ম্ম অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তাহার উপর আপন আপন ধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন এবং ধর্ম্মমার্গে যথাযথ বিচরণ করেন, এমন লোক কতগুলি আছেন? এক্ষণে সংশয়ের দিন আসিয়াছে, সহজ বিশ্বাস আমাদিগের আর নাই। কিন্তু ধর্ম্ম তর্ক যুক্তির সামগ্রী নহে; সুতরাং তর্কে ধর্ম্ম লাভ করিতে গিয়া তাহা হইতে আমরা দূরে গিয়া পড়িতেছি—'বিশ্বাসে মিলিবে হরি তর্কে বহু দূর।" এক্ষণে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান আমাদিগের চিন্তার পরিচালক; সুতরাং ঈশ্বর বিশ্বাসেও আমরা প্রমাণ চাহিয়া বসি। যে কারণেই হউক, ধর্ম্ম ক্রমেই পৃথিবী হইতে লোপ পাইতেছে, বিশেষতঃ কলিতে তাহার এক পাদমাত্র স্থিতি, সুতরাং আমরা যে তৎপ্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইব না, তাহা শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মালোচনার বিস্তর বিঘ্ন আছে সত্য; কিন্তু সে সকল বিঘ্ন যে অতিক্রম করা যাইতে পারে না, এমন নহে। ফলতঃ সে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিবার পক্ষে আমাদিগের বিশেষ চেষ্টার অভাব আছে এবং চেষ্টা করিলেও যে সম্যক্ প্রকারে

অতিক্রম করিতে পারিব, সে পক্ষেও কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। হয়ত এমন হইতে পারে যে, এক বিঘ্ন অতিক্রম করিতে গিয়া অন্য বিঘ্নকে ডাকিয়া আনিতে বাধ্য হইব। মনুষ্য যত প্রকারে অবনত হইতে পারে, তন্মধ্যে ধর্ম্মাবনতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক। ধর্ম্ম ও নৈতিক বলের অভাব হইলে মনুষ্য আর মহৎ মনুষ্য নামের উপযুক্ত নহে। কিন্তু কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সেই ধর্ম্ম ও নৈতিক বলেই আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি—ধর্ম্ম ও নীতি এক্ষণে বিদ্যালয়ে শিখিবার বিষয় হইয়াছে—"অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি" ভাবিয়া হতজ্ঞান হইতেছি। ক্রমশঃ। শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

মেঘদূত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"অরধ-বিকাশ কদমের ফুলে
হরিত কপিশ কেশর দেখি,
ভূমি-কদলীর নবীন মুকুলে
তটিনীর কূলে সুখেতে ভখি,
নবজলসেকে অতিসুরভিত
পাইয়া কাননে ভূমির ঘ্রাণ,
তব আগমন পথ সুনিশ্চিত
জানিবে কুরঙ্গ পুলকপ্রাণ। ২১

"সিদ্ধ-দম্পতি হেরিবে কেমন
চাতক চতুর গ্রহয়ে জল ;
অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে করিবে গণন
সারি সারি সারি বলাকাদল,
দুরু দুরু হিয়া, গুরু গরজনে
চমকে থমকে এ ওরে বুকে
বাঁধিবে সহসা গাঢ় আলিঙ্গনে,
হয়ে চেতহারা আবেশ-সুখে! ২২

"যদিও জানিগো মম প্রিয়া তরে
করিবে গমন বেগেতে অতি,
কুসুম-বাসিত শিখরে শিখরে,
শঙ্কা মনে তবু, করিবে স্থিতি ;
মিনতি আমার, সাদর সম্ভাষ
শিখীর কেকায় গ্রহণ করি,
সেও আশুগতি বিরহিণী পাশ,
সে যে আছে মাত্র জীবন ধরি! ২৩

"দশার্ণ প্রদেশে তব আগমনে,
ধরিবে সরসী মরাল-শোভা,
অযত কেতকী নিকুঞ্জ-বেষ্টনে
ফুটিয়া ছড়াবে কনক-আভা,
কুলায়ের তরে বিহঙ্গম-গণ
পীড়িবে গ্রামের পাদপ-বর,
পরিণত ফলে জম্বু-কুঞ্জ-বন
মাখিবে নীলিমা কোমলতর। ২৪

"বিদিশা-নগরী ভুবনে বিদিত
রাজধানী তার, পশিয়া তথা,
বেত্রবতী-তীরে গর্জ্জি সুললিত
জুড়াও প্রাণের প্রণয়-ব্যথা ;—
তরঙ্গে, ভ্রূভঙ্গ-কুটিলা কামিনী,
সলিলে, রমণী-অধর প্রায়
মধুরতা ধরে, সে চারু তটিনী,—
মিটাও পিপাসা চুমিয়া তায়। ২৫

"নীচগিরিপর-সুরভি-আধার
কর শ্রম দূর রাখিয়া কায় ;—
ফুটিবে হরষে পরশে তোমার
বিকচ-কদম্বে রোমাঞ্চ তায়!

পাদমূলে তার বিজন কন্দরে, *
ছাড়ি ঘর গুরুজনের ভয়ে,
প্রমত্ত-যৌবন প্রেমিক বিহরে
নিশীথ-আঁধারে প্রমদালয়ে। ২৬

"যাও, তার পর, নগনদী কূলে,
কুসুম-কানন যথায় রাজে,
নবজল সেকে মালতী-মুকুলে
কর হাসি-মুখ পাতার মাঝে;
পরশ ছায়ায় রমণী-আননে,
আসিয়াছে তারা তুলিতে ফুল,
স্বেদ-বারি-বিন্দু পুঁছিতে বদনে
শুকায়েছে, মরি, কমল-দুল! ২৭

"উত্তরে যাইতে, উজ্জয়িনী পুরী
বক্র পথে যদি জলদবর,
তথাপি তাহার উচ্চ হর্ম্ম্য-সারি
না দেখে যেও না, বচন ধর;—
বৃথায় জনম, যদি তথাকার
ত্রাসে চকিত রমণী-মুখে,
তীব্র স্ফুরণে দামিনী-লতার,
চঞ্চল নয়ন না হের চোকে! ২৮

নির্ব্বিন্ধ্যা তটিনী শোভা বিথারিয়া,
তব প্রেম-আশে, পথেতে রাজে,
মরাল-মেখলা, তরঙ্গে নাচিয়া
প্রেমবারিদান আদরে যাচে,
চলেছে, আবর্ত্ত-সুনাভি দেখায়ে,
হেলিয়া দুলিয়া উপল-গায়,
বিলাস-ঈঙ্গিতে প্রণয় জানায়ে,—
চতুরা রমণী,-নীরবতায়! ২৯

দেখ, সিন্ধুনদী, তব অদর্শনে,
প্রতনু-সলিলে লম্বিত-বেণী,
তটতরুচ্যুত জীর্ণ পত্রগণে
পাণ্ডুবর্ণ, আহা, বদন খানি!
তোমারি কারণে এ বিরহদশা,—
অহো কি সৌভাগ্য, জলদ, তব!
অন্তরের তরে মিটাও পিপাসা,
মালিন্য, কৃশতা, ঘুচায়ে সব। ৩০

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

এত দেশব্যাপী ব্রাহ্মবিদ্বেষের কারণ কি?

এমনি এক সময় ছিল, যখন সকলেই ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকে প্রশংসা করিত। ব্রাহ্মনাম তখন সর্ব্বজন-প্রিয় ছিল। কিন্তু আজকাল তাহার বিপরীত দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজ অথবা ব্রাহ্মদিগকে ঘৃণা করে না, এমন লোক বিরল। অল্প সময়ের মধ্যে কেন এরূপ হইল, ধীরচিত্তে ব্রাহ্মসাধারণের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। একশ্রেণীর ধারণা, ব্রাহ্মবিদ্বেষের কারণ, দেশের অধোগতি। অপর শ্রেণীর ধারণা, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান। কেহ কেহ বলেন, জাতিভেদ-নাশই ব্রাহ্মবিদ্বেষের মূল কারণ। ঐ সকলের মধ্যে আংশিক সত্য থাকিলেও, আমরা ব্রাহ্মবিদ্বেষের অন্যবিধ কারণ মনে করি। আমাদের প্রক্ষিপ্ত চিন্তার মধ্যে কোন সত্য থাকিলে, ব্রাহ্ম সাধারণ সে গুলির একবার আলোচনা করেন, অনুরোধ। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত কারণে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মসাধারণ দেশের বিদ্বেষের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছেন।

* সভ্যনিয়মানুসারে মূলের রুচিবিরুদ্ধতা বশতঃ অনুবাদে তাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল।

১। প্রথম কারণ—আমাদের অনুদারতা। বা সঙ্কীর্ণতা। এখন ব্রাহ্ম-সমাজ নানা দলে বিভক্ত। মতের বিভিন্নতা হেতু, একদলের লোক অন্য দলের লোকের মহত্ত্ব দেখিতে অক্ষম। যে ব্যক্তি যে গণ্ডীতে, সেব্যক্তি সেই গণ্ডীর দাসানুদাস। দল-বাদের কাছে ব্যক্তিত্বের বিবেক-বুদ্ধি পরিম্লান। পূর্ব্বে এমন ছিল, একজন ব্রাহ্মের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আনন্দে প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইত, এখন আদরের পরিবর্ত্তে পরস্পরকে ঘৃণা করাই যেন ব্রত। বিধাতার রাজ্যে প্রত্যেক বস্তুরই বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেকের মধ্যেই মহত্ত্ব আছে, ইহা ভুলিয়া, ব্রাহ্মগণ ভিন্ন দলের লোকদিগের মিথ্যা নিন্দাঘোষণায় সদা ব্যাপৃত। এইরূপ নিন্দাঘোষণায়, ক্রমে ক্রমে, ব্রাহ্মসাধারণ দেশের নিকট অপ্রিয় হইয়াছেন। পরস্পরের নিন্দা-ঘোষণায় এই ফল হইয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজে যে ভাল লোক আছে, সর্ব্বসাধারণের এ বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। এইরূপে ব্রাহ্মেরা আপনাদের সুনামে আপনারা কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

কেবল ইহাই নহে। হিন্দুসমাজের লোকদিগকে ব্রাহ্মেরা ভাল চক্ষে দেখিতে পারেন না। হিন্দুসমাজের লোকদিগকে সাধারণত ঘৃণার চক্ষে দেখাই যেন সচেতন-ব্রাহ্ম-স্বভাব। হিন্দুসমাজে ভাললোক নাই, ছোট ছোট ব্রাহ্মেরও এরূপ ধারণা। ব্রাহ্ম-সাহিত্য একদেশদর্শী, অন্য সাহিত্যকে ব্রাহ্ম ভাল চক্ষে দেখেন না। তুমি যদি আমাকে ঘৃণা কর, আমি তোমাকে ঘৃণা করিবই। বিশ্বজনীন উদার প্রকৃতিলাভ, ও ঘৃণার পরিবর্ত্তে সম্মান প্রদর্শন করা যায় তার ধর্ম নয়। ব্রাহ্মেরা সকলকে ঘৃণা করিবেন, আর সকলে ব্রাহ্মদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে, ইহা দীর্ঘকাল চলিতে পারে না। ব্রাহ্মদের সার্ব্বজনীন ঘৃণা, ব্রাহ্মদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে, লোক-সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছে। কি সংক্রামক নিন্দা-স্রোত, সমালোচনা নামে ব্রাহ্ম-গ্রামে চলিয়াছে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

২। দ্বিতীয় কারণ, সঙ্কীর্ণতার আর একদিক, কপটতা-মূলক অহঙ্কার। সাধকেরা বলেন, তৃণের ন্যায় দী[illegible] এবং পাগলের ন্যায় সরল না হইলে [illegible]ভ হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ কপ[illegible], আপন গৌরবে স্ফীত-বক্ষ। ব্রাহ্ম আপন দোষ ঢাকিতে শশব্যস্ত, কাহারও কথা ব্রাহ্মের সহ্য হয় না। কেহ একটু কটু কথা বলিলে ব্রাহ্ম রাজদ্বারে যাইতে পর্য্যন্ত উদ্যত! চরিত্র এখন আইন-আদালতে রক্ষা করিতে হয়। ভিতরের কোন লোক সরলভাবে কিছু বিরুদ্ধে লিখিলে তাহার চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধের জন্য, ব্রাহ্ম ব্যতিব্যস্তহন। হাটে বাজারে তাহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিবে, সভা সমিতিতে নিমন্ত্রণ বন্ধ করিবে, তাহার সহিত কথা বলিবেনা, একত্র আহার করিবে না, তাহার ভিটাবাড়ী উচ্ছিন্ন করিতেও চেষ্টা করিবে, ইত্যাদি নানা আস্পর্দ্ধার কার্য্যে এই অহঙ্কার পরিস্ফুট। দোষীকে দমন করিতেও এরূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন করা বিধেয় কিনা, তাহা এখনকার দিনে বিজ্ঞ লোকের গভীর চিন্তার বিষয়, আর এখনকার ব্রাহ্মসমাজ নির্দ্দোষীকে লাঞ্ছনা দিতে, এইরূপে সদা খর্গহস্ত। "ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা?—এত বড় আস্পর্দ্ধা?—

পাপব বলে মুখ বন্ধ কর;"—লোকের এইরূপ ভাব। শ্রীতবক ব্রাহ্মের পদভরে ধরা কম্পবান, তাহার প্রতি কথায়, প্রতি চাহনিতে ইহা দেদিপ্যমান। দুদণ্ড কোন সাধারণ ব্রাহ্মের সহিত আলাপ কর, বুঝিবে, পৃথিবীতে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও চরিত্রে তার অপেক্ষা আর যেন উন্নত লোক নাই। সে না পড়িয়া পণ্ডিত, কিছু না জানিয়াও মহা জ্ঞানী। কিসের সে এই আস্পর্দ্ধা, সময়ে সময়ে চিন্তা করিয়া অবাক হইয়াছি। ধার্ম্মিক কোথায় তৃণের ন্যায় দীন হইবে, না কপটতা গৌরবে উন্নত-মস্তক। যাহার দশ বিশ সহস্র টাকা বা সম্পত্তি আছে, যে মাসে হাজার দেড় হাজার টাকা বেতন পায়, তাহার কথা বলি না, অহঙ্কার বরং তাহার শোভা পায়, কিন্তু যে গরীব, বিশ টাকা ত্রিশ টাকা যার আয়, যে ঋণে ডুবিয়া রহিয়াছে, যে দুটা কথা রাখিতে পারে না, তাহারও এই-রূপ অহঙ্কার!! দুনিয়ার কেহকে ব্রাহ্ম গণনায় আনিতে চাহে না। এই রূপ অহঙ্কারের পরিচয় পাইয়া সর্ব্বসাধারণ ব্রাহ্মদের সংস্পর্শে আসিতে ভয় পায়। মানুষ আর সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু মানুষের দর্প বা অহঙ্কার সহ্য করিতে পারে না। এমন কি, বিধাতাও তাহা সহিতে পারেন না। অতি দর্পে হত লঙ্কা!! খ্রীষ্ট বলিতেন, উচ্চ হইতে বাসনা থাকিলে নীচ হও। বিনয় ও সরলতা যে ধার্ম্মিকের অমূল্য ভূষণ, তাহা দিন দিন আমরা ভুলিয়া যাইতেছি।

৩। তৃতীয় কারণ—সহানুভূতির অভাব। ব্রাহ্মদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি নাই, ইহা এখন সকলেই স্বীকার করেন। বিপদের দিনে মুখে সকলেই তোমার সাহায্য করিতে চাহিবে, কিন্তু কাজের বেলায় তুমি ঐ বিপদে যাহাতে আরো পড়, তাহার চেষ্টা করিবে। স্ব স্ব লইয়াই সকলে ব্যস্ত। কেহ যদি কাহার উপকার করে, কোন লোক যদি সদা-ব্রত গ্রহণ করে, লোকের উপকারের জন্য যত্নশীল হয়, তাহার সাহায্য করা দূরে থাকুক, অমনি দশজনে বলিবে, এই কাজে উহার "স্বার্থ" আছে!! দয়ার দ্বার রুদ্ধ করিতে, সকলে না হউক, অনেক ব্রাহ্ম সদা লালায়িত। আমরা জানি, কেবল সহানুভূতির অভাবে অনেক লোক ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। এমন এক সময় ছিল, যখন দুঃখী পাপীদের প্রতি ব্রাহ্মদের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। এখন এমন হইয়াছে, দুঃখী পাপীদের নাম শুনিলে অনেক ব্রাহ্ম কাণে হাত দেন! পাপীদের প্রতি পাপীদের সহানুভূতি নাই, (কেননা বিধাতার নিকট সকলেই পাপী) এ দৃষ্টান্ত কোন ধর্ম্মসমাজে যদি দেখিতে চাও, তবে ব্রাহ্ম-সমাজ অন্বেষণ কর। ৭ বৎসর বয়স্ক একটী বালিকাকে তাহার বেশ্যামাতা কোন ব্রাহ্ম বন্ধুর হাতে দিয়াছেন। দেখিয়াছি, ইহাকে গৌরবের বিষয় মনে না করিয়া ভ্রাতারা আশ্রয়-দাতাকে ঘোর লাঞ্ছনা দিয়াছেন! এমনই সহানুভূতি! যে সমাজ দুঃখী পাপীর কথা ভুলে, সে সমাজ অধিক দিন টিকিতে পারে না। ঈশা, শ্রীচৈতন্য দুঃখী পাপীর সেবা করিয়া অমর হইয়াছেন, আর আমাদের চক্ষের সম্মুখে জেনেরেল বুথ দুঃখী পাপীর সেবায় জীবন সমর্পণ করিয়া ধন্য হইতেছেন। দলে দলে পাপী ত্রাণ পাইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু এ পথকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিতেছেন! হিন্দু-সমাজ ব্রাহ্মসমাজকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে

অনেক দিন হইতে যত্নবান। এখন দেখিতেছি, হিন্দুসমাজ কতক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, একদিন যাহারা ভয়ানক পাপী ছিল, আজকাল ব্রাহ্ম-সমাজের গুণে তাহারাই সমাজের অগ্রণী হইয়া অন্য পতিতদিগকে তুচ্ছ করিতেছে। পতিতোদ্ধার যাহাদের ব্রত হওয়া উচিত, তাহারা কেন যে এরূপ মমতাহীন হইয়া উঠিতেছে, বুঝি না। এক সময়ে এমন ছিল, জাতিধর্ম্ম ভুলিয়া ব্রাহ্ম পরের উপকার করিতেন ; এখন নিজের সমাজের লোকের উপকারই করেন না, পর ত দূরের কথা! আতিথ্যপ্রথা—ব্রাহ্ম-সমাজে বড় একটা নাই। সকল সময়ে সবস্থানে ভিক্ষুক ভিক্ষা পায় না;—কোন কোন ব্রাহ্ম বলেন, যাহাকে বিধাতা মারিতেছেন, আমরা তাহাকে সাহায্য করিব কেন? প্রকাশ্য বক্তৃতাস্থলে আমরা আমাদের দেশের চিরাগত দয়া-ব্রতের বিরুদ্ধে অনেক কথা ব্যাখ্যাত হইতে শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। ব্রাহ্ম-সমাজের হাতে এখন বিশেষ কোন পরোপকারের কাজ বড় একটা দেখিতে পাইবে না ; কার্য্য বা সেবা-জগতে ব্রাহ্ম-সমাজ মরণের মুখে। দাতব্য-বিভাগ নামে আছে, কিন্তু কাজে নগণ্য। সেবায় জগৎ মুগ্ধ, সেবায় জগৎ বশ। সাধারণ হিতজনক কাজ হাতে না থাকিলে লোকে ব্রাহ্মদের আদর করিবে কেন, বলত? দিন দিনই ব্রাহ্মদের সৎকাজ লোপ পাইতেছে, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজ আপামর-সাধারণের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

৪র্থ।—প্রেমের অভাব। সহানুভূতি নাই, সুতরাং প্রেমও নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে প্রেম জিনিসটা ব্রাহ্মসমাজে বড়ই দুর্লভ। প্রেমের আকর্ষণ, মহা আকর্ষণ। বহু দূরের কথা নয়, যে প্রেমের গুণে ব্যুথ সাহেবের আজ্ঞাধীনে লক্ষ লক্ষ লোক ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় কাজ করিতেছে, যে প্রেমে ব্যুথ রাস্তার ধূলিকণা কুড়াইয়া স্বর্গের দেবতা সকল গড়িতেছেন; সেই প্রেমের অভাবে ব্রাহ্মেরা দিন দিন ছিন্ন-ভিন্ন, খণ্ড-ভণ্ড হইয়া পড়িতেছেন। যে দিকে চাই, কেবল শুষ্কতা, কেবল মতের ঝগড়া, কেবল নীরস শাসনবাণী, কেবল বৈষম্যের তীব্র কোলাহল, কেবল ছোট-বড়-ভেদাভেদ-জ্ঞানের নিত্য-নব-লীলা। প্রেমের অভাবে ব্রাহ্মেরা ভিতরে বাহিরে শত শত দলে বিভক্ত, ভালবাসার অভাবে ব্রাহ্মেরা কেহ কাহার গুণ দেখিতে পারেন না, অথবা গুণকেও দোষ বলিয়া গ্রহণ করেন। প্রেমের অভাবে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি এখন ছিন্ন-মূল। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কোথায় পশু পক্ষীকে পর্য্যন্ত ভালবাসিবে, এখন ব্রাহ্ম স্বদলের লোককেও ভালবাসিতে পারে না, বাহিরের লোক ত দূরের কথা! ভাব, কেমন প্রেম। জৈনদের ন্যায় মৎস্য-মাংস-ত্যাগী ব্রাহ্ম অনেক দেখা যায়, কিন্তু ভ্রাতা-দ্রোহী নয়, পরনিন্দাকে কণ্ঠের ভূষণ করে নাই, এরূপ ব্রাহ্ম এখনকার দিনে মিলে অল্প। উৎসবে ক্রন্দনের রোল প্রতি বৎসরেই শুনা যায়, কিন্তু উপাসনা-গৃহের বাহিরে আসিয়া পরনিন্দা করে না, বিধাতার পুত্র কন্যাকে ঘৃণা করে না, এমন লোক বড়ই বিরল। হায়, বিধাতার প্রেম-ভিখারী নর নারী, তাঁহার সৃষ্ট নর নারীকে কত অপ্রেম চক্ষে দেখিতেছে! "এ ব্যক্তি পতিত, এ ব্যক্তি

অপরাধী, এ রমণী বেশ্যা, এ রমণী কুলটা;—আর আমি স্বর্গের রাজা!!” কি নিদারুণ অপ্রেমের কথা, কি আস্পর্দ্ধা-গর্ব্বিত বাণী! ভালবাসার অভাবে দয়া গেল, মমতা গেল, এই ব্রাহ্ম-সমাজ একটা শুষ্ক মরুভূমি সদৃশ হইয়া উঠিল! ব্রাহ্ম-সমাজের এক সময়ের অতি আদৃত প্রেমের বাজার, এখন সমালোচনা নামক একটা প্রকাণ্ড দস্যু অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যে অন্যকে ভালবাসে না, সে অন্যের ভালবাসা কিরূপে পাইবে? আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, প্রেমের অভাবে দিন দিন ব্রাহ্ম-সমাজ জগতের ভালবাসা হারাইতেছে।

৫। পঞ্চম কারণ—চারিত্র্য বলের অভাব। উৎসবে মাতে অনেক লোক, কিন্তু চরিত্রবান লোকের সংখ্যা অল্প। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, স্থানে স্থানে কয়েকজন পুণ্যশ্লোক ক্ষণজন্মা পুরুষ আজও আছেন বলিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ আজও আছে, কিন্তু বহু লোক যে কথার ধার্ম্মিক,—সমাজ-সংস্কার বা পোষাকের খাতিরে ধার্ম্মিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই, বোধ হয়, দিন দিন দেখিতেছি, কঠোর পরীক্ষার দিনে অনেকেরই পদস্খলন হইতেছে। এ কথা বলিলে ব্রাহ্মেরা রাগ করেন,—ইহা চরিত্রহীনতার অন্যতর প্রমাণ। যে প্রকৃত চরিত্রবান, সে অন্যের কথায় রাগে না। বিধাতার নিকট যে খাঁটী, লোকের প্রশংসার জন্য লালয়িত বা নিন্দার ভয়ে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট সে কখনও নয়। এখন দেখি, ব্রাহ্মেরা সাধারণের ভয়ে জড়সড়। এই কাজ করিব, মানুষেরা কি বলিবে? ধর্ম্ম কি বলিবে, বিবেক কি বলিবে, এরূপ আদর্শমূলক কথা বড় একটা কেহ ভাবেনা, মানুষেরা কি বলিবে, ইহাই অনেকের চিন্তা। বলি ধর্ম্ম বড়, বিধা-তার আদেশ বড়, না লোকের প্রশংসা বড়? অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি, ব্রাহ্মসমাজ অন্যকে চালাইবে কি, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ যেন দেশ-সাধারণের দ্বারা চালিত হইতেছে। সাধারণের ভয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতা খর্ব্বতা লাভ করিতেছে, জাতি-ভেদ রূপান্তর পুনরুদিত হইতেছে, সাধারণের ভয়ে পতিতজনকে আশ্রয় দিতে ব্রাহ্মেরা কুণ্ঠিত হইতেছে, সাধারণের ভয়ে বীরের ন্যায় বিবেকের আদেশ পালনে বীতশ্রদ্ধ হইতেছে। ভক্ত কেশবচন্দ্র বলিতেন যে, “লোকের কথায় ভাল কাজও করিব না, বিধাতার কথায় করিব।” ব্রাহ্মেরা কিন্তু লোককেই আজকাল অধিক মান্য করিয়া চলিতেছে। চরিত্রে যে অটল, সে কখনও মানুষকে এত ভয় করিয়া চলিতে পারে না। সে বীরের ন্যায় আপন মনোমত কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিয়া যায়, মানুষের নিন্দা বা প্রশংসার ভিখারী হয় না, মানুষের ভয় রাখেনা। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবনা, কেননা, চারিত্র্যবলে একা খ্রীষ্ট, একা শ্রীচৈতন্য, একা মহম্মদ, একা বুদ্ধ জগতে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—আর ব্রাহ্ম-সমাজ যায় যায়—যাইতে বসি-য়াছে। সত্যের আদর, পুণ্যে আস্থা থাকিলে এমন করিয়া সমাজ যায় না। হায়, ধর্ম্মকে হজম করিলে এমনি করিয়া পাপের অত্যাচার বাড়ে না।

৬। ষষ্ঠ—সাধনায় সিদ্ধির অভাব। কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম দল ছাড়িয়া অন্যপথ অবলম্বন করায়, সাধারণের বিশ্বাস জন্মি-য়াছে, ব্রাহ্ম-সমাজের সাধনায় সিদ্ধি লাভ

করা যায় না। অটলভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে সাধনার অসাধ্য কি, জানিনা। নেপোলিয়ন বলিতেন, "অসম্ভব" নামক কথাটা অলস ব্যক্তিদের সৃষ্টি। মন্ত্রগ্রহণ করিয়া যে প্রকৃত সাধনা করে, তাহার নিকট অসম্ভব কিছুই থাকে না—সাধনায় গিরি উল্লঙ্ঘন করা যায়, সমুদ্র মন্থন করা যায়। রিপু ইত্যাদি দমন করা ত দূরের কথা, সাধনায় বশ করা যায় না, এমন পশুও জগতে নাই। সাধনায় সিদ্ধির অভাবে লোভীব্রাহ্ম, রিপুপরায়ণ ব্রাহ্ম, ক্রোধপরায়ণ ব্রাহ্ম, পরদ্বেষী-ব্রাহ্ম, হিংসুক-ব্রাহ্ম—কতরূপ ব্রাহ্মের কথা শুনা যায়। উৎসব আসিতেছে, লোক এখনই মাতিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতেছে, কিন্তু হায়, ইহার মধ্যে কয়টী লোক সাধনায় সিদ্ধ, জানি না। ধর্ম্মটা যেন এখন স্থানে বা সময়ে নিবদ্ধ! অমানুষিক ধৈর্য্য নাই, কঠোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা নাই, অটল ব্রতপরায়ণতা নাই, ব্রাহ্মেরা স্বেচ্ছাচারিতা-পবনের সাহায্যে, স্রোতের শৈবালের ন্যায়, আজ সংসার-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। দশটা এমন লোক দেখিনা, যাঁহারা মন্ত্রে অটল-ভিত্তি, যাঁহারা দল-বাদের উপরে উঠিয়া বীরের ন্যায় বলিতে পারেন, "স্বর্গও যদি চূর্ণ হয়, তবুও সত্য ও ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দিব।" গুরুবাদ ব্রাহ্মসমাজে নাই বটে, কিন্তু দল-নীতায় মনুষ্যের বিশেষত্ব খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে;—পাপের বিরুদ্ধে স্বর তুলিতে মানুষ যেমন ভীত হইতেছে, সমাজের দুর্গতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে তেমনই ভয় পাইতেছে। আত্মীয় বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়াও এখন ব্রাহ্মেরা দলের প্রশংসা বা ভালবাসার খাতিরে দুর্গতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেছে না। গুরুবাদের স্থান এখন দলবাদরূপ দাসত্ব-প্রথা দখল করিয়াছে। ইহা কি কম দুঃখের বিষয় যে, ব্রাহ্ম-সমাজে কপটতা প্রশ্রয় পাইতেছে! গুরুবাদ নাই, কিন্তু দলবাদ সর্ব্বনাশ করিতেছে। দলবাদ গড্ডলিকার প্রবাহ সৃজন করিতেছে। একজন যে পথে যাইতেছে, না বুঝিয়াও দশজন সেই পথে ছুটিতেছে। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন সাধনার ফল। স্বাধীন সাধনার অভাবে স্বাধীন চিন্তা লোপ পাইতেছে। ইহাতে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ধর্ম্মনিমগ্ন ব্যক্তি বিরল। যে প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহাকেও যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" মন্ত্র সাধনা করিতে হইবে, এমন কি অকাট্য যুক্তি তুমি দেখাইতে পার? দেখে নাই, বুঝে নাই, অথচ সেও এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। যে কখন সন্দেস খায় নাই, সে যেমন সন্দেসের মিষ্টত্ব ধারণা করিতে পারে না, ইহাতেও সেইরূপ ফল হইতেছে। দশজনে যাহা করে, আমার তাহা কর্ত্তব্য হইতে নাও হইতে পারে। বিধাতার নিকট ভিন্ন কাহারও নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা বিধেয় নহে। কেননা, আমার অভাব অন্যে বুঝে না,-কেননা আমার মন পৃথক। বিধাতার ইচ্ছা যে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বজায় থাকিবে। এই হিসাবে গুরুবাদ, দল-বাদ পৃথিবীতে থাকিতে পারে না, রাখা উচিত নয়। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের এমনি সাধনার প্রণালী—এক পথ ধরিয়াই চলিতে হইবে, একটু এদিক ওদিক হইলেই গোল। অসম্ভব সম্ভব করিতে গিয়া ফল এই হইতেছে, দিন দিনই দল বৃদ্ধি পাইতেছে,—দিন দিনই মানুষ ভিতর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের খোসা ধরিতেছে। বৈরাগ্য এখন

গৈরিকে, অথবা মৎস্য মাংস আহার-ত্যাগে ; ভক্তি, এখন মধুর কথা উচ্চারণে,—চরিত্র এখন বাহ্য পরিচ্ছদে। সারধর্ম্মের ভিতরে অল্পই প্রবেশ করিতে পারিতেছে, বাহির ধরিয়াই অনেকে চলিতেছে। পরিধানে গৈরিক বস্ত্র লইলে যেমন প্রকৃত বৈরাগ্য হয় না, মুখে মন্ত্র জপ করিলেও সেইরূপ সাধনা হয় না। অন্তরে, আত্মার মূলে অবগাহন করা চাই, সত্যপান এবং পবিত্রতা হজম করা চাই। দুঃখের সহিত বলিতেছি, এইরূপ সাধনার পথে অন্তরায়, ব্রাহ্ম-সমাজের একদেশদর্শী সাধন-প্রণালী। ব্রাহ্ম-সমাজের সাধন-প্রণালী, ব্যক্তিত্বের বা বিশেষত্বের ভয়ানক বিরোধী। এইজন্য, এই প্রণালীর সাধনায় সিদ্ধ হন, অতি অল্প ব্যক্তি। এইজন্য, বিজয় বাবু ও রামকুমার বাবু-প্রমুখ ব্যক্তিগণ দল ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছেন। তাঁহারাও যে স্বাধীন সাধনার বিরোধী এবং সর্ব্বনাশী গুরুবাদে জর্জ্জরিত, ইহা অবশ্য দুঃখের বিষয়। অবশ্য ইহা দুঃখের কথা যে, তাঁহারা আবার দল প্রস্তুত করিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহ সৃজন করিতেছেন। সাধনাকে প্রতি ব্যক্তির উপযোগী করিতে হইলে যে গভীর চিন্তার প্রয়োজন, ব্রাহ্ম-সমাজের বহির্মুখী সাধনার প্রণালীতে তাহা দৃষ্ট হয় না। পতন, চরিত্রহীনতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, পরনিন্দা এজন্য ব্রাহ্মদের পক্ষে অপরিহার্য্য। সুতরাং সাধারণের ভালবাসা না পাওয়ার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান।

শেষ কথা এই—ব্রাহ্মের বিশ্বাস ও নির্ভর-হীনতাই বর্ত্তমান অধোগতির কারণ এবং ইহাই বিদ্বেষের মূল। ভালকে ভাল বলে না, এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। প্রকৃত ভক্তের আদর সর্ব্বত্র। কিন্তু সেরূপ বিশ্বাসী বা ভক্তের সংখ্যা অল্প। অনেক দিন পূর্ব্বে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "ব্রাহ্মদের মধ্যে এত দলাদলি বা ঘৃণা বিদ্বেষ দেখা যায় কেন ?" আমরা বলিয়াছিলাম—"কেবল তন্ময়ত্বের অভাব অথবা বিশ্বাসহীনতা" ইহার কারণ। বিধাতার অটল বিশ্বাস থাকিলে, বিধাতার সৃষ্ট জীবকে মানুষ কখনও ঘৃণা করিতে পারে না। তারপর, যাহাদের মস্তক এক বিশ্বাধিপ বিধাতার চরণে বিলুণ্ঠিত, এমন সম-বিশ্বাসীদের মধ্যে, প্রকৃত বিশ্বাস উদয় হইলে, বিদ্বেষ থাকা কখনই সম্ভব নয়। বিশ্বাসহীনতাই ব্রাহ্মদের সকল অধোগতির মূল। লোকেরা ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়ে এইজন্য, নূতন দল বাঁধে এইজন্য, ব্রাহ্ম পরস্পরকে ঘৃণা করে এইজন্য, অপ্রেমে মরে এইজন্য। খ্রীষ্ট বলিতেন—"তোমার যদি সর্ষপ-কণার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, পর্ব্বতকে বলিও তুমি স্থানান্তরিত হও, পর্ব্বত অমনি স্থানান্তরিত হইবে।" বিশ্বাসহীনতায় এ অমূল্য কথাকেও আমরা এখন কাল্পনিক বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এই দেশব্যাপী বিশ্বাসহীনতা-প্রযুক্ত হিন্দুসমাজে একটা পুনরুত্থানের হাঙ্গামা উঠিয়াছে, এবং ব্রাহ্ম-সমাজে তাহার প্রতিবাদ চলিয়াছে। বিশ্বাসী ভক্ত কেশবচন্দ্রের তিরোধানে বঙ্গাকাশ শুষ্ক কঠোর অবিশ্বাসের ধূমে আচ্ছন্ন হইয়াছে, ব্রাহ্মেরা মারামারী কাটাকাটী করিয়া মরিতেছে। যে দোষ দেখাইতেছে, তাহার ঘাড় কামড়াইয়া খাইতেছে, কপটতার পূতিগন্ধময় পঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া মানুষ ধরিবার জন্য ছুটিতেছে, কিন্তু নিজেরা "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" রহিয়াছে।

হা ধর্ম্ম, তুমি কোথায়? আমরা বলি, ব্রাহ্ম, লোক আসে বা না আসে, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, তুমি আগে দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া দেখ, পৃথিবী কম্পিত হয় কি না। ধর্ম্মপ্রচার হয় কি না, পরযুগে ভাবিও। আমরা বিশ্বাসহীন, নির্ভরহীন, অভক্ত, আমাদিগকে জগৎ ভালবাসে না, ইহা কি বড় আশ্চর্য্যের কথা?

একান্ত কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই সকল কথা লিখিলাম। বিনীত নিবেদন, বন্ধুগণ ইহার ভিতরে কোন সত্য থাকিলে গ্রহণ করিবেন, না থাকিলে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। গভীর দুঃখে এ সকল কথা লিখিলাম, বিদ্বেষ ভাবে নাই।

ভবভূতি কাব্যের প্রগাঢ়তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে কবি-প্রকৃতির একরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছি; এখন ভবভূতির প্রগাঢ় ভাব সমূহের আভাস প্রদান করিলেই তৎসহ ভবভূতি-প্রকৃতির স্বরূপ স্পষ্টতর লক্ষিত হইবে।

ভবভূতির ন্যায় তাদৃশ ভাবে ভাব-নিবহের অভ্যন্তর বিদীর্ণ করা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। "সেই পক্ষ্মলাক্ষীর কটাক্ষ দ্বারা আমার হৃদয় অপহৃত, অপবিদ্ধ, পীত ও উন্মূলিত হইয়াছে।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবভূতি কবিজীবনে আজন্ম বৃদ্ধ; না হইলে ভাবের এতাদৃশ অদ্ভুত ছেদন, ভেদন, বিদারণ, সংযোগ ও বিয়োগ তরলমতি যুবকের সাধ্য নহে। রামচন্দ্র জানকীর স্পর্শানুভব পূর্ব্বক প্রেমে প্রমুগ্ধ-ভাবে বলিতেছেন, "সুখে ও দুঃখে যাহা একরূপ, সর্ব্বাবস্থায় যাহা সুখপ্রদ, যাহাতে হৃদয়ের বিশ্রাম, বৃদ্ধত্ব কর্ত্তৃক যাহার প্রীতি অপহৃত হয় না, বৃদ্ধকালে লজ্জাদির আবরণ দূরীভূত হইলে যাহা প্রেমের নির্য্যাস রূপে পরিণত হয়, অদ্বিতীয়, অতি বিরল, অকৈতব, সজ্জনের সেই প্রেম অতি দুর্ল্লভ সামগ্রী" (১)। "প্রিয়ে এ কি সুখ না দুঃখ, প্রবোধ না নিদ্রা, বিষধারা-সঞ্চার না মদোন্মাদ, আমি কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছিনা! তোমার প্রতি স্পর্শে সকলে-ন্দ্রিয় মোহন বিকার চেতনা শক্তিকে একবার ভ্রমিত ও পুনর্ব্বার উন্মীলিত করিতেছে।" (২)

রাম জানকীর নিদ্রিত মোহনমূর্ত্তি দর্শনে প্রেমবিকল চিত্তে বলিতেছেন, "ইনি গৃহের লক্ষ্মী, নয়নের অমৃতবর্ত্তি, ইঁহার স্পর্শ সর্ব্বাবয়বে চন্দনরস-বর্ষী, ইঁহার বাহু কণ্ঠ-দেশে বিনিবেশিত হইলে শিশির ও মসৃণ

---

(১) অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্ন হার্য্যো রসঃ
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎস্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।

(২) বিনিশ্চেতুং শক্যো সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষ বিসর্পঃ কিমু মদঃ
তব স্পর্শে স্পর্শে মম পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো।
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ।

মৌক্তিক হারের কার্য্য সম্পাদনকারী; প্রিয়ার বিরহ অসহ্য না হইলে প্রিয়ার সকলই অলৌকিক প্রীতিপ্রদ হইত, সন্দেহ নাই।" (৩)

রামচন্দ্র পুত্র স্পর্শান্তে বলিতেছেন,—"এই শিশু কি মদীয় প্রত্যঙ্গ হইতে ক্ষরিত স্বকীয় দেহোৎপন্ন বাৎসল্যের নির্য্যাস রাশি, না মদীয় শরীর হইতে নির্গত হইয়া চেতনাধাতু এই বালক-মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে? কেননা আলিঙ্গন মাত্রই এই শিশু প্রগাঢ় আনন্দের আঘাতে দ্রবীভূত হৃদয়ের ধারা দ্বারাই যেন নির্ম্মিত হইয়া আমার সমস্ত শরীর অমৃত ধারা বর্ষণ করত সন্তর্পিত করিতেছে।" (৪)

এইরূপ ভাবের শিল্পকার্য্য, সুতীক্ষ্নদর্শন, প্রশস্ত ও গভীর হৃদয়, কল্পনার হৃদয়স্পর্শী আবেগ ও তরঙ্গ, ভাব হইতে ভাবের উৎপাদন, কি ইংরেজী, কি সংস্কৃত, কোন ভাষায় প্রতিদ্বন্দ্বী কবি দৃষ্টিগোচর হন না। আবেগের এমন ঘনভাবময় পর্ব্বত, কন্দর ও নির্ঝর অন্য কোন কবির কাব্যে লক্ষিত হয় না। ভবভূতি কাব্য গঙ্গাজলের তরঙ্গ নহে, উহা বরং কন্দর, গহ্বর, নির্ঝর ও গণ্ড শৈল পূর্ণ তুহিনাবৃত আরণ্য গিরিভূমি। তদীয় কাব্যের বিরাট মূর্ত্তি দর্শনে চিত্ত বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়। অধিকন্তু কবির দৃশ্য বিষাদে জর্জ্জরিত। কবি বিপ্রলম্ভ ও করুণের প্রবাহে, ভাষায় এরূপ গভীরতা, প্রগাঢ়তা ও বিষাদ-নিশ্বাসিত করিয়াছেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। উক্তবিধ স্থলে কবির ভাষা প্রতি রেণুতে বিষাদ ও বিরহময়। প্রেমের অদ্ভুত বিবর্ত্ত ভবভূতি-কাব্য ভিন্ন অন্যত্র এমন কূলঙ্কষ নহে। যদিবা অবিমিশ্র, পরিশুদ্ধ, অতিঘন তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদ, ভয়াবহ আবর্ত্ত ও নক্রাদি পূর্ণ প্রেম-প্রবাহের চিত্র দর্শন করিতে অভিলাষ কর, তবে ভবভূতি কাব্য পাঠ কর। বৃদ্ধ ভবভূতি ব্যতিরেকে আবিগ্ন প্রেমরাজ্যের এরূপ প্রাচীন তপস্বী জগতে আর লক্ষিত হয় না। প্রেমের অদ্ভুত বিবর্ত্ত বিরহে অতিশয় স্ফুরিত হয়, তজ্জন্যে ভবভূতি বিরহ শৃঙ্গারে ও করুণে স্বকীয় কাব্য নিমজ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কেননা বিরহ ও বিপ্রলম্ভ প্রেমের নিকষ পাষাণ। যেস্থানে বিরহ নাই, সে স্থানে প্রেমের তরঙ্গ নাই। পূর্ণ বিকসিত প্রেমে, এমন কি প্রেমের আস্বাদনার্থে, বিরহ কল্পিত হয়। শাস্ত্রতঃ ইহার দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে। প্রেম বিবশা, প্রেমোন্মত্তা গোপী সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শনেও নেত্র মুদ্রিত করত তদীয় মূর্ত্তি ধ্যানে অধিকতর আহ্লাদ অনুভব করিয়াছেন।

"কৃষ্ণ পুনর্ব্বার দর্শন প্রদান করিলে কোন কোন গোপী তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করত আর তাঁহাকে দর্শন না করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করত তদীয় মূর্ত্তি অন্তরে ধ্যান করিয়া যোগীর ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।"

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্যচ
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দ সংপ্লুতা। ভাগবত।

---

(৩) ইয়ং গেহে লক্ষ্মী রিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ,
অসাবস্যাঃ স্পর্শঃ বপুষিবহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ংকণ্ঠেবাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ।

(৪) অঙ্গাদঙ্গাৎ স্রুতইব নিজো দেহজঃ স্নেহসারঃ।
প্রাদুর্ভূয় স্থিতইব বহিশ্চেতনা ধাতুরেব।
সান্দ্রানন্দ ক্ষুভিত হৃদয় প্রস্রবেনেব সৃষ্টো।
গাত্রং শ্লেষে যদমৃতরস স্রোতসা সিঞ্চতীব।

যাঁহা হউক, অধিক বিবরণ অস্থান সংরম্ভ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। সংক্ষেপত প্রেমবিরহে শতগুণ তরঙ্গায়িত হয়। এই নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক অনেক পাশ্চাত্য কবি প্রধান কাব্যসমূহ বিয়োগান্ত করিয়া গিয়াছেন। উহা আর্য্য অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত নহে। আর্য্য রঙ্গাচার্য্যগণ বিরহকে প্রেমের পোষক স্থির করিয়াও মৃত্যুকে রসবিঘ্নকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতএব সাহিত্য-দর্পণকার বলেন "মৃত্যু রসবিচ্ছেদক বলিয়া কাব্যে কুত্রাপি নায়ক বা নায়িকার মৃত্যু বর্ণিত হইবে না। কোন স্থানে প্রায় মৃত্যু বা মৃত্যু বাঞ্ছনীয় বলিয়া বর্ণিত হইবে, যদিবা মৃত্যু বর্ণিত হয়, অতি সত্বর মৃত ব্যক্তিকে প্রত্যুজ্জীবিত করিতে হইবে। যথা কাদম্বরীতে মৃত্যু বিধানান্তে প্রত্যুজ্জীবন।" *

সংস্কৃত সাহিত্যে এই জন্যই বিয়োগান্ত কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু উহাতে অভিলাষ, বিরহ, ঈর্ষা, প্রবাস ও শাপ-জনিত যন্ত্রণা, মৃত্যুর ছায়া ও প্রত্যুজ্জীবনাশ্রিত মৃত্যু যথেষ্ট আনন্দপ্রদ। †

যদিও সত্বগুণ প্রধান আর্য্য রঙ্গভূমিতে রজোগুণ প্রধান পাশ্চাত্য রঙ্গভূমির ন্যায় অমঙ্গল কদাচ রস পদবী লাভ করিতে পারে না, তথাপি মনুষ্য প্রকৃতি প্রায়ই একরূপ বলিয়া আর্য্য ও পাশ্চাত্য অনার্য্য এই উভয় জাতিতেই বস্তুত বিপ্রলম্ভই প্রেমের মাণযন্ত্র কল্পিত হইয়াছে। বিপ্রলম্ভ প্রেমের মন্থনদণ্ড, অভিমান উহার অমৃত, প্রসাধন উহার আস্বাদ, পুনর্ম্মেলন অমৃতাস্বাদ-জনিত অমরতা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বউ কথা কও।

মধুর বসন্ত মৃদু হেসে চলে যায়,
তপ্ত নিদাঘের বুকে সঁপে নব লতিকায়;
সহচরী কচিপাতা, সেও তপ্ত রবিকরে,
থর থর বিকম্পিত তপ্তবাত বুকে ধরে!
চলে গেছে কিবা দিন, এদিন সেদিন নয়,
সুখের স্বপন গেছে, এবে কিবা সুখ-ভয়!
পাতা'পরে মাথা রেখে কত উষ্ণ ভাবনায়,
ভেবে মরে দুই সখী কি হইবে ঝটিকায়!

কোকিলের কুহরবে একটু উৎকর্ণ কাণ,
হইলেও এবে তারা অতিশয় ম্রিয়মাণ;
"বউ কথা কও" স্বর বিঁধে কাণে শেল যেন,
কি কথা কহিবে বউ, বউ লাজে অতি মৌন।
"বউ কথা কও" কথা বলিতেছে কুটুম্বিনী,
রক্ত উঠে মুখে তবু "বউ কথা কও" বাণী,
বউ বুঝি মরে গেছে এ অকাল পরীক্ষায়,
কালামুখী কি হইবে করি এবে হায় হায়!

শ্রীমধুসূদন সরকার।

---

* রস বিচ্ছেদ হেতুত্বাৎ মরণং নৈব বর্ণ্যতে
জাত প্রায়ং তু তদ্বাচ্যং চেতসাকাঙ্ক্ষিতং তথা
বর্ণ্যতেঽপি যদি প্রত্যুজ্জীবনং স্যাদদূরতঃ। ২১৫
সাহিত্য দর্পণং।

† Though there are no tragedies among the number, none at least that terminate unhappily, yet these exhibit a variety not surpassed in any other stage.
Elphinstone's History of India.

শ্রীকৃষ্ণ।

কই হল গোচারণ,
কোথা র'ল সখাগণ,
কি সাধনা সাধে মন,
খুলে তা' বলিব কায়?—
মনে রাধা প্রাণে রাধা,
রাধা নামে বাঁশী সাধা,
তাই সে মানে না বাধা,"
কেবলি ডাকিতে চায়!
বুঝিনে কি পোড়া ভুল,
আগে "মান" শেষে "কুল,"
পরের নয়ন শূল
তার পরে "শ্যাম" চায়!—
বাঁশী তা বোঝেনা ছাই,
সদা ডাকে "রাই" "রাই"
আরো ত ভাবনা চাই—
তারো যে অনেক দায়!
ফুটিছে কুসুম বালা,
যামিনী জ্যোছনা ঢালা,
আমারি মরমে জ্বালা,
প্রাণে জাগে "হায় হায়"!
মধুর মাধুরী রাশি,
হৃদয়ে আসিছে ভাসি,
পাগল বিভোল বাঁশী,
আন্ মনে গান গায়!
মুখখানি ঢল ঢল,
আঁখি দুটি ছল ছল,
আমনি সে শতদল,
অমৃত উছলি যায়!—
যা হয় আমারি হবে,
এ পরাণে সবি স'বে
সে যদি বা সুখে রবে,
কেন রে কাঁদাব তা'য়?
কেন রে জাগায়ে দিব—
সে যদি ভুলিতে চায়!
ও বাঁশি! ক্ষমা দে তান,
গা'স্‌নে সাধের গান,
আর ভাঙিব না মান,
সাধিব না রাঙাপায়—
সাঁতারি যমুনা-জল
কা'ল যাব মথুরায়!

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

ভুল।

কবিতা লিখিতে যাই ছবি কেন আঁকি,
পরের হৃদয় নিয়ে করি টানাটানি,
পরাণের ভাষা গুলি কোথা ফেলে রাখি,
অজানা নূতন সুর কল্পনায় আনি॥
যশের প্রত্যাশা নাহি শুধু আশা মনে,
এখানে বর্ষিবে প্রাণে সুধা মানবের।
সকলে মুছিবে অশ্রু আকুল নয়নে;
প্রতিধ্বনি শুনিব গো শত হৃদয়ের॥
বৃথা আশা, নিজেরে যে পারেনা চিনিতে,
ভাব হারাইয়া ফেলে ভাষার তরঙ্গে।
কতশত কোলাহল পাইয়া শুনিতে,
কল্পনা ফিরিয়া আসে সভয়ে আতঙ্কে॥
হৃদয় আমার তুমি দাওনাত ধরা।
এবড় বিশ্বেতে আমি হই আত্মহারা॥

শ্রীমতী সরলা বালা সরকার।

মেঘদূত।

শ্রাবণে মুদিরময় বিষণ্ণ আকাশ,
নেহারি তড়িত লতা কনক বরণ
মনে হয় যৌবনের রম্য নিকেতন
চারুতা মণ্ডিত সেই নিরমল হাস।
এ ধনী চঞ্চল বড় সে যে অচঞ্চল
সহস্র দামিনী বাঁধা নয়নেতে যার

তুলনা:কি তার সনে হয়গো ইহার,
দামিনী কটাক্ষ শরে যে মেঘ গলিত
সেই মেঘে দূত? এতো অসম্ভব কথা।
মন্থর সলিল-বাহী—মর্ম্মের বারতা,
বহিতে হইলে হবে নিশ্চল স্তম্ভিত;
শ্রাবণে প্রকৃতি আঁধা স্মৃতি বিকশিত
বিরহ আতপে প্রেম সতত ব্যথিত।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

স্বর্ণ-রেণু।

গৌরাঙ্গ রূপেতে নারী প্রেম অবতার,
কিছুতে মিটেনা তাই প্রেমের পিয়াসা;
আত্ম পর ভেদাভেদ না করি বিচার,
সকলের সনে সম করে ভালবাসা।
পাপীতাপী, সুখী দুখী, জগাই মাধাই,
কতবে তরিয়া গেল রমণীর প্রেমে,
শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত গোঁসাই,
কভু যাহা পারে নাই বহু পরিশ্রমে।
কত মুসলমান হায় হ'ল হরিদাস,
দরিদ্র হইল কত রূপ-সনাতন,
রমণী হৃদয়ে তৃষ্ণা জাগে বারমাস,
মিটেনা করিলে প্রেম সহস্রেক জন।
রমণী সাক্ষাৎ যেন প্রেম অবতার,
প্রেমের পিপাসা কভু মিটেনা তাহার॥

শ্রীভুবনমোহন দাস।

সে বিনে।

হায় কেন বা সুধাও, মুখপানে চাও
হেথায় আর সে নাহি যে,
এই স্বভাবের সাজে, সেই সবি আছে
তারে শুধু তার চাহি যে।
ওই গগনের গায় চাঁদ হেসে যায়
তরল স্বপন তুলিয়া,
ওই সেই মধুবায় মধু বহে যায়
দিক্ ঠাঁই সব ভুলিয়া,
হাসে তেমনি ত ফুল, সেই অলিকুল
আকুল তারে চুমিছে,
সেই হেসে হেসে লতা, কারে কহে কথা
প্রেম ভরে তনু নুমিছে,
আহা ঢল ঢল প্রাণে, কল কল তানে
যমুনা চলিছে উছলি,
ওই ডুবাইয়া দিক, গাহিতেছে পিক,
ঢালিতেছে মধু কাকলী;—
সেই সকলিত আছে স্বভাবের কাছে
কি-যেন-কি তবু নাই গো,
বুঝি সেই মুখখানি, সেই তনুখানি
শোভার তাহার চাই গো।
বুঝি সে বিনে এ ধরা, সাজেনা সাজেনা
হাসি খুসি তার রহে না,
যেন জ্যোতিহারা, হায়, হরিণী-নয়ন
নয়নের ভাষা কহে না,
যেন বিহীন-সুবাস কুসুম পলাশ
যেন ক্ষীণজ্যোতিঃ বিজরী,
যেন কাতর-নয়ন প্রভাতেরি তারা,
আবেগ হারা-নিঝরী,
যেন ধূলায় মলিন বদন নলিন,
ছিনা-তার বীণা বাজে না;—
হায় সে বিনে এ প্রাণ কেমন কেমন,
সে বিনে এ ধরা সাজে না।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

ভালবাসা।

এ ধরার ভালবাসা সেফালির ফুল
দখিনা সাঁঝের বায়, মৃদু মৃদু হেসে চায়,
বুক ভরা প্রেম—প্রাণ শরমে আকুল!
মুখেতে ফুটেনা কথা, কহিতে ব্যাকুল!
এ ধরার ভালবাসা সেফালির ফুল
নিশীথের জ্যোছনায়, লাজ-বাঁধ ভেঙ্গে যায়,
প্রেমের প্রবাহ ছোটে, অগাধ আকুল
কত কয় তবু প্রাণ কহিতে ব্যাকুল!

এ ধরার ভালবাসা সেফালির ফুল
ধীরে ধীরে নিশিশেষে, ম্লানমুখ, শ্লথ বেশে
দীন আঁখি নিদ্রাবেশে আধ ঢুলু ঢুল !
প্রেমের কাহিনী শেষ প্রাণ নিদ্রাকুল !

এ ধরার ভালবাসা সেফালির ফুল
উষার শীতল বায়, অবসাদে ঝরে যায়
প্রেমের মধুর সৃষ্টি উচ্ছিন্ন নির্ম্মূল !
এ ধরার ভালবাসা স্বপনের ভুল !

ঢাকার পুরাতন কাহিনী। (৭)

সেনরাজগণ।

এক সময়ে বল্লাল সেন মাতার নিকট প্রতিশ্রুত হন যে, তিনি পথিমধ্যে কোথায়ও না থামিয়া যতদূর পর্য্যন্ত গমন করিতে পারিবেন, ততদূর স্থান ব্যাপিয়া বল্লাল এক দীর্ঘিকা খনন করাইবেন। এই দীর্ঘিকা এরূপ বৃহৎ হইয়াছিল যে, তাহার এক পারে দুন্দুভিধ্বনি কলিলে অপর তীরের লোকেরাও তাহা শুনিতে পাইতনা। এই জলাশয় খনন সময়ে সায়ংকালে স্ব স্ব কোদালি পরিষ্কার ও ধৌত করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক শ্রমজীবী এক এক কোদালি মাটী কাটিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত। এইরূপে 'কোদাল ধোওয়া দীঘি' নামে সুপ্রশস্ত জলাশয় খনিত হয়। একদা কোন জ্যোতির্ব্বিৎ গণনা করিয়া স্থির করেন যে, মৎস্যের কণ্টক বিদ্ধ হইলে রাজা বল্লালের অপমৃত্যু ঘটিবে। এই নিমিত্ত তিনি রাজাকে নিষ্কণ্টক মৎস্য ভক্ষণের পরামর্শ দেন। এই উপদেশ মতে পদ্মা নদী হইতে প্রত্যহ কাঁচকি মৎস্য আনয়নের নিমিত্ত যে পথ প্রস্তুত হয়, তাহা 'কাঁচকী দরজা' নামে পরিচিত হয়।

এক সময়ে রাজার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে এক সিদ্ধ সন্ন্যাসী ক্ষুব্ধচিত্তে পথপ্রান্তে অবস্থিত গজবন্ধনী গজারি বৃক্ষের শুষ্ক আলানের উপর রাজার নিমিত্ত আনীত আশীর্ব্বাদ রাখিয়া যান। সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদের জোরে গজারিবৃক্ষের স্তম্ভে অচিরে শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড সজীব বৃক্ষে পরিণত হইয়া উঠে।

২০। ২২ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক উপাখ্যান যে ইতিহাসের পবিত্র স্থান অধিকার করিতেছিল, অম্বিকা বাবুর 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'ই তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে। এই নিমিত্ত এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখিত হইল। যে স্থলে প্রকৃত ও প্রামাণিক ইতিহাসের অভাব হয়, সেই স্থলে জনপ্রবাদই ইতিহাসের স্থলবর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে এবং তাহা অবলম্বন করিয়াই ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়। জনশ্রুতিতে সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবহারের নিদর্শন থাকাতে, ভারতবর্ষের ইতিহাস সংগ্রাহকের পক্ষে তাহা একবারে অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। এই সকল উপাখ্যানের মধ্যে দ্বিতীয় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ইতিহাস ইহা অমূলক বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে।

যে সময়ে সেনরাজগণ বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে তুঁয়ার রাজপুতগণ দিল্লীর এবং গাহড়বালবংশীয় রাঠোর রাজপুতগণ কনোজের সিংহাসন

অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। ১০৫২ খ্রীঃ বিলনদেব দ্বিতীয় অনঙ্গপাল উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর রাজাসনে যে তুঁয়ারবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বংশ তৃতীয় অনঙ্গপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক শত বৎসর পরে শেষ হয়। এই শেষ অনঙ্গপালের দৌহিত্র আজমিরপতি সোমেশ্বরের পুত্র চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজ দ্বারা তুঁয়ারবংশের লোপের পর দিল্লী ও আজমীর রাজ্য একত্রিত হয়। এই পৃথিরাজের কীর্ত্তিকাহিনী মহাকবি চাঁদ 'পৃথ্বিরাজ রাসৌ' নামক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কাব্যে বর্ণনা করিয়া, তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন। ১১৯৩ খ্রীঃ পানিপথের ভীষণ যুদ্ধে মহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর হস্তে দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে, ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক্তর হারনলির মতে ১০৫০ খ্রীঃ চন্দ্রদেব চেদিরাজ্যের কুলাচারীবংশীয় কর্ণদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কনোজে গাহড়বালাখ্য রাঠোর বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ ডাক্তর মিত্র কনোজরাজাগণের যে দুই খানি তাম্রশাসনের বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, চন্দ্রবংশীয় রাজা যশোবিগ্রহ ও মহীচন্দ্র এই চন্দ্রদেবের পিতামহ ও পিতা ছিলেন। চন্দ্রদেবের পর মদন পাল, গোবিন্দচন্দ্র, বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্র যথাক্রমে স্ব স্ব পিতৃবিয়োগের পর কনোজের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ২৬ বৎসর রাজত্বের পর এই জয়চন্দ্র ১১৯৪ খ্রীঃ মহম্মদ ঘোরীর নিকট পরাজিত হইয়া পলায়নকালে গঙ্গায় নিমগ্ন হইলে, হিন্দুদিগের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য আর্য্যাবর্ত্ত হইতে অন্তর্হিত হইলেও তৎপরিবর্ত্তে মুসলমান প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হয়। * এই জয়চন্দ্রের বংশধর শিবজী মারবারে যাইয়া বর্ত্তমান

* কৈলাস বাবু ডাক্তার মিত্র ও অন্যান্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের এসিয়াটীক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে কনোজরাজগণের নাম ও আনুমাণিক শাসন সময় সংগ্রহ করিয়া, তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত নব্যভারতে প্রকাশ করেন নাই দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইলাম। তিনিই আবার বাঙ্গালার লেখকচূড়ামণি শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবুর লিখিত ও 'প্রচার' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের ('ঐতিহাসিক কলঙ্ক' কি অন্য কোন নাম ছিল, স্মরণ নাই) সমালোচনা উপলক্ষে, নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশার্থ অতি নির্ল্লজ্জ ভাবে পাঠককে সম্বোধন করিয়া বঙ্কিম বাবুকে উপদেশছলে লিখিয়াছিলেন "যদি ইতিহাস শিক্ষা করিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর এবং মেইন মিত্র হাণ্টার প্রভৃতির কুসুমোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তস্করতা বৃত্তি অবলম্বন করিওনা" !!! সর্ব্বজ্ঞ উপদেষ্টা আপনার উপদেশ অনুসারে চলিবেন বা বৈদ্যরাজ আত্মব্যাধিব স্বয়ং চিকিৎসা করিবেন, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। বিজ্ঞলোকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া তাঁহাদের ভাব ও ভাষা ও বিষয় গ্রহণ করিয়া স্বাধীন গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান আমাদের অত্যন্ত রোগ জন্মিয়া উঠিয়াছে। বাবু হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সুবিজ্ঞ কর্ণেল মেলিসনের 'দেশীয় রাজা ও রাজগণ' নামক গ্রন্থ হইতে "রাজপুতনার ইতিহাস" লিখিলেন, অথচ ইংরেজ গ্রন্থকারের নামটী পর্য্যন্ত পুস্তকের কোন স্থলে উল্লেখ করেন নাই। কলিকাতা রিভিউতে সুপণ্ডিত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র (যদি আমাদের স্মৃতিবিভ্রম না হইয়া থাকে) সুরসিক রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত তাহারই সংক্ষিপ্তসার নব্যভারতে প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মূল প্রবন্ধ কি প্রবন্ধ-লেখকের নামটী পর্য্যন্ত কোথায়ও উল্লেখ করা উচিত বোধ করেন নাই। হায়! কবে আমরা এরূপ কপটাচার ও সঙ্কীর্ণ হৃদয়কে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিতে শিখিব।

যোধপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ ১০৬৬ হইতে ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অতি দক্ষতা ও নিপুণতার সহিত মহারাজ বল্লাল-সেন বাঙ্গলার শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। আবুল ফাজলের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি ১০৬৬খ্রীঃ বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৪১ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ডাক্তার মিত্র আবুলফাজলের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির শ্রেণী বিভাগরূপ বহুবর্ষব্যাপী সামাজিক বিপ্লব যাঁহার আদেশে ও কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হয়, তিনি অবশ্যই দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। বল্লাল-সেন যে কেবল বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন, তাহা নহে, তিনি বিখ্যাত গ্রন্থকারও ছিলেন। তিনি নানা স্মৃতিশাস্ত্র স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়া প্রৌঢ় বয়সে 'দানসাগর' নামে স্মৃতিগ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করেন। তাঁহার রচিত এই গ্রন্থে মহারাজ বল্লাল সেনের সামান্য পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা প্রদর্শিত হয় নাই। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার বংশধরগণ সংস্কৃত কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া না থাকিলেও, নানা বিষয়িনী কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। বল্লালসেন, লক্ষ্মণ সেন, মাধব সেন ও কেশব সেনের রচিত কবিতা এক্ষণ পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে। বস্তুতঃ সেনরাজ-দিগের সময়ে একদিকে হিন্দুধর্ম্মের যেমন বহুল উন্নতি সঞ্চিত হয়, অপরদিকে সমস্ত দেশ মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যেরও সেই সঙ্গে সঙ্গে বহুল চর্চ্চা হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। প্রেমের জয়।—শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীচরণ চক্র-বর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ৷৵১০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় উনবিংশ শতাব্দীর অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার মুক্তিসেনা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিত হইয়াছে। আমাদের দেশে যদি কিছুর অভাব থাকে তো প্রেমের। সকলেই এখন মুখসর্ব্বস্ব ও ভোগবিলাস-পরায়ণ। এ সময়ে মুক্তিসেনার স্বর্গীয় স্বার্থত্যাগ ও বিশ্বজনীন প্রেম, বিধাতার নিগূঢ় লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় নরনারীর এই কাহিনী একবার পাঠ করা উচিত। লেখা উত্তম।

২। বিজ্ঞানসার।—মূল্য ।৵০। ২০ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বিষয়গুলি সরল ভাষায়, অল্প কথায় বেশ লিখিত হইয়াছে।

৩। রঘুবংশ।—বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ, ১ম হইতে ৮ম সর্গ পর্য্যন্ত। শ্রীনবীনচন্দ্র দাস, এম্, এ, প্রণীত। মহাকবি কালী-দাসের সংস্কৃত রঘুবংশ কাব্যজগতে এক অমূল্য কীর্ত্তি। আমাদের মতে তাঁহার কবিতাংশ অনুবাদের যোগ্য নহে। কবির ভাষা পড়িয়াই তাহা কেবল আস্বাদন করিতে হয়। তবে গল্পাংশ ও ভাবাংশ অনুবাদ হইতে পারে। এ গ্রন্থে নবীন কবি তাহাতে অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। অনেক স্থান পড়িয়া দেখিয়াছি, অনুবাদ যথাযথ ও

প্রাঞ্জল হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে ইহা বেশ সুবিধাজনক।

৪। কবি বচনসুধা।—শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন সঙ্কলিত। মূল্য ১৲ টাকা। দেশ-প্রচলিত নানা বিষয়িণী কবিতা সংগ্রহ করিয়া ও বাঙ্গালা পদ্যে তাহার অনুবাদ দিয়া পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। বাল্যকালে যে সকল কবিতা শিখিয়াছিলাম, তাহার কোন কোনটী ইহাতে সন্নিবিষ্ট দেখিয়া সুখী হইলাম। এরূপ কবিতা-সংগ্রহ জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। অনুবাদ গুলি মন্দ হয় নাই।

৫, ৬। তৎতত্পদ প্রদীপ ও জ্ঞানতত্ব।—ভিক্ষু জ্ঞানানন্দ গিরি পরিব্রাজক প্রণীত। ধর্ম্ম, নীতি ও তত্বজ্ঞান বিষয়ে কতক গুলি কবিতা-পূর্ণ গ্রন্থদ্বয়। কবিতাগুলিতে যথেষ্ট উপদেশ আছে; কিন্তু ভাষা সুমধুর তত নহে।

৭। চারুনীতি পাঠ; পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ।—দ্বিতীয় সংস্করণ। দৃষ্টান্ত মূলক নীতি কথায় গ্রন্থখানি পূর্ণ। ইহা সেণ্ট্রাল টেক্সট্ বুক কমিটী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছে। আমরা প্রথম সংস্করণে যাহা দেখিয়াছিলাম, তদপেক্ষা অনেক বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, পুস্তক খানির লেখা ভাল। কি স্কুল কি গৃহ, সর্ব্বত্র পড়িবার যোগ্য।

৮। ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা।—শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। আর্য্যজাতির কতিপয় অবস্থা বর্ণন ছলে বিদ্যানিধি মহাশয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না করিয়াছেন, এমন বিষয়ই নাই। সৃষ্টি প্রকরণ ও দশাবতার হইতে পাঁটা কাটা, প্রসাদ ভক্ষণ ও রাস নিরূপণ গ্রন্থ মধ্যে সকলেরই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। আজ কাল উত্থানকারী-দলের আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। বিজ্ঞান পড়া থাকুক আর নাই থাকুক, বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া যাহা কিছু হিন্দুসমাজ-প্রচলিত, তাহাই বৈজ্ঞানিক। বিদ্যানিধি মহাশয়কেও সেই রোগে ধরিয়াছে। একবার একটী স্কুলের ছাত্র তৃতীয়ভাগ চারুপাঠে বিদ্যুতের বিষয় পড়িয়া কোন টোলের অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহাশয়! শাস্ত্রে বিদ্যুতের বিষয় কি কিছু বর্ণিত আছে? ভট্টাচার্য্য অম্লান বদনে বলিলেন, "থাক্‌বে না কেন" এই শুন অমরকোষ কি বলিতেছেন; "তড়িৎ সৌদামিনী বিদ্যুচ্চঞ্চলা চপলাপি চ।" বিদ্যানিধি মহাশয়ও সেই ছাঁচে আর্য্য-রীতির সমালোচনা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এরূপ গ্রন্থের কিছুই প্রয়োজন ছিল না। এরূপ গ্রন্থ উন্নতিপথের কণ্টকস্বরূপ।

৯। হামির।—ঐতিহাসিক উপন্যাস।—শ্রীকিশোরীমোহন রায় প্রণীত। রাজস্থানের ইতিহাসে চিতোর কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। আলাউদ্দীনের দুর্ম্মতিই চিতোর ধ্বংশের কারণ। সেই হইতে যবনরাজ নিযুক্ত মালদেব চিতোরের শাসন-কর্ত্তা। যথার্থ উত্তরাধিকারী অজয় সিংহ ও কুমার হামির নির্ব্বাসিত। যে প্রকারে হামির মালদেবের দুহিতাকে বিবাহ করিয়া চিতোর পুনরুদ্ধার করেন, গল্পচ্ছলে তাহাই এ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক নবীন হইলেও লেখার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে। বিশেষতঃ আদিরসপ্রিয় বাঙ্গালী জাতির নভেলে তিনি যে বীররসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার কথা।

অন্যান্য পুস্তক আগামীবারে সমালোচিত হইবে।

আলোক কি অন্ধকার ? (২)

পূর্ব্বপুরুষদিগের মত বুদ্ধিবৃত্তিও আমাদিগের আর নাই। যে বুদ্ধির আমরা অহঙ্কার করি, তাহা পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত তুলনায় কিছুই নহে। তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগের প্রতিভা আর নাই, আমরা বুঝিতেও কিছুই পারি না—না বুঝি বাহ্ জগৎ, না বুঝি অন্তর্জগৎ। পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া আমরা মনে করি যে, বুদ্ধিমত্তার চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছি; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান, প্রাচ্য দর্শন বিজ্ঞানের নিকট দুগ্ধপোষ্য শিশু। আজকাল রাজনীতি ও অর্থনীতির বিলক্ষণ আড়ম্বর দেখা যায় সত্য; কিন্তু তাহাতে আমাদিগের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ যখন আমাদিগের রাজ্যও নাই, অর্থও নাই, তখন কেবল নীতি লইয়া কি করিব ? মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশীলতা তাহার আহার ব্যবহারের উপর বিস্তর পরিমাণে নির্ভর করে। যৎকালে আর্য্যঋষিদিগের বুদ্ধির জ্যোতিতে ভারত উজ্জ্বল ছিল এবং তাঁহাদিগের অতলস্পর্শী চিন্তাশক্তি প্রবল ছিল, তৎকালে আমাদিগের যে প্রকার আহার ব্যবহারের নিয়ম ছিল, এখন তাহা নাই, এখন যথেচ্ছাচারের দিন আসিয়াছে; সুতরাং আমাদিগের বুদ্ধিশুদ্ধি এবং চিন্তাশীলতাও তথৈবচ তথা দাঁড়াইয়াছে। বুদ্ধি-স্থূলকারী ও চিন্তাশক্তি-হ্রাসকারী অখাদ্যে আমাদিগের আপত্তি নাই, জাতিভেদ মানি না, যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম বুদ্ধি ও চিন্তার প্রণোদক, তাহা মানি না, যে পরিচ্ছদে শরীর ও মনে স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা পরি না এবং যে কার্য্য করিলে মানসিক শক্তির বিকাশ হয়, তাহা করি না; সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রগাঢ় চিন্তাশক্তি আমরা আর কোথায় পাইব ? পূর্ব্বে মানসিক বিকাশের গুণে ঋষিগণ যে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিতেন, তাহা এখন আর আমরা বিশ্বাসই করি না—মিথ্যা গল্প মনে করি। আহারের দোষে, ব্যায়ামের অভাবে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘনে আমাদিগের শারীরিক উন্নতিও কিছুমাত্র নাই। পুরুষপরম্পরা ক্রমেই অধিকতর দুর্ব্বল হইতেছে এবং প্রতি গৃহ এক একটী চিকিৎসালয়ে পর্য্যবসিত হইতেছে। আমাদিগের আয়ুও এক্ষণে অল্প; যে শতবর্ষ পূর্ব্বে জীবনকাল ছিল, এক্ষণে অধিকাংশ লোককে তাহার অর্দ্ধেকও দেখিতে হয় না। যে কয়দিন বাঁচি, জড়পিণ্ডবৎ হইয়াই ত থাকি; সুতরাং মনুষ্যোচিত কার্য্য করিব কবে ? যদিও স্বীকার করা যায় যে, আমরা অপর কোন বিষয়েই অবনত হই নাই, কেবল শরীরে অবনত হইয়াছি, তাহা হইলেও ইহা সহজে বলা যাইতে পারে যে, আমরা সকল বিষয়েই অবনত হইয়াছি; কারণ শরীরই সকল কার্য্যের মূল। শরীর হইতেই কার্য্য; কিন্তু সেই শরীরই যদি রহিল না, তাহা হইলে সমস্তই নিরাকার। আমরা যেমন ভীরু তেমনই দুর্ব্বল—বল না থাকিলে সাহস থাকিতে পারে না; সুতরাং আমরা গৃহিণীর অঞ্চল-ধরা, পরকৃত অপমান সহকারী এবং গালি গালাজ চড় চাপড় লাথি জুতা আমাদিগকে সকলই অম্লানবদনে চর্ব্বণ ও পরিপাক করিতে হয়। কি মানসিক কি নৈতিক, সকল উন্নতিরই মূল স্বাস্থ্য এবং

শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি। শরীর স্বচ্ছন্দ না থাকিলে কাহারও যথোপযুক্ত বিকাশ হয় না; সুতরাং আমরা দুর্ব্বল ও রুগ্ন শরীরে সুস্থ ও সবল শরীরের আনুষঙ্গিক উন্নতি কোথায় পাইব? যে আহার, পরিচ্ছদ, চালনা ও নিয়ম পালনে শরীরের পোষণ, তাহার প্রতি আমাদিগের অনেকেরই তাচ্ছল্য আছে, অর্থাভাবে অনেকে তৎপ্রতি মনোযোগ দিতে পারি না, অনেকে তাহার উপকারিতা মানি না এবং অনেকে তাহার ফলাফল জানি না। এ সকল বিষয়ে এক্ষণে তাচ্ছল্য, অভাব ও যথেচ্ছাচার চলিতেছে এবং তাহার ফলে আমাদিগের সকল প্রকার অবনতি হইয়া দ্রুত গতিতে আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে।

যে প্রণালীতে আমরা এক্ষণে শিক্ষিত হই, তাহা অনেক প্রকারে আমাদিগের উপযোগী নহে। শিক্ষা ত্রিবিধ—শারীর, মানস ও নৈতিক। আজকাল বিদ্যালয়ে একটু একটু ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র নহে এবং দিবসের অযথাকালে তাহা অভ্যাস করা হয়; তদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা কারণে তাহাতে কিছুই উপকার হইতেছেনা। শরীর পালনের অপরাপর সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বিদ্যালয়ের প্যারালেলে্ একবার বসিলে কি হইতে পারে? তাহাতে উন্নতি হইলেও সে উন্নতি কয় দিনের? বিদ্যালয় ত্যাগ করিলে আর ত ব্যায়াম ভূমিতে পদার্পণ করিব না! মানসিক শিক্ষার গুণে আমরা অল্প বয়সে অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সন্দেহ নাই। আমরা অতি বাহাদুর যে, এক অঙ্গুলি নলে সাত অঙ্গুলি বারুদ প্রবেশ করাইতে পারি; কিন্তু অগ্নি সংযোগ করিলে সে নলের আর চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই না, তখন ভাবি যে, কেবলই ভূতের বোঝা বহন করিয়াছি মাত্র। একে ত কার্য্যকরী বিদ্যা আমরা শিখি না, তাহার উপর স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে যে কোন একটা বিষয়ে গভীর জ্ঞানোপার্জ্জন করিব, তাহা আমরা করি না—ডাল, অম্বল, ঝাল, ঝোল সমস্ত মিশাইয়া গোগ্রাসে ভোজন করি; সুতরাং কিছুরই আস্বাদন পাই না। তদ্ভিন্ন তাহার ব্যবহার প্রভৃতি অন্যান্য দোষের জন্য আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এখন আর সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পায় না এবং চিন্তাশক্তি একেবারেই নাই—একটু চিন্তা করিতে হইলেই মাথায় বরফ দিয়া ধবলগিরি হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, দুই দণ্ডকাল পুস্তক পাঠ করিলেই সলমন্ কোম্পানীর নয় নম্বর চস্‌মা ধারণ করিয়া কলুর বলদ সাজিতে হয়! এবম্প্রকার বিদ্যার ফলে আমরা কেরাণী-জীবনের উপযুক্ত হইতেছি, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু সে প্রকার জীবলোকেও স্থানাভাব হইয়াছে। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প আমাদিগের আকাশ-কুসুম! পেটে না খাইতে পাইলে কর্ষণ চলেনা, কাহার জন্যই বা শস্যোৎপাদন? মূল ধন নাই যে ব্যবসা বাণিজ্য করিব, শিল্পজাত দ্রব্যের ক্রেতা না থাকিলে বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র! সুতরাং এ সকল শিক্ষারও প্রকৃত পদ্ধতি নাই, স্কুলও নাই, ছাত্রও নাই। একটা শিল্প শিক্ষার বিদ্যালয় হইতেছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি তাহার বিশেষ উপকারিতা দেখা যায় না। ধর্ম্ম ও নৈতিক শিক্ষার অভাব পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্ম এক্ষণে বিকৃত, হিন্দু-

নীতি এক্ষণে বিপর্য্যস্ত, সুতরাং কোন বিষয়েই আমাদিগের আবশ্যক মত শিক্ষা হইতেছেনা এবং দুর্ব্বল শরীরে মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার অভাব হইলে যে সকল দোষ মনুষ্যের জন্মিয়া থাকে, আমাদিগের তাহাও জন্মিতেছে, অর্থাৎ প্রবঞ্চনা, শঠতা, কপটতা ইত্যাদিতে আমরা অভ্যস্থ হইতেছি। বর্ত্তমান কালে আমরা অত্যন্ত দরিদ্র জাতি, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু দরিদ্র হইলেও উদর পূরণ করা চাই বলিয়া উপার্জ্জনের সদসদ্ উপায়ের দিকে আর কি প্রকারে লক্ষ্য থাকিতে পারে?

যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী চরিত্রের উপর আমাদিগের শিক্ষা বিস্তর পরিমাণে নির্ভর করে, তাহার অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। স্ত্রী শিক্ষা ত এক্ষণে নাই বলিলেও বলা যায়, যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে বা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রণালীর দোষে আমাদিগের মহিলাগণ কাঁঠালের আমস্বত্বে পরিণত হইতেছেন—প্রাচ্য পাশ্চাত্যে মিলিয়া যে অদ্ভুত সামগ্রীর সৃজন হইতেছে, তাহাতে আমাদিগের হিন্দুগৃহের মঙ্গল হইতেছে না। স্ত্রী চরিত্র যে একটা সামগ্রী, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না—আমরা স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে বলিতেছি না, যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে চরিত্র বলে, আমরা তাহারই উল্লেখ করিতেছি। হিন্দুর অবরোধের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত প্রবেশ করিয়া সমস্ত ভাসাইয়া দিল; ধর্ম্মাচরণ যদি কিছু থাকে, এখন কয়েকজন বৃদ্ধার দ্বারাই তাহা আচরিত হইয়া থাকে—তাঁহাদিগের গঙ্গা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত গঙ্গাগর্ভে যাইবে, এবং তৎসঙ্গে স্বার্থ, বিলাস, অনাচার ইত্যাদি আমাদিগের গৃহের রাজরাজেশ্বর হইয়া দাঁড়াইবে! যে স্ত্রী চরিত্রগুণে আমাদিগের গৃহ স্বর্গতুল্য পবিত্র ছিল, তাহার অবনতির অবস্থা মনে হইলে হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগে; সুতরাং এইখানেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত। আর কত অবনতির কথা বলিব? বলিতে লজ্জা করে, দুঃখ হয় এবং মর্ম্মে বড় আঘাত লাগে!

অবনতির শেষ সীমায় পৌঁছিতে পৌঁছিতে জাতি মাত্রের ধ্বংস হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহারা হয় মরিয়া যায়, স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করে, এবং অন্য জাতির সহিত মিলিত হইয়া যায়, অথবা আবার উন্নত হয়। ইহাই সকল জাতির অবনতি ও উন্নতির সাধারণ নিয়ম। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, আমাদিগের অদৃষ্টে কি আছে? কেহ কেহ বলেন যে, একবার বিবর্ত্তন হইয়া গেলেই সকল বস্তুর আবর্ত্তন আরম্ভ হয়। এ কথা অবশ্য সত্য; কিন্তু ইহা কেবল জড়ের পক্ষেই সত্য বলিয়া বোধ হয়—চৈতন্যের পক্ষে নহে। একটী ফুল একবার ফুটিলে আবার ফুটে না এবং ধ্বংস হইয়া যায়, কোন বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেলে আবার সরল ও সজীব হয় না, মনুষ্য মরিয়া গেলে আর বাঁচে না; এ সকল ঘটনা আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি। কিন্তু আবার ইহাও প্রত্যহ দেখা যাইতেছে যে, যে সকল ফুল, বৃক্ষ, জীব ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, তাহাদিগের স্থানে অন্যে জন্ম গ্রহণ করিতেছে। যদিও যে বৃক্ষ বা জীব ধ্বংস হয়, তাহা আবার নব জীবন লাভ করে না; কিন্তু তাহা হইতে যে বীজ জন্মে, সেই বীজ হইতেই তাহার স্থান পূর্ণ হয়। বীজ অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য বটে; কিন্তু তাহাতে বৃক্ষের সমস্ত উপকরণ লুক্কায়িত থাকে, রৌদ্র ও

রসের সংযোগে তাহা হইতে আবার প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। যদি এই যুক্তি অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, কোন জাতির অধঃপতন হইলে তাহার পুনরুত্থান অসম্ভব নহে, অধঃপতন হইলেই পুনরুত্থান সম্ভব, একেবারে ধ্বংস হইলে নহে। সুতরাং আমরা বলি যে, এই নিয়মে অধঃপতিত ভারতেরও পুনরুত্থানের আশা আছে এবং যাঁহারা বহু দূরে অন্ধকারের মধ্যে আলোক রেখা দেখেন, তাঁহাদিগের অনুমানই সত্য হইলে হইতে পারে বলিয়া বিবেচনা করি। কোন জাতির বহুকালের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহাকে কেবলই মস্তক উন্নত করিয়া থাকিতে দেখা যায় না, উন্নতির যুগ অতিবাহিত হইলে অবনতির যুগ আইসে, অবনতির যুগ গত হইলে আবার উন্নতির যুগ আইসে। যে কোন জাতির বহু যুগ-ব্যাপী ধর্ম্ম ও নৈতিক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সময়ে সেই জাতি উন্নতির তরঙ্গে সাঁতার দিতেছে, আবার অন্য সময়ে অধর্ম্মের পঙ্কে পড়িয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। অধর্ম্মকে বিনাশ এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং যুগে যুগে অবতীর্ণ হন এবং গীতা শাস্ত্রপ্রোক্ত তাঁহার আশ্বাস বাক্য * যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সংসার হইতে মনুষ্যকে উচ্ছেদ করা কখনই মঙ্গলময় সৃষ্টি কর্ত্তার অভিপ্রায় নহে; সুতরাং প্রয়োজন হইলেই বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য, রুসো, ওয়াশিংটন, ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতির ন্যায় অমানুষী প্রতিভার অভ্যুদয় হয়, এবং সেই প্রতিভার বলে লোকে বিনাশের হস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কোন জাতি অবনত হইলেই যে তাহার ধ্বংস নিকটবর্ত্তী, এমন নহে; সেই অবনতির মধ্য হইতেই ভস্ম মধ্যস্থ অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় এমন এক তেজ বাহির হয় যে, তাহার আভায় সমস্ত জাতি আবার উজ্জ্বল ও প্রভাময় হইয়া উঠে। উন্নত হইলেই পতন আছে, চির দিন কেহই উন্নত থাকিবার প্রত্যাশা করিতে পারেন না; আবার অবনত হইলেও উন্নতির আশা একেবারে বিলুপ্ত হয় না। অতএব যাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে উন্নতি অবনতির গতি স্বীকার করেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত, এ কথা কোন মতেই বলা যাইতে পারে না।

যাঁহারা বলেন যে, অবনত জাতির একটী জাতীয় জীবন অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় লুক্কায়িত না থাকিলে কোন জাতিই পুনরায় উন্নত হইতে পারে না, তাঁহাদিগের ইহা জানা কর্ত্তব্য যে, জাতীয় জীবন সকল জাতিরই একভাবে গঠিত হয় না, এবং অমানুষী প্রতিভার দ্বারা তাহা সৃজিত হইতে পারে। কোন জাতি অবনত হইলেই মৃত হয় না—জড়ের ন্যায় জাতীয় জীবন একেবারে মৃত্যুর অধীন নহে। বৃক্ষের বীজের মধ্যে যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে, তাহা কে দেখিতে পায়? সুতরাং জাতীয় জীবন কোন সময়ে অদৃশ্য হইলেই যে তাহার আর পুনঃ প্রকাশ নাই, এমন নহে। হইতে পারে যে, বহুকাল যাবত সে বীজে জীবন চিহ্ন থাকে না; কিন্তু কালে অবতারবৎ প্রতিভার বলে তাহা পুনর্জ্জীবিত

---

* পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।
ভগবদ্গীতা ৪র্থ অধ্যায়, ৮॥

হয়, তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া যে হাল ছাড়িয়া দিয়া অবসাদ ও অবনতির স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, আমরা এমন মতের পোষকতা করি না। যতদূর সম্ভব, প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবনতির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে দুই এক পদ উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। জাতীয় জীবন লুপ্তপ্রায় হইলেও হৃদয়ের এক কোণে তাহাকে একটু স্থান দিয়া তাহার প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই চেষ্টা থাকা আবশ্যক। আইস সকলে মিলিয়া যত্ন করি—ভারত আবার উন্নত হইবে না কে বলিল? যদিও যত্ন বিফল হয় তথাপি যত্ন করা আবশ্যক—"যত্নে কৃতে যদি না সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ?" আজই যত্ন সফল হইবে, এমন আশা করা যাইতে পারে না; কিন্তু কালে যে আশা ফলবতী হইবে না, এমন চিন্তা করিতে বড়ই কষ্ট বোধ হয়।

ভারতকে আবার উন্নত করিতে হইলে, আবার পূর্ব্ব গৌরবে তাহাকে গৌরবান্বিত করিতে হইলে, একটী জাতীয় জীবন সংগঠনের আবশ্যক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, কোন্ বিষয়ে সেই জাতীয় জীবন গঠিত করা কর্ত্তব্য? অনেকে হয় ত বলিবেন যে, এ বিষয়ে ইউরোপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া রাজ্য, ধন বা সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জাতীয় জীবন সংগঠন করা কর্ত্তব্য। পচা সড়া ধর্ম্মকে জাতীয় জীবন করিলে এখন আর চলিবে না—যে সময়ে ধর্ম্ম আমাদিগের জাতীয় জীবন ছিল, সে দিন বহু দিন গত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি যে, ভারতে জাতীয় জীবন সংগঠন করিবার যদি কিছু উপকরণ থাকে, তবে সে উপকরণ ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ আমাদিগের বিশ্বাস যে, এক্ষণে অধর্ম্মের পূর্ণ প্রতাপ হইলেও পূর্ব্বপুরুষগণের শোণিত এখনও শুষ্ক হয় নাই, ধমনী ব্যবচ্ছেদ করিলে এখনও তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়; সুতরাং নূতন করিয়া অন্য জীবন সংগঠন না করিয়া ধর্ম্ম-জীবনকে সতেজ করিতে পারিলেই ভারতের অদৃষ্টচক্র ফিরিতে পারে। হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় আর ধর্ম্ম নাই, এমন কল্পবৃক্ষ আর জন্মিবে না—যাঁহার যে প্রকার ধ্যান ধারণার শক্তি, তিনি সেই প্রকারেই সাধনা করিতে পারেন; এমন ধর্ম্ম আর কোথায়? ছিন্ন ভিন্ন ভারতকে আবার যদি কেহ এক করিতে পারে, আবার যদি কেহ ভারতকে উন্নত করিয়া তাহার শরীরে হৈমমুকুট পরাইতে পারে, তবে সে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

ঢাকার পুরাতন কাহিনী। (৮)

সেনরাজগণ।

'সময়প্রকাশ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুসারে ১০১৯ শকাব্দে (১০৯৭খ্রীঃ) মহারাজ বল্লালসেন "দানসাগর" রচনা করেন *, ইহা দ্বারা বল্লাল সেনের সময় নিশ্চিতরূপে এই নির্ণীত হইতেছে যে, খ্রীষ্টীয়

* দানসাগরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ডাক্তার মিত্র কর্ত্তৃক

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। এই গ্রন্থে তিনি আপনাকে বিজয়-সেনের পুত্র ও হেমন্তসেনের পৌত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহার মতে অনিরুদ্ধ ভট্ট বল্লালের গুরু ছিলেন। তিনি সাবর্ণ-গোত্রজ বারেন্দ্রকুলের আদিপুরুষ পরাশরের অধস্তন অষ্টম পুরুষ অনিরুদ্ধ কিনা, বলা যায় না। কৈলাস বাবুর অনুমান মতে সাবর্ণগোত্রজ আদিদেব বল্লালের মন্ত্রী ছিলেন এবং বল্লাল মন্ত্রী এই আদিদেবই রাজা প্রথম লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ সুকবি গোবর্দ্ধন আচার্য্যের পিতা ছিলেন।

কথিত আছে যে,রাজা বল্লাল সেন স্বীয় অধিকৃত রাজ্যকে বঙ্গ, বাগড়ি, রাঢ়, বরেন্দ্র ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। প্রধান প্রধান নদীর স্রোতগতি দ্বারা স্বভাবতঃ বা রাজকীয় রাজস্ব সুবিধামতে আদায়ের জন্য এই পাঁচভাগে সমগ্রদেশ বিভক্ত হয়, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না।

১৮২০ খ্রীঃ হেমিলটন সাহেব বল্লাল কৃত এই দেশবিভাগের বিষয় সর্ব্ব প্রথম উল্লেখ পূর্ব্বক সীমানির্দ্দেশ বিবরণ প্রকাশ করেন। মুসলমানদিগের বাঙ্গলা বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে এই বিভাগ অব্যাহত ছিল,তাহাতে সন্দেহ নাই বলিয়া সুবিজ্ঞ ব্লকম্যান সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাঙ্গলার যে ভাগ গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর (হুগলীর) পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তাহা (১) রাঢ়, পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যস্থিত অনুগঙ্গ প্রদেশ (২) বাগড়ি পদ্মার উত্তরস্থ করতোয়া ও মহা-নন্দার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ (৩) বরেন্দ্র, বাগ-ড়ির পূর্ব্বদিকে করতোয়া ও পদ্মার পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থ গঙ্গা, পদ্মা ও মেঘনার তীরবর্ত্তী প্রদেশ (৪) বঙ্গ,এবং মহানন্দা নদীর পশ্চিমস্থ ভূভাগ মিথিলা নামে পরিচিত ছিল। রাজা বল্লাল সেনের সময়ে প্রাচীন মিথিলার (ত্রিহুত) কিয়দংশ বাঙ্গলার সেনরাজগণের অধীন ছিল কিনা, বিশেষ সন্দেহের বিষয়। বুকানন হেমিলটন সাহেবের মতে ১১০৪খ্রীঃ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্তির পর,প্রথম লক্ষ্মণ সেন মিথিলা অধিকার করিয়া তথায় ও বাঙ্গলার সর্ব্বত্র লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত করেন এবং লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) নগরী সংস্থাপন করিয়া আপনার পুত্র সুষেণ দেবকে পশ্চিম অঞ্চলের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করেন। বল্লাল সেনের নাম মিথিলাবাসীর নিকট অজ্ঞাত ও অপরিচিত থাকায় বোধ হয় যে বল্লাল সেনের অধিকার মিথিলায় প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই।

ডাক্তার মিত্রের মতে বল্লাল সেনের প্রবর্ত্তিত কৌলীন্যপ্রথা তাঁহার রাজত্বকালে রাঢ় ও বঙ্গের বহির্ভাগে বিস্তৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে রাজকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন যে,

---

"Notices of Sanskrit Manuscripts" নামক বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে খণ্ডাকারে প্রকাশিত পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। তাহার শেষভাগে লিখিত আছে—

ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ
শ্রীকান্তোঽপি সরস্বতীপরিবৃতঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ
পদাম্ভোজনিষণ্ণবিশ্ববসুধাসাম্রাজ্যলক্ষ্মীযুতঃ
শ্রীবল্লালনরেশ্বরো বিজয়তে সদ্বৃত্তচিন্তামণিঃ॥

ইতি পরমমাহেশ্বর-মহারাজাধিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর-শ্রীমদ্ বল্লালসেনদেববিরচিতঃ শ্রীদানসাগরঃ সমাপ্তঃ।

"সময়প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১০১৯ শকাব্দে দানসাগর রচিত হয়।

নিখিলনৃপচক্রতিলক-শ্রীমদ্বল্লাল সেনদেবেন পূর্ণে নব-শশি-দশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ॥

দানসাগরে বল্লাল সেন আপনাকে শৈব ও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

বল্লালের প্রবর্ত্তিত দেশ বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, প্রধানতঃ রাঢ় প্রদেশ লইয়াই বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ, বরেন্দ্র লইয়া রাজসাহী, বঙ্গ লইয়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম, বাগড়ি লইয়া বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগ গঠিত হইয়াছে। বল্লাল সেনের বহুপূর্ব্ব হইতে সমগ্র বাঙ্গালা গৌড়, বঙ্গ ও পৌণ্ড বর্দ্ধন এই তিন অংশে বিভক্ত ছিল *।

* 'গৌড়ীয় ভাষাতত্বে' বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, আবশ্যক ও কৌতুহলজনক বোধে সংক্ষেপে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তাহাতে অনেক পৌরাণিক কথা ইতিহাসের স্থলে অবতারণা করিয়া গৌড়ের প্রাধান্য ও বঙ্গের অপকৃষ্টত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই উপাদেয় কাল্পনিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ আদর ও অর্থ সাহায্যের অভাবে বোধ হয় সমাপ্ত হইতে পারে নাই, ইহা বড়ই আক্ষেপ ও লজ্জার বিষয়। গ্রন্থকার দ্বয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইহা কোনও ক্রমে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিতে পারিলে, ইহা বঙ্গলা ভাষার গৌরবের সামগ্রী হইত। পুরাণ ও ইতিহাসের সম্মিলনে ইহা এক অপূর্ব্ব পদার্থ হইত।

আমরা সচরাচর যেদেশকে বাঙ্গলা বলিয়া থাকি, তাহার প্রকৃত নাম গৌড়। এককালে এই স্থানে দশটী পরম রমণীয় অরণ্য ছিল বলিয়া, দশারণ্য নামে কোন কোন স্থলে কথিত হইয়াছে। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে ভাগীরথীর সলিল-সিক্তা এই পুণ্যভূমি উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। স্কন্দপুরাণ মতে সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতার পঞ্চগৌড় নামে পাঁচজন দৌহিত্রের বংশাবলী পঞ্চগৌড়ে বিস্তৃত হয়। অনন্তর সোমবংশীয় বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড ও সুহ্ম নামে পঞ্চক্ষেত্রজ পুত্র স্বনামখ্যাত দেশে রাজ্যবিস্তার করে। তদবধি বঙ্গরাজ্যের উৎপত্তি হয়। মধ্য ভাগের কিয়দংশ (বর্ত্তমান রাজসাহী, মুরসিদাবাদ, ভাগলপুর ও জঙ্গল মহাল (?)) পুণ্ড্র বলিয়া খ্যাত থাকে। এখনও ঐ সকল স্থানে পুণ্ড্র বা পুঁড়েজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। কূর্ম্মচক্রে লিখিত আছে, 'আগ্নেযাং অঙ্গ-বঙ্গোপবঙ্গ-ত্রিপুর-কোশলাঃ।' বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্বাঞ্চল বঙ্গ ও পশ্চিমাঞ্চল গৌড় নামে বহুকালাবধি পরিচিত ছিল। জ্যোতিষতত্ত্বে দশব্যঙ্গুল অধিক পঞ্চাঙ্গুল ছায়া গৌড়ের ছায়া বলিয়া ধৃত হইয়াছে। এরিয়ান্ ইহাকে গৌড়রসী, সিলিলিয়ান্ ডাইওডোরস গণ্ডারিস, এবং টলেমি গোড়ীঘোস কহিয়াছেন। গৌড়েশ্বরীর মাহাত্ম্য জন্য নোনছ ইহাকে পুণ্যাখ্য গৌড়ীয়ান্ দেশ কহিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যও গৌড়দেশে আসিয়া গৌড়ের নাস্তিক বৌদ্ধদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত, হতপ্রভ ও ত্রস্ত দেখিয়া গৌড়াচার্য্যদিগের ভূয়সী প্রশংসা করেন— পঞ্চদশীতে এইরূপ লিখিত আছে। রাজতরঙ্গিণীর (চতুর্থ তরঙ্গ) মতে গৌড়াচার্য্যেরাই তত্রস্থ পণ্ডিতদিগকে বিবাদে পরাভূত করিয়া গুরু শঙ্করাচার্য্যের সহিত সরস্বতী পীঠ মধ্যে প্রবেশ করেন। বহুকালাবধি (ডাউ সাহেবের মতে ৭৩০ খ্রীঃ পূঃ) গৌড়নগর বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। টলেমি ইহাকে 'অনুগঙ্গ প্রদেশ' কহিয়া গিয়াছেন। গৌড়নগর প্রতাপশালী হইলে গৌড়াধীন সমস্ত সাম্রাজ্যই সামান্যতঃ গৌড় বলিয়া কথিত হইত।

করতোয়া ও ভাগীরথী দ্বারা গৌড় ও বঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর বামপার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া কলিকাতা বঙ্গদেশ মধ্যে গণ্য বলিয়া ব্রহ্মযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তজ্জন্য কেহ কেহ কলিকাতার পার্শ্বে গঙ্গায় স্নান পর্য্যন্তও করেন

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াংসাং বঙ্গকে সমতট নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কৈলাস বাবু এই কথা সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করেন।

সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল বলিয়া ইহার নাম সমতট হওয়া অসম্ভব নহে। সেই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরিব্রাজকের সময়ে এদেশে কামরূপ (আসাম), ব্রিজি (মিথিলা), মগধ (পাটনা), চম্পা (ভাগলপুর), পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (রাজকৃষ্ণ বাবুর মতে গৌড় ও পাণ্ডুয়া), সমতট (বঙ্গ), শ্রীক্ষেত্র (শ্রীহট্ট), কমলাঙ্ক (কুমিল্লা বা ত্রিপুরা), কিরণসুবর্ণ (সুবর্ণরেখা

না। সমুদ্রাবধি ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত ইহার সীমা। বঙ্গদেশ হইতে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত গৌড় রাজ্য বিস্তৃত। বঙ্গদেশ জ্যোতিষ-তত্ত্বে দেবলের নির্দ্দেশ অনুসারে ম্লেচ্ছ দেশের ন্যায় হেয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। "অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গৌড্রান্ গত্বা সংস্কারমর্হতি"। যবন রাজাদিগের আধিপত্য কালে বঙ্গদেশই সমৃদ্ধিশালী ছিল,সমসুদ্দিন দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া বঙ্গের রাজা নামে প্রথমতঃ পরিচিত হইলেন। তথাকার যবনাধিপেরা ক্রমশঃ পরাক্রান্ত হইয়া সমস্ত গৌড় স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিলেন। তদনুসারে সমস্ত দেশেরই নাম বাঙ্গালা হইল।

'বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর ভাগ মিথিলা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজা ইক্ষাকুর পুত্র নিমি এই মিথিলারাজ্য স্থাপন করেন। বশিষ্ঠ শাপে দেহ অবসান হওয়ায় তাঁহার বিদেহ নাম হয়। তদনুসারে রাজ্যের নামও বিদেহ হয়। তাহার পুত্র মিথি বা জনক বা বৈদেহ। এইবংশীয় অধিকাংশ রাজাই জনক ও বৈদেহ নামে খ্যাত এবং রাজ্যের নাম মিথিলা হয়। ত্রিহুত জেলায় জনকরাজের রাজধানী জনকপুর নামে প্রসিদ্ধ। জনকবংশজ সীরধ্বজের কন্যা সীতাকে রামচন্দ্র বিবাহ করেন। মিথিলার অধিকাশ ভূপতিই আত্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। অতিপ্রাচীন কালাবধি ঋষিগণ তথায় যাতায়াত করিতেন। কেহ বা যজ্ঞের নিমিত্ত, কেহ বা অর্থের নিমিত্ত, কেহ বা জ্ঞানের নিমিত্ত, কেহ বা যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইতেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে লিখিত আছে,শুক্ল যজুর্ব্বেদের প্রকাশক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বহুকাল জনকালয়ে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার সহিত আত্মতত্ত্ব আলোচনা করেন।

'দ্বাপরের শেষে অসুরবংশজ বাণরাজা বাহুবলে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ নামক পুত্র ত্রয়কে তিনরাজ্য প্রদান করিলেন। পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব, কৌশিকীকচ্ছবাসী মনোজা রাজা, সমুদ্র সেন, চন্দ্র সেন,বঙ্গরাজ, তাম্রলিপ্তাধিপতি, কর্কটাধিপতি, সুহ্মরাজ প্রভৃতি অস্মদ্দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থিত ভূপালবর্গ দিগ্বিজয় কালে পাণ্ডবদের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কামরূপের অধীশ্বর নরকরাজ শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হইলেন। অঙ্গেশ্বর দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইলেন। মগধের জরাসন্ধের দর্প চূর্ণ হইল। শোণিত পুরাধিপতি বাণরাজার সৈন্য ভীমসেন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরে (রাজতরঙ্গীর মতে ৬৫৩ বর্ষ কলি গতে) কামরূপের রাজা ভগদত্ত দুর্য্যোধনের পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সমরশায়ী হইলেন। বঙ্গাধিপতি সাত্যকির হস্তে পুণ্ড্রাধিপতি সহদেব হস্তে এবং তাম্রলিপ্তাধিপতি নকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর নরকবংশীয় ভগদত্তের বংশধরগণদ্বারা অধিকাংশ দেশ শাসিত হয়। ভগদত্তের পরলোকের পর অনঙ্গভীম, রণভীম, গজভীম, দেবদত্ত, জগৎসিংহ, ব্রহ্মসিংহ প্রভৃতি ২৩ জন নরপতি রাজত্ব করিলেন, খ্রী পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে ঐ বংশ লোপ হয়। তৎপরে কামরূপে ক্ষত্রিয় বংশ, ব্রহ্মপুত্র বংশ, বারভূঁইয়া আদি বংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করেন।

"নরকবংশের পর সুযজ্ঞবংশীয় ভূপতিগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই বংশীয় তৃতীয় নরপতি মাধব সিংহের পুত্র বিজয় সিংহ ৫৩৩ খ্রী পূঃ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও তদনন্তর কোন ঘৃণিত দোষে নির্ব্বাসিত হইয়া সিংহলে গমন পূর্ব্বক আধিপত্য লাভ করেন। মাধবসিংহের পর ছয়জন নরপতি রাজত্ব করিলে এই বংশ তিরোহিত হয়

নদীর তীরবর্ত্তী এবং বীরভূম ও সিংহভূম জিলার কোন স্থলে অবস্থিত), তাম্রলিপ্ত (তমলুক), ওড্র (উড়িষ্যা) প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। অনেক স্থলে কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের বর্ণনা অনুসারে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে তাম্রলিপ্তের বন্দর হইতে বাঙ্গলা দেশীয় লোক সমুদ্রপথে সিংহলাদি দূর দেশে যাতায়াত করিত। রমেশ বাবুর মতে কিরণসুবর্ণ নামে পরাক্রান্ত রাজ্য মুরসিদাবাদের নিকট অবস্থিত ছিল। কান্যকুব্জের অধীশ্বর প্রভাকর বর্দ্ধনের পুত্র ও হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের (৬০৮-৪৮ খ্রীঃ) পিতা রাজ্যবর্দ্ধন—কিরণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কগুপ্তদেব দ্বারা পরাস্ত ও নিহত হন বলিয়া হিয়াংসাঙ্‌ লিখিয়া গিয়াছেন। আদিশূর ও পাল রাজগণের সময়ে যে গৌড়,বঙ্গ ও পৌণ্ড্র বর্দ্ধন বর্ত্তমান ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে! বল্লালসেন সম্ভবতঃ গৌড় ও পৌণ্ড্র বর্দ্ধন এই দুই প্রদেশকে শাসনকার্য্য ও রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধা বিধানার্থ রাঢ়, বরেন্দ্র ও বাগড়ি, এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহার পুত্র প্রথম লক্ষ্মণ সেনের সময়ে প্রাচীন মিথিলা গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বল্লালের সময়ে মিথিলার পূর্ব্বভাগও তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। মিথিলায় বল্লাল সেনের নাম অপরিচিত থাকাতে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির শ্রেণীবিভাগের অভাব দৃষ্টে, মিথিলায় বল্লালের শাসন প্রভাবের বিস্তার হয় নাই বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কনোজ দেশ হইতে আগমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, বল্লাল সেন তাঁহাদের বংশধরদিগের শ্রেণীবিভাগ করিয়া কৌলিন্য প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেন। সমাজের জ্ঞানী, বিদ্বান ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সম্মান বৃদ্ধির নিমিত্ত গুণসাপেক্ষ যে কৌলিন্য মর্য্যাদা সংস্থাপিত হয়, কালক্রমে তাহা বংশগত হইয়া বহুবিবাহ ও কন্যাবিক্রয়াদি বিষময় ফলোৎপত্তির হেতু হইয়াছে, এবং অশেষবিধ কলঙ্কের ভারে সমগ্র সমাজকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে।

রাঢ়ীয় কুলজিমতে নিম্নলিখিত ১৯জন ব্রাহ্মণকে আচারবিনয়াদি নবগুণ সম্পন্ন দেখিয়া, মহারাজ বল্লাল সেন কুলীন আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক সমাজে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কান্যকুব্জাগত পঞ্চগোত্রজ ব্রাহ্মণদিগের ৫৬জন বংশধরকে রাঢ় ও বঙ্গে গঙ্গাতীরবর্ত্তী ৫৬খানি গ্রাম (গাঁই) বসতি স্থাপনের জন্য প্রদান করিয়া, তন্মধ্যে ৮জনকে মুখ্য ও ১৪জনকে গৌণ কুলীন এবং অবশিষ্ট ৩৪জনকে শ্রোত্রীয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট করেন। অতঃপর কন্যার দানাদান প্রভৃতির দোষে কতিপয় কুলীন সন্তান বল্লাল-নির্দ্দিষ্ট কুল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বংশজ নামে পরিচিত হন। বঙ্গদেশীয় আচারবিহীন আদিমনিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে ৭০০ গৃহে গণনা করিয়া বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে "সপ্তশতী" আখ্যায় অভিহিত করেন, এবং পঞ্চগোত্রীয় শ্রেষ্ঠ কনোজ ব্রাহ্মণদিগের

এবং গৌড়ে মগধের আধিপত্য (খ্রীঃপূ ৪০০-৩০০ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপর পালবংশ, আদিশূর বংশ ও সেনবংশের পর বাঙ্গালায় মুসলমানগণ প্রবেশ করে।

সহিত তাহাদের বিবাহাদি বন্ধন নিষিদ্ধ করেন। পঞ্চগোত্রজ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদানের নিয়ম বল্লালের পুত্র রাজা লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। চৈতন্যদেবের সময়ে বা কিছু পরে দেবীবর ঘটক নামে সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হইয়া রাঢ়ীয় কুলীন সম্প্রদায়ের বিবাহাদির সীমা সঙ্কীর্ণতর মেলে আবদ্ধ করেন। সেই সময় হইতে কৌলিন্য প্রথায় বিবিধ পাপরাশি সঞ্চিত হইয়া নানারূপ জঘন্য দৃশ্যে ব্রাহ্মণ সমাজকে অহরহ কলঙ্কিত করিতেছে, পবিত্র বিবাহ বন্ধন অর্থলোভী কুলীনদিগের ব্যবসায়ের উপযোগী ক্রীড়ার সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে, কুলীনকুমারীগণ জীবন্ত দেহে অশেষবিধ নরকযাতনায় ও অত্যাচারে ব্যাকুল হইয়া নির্জ্জন অশ্রুজলে দিবারাত্রি পৃথিবীর বক্ষ সিক্ত করিতেছে, কন্যা কোন রূপে পাত্রস্থ করিয়া কুল রক্ষা করা কুলীনজীবনের একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, বিবাহবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে কুলীনকন্যাগণের হৃদয়বিদারক ক্রন্দনধ্বনি মিশ্রিত হইয়া অসীম অনন্ত আকাশে বিলীন হইতেছে।

মহারাজ বল্লাল সেন বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রকে কুলীন, দত্তকে অর্দ্ধ কুলীন (?) নাগাদি দ্বাবিংশতি বংশকে সন্মৌলিক বা মহাপাত্র বলিয়া সম্মানিত করেন। অম্বিকা বাবু বিক্রমপুরের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, দত্ত মৌলিক, আটঘর সিদ্ধ মৌলিক ও ৭২ঘর সামান্য মৌলিক বলিয়া পরিগণিত হয়। সিদ্ধ ও সামান্য মৌলিকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ পঞ্চ কায়স্থের পূর্ব্বে এদেশে আগমন করেন। কৈলাস বাবুর প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তীর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে।

মহারাজ বল্লাল সেন বিভিন্ন প্রদেশবাসী কায়স্থগণকে বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই চারিভাগে বিভক্ত করেন বলিয়া ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'কায়স্থকারিকা' অনুসারে কৈলাস বাবু লিখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের শ্রেণীবিভাগ ও কুলমর্য্যাদা সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্য জাতির শ্রেণীবিভাগ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না, তাহা জানিনা। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির প্রধান প্রধান কুলজী গ্রন্থগুলির অধ্যয়ন ও আলোচনা ভিন্ন এ বিষয়ের মীমাংসা যথোচিতরূপে হওয়া অসম্ভব। এ বিষয় আমরা বিশেষ কিছু না জানিয়া কোন কথা লিখা অসঙ্গত মনে করি *। বৈদ্যদিগের মধ্যে

* কৈলাস বাবু লিখিতেছেন—'বল্লাল সেনের শাসনকালে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বাঙ্গালার শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছিলেন। (মৌদ্গল্য গোত্রজ পঞ্চ কুলীনের অন্যতম নারায়ণ দত্ত মহারাজ বল্লাল ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন দেবের মহা সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন।) এজন্য তিনি কেবল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের শ্রেণীবিভাগ ও তাঁহাদের মধ্যে কুলমর্য্যাদা সংস্থাপন করেন। সেই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজ বল্লালের সময়ে গঠিত হয় নাই, বৈদ্যদিগের কৌলিন্য প্রথাও বল্লাল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় নাই। 'বৈদ্যদিগের ঘটক নাই, ইহাই আমাদের মত-সমর্থনোপযোগী সুদৃঢ় প্রমাণ।' বৈদ্যগণ আপনাদের কুলজীগ্রন্থ স্বয়ং রচনা করিয়াছেন, আর কায়স্থদিগের কুলবিবরণ লিখিবার ভার ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল।'***'কায়স্থগণ সেই প্রাচীন কাল হইতে কেবল অর্থকরী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন। মুসলমান শাসনকালে যখন তাঁহারা সংস্কৃত পরিত্যাগ

ঘটক নাই বলিয়া কৈলাস বাবু আপনার অভিজ্ঞতার উপর স্বীয় মত স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণজাতীয় ঘটক না থাকিলেও স্বজাতীয় কুলজ্ঞ ঘটকের অসদ্ভাব নাই। কৈলাস বাবু নিজেও স্থানান্তরে তাহা লিখিয়াছেন। আমরা দুই চারিজন সম্ভ্রান্ত বৈদ্য ঘটককে দেখিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঢাকানগরে অতি সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত আছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে মহারাজ বল্লাল সেন নবগুণসম্পন্ন* বলিয়া কুলীন উপাধি প্রদান করেন, নিম্নের চিত্রে তাঁহাদের নামাদি প্রকাশিত হইল। 'সম্বন্ধনির্ণয়' বা অন্য কোন মূল

করিয়া পারস্ত (পারসী ?) অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন, সেই সময় চৈতন্যদেবের কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠ দেবীবরের অভ্যুদয়। এইজন্যই কায়স্থদিগের কুলজীগ্রন্থ লিখিবার ভার ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল।'—'বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদ্যবংশীয় রাজবল্লভ সেন দশলক্ষ টাকা দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ঘটকদিগকে বাধ্য করিয়া সেনরাজগণকে বৈদ্য ও রাজবল্লভকে তদ্বংশধর অবধারণ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই বঙ্গীয় বৈদ্যগণ উপবীত ধারণপূর্ব্বক অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। রাজনগরনিবাসী এই রাজা রাজবল্লভ সেনেরই চক্রান্তে বৈদ্যজাতির উপবীত-হীনতার অমূলক কারণ প্রচার করিবার জন্য সত্যের শীর্ষে পদাঘাত করিয়া বল্লালকে দিল্লীরসিংহাসনে স্থাপন করা হইয়াছে।'

'চন্দ্রদ্বীপ-পতি রাজা দনুজমর্দ্দন দেব বল্লালের প্রবর্ত্তিত প্রথা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কায়স্থদিগকে কুলীন (ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র,) মধ্যল্য (দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস),মহাপাত্র (সেন সিংহ, দেব ও রাহা) (কর, দাস, পালিত, চন্দ, পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য, ও নন্দন) এবং অচলা (নিকৃষ্ট) এই চারিভাগে বিভক্ত করেন। রাজা দনুজ রায় সমাজপতি উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধর ও স্থলবর্ত্তী চন্দ্রদ্বীপাধিপতিদিগের সামাজিক আধিপত্য সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। উত্তরকালে যখন বসুবংশীয়গণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন ও সমাজপতির আসন অধিকার করেন, তৎকালে বঙ্গজ কায়স্থগণ চন্দ্রদ্বীপ, যশোহর, বিক্রমপুর, ভুষণা (ফতেয়াবাদ) এই চারি প্রধান সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য যশোহর সমাজের, সুবিখ্যাত ভৌমিক চাঁদ রায় ও কেদার রায় বিক্রমপুর সমাজের, ভূষণার মুকুন্দ রায় ফতেয়াবাদ সমাজের সমাজপতি ছিলেন। বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনদিগের মধ্যে মিত্রের কুল নষ্ট হইয়া তিন বংশ মাত্র কুলীন রহিয়াছে।'

'বঙ্গজ কুলীন কায়স্থের কুল কন্যাগত। আদান প্রদান, কুলত্যাগ এবং ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, এই চারি উপায়ে কুলীনের সম্বন্ধ স্থির হয়। কন্যাভাবে কুশত্যাগ অথবা পরস্পরের প্রতিজ্ঞা দ্বারা সম্বন্ধ স্থির রাখিতে হইবে। সপর্য্যায়ে দান ও গ্রহণ উত্তম। পর্য্যায়ক্রমে কুলীনে কন্যাদান ও কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলদীপক বলিয়া গণ্য হইবে। অচলের সহিত কর্ম্ম করিলে কুলনষ্ট ও দূষিত হয়। সদ্বংশজাত কুলীন-ভ্রষ্ট স্থানে বাস করিলে কৌলীন্য হইতে চ্যুত হইবে। কুলীনের আশ্রয় ও বিরামস্থল কুলজ, মধ্যল্য ও মহাপাত্র। কুলীন তাহাদের সহিত সম্বন্ধ করিয়া পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে কুলক্রিয়া করিলে তাঁহার কুল নষ্ট হইবে না। তিন পুরুষের মধ্যে দৌহিত্র দোষবর্ত্তিলে কুলীনের কুল নষ্ট ও দূষিত হইবে।'

কৈলাস বাবু কায়স্থ সমাজ সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ বিবরণ লিখিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

* আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥

কুলজীগ্রন্থ আমাদের নিকটে নাই বলিয়া কৈলাস বাবুর 'সেনরাজগণ' নামক পুস্তকের "আদিশূর ও কায়স্থ সমাজ" প্রবন্ধ হইতে ইহা সংগৃহীত করিয়া দিলাম।

ব্রাহ্মণজাতি।

দেবীবরের মতে আদিপুরুষ	শ্রেণী	শ্রেণীপ্রবর্ত্তক প্রধান পুরুষ	গোত্র	শ্রেণীপ্রবর্ত্তক হইতে অন্তর	নাম ও উপাধি	মন্তব্য
ক্ষিতীশ	রাঢ়ীয়	ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	দশম পুরুষ	মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জাহ্লন, দেবল, বামন, ঈশান, মকরন্দ,	আদিশূর দ্বারা কান্যকুব্জ হইতে আনীত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী দৃষ্টে, মহারাজ আদিশূর ও বল্লাল সেনের আনুমানিক আবির্ভাব কাল নির্ণীত হইতে পারে। ইহা হইতে আদিশূরের সহিত বল্লাল সেনের ৪,৮,৯,১০,১৩,১৪,১৫ পুরুষ অন্তর দেখা যাইতেছে। এই দুই রাজার মধ্যে নয় পুরুষ ব্যবধান ধরিয়া, এবং তিন পুরুষে ডাক্তার মিত্রের মত অনুসারে এক শতাব্দী গণনা করিয়া, আদিশূরের সময়, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ ও বল্লালের সময় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়া কৈলাস বাবু অনুমান করেন।
	বারেন্দ্র	দামোদরের পুত্র আদি গাঁই ওঝা	ঐ	ত্রয়োদশতম...	জয়সাগর, মণিসাগর,	
তিথিমেধা	রাঢ়ীয়	শ্রীহর্ষ	ভারদ্বাজ	ত্রয়োদশতম...	উৎসাহ মুখোপাধ্যায় গরুড়,	
	বারেন্দ্র	গৌতম	ঐ	পঞ্চদশতম...	ভাস্কর বৈদান্তিক পরাশর,	
বীতরাগ	রাঢ়ীয়	দক্ষ	কাশ্যপ	অষ্টম...	বহুরূপ চট্টোপাধ্যায়, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ বাঙ্গাল	
	বারেন্দ্র	সুষেণ	ঐ	অষ্টম...	স্বর্ণরেখ, ভবদেব	
সুধানিধি	রাঢ়ীয়	ছান্দড়	বাৎস্য	নবম...	গোবর্দ্ধন পুতিতুণ্ড শির ঘোষাল কানু কুতুহল } কাঞ্জীলাল	
	বারেন্দ্র	ধরাধর	ঐ	চতুর্থ	চতুর্ব্বেদান্তাচার্য্য দামোদর	
সৌভরি	রাঢ়ীয়	বেদগর্ভ	সাবর্ণ্য	অষ্টম	শিশু গঙ্গোপাধ্যায় রোষাকর	
	বারেন্দ্র	পরাশর	ঐ	অষ্টম	অনিরুদ্ধ, গুণার্ণব	

(কায়স্থ জাতি)

দেবীবরের মতে আদি পুরুষ।	শ্রেণী	শ্রেণী প্রবর্ত্তক প্রধান পুরুষ	গোত্র।	শ্রেণী প্রবর্ত্তক হইতে অন্তর।	নাম ও উপাধি।	মন্তব্য।
মকরন্দঘোষ	বঙ্গজ দক্ষিণরাঢ়ী	সুভাষিত পুরুষোত্তম	সৌকালীন ঐ	তৃতীয় ঐ	চতুর্ভুজ ঘোষ ভবনাথ...	মহারাজ বল্লাল সেন ২৭ ঘর কায়স্থের ঘোষ, বসু, গুহ, দত্ত, ও মিত্র এই পাঁচ বংশীয় চতুর্ভুজ, লক্ষ্মণ ও পূষণ, দশরথ, নারায়ণ ও অশ্বপতি এই ছয়জনকে কুলীন (নবগুণ সম্পন্ন) ও আদিশূরের সময়ে বঙ্গে আগত অন্য ২২টী বংশকে সম্মৌলিক (সপ্তগুণান্বিত) আখ্যা প্রদান করেন। কেবল অবিশুদ্ধ এই কায়স্থ বংশাবলী হইতে বল্লালের সময় কি আদিশূরের কাল নিরূপিত হওয়া অসম্ভব। বল্লালের সময়ে দত্তের কুল নষ্ট হয় নাই। এইজন্য বিক্রমপুর সমাজে অদ্যাপি কাঠালিয়ার দত্তগণ অর্দ্ধ কুলীন বলিয়া পরিগণিত।
দশরথ বসু	বঙ্গজ দক্ষিণরাঢ়ী	পরম বসু কৃষ্ণ বসু	গৌতম	তৃতীয়	লক্ষ্মণ ও পূষণ বসু {আলঙ্কারের রাঢ় হইতে বঙ্গে আগমন	
বিরাট গুহ	বঙ্গজ		কাশ্যপ	পুরুষের নিশ্চয়তা না থাকাতে কায়স্থ কুলজী গুলিকে ব্রাহ্মণগণের কুলজী গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। কায়স্থ কুলজীর বংশাবলীর নানাস্থল কাল্পনিক হওয়া বিচিত্র নহে।	দশরথ গুহ, ইহার কোন উত্তর পুরুষ বহুকাল পরে রাঢ়দেশে গমন করিয়া অকুলীন হন।	
পুরুষোত্তম দত্ত	বঙ্গজ		মৌদ্গাল্য		নারায়ণ দত্ত লক্ষ্মণ সেনের মহা সন্ধিবিগ্রহী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী উমাপতির নিম্নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।	
কালিদাস মিত্র	বঙ্গজ দক্ষিণ রাঢ়ী		বিশ্বামিত্র		অশ্বপতি মিত্র শ্রীধর মিত্র	

মহারাজ বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঘমাসে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরের (রামপাল) রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসন আরোহণের সময় হইতে তিনি যে অব্দ স্বীয় নামে প্রচলিত করেন, মুসলমানদিগের সমগ্র বাঙ্গলা অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র ও মিথিলায় প্রচলিত ছিল। অধুনা মিথিলা প্রদেশে সামান্য ভাবে তাহা প্রচলিত আছে। ইতিপূর্ব্বে

লক্ষ্মণাব্দ আবিষ্কারের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ কাল সম্পর্কে ও বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে বিধায় নিশ্চিতরূপে তাহা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। আমরা উপরে ডাক্তার রাজেন্দ্র লালের মত নির্দ্দেশ করিয়াছি। কানিংহাম সাহেবের মতে ১১০৭ খ্রীঃ হইতে সেনবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব কাল আরম্ভ হয়। লক্ষ্মণাব্দ হইতে রাজা লক্ষ্মণ সেনের পিতা ও পিতামহের রাজত্ব আরম্ভ হয় নাই, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কানিংহাম সাহেব লক্ষ্মণাব্দকে সেনবংশের রাজ্যারম্ভের অব্দ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গলার ইতিহাসে ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী (মাঘ) মাস হইতে লক্ষ্মণাব্দ প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া লিখিত রহিয়াছে। ডাক্তার বুকানন হেমিলটনের নির্দ্দেশ অনুসারে ১১০৪ খ্রীঃ লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক মিথিলা বিজয়ের সময় হইতে এই লক্ষ্মণাব্দের বর্ষ গণনা আরম্ভ হয়। এবং তিনি লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) নগরী সংস্থাপন করিয়া আপন পুত্র সুষেণের হস্তে মিথিলা ও পশ্চিম বঙ্গের শাসনভার অর্পণ করেন। ডাক্তার বুকানন পূর্ণিয়া ও মিথিলায় অনুমান ১৮১০ খ্রীঃ স্বয়ং যাইয়া তত্রত্য নানা লোকের মুখে এই কথা শুনিয়া পূর্ণিয়ার ঐতিহাসিক বিবরণে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুপণ্ডিত ও সত্যানুসন্ধায়ী বুকাননের মতকে অগ্রাহ্য করিবার কোনও কারণ দেখা যাইতেছে না। ডাক্তার বুকাননের মত সত্য হইলে, ১১০৪ খ্রীঃ পিতৃবিয়োগের পর রাজা লক্ষ্মণ সেন স্বীয় নামে মিথিলা বিজয়ের পর হইতে এই অব্দ প্রচলিত করিয়া থাকিবেন। পিতার জীবদ্দশায় যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন মিথিলীয় সেনবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিলে কখনই নিজের নামে অব্দ প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না।

তিনি পিতৃপ্রতিষ্ঠিত কৌলীন্য প্রথা দৃঢ়ীভূত করিয়া তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি সেনবংশীয় নরপতিদিগের মধ্যে সমধিক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছে। ইদিলপুরের শাসনপত্রের অতিরঞ্জিত বর্ণনা অনুসারে তিনি বারাণসী ও প্রয়াগ হইতে শ্রীক্ষেত্র (পুরী) পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়া বিজয়স্তম্ভ সংস্থাপিত করেন। লক্ষ্মণসেনের বাঙ্গালা শাসন কালে কান্যকুব্জে মদনপাল ও বিজয়চন্দ্র প্রবল প্রতাপের সহিত রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। প্রয়াগ ও বারাণসী সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই অধিকারভুক্ত ছিল। বোধ হয় লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালেই সেনবংশীয় নৃপতিবর্গের রাজ্য বিস্তৃতি চরম সীমায় উপনীত হয়। তিনি মিথিলা আপনার অধিকারভুক্ত করেন বটে, কিন্তু দক্ষিণবিহারে পালবংশের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ পালবংশ মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া বিহার নগরে আপনাদের রাজধানী স্থাপিত করিয়া হীনপ্রভ অবস্থায় রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত অব্দ অদ্যাপি মিথিলায় প্রচলিত থাকিয়া, রাজা লক্ষ্মণ সেনের ক্ষমতা ও পরাক্রমের সাক্ষ্য স্পষ্টাক্ষরে প্রদান করিতেছে। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বের মতে তাঁহার সেনাপতি রণজয়বীরের প্রতাপে

চতুর্দ্দিক ত্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই।

রাজা লক্ষ্মণ সেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং পিতা ও পিতামহের ন্যায় শৈব ও শাক্ত ছিলেন না। কবিবর উমাপতি তাঁহার প্রধান অমাত্য ও নারায়ণ দত্ত তাঁহার মহাসন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। সুকবি জয়দেব উমাপতি, গোবর্দ্ধন ভট্ট, শরণ ও ধোয়ী কবিরাজ মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত পৃথ্বিধর, ভবানন্দ, দিনকর মিশ্র ও অরবিন্দ ভট্ট লক্ষ্মণ সেনের সভায় উপস্থিত থাকিতেন বলিয়া গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বে লিখিত হইয়াছে। কোথা হইতে ইহাদের নাম সংগৃহীত হইয়াছে,উক্ত পুস্তকে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ডাক্তার বুলার সাহেব কাশ্মীরে যে এক খানি হস্ত লিখিত 'গীতগোবিন্দ' দর্শন করেন,তাহার শেষভাগে জয়দেব রাজা লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া লিখিত ছিল। জয়দেব ও গীতগোবিন্দের বিবরণ "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা" নামক প্রবন্ধে বিস্তীর্ণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের সভামণ্ডপ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পণ্ডিতরত্ন দ্বারা যে অলঙ্কৃত হইয়াছিল, ডাক্তার মিত্রের গবেষণায় 'কবিরাজ প্রতিষ্ঠা' নামক গ্রন্থ হইতে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দের আরম্ভে এই সকল কবিগণের রচিত কবিতার সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন *। কৈলাস বাবুর মতে জয়দেব ও গোবর্দ্ধন রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং উমাপতি ও শরণ ও ধোয়ী কবিরাজ বারেন্দ্র কি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই। তিনি কোথা হইতে এই সকল বংশতত্ত্ব সংগ্রহ করিলেন, তাহা উল্লেখ করেন নাই। বারেন্দ্র শ্রেণীর উদয়নাচার্য্যের এক পুত্রের নাম উমাপতি। কৈলাস বাবু এই উদয়নাচার্য্যকে ন্যায়-শাস্ত্রীয় সুপ্রসিদ্ধ কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু এই সম্পর্কে কোনও প্রমাণ বা যুক্তি দেন নাই।

'সর্ব্বস্ব' নামে বহুতর স্মৃতিগ্রন্থ প্রণেতা বাৎস্য গোত্রজ কোষকার হলায়ুধকে ডাক্তর মিত্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তী রাজকৃষ্ণ বাবু প্রথম লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ ও মন্ত্রী বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু হলায়ুধের ন্যায় শাস্ত্রবিৎ সুপণ্ডিত জয়দেবের সমসাময়িক হইলে, গোবর্দ্ধনাদি সুকবির ন্যায় গীতগোবিন্দে জয়দেব অবশ্যই তাঁহার উল্লেখ করিতেন এবং কবিরাজ প্রতিষ্ঠা গ্রন্থেও প্রথম লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ অন্য পঞ্চ পণ্ডিতরত্নের ন্যায় তাঁহার নাম উল্লিখিত থাকিত। প্রথম ও দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনকে অভিন্ন কল্পনা করিয়া, পণ্ডিতবর ডাক্তার মিত্র ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। হলায়ুধ দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ও সভাপণ্ডিত ছিলেন—আমাদের নিকট কৈলাস বাবুর এই উক্তিই সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। সেনবংশীয় দুই লক্ষ্মণ সেনের পৃথক অস্তিত্বের বিষয় বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তর

* গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ ॥
(কবিরাজ প্রতিষ্ঠা)

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ; সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব, শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন,
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ, শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥
(গীতগোবিন্দ, ১।৪)

বুকানন্ পুর্ণিয়া জিলার বিবরণে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ১৮২০ খ্রীঃ হেমিণ্টন নবদ্বীপের রাজা লক্ষ্মণ সেনের উল্লেখ করেন। মিথিলার সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি বিদ্যাপতি স্বকৃত 'পুরুষ-পরীক্ষা'য় উমাপতিকে লক্ষ্মণ সেনের প্রধান মন্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন যে একবার কাশী আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তাহাও এই পুরুষ পরীক্ষায় বর্ণিত হইয়াছে।

রাজ্ঞী বসুদেবীর (গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বের অতুলাকুমারী?) গর্ভে মাধব ও কেশব নামে লক্ষ্মণ সেনের দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ডাক্তার বুকাননের অনুমান অনুসারে লক্ষ্মণ সেনের পুত্র সুষেণ লক্ষ্মণাবতীর (গৌড়ের) শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কুলজী গ্রন্থে মাধব সেন কেশব সেনের পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনুমান ১১০৪ হইতে ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরের সিংহাসনে আসীন থাকিয়া সমগ্র বাঙ্গলা ও মিথিলা (উত্তর বিহার) শাসন করিতে থাকেন। সুদীর্ঘকাল রাজ্য শাসনের পর রাজা লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মাধব সেন পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অতি অল্প কালের মধ্যেই নিঃসন্তান মাধব সেন পরলোকগামী হন। ইদিলপুরের শাসনপত্র দৃষ্টে প্রিন্সেপ সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ডাক্তার মিত্রের অনুমান মতে ১১৩৬-৩৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত দুই বৎসর মাধব সেন ও ১১৩৮-৪২খ্রীঃ পর্য্যন্ত চারি বৎসর কেশব সেন বাঁঙ্গলার রাজদণ্ড ধারণ করেন। পক্ষান্তরে কৈলাস বাবু লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অনুমানমতে ভবদেব ভট্টের নামাঙ্কিত শাসনলিপির নির্দ্দেশ অনুসারে কেশব সেনের মৃত্যুর পর ৩২ লক্ষ্মণাব্দে (১১৩৮খ্রী) সেনবংশীয় হরিব্রহ্ম দেব বাঙ্গলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সকল আনুমানিক সময়নির্দ্দেশ বিভিন্ন সুবিজ্ঞ লেখকের অনুমান ও কল্পনার উপর স্থাপিত, ইহার সহিত যুক্তি তর্কের বড় অধিক সংশ্রব নাই। যে দেশের প্রকৃত ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, সেই দেশে এই সকল অনুমান ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভজন।

রাগিণী—শুক্ল-বেলওয়ার—তাল ঝাঁপতাল।

(১)

(হে) ভুলিব ভুলিব করি, কিন্তু ভুলিতে না পারি
এমনি মোহিনী শক্তি হয়, হরি হে তোমারি!
যে মজেছে একবার, প্রেমেতে তোমার হরি
নাহিক নিস্তার তার, লহ তার প্রাণ কাড়ি।

(২)

বসন ভূষণ ধন, সব লহ তার হরি,
দিগম্বর কর তারে, তুমি ওহে কৃপা করি;
কাড়িয়া সমস্ত লয়ে, তারে করহে ভিখারী!
এ রীতি কেমন তব বল মোরে প্রাণহরি?

(৩)

চরণে শরণ লয়, ওহে যে জন তোমারি,
একে একে বন্ধু জনে, তুমি লহ তার হরি!
সহধর্ম্মিনী সহিত তার, বিচ্ছেদ ঘটাও হরি,
অকারণ শত্রু সবে, আহা হয় হে তাহারি।

(৪)

এ রীতি তোমার নাথ! কেমনে প্রশংসা করি?
অথবা অবোধ আমি, কেমনে বুঝিতে পারি—
কৌশল তোমার নাথ! অতি-সূক্ষ্ম-মনোহারী?
তুমি বিনে এ কৌশল, কে বুঝিবে হে তোমারি?

(৫)

যবনিকা পটাচ্ছাদে, রেখেছ গোপন করি,
অদ্ভুত-শৃঙ্খলাময়, সৃষ্টি কৌশল তোমারি!
মানবের সাধ্য কিগো, প্রবেশে মধ্যে তাহারি
কৃপা ক'রে জ্ঞাননেত্র দিলে নেহারিতে পারি।

(৬)

অর্জ্জুনে যেমতি নাথ! দিয়াছিলে কৃপা করি
জ্ঞাননেত্র সমুজ্জ্বল, তথা অনন্ত-প্রসারি,
তেমতি আমাকে নাথ! আজ দেহ দয়া করি
উজ্জ্বল জ্ঞান-নয়ন, সকল-দর্শন-কারী।

(৭)

দেখিব তাহার বলে নাথ! কিবা মহিমা তোমারি,
রোগ শোক পরিতাপ, বন্ধন ব্যসন মারি
জরা মৃত্যু দরিদ্রতা, কেন পাঠাও হে হরি,
তোমার করুণাময় নামের কলঙ্ককারী!

(৮)

না বুঝে অনেক দোষ, দিই চরিত্রে তোমারি,
নিঠুর নিদয় ব'লে, হায় কত নিন্দা করি!
অথবা মনেতে হয়, নাহি শক্তি হে তোমারি
রক্ষিতে শরণাগতে, ত্রিতাপ হইতে হরি!

(৯)

না বুঝে দিয়ে গো দোষ, কত অপরাধ করি,
বুঝায়ে দেওগো মোরে, ওহে তব পায়ে ধরি;
অজ্ঞাত দুর্ব্বোধ এই, সৃষ্টি কৌশল তোমারি!
বুঝায়ে না দিলে আমি, কেমনে বুঝিতে পারি?

(১০)

যে জ্ঞান দিয়াছ নাথ! তাতে (এই) অনুমান করি,
ভক্তজনে পরীক্ষিতে, এই কৌশল তোমারি
(কিন্তু) সর্ব্বজ্ঞ হইয়ে তুমি, এই বক্র পথ ধরি
পরীক্ষা কেন গো কর, আমি বুঝিতে না পারি।

(১১)

অথবা আকৃতি নাথ! হয় বক্র হে যাহারি,
তেমনি প্রকৃতি বক্র, হয় দেখিহে তাহারি!
তোমার বিশ্ব-রূপের যে দিকে হরি নেহারি,
বক্রাকার চক্রাকার, দেখি চৌদিকে সকলি।

(১২)

আকৃতি যেমতি তব, আমি এ বিশ্ব নেহারি।
প্রকৃতি তেমতি দেখি, জটিল-কৌশলধারী।
ত্রিভঙ্গ মূরতি ভক্তে, তাই করেছে তোমারি!
মূরতি ও কৌশল তব, সকলি হে বলিহারি।

(১৩)

চতুরের চূড়ামণি, তুমি গুরু প্রেমিকেরি!
ভক্তের সমক্ষে তুমি হও কৃষ্ণরূপধারী;
মধুর সেরূপে মুগ্ধ কর নর নারী!
(আর) দৈত্যগণসম্মুখেতে, হও রুদ্রমূর্ত্তিধারী।

(১৪)

সংসার বিরাগী কাছে হও শিবমূর্ত্তিধারী।
অনন্ত মহিমা তব, কেমনে জানিতে পারি?
বামন হইয়ে চাঁদ, ধরিতে হে ইচ্ছা করি!
দেখাও স্বরূপ ভক্তে, তুমি কৃপা ক'রে হরি।

(১৫)

নহিলে সাধ্য কি জানি, স্বরূপ তোমার হরি?
তপস্যা করিয়া যোগিজন কত দিন ধরি,
জানিতে পারেনা যাহা, কেমনে করিতে পারি,—
তব কৃপা বিনা নাথ! আমি নির্ণয় তাহারি?

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

ভবভূতি কাব্যের প্রগাঢ়তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা বলিয়াছি, বিরহ প্রেমের নিকষ-পাষাণ, অভিমানেও বিরহাভাস কল্পনা লক্ষিত হয়, উহা প্রেমের একটী বৈচিত্র বিশেষঃ—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলাভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোমান উদঞ্চতি॥

"প্রেমের গতি ভুজঙ্গবৎ স্বভাবতঃই কুটিল, অতএব প্রেমিকের চিত্তে কখনও বা কারণ বশতঃ কখনও বা কারণ ভিন্ন মানের উদয় হয়"।

তথাচ সাহিত্য দর্পণং।
প্রেম্নঃ কুটিলগামিত্বাৎ কোপো যঃ কারণং বিনা।

"প্রেমের গতি অতি কুটিল, অতএব কারণ ভিন্নও কোপ সমুৎপন্ন হইয়া অভিমানের সঞ্চার করিয়া থাকে।"

অতএব রসরাজ শৃঙ্গার আশ্রয় করত সৎকাব্য রচিত হইলে উহাতে অভিমানাদি অবশ্যই কোন না কোন সূত্রে সমুদিত হইবে। অনন্ত, অপ্রমেয়, দুর্ব্বিগাহ রস শাস্ত্রের উক্তরূপ বহুবিধ সিদ্ধান্তে ভবভূতি পারদর্শী হইয়াছিলেন। অতএব রস, রসাভাস, ভাব, ভাবাভাস, ভাবসন্ধি, ভাবশবল ও ভাব সমূহের চ্ছেদন, ভেদন, বিদারণ, সংযোগ ও বিয়োগে তাঁহার অলোক-সামান্য শক্তি লক্ষিত হয়। এই অদ্ভুত শক্তিবলে করুণ বিপ্রলম্ভ দ্বারা শৃঙ্গার ও করুণের এতই প্রবাহ বৃদ্ধি করিয়াছেন যে, উহার স্রোতে একবার নিমগ্ন হইলে পুনর্ব্বার তীরে উপনীত হওয়া অতি দুষ্কর।

বিপ্রলম্ভ বিষাদ পরিপূর্ণ। বিষাদ পরিপূর্ণ বিপ্রলম্ভ সহৃদয় মাত্রেরই অতি চিত্তহারী। বিষাদময় বিরহ বিপ্রলম্ভ কিরূপ চিত্তহারী, তাহা যাঁহারা বর্ষাগমে মধুরকণ্ঠ গোপালের অসম্পূর্ণ বিরহ-সংগীত শ্রবণে অপরিতৃপ্ত ভাবে নয়ন জল বর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা কিয়ৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। বস্তুতঃ প্রকৃতির শোভা মাত্রই বিষাদময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক মনে যে এক অপূর্ব্ব প্রলয় সংঘটিত করিয়া থাকে, তাহা যথার্থই অনির্ব্বচনীয়। মধুর সংগীত শ্রবণ, পর্ব্বত সমূহের বিরাট মূর্ত্তি, কুসুমিত উদ্যান ও অনন্ত সাগরাদি দর্শনে, সহৃদয় মাত্রেরই অন্তঃকরণে কি এক বিষাদ, কি এক ঔৎসুক্য, কি এক অভাব যেন দংশন করিতে থাকে, এই জন্যই কবিদেব কালিদাস প্রকৃতির এইরূপ বিষাদময় কবিতা পাঠ করত বলিয়াছেন ;—

রম্যাণিবীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্।
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখি তোপিজন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং।
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি।

রম্যবস্তু অবলোকন ও মধুর শব্দ শ্রবণ করত মনুষ্য সুখিত রহিলেও কেন এত পর্য্যুৎসুক ও বিকল হয়? না সে নিশ্চত রূপেই মনের অজ্ঞাতসারে পূর্ব্বজন্ম পরিচিত সুদৃঢ়-প্রেম কোন বান্ধবের কথা স্মরণ করিয়া থাকে। প্রকৃতি শোভায় এই নিগূঢ় তত্ত্ব কালিদাস ভিন্ন অন্য কেহই অবগত নহেন। তিনি ইহা অতি স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন।

ভবভূতি বোধ হয় কালিদাস-কথিত ভাবের অবলম্বনে কাব্যের চরম উৎকর্ষ সম্পাদিত করিয়াছেন। বিরহের অন্ধকার-

পটে প্রেমের জ্যোৎস্না উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হয়। এই জন্যই ভবভূতি কাব্য এত বিরহ ও বিপ্রলম্ভময়। সেই বিপ্রলম্ভ অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতির বিষাদ-প্রসূত নিঃশ্বাসের উষ্ণতা হইতেও তৎকর্ত্তৃক বিভক্ত এবং পরিগৃহীত হইয়াছে। অতএব ভবভূতির প্রগাঢ় কথামাত্রই বিষাদময়, যেন "বিষমিশ্র চন্দন রস" বা "সবিষ মধুধারা"। জানকীর অন্বেষণার্থে রামচন্দ্রের প্রতি বন, প্রতি কন্দরে ভ্রমণচ্ছলে সেই সকল প্রশান্ত শৈলমালা ও নিবিড় অরণ্য নিবহে কবি বহু বিষ সঞ্চার করিয়াছেন, রঘুপতির সঙ্গে বনদেবী ও কুশীলবের সম্ভাষণ এবং জানকী সহ তমসার প্রসঙ্গ অতিমাত্র বিষাদের পোষক এবং নিতান্তই হৃদয়বিদারক! এরূপ হৃদয়বিদারক দৃশ্য মানবের চিত্ত-ফলকে দ্বিতীয়বার অঙ্কিত হয় নাই। তাঁহার প্রতি দৃশ্য অগাধ বিষাদের পদ্মাতরঙ্গ,; তাঁহার প্রতি কন্দর, প্রতি নির্ঝর-নিকুঞ্জ ঘনগভীর বিরহের পোষণ। প্রতি কার্য্যেই পোষক আবশ্যক ; শোভা সম্পাদন করিতে হইলে, বিদ্যুন্মালার শরদভ্র পরিত্যাগ করত নবজলধরের হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, বৃহৎ মন্দিরের অভ্রঙ্কষ শৃঙ্গ ক্ষুদ্রাকারে চিত্রপটে পূর্ণমাত্রায় প্রতিবিম্বিত করিতে হইলে নিম্নে অতি ক্ষুদ্রাকারে বৃক্ষাদি অঙ্কিত করিতে হইবে ; বজ্র-নির্ঘোষ প্রভঞ্জন প্রবাত হইবার পূর্ব্বে জগৎ কিয়ৎ কালের জন্য নিস্তব্ধে বল সঞ্চয় করিবে। ভবভূতি কাব্যে ঘন গভীর ও বিষাদময় ভাবই অঙ্কিতব্য বস্তু, অতএব প্রতিপোষণ বস্তু তদীয় কাব্যে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ। তাঁহার সান্ত্বনাও উত্তেজনার পূর্ণমাত্রায় সহায়, ভবভূতি তজ্জন্যই রামচন্দ্রের সান্ত্বনাচ্ছলে দণ্ডকারণ্যে বনদেবী, সীতা, তমসা ও মুরলাকে অবতারিত করিয়া রামচন্দ্রকে আশ্চর্য্যভাবে রোদন করাইয়াছেন। এমন অদ্ভুত আবেগের রোদন, বিস্ময়কর ভাব-সংযম চ্ছলে আবার তাহার প্রবাহ বৃদ্ধি অন্য কোন কাব্যে অবলোকন করিনাই। সেই রোদনের উদ্দীপক অতীত বৃত্তান্ত সাক্ষী বিবিধ বন ভূভাগ আবার চতুর্দ্দিকে তুষানলের ন্যায় জ্বলিতেছে। বনবাস কালে প্রিয়ার সহিত যে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন, দ্বাদশ বৎসর হইল জানকীকে নির্ব্বাসিত করিয়া, হয়ত সুবর্ণ প্রতিমা ব্যাঘ্রের করাল দন্তে সমর্পণ করিয়া, শূদ্র তপস্বীর শান্তি বিধানার্থে রাম পুনর্ব্বার দণ্ডকারণ্যের হৃদয়-বিদারক শোভা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে সেই নির্ঝর, সেই অরণ্য, সেই শিলাতল, সেই প্রমত্ত ময়ূর, মেঘ-মুকুট, অচল শৃঙ্গ, সেই স্রোতস্বতী গোদাবরী, কবি এতদুপলক্ষে বিষাদ-মিশ্রিত বিবিধ গাম্ভীর্য্যময় আরণ্য কন্দরাদির বর্ণনায় অসমোর্দ্ধ কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ণনীয় বস্তুর সঙ্গে কবিহৃদয়ের যেন কি এক মায়িক বন্ধন ঘটিয়াছিল: সুচতুর বীণাবাদক বীণার বিভিন্ন গ্রন্থি স্পর্শ করত আবেগ-পূর্ণ সঙ্গীত লহরী বিস্তার পূর্ব্বক যেমন মানুষের প্রতি হৃদয়তন্ত্রী প্রতিধ্বনিত করেন, ভবভূতিও তেমনিই কোন বর্ণনায় রোমাঞ্চ, কোন বর্ণনায় স্তম্ভ ও পুলক স্বরূপে অবতারিত করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিষাদময়, অশ্রুজলময় ভাবতরঙ্গের নিত্য প্রদর্শন করিবার জন্য কবির নিকুঞ্জ, নবজলধর, গভীর অরণ্য ও বেগবতী স্রোতস্বতীর অবতারণা। তাঁহার বর্ণনায় হাস্য নাই,

আনন্দ নাই, উল্লাস নাই, জ্যোৎস্না নাই। উহাতে দর্পের নির্ঘোষ, বিষাদের কালিমা, অশ্রুজলের প্রবাহ ও দুঃখের তুহিন-সন্ততি। তাঁহার সেই কালকূট জর্জ্জরিত ভাবসমূহের পরিপোষণার্থে তাঁহার যাবতীয় বর্ণিত দৃশ্যই বিস্ময় ও বিষাদময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার ভাষাও তদনুরূপ। তাঁহার ভাষা সিংহনাদ ও রোদনের উপযোগিনী। তাঁহার ভাষা হৃতসর্ব্বস্ব, জ্ঞানী, বৃদ্ধ বীরহৃদয়ের যোগ্য; যিনি একবার অরির প্রতি ভ্রুকুটী করিয়া জলধরের ন্যায় আমন্দ্র গর্জ্জন এবং সংসারের অনিত্যতা দর্শনে বিস্ময়ে নয়নজল বিসর্জ্জন করিতে পারেন। বস্তুত কবি, শোক, দুঃখ, বিরহ, উদ্বেগ, ভয়, উৎকণ্ঠা প্রভৃতির অন্তস্তল পর্য্যন্ত দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। কবি এই সকল ভাব সমালোচনপূর্ব্বক যে সকল নীতিবাক্য গ্রথিত করিয়াছেন, উহা ভাবের দর্শন-শাস্ত্র। তাহার প্রতিশ্লোক জ্ঞান গরিমা ও ভূয়োদর্শনের অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কবি যেমনি হৃদয়স্থ ভাবরাশির প্রতি পরমাণু পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি ঐ সমস্ত ভাবের একমুখ ও সর্ব্বতোমুখ, প্রসারণ ও সঙ্কোচ, মেলন, বিবাদ, সংঘর্ষ ও নিলয়, পূর্ণজ্ঞান ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় প্রশান্তভাবে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিত্র শোকাদির সর্ব্ববিধ বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত; ঐ সকল ভাবের যতরূপ বিপরিণাম ও বিবর্ত্ত সম্ভবে, তাহা তিনি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

তমসা। "বৎসে, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার চিত্ত নৈরাশ্যবশতঃ তটস্থ, বিপ্রিয়াচরণ হেতু রোষাকুল, দীর্ঘ বিরহান্তে সহসা সমাগমবশাৎ জড়ীকৃত, প্রিয়ের অনুরাগ দর্শনে পুলকিত, তাঁহার করুণ বচন শ্রবণে প্রগাঢ় করুণ, অতএব তোমার চিত্ত যেন প্রেমভরে দ্রবীভূত হইয়াছে।"

ভবভূতি কাব্যে এরূপ বিষাদময় ভাবে ভাবে অবিশ্রান্ত যুদ্ধের অবধি নাই।

তাঁহার নায়কগণের প্রতিই কেন দৃষ্টিপাত কর না; যদি মাধবের সহচর হইতে অভিলাষ কর, তাঁহার নৈরাশ্যের উষ্ণ নিশ্বাসে সতত সন্তপ্ত হইতে হইবে। তাঁহার সঙ্গে নিশীথে ভয়াবহ শ্মশানে আত্মহত্যার আতঙ্ক সহ্য করিতে হইবে। মালতী সহবাসে অতৃপ্ত মাধবের সঙ্গে শ্রীপর্ব্বতের প্রতি কন্দরে রোদন করিয়া ভ্রমণ করিতে হইবে। যদি রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের সহচর হইতে অভিলাষ কর, সেখানেও সুখের প্রবিরল সঞ্চারও নয়নগোচর হইবে না। হরধনু ভঙ্গের উল্লাস জামদগ্ন্যের ক্রোধানলে দগ্ধ হইবে; রাজ্যসুখের ছায়া না পাইতেই পিতৃশোক ও বনবাসের দাবানলে সন্তপ্ত করিবে। বহুযত্নে জানকীর উদ্ধার হইবা মাত্রই বনবাসিনী জানকীর বিরহ-পর্য্যাকুল মূর্ত্তি হৃদয়-তুষানলে দগ্ধ করিবে। শূদ্রতপস্বীর শাস্তি বিধানার্থে রামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্যে পুনঃপ্রবেশে সেই তুষানল দাবানলায়িত। উহা প্রদর্শন করিবার জন্য উত্তরচরিতের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

রামচন্দ্র লোকাপবাদ শ্রবণে বিমূঢ় হইয়া জানকীকে বাল্মীকি তপোবনে নির্ব্বাসিত করেন। নির্ব্বাসনের দ্বাদশ বর্ষান্তে শম্বূকনামা শূদ্রতপস্বীর শাস্তিবিধানার্থে তিনি পুনর্ব্বার পঞ্চবটীবনে উপস্থিত হন। রামচন্দ্র বহুদিনান্তে সেই বনভাগে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যেস্থানে প্রতি বৃক্ষ, প্রতি লতা,

প্রতি নির্ঝর সেই "অরণ্যবাস প্রিয়সখী" জানকীর প্রলয়ঙ্করী স্মৃতির উদ্দীপক। যাহার বর্ণনায় বাণভট্ট বলিয়াছেন "যে বনে এখনও জানকী সংবর্দ্ধিত জরাজর্জ্জর বিষাণ কোটী জীর্ণ মৃগগণ মেঘ গর্জ্জন শ্রবণ করিবামাত্র ভগবান্ রঘুপতির ত্রিভুবনব্যাপী চাপ-ঘোষ স্মরণ করত অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া থাকে।" রামচন্দ্র বহুকাল পরে সেই হৃদয়বিদারক বনভূভাগে উপস্থিত হইলেন। এখন আমরা কবির ভাষাতেই অবশিষ্ট ঘটনা বিবৃত করিব।

রাম শূদ্রতপস্বীকে দর্শন করতঃ বলিলেন "হে দক্ষিণহস্ত, মৃত ব্রাহ্মণশিশুর জীবনার্থে শূদ্র মুনির প্রতি কৃপাণ বিসর্জ্জন কর; তুমি দুর্ব্বহগর্ভখিন্ন জানকী বিবাসনে পটুরামের অঙ্গ, তোমার করুণা কোথা?" অতঃপর পঞ্চবটী বনভাগ অবলোকনপূর্ব্বক সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন "অহো অতঃপর কি অধিকতর মর্ম্মঘাতি-বস্তু বিদ্যমান আছে? তাঁহার কি অপূর্ব্ব প্রেম! "আপনার সঙ্গে মধুগন্ধিবনে বিচরণ করিব" ইহা বলিয়াই না তিনি কত আনন্দ অনুভব করিতেন। অথবা ইহা বিচিত্র নহে; কেন না প্রিয়জন অকিঞ্চিৎকর কার্য্য করিয়াও দুঃখ দূর ও সুখ উৎপাদন করিয়া থাকেন; যিনি যাঁহার প্রিয়জন, তিনি তাঁহার কি এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু, অনন্তর সেই অসহ্য স্মৃতির উদ্দীপক বস্তু পরিত্যাগ করত সম্মুখে "মদকল ময়ূরের কণ্ঠছবি পর্ব্বতদ্বারা সমাকীর্ণ, অবিরল নিবিষ্ট, গাঢ় নীলছায়া বিশিষ্ট, তরুণ তরুসমূহ মণ্ডিত, নানাবিধ নির্ভয় মৃগসমাকুল, প্রশান্ত গম্ভীর মধ্যমারণ্য সমূহ", দর্শন করিতে লাগিলেন। আমরা এতদুপলক্ষে ভবভূতির চিত্তহারিণী বর্ণনার আভাস প্রদান করিব। রামচন্দ্র দেখিলেন—"প্রমত্ত বিহঙ্গম কর্ত্তৃক ব্যাধূত বেতসকুসুম সুরভিত, শীতল ও স্বচ্ছ জলপূর্ণ এবং শ্যামল পরিণত জম্বুফল নিকুঞ্জ প্রতিঘাত বশতঃ শব্দায়মান, ভূরিস্রোতযুক্ত নির্ঝরিণী সমূহ প্রবাহিত হইতেছে।

"গিরিকন্দরবাসী তরুণ ভল্লুক সমূহের কন্দরে প্রতিধ্বনিত থুৎকার নিঃসারণযুক্ত শব্দসমূহ অতি গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে। গজবৃন্দ দ্বারা নিষ্পেষিত শল্লকী বৃক্ষের গ্রন্থি নিসন্দজ শিশির কটু ও কষায়গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছে।" "রাম বলিলেন—

"অহহ! কেকাকণ্ঠ ময়ূরগণ নিষেবিত উহা ত সেই ভূধরবৃন্দ, মত্তহরিণযূথপূর্ণ ইহা ত সেই বনস্থলী, অতি মনোহর বেতসলতা পরিপূর্ণ, অবিরল নীলনিচুল বৃক্ষাকীর্ণ ইহা ত সেই সরিত্তট।

"দূর হইতে যাহা মেঘমালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, উহা সেই গিরি প্রস্রবণ! উহার পাদদেশেই প্রসন্নসলিলা গোদাবরী প্রবাহিতা।

"এই গিরিশিখরেই গৃধ্ররাজ জটায়ুর বসতি ছিল, ইহার পাদদেশেই গোদাবরীর প্রসন্ন সলিলে প্রতিবিম্বিত শ্যামল অনোকহ তরু শোভিত, অভ্যন্তরে অব্যক্ত মধুরনাদকারী বিহঙ্গম সেবিত সেই বনান্ত, যে স্থানে প্রস্রবণ গিরির পাদদেশে পর্ণকুটীর রচনা করত আমরা কত সুখেই না কাল অতিবাহিত করিয়াছিলাম।"

"এই ত সেই পঞ্চবটী, যেস্থানে বহুকাল নিবাস বশতঃ বিবিধ বিহার সাক্ষী প্রদেশ সমূহ অবস্থিত, যাহা জানকীর প্রিয়সখী বনদেবী বাসন্তী কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত!

"কিন্তু তথাপি এই সকল পূর্ব্ববন্ধু বনভূমি দর্শন করত চিত্ত পরিতৃপ্ত করিব। অহো! এইস্থানের ভূভাগ সন্নিবেশ কতই না পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! পূর্ব্বে যেস্থানে নদীর খরতর স্রোতঃ দর্শন করিয়াছি, এখন সেই স্থানে উহার পুলিন অবস্থিত; ঘন বৃক্ষাবলী বিরল ভাব ও বিরল বৃক্ষাবলী ঘনভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; বহুকাল পরে এই বন দর্শন করাতে অন্য বন বলিয়া ভ্রান্তি হইলেও গিরি সমূহের অবস্থান সেই বন বলিয়াই অভিজ্ঞান প্রদান করিতেছে।"

"এই সেই কন্দর সমূহে গদ্‌গদ শব্দে প্রবাহিত গোদাবরীর বারিনিবহযুক্ত, মেঘালঙ্কৃত, নীল শিখরমালী, দক্ষিণারণ্যবর্ত্তী পর্ব্বত সমূহ; এবং পরস্পর প্রতিঘাত বশত চলিতকল্লোল কোলাহল পূর্ণ, উত্তাল ও গভীর জলময়, এই সেই সকল সরিৎসঙ্গম সমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে।"

এইরূপে জনস্থানের শোভা প্রদর্শন করত অতীত বৃত্তান্তের মোহন মন্ত্রে রামকে ব্যাকুল করত, ভবভূতি তমসা ও মুরলা নাম্নী নদীর অবতারণা করিলেন। তমসা একাকিনী পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া সহসা মুরলাকে দর্শন করত বলিলেনঃ—

"সখি মুরলে, তোমাকে কি হেতু যেন চকিতার ন্যায় অবলোকন করিতেছি!" মুরলা বলিলেন "ভগবতি তমসে, ভগবান্ অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা কর্ত্তৃক এই সরিদ্বরা গোদাবরী সন্নিধানে প্রেরিত হইয়াছি; তাঁহাকে বলিতে হইবে "ভগবতি গোদাবরি, আপনে অবগত আছেন, লোকাতীত গাম্ভীর্য্য বশত রামচন্দ্রের হৃদয়স্থ গূঢ় ও প্রগাঢ় সন্তাপপূর্ণ শোকসম্ভার পুটান্তর্গত ধাতুদাহের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। জানকীর ন্যায় ইষ্টজন বিরহজ প্রবৃদ্ধ দীর্ঘ শোক সন্তাপ বশত রামচন্দ্র নিরতিশয় পরিক্ষীণ হইয়াছেন; তদ্দর্শনে আমার হৃদয় যেন কম্পিত হইয়াছে। অধুনা শম্বূক নিধনান্তে অযোধ্যাভিমুখে গমন সময়ে তিনি নিশ্চয়ই বধূসহবাস সাক্ষী পঞ্চবটী বনস্থ বিবিধ প্রদেশ অবলোকন করিবেন, এবং স্বভাবতঃ ধীর হইলেও অতি গম্ভীর ও বিতত শোকাবেগ বশতঃ, সেই স্থলে, প্রতিপদে রামচন্দ্রের প্রমাদ আশঙ্কা হইতেছে। অতএব ভগবতি গোদাবরি, আপনে সাবধানে রহিবেন এবং প্রতি মূর্চ্ছাবস্থায় পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধি ও জল কণস্নিগ্ধ তরঙ্গ মারুত মন্দ মন্দ সঞ্চালিত করত রামচন্দ্রের জীবন সন্তর্পিত করিবেন।"

রামচন্দ্রের জীবন সন্তর্পণার্থে কবি উদ্ধৃত অংশের শেষ ভাগে যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, এরূপ অলৌকিক কবিত্বপূর্ণ উপায় বোধ হয় জগতের কোন কবির লেখনী হইতে নিঃসৃত হয় নাই, কোন কবি সরিৎগণকে এমন দিব্যমূর্ত্তিতে রঙ্গভূমিতে অবতারিত করিতে পারেন নাই, ভুবনপাবন রঘুপতি চরিতের এরূপ দেবতার হস্তে অদ্ভুত কবিত্বপূর্ণ পূজাও অন্যে প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, মানুষলীলাশ্রিত এমন দিব্য চরিত্র জগতে বোধ হয় অন্য কবি ধারণাও করিতে সমর্থ নহেন।

মুরলা বাক্য শ্রবণ করত দেবী তমসা বলিলেন "ইহা স্নেহানুরূপ দাক্ষিণ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু রামচন্দ্রের প্রকৃত সঞ্জীবনৌষধই সন্নিহিত রহিয়াছে।" মুরলা বলিলেন—"সে সঞ্জীবনৌষধ কিরূপ?" তখন তমসা সংক্ষেপে সবিস্তর বলিতে

লাগিলেন ;—"শ্রবণ করুন, পূর্ব্বে লক্ষ্মণ বাল্মীকি তপোবন প্রান্তে জানকীকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি প্রসব বেদনায় কাতর হইয়া গঙ্গা প্রবাহে পতিত হন এবং সেই স্থানেই দুইটী পুত্র প্রসব করেন। ভগবতী ভাগীরথী ও পৃথ্বী উভয়ে গঙ্গা গর্ভেই পুত্র দ্বয় প্রতিপালন করত স্তন ত্যাগান্তে বাল্মীকি সমীপে অর্পণ করেন। ইদানীং শূদ্র তপস্বীর শাস্তি বিধানার্থে রামের দণ্ডকারণ্যে আগমন বৃত্তান্ত সরযূ সমীপে শ্রবণ ও স্নেহবশতঃ লোপামুদ্রাকৃত আশঙ্কা পূর্ব্বেই হৃদয়ঙ্গম করত, ভগবতী ভাগীরথী কোন গৃহাচার ব্যাজে জানকী সহ গোদাবরী সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন; ভগবতী বলিয়াছেন "বৎসে, জানকি, অদ্য আয়ুষ্মান্ কুশীলবের দ্বাদশ বার্ষিক গ্রন্থি বন্ধন করিতে হইবে; অতএব মনুবংশের প্রসবিতা পুরাণ শ্বশুর ভগবান্ সবিতাকে তোমার স্বহস্তাবচিত পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হইবে, বনভূমিতে পুষ্পাহরণ কালে মনুষ্য দূরে রহুক, মৎপ্রভাবে বনদেবতাগণও তোমাকে অবলোকন করিতে পারিবেন। তৎপর আমাকেও বলিলেন, তমসে, বধূ বৎসা জানকী তোমার প্রতি প্রকৃষ্ট প্রণয়বতী, অতএব পুষ্পাহরণ কালে তুমিই ইহার সহচরী হও, আমি তাঁহার আদেশে এই উপস্থিত হইলাম। অহো! পরিপাণ্ডু ও দুর্ব্বল কপোলযুক্ত অতি মনোহর মুখীর মূর্ত্তিমান্ করুণ অথবা শরীরিণী বিরহব্যথা জানকী এই গোদাবরী হ্রদ হইতে পুষ্পার্থে কাননে আগমন করিতেছেন!"

মুরলা তমসাবচনাবসানে রামবিরহ কাতরা জানকীকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া বলিলেন, "অহো! ইনি সেই জানকী; শরদের সূর্য্যসন্তাপ যেমন কেতকীর অন্তঃস্থ দল দগ্ধ করে, হৃদয়-কুসুমশোষী দারুণ দীর্ঘ শোক বৃন্ত-স্খলিত মনোজ্ঞ কিশলয়ের ন্যায় পরিক্ষীণ জানকী শরীর তেমনই দগ্ধ করিতেছে।" ক্রমশঃ

শ্রীবসন্তকুমার রায়।

সাঁওতালের শ্রাদ্ধ প্রণালী।

"হায়, এত দিনে আমাদের দুগ্ধ বৃক্ষের পতন হইল, কোথায় যাইলে সে দুগ্ধ বৃক্ষের রূপ আবার দেখিব, মুরগীর ছানা এতদিনে আশ্রয়-শূন্য হইল,"—মা বাপ মরিলে সাঁওতাল এই বলিয়া কাঁদিয়া থাকে। সাঁওতাল বড় ভাবপ্রবণ—দয়া, স্নেহ, ভয়, ভক্তি, ভালবাসা তাহার যথেষ্ট আছে, বিদেশীর নিকট ভয়ে তাহারা আপন আপন প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। ধৈর্য্য ও উদ্যমের কোন অভাব নাই। তথাপি প্রবল বিদেশীর সহিত জীবন-সংগ্রামে বুদ্ধির অল্পতা বশতঃ পরাস্ত হইয়া সাঁওতাল পূর্ণ ক্ষেত্রে নিরন্ন, উপযোগী স্থান সন্ধানে চিরদিন দেশান্তরী।

"রৌদ্রে ছাতার মত আমাকে আশ্রয় দিতে—আজ কোথায় যাইলে—কোথা গেলে আবার দর্শন পাইব।" "কপোত মিথুন এত দিনে বিচ্ছিন্ন হইল"—বিধবা স্বামীর বিরহে এই বলিয়া ক্রন্দন করে। বিধবা-বিবাহ সাঁওতাল সমাজে ঘৃণিত।

স্ত্রী-শূন্য পুরুষেই কেবল বিধবা বিবাহ করে।

কাহারও মৃত্যু হইলে মাজি ও পরামাণিককে সংবাদ দিতে হয় তাহারা গোড়াইত দ্বারা কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া সেই দিনই মৃত দেহ দাহ করিতে যায়। যাইবার সময় একটী কুলা করিয়া একটী মুরগীর ছানা, হলুদ গুঁড়া, ধান্য ও কার্পাশ বীজের খই চালের খড়, একখানি কোদাল, একখানি কুঠার ও আগুন লইয়া যায়। মৃত দেহের সঙ্গে খাটিয়ার উপর মৃতব্যক্তির তৈজস সামগ্রী চাপাইয়া দেয়—সেগুলি পরলোকে প্রেতাত্মা ব্যবহার করে—যথা বস্ত্র, বাটী, টাকা পয়সা, ফারসা, তরবারী, ধনুক, শর, যষ্ঠি, বাঁশরী ইত্যাদি।

চারি জন লোকে মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া কিয়ৎক্ষণ কুলি মুড়ায় রাখিয়া দেয়। সেখানে গ্রামের সকলে মৃতদেহে হরিদ্রা তৈল মর্দ্দন করে এবং ললাটে একবিন্দু সিন্দূরের চিহ্ন দেয় এবং ভাজা কার্পাশের বীজ ও ধান্য পালঙ্কের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেয়। অতঃপর ওঝা আসিয়া মুরগীর ছানা মৃত ব্যক্তির অঙ্গে ঝুলাইয়া দেয়। তখন স্ত্রীলোকেরা বাড়ী ফিরিয়া যায়। পুরুষেরা মৃত দেহ দাহ করিতে লইয়া যায়।

নিজের পুষ্করিণী থাকিলে তাহার পার্শ্বে নতুবা নদী তীরে মৃতদেহ দাহ করে। উত্তর দক্ষিণে চিতা প্রস্তুত করিতে হয়, চিতার অবলম্বন স্বরূপ চারি পাশে চারিটী খুঁটী দেয়, তাহাকে তরড়ে খুঁটী বলে। চিতা প্রস্তুত হইলে উত্তরাধিকারীগণ মৃত ব্যক্তির হাত পা ধুইয়া দেয় এবং মুখে একটু জল দেয়। তখন তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করাইয়া দক্ষিণ শিরে মৃতদেহ চিতায় চাপাইয়া দেয়। পরিবার কাপড়, কোমরের দড়ি, অঙ্গুরী ও কুণ্ডল এই সমস্ত খুলিয়া দিয়া একটী ডাল দিয়া মৃত দেহের নগ্নতা নিবারণ করিতে হয়। পালঙ্কে আনীত তৈজস পত্র এই সমস্ত চিতায় (সারা) চাপাইয়া দেয় এবং বুকে, পেটে, কোমরে ও পায়ে চারি খানি কাঠ চাপাইয়া দেয়। যাহাদের স্ত্রী গর্ভবতী থাকে, তাহারা দূরে গিয়া দাঁড়ায়। তখন ওঝা আসিয়া মুরগীর ছানা দিয়া মৃতদেহ আর তিনবার স্পর্শ করিয়া তরড়ে খুঁটীতে ছানাটী বাঁধিয়া দেয় ও খাটিয়ার উপর একটী কোপ মারে। অতঃপর উত্তরাধিকারী পরিধেয় নূতন বস্ত্রের সুতা খুলিয়া হাতে জড়াইয়া ডান হাতে আগুন লইয়া অন্য দিকে মুখ করিয়া শবের মুখাগ্নি করে। তখন প্রথমে ভ্রাতৃগণ, তাহার পর অন্য সকলে চিতার উপর ছোট ছোট কাঠ ফেলিয়া দেয় ও বলে "আর বিলম্ব করিও না, আমরা এক এক জন ডাল কাঠ দিলাম, বায়ুর ন্যায় দ্রুত যাও" এই বলিয়া চিতার চারিপার্শ্বে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। চিতা জ্বলিবার সময় দাহনকারীরা ক্ষৌর কার্য্য সম্পন্ন করে। দাহন সম্পন্ন হইলে জল দিয়া চিতা নির্ব্বাণ করা হয়। তখন উত্তরাধিকারী অবশিষ্ট হাড়গুলি ধুইয়া হলুদ জল ও দুগ্ধ ঢালিয়া একটী ভাঁড়ে ভরিয়া লয়। এখন দামোদর হইতে সাঁওতাল অনেক দূরে আসিয়াছে, এজন্য সকল হাড় না লইয়া কেবল গলার একখানি ও কপালের তিনখানি হাড় লয়। একটী ঢেলা দিয়া ভাঁড়ের মুখ বন্ধ করে —কিন্তু প্রেত পুরুষের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য একটু ফাঁক রাখিয়া দেয় এবং ভাঁড় হইতে

বাহিরে যাইবার ও ভিতরে আসিবার জন্য সেই ফাঁকে এক টুকরা খড় রাখিয়া দেয়। ভাঁড়ের চারিদিকে হরিদ্রা লেপিয়া দেয়। অবশিষ্ট হাড় ক্ষার ও অঙ্গারগুলি নদি-জলে ভাসাইয়া দেয় এবং চিতা স্থানে কুলা খানি রাখিয়া তাহার উপর চতুর্দ্দিকের মাটী কাটিয়া চাপা দেয়, যে সর্ব্বশেষে মাটী কাটে, সে কুলার উপর এক আঘাত করে। যে থানে মৃতদেহ রাখিয়াছিল, সেথানে গোবর জল ছিটা দেয় এবং অবশিষ্ট কার্পাস বীজ ও ধানের খই চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। বাড়ী ফিরিবার সময় তিনজন লোক ভাঁড়স্থিত হাড়গুলি কুলি মুড়ার জঙ্গলে পুতিয়া রাখে। ভাঁড়ের উপর শালের ছাল, তাহার উপর পাথর ও তাহার উপর মাটী দেয়। তদনন্তর সকলে স্নান করিয়া সেথানে উপস্থিত হয় এবং ধুনার ধুম স্পর্শ করিয়া স্বস্ব গৃহে ফিরিয়া যায়। এই দিন সন্ধ্যাকালে প্রতি-বেশীরা প্রবোধ দিতে আসে। তাহারা বলে, ক্রন্দন করিলে বল হ্রাস হইবে, কার্য্য খারাপ হইবে, রাজা মহাজন কুটুম্ব উদর প্রতিপালন হইবে না, অতএব ক্রন্দন করিওনা। ইহাও বলে, যাহার আত্মীয় ক্রন্দন করে, অন্যপ্রেতেরা তাহাকে যষ্টি প্রহার করে ও বলে "নাচ নাচ, ঘরে তোমার গান হইতেছে"। পঞ্চম দিবসে তৈল স্নান। গ্রামের লোক মৃতের বাড়ী একত্র হইয়া ক্ষৌর কার্য্য সমাপন করিয়া মাথা ঘষিবার মাটী, ক্ষার, তেল, তিনখানি দাঁতন ও তিন চারি খানি পাত লইয়া স্নানের ঘাটে যায়। স্ত্রী পুরুষে ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে যায়। ঘাটে পুরুষেরা মাটী ও ক্ষার তিনটী পাতায় রাখে এবং এক একটী পাতায় এক একটী দাঁতন রাখে—একটী পাত্র মৃতের ও একটী পাত্র পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ীর এবং তৃতীয়টী মারাংবুরুর। নাইবার সময় বলে "আমাদের সঙ্গে তুমিও স্নান কর," বুড়া বুড়ী ও মারাংবুরুকে সম্বোধন করিয়া বলে "তোমরাও আজ মৃত ব্যক্তিকে লইয়া আমাদের সঙ্গে স্নান কর, তাহাকে বাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে থাকিতে দিওনা।" স্ত্রী লোকেরা ভিজা কাপড়ে বাড়ীতে ফিরে এবং যেথানে মৃত্যু ঘটিয়াছিল, কাপড়ের জল সেইথানে নিংড়াইয়া দেয়।

সেই দিন রাত্রে গ্রামস্থ সকলে মৃতের বাড়ীতে একত্র হইলে তিনজন "ঝুপে" (মাথা ঘুরায়) একজন মৃতের একজন বুড়া বুড়ীরও একজন মারাং বুরুর নামে ঝুপে। তথন তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শেষোক্ত দুইজন সহজে পরিচয় দেয়। প্রথমোক্তটীর মুখে জল ছিটাইয়া পৃষ্ঠে করাঘাত করিলে সেও সাঁহা বলিয়া আপন পরিচয় দেয়। তথন তাহাদের চাউল ও জল দেয় এবং মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করে। প্রথমোক্তটী কথন বলে, আমি আপন ইচ্ছায় মরিয়াছি, কথন বলে লোকে আমাকে দেখিতে পারিল না তাই মরিয়াছি, (অর্থাৎ ডাইনে মারিয়াছে) তথন সেই বাড়ীর প্রত্যেকের নাম করিয়া জল চাহে, সকলে জল দেয়। অতঃপর তিনজনকেই মদ ও জল থাইতে দিয়া বর প্রার্থনা করে, যেন দামোদরে যাইবার সময় পথে মাথার বেদনা বা পেটের বেদনা উপস্থিত না হয়। সাঁওতালদের মধ্যে এ দুটি পীড়া প্রবল। তাহারাও অভয় দিয়া ক্ষান্ত হয়।

তথন সকলে কুলী মুড়ায় "বুড়ীর ঘর" পোড়াইতে যায়। স্ত্রীলোকেরা হলুদ জল ও

পুরুষেরা চিড়া চাউল ও পিঠা সঙ্গে লয়। সকলে সেখানে একত্র হইলে তিনজনে পোতা হাড় তুলিয়া লইয়া আসে, আসিবার সময় গর্ত্তটী পোড়াইয়া দেয়। ইহাকেই বুড়ীর ঘর পোড়ান বলে। তিন খানি ছোট ছোট কেঁদের লাঠীর এক বোঝা করিয়া তাহার অগ্রভাগে ভাঁড়টী ঝুলাইয়া যেখানে সকলে থাকে, সেখানে উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোকেরা হাড়ের উপর প্রথমে জল, তাহার পর হলুদ জল ও তাহার পর দুগ্ধ ঢালিয়া দেয়। আসিবার সময় পুরুষেরা মৃতব্যক্তির বস্ত্রে একটী থলি প্রস্তুত করিয়া আনিয়া থাকে। তাহাতে হাড়গুলি পূরিয়া লয় এবং একজন একখানি কেঁদের লাঠী দিয়া এক আঘাতে ভাঁড়টী ভাঙ্গিয়া ফেলে। ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে ভাঁড়টী তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হয় এবং বাম হাতের আঘাতে ভাঙ্গিতে হয়। যে ভাড় ভাঙ্গে, সে ভাঙ্গিয়াই আপনার বাড়ীর সীমা পর্য্যন্তগিয়া আবার যেখানে সকলে থাকে সেখানে ফিরিয়া আসে। তখন সকলে স্নান করিয়া মৃত ব্যক্তির বাড়ী গিয়া কিছু সুরা পান করে।

এইদিন সন্ধ্যা বেলা মাছধরিয়া আনিয়া মাছের ও মুরগীর তরকারী প্রস্তুত করে, তাহাতে লবণ দেয় না। মুরগী কাটিবার সময় তাহার একখানি পা ও দুখানি ডানা কাটিয়া রাখে। অন্ধকার হইলে দু তিন জনে মিলিয়া শর ও চালের খড় ও আগুন লইয়া কুলী-মুড়ায় যায় এবং একগাছি লাঠিতে সেই মুরগীর পা ও ডানা বাঁধিয়া মাটীর উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। সেই শর ও খড় দিয়া কুলীমুড়ায় একখানি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে পা ও ডানা রাখিয়া ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং সেদিকে আর না চাহিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে। বাড়ী প্রবেশ করিবার সময় আঙ্গিনার দ্বারে উথলিতে জল থাকে, তাহাতে বাম পা ধুইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়, যে সর্ব্ব শেষে পা ধোয়, সে পদাঘাত করিয়া বাকী জলটা ফেলিয়া দেয়।

তাহার পর আহার। বাড়ীর দুজন লোক কুড়ুমের পাতায় ও গ্রামের লোক শালের পাতায় আহার করে। আহারে বসিবার পূর্ব্বে এক দোনা ভাত, এক দোনা তরকারী ও এক দোনা জল একটি ডালায় সাজাইয়া যেখানে মৃত্যু ঘটিয়াছিল, সেখানে শিকল দিয়া টাঙ্গাইয়া দেয়। বাড়ীর লোকেরা বাম হাত দিয়া আহার করে, গ্রামের লোকেরা সে সময় তাহাদের গায়ে বেণার জল ছিটাইয়া দেয়। যাহারা হাড় লইয়া আসে, তাহাদের অতি আদর করিয়া বসায় ও প্রণাম করে। একটী নূতন ভাঁড়ে হাড়গুলি রাখিয়া তাহারা উপরে টাঙ্গাইয়া দেয়। প্রাতঃকালে দেখিয়া আসে, প্রেতাত্মা ভাত খাইয়াছে কিনা। খাইলে জলের দোনায় দু একটী ভাত পড়িয়া থাকে। না খাইলে সেগুলি কুলি মুড়ায় ফেলিয়া দেয়।

দামোদরে হাড় ভাসাইবার নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। দামোদরের নিকটবর্ত্তী লোকেরা যে দিন দাহন করে, সেই দিনই হাড়গুলি জলে ভাসাইয়া দেয়। দূরবর্ত্তী লোকেরা এক মাসে, পাঁচ মাসে, কি দু তিন বৎসর পরে লইয়া যায়। ধান কাটিবার পর অগ্রহায়ণ মাসেই অনেকে যায়। যাইবার সময় একখানি তিনহাত কাপড়, পাঁচ কড়া কড়ি, একটী খাড়ু, কিঞ্চিৎ সিঁদূর, একসের চিড়া, তিনখানি রুটী ও একসের চাউল লইয়া

যায়। যাইবার সময়ে জঙ্গলে চোরের ভয়ে অনেক গ্রামের লোক একত্র হইয়া যায়। একটী পশু মৃতের নামে উৎসর্গ করিয়া তাহার কাণ কাটিয়া দেয় ও সেই রক্তে হাড়গুলি ভিজাইয়া লয়। পূর্ব্বে দামোদরের গাইঘাটে, তাহার পর বাঁশলী ঘাটে, তাহার পর তেলকুপী বরুণী ঘাটে হাড় ভাসাইত। আজ কাল হাড় কুণ্ডা বাঁধা ঘাটে ভাসায়। এই ঘাটকে হাণ্ডাভাঙ্গা ও দামলিয়াও বলে। হেমরোমেরা গুয়ারই দামোদরে হাড় লইয়া যায়।

দামোদরে পৌঁছিয়া কড়ি খাড়ু ও সিঁদুর দিয়া ঘাট কিনিয়া তবে নদীতে নামে। অতঃপর তটে বালুকায় একটী ছোট গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া নূতন কাপড় পরিয়া হাড়গুলি লইয়া আবার জলে নামে এবং পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া জলে ডুবিয়া হাড়গুলি ভাসাইয়া দেয়। তদনন্তর স্নান করিয়া উঠিয়া কাপড় খানি ছাড়িয়া ফেলে। ডোমেরা সে কাপড় পায়। তখন সেই বালুকা গর্ত্তে চুয়ান জলের নিকট তিনটী শাল পাতে তিনটী মাটীর ডেলা ও দাঁতন রাখিয়া এইরূপ বলে, হে মৃত পুরুষ, অদ্য আমি তোমার গয়া গঙ্গা করিলাম, আমি স্নান করিলাম তুমিও স্নান কর। পরে বুড়া বুড়ী ও মারাং বুরুকে সম্বোধন করিয়া বলে, আমি স্নান করিলাম, তোমরাও স্নান কর এবং অদ্যাবধি মৃতব্যক্তিকে তোমাদের সঙ্গী করিয়া লও। আবার সেই পত্র গুলিতে চিড়া ও মিঠা রাখিয়া এইরূপ বলে। পূজা শেষ হইলে সেই চিড়া ও পিঠা সকলে প্রসাদ পায়। ঘাট হইতে ফিরিবার সময় সকলে হরিবোল বলে। বাড়ী ফিরিয়া আসিলে গ্রামের লোকেরা আসিয়া তাহাদিগকে মদ খাইতে দেয় ও সুসংবাদ জিজ্ঞাসা করে।

দামোদরে হাড় ভাসাইবার পরে একদিন ভোজ হয়। যে পর্য্যন্ত এই ভাণ্ডান না হয়, সে পর্য্যন্ত পূজা পার্ব্বণ বা কোন উৎসবে বাড়ীর লোক যোগ দিতে পারেনা। এই দিনও সকলে একত্র হইলে মারাংবুরু, পিলচু বুড়া ও বুড়ী এবং মৃতব্যক্তির নামে তিনজন ঝুপে। তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া পূজা ও বলিদান করিতে হয়। হাড় ভাসাইতে যাইবার সময় যে পশুটীর কাণ কাটিয়া দেওয়া হয়, এই দিন মৃতের উদ্দেশে তাহাকে বলিদান করে। গ্রামবাসী ও কুটুম্বেরাও বলি পশু সংগ্রহ করিয়া আনে। বলিপশুমাংস দগ্ধ করিবার পূর্ব্বে অগ্রভাগের একখানি পা ছাড়াইয়া লয় এবং মস্তক ও যকৃত পূজা করিবার জন্য গৃহ স্বামীকে দেয়। তদনন্তর এক ভাঁড় মদ ও তিন পাই চাউল, তিন গাঁট হলুদ, এক আটী কাঠ, এক খানি হাতা, খড়, তামাক ও জল গৃহস্বামীর নিকট চাহিয়া লয়। অনন্তর গৃহস্বামীকে সেই বলি পশুর অগ্র পা খানি ধরাইয়া দাঁড় করায়। তখন গ্রামবৃদ্ধেরা তাহার নিকট সাঁওতালদের প্রাচীন কাহিনী বিবৃত করে, সেও তাহাদের নিকট যে উপকার পাইয়াছে, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও আপনাদের দীনতা ও অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া আদর অভ্যর্থনার ত্রুটির জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। বিনতি শেষ হইলে, পাঠার পা, মদ, চাউল প্রভৃতি লইয়া গ্রামের বাহিরে যায়। পাঁচজনে মিলিয়া সেখানে ভোজন করে। ইহাকে কাঁদাকাটী ভাত বলে। গৃহস্বামী ও যকৃত ও মস্তক লইয়া পোলাও ভাত

প্রস্তুত করিয়া যেখানে বলিদান হইয়াছিল, সেখানে এই ভাত প্রেত পুরুষের নামে উৎসর্গ করে ও বলে, হে মৃত পুরুষ, আমরা পচা ভাত তোমাকে দিতেছি, আহ্লাদে লও, আমরাও প্রসাদ পাইব, দেখিও যেন আমাদের কাহারও পীড়া হয় না। এই সময় আত্মীয় প্রেতপুরুষ মাত্রকে স্মরণ করে। তখন আবার বলিদান হয়। কুটুম্বেরা যে পশু আনে, তাহা মাঝা মাঝি চিরিয়া অর্দ্ধেক নিমন্ত্রিতদের জন্য রাখে, অর্দ্ধেক কুটুম্বকে ফিরাইয়া দেয়, সকল পর্ব্বে সাঁওতালদের নাচ গান হয়, কিন্তু শ্রাদ্ধে হয় না। ভোজের সময় সকলে সকলকে মদ ভাত দেয়। মদ খাইয়া সকলে বিদায় হয়।

বেহাইকে দুই হাড়ী মদ, আধমন চাউল, আধমন চিড়া, লবণ ও তৈল লইয়া আসিতে হয়। বিদায় কালে খাসি কাটিয়া মাথাটা ও একটা পা রাখিয়া বাকী বেহাইকে দিতে হয় ও নগদ চারি আনা, দশসের চাউল, চিড়ে, লবণ, তৈল ও একহাড়ী মদ দিতে হয়। গ্রামে ফিরিয়া আসিলে সেই "সন্দেশ" বেহাই মাজী প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া একত্র ভোজন করে। "বীর বৎসর ধর্ম্মের পাঠার মত যে চুল বহন করিয়াছিলাম, তুমি তাহা কামাইয়াছ, তোমাকে তাহার উপযুক্ত কিছু দিতে পারিলাম না, মনে দুঃখ করিওনা" এই বলিয়া নাপিতকে খাসির গলা, এক সের চাউল, চিড়ে, তিন টুকরা হলুদ, লবণ, তামাক ও একটু মদ খাইতে দেয়। নাপিত বিদায় হইলে ভাণ্ডান শেষ হয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

শ্রীহর্ষের নৈষধকাব্য। (১)

তাবদ্ভা ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ॥

উদ্ধৃত মন্তব্য দ্বারা প্রতীত হয়, প্রাচীন পণ্ডিতেরা মাঘ ও ভারবি অপেক্ষা নৈষধ-চরিতকেই অধিক ভালবাসিতেন, নৈষধ কাব্যের কোন্ গুণে তাঁহাদের হৃদয়কে এত বিমোহিত করিয়াছিল, বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, আদিরসের বাহুল্যই চিত্ত বিমোহনের হেতু, কেহবা নৈয়ায়িকগণের রুচির অনুকূল শব্দ ও ভাবের বিন্যাসকেই হৃদয়াকর্ষণের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সে যাহা হউক, প্রাচীনগণের উপযোগী অনেক পদার্থই নৈষধে আছে, অগ্রে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রকটিত করিয়া পরে আমরা ইহার গুণদোষাংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। নৈষধচরিত মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানের কিয়দংশ অবলম্বনে রচিত।

নিষধ (পঞ্জাবের অন্তর্গত) দেশের অধিপতি নলনামে সর্ব্বগুণযুক্ত অশ্ববিদ্যা-বিশারদ একরাজা ছিলেন, তিনি তরুণ-বয়সে উপনীত হইলে বিদর্ভ (মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অধীন বিদর) দেশের অধীশ্বর ভীমরাজার তনয়া দময়ন্তীর অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণে অতিশয় বিরহাতুর হইয়াছিলেন, রাজসভায় তাঁহার আত্মভাব গোপন করা কঠিন হইল, সুতরাং মন্ত্রি-সমাজের প্রতি রাজকীয় কার্য্যের ভার ন্যস্ত

করিয়া অশ্বারোহণে প্রমোদ-বনে গমন করিলেন, সৌভাগ্যশালীদের কুত্রাপি সুখের অভাব নাই, এখানে উদ্যানরক্ষীদের কর্ত্তৃক শিক্ষিত বনের বিহঙ্গেরাও গুণগান দ্বারা তাহাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিল। বিধাতার ইচ্ছা যেদিকে যায়, মানবের অস্বাধীন চিত্তবৃত্তিও তাহারই প্রতি ধাবিত হয়। সেখানে রাজা নল কেলিসরোবরে একটী সুবর্ণপক্ষ হংস দেখিতে পাইলেন, হংসটী রাজার সাক্ষাতেই সরসীতটে নিদ্রিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া তাহাকে ধরিলেন। হংস তখন স্বকীয় জরাতুরা জননী ও নবপ্রসূতা সাধ্বী ভার্য্যা এবং অতিশিশু সন্তানগুলিকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল, অবশেষে বিধাতাকে ধিক্কার প্রদান করিয়া বিরত হইল। তাহাতে করুণহৃদয় নলের অন্তঃকরণে দয়া উপস্থিত হইল, তিনি বাষ্পবারি মোচন করিতে করিতে হংসকে পরিত্যাগ করিলেন, হংস একবার গগনপথে উড্ডীন হইয়া পুনরায় ঘুরিতে ঘুরিতে নলের হস্তে আসিয়া নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে নল বলিলেন, আমি দেখিবার জন্য তোমায় ধরিয়াছিলাম, আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব এখন তুমি অভীষ্টস্থানে যাইতে পার। হংস বলিল, মহারাজ! মৃগয়া রাজাদের পক্ষে নিন্দনীয় নহে, অতএব পক্ষিবধ ও মৃগয়া মধ্যে পরিগণিত, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকে করুণা দ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। আমি আপনাকে অনেক অপ্রিয় কথা বলিয়াছি—অতএব কোন প্রিয়কার্য্য সাধনদ্বারা উহার অপনোদন বাঞ্ছা করি, আমি ক্ষুদ্র বিহঙ্গ, জগৎপতির কি উপকারে লাগিতে পারি। ইহা জানা সত্ত্বেও প্রত্যুপচিকীর্ষা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না, যেহেতু অচিরাৎ উপকারীর প্রত্যুপকার করিবে, উপকার ক্ষুদ্র কি মহৎ হইল, তদ্বিষয়ে মনীষীরা আগ্রহ প্রকাশ করেন না। বিদর্ভদেশের অধীশ্বর ভীমনামা এক ভূপতি আছেন, তিনি দমন-ঋষি হইতে বরলাভ করিয়া দময়ন্তী কন্যা লাভ করিয়াছেন, যে দময়ন্তী কমনীয়তাগুণে জগতের সমস্ত ললনাকুলকে পরাজিত করিয়াছেন। সরসীতে অবগাহনের নিমিত্ত অনেক প্রদেশে আমার গমনাগমন আছে, তাহাতেই সেই ক্ষীণমধ্যা আমার নয়নের অতিথি হইয়াছিলেন, তাঁহার বরের জন্য পৃথিবীর সমস্ত যুবাতে আমি অযোগ্যতারূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া আপনাতেই সিদ্ধান্ত-বুদ্ধি নিবেশিত করিলাম। দময়ন্তীর পাণিগ্রহণে আপনার অভিমত আছে কি না, কেবল ইহাই জানিবার জন্য আমার এই নিবেদন নহে, মনীষীরা ফলদ্বারাই নিজের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করেন, কিন্তু কণ্ঠস্বর দ্বারা নহে। তদনন্তর নলরাজ অতি আহ্লাদসহকারে হংসের প্রস্তাবে সম্মত হইলে, হংস বিদর্ভ রাজধানী কুণ্ডিনপুরে গমন করিল। সেখানে কেলিকাননে দময়ন্তীকে সখীদের সহ খেলা করিতে দেখিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহাদের মধ্যভাগে পতিত হইল। দময়ন্তী সুবর্ণের হংস অবলোকন করিয়া কৌতুহলবশতঃ যেমন তাহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন হংসও একপা একপা করিয়া প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইল, দময়ন্তীকে অকৃতকার্য্য দেখিয়া সখীরা করতালী দিতে দিতে পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া দময়ন্তী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, যে আমার

পশ্চাৎ গমন করিবে, সে আমার ক্রোধের উৎপত্তি করিবে তাহার প্রতি আমার দিব্য। ইহা শুনিয়া বয়স্তারা ক্ষান্ত হইল, তিনি ক্রমে ক্রমে উদ্যানের বহুদূরে নীত হইলেন। তখন হংস বলিতে লাগিল, অয়ি! কতদূর আসিয়া পড়িয়াছ, তোমার এরূপ পরিশ্রমের কারণ কি? এই ঘন-বনালী সন্দর্শনে কি তোমার ভয়ের সঞ্চার হইতেছে না? তুমি কিরূপে আমাকে ধরিবে? আমি বিয়দ্বিহারী বিহঙ্গ, বসুধাই তোমার একমাত্র গম্যস্থল, হায় কন্দর্পের বন্ধুত্ব-যোগ্য বয়সেও তদীয় বালিকাভাব বিদূরিত হয় নাই। ব্রহ্মার বাহন যে সকল হংস, তাহার বংশে আমি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। স্বর্গগঙ্গার হেমমৃণালিনীর কোমলনাল ভোজনে আমার দেহ সুবর্ণময় হইয়াছে, যেহেতু ভোজ্যানুরূপই শরীর হয়, কার্য্যের কারণের গুণপ্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ। বিধাতার আজ্ঞায় নলরাজার ক্রীড়াসরোবরে অবগাহনের নিমিত্ত সমাগত হংসগণের মধ্য হইতে আমি ভূলোক সন্দর্শনে উৎসুক হইয়া, ভ্রমণ করিতে করিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। সেই নলরাজার ঐশ্বর্য্যের বিষয় আর কি বলিব, প্রসিদ্ধ দেবাঙ্গনা রম্ভা আমাদের মুখে নলের অনুপম সৌন্দর্য্যের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহাতে অনুরক্তা হইয়াছিলেন, শেষে তাঁহাকে লাভ করিতে না পারিয়া নল নামের গন্ধ আছে বলিয়া নলকুবেরকে ভজনা করিতেছেন। হে দময়ন্তি, তুমি নলকে আশ্রয় করিয়া সেই স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে পারিতেছ না, আর কোন অযোগ্যা রমণী উহা উপভোগ করিতেছে, ইহা কি অল্প দুঃখের বিষয়? হায়, পদ্মিনীর দুষ্প্রাপ্য জ্যোৎস্নার উৎসব চন্দ্রের আশ্রয়ে কুমুদিনী লাভ করিতেছে। তুমি যে সেই নলের হস্তগতা হইবে না, তাহা বিধাতার মনে প্রবেশ করিয়া কে দেখিয়াছে? তোমার পাণিগ্রহণ হয় নাই—রাজকুমারীও বট, সৌন্দর্য্যের ত তুলনাই নাই—হে সুন্দরি! আমি তোমাকে বড় পরিশ্রান্তা করিয়াছি, সেই অপরাধ ক্ষালনের জন্য কি প্রিয়কার্য্য করিব বল? তদন্তর দময়ন্তী দ্ব্যর্থঘটিত বাক্যে নলের প্রতি স্পৃহা ব্যক্ত করিলে হংস পুনরায় বলিতে লাগিল,—তুমি পিতার অনুমতিক্রমে অথবা নিজের ইচ্ছায় যদি পুরুষান্তর বরণ কর, তাহা'হইলে আমার প্রতি নিষধেশ্বরের বিশ্বাস কি আকার ধারণ করিবে, বল দেখি? তাহা শ্রবণে দময়ন্তী লজ্জার অনুরোধ কথঞ্চিৎ ত্যাগকরতঃ মস্তক কম্পিত করিয়া বলিলেন, হে হংস! তুমি অগ্রে সরোজিনীর অন্তঃকরণের অনুরাগ সূর্য্য ব্যতীত অন্যের প্রতি বিতর্ক না করিয়া আমার অন্যের সহিত পাণিগ্রহণের আশঙ্কা করিতেছ, ইহা অল্প সাহস নহে। তাহার পর হংস প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নলের নিকট সমুদয় নিবেদন করিল। ইহাতে নলরাজের বিরহাগ্নি বহুগুণে বর্দ্ধিত হইল। এদিকে হংসের গমনের পর দময়ন্তীর বিবিধ প্রকার স্মর-বিক্রিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। চিন্তা, অরুচি, সর্ব্ববিষয়ে নিঃস্পৃহতা, কৃশতা প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে দেখা দিতে লাগিল। তদনন্তর দময়ন্তী বসন্ত, কোকিল, ভ্রমর, চন্দ্র প্রভৃতিকে নিন্দা করিতে করিতে সখীদের সহ কথোপকথনের সময় বিরহে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, বয়স্যারা কেহ মুখে সুশীতল জলসেক, কেহ বা পদ্মিনীদলদ্বারা স্তনযুগ আচ্ছাদন, কোন সখী তালবৃন্ত ব্যজন,

অন্যকেহ শরীরে তুষার (বরফ) প্রদান করিতে লাগিল। এমন সময় ভীমনরপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত চিকিৎসক ও মন্ত্রী একদা একপ্রকার বাক্য দ্বারা রাজকুমারীর পীড়া প্রশমনের ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। চিকিৎসক বলিলেন, আমি চরক ও সুশ্রুত অনুসারে জানিতে পারিয়াছি, নলদ (উষীর-মূল) ভিন্ন এ পীড়া উপশমের অন্য উপায় নাই। মন্ত্রী বলিলেন, আমি গুপ্ত চরের নিকট উত্তমরূপ শ্রুত হইয়াছি, নল ভিন্ন এপীড়া নিবারণের অন্যবিধ উপায় নাই। তারপর রাজা শুভদিন স্থির করিয়া দময়ন্তীর স্বয়ম্বরবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিলেন, এদিকে দেবর্ষি নারদ পর্ব্বতমুনিকে সঙ্গে করিয়া বীণাযন্ত্রে হরিগুণগান করিতে করিতে অমরাবতীতে ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত হই-লেন। ইন্দ্র তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা ও সাদর সম্ভাষণের পর জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবর্ষে! পূর্ব্বে মর্ত্ত্যলোকের বহু বীরপুরুষ সম্মুখ সংগ্রামে দেহত্যাগ করিয়া আমার সহচর হইতেন, এখন আর কেহ আগমন করেন না, ইহার কারণ কি? তবে কি মর্ত্ত্যভূমি বীরশূন্যা হইয়াছে? তাহা শুনিয়া দেবর্ষি বলিলেন, দেবরাজ! ভূমণ্ডলে বীরের অভাব নাই—কিন্তু বীরগণের স্বর্গ আগমনের এক প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে, বিদ-র্ভের অধীশ্বর ভীমরাজার গৃহে দময়ন্তী নাম্নী এক ত্রিভুবনমোহিনী কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। সংপ্রতি তাহার বিবাহোচিত বয়স নিরীক্ষণ করিয়া রাজা স্বয়ম্বর বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন। তদীয় সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ পৃথিবীর যাবতীয় নরপতিগণ তাহার স্বয়ম্বর দিন প্রতীক্ষা করিতেছেন। যুদ্ধ তাঁহাদের নিকট এখন বিষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এই কথা বলিয়া দেবর্ষি বিরত হইলেন। দেবরাজ ঋষিকে বিদায় দিয়া অতীব উৎকণ্ঠিত চিত্তে বরুণ, অগ্নি ও যমের সহিত দময়ন্তীর কামনায় যাত্রা করিলেন, তদানীং ইন্দ্রাণী সখীদের সহ কথাপ্রসঙ্গে দেবরাজের প্রতি তিস্কারসূচক কথা বলিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতেও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। রথে মর্ত্ত্যভূমে আগমন করিতেছেন, এমত সময় দেখিতে পাইলেন, নল বেগবান্ অশ্ব রথে যোজনা করিয়া বিদর্ভ প্রদেশাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। তাঁহারা দূর হইতেই নলকে চিনিতে পারিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, এ যদি স্বয়-ম্বর সভায় গমন করে, তাহা হইলে দময়ন্তী কদাচ অন্যকে বরমাল্য প্রদান করিবে না, আর যদি অপরকে বরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে অনভিজ্ঞা মনে করিতে হইবে। তদনন্তর কূটরাজনীতিজ্ঞ ইন্দ্র নানা প্রকার বাক্‌চাতুর্য্যে নলকে আত্মীয় প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার দৌত্যভার লইয়া দময়ন্তীর নিকট প্রেরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

তখন নল ইন্দ্রের কপটতা বুঝিতে পারিয়া তদুচিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং সুন্দর ও যুবা পুরুষের যে দৌত্যকার্য্য নিষিদ্ধ প্রভৃতি কারণ দর্শাইয়া দেবরাজের বাক্যে অসম্মতি প্রকাশ করি-লেন, কিন্তু ইন্দ্র কোন প্রকারেই নির্ব্বন্ধ ত্যাগ করিলেন না। নলকে আকাশমার্গে গমনের শক্তি প্রদান করিয়া বিদর্ভনগরে পাঠাইয়া দিলেন। নল তাহার সাহায্যে প্রহরীদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভীমনরপতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, অন্তরাল হইতে দেখিলেন, বিদর্ভরাজনন্দিনী তাঁহার বিরহে অধৈর্য্যা হইয়া আছেন। তিনি দময়ন্তীর

সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু কি করেন যে গুরুতর কর্ত্তব্য ভারগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পালন করিতেই হইবে, সুতরাং দময়ন্তী সকাশে প্রকাশিত হইয়া দেবরাজের প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু দময়ন্তী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া কেবল তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নল ইন্দ্রের দূত ব্যতীত অন্য কোন পরিচয় প্রদান করিলেন না এবং সুরপতির অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যই বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী বলিলেন, আমি নলে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, আমার এখন আর অন্য কোন অভিলাষ নাই—অতএব আপনার অন্যের নিমিত্ত চেষ্টা বৃথা; আপনি কে, এই পরিচয় আমাকে প্রদান করুন, ইন্দ্রের দূত এই পরিচয়ে আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইতেছে না, কেননা জলের পিপাসা কদাচ দুগ্ধ দ্বারা উপশমিত হয় না। তদনন্তর নলরাজ দময়ন্তীকে একান্ত অনুরক্তা বুঝিতে পারিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং দময়ন্তীর সহিত অনেক প্রণয়গর্ভ আলাপের পর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমুদয় দেবরাজকে বিদিত করিলেন। অনন্তর বিদর্ভরাজধানী কুণ্ডিনপুরে মহতী স্বয়ম্বর সভা আহূত হইল। পৃথিবীর যাবতীয় নৃপতিবর্গ সভায় যথাযোগ্য স্থানে আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন। নলরাজও সভাক্ষেত্রে সমুপস্থিত আছেন। ঈদৃশ সময়ে দেবরাজ অপূর্ব্ব মায়া বিস্তার করিলেন। বিদর্ভরাজনন্দিনী স্বয়ম্বর সভায় আনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন, স্বয়ম্বর সভায় বহু নলনৃপতি বিরাজমান আছেন, ইহার মধ্যে প্রকৃত নলনৃপতি কে? কাহাকে তিনি বরমাল্য প্রদান করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তখন ধর্ম্মপরায়ণা দময়ন্তী কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! আমি নলে আত্মসমর্পণ করিয়াছি—আমি কদাচ যদি মনে ও বাক্যে ইহার অন্যথা না করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের ফলে আপনারা আমার পতিকে প্রদর্শন করুন, বারম্বার এইরূপ প্রার্থনা করিলে দেবতারা অনুগ্রহ করিয়া নিজ বেশ ধারণ করিলেন, তখন দময়ন্তী প্রফুল্লচিত্তে দেবগণকে প্রণিপাত করিয়া নলকে বরমাল্য প্রদান করিলেন। যথাবিধি পরিণয়োৎসব সম্পন্ন হইল।

নৈষধের গল্প সংক্ষেপে বিবৃত হইল, মহাভারতে নলোপাখ্যান কাহারও অবিদিত নহে। কবি উপাখ্যানের প্রায় অংশ পরিত্যাগ করিয়া প্রথম হইতে যৎকিঞ্চিৎ যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই উপর সাময়িক রুচির অনুকূল হীরা, মতি বসাইয়া একটী লাবণ্যময় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। নৈষধকারের কল্পনা বেশ মনোহারিণী। নল এই বাক্যের নায়ক, নল। অনেকে হয়ত ইহাঁকে ধীরোদাত্ত নায়ক বলিবেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধীরললিত নায়ক বলাই সঙ্গত। ধীরললিত নায়ক নিশ্চিন্ত, মৃদুপ্রকৃতি, সর্ব্বদা নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতিতে রত। *। নলও রাজ্যাদির চিন্তায় আসক্ত নহেন যথা;—

অথ প্রিয়া ভর্ৎসিতমীনকেতনঃ
সমং বয়স্যৈঃ সরহস্যবেদিভিঃ।
পুরোপকণ্ঠং সবনঙ্কিলেক্ষিতা
দিদেশ যানায় নিদেশকারিণঃ॥

(নৈষধ, ১ম সর্গ)

* নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ। সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ।

মুখে ব্যক্ত করিয়া দময়ন্তীকে লজ্জাহীনা ও কিয়ৎপরিমাণে প্রগল্‌ভা করিয়া তুলিয়াছেন। যদিও পূর্ব্বে বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া বিবাহ হইবার প্রথা ছিল, তথাপি একটী অপরিণীতা বালা, যিনি দাম্পত্য ব্যাপারে কিছুমাত্র অভিজ্ঞা নহেন, তাঁহার মুখে এতদূর পাকা পাকা কথাগুলি একান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। যদি কেহ বলেন, আজকালও কত কুমারীদের কবিতায় প্রণয়ের উচ্চ উচ্চ কথা পাঠ করা যায়, অতএব দময়ন্তী ওরূপ দুইচারিটা কথা বলিবেন, আশ্চর্য্য কি? অধুনাতন শিক্ষিতাদের ন্যায় তাঁহারও প্রণয়বিজ্ঞানের দুই একখানি গ্রন্থ অধীত ছিল না, এমন নহে, কিন্তু পঠিত জ্ঞান আর (practical knowledge) কার্য্যকরী ব্যুৎপত্তি, এ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। দময়ন্তীর কথাগুলি পাঠ করিলেই বোধ হয় যেন তিনি কতবার নিরাশ হইয়াছেন, পদে পদে তাঁহার আশঙ্কা। এই সকল প্রৌঢ়া-রমণী-সুলভ ভাব বালিকাতে কি কখন সম্ভব হইতে পারে? শালীনতাই রমণীর অলঙ্কার, শালীনতাগুণ-বিবর্জ্জিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীও লোকচক্ষে, সুন্দরীরূপে প্রতীত হয়েন না। কবি উল্লিখিত দোষ পরিহারের জন্য শেষে কন্দর্পের ঘাড়ে সমুদয় চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যথা;—

> ইত্যুক্তবত্যাযদলোপি লজ্জা
> সানৌচিতী চেতসিনশ্চকাস্তু।
> স্মরস্তুসাক্ষী তদদোষতায়া
> মুন্মাদ্যযস্তত্তদবীবদত্তাং॥ ৯৭।
> (নৈষধ ৩য় সর্গ)

এই সকল কথা বলিবার সময় দময়ন্তী যে লজ্জা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের হৃদয়ে অনুচিত বলিয়া বোধ না হউক, কেননা দময়ন্তীর নির্দ্দোষিতা বিষয়ে কন্দর্পই সাক্ষী, যেহেতু সেই কন্দর্পই দময়ন্তীকে উন্মত্তা করিয়া ঐ সকল কথা বলিতে বাধ্য করিয়াছিল। এই কথা বলিয়া কবির কি লাভ হইল, বুঝিতে পারা যায় না। দময়ন্তী তাঁহার স্বহস্ত রচিত পুত্তলিকা, সুতরাং তিনি যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপেই নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া প্রকারান্তরে অসামর্থ্যের পরিচয় দেওয়া কি উচিত হইয়াছে? (ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র [illegible]।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪৯)

সনাতন শিক্ষা—অভিধেয় তত্ত্ব।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, তত্ত্ববস্তু নির্ণীত হইলে এবং জীবতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মিলে, সম্বন্ধতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে উপায়ের দ্বারা এই সম্বন্ধের অনুশীলন হইয়া জীব আপনার অভীপ্সিত প্রাপ্য কি, জানিতে পারে, তাহার নাম অভিধেয়। সোজা কথায় শ্রীকৃষ্ণ ভজনের মুখ্য উপায়কেই অভিধেয় বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ নানাপ্রকার উপায়কে মুখ্য পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বর্ণাশ্রমাচরণে, কেহ কর্ম্মযোগকে, কেহ জ্ঞান-

পথকে, কেহ, নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভকে, এবং কেহ বা ভক্তিমার্গকে প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে সুচতুর সাধক কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ পথ, বিচার করিয়া লইবেন। মোটের উপর যাঁহার যেমন অধিকার বা শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহার সাধন-পথও তদনুযায়ী উন্মুক্ত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা বা অধিকার ত্রিবিধ। উত্তম, মধ্যম এবং অধম। যিনি স্বকীয় ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে অবলোকন করেন এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্মাধিষ্ঠানে পূর্ণ দেখেন, তিনি উত্তম অধিকারী। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তজনে মৈত্রী, অজ্ঞজনের প্রতি কৃপা এবং শক্রর প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম অধিকারী। আর যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাতে হরিপূজা করেন; তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী। সমস্ত অধিকারীগণের একই উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ভজন না করিয়া যিনি যে উপায়ই অবলম্বন করুন না কেন; তাহাতে কোন ফলই হইতে পারে না। আর ভগবদুপাসক কোন বিশেষ পথ অবলম্বন না করিলেও পূর্ণ-মনোরথ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সে যাহা হউক, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি?—একবার বিবেচনা করা যাউক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, চারিবর্ণের ও ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক, এই চতুরাশ্রমের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের নাম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। বর্ণাশ্রমীগণ ভগবান্‌কে না ভজিয়া—যুগযুগান্ত-নির্দ্ধারিত নিয়ম প্রতিপালন করিলেও মায়ামোহের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মযোগ। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমের কর্ম্মানুষ্ঠান ও যত কিছু সাধুকর্ম্ম, এ সকলকেই কর্ম্মসংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। কর্ম্ম থাকিলেই তাহার কর্ত্তা থাকিবে। এবং কর্ত্তৃত্ব-বোধের সঙ্গে সঙ্গে অহংজ্ঞান থাকা অনিবার্য্য। এই সমুদায় সাধুকর্ম্ম আমি করিতেছি, এবম্প্রকার অহঙ্কারজনিত কর্ম্মকে কখনই ভগবল্লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলা যাইতে পারে না। তাহাতে লাভই বা কি? তাহার পর জ্ঞান। বেদবেদান্তাদি ভূরি ভূরি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যাহারা মনে করে, আমরা জ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত, তাহাদের সকল শ্রম, তণ্ডুল লাভার্থে তুষাবঘাতীদের ন্যায় কি বৃথা হয় না? তাহার পর নির্ব্বিকল্প সমাধি। সোহহং বা আমিই ব্রহ্ম, এই সাধনা কি বিড়ম্বনার জন্য নয়? জীব-প্রকৃতি কি কখন ঈশ্বর-প্রকৃতি লাভ করিতে পারে? অথচ নির্ব্বিকল্প সমাধির লক্ষ্যই সোহহং জ্ঞান লাভ। আর ইহাও বলি যে, আত্মারাম মুনি সকলও ভগবানে ভক্তি করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। তবেই দেখ, বিশুদ্ধ ভক্তি ভিন্ন আর অন্যপথ নাই। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, বা অন্যকামীগণও গাঢ় ভক্তি যোগে যদি একবার 'হে প্রভো!' আমি তোমারই বলিয়া শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলেও তাহারা তাঁহার চরণ লাভে সমর্থ হয়। ধ্রুব স্থানাভিলাষী হইয়া তপস্যা করিয়াও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ভক্তি লাভ সহজে হয় না। ভগবানের কৃপায় বহুকালে লাভ হইয়া থাকে। তখন স্বয়ং প্রভু অন্তরে অন্তর্যামীরূপে ও বাহিরে আচার্য্যরূপে তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তখন সাধকের সাধুসঙ্গ করিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। সনাতন, সাধুসঙ্গের গুণ আর কত বলিব। সাধুসঙ্গ লাভে সর্ব্বানর্থ নষ্ট হইয়া সিদ্ধিলাভ হয়।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধু কি প্রকারে চেনা যায়?

শ্রীচৈতন্য। সাধুতে এই সকল গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যকেই সার করিয়াছেন, সর্ব্বত্র সমদর্শন, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারী, শান্ত, অকাম, নিরীহ, স্থির, রিপু-জয়ী, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী এবং সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রয় করিয়াছেন। এমন সাধুসঙ্গ পাইলে ত হয়!

সনাতন জিজ্ঞাসিলেন, কাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত?

শ্রীচৈতন্য। অশান্ত, মূঢ়, দেহে আত্মাভিমানীগণের ও অভক্তজনের, স্ত্রীসঙ্গে অনুরক্তজনের এবং যাহারা ঐরূপ লোকের সঙ্গ করে, তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করা উচিত। অগ্নিদাহ মধ্যে লৌহপিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল, তথাচ এরূপ লোকদিগের সহিত একত্র বাস করা উচিত নয়। তবেই দেখ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ না লইলে ভক্তিলাভের উপায় নাই। অকিঞ্চন শরণাগত হইতে হইবে, তা যেন মনে থাকে।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, শরণাগত ব্যক্তির লক্ষণ কি?

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, ভগবৎ সেবার অনুকূল বিষয়ে সংকল্প, প্রতিকূল পরিত্যাগ, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তিনি রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস, তাঁহার রক্ষিতৃত্বে আত্মসমর্পণ, তাঁহার কার্য্যে আত্ম বিসর্জ্জন ও তাঁহাতে নিষ্ঠগতি, এই ছয়টী শরণাগতের লক্ষণ। শুন সনাতন, এইরূপে সাধু সঙ্গ ও শরণাগতি লাভ হইলে সাধন ভক্তির আরম্ভ হইয়া থাকে। স্বভাবজ স্বতঃসিদ্ধ কতকগুলি ভাব মানবান্তরে নিহিত আছে, সেই গুলিকে উদ্দীপন করার নামই সাধন। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যদ্দ্বারা এই সকল ভাব সাধন করিতে পারা যায়, তাহারই নাম সাধন ভক্তি। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি তাহার ক্রিয়া। প্রেম তাহার ফল। মনে ভাবিও না যে, কৃষ্ণপ্রেম সাধনার যোগ্য। সাধন করিয়া কেহ সে প্রেম পাইতে পারেনা। উহা নিত্যসিদ্ধ হইয়া মানবান্তরে রহিয়াছে। চিত্ত পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যোগে তাহা উদয় হয় মাত্র। দর্পণের ময়লা নিষ্ক্রান্ত হইলে উহাতে প্রতিবিম্ব যেমন দেখা যায়, সেইমত। এই সাধন ভক্তি দুই প্রকার, এক বৈধীভক্তি, অপর রাগানুগা। অনুরাগবিহীন ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রাজ্ঞায় যে সাধন করেন, তাহারই নাম বৈধীভক্তি। গুরু পদাশ্রয় প্রভৃতি ইহার চৌষট্টী অঙ্গ আছে; তাহার মধ্যে স্বধর্ম্মী ও আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুগণের সঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস* এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনা, এই পাঁচটী প্রধান। এই সকল সাধনাঙ্গের মধ্যে কেহ এক, কেহবা বহু অঙ্গ সাধন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। যেমন ভগবানের গুণলীলা শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে ব্যাসনন্দন শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদ সেবায় লক্ষ্মী, পূজায় পৃথুরাজা, অভিবন্দনে অক্রূর, দাস্যে পবন তনয়, সখ্যে অর্জ্জুন, এবং আত্ম নিবেদনে বলিরাজা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আর অম্বরীষাদি বহু অঙ্গ সাধন করিয়াছিলেন। কামনা পরি-

* ভাবনাদ্বারা ভগবান্কে সমীপস্থ জ্ঞান করিয়া লীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তনে মগ্ন হওয়ার নাম মথুরাবাস।

ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রাজ্ঞায় ভক্তি সাধন করিলে সাধক কখন পাপাচরণ করিতে পারেনা, প্রমাদ বশতঃ করিলেও অন্তর্যামী হরি তাহার অন্তরে থাকিয়া সংশোধন করিয়াছেন। এক্ষণে রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তির সাধন বলি, শ্রবণ কর। অভিলষিত বস্তুতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনপেক্ষিত স্বাভাবিক প্রেমময় প্রগাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগ বা অনুরাগ। রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা ও আবেশ বা লোভই ইহার প্রাণ। কেবল ব্রজবাসী জনেই উহা সুস্পষ্ট বিরাজমানা। যে সব সাধক ব্রজবাসীজনের অনুগত হইয়া রাগাত্মিকার অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভক্তিকে রাগানুগা বলা যায়। তাঁহারা শাস্ত্র যুক্তি কিছুই মানেন না। রাগানুগা ভক্তির অনুসরণকারী সাধকের সাধন দুই প্রকার; বাহ্য ও অন্তর। বাহিরে সাধক-দেহেতে বৈধীভক্তি সাধনের ন্যায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি অঙ্গ আচরণ করা এবং অন্তরে ব্রজভাবের কোন একটী সখী, সখা, বা পিতামাতাকে নিজ আদর্শ স্থানে রাখিয়া ও সেই আদর্শ ব্যক্তির সিদ্ধ দেহ পাইয়াছেন, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই ভাবে কৃষ্ণ সেবা করা। ইহা কিন্তু অন্যের অগোচর খুব গোপনে করিতে হইবে। এই সাধনে ভক্ত ভগবান্‌কে পতি, পুত্র, সুহৃদ্‌, ভ্রাতা, ও পিতা মনে করিয়া সেবা করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে এই অভিধেয় তত্ত্ব বলিলাম।

প্রয়োজনতত্ত্ব বা প্রেম।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চারিটী পুরুষার্থ শাস্ত্রে নিরূপিত থাকিলেও, জীবের যথার্থ প্রয়োজন প্রেমে—উহাই তাহার প্রাপ্য, উহাই তাহার পরিণতি। ইহা লাভ করিবার পূর্ব্বে রুচি ও ভাব আবশ্যক। কিন্তু বিশুদ্ধ সত্ব গুণদ্বারা চিত্ত মসৃণ না হইলে এ সব কিছুই লাভ হয় না। সাধকের প্রেমলাভ করিবার সিঁড়ি এইরূপ বলা যাইতে পারে। প্রথমে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, তৎপরে সাধুসঙ্গ, তাহার পরে সাধনারম্ভ। সাধন আরম্ভ হইলে অসৎ ক্রিয়া কপটাদি ক্রমে দূরীভূত হইয়া থাকে। তাহার পর নিষ্ঠা জন্মায়। নিষ্ঠা হইতে গুণলীলাদি শ্রবণে রুচি হয়। এতদিন যাহা তিক্ত ঔষধ সেবনের ন্যায় কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনুষ্ঠিত হইত, সেই শ্রবণাদি এখন সুখময় হইয়া দাঁড়ায়। তাহার পর আসক্তি। শ্রবণ কীর্ত্তন না হইলে আর প্রাণ বাঁচে না। তাহার পর জোয়ারের জল দাঁড়াইলে যেমন নিম্নে পলি পড়িতে থাকে, তেমনি কুভাবের পরিবর্ত্তে হৃদয় এখন বিশুদ্ধ ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। ভাবোৎপত্তি হইলেই প্রেমোদয় হয়।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রেমের লক্ষণ কি?

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, যাহাতে হৃদয় সম্যক্‌রূপে মসৃণ হয়, যাহা অতিশয় মমতাযুক্ত এবং যাহার স্বরূপ অত্যন্ত ঘনীভূত, পণ্ডিতেরা তাহাকেই প্রেম কহিয়া থাকেন। প্রেমাঙ্কুর জন্মিলে সাধকে এই সব চিহ্ন প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তিনি ক্ষমাশীল হয়েন। প্রাকৃত ক্ষোভে তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না। ভগবদ্বিষয় ভিন্ন তিনি অন্য বিষয়ে কালক্ষেপ করেন না; সমস্ত জীবন তাঁহারই জন্য উৎসর্গ করিয়া

দেন ; বিষয়াদি ভোগে বীতরাগ ও নিরভি মানী হয়েন। ভগবানকে পাইবেন, হৃদয়ে এই সুদৃঢ় আশা বদ্ধমূল হয় ; তাঁহার মিলনাশায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়া থাকে, নামগানে ও গুণাখ্যানে রুচি ও আসক্তি জন্মে এবং লীলাস্থানে বসতি করিতে অত্যন্ত আগ্রহ হয়। ফলতঃ যাহার প্রাণে নব প্রেম উন্মীলিত হয়, তাহার হৃদয়ের ভাব ও চেষ্টা সকলই অলৌকিক দেখা যায়। সে কখন হাসে, কাঁদে, গান করে, নৃত্য করে, মৌনী হইয়া থাকে এবং কখন বা অত্যুচ্চ চীৎকারে লোকের ভীতি জন্মায়। যেমন মূল ইক্ষুরস হইতে গুড়, চিনি, মিছরি প্রভৃতি উৎকৃষ্টতর বস্তু সকল পর পর উৎপন্ন হয়, তেমনি প্রেম বাড়িয়া ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্তে পরিণত হইয়া থাকে। এ সব কথা আমি পূর্ব্বে প্রয়াগে তোমার ভাই রূপকে বলিয়াছি, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের নব্যভারত দেখ।) এই পর্য্যন্ত প্রয়োজনতত্ত্ব। এই তত্ত্ব লাভ করিতে হইলে নায়ক নায়িকাকে রসের আলম্বন করিতে হয়। পুরুষ-প্রধান শ্রীকৃষ্ণই সেই নায়ক ও প্রধানা প্রকৃতি শ্রীরাধিকাই সেই নায়িকা। অন্য নায়ক নায়িকাকে কল্পনা করিলেও মহাপাতক হয়। শুন সনাতন, এই সব তত্ত্ব তুমি লিপিবদ্ধ করিয়া ভক্তি প্রচার করিবে।

সনাতন অতি দীনভাবে বলিলেন, আমি অতি নীচ, কুবিষয় গর্ত্তে পড়িয়াছিলাম। তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দেবাদির দুর্লভ কত তত্ত্বই শিখাইলে। কিন্তু তোমার কৃপা ভিন্ন ত এ সব কথা আমাতে স্ফূর্ত্তি পাইবে না। তুমি আমার মাথায় চরণ দিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন এ সব তত্ত্বকথা আমি বর্ণিতে সমর্থ হই।

শ্রীচৈতন্য তখন তাঁহার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, ভগবানের কৃপায় এ সব তত্ত্ব তোমাতে স্ফুরিবে স্ফুরিবে। ইহার পর গৌড়-রাজ-সচিব শ্রীসনাতন শ্রীচৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিয়াছি পূর্ব্বে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট তুমি ভাগবতীয় 'আত্মারাম' শ্লোকের আঠার প্রকার অর্থ করিয়া শুনাইয়াছ। কৃপা করিয়া সেই সব ব্যাখ্যা আমাকে শুনাইলে কৃতার্থ হই।"

শ্রীচৈতন্যদেব উত্তর করিলেন, আমি পাগল, ভট্টাচার্য্যের নিকট কি পাগলামি করিয়াছিলাম, মনে নাই। ভট্টাচার্য্য বুঝি সে সব কথা সত্য মনে করিয়া লইয়াছেন ? আচ্ছা দেখি, তোমার সঙ্গ-বলে কিছু অর্থ স্ফূর্ত্তি হয় কি না। সহজে আমার মুখে কোন ব্যাখ্যা স্ফূর্ত্তি হয় না ; ভক্তের সঙ্গে ও শক্তিতে যাহা কিছু বলিতে পারি। শ্লোকটী এই :—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণো হরঃ।"

'আত্মা' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি ও স্বভাব। এই সকলে যাহারা রমণ অর্থাৎ সুখে অবস্থিতি করেন, তাঁহারাই আত্মারাম। 'মুনি' শব্দে মননশীল, যথা তপস্বী,ব্রতী, যতি ও ঋষি মুনি।

'নির্গ্রন্থাঃ' অর্থ যাঁহাদের অবিদ্যা বা মায়াজনিত গ্রন্থি নাই। শাস্ত্রাদি জ্ঞান বিহীন, মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ, ধনসঞ্চয়ী ও নির্দ্ধনকেও নির্গ্রন্থা বলা যাইতে পারে।

'উরুক্রম' বলিতে যাঁহার বৃহৎ ক্রম।

'ক্রম' শব্দে পাদ বিক্ষেপ, শক্তি, কল্প, পরিপাটী, যুক্তি ও আক্রমণ। ইহার তাৎপর্য্যার্থে এই যে, যিনি বিভুরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, সকলকে ধারণ ও পোষণ করিতেছেন, মায়া শক্তিতে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সকল সৃজন করিতেছেন ও মাধুর্য্যশক্তিতে পরব্যোম ও গোলোকাদিতে লীলা করিতেছেন।

'কুর্ব্বন্তি' পদ পরস্মৈপদী, এই জন্য যে উপাসনার ফল ভগবানে অর্পণ।

'অহৈতুকী' শব্দে বাঞ্ছান্তর রহিত। ভক্তি অর্থাৎ অনন্ত ভোগ, অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ও পঞ্চ প্রকার মুক্তির বাঞ্ছাশূন্য।

'ভক্তি' শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাধন ভক্তি ও প্রেমভক্তি। রতিভেদে প্রেমভক্তি আবার নয় প্রকার।

'ইত্থম্ভূত গুণঃ' শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, রস স্বরূপ পূর্ণানন্দময়। কৃষ্ণের 'সৎ, চিৎ, আনন্দরূপের গুণ অনন্ত। অনন্ত গুণে বিশ্ব চরাচর স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ সকলেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ।

'হরি' শব্দের নানার্থের মধ্যে দুইটী প্রধান। প্রথম যিনি অমঙ্গল হরণ করেন; দ্বিতীয় যিনি প্রেম ও করুণা দানে প্রাণ মন হরণ করিয়া লয়েন। অমঙ্গল হরণ প্রথমাবস্থায়, প্রাণ মন চুরি করা শেষাবস্থায়। তাঁহাকে যে স্মরণ করে, প্রথমে তাহার তিনি সর্ব্ববিধ তাপ ও অবিদ্যান্ধকার নাশ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনে রুচি দেন, তাহা হইতে ক্রমে প্রেম প্রকাশ করিয়া শেষে তাহার আত্মা প্রাণ মনাদি হরণ করিয়া একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন।

'অপি' ও 'চ' দুই অব্যয় পদ; যেখানে যে অর্থ খাটে, তাহা করিতে হইবে। 'চ' শব্দ একতর প্রাধান্যে, সমূহার্থে, ইতরেতর যোগে, সংযোগার্থে, যত্নে, পাদপূরণে ও অবধারণে ব্যবহৃত হয়। আর 'অপি' শব্দ সম্ভাষণা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, ভয়, নিন্দা, সংযোগ, উহ্যার্থ ও যথেচ্ছ ক্রিয়া সম্পাদন অর্থে প্রযুক্ত হয়। শ্লোকের একাদশ পদের এই বিভিন্নার্থ। এক্ষণে যাহার যে অর্থ যেখানে লাগে, তাহা দিয়া শ্লোকের যত প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্য সহকারে শ্লোকের একষট্টি প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন। তাহাতে তিনি দেখাইলেন যে, কি ব্রহ্মোপাসক, কি পরমাত্মার উপাসক ও কি ভগবানের ভক্ত, জ্ঞানপথেই হউক, যোগ, ভক্তি কি কর্ম্মপথেই হউক; অকামী হউন, মোক্ষকামীই হউন কি সর্ব্বকামীই হউন, সাধু সঙ্গের গুণে ও ভগবানের কৃপায় কামাদি দুঃসঙ্গ অর্থাৎ কৈতব আত্মবঞ্চনা এবং মোক্ষ বাঞ্ছা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মোপাসক ত্রিবিধ, সাধক, ব্রহ্মময়প্রাপ্ত ও ব্রহ্মলয়। আত্মোপাসক ত্রিবিধ; মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্ত স্বরূপ ও যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ় ও প্রাপ্তসিদ্ধ তিন প্রকার যোগী এ সকলকেই শেষে শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয় লইতে হয়। ইহাদের কথা দূরে থাকুক, সামান্য জীবগণ, ম্লেচ্ছাদি, কদাচারী ও পাপাচারীগণ, এমন কি স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী সকলেই সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণ কৃপাগুণে ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে, কেহই তাঁহার কৃপা লাভে বঞ্চিত নয়। ব্রহ্মাদি দেবগণও এই অহৈতুকী ভক্তির জন্য লালায়িত। অতঃপর

শ্রীচৈতন্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের বহু প্রশংসা করিয়া তাহার সদর্থ সনাতনকে শিক্ষা দিয়া প্রচার করিতে উপদেশ দিলেন।

তখন সনাতন অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, আপনি যে সব তত্ত্ব আমাকে শিখাইয়া গ্রন্থাকারে বর্ণন করিতে বলিলেন, আমার ভয় হইতেছে, আমা হইতে তাহা সম্পন্ন হইবে না। অতএব কৃপা করিয়া ভবিষ্যৎ গ্রন্থ নিচয়ের সূত্র করিয়া দিউন। শ্রীচৈতন্য হাসিয়া বলিলেন, তোমা দ্বারাই কৃষ্ণ সব কাজ সম্পন্ন করিয়া লইবেন, তাহাতে কোন আশঙ্কা করিও না। তথাচ তোমার সন্তোষার্থ আমি কোন কোন গ্রন্থের সূত্র করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া গৌরচন্দ্র শ্রীমুখ হইতে কতক সূত্র রচনা করিয়া দিলেন। সনাতন গোঁসাই তাহা লিখিয়া লইলেন।

দুই মাস ধরিয়া শ্রীচৈতন্য সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী গোষ্ঠিতে।

কাশীতে অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্য ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ পরিহার করিতেন। প্রকাশানন্দ-প্রমুখ পরমহংসগণ একে সর্ব্বদাই তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইত, তাহাতে উহাদের সভাতে গর্ব্বপূর্ণ আত্মশ্লাঘা ভিন্ন কোন সৎপ্রসঙ্গ হইত না, এজন্যই চৈতন্যদেব তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতেন না। পরমহংসগণ ইহাতে অপমানিত জ্ঞান করিয়া পূর্ণমাত্রায় তাঁহার নানাবিধ নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র ও মহারাষ্ট্রী বিপ্র সেই সব নিন্দাবাদ শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইয়া একদিন তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "আর সহ্য হয় না; তোমার নিন্দা শুনিতে শুনিতে শ্রবণ ও প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে।" শ্রীচৈতন্য ঈষৎ হাসিলেন। এমন সময়ে একটী ব্রাহ্মণ হঠাৎ সেখানে আসিয়া গৌরকে বলিতে লাগিল "আজ আমি কাশীবাসী সমস্ত সন্ন্যাসী পরমহংসদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া যদি একবার পদধূলি দেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। আপনি সন্ন্যাসী সভায় যান না, তা জানি। তবুও যদি আমাকে কৃপা করেন, বড়ই অনুগৃহীত হই।" এরূপ নিমন্ত্রণ গৌরচন্দ্র কতবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এবারে কিন্তু করিলেন না। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কেন করিলেন, পরে প্রকাশ হইবে।

ব্রাহ্মণ-গৃহে মধ্যাহ্নে সন্ন্যাসীদিগের সভা বসিয়াছে। কাশীর সমস্ত দণ্ডী, সন্ন্যাসী ও পরমহংসই সে সভায় আসীন। সকলের অগ্রণী শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ স্বামী মধ্যে বসিয়া প্রগল্‌ভতা সহকারে বেদান্ত আলোচনা করিতেছেন। চৈতন্যদেব এমন সময় উপনীত হইয়া পাদপ্রক্ষালনান্তে সন্ন্যাসীদিগকে নমস্কার করিয়া নিম্নাসনে উপবেশন করিলেন। প্রকাশানন্দ গৌরকে মৌখিক সম্মান করিয়া বলিলেন, 'শ্রীপাদ গোঁসাই, এদিকে আসুন, নীচে কেন বসিলেন।' গৌরচন্দ্র বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, 'আমি অতি হীন সম্প্রদায়, আপনাদের সঙ্গে বসিবার উপযুক্ত নই।'

তখন প্রকাশানন্দ স্বয়ং তাঁহার হাতে ধরিয়া সভার মধ্যখানে আসিয়া বসাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারই নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! আপনি কেশব ভারতীর শিষ্য?'

উত্তর। আজ্ঞে!

প্রশ্ন। আপনি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, এইগ্রামে থাকেন, অথচ আমাদিগকে দর্শন দেন না কেন? শুনিতে পাই, ভাবুকদিগের সঙ্গে মিশে ভাবুকের ন্যায় সর্ব্বদা নৃত্যকীর্ত্তন করেন। বেদান্ত পাঠ ও বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর পরম ধর্ম্ম, তাহা ছাড়িয়া ভাবুকতা করেন্ কেন?

শ্রীচৈতন্য প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপতার সহিত উত্তর করিলেন, শুনুন্ ইহার কারণ। আমাকে অতি মূর্খ দেখিয়া গুরু বলিয়াছিলেন "তোর বেদান্তে অধিকার নাই; কৃষ্ণনাম জপ কর, তাহাতেই সিদ্ধমনোরথ হবি।" সেই আজ্ঞাক্রমে আমি নাম লইতে আরম্ভ করিলাম। নাম জপিতে আমার মতিভ্রান্তি হইল; আমি দিশেহারা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে, গাহিতে লাগিলাম। একটু সাব্যস্ত হইয়া মনে মনে বিচার করিলাম "আমি কি পাগল হইলাম। কৃষ্ণনামে কি আমার মতিচ্ছন্ন হইল।" তখন গুরুপদে নিবেদন করিলাম—"মহাশয়, এ কিমন্ত্র দিলেন? আমি যে নাম জপে পাগল হয়ে গেলাম।" গুরু বলিলেন, 'না বাপু! পাগল হও নাই। তোমার পরম ভাগ্য যে নামের ফলে তুমি প্রেমানন্দামৃত লাভে সমর্থ হইয়াছ। কৃষ্ণনামের ফলই এই প্রেম। ইহার নিকট চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ।" শুনিলেন শ্রীপাদ, আমার নাচিবার গাইবার কারণ। আমি কিছু ইচ্ছাপূর্ব্বক নাচি না, গাই না।

শ্রীচৈতন্যের সুচতুর ও সুমিষ্ট বচন ভঙ্গি শুনিয়া সন্ন্যাসীগণ মুগ্ধ হইলেন, তখন প্রকাশানন্দ বলিলেন, "আচ্ছা তা যেন হ'ল, বেদান্ত শুনেন না কেন?

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'যদি দুঃখিত না হন্ তবে তাহার কারণ বলি।'

সন্ন্যাসীগণ বলিয়া উঠিলেন 'না না' আপনি মহাতেজস্বী সন্ন্যাসী। আপনি যাহা বলিবেন, তাহা কখন অসঙ্গত নহে। যাহা ইচ্ছা হয় বলিয়া যাউন।

শ্রীচৈতন্য বলিতে লাগিলেন, 'বেদান্ত সূত্র ঈশ্বর-বাক্য, স্বয়ং নারায়ণ ব্যাসরূপে বলিয়াছেন। উহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি থাকিতে পারে না। উপনিষদ্‌তত্ত্ব পরম পবিত্রতত্ত্ব। কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাহার যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে সূত্রের মুখ্যবৃত্তি আচ্ছন্ন হইয়া গৌণার্থ কল্পিত হইয়াছে। শুনিলে পরমার্থ হানি হয়। আচার্য্যেরও দোষ নাই; তিনি ঈশ্বর-প্রেরণায় বৌদ্ধদিগকে জয় করিবার জন্য ঐরূপ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট যেরূপ ব্যাস সূত্রের ব্যাখ্যায় নির্ব্বিশেষ বাদে দোষারোপ করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরমহংসদিগকে চমৎকৃত করিলেন। সার্ব্বভৌম প্রকরণে এই সব কথা লেখা হইয়াছে। পাঠক মহাশয় দেখিয়া লইবেন। (১২৯৭ সালের ভাদ্র মাসের নব্যভারত ২২৫ পৃঃ দেখ)।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, মোটের উপর ব্রহ্মস্বরূপ অতিবৃহৎ, বাক্য মনের অগোচর। জীব সামান্য চিদংশ মায়া-বদ্ধ। তাহাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলার অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ কি হইতে পারে?

প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ গৌরের

অসাধারণ বিচার-কৌশল ও যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। প্রকাশানন্দ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা আচার্য্যের ভাষ্য না হয় ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিলাম। কিন্তু বেদান্তের প্রকৃত অর্থ কি? আপনি ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা করেন?

তখন শ্রীচৈতন্য বেদান্ত-নিষ্পন্ন ব্রহ্মই যে পরমতত্ত্ব ও একমাত্র উপাস্য, জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন ও তাঁহার দাস ও জীবের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাঁহাকে পাইবার উপায় ও জীবের লক্ষ্য কি, তাহা একে একে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এইসব কথা পূর্ব্বে সম্বন্ধ, অভিধেয়াদি তত্ত্বে লিখিত হইয়াছে। সন্ন্যাসীগণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সেই দিন হইতে কাশীর সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জয় ঘোষণা হইতে লাগিল। কথিত আছে, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এখন সন্ন্যাসীসভায় শ্রীচৈতন্যের নিন্দার পরিবর্ত্তে সুখ্যাতি হইতে লাগিল। একদিন শ্রীচৈতন্য বিন্দুমাধবের মন্দির প্রাঙ্গনে ভক্তগণ সহ নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রকাশানন্দ স্বশিষ্যে আসিয়া দর্শন শ্রবণে পুলকিত হইয়া চৈতন্যের পাদবন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য অমনি নৃত্য বন্ধ করিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলেন—'একি! আপনি মহা পূজার্হ, আমি আপনার শিষ্যের যোগ্য নই, আমার প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণ করিতেছেন কেন? প্রকাশানন্দ বলিলেন, 'আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, লোক নিস্তার জন্য নররূপে অবতীর্ণ, পূর্ব্বে না বুঝিয়া যে নিন্দা করিয়াছি, তাহা মার্জ্জনা করুন।'

শ্রীচৈতন্য কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন, 'বিষ্ণু! বিষ্ণু! আমি জীবাধম। আপনি জগদ্গুরু হইয়া আমাকে এমন বলিলে আমার অপরাধ হইবে।'

তখন উভয়ে অনেক শাস্ত্রালাপ হইল। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ ও আপামর সাধারণ সকলেই এখন হরিসংকীর্ত্তন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইল। সমস্ত বারাণসীপুরী প্রেমে টলমল্ করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য বাসায় আসিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া ভক্তগণকে বলিলেন,'কেমন হে, কাশীতে ভাবকালি বেচিতে এসেছিলাম। গ্রাহক না থাকায় বিক্রী হয় নাই। তাহাতে তোমরা মনে বড় দুঃখিত হয়েছিলে, সেজন্য বিনামূল্যে বেচে গেলাম।' চন্দ্রশেখর প্রভৃতি হাসিতে লাগিলেন। অন্যদিনে প্রভাতে উঠিয়া সনাতনকে বৃন্দাবনে বিদায় করিয়া দিয়া বলভদ্র আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে যাত্রা করিলেন। তপন মিশ্র, রঘুনাথ, চন্দ্রশেখর সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে বলিলেন, 'যাহার ইচ্ছা হয়, পরে আমাকে দেখিতে আসিবে, এখন আমি একা যাইব।' তৎপরে পূর্ব্ব আগত ঝারিখণ্ড পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন এবং যথাসময়ে নীলাচলে উপনীত হইয়া ভক্তগোষ্ঠির আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্ব্যবহার। (১)

যে পঞ্চভূতে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের দেহ গঠিত, তাহা যখন "অব্যক্তে" বিলীন ছিল ;—যখন তাঁহার "দর্শন" কিম্বা "উপলব্ধি" ছিল না, বোধ হয় সেই সময় হইতে আমি স্বদেশের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত আছি। ত্রৈলোক্য বাবু যখন তাঁহার দুই চারিটী দন্ত বিকাশ করিয়া "আঙ্গা কাপলের" জন্য আবদার করিতেন, বোধ হয় তৎকালে আমি সংবাদ পত্রে লিখিতে আরম্ভ করি। আমার প্রথম গ্রন্থ "ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত" যৎকালে প্রকাশিত হয়, বোধ হয় তৎকালে ত্রৈলোক্য বাবু বিদ্যালয়ের নিতান্ত অল্প বয়স্ক বালক মাত্র। সাময়িক পত্রিকায় যখন আমি প্রথম পুরাতত্ত্ব-মূলক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি, বোধ হয় ত্রৈলোক্য বাবু তখনও অজাত-শ্মশ্রু বালক।

তদনন্তর যৎকালে আমি কলিকাতা মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ২৮ নং বাটীতে থাকিয়া ভারতী, বান্ধব প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় পুরাতত্ত্ব মূলক প্রবন্ধ লিখিতে ছিলাম, ত্রৈলোক্য বাবু তৎকালে সেই বাটীতে থাকিয়া কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। সেই সময়ে স্বদেশীয় পুরাতত্ত্বের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দর্শনে নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। কোন্ গ্রন্থ হইতে কিরূপে কোন্ তত্ত্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে, বোধ হয় তাহাও তৎকালে তাঁহাকে বন্ধুভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছি। আশা ছিল, ভবিষ্যতে তিনি সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইলে অবশ্যই আমাদের প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু আমাদের সেই আশায় ছাই পড়িয়াছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে * * * বহির্গত হইয়াই আমার পশ্চাতে লাগিয়াছেন। ততোধিক আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি পদে পদে আমার পদানুসরণ করিয়াও আমার প্রতি অযথা বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতেছেন। ত্রৈলোক্য বাবুর এই ব্যবহারকে কি বলা যাইতে পারে, পাঠকগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

ত্রৈলোক্য বাবুর লিখিত ভাষায় আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—"ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া (ত্রৈলোক্য বাবুর) লেখনী পদে পদে নিজের বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে এত ব্যস্ত হয় কেন, অনর্থক (আমাকে) অন্যায় রূপে নিন্দনীয় ভাষায় আক্রমণ ও গালি বর্ষণ করে কেন, কথায় কথায় বাগাড়ম্বরের সহিত সময় সময় এত গরল উদ্গীরণ করে কেন ?"

"বেণীসংহার" নাটকের ভূমিকায় ৺ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, লক্ষ্মণ সেনের সুবিখ্যাত মন্ত্রী,—"ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" প্রণেতা হলাবুধকে ভট্টনারায়ণের বংশধর লিখিয়াছেন। "ক্ষিতীশ বংশাবলী" চরিত-প্রণেতাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তদনুসারে পণ্ডিতাগ্রগণ্য মৃত রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র বাহাদুর "বঙ্গীয় সেনরাজগণ" প্রবন্ধে হলায়ুধকে ভট্টনারায়ণের বংশধর লিখিয়াছেন।* ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ মহাশয়

---

* His Prime Minister and Lord Chanceller was Halayudha, son of Dhananjaya of the Vatsya race, a Brahmin of great learning and a descendant of Bhattanarayan, the author of Venisanhara.

পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিতগণের মতানুসরণ করিয়া হলায়ুধকে ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থ পাঠে এইমত আমাদের বিবেচনায় সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হওয়ায় ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে "হলায়ুধ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি। সেই প্রবন্ধে ইহা প্রদর্শিত হয় যে, উক্ত গ্রন্থে হলায়ুধ স্বয়ং বাৎস্য গোত্রজ ধনঞ্জয়ের পুত্র বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশধর বলা যাইতে পারে না। "সেনরাজগণ" পুস্তকেও আমরা সংক্ষেপে এই কথার উল্লেখ করিয়াছি।

১২৯৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের নব্যভারতে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'সেনরাজগণ' নামক পুস্তিকার লিখনানুসারে হলায়ুধকে আদিশূরানীত পঞ্চবিপ্রের অন্যতম বাৎস্য গোত্রজ ছান্দড়ের বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। * * কিন্তু পণ্ডিতবর ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতির পরিচয়কালে হলায়ুধকে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এইমত ভ্রমাত্মক কি না, বলিতে পারি না।"

রাবণপুত্র মেঘনাদের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, ত্রৈলোক্য বাবু আরও দুই একবার আমাদিগের প্রতি বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের নব্যভারতে "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম যে, বাৎস্যগোত্রজ হলায়ুধ কখনই শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশধর হইতে পারেন না, "৫ বৎসরের হিন্দুবালকও যাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারে, সংস্কৃতে এম, এ উপাধিধারী একজন ব্রাহ্মণ-যুবক তাহা "ভ্রমাত্মক কি না" তাহা বলিতে পারিলেন না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ভিন্ন আর কি হইতে পারে!

তদনন্তর আমাদের উভয়ের বন্ধু "ঢাকা-গেজেট" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ রায় মহাশয়, আমাদের মধ্যে যাহাতে কোনরূপ কলহ কিম্বা তর্ক-সংগ্রাম উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, "ত্রৈলোক্য বাবুর প্রতিকূলে আমি কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না; তিনিই বারম্বার তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিবার জন্য আমাকে উত্তেজিত করিয়াছেন। ভবিষ্যতেও আমি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিব না।"

বন্ধুবর শশী বাবুর অনুরোধেই হউক, কিম্বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, কিঞ্চিদধিক তিন বৎসরকাল ত্রৈলোক্য বাবু আমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই। সম্প্রতি "ঢাকার পুরাতন কাহিনী" লিখিতে যাইয়া তিনি "ধানভানিতে শিবের গীত" স্বরূপ অপ্রাসঙ্গিক পুরাতত্ত্বের অবতারণা করিয়া আমাদের প্রতি অযথা বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ত্রৈলোক্য বাবুর লেখনী হইতে আমরা যখন "গরল উদ্গীরণের" সূচনা দেখিলাম, তখন নব্যভারত-সম্পাদক প্রিয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহা-

শয়কে বলিলাম যে, "আপনি ত্রৈলোক্য বাবুকে বলুন, আমি তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জানি, তিনি আমার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে বিরত হউন।"

সুহৃদ্‌প্রবর দেবী বাবু বলিয়াছেন, তিনি ত্রৈলোক্য বাবুকে পত্রদ্বারা এই বিষয় লিখিয়াছিলেন, তদুত্তরে ত্রৈলোক্য বাবু নাকি বলিয়াছেন যে, "কৈলাস বাবুর বিরুদ্ধে অন্য কোন লেখক লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হন না, এজন্যই আমি একার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।"

পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, ত্রৈলোক্য বাবুর লিখিত শব্দগুলি ত্রৈলোক্য বাবুর প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি না? আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লেখকের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিবার জন্য বাঙ্গালার কোনও মহারথী লেখক সাহসী হইলেন না (!!!) সুতরাং ত্রৈলোক্য বাবুর ন্যায় "হাম্‌বড়া" লেখক কিরূপে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারেন। ভারত যুদ্ধে সূতপুত্র কর্ণ যেরূপ "হাম্‌বড়া" যোদ্ধা ছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে ত্রৈলোক্য বাবু সেইরূপ "হাম্‌বড়া" লেখক হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

যে ব্যক্তি যে বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অনবগত, তাহাকে সেই বিষয়ের বর্ণনা করিতে হইলে অনেক প্রকার "আগড়ম বাগড়ম" বকিতে হইয়া থাকে। বোধ হয় ত্রৈলোক্য বাবু "ঢাকার পুরাতন কাহিনী" অবগত নহেন বলিয়াই আদিশূর, পাল ও সেনরাজগণকে লইয়া টনাটানি আরম্ভ করিয়াছেন। ঢাকার পুরাতত্ত্বমূলক অনেক বৃত্তান্ত আমরা অবগত আছি। ত্রৈলোক্য বাবুর ন্যায় "গুরুমারা ছাত্রকে" শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপাততঃ আমরা সেই সকল বৃত্তান্ত উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করি না। তবে পাঠকদিগকে শ্রবণ করাইবার জন্য ফরাসী ভ্রমণকারী টেবার্ণিয়ায়ের কথা উল্লেখ করিব।

সাহজেহান পাতসাহের শাসনকালের অন্তভাগে দুইজন ফরাসী ভ্রমণকারী ভারতে আগমন করেন। একজনের নাম ফ্রান্‌সিস্ বর্ণিয়ার, তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম জন্‌ব্যাপ্টিস্‌টা টেবার্ণিয়ার, ইনি ফরাসীদেশের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যারণ, বণিক্‌বেশে ভারতে উপনীত হন। ইঁহারা উভয়েই দীর্ঘকাল ভারতে অবস্থানপূর্ব্বক সাহজেহানের দুর্দশা ও আওরংজেবের অভ্যুদয় দর্শন করিয়াছিলেন। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি টেবার্ণিয়ার ঢাকায় উপনীত হন। তিনি ঢাকানগরের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে মৎপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। * এস্থলে কয়েকটি পংক্তি মাত্র গ্রহণ করা হইল। টেবার্ণিয়ার বলেন;—"এই নগর খড়ের ঘরে পরিপূর্ণ; ইষ্টকের গৃহ প্রায় দেখা যায় না। শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁর বাসভবন কাষ্ঠনির্ম্মিত। ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকগণ দুইখানা পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ওলন্দাজদিগের গৃহটি সুন্দর। পর্ত্তুগীজ

* বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথমখণ্ড ১৯১, ১৯২, ১৯৩ পৃষ্ঠা। এস্থলে ত্রৈলোক্য বাবু অবশ্যই বলিবেন, মূলগ্রন্থের কথা না বলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের উপর বরাত দেওয়া হইল কেন। তদুত্তরে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, আমাদের মূলগ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে গুরুমারা ছাত্রদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া আমরা উচিত বোধ করি না।

পাদ্রি অষ্টিন ফেরারের গির্জাটিও ইষ্টক নির্ম্মিত।"

২২৫ বৎসর পূর্ব্বে টেবার্ণিয়ার তিন-ক্রোশ দীর্ঘ যে ঢাকানগরে তিনটি মাত্র পাকাবাড়ী দর্শন করিয়াছিলেন, সেই ঢাকানগরের "পুরাতন কাহিনী" বলিতে যাইয়া এত আগড়ম বাগড়ম বকিবার যে কি প্রয়োজন, তাহা ত্রৈলোক্য বাবুই বুঝিতে পারেন, ইহা আমাদের বুদ্ধির আয়ত্ত নহে। পূর্ব্ববাঙ্গালার প্রাচীন কাহিনা লিখিতে হইলে যে একটি বিষয় বিশেষভাবে লেখা যাইতে পারে, তাহার বিন্দুবিসর্গও ত্রৈলোক্য বাবুর প্রবন্ধে দেখিতে পাইলাম না। আমাদের বিশ্বাস, ত্রৈলোক্য বাবু সেই বিশেষ বিষয়টী অবগত নহেন। তাঁহার আগড়ম বাগড়মে আমরা কোন নূতনত্ব প্রাপ্ত হইতেছি না, সকলই আমাদের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ মাত্র। করুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। গায় পড়িয়া আমাদের সহিত কলহ করিতে আসিয়াছেন বলিয়াই অদ্য আমরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান করিতে উদ্যত হইয়াছি।

ত্রৈলোক্য বাবু যদি আদিশূর, পাল ও সেনরাজগণ সম্বন্ধে আমাদের প্রচারিত মতসমূহ খণ্ডন করিয়া একটি নূতন মত সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতাম। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া পদে পদে আমাদের পদানুসরণ করিয়াও আমাদের প্রতি বিদ্বেষ "গরল উদ্গীরণ" করিতেছেন। তীব্রভাবেই হউক, আর মৃদুভাবেই হউক, প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করাই জগতের নীতি। কিন্তু ত্রৈলোক্য বাবুর নীতি শিক্ষা ইহার বিপরীত, তিনি যাঁহার মতানুসরণ করেন, তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ "গরল উদ্গীরণ" করিয়া থাকেন।

আদিশূর, পাল ও সেনরাজগণ সম্বন্ধে পণ্ডিত-প্রবর ডাক্তার ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর যে মত প্রচার করিয়াছেন, রাজকৃষ্ণ বাবু প্রভৃতি বঙ্গের অন্যান্য ইতিহাস-লেখকগণ স্ব স্ব গ্রন্থে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, কেবল আমরাই "যথাবুদ্ধি (এই সকল মতের ভ্রমপূর্ণ অংশগুলি) সংশোধন পূর্ব্বক" নূতন ভাবে আদিশূর, পাল ও সেনরাজাদিগের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি, ইহা ত্রৈলোক্য বাবু আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীকার করত মধ্যে মধ্যে শর্করা-মিশ্রিত ছুরিকা আমাদের হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়াছেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলেন, আদিশূর বীরসেনের নামান্তর মাত্র। তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের অধিপতি ছিলেন। তাহার পুত্র সামন্ত সেন। তৎপুত্র হেমন্ত সেন। হেমন্তের পুত্র বিজয় সেন, গৌড় জয় করিয়া সমগ্র বাঙ্গালার রাজদণ্ড ধারণ করেন। তৎপুত্র লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয় মাধব ও কেশব। তৎপুত্র অশোক সেন। লক্ষ্মণের পৌত্র বলিয়া তাহার নাম লাক্ষ্মণেয়।

আমরা লিখিয়াছি, আদিশূর ও বীরসেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। আদিশূর বঙ্গের রাজা। বীরসেন "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র," তাঁহার সহিত বাঙ্গালার কোন সম্পর্ক নাই। * সামন্ত সেন বীরসেনের পুত্র নহেন,

* রাজসাহীর প্রস্তর লিপির চতুর্থ শ্লোকটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল যথা—
বংশে তস্যামরস্ত্রীবিতত রত কলাসাক্ষিণোদাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্রৈ বীরসেন প্রভৃতিভি রভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।

তাঁহার উত্তর পুরুষ মাত্র। হেমন্তের পুত্র বিজয় বাঙ্গালায় বিজয়ী পতাকা সংরোপিত করেন। বিজয়ের প্রপৌত্র কেশব সেনের পর হরিব্রহ্মদেব বঙ্গের রাজদণ্ড ধারণ করেন। তদনন্তর অশোক চন্দ্র দেব। তাহার পর (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণ সেন দেব। ইহার নাম লাক্ষ্মণেয় নহে। (সেনরাজগণ, ৩৯ পৃষ্ঠা) দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন দেব নবদ্বীপ নগরী শত্রু পদে সমর্পণ করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের রাজধানী সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। (জগন্নাথ তীর্থে গমন করেন নাই।) দ্বিতীয় লক্ষ্মণের পর তাঁহার উত্তর পুরুষ সুষেনদেব, দনুজরায়, দ্বিতীয় বল্লাল সেন প্রভৃতি নরপতিগণ প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্ব বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছেন *।

পাঠকগণ ত্রৈলোক্য বাবুর প্রবন্ধ খুলিয়া দেখিবেন, মূল বিষয়ে তিনি ডাক্তার মিত্রের মত অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের মতানুসরণ করিয়াছেন। এমতস্থলে আমাদের কুৎসা কীর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষে কতদূর গর্হিত কার্য্য হইয়াছে, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

১২৮৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের ভারতী পত্রিকায় আমরা "লক্ষ্মণসেন-প্রদত্ত সুন্দরবনের তাম্রশাসন" প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার সূচনা স্বরূপ লিখিত হইয়াছিল যে,—

"কতিপয় বৎসর অতীত হইল সুন্দরবনের কোন এক লাটে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মার্সমান সাহেব স্বপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। অল্পকাল অতীত হইল, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ শাসনপত্রের একখণ্ড ভ্রমসঙ্কুল প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভ্রম প্রমাদের দায় অন্যের শিরে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং পরিত্রাণের চেষ্টা পাইয়াছেন। * * * ন্যায়রত্ন মহাশয় যৎদৃষ্টম্ তৎপ্রকাশিতম্ মাত্র করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন দানপত্রের প্রতিলিপি আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিয়াছেন; তখন তাহা সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করাই উচিত ছিল। বোধ হয় একটুকু পরিশ্রম করিলেই তিনি তাহা সংশোধন করিতে পারিতেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের অন্তভাগে দিনাজপুরের অন্তর্গত তর্পণদীঘির (তপনদীঘির) সন্নিকটে ক্ষুদ্র পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব' প্রদত্ত আর একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই তাম্র শাসনের প্রতিলিপি (Photozincographe) দৃষ্টে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত সুন্দরবনে প্রাপ্ত তাম্র-

---

বচ্চারিত্রানুচিন্তা পরিচয় শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যোনবিশ্বশ্রবণ পরিসর প্রীণনায় প্রণীতাঃ॥

এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া আমরা বলিয়াছি যে, বীরসেনকে পরাশর পুত্র ব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তীও বলা যাইতে পারে। গতবৎসর সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার কিলহরণ এই বীরসেনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, Vi rasena clearly is a mythical being. সেই বীর সেনকে যে ডাক্তার মিত্র মহাশয় কিরূপে বঙ্গেশ্বর আদিশূর নির্ণয় করিলেন, তাহা আমরা কোন মতেই স্থির করিতে পারি না। ডাক্তার মিত্র যেরূপ মহা পণ্ডিত ছিলেন, এই ভ্রমটিও সেইরূপ মহাভ্রম রাখিয়া গিয়াছেন।

* পাঠকগণ মৎপ্রণীত "সেনরাজগণ" পুস্তিকা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করেন, ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ। নব্যভারতের পাঠকদিগের জন্য ইহার মূল্য নিতান্ত হ্রাস করা হইল। (বিজ্ঞাপন দেখুন)

শাসনের প্রতিলিপি সংশোধন করিয়া অদ্য আমরা পাঠকদিগকে উপহার অর্পণ করিলাম।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর তর্পণদীঘির তাম্রফলকের বিবরণ ও মন্তব্য, প্রতিলিপির সহিত ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদিগের ন্যায় সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু অন্যান্য দুই চারি খানি প্রাচীন শাসন দর্শন করিয়া তিনি অনায়াসে যে সকল বাক্য সংশোধন করিতে পারিতেন, তাহাতেও হস্তক্ষেপ করেন নাই। 'চট্ট ভট্টের' স্থলে 'চড়ভচ্ছ'; 'পরমবৈষ্ণব' স্থলে 'পরমবীরসিংহ'; 'পরমভট্টারক, স্থলে 'পরমন্তদ্ভাবক" ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দ সমূহ পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া থাকি। আমরা বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছি, বঙ্গীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগে এইক্ষণে বিলক্ষণ 'গোঁজামিলন' চলিতেছে; কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে ও অনভিজ্ঞজন-প্রদর্শিত মার্গাবলম্বী দর্শন করিলে স্বভাবতঃ আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে।"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিরুদ্ধে আমরা ভাল মন্দ যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম, তাহা উদ্ধৃত করা হইল। এই সকল বাক্য লক্ষ্য করিয়া ত্রৈলোক্য বাবু আমাদের প্রতি যে সমুদয় ভদ্রোচিত সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তুলনায় সমালোচনা করিবার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"তর্পণদীঘির তাম্রশাসন দৃষ্টে চতুর্থ খণ্ড 'ভারতী পত্রিকায় কৈলাস বাবু যথাবুদ্ধি সংশোধন পূর্ব্বক সুন্দরবনের এই তাম্রশাসন প্রকাশিত করেন। নিজের বিদ্যা বুদ্ধির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের ন্যায় সম্মাননীয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতকে ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ শাসনলিপি প্রকাশের জন্য বিদ্রূপ করা এবং তাঁহার অপেক্ষা কৈলাস বাবু যে অধিক সংস্কৃত জানে, তাহা প্রদর্শন করিতে বিশেষ গর্ব্বের সহিত যত্ন করা কৈলাস বাবুর পক্ষে উচিত হয় নাই। * * * ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কৈলাস বাবুর লেখনী পদে পদে নিজের বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে এত ব্যস্ত হয় কেন, অনর্থক প্রতি পক্ষকে অন্যায়রূপে নিন্দনীয় ভাষায় আক্রমণ ও গালিবর্ষণ করে কেন, কথায় কথায় বাগাড়ম্বরের সহিত সময় সময় এত গরল উদগীরণ করে কেন, বিজ্ঞলোকের অযথা নিন্দাবাদে আপনাকে কলঙ্কিত করে কেন, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা।"

পাঠকগণ, এইক্ষণ তুলনা করিয়া দেখুন, সত্যসত্যই আমাদের লেখনী 'গরল উদগীরণ' করিতেছে, কিম্বা ত্রৈলোক্য বাবু হিংসার দংশনে অস্থির হইয়া যে কোনরূপে আমাদিগকে অপদস্থ করিয়া পাঠকদিগের নিকট বাহবা পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় পুরাতত্ত্ববিভাগে যাঁহারা প্রতারণা, ভণ্ডামি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইতিহাসের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া থাকেন, আমরা তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিনা বলিয়া সময় সময় সাময়িক পত্রিকা সমূহে তাঁহাদের বিরুদ্ধে তীব্র লেখনী ধারণ করিয়া থাকি। কিন্তু "সেনরাজগণ," "শ্রীদারুব্রহ্ম", কিম্বা "ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে" আমরা কোন্ পণ্ডিতের অযথা নিন্দাবাদ করিয়াছি, তাহা প্রদর্শন জন্য ত্রৈলোক্য বাবুকে প্রতিদ্বন্দীভাবে আহ্বান(challenge)করিতেছি।

সেন রাজগণের বিবরণ উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে, ত্রৈলোক্য বাবু কিরূপ পদে পদে আমাদের পদানুসরণ করিয়াছেন।

তিনি যে স্থানে স্থানে তদপেক্ষা ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারও দুই একটি প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক বোধ হইতেছে।

"সেনরাজগণ" পুস্তিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, "প্রায় তিন শত বৎসর গত হইল তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকার তারানাথ সেনরাজগণকে চন্দ্রবংশজ লিখিয়া গিয়াছেন। *

১২৯৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের নব্যভারতের ২৯৫ পৃষ্ঠায় ত্রৈলোক্য বাবু লিখিয়াছেন, "প্রায় ৩০০ বৎসর গত হইল তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থকার তারানাথ বাঙ্গালার সেনরাজগণকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া লিখিয়াছেন।"

ইহাতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, ত্রৈলোক্য বাবু আমাদের "তিনশত" শব্দের পরিবর্ত্তে ৩০০ লিখিয়াছেন। আমাদের "তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকারের" পরিবর্ত্তে তিনি তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন। "সেনরাজগন" শব্দের পূর্ব্বে "বাঙ্গালার" শব্দ অতিরিক্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। আমাদের "চন্দ্রবংশজ" শব্দের পরিবর্ত্তে "চন্দ্রবংশীয়" লিখিয়াছেন। পাঠকগণ, ইহাকে কি বলা যাইতে পারে—চুরি না বাটপাড়ি?

পালরাজগণের বিবরণ উল্লেখ কালে ত্রৈলোক্য বাবুর এবম্প্রকার ব্যবহার আরও উল্লেখ করা যাইবে।

প্রায় ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ আমরা এক খণ্ড বাঙ্গালার ইতিহাস সংগ্রহের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছি। ত্রৈলোক্য বাবু ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। পাল ও সেনরাজগণের ইতিবৃত্ত-মূলক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা সমূহ সেই ইতিহাসের অধ্যায় বিশেষের সংক্ষিপ্ত সারাংশ মাত্র। ত্রৈলোক্য বাবু আমাদের বিরুদ্ধে যতই লেখনী সঞ্চালন করুন্ না কেন, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রকাশের পূর্ব্বে আমরা তাহার অসম্পূর্ণতা দূর করিতে পারিনা। অন্যের কথা কি বলিব, ত্রৈলোক্য বাবু আমাদের বন্ধু হইয়া যখন নিতান্ত ঘৃণিত পন্থাবলম্বনপূর্ব্বক আমাদের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আর আমরা কোন্ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারি? ত্রৈলোক্য বাবু সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার জন্য যত্নবান হইয়া তাহার প্রথমখণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য প্রায় সমাধা হইয়াছে। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করিতেছি। এমতস্থলে ত্রৈলোক্য বাবু আবার "বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক বিবরণ" প্রকাশ করিবেন বলিয়া নব্যভারতের কভারে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা পাঠকগণ দেখিবেন ত্রৈলোক্য বাবু হিংসার দংশনে অস্থির হইয়া কিরূপ ছুটাছুটী করিতেছেন। তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্পূর্ণ না করিয়া প্রকারান্তরে আমার আরব্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কি সঙ্গত কার্য্য হইতেছে? ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

* 'Taranath's Vassilieps work on Buddhism. Translated by Miss. Lyall.

জাতীয় একতা। (৫)

যে শাস্ত্রের একাংশ ও ভারতবর্ষীয় সংগ্রহের নাম চতুর্ব্বেদ, সেই শাস্ত্রের অপরাংশ ও ইলাবৃতবর্ষীয় (১) সংগ্রহ হইতে তওরৎ, জব্বুর, ইঞ্জিল ও কোর্‌কান বা কোরাণ উৎপন্ন হইয়াছে। কোরাণ শব্দ 'করয়' ধাতু হইতে উৎপন্ন, অর্থ সংগ্রহ করা। সুতরাং বেদ যেরূপ সংগৃহীত, কোরাণও তাহাই।

অনেকের বিশ্বাস এই হিব্রু, সিরিয়াক ও আরবিক ভাষা যখন আর্য্য ভাষা সমূহ হইতে বিভিন্ন, তখন ইহুদী ও আরববাসীগণের সহিত আর্য্যগণের জাতীয় বিভিন্নতাও অধিক। কিন্তু আমাদের ঐ বিষয়ে একটুক সন্দেহ জন্মিতেছে। আর্য্য জাতির শাখাগুলি ইংলণ্ড ও আইসলণ্ড পর্য্যন্ত যাইতে পারিল, আর আরব ও সিরিয়া দেশে যাইতে পারিল না? পরন্তু টেলর সাহেবের মতে মিসরভূমে সিন্ধু তীরবাসী আর্য্যগণের উপনিবেশ ছিল: স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্ যে আফ্‌গানভূমে ইহুদী উপনিবেশের কথা বলেন, তাহাই একটুক তলিয়া বুঝিলে হিন্দুর সিরিয়া ভূমির সহিত বিলক্ষণ সংশ্রব ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। ফলে ইহুদী শব্দ হিন্দু এবং Jew শব্দ দ্যু বা দেব শব্দ হইতে উৎপন্ন। আরব ও পারস্যের প্রান্তে অদ্যাপি হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায়। অনেক আরবীয় ও ইহুদীয় দেবদেবীগণের নামের সহিত হিন্দু দেবদেবীগণের নামের ঐক্য হয়। এমন অবস্থায় ইলাবৃতবর্ষীয় অধিবাসিগণের সহিত হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষগণের কোন সংশ্রব ছিলনা, একথা কেমন করিয়া স্বীকার করিব?

আমরা দেখিতেছি, কোরাণোক্ত ১,২৪০০০ পেগম্বর, যাহাদিগকে ইংরেজেরা Prophets ও আমরা পুরোহিত বলি, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ৬ জনের নাম হিন্দুনামের সহিত ঐক্য হয়। (১) যথা:—

১। আদম—আদি (মহাদেব) (২)
২। নূ———মনু
৩। এব্রাহিম্—ব্রহ্মা
৪। মোশেশ—মহেশ (৩)
৫। ঈশা—ঈশ
৬। মহম্মদ—মহৎ-মদ (মহামদ)

---

(১) "ইলাবৃতবর্ষ সর্ব্ব বর্ষের মধ্যস্থলে বিদ্যমান রহিয়াছে।" মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, বঙ্গবাসী সংস্করণ। ঐ অধ্যায় পাঠে ইলাবৃতবর্ষ বর্ত্তমান তুরস্কের অধিকাংশও আরবদেশকে বলা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। উহা বাস্তবিক প্রথম শশস্থান যাহাকে এক্ষণে পুরাতন মহাদ্বীপ ও পূর্ব্বে জম্বুদ্বীপ বলিত, তাহার "মধ্যস্থলে" অবস্থিত। অসুরিয়া (Assyria) দেশে ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত ছিল।

(1) And six of them (313 apostles) brought new laws or dispensation which successively abrogated the preceding: these were Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus and Mahammed. *Sale's Preliminary discourse on the Korun, chapter IV, P 59.*

(২) মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব, ৭ম অধ্যায় ১৮৫৩ পৃঃ, বঙ্গবাসী সংস্করণ।

(৩) বেদোক্ত "বৃসয়" শব্দ যে প্রকারে গ্রীক ভাষায় "Brises" হইয়া হোমারের বিখ্যাত ইলিয়াদ গ্রন্থে দেখা গিয়াছে (রমেশ বাবুর ঋক্‌বেদ সংহিতা ১ম মণ্ডলের ৯৩ সুক্তের ৪ ঋকের টীকা দেখ) সেই প্রকার মহেশ শব্দ মশহ বা Moses হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন, ইহুদী ধর্ম্ম গ্রন্থোক্ত Seth (শ্বেত) এবং Lot (লঃ অথবা লহ) ইত্যাদি প্রচারকগণের সহিত হিন্দুশাস্ত্রোক্ত শিব ও ইন্দ্রের সংশ্রব লক্ষিত হইতেছে। (১) এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিব্লিক ও কোরাণিক শাস্ত্রোক্ত প্রাচরক বা দেবদেবীগণের সহিত হিন্দু ধর্ম্মোক্ত বিশেষতঃ শৈব শাখার দেবদেবীগণের অনেক সামঞ্জস্যতা উপলব্ধি হইতেছে।

কিন্তু এদেশে বৈদিক, কোরাণিক ও বিব্লিক হিন্দুগণ এমনই পরস্পর ধর্ম্ম-বিদ্বেষী যে, উপরোক্ত বিশ্বাসের অনুকূলে লোক পাওয়া সন্দেহজনক। আধুনিক বৈদিক হিন্দুগণ আপনাদের প্রাচীনতম শাস্ত্রের মস্তকোপরি পদাঘাত করিয়া ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের চক্রান্তে ও স্পর্শ-দোষ প্রথার ষড়যন্ত্রে সর্ব্ব সাধারণকে এমনই বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে, হিন্দু বৈদিক ধর্ম্মের সহিত কোরাণিক ও বিব্লিক ধর্ম্মের এবম্বিধ সংশ্রবের কথা শুনিলে তাঁহারা কর্ণে হস্ত দিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সরলহৃদয় কোরাণিকগণ হিন্দুর দেশ হইতে ধর্ম্ম গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, একথা স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর আদম (আদিকে) ১০ খানি গ্রন্থ প্রদান করেন। এই আদম সপ্ততাল স্বর্গের শেষতালে অবস্থিত ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের কোপে সরন্দীপে (লঙ্কায়) পতিত হন এবং তাহার স্ত্রী ইব (১) (শক্তি) যদ্দায় পতিত হন। ২০০ বৎসর পরে আদম মক্কায় ইবের সহিত সম্মিলিত হন। (২) আদমের প্রাপ্ত ১০ পুস্তক হইতে সেমিতিক ভাষা সমূহে ক্রমশঃ ধর্ম্ম বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রুতি পরম্পরায় যে শাস্ত্র ঈশ্বর মনুষ্যকে দিয়াছিলেন, তাহারই ১০ মণ্ডলে সংগ্রহের নাম ঋক্‌বেদ সংহিতা। ইতিপূর্ব্বে বা সমকালে লঙ্কাদ্বীপে শৈব মতানুসারে শ্রুতির যে সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহাই কি আদমের প্রাপ্ত ১০ পুস্তক? (৩) তাহা হইলে, আগম শাস্ত্র ও আদম বা আদিদেব প্রাপ্ত ১০ পুস্তক একই কথা। সুতরাং

(১) শ্বেত শব্দে শিব বুঝায় এবং ল শব্দের আভিধানিক অর্থ ইন্দ্র। In this great number of prophets they (Arabians) not only reckon diver's patriarchs and persons named in the scripture but not recorded to have been prophets (wherein the Jewish and Christain writers have sometimes led the way) as Adam, Seth, Lot, Ismail, Newe and Joshua &c. *Sale's Discourse on the Korun, chapter IV, P. 59.*

(১) ইব্‌=ই ধাতুর পদ; ইধাতু গমনে বা জ্ঞানে; দুই অর্থেই ইব্‌ শিবের সহচরী হইতে পারেন। আদ্যাশক্তির সহিতও শিবের সংশ্রব এবং আদিজ্ঞানের সহিতও শিবের সংশ্রব আছে। "জ্ঞান প্রদায়" শব্দ শিবের ধ্যানের মধ্যে আছে। যাঁহারা নিষিদ্ধ বৃক্ষকে (forbidden tree) জ্ঞানবৃক্ষ বলেন (tree of knowledge), তাঁহারা আদম ও ইবের সহিত আদি ও আদ্যাশক্তির সংশ্রব সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

(2) The Mahammedans say, that when they were cast down from paradise, Adam fell on the isle of Ceylon or Serendib and Eve near Juddah (the port of Mecca) in Arabia; and that after a separation of 200 years in his repentance conducted by angel Gabriel to a mountain near Mecca, where he found and knew his wife, the mountain being thence named Ararat; and that he afterwards returned with her to Ceylon where they continued to propagate their species. শিবের সতী বিরহ এবং সতীর পার্ব্বতীরূপে পুনঃজন্ম এই আখ্যানের রূপান্তর মাত্র।

(3) "The number of books revealed into Adam they say was ten." Notes on Alkoran chapter II, page 5, by Sale.

কোরাণের আকর স্থল যে উক্ত আগম শাস্ত্র (১), ইহা বলা অসঙ্গত নহে। এস্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। এতদ্দেশীয় বৈদিক হিন্দুগণ ও উপরোক্ত আদিদেব (আদমের) ঈশ্বর হইতে ১০ পুস্তক প্রাপ্তির কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন। ভারতে, দাক্ষিণাত্যে ও লঙ্কাদ্বীপে যে শৈবধর্ম্মের অত্যন্ত প্রভাব হইয়াছিল, তাঁহা যাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্র একটুক হিসাবের সহিত পাঠ করেন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। প্রাচীন কালে এই শৈবগণের মধ্যে দশানন রাবণ অতি ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। রাবণের দশ মস্তকের যদি কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থে দেবাদিদেব মহাদেব প্রাপ্ত দশ পুস্তককেই লক্ষ্য করিতেছে। ভক্তিমান রাবণ দেবাদিদেব মহাদেবের দশ পুস্তক কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ করাতে তাঁহাকে সকলে দশমুখ রাবণ বলিত এবং তিনিও সর্ব্বত্র শৈবধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তিব্বতে রাবণহ্রদ তাঁহার প্রচার ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে এবং বঙ্গে তারকেশ্বর মন্দিরে যে অদ্যাপি "রাবণেশ্বরায় হরায়" মন্ত্রে প্রণিপাত করিতে হয়, উহাও রাবণের দিগন্তব্যাপক প্রচার কার্য্যের পরিচয় মন্ত্র। রামের লঙ্কা বিজয়ও প্রচার কার্য্য (mission work) ভিন্ন আর কিছুই নহে; যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধও ধর্ম্ম প্রতিদ্বন্দীতা ভিন্ন আর কিছুই। যদি তাহা না হইবে, তবে মহাভারতোক্ত ও রামায়ণোক্ত দুটী বৃহৎ পার্থিব সংগ্রামের পূর্ব্ব পক্ষগণকে সর্ব্ব প্রথমে কৌপীন ও বল্কলধারী অবস্থার বাহির হইতে দেখি কেন? কুরুক্ষেত্রের ও লঙ্কার যুদ্ধ কি নাট্যশালার ব্যাপার? উন্মাদ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি বল্কলধারী রাম ও বনবাসী পঞ্চ পাণ্ডবের কার্য্যে পার্থিব ভূ-সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্তির জন্য সংগ্রাম, একথা অনুভব করিতে পারে? ফলে ঐ দুটী যুদ্ধ শৈব বৈষ্ণব ধর্ম্ম দ্বয়ের দ্বেষাদ্বেষী ও পরিশেষে মেশামিশি, একথার সাক্ষ্য দিতেছে। পরম শৈব জনকের (১) শিষ্য রাম ও সীতা কর্ণাল অলকট ও মেডাম ব্লাভেটস্কীর ন্যায় দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া ধর্ম্ম সম্মিলন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইহাই ভিখারীর কার্য্য বটে। অবশেষে শৈব বৈষ্ণব মত দ্বয়কে শক্তিমূলে সংমিশ্রিত করিয়া শৈবধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস করেন, অথবা উভয়ধর্ম্মের সংমিশ্রণে পরম একতা সংস্থাপন করেন। ঠিক সেই প্রকারে পরম শৈব যুধিঠির শৈব কৃষ্ণের মতানুসারে প্রভাসে ধর্ম্ম সম্মিলন সম্পন্ন করেন। বর্ত্তমান সময়েও সেই দাক্ষিণাত্যে কর্ণাল অলকট ও মেডাম ব্লাভেটস্কী ভিখারী ও ভিখারিণী বেশে সেই সম্মিলন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বিধাতার কি ইচ্ছা! পঞ্চবটী, প্রভাস (২) ও অঘোর সকলই সেই দাক্ষিণাত্যে এবং সম্ভবতঃ অতি নিকটবর্ত্তী স্থান।

এজন্য দশানন ও দাশরথীর সংগ্রাম ১০ অধ্যায় বিশিষ্ট ও মহাদেব-প্রচারিত

(১) আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে॥
শব্দসার অভিধান।

(১) হরধনু ভঙ্গ করিলে সীতাকে তাহার নিকট বিবাহ দিব, এই প্রতিজ্ঞায় তাঁহাকে শৈব ভিন্ন আর কি মনে করিব?

(২) মহাভারতে পাণ্ডব দিগ্বিজয় পাঠ করিলে প্রভাসকে দাক্ষিণাত্যে অনুভব হয়। (বনপর্ব্ব, ১১৮ অধ্যায় দেখ।)

আগম শাস্ত্র ও ১০ মণ্ডলে সংগৃহীত ঋক-বেদ শাস্ত্র এতদুভয়ের সংগ্রাম মাত্র। কিন্তু যেখানেই ধর্ম্মগ্রন্থের সংগ্রাম হইয়াছে, সেই খানেই ধর্ম্মগ্রন্থের সংমিশ্রণ হইয়া তদধীন লোকসমূহকে একীভূত করিয়াছে। হিন্দুর শাস্ত্র ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ঈশকৃষ্ণের কার্য্যও এই সংমিশ্রণ এবং মহম্মদের কার্য্যেও এরূপ সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। "আল্লা" ও "বিশ্‌মল্লা" শব্দের ব্যাখ্যাচ্ছলে তাহা যথাসাধ্য প্রমাণিত করিতে যত্ন করিব।

হর (১) পর্ব্বতে সিদ্ধ মহাযোগী মহম্মদের ঈশ্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে আরবে শৈবধর্ম্ম (Sabian Religion) (২) প্রচলিত ছিল। কাহার মতে শেতের পৌত্র শবি (স্বর পরিবর্ত্তনে শিব), কাহার মতে শব ("host of Heaven") হইতে উক্ত শৈবধর্ম্ম (Sabian religion) উৎপন্ন হইয়াছে। যদি কোন হিন্দু একথা বলেন, Sabian শব্দকে শৈব মনে করিয়া এত বড় একটা কথা বলা সঙ্গত নহে; তাঁহাকে আমি একটুক ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলি। ক্রমে শৈব মতের সহিত Sabian ধর্ম্মের অনেক সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন। কেবল মতের সামঞ্জস্য, এমত নহে, শব্দের উচ্চারণ-গত সামঞ্জস্যও অনেক আছে। দৃষ্টান্তচ্ছলে ২টী শব্দের উল্লেখ করিতেছি, ১ম—মক্কা, ২য়—হবল।

১ম—মক্কার বিব্লিক নাম Mesha (মেশহ) মহেশ শব্দ স্বর পরিবর্ত্তনে ঐ আকার ধারণ করিয়াছে।

২য়—ঈশ্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে মক্কায় বা মাহেশ দেবালয়ে যে সকল দেবমূর্ত্তি ছিল, তন্মধ্যে হবল সর্ব্বপ্রধান। এই হবল শব্দ "হর" শব্দের রূপান্তর মাত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "হর" শব্দ ও আরবিক "Hawyra" বা হবর বা হবল শব্দ এক ধাতু হইতে উৎপন্ন। সুতরাং হবল দেব যে হর, ইহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এস্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। ইলাবৃতবর্ষে বিসর্গ স্থানে অনেক স্থলে হ্, ল্ বা ইল্ হইতে দেখা যায় এবং সময় সময় অনুস্বার স্থান পরিবর্ত্তন করে। যথা লঃ শব্দ লহ, জাবঃ শব্দ জীবরাইল, ঈশ্বর শব্দ· ঈশ্মল বা ঈশ্‌মাইল হইয়াছে। হরস্

---

(1) "Having therefore retired with his family, as he had done several times before to the above mentioned came in the mount *Hara* (হর) he there opened the secret of his mission to his wife khadijah, and acquainted her that the angel Gabriel appeared to him and told him he was appointed the apostle of God." *Sale's Preliminary discourse on the Korun sec* II, p. 33

কোরাণের ৩য় সুরাতে Hawariyan (apostle) শব্দ আছে। "which word they (Arabians) derive from *Hara to be white* and suppose the apostles were so called either from the *candour* or sincerity of their minds. But the true etymology seems to be from the Etheopic verb *Hawyra* to go; whence Hawarya signifies *one that is sent*, a messenger or apostle." শিবের এক নাম হর। তাঁহার শরীরের ধবলত্ব, হৃদয়ের অকপটতা অথবা হৃ ধাতুর বিচরণ ("go") অর্থ যে ভাবেই বল, আরবিক ও ইথিয়পিক ভাষায় ঈশ্বর স্থাপিত ব্যক্তিকে হর শব্দের প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন দেখা যাইতেছে। *Sale's Alkorun notes* p. 33.

(2) The religion of the Arabs before Mahammed * * * was chiefly gross idolatory, the Sabian religion having almost overrun the whole nation though there were also great numbers of Christians, Jews, Magians among them. *Sale's Preliminary discourse on the Korun sec* I, p. 11.

শব্দ মহরম এবং হিততন্ত্র শব্দ হিত্তন্ হইয়াছে।

যখন মক্কার নাম মহেশ এবং তদন্তর্গত প্রধান দেব হবলের নাম হর দেখা যাইতেছে, এবং পূর্ব্বে যখন প্রদর্শিত হইত কাবা বা কেবলা বা কৈবল্য ধাম মাত্র, তখন মক্কা মন্দির যে শিবালয় ছিল, ঐকথা সন্দেহ করা যায় না। বৈদিক হিন্দুগণের পুরুষ পরম্পরাগত লৌকিক বিশ্বাস,ও ইহা ভিন্ন অন্য নহে। সুতরাং শৈব ধর্ম্মের সঙ্গে Sabian religion এর যে কি প্রকার গাঢ় সংশ্রব ছিল, পাঠকেরা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

এই ইলাবৃতবর্ষীয় শৈবগণ (Sabians) এক ঈশ্বরের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবাদিদেব মহেশ্বর সর্ব্বদেবে অনুপ্রাণিত, ইহাই তাহাদের মূল বিশ্বাস। (১) ঈশ্লাম ধর্ম্মের হিততন্ত্র ("Hettaton") যে এমন অমূল্য তত্ত্ব,তাহাও এই শৈব বিশ্বাস হইতে অবিকল গৃহীত হইয়াছে। (২) এই শৈবগণ জগৎ পতিকে "আল্লা তালা" বা সর্ব্ব উচ্চ দেব বলিতেন। (১) এই "আল্লা তালা"ই ঈশ্লাম ধর্ম্মের "আল্লা তালা," ইহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশকৃষ্ণের "Messiah" মহেশ শব্দ মাত্র এবং "আল্লা তালা" শব্দও মহেশ-কেই লক্ষ্য করিতেছে; সুতরাং ঈশকৃষ্ণ, ও মহম্মদের হৃদয় শিব-বিচ্যুত ছিল না।

কোরাণের ৫৩ সুরাতে মহাযোগী মহম্মদ আল্লাত্, আল্ অজ্জা এবং মনাহ্ নাম্নী দেবীত্রয়ের উল্লেখ করিতেছেন। (২) সেল সাহেব এই দেবীত্রয়ের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত এবং কোন্ দেবী কাহার কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, একথা যত বর্ণিত হইয়াছে, কোন্ দেবীর অর্চ্চনার কি উদ্দেশ্য, তাহা তত বর্ণিত হয় নাই। তথাচ তাঁহার বর্ণনা পাঠে ইহা অনুভব করা যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে আমরা শৈবী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী শক্তি বলি, আল্লাত্, আল্ অজ্জা ও মনাহ্ দেবী তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। আমরা দেখিতেছি, আরববাসীরা ভারতবর্ষীয় গুজ্জর দেশের সোমনাথকে লট্ বা অল্লট

(1) They (Sabians) do not only believe one God but produce many strong arguments for His unity though they also pay an adoration to the Stars or the angels and intelligences which they suppose to reside in them and govern the world under the Supreme Diety. *Sale's preliminary discourse Sec I, p.* 11.

(২) ঈশলাম ধর্ম্মিগণের হিততন্ত্র("Hettaton") এই "La ilaha illa 'llahi"। সেল সাহেব "There is no God but God" এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই, ইহাই উহার বাঙ্গলা অর্থ। যাহারা জানেন যে, বৈদিক হিন্দুগণও দেব "দেবীর পূজারম্ভ সময়ে ইহা গচ্ছ ইহতিষ্ঠ" ইত্যাদি বাক্যে দেবাদিদেব মহেশ্বরকে আহ্বান করেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ঈশলাম ধর্ম্মিগণের "লা ইলাহ ইল্লা "লাহো" তত্ত্বকে তাঁহারা প্রত্যেক দৈবকার্য্যের সময় কাজে পরিণত করিয়া থাকেন। কোরাণিক হিন্দুগণের উক্ত তত্ত্ব বাক্য মাত্র,বৈদিক হিন্দুগণের উহা বাক্য ও কার্য্য উভয়।

(1) For the Arabs (Sabians) acknowledge one supreme God,the Creator and Lord of the Universe whose they called Allah Ta ala, the most high God. Sale's Preliminary discourse in the Korun Sec I p. 12.

(2) What think ye of Adat al uzza and manah that other third Goddess কোরাণানুবাদ ৫৩ সুরা।

বলিতেন। (১) এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আল্লাত হইলে, আল্লাত্‌কে শৈবী শক্তি বলিবার কারণ আছে। মনাহ্‌ দেবীর যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাকে শিলাময়ী বোধ হইতেছে, সুতরাং তাহা বৈষ্ণবী শক্তির তুল্য। (২) অল্‌ অ'জ্জা al uzza অজ্জা ধাতু হইতে উৎপন্ন। (৩) অর্থ সর্ব্ব শক্তিমান ("the most mighty') এবং তাহার মন্দির হইতে দৈববাণী হইত। অতএব এই অল্‌ অজ্জাকে অজা বা ব্রাহ্মী শক্তি বলিয়া মনে করিলে দোষ হয় না। এই প্রকারে আবরীয় পূর্ব্বতন শৈবধর্ম্মে তিনে এক, একে তিন, ত্রিশক্তির বর্ণনা অন্তর্নিহিত ভাবে আছে। এই ত্রিভাব বা "ত্রিমূর্ত্তি" (Trinity) মহাম্মদ-প্রচারিত ঈশলাম ধর্ম্মেও আছে। কিন্তু সে কথা সম্প্রতি থাক। আমরা আল্লা শব্দের অন্যান্য যে অর্থ হইতে পারে, তাহাই এক্ষণ বলিব।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

করুণা শঙ্কর।

(জন্ম ২৯ শে পৌষ, মৃত্যু ৪ঠা পৌষ, ১২৯৮ সাল)

আঁধার ঘরের উজ্জ্বল মাণিক
কাঙ্গাল ঘরের সোণা,
পিতার মাতার বুকভরা ধন
বিধির করুণা-কণা।
জীবনের বৃন্তে ফুটন্ত কুসুম,
জীবন্ত স্নেহের ধার,
মাতার স্নেহের গুণেতে গ্রথিত
চারু মুকুতার হার।
বিধির করুণা যেন অবতার
তোমার মোহন ছবি।
বিধির বিধানে আজি অস্তমিত
হায় সে নবীন রবি।

জননীর কোল করি অন্ধকার
হরিয়ে নয়ন মণি,
আঁধার করিয়া পিতার হৃদয়
হীরক ত্যজিল খনি।
কি বিধির বিড়ম্বনা,
চাই নাই ধন তথাপি পাইনু
বিধির করুণা কণা।
"করুণা শঙ্কর" সাধের সে নাম
আজি কি গেলরে ভাসি,
আর কি হৃদয় জুড়াবেনা হায়
হৃদয়ের ধন আসি!

(1) "There was also an idol at Sumenot in the Indies called Lat or al Lat whose statue was 50 fathoms nigh, of a single stone and placed in the middle of a temple supported by 56 pillars of massy gold : this idol mahomed Ebu Sebecteghin who conqured that part of India broke to pieces with his own hand." Sale's Preliminary discourse, Sec. I, p 15.

(2) Several of their idols as Manah in particular were no more than rude stones, the worship of which the posterity of Ismail first introduced. Sale's Preliminary discourse Sec 1, Page 14.

(3) The name of this Diety (al uzza) is derived from the root azza and signifies *the most mighty. Sale's discourse on the Korun Sec I, page* 14.

আর কি মায়ের স্তনের অমিয়া
পিবেনা সে যাদু ধন,
আর কি মধুর হাসিয়ে কান্দিয়ে
শীতল করিবে মন!
আর কি সেঘোর মেঘের মতন
সুন্দর কেশের রাশি,
স্থির সৌদামিনী মাঝে নীলোৎপল
নয়ন ঢাকিবে আসি।
আর কি মধুর সুধামুখ খানি
দুধেতে আলতা মাখা,
সে সুন্দর ছোট কচি হাত পায়ে
কুসুম কোরক গাঁথা।
পৃথিবীর রূপ পৃথিবীর ধন
মাটীতে হইল লয়।
মাটীতেই পুনঃ আমারও শরীর
মিশিবে, তবে কি ভয়?
চাইনা মাটীর দেহ,
অসার, অনিত্য, আত্মার পিঞ্জর,
তাহাতে কি আর স্নেহ।
কোথা সে কোমল ফুটন্ত কোরক
ক্রমশঃ বিকাশমান,
অনিত্য দেহেতে নিত্যের বিহার
ক্রমশঃ ফুটন্ত জ্ঞান।
বিধির করুণা ভাবিয়া যাহার
হইল করুণা নাম,
কেমনে ভাবিব হায় সে করুণা
হয়েছে আমায় বাম।
যে করুণা কণা দিয়াছিলা বিধি
তাহা কি হরিয়া নিলা,
হায়রে কেমনে হেন নিদারুণ
ভাবিব বিধির খেলা।
নহেরে সম্ভব কথা।
বিধির করুণা তাহারই সনে
দেখহে খেলিছে তথা।
যথা রোগ নাই শোক তাপ নাই,
নাহিক মরণ জরা,
যাঁহার করুণা তাঁহারই কোলে
হাসিছে ত্যজি এ ধরা।
বিধাতার সনে করিছে বিহার
বিধাতার কোলে বসি,
তাহারই কোলে আমরা আবার
হেরিব সে মুখ শশী।
শান্ত ক্ষুদ্রদেহ পরিহার করি
করুণা অনন্ত হ'ল,
চারিদিকে দেখ করুণার খেলা
জগৎ ভরিয়া গেল।
আজি ভগবান করুণা-নিধান
লইলা করুণা হরি,
অপার করুণা করিলা বিস্তার
করুণা মূরতি ধরি।
ছিলা আগে পিতা হইলা তনয়
পুত্র শোকাতুর তরে।
গোপাল বলিয়া আজিও পূজিছে
বিয়োগ বিধুরনরে।
ভকতি প্রেমের স্নেহের সহিত
মিলন হইয়া গেল।
করুণার নিধি "করুণা শঙ্করে"
মিলিয়া তনয় হল।

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার।

জন্ম কথা। (৪)

বাইবেলের কথা প্রাঞ্জল, সকলেই বলেন, সকলেই শ্রবণ করেন, সকলেরই বিশ্বাস মেরির গর্ভ হইল অলৌকিক আকারে; ভূভার হরণ জন্য ঈশ্বর মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"This day I have begot whom I declare
My only son, and on this holy hill.
Him have anointed, whom ye now behold
At my right hand, your head I him appoint.
And by myself have sworn to him shall bow
All knees in Heaven and shall confess him Lord.'

Paradise Lost, Book V.

যে তাঁহাকে অনাথা করিবে, অন্ধকূপে তাহাকে নিক্ষিপ্ত করা যাইবে।

" * * * Him who disobeys
Me disobeys, breaks union and that day
Cast out from God and blessed vision falls
Into utter darkness deep engulfed."

Hebrew Ch I, 5.

ভাবগ্রাহী পাঠক, সৃষ্টিকর্ত্তার মানব সৃষ্টি করিবার তাৎপর্য্য অবধারণ করুন, এক্ষণে সৃষ্টিকর্ত্তার আজ্ঞা পালন হয় নাই বলিয়াই মানবের সৃষ্টি; খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্ম-দিবাকরের ইহাই উদয় পর্ব্বত। মহাপর্ব্বের সূত্রপাত এই স্থানে। অতএব জিজ্ঞাস্য, ভাগবতের কিম্বদন্তির সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য প্রতিপন্ন হয় কি না?

"তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ "প্রজা সৃজ্য সৃজথ পুত্রকা"।
তন্নৈচ্ছন্ মোক্ষধর্ম্মানো বাসুদেবো পরায়ণাঃ।
সোবধ্যাতঃ সুতৈরেবং প্রত্যাখ্যাতোনুশাসনৈঃ।
ক্রোধং দুর্ব্বিসহং জাতং নিয়ন্তুমুপ চক্রমে।"

ভাগবত মৈত্রেয় বিদুর সংবাদ, তৃতীয় অধ্যায় ৫।৬ শ্লোক।

মিলটনের বর্ণনায় বিদিত আছে, প্রধান সেবক পুত্রকে মানিল না, সেই জন্য ক্রোধে ঈশ্বর তাহাকে স্বর্গচ্যুত করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন; এদিকে ভাগবতের বর্ণনায় মোক্ষধর্ম্মানুরক্ত পুত্রেরা পুত্রোৎপাদনে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, ব্রহ্মা রুষ্ট হইয়া প্রজা সৃষ্টির অন্য উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন।

"দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং সবিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।"

মনু ১ম অধ্যায়, ৩২ শ্লোক।

আপনার মহাপর্ব্বের কথাও ত তাই।—"পরমেশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রাগ্রস্ত করিয়া সেই নিদ্রা সময়ে তাহার এক পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা তাহার সেই ক্ষত স্থান পুরাইলেন এবং প্রভু পরমেশ্বর আদম হইতে নীত সেই পঞ্জর দ্বারা এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন।"

আদি পুস্তক ২য় অধ্যায় ২১।২২ পদ।

মনুষ্য সৃষ্টি সফল হইল বটে, কিন্তু দার্শনিকগণের চক্ষে নানা দোষ জন্মিল, কিম্বা চক্ষুর তেজ ফুটিয়াছিল, সেই প্রাচীন কথা কি করিয়া বলি?

"তদ্‌যোগোঽপ্যবিবেকান্ন সমানত্বং।"

সাংখ্যদর্শন, ১ম অধ্যায়, ৫৫।

ভক্তিভাজন সাংখ্যকারের মতে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগই দুঃখের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, সেই দুঃখ নাশের উপায় কি?

"নিয়তকরণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ।"

যেমন অন্ধকার নাশের কারণ আলোক, সেইরূপ বিবেক হইতে অবিবেকের উচ্ছেদ হয়, তাহা হইলেই মানব পরম পুরুষার্থের অধিকারী হইয়া থাকে।

আধ্যাত্মিক বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ চির দিন পাশ্চাত্য চিন্তায় স্বদেশে সুখে

রাজত্ব করুন, আমরা তাহার নিকটেও যাইব না। জ্ঞান গভীর খ্রীষ্টোপাসকদিগের মতে শয়তান আদি নারীকে অমৃত ফলাস্বাদন করাইয়া তাহাদিগকে তাপ, পাপ, ও মৃত্যুর পথে আনয়ন করিয়াছিল, পাপবিনাশের উপায় ছিল না, দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় উপায় হইল, পাপীর পরিত্রাণ জন্য ঈশ্বর যিশুকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। আর্য্যা ব্লাবাৎস্কি ইহার কি প্রতিবাদ করিয়াছেন, শ্রবণ করুন।

"It is to say the least strange that the Christians claim to base their religion upon a prophecy of the Bible which exists no where in that book. In what chapter or verse does Jehovah, the Lord God promise Adam and Eve to send them a Redeemer who will save humanity. "I will put enmity between thee and the woman" says the Lord God to the serpent "and between thy seed her seed; it shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel." In these words there is not the slightest allusion to a Redeemer and the subtilest of intellects could not extract from them as they stand in the third chapter of Genesis any thing like that which the Christians have contrived to find."

Isis Unveiled, II., P. 111.

আর্য্যা ব্লাবাৎস্কি বলিতেছেন, বাইবেলের কোন অধ্যায় বা কোন পদে এরূপ লিখিত হয় নাই যে,ঈশ্বর আদমকে বলিয়াছিলেন,তোমাদের উদ্ধারের জন্য আমি যিশুকে প্রেরণ করিব।

পাশ্চাত্য চিন্তা পাশ্চাত্যেরাই ভাল বুঝেন, তাহাতে আমাদের অধিকার কি? অধিকার নাই বলিয়াই এটা আমরা ভাল বুঝিতে পারি না যে, মেরির গর্ভে ভগবান কি প্রকারে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার অলৌকিক গর্ভ সঞ্চার কি প্রকারে হইতে পারে? বাইবেলে যদি তাহার আনুসঙ্গিক প্রসঙ্গ না থাকে, মেরির অলৌকিক গর্ভে কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে?

খ্রীষ্টোপাসকেরা খ্রীষ্টের জন্মের যে কোন হেতু প্রদর্শন করুন, আর্য্যাকিম্বদন্তী অতিক্রম করা বড় সহজ হইবে না। এ সম্বন্ধে অধিক আর কি লিখিব, ললিতবিস্তর জাতকাদি বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রমাণ সমূহ সপ্রমাণ করিতেছে। ভগবান্ বুদ্ধের জন্মসম্বন্ধে বৌদ্ধেরা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রমাণ অনায়াসে দিতে পারেন। যথা—"শত কল্পের পর তুমি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া জগতে শাক্যমুনি বলিয়া অভিখ্যাত হইবে, যে কল্পে তুমি বুদ্ধরূপে ভূমণ্ডলে বিরাজ করিবে, উহা ভদ্র কল্প বলিয়া খ্যাত হইবে। তোমার পিতা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী, আনন্দ চিরসহচর এবং শারিপুত্র তোমার শিষ্যের জ্যেষ্ঠ পদাধিকারী হইবেন। তুমি জগতের চক্ষু প্রকাশক ও বিশ্বের পাবক হইবে।"

"In a hundred Kalpos thou shalt become Budha; Thou shall be called Shy Kia wen (the pious the humane.) The name of the Kalpo in whicle thou shalt appear shall be "Photho" (wise.) Thy father shall be Pe tsing, thy mother Ma ye. Thy companion shall be Anan, thy right hand disciple She li foe, thou shalt instruct the men of the five great worlds, thou shalt save the ten parts."

Pilgrimage of Fa Hian P. 69.

ভাষার বৈষম্যে বুদ্ধের মাতা মায়াদেবী (Maye "মেয়ি") বলিয়া উক্তা হইয়াছেন; জাতি বিশেষের দ্বারা মায়া শব্দের অপভ্রংশ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। বস্তুতঃ খ্রীষ্টের প্রসূতি মেরি বা মেরায়া এবং বুদ্ধ মাতা "মেয়ি" বা মায়া যেন একই আখ্যা বোধ হয়। খ্রীষ্টের প্রধান শিষ্য পিতর, বুদ্ধের প্রধান শিষ্য শারি পুত্র। পুত্র শব্দের অপভ্রংশে পুৎ বা পুত্তুর হইয়াছে। পুত্তুর ও পিতার একই বোধ হয়। কিন্তু সেমিটিক

শব্দ "কয়র্কা" বলিলে অবশ্যই আর্য্য শব্দার্থের ব্যতিক্রম ঘটে।

প্রাচীন কিম্বদন্তীই প্রাচীন জাতির পুরাবৃত্ত। বাইবেলে বিশ্ব সৃষ্টির বিষয় বর্ণিত আছে; সুতরাং তৎসম্বন্ধে কথা কহিতে হইলে দেবচক্ষের প্রয়োজন। আমার দেবচক্ষু কৈ? সুতরাং "প্রসাদ ভাসে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন," আমার তাহাই হইয়াছে। অভ্যন্তর দর্শন শক্তি যিনি প্রদান করেন, তিনি সকলি করিতে পারেন, যদি কৃপা করিয়া আমাকে সেই দিব্য চক্ষু প্রদান করেন, তবেই আমি সঙ্কট-সাগর পার হইতে পারি। খ্রীষ্টোপাসকদিগের খ্রীষ্টই ঈশ্বর ও তাঁহার বচনই তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। খ্রীষ্ট কে? কোন্ বংশীয়? তদ্বংশের আদি পুরুষ কে? তদীয় সন্তানগণ কোন্ দেশ অধিকৃত করিয়াছিল, ইত্যাদি বিষয় বাইবেলে উক্ত আছে, খ্রীষ্টোপাসকগণের তাহাতেই অটল বিশ্বাস; প্রত্যুত প্রাচীন কিম্বদন্তী যে কুশের মূলের ন্যায় অত্যন্ত দুরবগত, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন কিনা, বলিতে পারি না। বাইবেলের জেনেসিস্ পর্ব্বের সপ্তমাধ্যায়ে মুশা কর্ত্তৃক যে মহাপ্রলয় বৃত্তান্ত প্রকীর্ত্তিত আছে, বোধ হয় তাহা আর্য্য পৌরাণিক প্রবাদের অনুকল্প; এ "কিম্বদন্তী কুশের মূল" কোথায়, কেহ নিরূপণ করিতে পারিয়াছেন? খ্রীষ্টের পূর্ব্ব পুরুষ ইস্রাইলদিগের কিম্বদন্তী এতদুভয়ের সমন্বয় করিলে আমরা কি দেখিতে পাই?

শাক্য বংশের কৌলিক প্রবাদ।

১। শাক্য প্রবাদ মতে ইক্ষ্বাকুবংশের পুরাবৃত্তের মর্ম্ম এই যে, তাহারা প্রথমতঃ একজনকে দলপতি মনোনীত করে। "মহাসম্মত" নামে উক্ত দলপতি প্রসিদ্ধ ছিলেন, পেট্রিয়ার্ক ও মহাসম্মতের অর্থ একই প্রকার। (ক)

২। সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলের আদি বাসস্থান অযোধ্যা প্রদেশ।

৩। বুদ্ধের জন্ম সূর্য্যবংশীয় রাজকুলে।

৪। শাক্যবংশের আদিপুরুষ ইক্ষ্বাকু।

৫। ইক্ষ্বাকুর দুই পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ছিল। (খ)

৬। ভার্য্যার অনুরোধে ইক্ষ্বাকু কনিষ্ঠ সন্তানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করণার্থ জ্যেষ্ঠ সন্তানকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। (গ)

৭। ইক্ষ্বাকুর সেই নির্ব্বাসিত সন্তান হইতে এক মহাকুল উৎপন্ন হয় (শাক্যবংশ)। (ঘ)

৮। শাক্যকুলের রাজ্য স্থাপন জন্য মুনি ও দেবতা কর্ত্তৃক স্থান প্রদর্শিত হইয়াছিল। (ঙ)

৯। অষ্টকা শ্রাদ্ধ হেতু মৃগমাংস আহরণ জন্য ইক্ষ্বাকু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ধনুর্ব্বাণ লইয়া মৃগয়ায় প্রেরণ করেন। (চ)

১০। প্রবাদ আছে, ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠপুত্র

(ক) "They accordingly met and elected one for their master and proprietor of their lands and for the arbitrator of their controversies saying to him come animal being, punish from among us those that are to be punished and reward those with a gift that merit to be remunerated; from all the products of our lands we will pay you a certain rate according a rule."

"Since he was honored by a great multitude of animal being he was called Maha Sammata." *Fa Hian 203.*

(খ) Ibid.

(গ) ঐ।

(ঘ) কাগয়ুর সূত্রভাগ।

(ঙ) Fa. Hian 203.

(চ) ঐ।

বিরুদ্ধী মৃগয়ার শ্রমপ্রযুক্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মৃগয়ালব্ধ একটী শশক-ভোজনাপরাধে পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। (ছ)

১১। শাক্যকুলে নদীর জলাধিকার জন্য আত্মীয় বিরোধ হইয়াছিল। (জ)

১২। পশুপালন কৃষিকার্য্যদ্বারা শাক্যকুল কালাতিপাত করিত।

১৩। মাতুল কন্যার পাণিগ্রহণ শাক্য বংশের রীতি ছিল।

১৪। ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণ সোদরার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। (ঝ)

১৫। কপিলবাস্তুর চারিদিক পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত ছিল। (ঞ)

১৬। কপিলবাস্তুর চারিটি দ্বার ছিল। (ট)

১৭। কপিল মুনির আশ্রম সন্নিহিত বলিয়াই কপিলবাস্তু নাম হইয়াছিল।

ইস্রাইল বংশের কৌলিক প্রবাদ।

১। প্রথমত পেটিয়ার্কগণ ইস্রাইল বংশের শাস্তা ছিলেন। পরে তাহারা আপনাদিগের একজন রাজা নিয়োজিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। (ক)

২। ইস্রাইল বংশের আদি বাসস্থান যোধিয়া প্রদেশ।

৩। খ্রীষ্টের জন্ম রাজবংশে।

৪। ইস্রাইল বংশের আদিপুরুষ ইস্‌হাক।

৫। ইস্‌হাকের পিতা আব্রাহামের দুই পত্নীরই গর্ভজাত সন্তান ছিল। (খ)

৬। ভার্য্যার অনুরোধে আব্রাহাম কনিষ্ঠ সন্তানকে দায়াধিকার প্রদান জন্য জ্যেষ্ঠ সন্তানকে বনে নির্ব্বাসিত করেন। (গ)

৭। আব্রাহামের সেই নির্ব্বাসিত সন্তান হইতে এক মহাকুল সমুৎপন্ন হইয়াছিল (মুসলমান জাতি)। (ঘ)

৮। ঈশ্বর ইস্রাইল রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। (ঙ)

৯। মৃগমাংস আহরণ জন্য ধনুর্ব্বান লইয়া ইস্‌হাক জ্যেষ্ঠ সন্তানকে শীকারে যাইবার অনুমতি করেন। (চ)

১০। মাংস সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে, ইস্‌হাকের জ্যেষ্ট পুত্র শীকারে গমন করিলে তাহার কনিষ্ট ভ্রাতা প্রবঞ্চনা দ্বারা অন্ধ পিতাকে ছাগমাংসের পলান্ন ভোজন করাইয়া জ্যেষ্ঠকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে নিরাশ করিয়াছিল। (ছ)

১১। কূপের জল অধিকার সম্বন্ধে ইস্রাইল বংশে একটা আত্মীয় বিরোধ হইয়াছিল। (জ)

১২। মৃগয়া, পশুপালন এবং কৃষি কার্য্য ইস্রাইল বংশের জীবনোপায় ছিল।

(ছ) ঐ।

(জ) ঐ।

(ঝ) বা চ ইক্ষ্বাকু অষ্টকায়াম "উৎপাদ্য শ্রদ্ধার্হং মাংসম আনয়" ইত্যাদি। গদ্য সংগ্রহ বিষ্ণুপুরাণ।

(ঞ) ঐ।

(ট) কপিলবাস্তুর ৪টা দ্বার ছিল।

(ক) "In Jewish history the term is also applied to a person invested with a dignity, the origin of which has been the subject of much discussion." *Beeton's Dict.*

(খ) আদি পুস্তক ১৬।২১ অধ্যায়।

(গ) আদি ২১ অ, ১৪ পদ।

(ঘ) White's Universal History.' P. 9.

(ঙ) আদি ১৫ অ, ১৮ প।

(চ) আদি ২৭ অ, ৩ প।

(ছ) আদি ২৭ অ, ৩৩ প।

(জ) আদি ২৬ অ, ১২ প।

১৩। ইস্রাইল বংশে মাতুল কন্যার পানিগ্রহণ রীতি ছিল।

১৪। ইসহাক্ সোদরার পানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ঋ)

১৫। খ্রীষ্টের জন্ম বেথ্‌লেহেম নগর চতুর্দ্দিক পর্ব্বতাদীর দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ ছিল। (এ)

১৬। বেথলেহেমের চারিটি দ্বার ছিল।

১৭। বেথাএল, বেথসৈদা, বেথসেবা, বেথানি, বেথর্ফাজি, বেহলেহেম প্রভৃতি শব্দ বাস্তু-বোধক। বাস্তুর অপভ্রংসে বেথ হইতে পারে। বেথ্‌লেহম অর্থাৎ অন্নপুর (House of Bread).

খ্রীষ্টের জন্মস্থান বেথলেহেম বা অন্নপুর, বুদ্ধের জন্ম স্থান কপিলবাস্তু বা কপিলপুর উভয় শব্দের সমন্বয় হইল। ইস্রাইল বংশের কৌলিক প্রবাদের অধিক আলোচনা আবশ্যক বোধ হইতেছে না।

বৌদ্ধধর্ম্ম রূপান্তরিত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মোৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ অনুমানের যে যে কারণ আছে, তন্মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যই প্রধান। হ্রসডেবিডস্, বলেন, খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি এই দুয়ের রূপক ভাব চিন্তা করিলে মিলটনের সহিত বৌদ্ধ কবিগণের চমৎকার সমন্বয় হইতে পারে। কিন্তু মিলটনের কাব্য কোন্ আদর্শে লিখিত, তাহা হ্রস্‌ডেবিডস চিন্তা করিলে বড় কাজই হইত। কবি মিলটন প্যারাডাইস লষ্টের পঞ্চম স্বর্গে আদম ও রাফেলের কথোপকথন প্রসঙ্গে স্বর্গের যেরূপ ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের চতুর্থ সর্গের স্বর্গ বৃত্তান্তের সহিত বেশ ঐক্য হয়। বর্ণনাও বৌদ্ধ তত্বানুযায়ী। ললিতবিস্তরের চতুর্থ সর্গে ভগবান বোধিসত্ত্ব তুষিত নামক স্বর্গের উচ্চধ্বজ প্রাসাদে যে ভাবে দেবমণ্ডলী লইয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কবি মিলটন যেন সেই ভাবটী হরণ করিয়া পঞ্চম সর্গের উপষ্টম্ভ করিয়াছেন। ললিতবিস্তরে বোধিসত্বের জন্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং ধর্ম্মোপদেশ বাহুল্যরূপেই উক্ত আছে, মিলটনের গ্রন্থে সয়তানের সংগ্রাম বিষয়ক প্রসঙ্গ বাহুল্যরূপেই বলা হইয়াছে, ফলত উক্ত উভয় গ্রন্থের উক্ত সর্গ পাঠ করিলে পাঠকের মন অবশ্যই বিস্ময়াপন্ন হইতে পারে।

খ্রীষ্টোপাসকেরা বলেন, খ্রীষ্টের জন্ম অতি আশ্চর্য্য এবং অলৌকিক। যে স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা জীবোৎপত্তির বিধান আছে, খ্রীষ্টের জন্ম সে নিয়মের অতীত, তিনি কুমারীর গর্ভে এবং হোলিঘোষ্টের তেজ দ্বারা উৎপন্ন হন। গস্‌পেলের প্রারম্ভেও এই কথা লিখিত আছে। ভগবন্নারায়ণ যখন বুদ্ধাবতার হইয়া সংসারে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহারও জন্ম অলৌকিকরূপে হইয়াছিল। ললিতবিস্তরের ষষ্ঠ সর্গের প্রারম্ভেই প্রকাশ আছে যে, বৈশাখ মাস, বিশাখা নক্ষত্রে লোকজ্যেষ্ঠ ভগবান বোধিসত্ত্ব ভগবতী মায়া দেবীর উদরে দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করেন। এ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি দিব্য জলে স্নাত হইয়া শয়ন গৃহে নিদ্রিত ছিলেন, দেখিলেন, দেবদূতগণ তাঁহাকে বহন করিয়া উচ্চ শৈলে স্থাপিত করিয়াছে, এবং তুষার ধবল একটী মাতঙ্গ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিতেছেন। এই মাত্র প্রভেদ, বাইবেলে স্বামীর স্বপ্নদর্শন, ললিত-

(ঋ) আদি ২০ অ, ১২ প।

(এ) Founder of Christianity. P. 25.

বিস্তরে স্ত্রীর স্বপ্ন দর্শন, ঘটনা এক, বর্ণনায় বিভিন্নতা আছে মাত্র।

তাতার ভাষাভিজ্ঞ কুথা করোসি বলেন যে,মায়া দেবী কুমারী ছিলেন,মোগল জাতির ধর্ম্ম গ্রন্থে ইহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চতুর্থ খ্রীষ্টশতাব্দে খ্রীষ্টোপাসক সেণ্টজেরোম লিখিয়াছেন,"ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ দিগের এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বুদ্ধ কোন কুমারীর পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।" বিজাতীয় পণ্ডিত জেরোম যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা বোধ হয় না, মায়া দেবী দুই বৎসর আট মাস কঠোর ব্রতানুষ্ঠান-পরায়ণা, স্বামী-সংসর্গ-বিহীনা ছিলেন, তদবস্থায় তাঁহার গর্ভের সঞ্চার হইয়াছিল।

শ্রীজগনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিমন্যু।

১

মরেছে কি ?—মরেনি তো,সে যে বীরবর—
মৃত্যু তার প'ড়া পা'য়,
ছুঁইতে পারেনি তা'য়,
সে যে ছিল মরণের অনেক উপর।
যেখানে মৃত্যুর মেলা,
সেথা সে খেলিত খেলা,
মরণ উঠিত কেঁপে পেয়ে পদ ভর,
"মরণে" আশীষ তার, সে যে বীরবর!

২

কপালে ছিলনা তার মরণের লেখা—
সে নয় ডাকাত, চোর,
ছিল তার গায়ে জোর,
শোণিতে ছুটিত তার আগুনের রেখা,
ছিল তার পরাক্রম,
বাঁধিতে সহস্র যম,
কোটি মৃত্যু-গলে সে যে "ফাঁসি" দিত একা,
কপালে ছিল না তার মরণের লেখা!

৩

শৃগাল কুকুর নয়—সে ছিল কেশরী,
বাহুবলে মৃগযূথে
রাখিত সে ভূঁয়ে পুঁতে,
শুনি তার সিংহনাদ শিহরিত করী!
সে তো নয় ছাগ বৃন্দ,
বীরত্বে পূর্ণ সে চিত্ত,
জানিত না, কাপুরুষি—পায় ধরাধরি!
শৃগাল কুকুর নয়, সে ছিল কেশরী!

৪

সে ছিল কোলের ছেলে স্নেহময়ী মা'র—
বুঝিত সে মা'র মর্ম্ম
করিত পুত্রের কর্ম্ম,
সেছিল সুপুত্র—সে তো নহে কুলাঙ্গার!
যদি মা বিষাদ-ক্ষীণা,
"রক্তে জোর আছে কিনা"
তাই সে দেখায়ে গেল আর একবার!
সে ছিল স্নেহের ধন অভাগিনী মা'র।

৫

তার কথা তার নাম বলিওনা কেহ,
যা হবার গেছে হয়ে,
সে তো সব গেছে স'য়ে,
হয়েছিল তারি তরে "চক্রব্যূহ" গেহ!
সম্পূর্ণ হয়েছে তার
অত্যাচার, অবিচার!
"সপ্তরথী" বীরধর্ম্ম রাখিল না কেহ!
আর কেন মুখ নাড়া,
মরার উপরে খাঁড়া!
আর কেন গালি দাও, কেন দাও স্নেহ!

ভারতের বক্ষ খুলি,
লেখ তার কীর্ত্তি গুলি,
ভস্মেতে মিশাও ভস্ম, খুঁজি তার দেহ!
তার নাম আর কেন?—বলিওনা কেহ।

৬

মরেছে কি? মরেনিতো সে যে বীরবর!
অমন তরুণ প্রাণে
কে কবে মরিতে জানে,
আশার অমৃত ভাষা শুনি নিরন্তর?
অধরে উছলে ভাসি
সতেজ দাম্ভিক হাসি!
সে দেহ উদ্যমে ভরা নবীন নধর!
এখনো তাহার ডরে
মরণ কাঁপিয়া মরে,
পাছে সে "দুরন্ত ছেলে" ভাঙ্গে তার ঘর!
এখনো তাহার তরে
কত প্রাণ ভয়ে মরে,
পাছে সে আবার বলে "ধর, ধর, ধর"!
এখনো তাহার ভরে
কত চোকে জল ঝরে,
"সেও কি ভারতেছিল—প্রিয় সহোদর!"
মরেছে কি?—মরেনি তো সে যে বীরবর!

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

প্রাচীন-বংশ-বিবরণ।

বাৎসায়ন গোত্র।

এবারে আমরা বাৎসায়ন গোত্রের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এই বংশে অনেক মহামুনি ও ঋষি, তপস্বী ও সন্ন্যাসী, কাব্য-প্রণেতা ও গ্রন্থকর্ত্তা উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনের পবিত্র কাহিনী ও বিস্ময়কর জীবনী পাঠে পাঠকগণ পুলকিত হইবেন ভাবিয়া অদ্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। এই প্রবন্ধে যে যে নামে ২ দুই, ৩ তিন, ৪ চারি ইত্যাদি অঙ্ক দেওয়া গেল; তাহাতে ব্রহ্মা হইতে তাঁহারা কত অধস্তন জানা যাইবে।

২ ভৃগু ও ৩ কবি।

কোন কোন গ্রন্থের মতানুসারে ব্রহ্মাই সৃষ্টির আদি পুরুষ। মতান্তরে বিষ্ণুই সর্ব্বপ্রথম। ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভি হইতে সঞ্জাত। এস্থলে ব্রহ্মার সম্বন্ধে বিশেষ লেখা অনাবশ্যক। নব্যভারতের পাঠক তাহার পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন। বিষ্ণু সম্বন্ধেই কি বলিব? তাঁহারা স্ব স্ব প্রধান। ভৃগু, ব্রহ্মার সন্তানগণের অন্যতম। বরুণ দেবের যজ্ঞে ব্রহ্মার নাভিদেশে তিনি উৎপন্ন হন। অন্য মতে ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্র নন, প্রপৌত্র। সে বর্ণনা এইরূপ—বিরাট, ব্রহ্মার আত্মজ। এই বিরাট ও মৎস্যদেশাধিপ বিরাট, দুই ভিন্ন ব্যক্তি নির্দ্দেশ করা অপ্রয়োজনীয় বলিলেও বলা যায়। ব্রহ্মাত্মজ বিরাটের সন্তান স্বায়ম্ভুব মনু। ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ ইত্যাদি এই মনুর পুত্রত্ব অঙ্গীকার করেন। ভৃগু একজন পুরাতন ও খ্যাতিশালী। প্রসিদ্ধ সপ্তর্ষির মধ্যে তাঁহার আসন উচ্চ স্থানেই প্রতিষ্ঠিত। কশ্যপদনায়ুনন্দিনী পুলোমা, ভৃগুর প্রণয়িনী। শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধের অস্তিত্ব পরীক্ষার্থে তিনি

কৃত্রিম আক্রোশ ভরে তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিয়া কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলের পূজ্য হইয়াছেন।

দধীচের ভ্রাতৃজায়া অক্ষমালিকা। তাঁহারই পুত্র নিজ নাম—খ্যাত বৎস মুনি। দধীচ স্বীয় বিদ্যা, বৎসকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রীতিকূটে স্থাপন করেন। বৎসের পুত্র বাৎস্য বা বাৎসায়ন। বাৎস্য বা বাৎসায়ন প্রকৃত নাম নয়। বৎস মুনির (বৎস্য বা বাৎস্যায়ন) বৎস বলে। বাৎস্য গোত্রের বিস্তৃত বর্ণনা পরে লেখা যাইবে। সম্প্রতি বাৎসায়ন কুলের বর্ণনা বলিতেছি। কাহারও মতে বাৎস্য ও বাৎসায়ন এক মাত্র গোত্র, দুই গোত্র নয়। ইহা সম্ভব বোধ হয়। সারস্বত, যৌবন সময়ে আপন তাবৎ শাস্ত্রজ্ঞান বৎসকে সমর্পণ করিয়া তপঃসিদ্ধি-কামনায় জনকের সমীপস্থ হইলেন। ইহারই কিছু পূর্ব্বেই বৎসমুনি পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হন। তিনি শোণতীরস্থিত প্রীতিকূটে রহিলেন। বৎসের পুত্র বাৎস্য বা বাৎস্যায়ন, ইহা ইত্যগ্রেই বলিয়া আসিয়াছি। বাৎস্য ও বাৎসায়ন নাম হইতে বাৎস্য গোত্র বা বাৎস্যায়ন গোত্র। এই এক গোত্রের সংজ্ঞা সমরাণতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে। বংশ তালিকায় পাঠকেরা চক্ষুঃ নিক্ষেপ করুন, অনেক সহজে বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

১ ব্রহ্মা।

২ মরীচি — ২ অত্রি

৩ কশ্যপ (দনায়ু) — ৩ দুর্ব্বসা

৪ সূর্য্য — ৪ পুলোমা
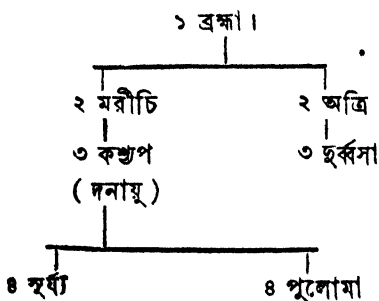
এই বংশতালিকায় ও নিম্নের তালিকায় কোন কোন নামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে যে নাম রহিয়াছে, তাহা তদুপরিস্থ পুরুষের ভার্য্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মুদ্রাযন্ত্রের ও পাঠকগণের বোধের সুবিধা জন্য পৃথক্ পৃথক্ বংশতালিকা দিতেছি। উপরের তালিকায় যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহা বংশের মূল। তাহার সঙ্গে বাৎস্য বা বাৎস্যায়ন গোত্রের কি সম্বন্ধ আছে, নিম্নে দেখাইতেছি।
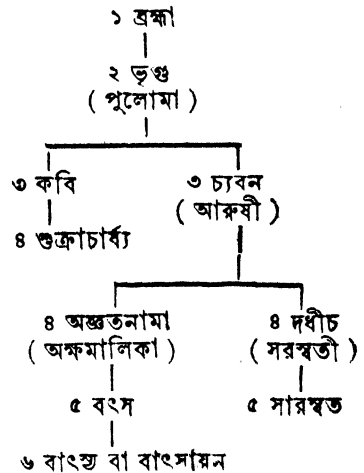
এক কথায় বলিতে গেলে, ভৃগু প্রায় সকলেরই জ্ঞাতসার হইয়াছেন। এত প্রসিদ্ধি অতি অল্প লোকের অদৃষ্টেই ঘটে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হইলে, এত সমাদর কেন হইবে বল? এস্থানে ভৃগুমুনির ক্রোধের হেতুর উল্লেখ করিব। না করিলে অনেকেই মুনিবরকে মূর্ত্তিমান ক্রোধ মনে করিবেন, ভাবিয়া এই প্রাচীন কাহিনীর সংক্ষেপে অবতারণা করিতেছি। একদা এক যজ্ঞস্থলে ঋষিগণের মনে প্রশ্ন উঠিল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর এই দেব-ত্রয়ের মধ্যে কাহার যজ্ঞাংশ পাওয়া বৈধ। কেহ কহিলেন, ব্রহ্মাই যজ্ঞাংশের উপযুক্ত, কাহারও

মতে বিষ্ণুই যজ্ঞেশ্বর। অবশিষ্টেরা বলিলেন, শিবই যজ্ঞ ভাগের অধিকারী। কথা এই, যিনি রোষপরবশ নন, তিনিই যজ্ঞেশ্বর। এই বিসংবাদী তর্কবিতর্কবাদে কিছু সাব্যস্ত না হওয়ায়, ব্রহ্মার তনয় ভৃগুমুনিকে সকলেই একবাক্যে উক্ত বিতণ্ডার মীমাংসার ভার দিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে জনকের সকাশে গমন করিলেন। কিন্তু অভিবাদন করিলেন না। না করায় ব্রহ্মার অক্ষিযুগল হইতে অনল-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। মুনি তাহা দেখিয়া বুঝিলেন, ইঁহার ক্রোধ সম্পূর্ণ রহিয়াছে। তৎপরেই রুদ্রের নিকট গেলেন। ভৃগু তাঁহাকে প্রণাম না করিলেও, দেবদেব তাঁহাকে মহা সমাদরে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি এই বলিয়া আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করিলেন, তুমি শ্মশানে থাক। অস্থিমালা ও ভস্ম তোমার ভূষণ। সিদ্ধি, ভাঙ তোমার খাদ্য। অতএব তুমি অস্পৃশ্য, অগ্রাহ্য। এই কথা শুনিয়াই সাক্ষাৎ ক্রোধাবতার শিব, ত্রিশূলাঘাতে ভৃগুর জীবন ধ্বংসে উদ্যত হইলেন। শেষে তিনি শিবানীর অনুগ্রহে জীবন ভিক্ষা দিলেন। বিষ্ণু, কৃষ্ণাবতার হইয়া দ্বারকায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তথায় উপনীত হইয়া শুনিলেন, তিনি পত্নীর সঙ্গে শয়ন-কক্ষে নিদ্রা-সুখ-সম্ভোগ করিতেছেন। হঠাৎ শয়ন মন্দিরে উপনীত হইয়া, কৃষ্ণ-বক্ষে পদাঘাত করিলেন। তিনি জাগ্রত হইয়া ঋষিবরের স্তুতি করিতে লাগিলেন। আহা! আমার কঠোর বক্ষে চরণাঘাতে আপনার চরণে না জানি কতই ব্যথা লাগিয়াছে। কৃষ্ণের এই অক্রোধ প্রকৃতির জন্য তিনিই যজ্ঞেশ্বর হইয়াছেন। ভৃগুর অপরাপর পরিচয় অনাবশ্যক। তিনি গোত্রকর্ত্তা ঋষি। যাবৎ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ, বর্ত্তমান রহিবে, ভৃগুর নাম তাবৎ কাল মানব জাতির হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকিবে। বিদেশেও তিনি অজ্ঞাত ও অপরিচিত নন। নরনারী সযত্নে তাঁহাকে চিত্তগৃহে জাগরূক রাখিয়াছে ও রাখিবে।

শুক্রাচার্য্য যেমন দৈত্যগুরু, বৃহস্পতি তেমনই দেবগুরু। শুক্র, বৃহস্পতি অপেক্ষা, জ্ঞানাংশে উৎকৃষ্টতর বোধ হওয়ায়, দৈত্যগণ কর্ত্তৃক প্রপূজিত হন। শুক্রাচার্য্য প্রণীত নীতিশাস্ত্র আছে। তাহার সমগ্র ভাগ সুপ্রাপ্য না হইলেও, মহাভারতের উল্লিখিত প্রমাণে বলিতে পারি, তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির সদৃশ এক জন উত্তম হিতোপদেশক ও নীতিশাস্ত্র-কর্ত্তা অসাধারণ মানব। সুতরাং ইহা অবলীলায় বলিতে বাধা নাই যে, দেবদানবে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহাদের উপদেষ্টারাও সেই প্রতিযোগিতায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এটি সামান্য কৌতূহলোদ্দীপক নয়। কালিকাপুরাণের বচনানুসারে, শুক্রাচার্য্যের ত্বষ্টা, বর, অত্রি ও শৌক্কল এই চারি সন্তান। এই "অত্রি" গোত্রকর্ত্তা প্রসিদ্ধ অত্রি নহেন। ত্বষ্টাই দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা। ত্বষ্টা, মতান্তরে কশ্যপ-অদিতির সন্তান। তাঁহার সংজ্ঞা ও ছায়া নামে দুই তনয়া। উভয়েই সূর্য্যের পত্নী। বৈবস্বত মনু, যম, যমুনা, জ্যেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার, কনিষ্ঠ অশ্বিনীকুমার, শনি, সাবর্ণি, ও তপতী, বিশ্বকর্ম্মার দৌহিত্র। যমুনা ও তপতী ব্রহ্মার দৌহিত্রী। ত্বষ্টা, বর, অত্রি, শৌক্কল, ইহারা সকলেই অসুরগণের পুরোহিত।

৩ চ্যবন।

শোণদের পশ্চিমে প্রীতিকূটের ১॥• সার্দ্ধৈক ক্রোশ দূরে চ্যবন বাস করিতেন।

শোণ ভাগীরথীর করদ নদ, পাঠকেরা ইহা স্মরণ রাখিবেন। যখন ইনি জননী-জঠরে ছিলেন, তৎকালে চ্যবন নামে এক তস্কর ইহার জননীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে ইনি জননীর গর্ভ হইতে নির্গত হন। তিনি অনুবাল্যা আরুষীকে দাররূপে গ্রহণ করেন। চ্যবন, বেদবিখ্যাত বেদমন্ত্র সঙ্কলয়িতা ঋষি। তিনি বেদমন্ত্র রচনা করেন। তদীয় বাক্য, ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ মণ্ডলের ১৯ সূক্তে দৃষ্ট হয়। এ পর্য্যন্ত চ্যবনের ৩ তিন পুত্রের নাম জানিতে পারা গিয়াছে। দধীচ, ঔর্ব্ব ও অন্য এক জন অজ্ঞাতনামা এই তিন জন তাঁহার পুত্র।

৫ সারস্বত, ৫ বৎসমুনি ও ৬ বৎস্য বা বাৎসায়ণ।

অদ্য সারস্বতের বৃত্তান্ত অগ্রে লিখিয়া পর প্রস্তাবে ঔর্ব্বের বৃত্তান্ত লিখিব। দধীচ ব্রহ্মার জামাতা, ব্রহ্ম তনয়া সরস্বতীর স্বামী। দধীচের ঔরসে সরস্বতীর গর্ভে সারস্বত জাত হন। মাতৃনামে তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল। যে দেবী, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী, তাঁহার নামানুসারে তাঁহার উদরোদ্ভূত সন্তানের নামকরণ হওয়া, দেখিতে শুনিতে ভাল লাগিতেছে।

৩ দুর্ব্বাসা, ২ সরস্বতী, ৪ দধীচ।

দুর্ব্বাসা, অত্রিপুত্র। ব্রহ্মার সদনে সামবেদ গান করিতেছিলেন। মন্দপাল নামক এক মুনির সহিত বিবাদ হওয়ায় সামগানের সুর বিকৃত হইয়া যায়। তাহাতে সরস্বতী হাস্য সংবরণ করিতে না পারায়, দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া পিতৃস্বসা সরস্বতীকে এই অভিসম্পাত করিলেন, তুমি মর্ত্ত্যে গমন কর। ব্রহ্মা স্বীয় পৌত্র দুর্ব্বাসাকে শান্ত করিয়া তনয়াকে কহিলেন, "কুমারি! আমার আদেশে তোমার আনুকূল্যের নিমিত্ত তোমার অনুগতা সহচরী সাবিত্রী তোমার সঙ্গে যাইবেন। পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবামাত্র তুমি শাপ হইতে প্রমুক্ত হইয়া পুনরায় স্বস্থানে আগমন করিবে।" এই সাবিত্রী সত্যবান্ পত্নী নন। এই সাবিত্রী, সূর্য্যের দুহিতা। সরস্বতী দণ্ডকবিপিনে বিন্ধ্যাচলের সন্নিকটে শোণনদের পশ্চিম তীরে অবস্থান করিলেন। শোণকে কেহ কেহ 'নদ' বলেন। উহা ভাগীরথীর এক উপনদী। কালক্রমে চ্যবনাত্মজ দধীচের প্রতি সরস্বতী, প্রীতিমতী হইলেন। এই দধীচ, পরোপকারক দধীচ নন। যে দধীচ, দেবগণের উপকার জন্য তৃণবৎ নিজ কলেবরপাত করিয়াছিলেন, তিনি ও এই দধীচে সম্পূর্ণ পার্থক্য। উভয়ের সংযোগে এক সুকুমার কুমার জন্মিলেন। সরস্বতীর বরে তাঁহার স্মৃতিশাস্ত্রে অসামান্য অধিকার হইল। সারস্বত পুত্র জন্মিলেন। এইবার সাবিত্রীর সঙ্গে সরস্বতী দেবলোকে গমন করিলেন। এদিকে দধীচ, স্বীয় সহোদরপত্নী অক্ষমালিকার সমীপে সন্তানের শিক্ষাভার সমর্পণ পূর্ব্বক তপস্যার নিমিত্ত বিপিনবিহারী হইলেন। প্রায় এই সময়েই অক্ষমালিকার এক সুত প্রসূত হন। তাঁহার নাম বৎস। বৎসের পিতৃনাম এখনও পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে পারিলাম না, ইহা হইতে ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে! অক্ষমালিকা আপন সন্তান বৎস ও দেবর-কুমার সারস্বতকে তুল্য স্নেহ-মমতার অধিকারী করিয়াছিলেন।

৩ কবি, ৪ শুক্রাচার্য্য।

ভৃগুর দুই পুত্র, কবি ও চ্যবন। চ্যবনের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন অগ্রে না করিয়া প্রথমতঃ কবির বিষয় সমাপ্ত করা যাউক। শুক্র, কবির সন্ততি, মতান্তরে শুক্রাচার্য্যই নিজে কবি। "কবি" তাবৎ কাব্যকারেরই উপাধি হইতে পারে। শুক্র, নিজে কবিতাকার, এজন্য তিনি কবি। শুক্র দৈত্যগুরু। তাঁহার "আচার্য্য" উপাধিতে অনেক প্রাচীন তত্ত্ব প্রচারিত করিতেছে।

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥

যে দ্বিজ, শিষ্যদিগকে উপনয়ন সংস্কার দিয়া কল্প ও রহস্যের সহিত বেদ অধ্যাপন করেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলা যায়।

শুক্র ও অসুরকুলের বেদোপদেষ্টা, অতএব তাঁহার আচার্য্য উপাধি হইয়াছিল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

বিধবার সুখ।

কে বলেরে বিধবার জীবন অসার?
অভাগ্য তাদের মত নাহি কারো আর,
কে বলে বিধবা প্রাণ, জলন্ত শ্মশান সম,
নিরাশা অনল তথা দহে অনিবার?

বিধবার লাগি কেন কাঁদে গো সকলে,
কেহ বলে ছিঁড়ে ফুল ফেলেছে অনলে,
কেহ বলে এ জীবন, গেল সুধু অকারণ,
কেহ বলে তাহাদের সব গেছে চলে।

বিধবার কত সুখ কে বুঝিবে হায়,
কেমনে বুঝাব তাহা, বুঝান কি যায়?
না বুঝে অবোধ নরে, বৃথা দুখ ভেবে মরে,
বৃথা তাহাদের তরে করে হায় হায়।

বিধবার কত সুখ কে বুঝিবে হায়!
কত তুচ্ছ সুখ লুটে কাঁদে তার পায়।
কত না তরল হাসি, চপল প্রমোদ রাশি,
চরণের তল দিয়া বহে চলে যায়।

কে বলে রে বিধবার জীবন অসার,
কে বলে বিধবা প্রাণ সুধু অন্ধকার,
চলিতে জীবন পথে, সদা যেন সাথে সাথে,
অলক্ষ্যে দেবতা এক ফিরে অনিবার।

কে যেন স্নেহের ভরে ধরে থাকে হাত,
দেখাইয়া দেয় সদা সুপথ কুপথ,
ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হ'লে, অমনি ধরিয়া তুলে,
সদা যেন জাগে প্রাণে দেব আশীর্ব্বাদ।

স্বরগের সিংহাসন বিধবা হৃদয়,
সদাই আরাধ্য দেব বিরাজে তথায়,
পূত মন্দাকিনী বারি, আঁখি হতে পড়ে ঝরি,
মানসে সে দেব পদ ধোয়াইয়া দেয়।

ভক্তির চন্দনে মাখা প্রেমের কুসুমে,
মনোমত সাজাইয়া সে দুটি চরণে,
যতেক প্রাণের ব্যথা, যতেক মনের কথা,
সমর্পিয়া কত সুখী হয় মনে মনে?

অটল পর্ব্বত সম বিধবা হৃদয়,
কে যেন সদাই প্রাণে শক্তি ঢেলে দেয়,
কর্ত্তব্য আদেশ করে, "সম্মুখে অনল জ্বলে,
ঝাঁপ দিয়া পড় তাহে করিও না ভয়।"

মুহূর্ত্তের তরে যদি কাঁপে ক্ষীণ প্রাণ,
নিমেষে অমনি সব হয় অন্তর্ধান!
চাহে সে অনল মাঝে, কে যেন গো হাসিতেছে,
কে যেন ডাকিছে দিতে প্রীতি শান্তিদান।

সে যেন গো জীবনের দেবতা তাহার,
আশঙ্কা সঙ্কোচ প্রাণে থাকে কিগো আর?
অমনি ভীম অনল, হয়ে যায় ফুলদল,
হাসিয়া তাহার মাঝে হয় অগ্রসর।

শত বাধা শত বিঘ্ন রয়েছে ঘেরিয়া,
নয়ন সে ঊর্দ্ধপানে রয়েছে চাহিয়া,
মাথার উপরে ধীরে, অঙ্গুলী সঙ্কেত করে,
কে যেন দিতেছে সদা পথ দেখাইয়া।

যত কর্ত্তব্যের পথে হয় অগ্রসর,
তত যেন জাগে প্রাণে হাসিমুখ কার,
শত ঝটিকায় তাই, মুহূর্ত্ত ভ্রূক্ষেপ নাই,
সেই হাসি জীবনের এক পুরস্কার।

শত পরীক্ষার এই মহাক্ষেত্র ভবে,
(যদি) সকলে মুছিবে অশ্রু কে মুছাবে তবে?
সে অশ্রু মাখিয়া অঙ্গে, রোগী তাপী দুখী সঙ্গে
দুজন না রবে যদি কিসে শিক্ষা হবে?

তাই ইচ্ছাময় ইচ্ছা সাধন করিতে,
অনন্ত মিলনে ক্ষুদ্র মিলন বাঁধিতে,
পৃথিবীর জ্ঞান পারে, তাই বুঝি যায় সরে,
পবিত্র হইতে আর পবিত্র করিতে।

তাই প্রাণে নাহি আর বাসনা বিলাস,
তাই সদা বহে সেথা স্বর্গের বাতাস,
কোন মহাব্রত দিয়ে, দেবতা গিয়েছে কয়ে.
ব্রতশেষে শীঘ্রগতি যেও মোর পাশ।

সেই লক্ষ্য ধরে বহে বিধবা জীবন,
নীরব নিথর নাহি কোন আন্দোলন,
সংসার তরঙ্গ ভরে, আর না সে হেলে পড়ে,
সেই স্বরগের সূত্রে বাঁধা আছে মন।

নিজ স্বার্থ সঙ্কীর্ণতা গিয়াছে ঘুচিয়া,
মিশিয়াছে ক্ষুদ্র নদী সাগরে আসিয়া,
আপনার তুচ্ছ প্রাণ, জগতে করিয়া দান,
কি স্বর্গীয় সুখ প্রাণে যেতেছে বহিয়া।

অহংজ্ঞান গেছে কোথা বিলুপ্ত হইয়া,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সেথা পড়েছে আসিয়া,
দেখিতে বিশ্বের দুখ, চাহিতে বিশ্বের মুখ,
আপনার সুখ দুঃখ গিয়াছে ভাসিয়া।

পবিত্র বেশেতে শোভে পবিত্র জীবন,
মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা করে বিচরণ,
দুখী অশ্রু মুছাইতে, শোকের সান্ত্বনা দিতে,
নিষ্কাম সন্ন্যাস ব্রত করিতে পালন!

সংসার হইতে কত দূরে তাঁর ঠাঁই,
সংসার মাঝারে তবু আছেন সদাই,
সংসার সাগর মথি, উঠিতেছে নিরবধি,
যেই হলাহল আর সুধাপাত্র যেই।

সেই সুধা বাটি অগ্রে দেন সবাকারে,
যত দূর সাধ্য আছে তত দূর করে,
পরে যত হলাহল, যত দুঃখ অমঙ্গল,
নীলকণ্ঠ সম রাখে নিজ কণ্ঠে ধরে।

কি গভীর যোগে মগ্ন বিধবা জীবন,
একই তাঁহার কাছে উদ্যান শ্মশান,
দেহ জগতের কাছে. নিয়োজিত রহিয়াছে,
মুক্ত ভাবে আত্মা করে স্বর্গে বিচরণ।

কে বলে রে বিধবার জীবন অসার?
সংসার ছুঁইবে তাঁরে কি সাধ্য তাহার।
এযে তুচ্ছ হতে তুচ্ছ, সে সুখ যে অতি উচ্চ,
সেই সুখে মগ্ন সদা জীবন তাহার।

কেন বিধবার তরে এত হাহাকার,
কে বলে বিধবা প্রাণ সুধু অন্ধকার?
না বুঝে অবোধ নরে, বৃথা দুঃখ ভেবে মরে,
মিছে বিধবার তরে ফেলে অশ্রুধার।

শ্রীসুশীলা সুন্দরী দাসী।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩৫৪। স্থান, কাল, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গ্রন্থ নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মসাধন করা ব্রাহ্মের একটী বীজ মন্ত্র। যতই ঐ মন্ত্র সাধন, ততই তাহার হৃদয় ও মনের উদারতা, প্রশস্ততা, ব্যাপকতা, বল ও পবিত্রতার বৃদ্ধি। আর যেমন ঐ উচ্চ আদর্শ হইতে পদস্খলন, অমনি অধঃপতন। যতই ঐ মন্ত্রের অন্যথাচরণ হইবে, ততই ক্ষুদ্রতা, হীনতা ও ক্ষীণতা অল্পে অল্পে তাহার অগোচরে তাহার জীবনকে কলঙ্কিত ও দূষিত করিবে। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মের সমস্ত জীবনের সমস্ত কার্য্য ঐ মন্ত্রানুসারে পরিচালিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যকীয়।

৩৫৫। সচ্চিন্তার স্রোত বহনের পরক্ষণেই কুচিন্তার উদয়! কেন এমন হয়? তোমার ধর্ম্মাভিমান বিনাশের জন্য। অহো! কুচিন্তার উদয়েও মঙ্গল স্বরূপের প্রকাশ! হা মঙ্গলময়! মানুষ তোমার মঙ্গলের গূঢ় ভাব কি বুঝিবে!

৩৫৬। গুরুজনের সঙ্গে সমাসীন হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করা ভদ্রতা ও বিনয় বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া ভক্ত তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। তিনি তাঁহাদিগের উপদেশাদি যাচ্ঞা ও কোন সন্দেহ নিরসন জন্য তাঁহাদিগের নিকট আপন বক্তব্য বিনীতভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি আপনাকে সদা অযোগ্য মনে করিয়া সকলের সহিত বিনয় ও প্রেম সহকারে ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। তিনি ঔদ্ধত্যের পথে পদচারণা করা নিতান্ত অধর্ম্মাচরণ বলিয়া জানেন।

৩৫৭। ভক্তের মন সদাই এত নম্র ও প্রেমভরে অবনত যে, তিনি সকল মনুষ্যে ন্যূনাধিক ব্রহ্মতেজ দর্শন ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। তিনি যাঁহার মান নাই, তাঁহাকেও মান দানে আপনাকেই সম্মানিত করিতে সমর্থ হন।

৩৫৮। ভক্তই ভক্তকে চিনিতে পারেন। তিনি পর হইলেও তাহার আপনার হন। আর যাহারা রক্ত সম্বন্ধে তাঁহার আপনার, তাহারা অভক্ত হইলে পর হইয়া যায়। ভক্তির কি আশ্চর্য্য শক্তি! আমরা এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাসের অধীন হইলেই পরস্পরকে আপনার বলিয়া দেখি।

৩৫৯। প্রেমাভিষিক্ত জ্ঞানের অভাবজনিত যতই হৃদয় ও মনের সঙ্কীর্ণতা, ততই অপ্রেম, ধর্ম্মবিদ্যাদির অভিমান ও ভেদাভেদ জ্ঞান।

৩৬০। বড় বড় বিষয় ও বড় বড় ভাব পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া অপেক্ষা চিন্তাযোগে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে অধিকতর আত্মোন্নতি হয়।

৩৬১। পরসেবা বিনা ভক্তি হয় না। ভক্তি বিনা পরসেবা চলেনা। যে পরসেবক হইল না, তাহার জীবন বৃথা।

৩৬২। যাহার হৃদয় মন যত প্রশস্ত, সে তত পরের মঙ্গল চায়। আর যাহার হৃদয় মন যত সঙ্কীর্ণ, সে তত আপনার সুখান্বেষণ করে। ধর্ম্মসাধনেও এ নিয়ম প্রকাশিত হয়। নিত্য, বিশুদ্ধ ও উদারপ্রেম বিনা এ সঙ্কীর্ণতা নিবারণ করিবার উপায়ান্তর নাই।

৩৬৩। মানুষ আপনার ভিতর দিয়া সকলকে পর দেখে ও প্রেমময়ের প্রেমের জ্যোতিতে সকলকে আপনার দেখে। "প্রেমিকের নাইক কেহ আত্মপর"।

৩৬৪। কাহারও বহুদিনের বিশ্বাসে আঘাত না করিয়া যিনি সদুপদেশাদি দ্বারা তাহার জীবনকে উন্নত ও পবিত্র করিতে পারেন, তিনিই জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, তিনিই যথার্থ মঙ্গলসাধনে সমর্থ, তিনিই গুরুসম সম্মান পাইবার যোগ্য।

৩৬৫। প্রার্থনাই প্রার্থনা করিবার ফল। যতই প্রার্থনা, ততই ফল।

৩৬৬। যে ভাবে ও যে রূপে ভক্তবৎসল ভগবানকে ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকেন, তিনি তাঁহার কাতর প্রাণে তদনুরূপ দর্শন দেন। যতই ব্যাকুলতা, ততই দর্শন লাভ। যতই দর্শনভোগ, ততই প্রেম, পবিত্রতা, শান্তি, শিক্ষা ও আনন্দলাভ।

৩৬৭। প্রেমের ভাষা "আমার," "তোমার" নহে। আমার বাড়ী, আমার গাড়ি, আমার গহনা, আমার টাকা, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বিদ্যা, আমার ধর্ম্ম, তোমার রোগ, পাপ, তোমার শোক, তাপ, তোমার দুঃখ ক্লেশ, তোমার মূর্খতা এই সকল স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রাশয়তার কথা প্রেম জানে না। পরসুখে সুখী ও পর-দুঃখে দুঃখী হওয়াই প্রেমের স্বভাব। সেই-জন্য প্রেমের ভাষা "আমাদের"—"আমার তোমার" নহে।

৩৬৮। পরদোষ চিন্তনে মন গ্লানিযুক্ত হয়। পর-মঙ্গল কামনায় অনেক সুখানুভব হয়।

৩৬৯। পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বর সমীপে যাহা ব্যক্ত করি, তাহাই প্রধানতঃ প্রার্থনা বলিয়া পরিগণিত হয়। স্তব, স্তুতি, প্রার্থনার অঙ্গ।

৩৭০। ব্যাকুলতা আত্মার অপরিস্ফুট ভাষা।

৩৭১। আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ বিশ্বাস ঈশ্বর-জ্ঞান-লাভের পত্তন ভূমি। প্রত্যাদেশে (দৈববাণী) সেই জ্ঞানের পরিপক্কতার শেষ উপায়। মানুষ তোমার জ্ঞানালোক বিনা তোমায় দেখিতে পায় না। তোমার জ্ঞান বিনা তাহার জ্ঞানের তৃপ্তি হয় না"। "তোমারই জ্ঞানালোকে সে জ্ঞানের চরম ফলরূপ তব দর্শন সুখে সুখী হয়"।

৩৭২। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সরল বিশ্বাসী ও নিষ্কাম কর্ম্মীরা ঈশ্বরকে খণ্ড খণ্ড রূপে গ্রহণ করে। তাহারা অজ্ঞাতসারে অখণ্ড ঈশ্বর-গ্রহণকারী ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষকতা আংশিকরূপে করিতেছে।

৩৭৩। দৈনিক নির্জ্জন ব্রহ্মোপাসনা বিনা সাময়িক সজনব্রহ্মোপাসনা করিবার যোগ্যতা লাভ হয় না।

৩৭৪। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ হইয়াও যিনি কনিষ্ঠদিগকে বলিতে পারেন যে, "তোমরা আমাপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও পবিত্রমনা হইলে আমি এত আনন্দিত হইব যে, আর কিছুতেই আমাকে সেরূপ আনন্দিত করিতে পারিবে না," তিনিই যথার্থ প্রেমিক।

৩৭৫। নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরাদেশ পালনোদ্দেশে পরসেবা করিবার নিমিত্তই ধন, মান ও যৌবন; ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নহে। ইন্দ্রিয়সুখ পশুজীবনের ভোগ্য।

৩৭৬। পশুজীবনাধীন হওয়াই নরক-

বাস। আর দেব ভাবের প্রাধান্যই স্বর্গ-ভোগ।

৩৭৭। আমরা যতদিন না বাহিরের বস্তু হইতে অন্তরের নিত্য পদার্থে মন, প্রাণকে লইয়া যাইবার অভ্যাস করিতে পারি, ততদিন আমরা ঈশ্বরের পবিত্র দর্শন ও সহবাস ভোগে বঞ্চিত হইয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক জীবনের পবিত্রতা ও উন্নতি-সাধনে অক্ষম হই। "তিনি অন্তরের ধন, রাখিতে হয় অন্তরে"।

৩৭৮। একমাত্র ঈশ্বরই পুরুষ, আর সমস্ত সৃষ্টি প্রকৃতি। সেই পুরুষই ভক্তনাথ আর অসংখ্য নির্জ্জীব ও সজীব পদার্থ সকল ভক্ত। তাহারা নিরন্তর তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

৩৭৯। সহিষ্ণুতাই ধর্ম্মের দ্বার স্বরূপ। সহিষ্ণুতাই ধর্ম্মাচরণের ভিত্তিভূমি। সহিষ্ণুতা বিনা ধর্ম্মসাধন হয় না। সহিষ্ণুতাই ইহজীবনের আদরণীয় ভোগ্য। সহিষ্ণুতাই আত্মার বল। যাহার সহগুণ যতবেশী, সে ধর্ম্মাচরণে তত অধিক সমর্থ। আগে হও সহিষ্ণু, তবে পাবে ধর্ম্ম।

৩৮০। অদৃশ্য পরকাল সম্বন্ধে যে সকল সত্য সেই একমাত্র সত্যরূপের নিকট হইতে পাওয়া যায়, তাহাই বিশ্বাস, নির্ভর ও গ্রহণ যোগ্য। যাহা তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যায় না, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক ও পাপের কারণ বলিয়া অগ্রাহ্য ও পরিহার্য্য।

৩৮১। চিরোন্নতিই মানবাত্মার নিয়তি। তাহাই তাহার জীবন ও বল। যতই উন্নতি, ততই তাঁহার প্রণতি মঙ্গলময়ের মঙ্গলপূর্ণ চরণে। যাহা কিছু এই নিত্যোন্নতির বিঘ্নকারী, তাহাই পাপ ও পতনের কারণ। পাপ ও পতন অচিরস্থায়ী। তাহাদিগের বিনাশ নিশ্চয়ই হইবে।

৩৮২। আমাদিগের প্রত্যেক পুণ্য অথবা সৎক্রিয়ায় আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, ও আত্মার সুস্থতা ও বল বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ আমাদিগের প্রত্যেক পাপ কিম্বা অসৎ-ক্রিয়ার আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় ও আত্মার রোগ হইয়া তদীয় বলক্ষয় হয়। এইরূপেই আমরা পাপ পুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার ভোগ করি।

কানাইলাল পাইন।

মেঘদূত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"প্রবেশি অবন্তী, যথা বৃদ্ধগণ
বৎসরাজ কথা জানে সকলে,
বিশালা-নগরী করহে গমন
অতুল-সম্পদ জগতী-তলে ;—
ফুরাইলে প্রায় স্বর্গে পুণ্যফল,
আগমন কালে মরত'পরি,
শেষ পুণ্যে সাধু যেন বা উজল
ত্রিদিবের খণ্ড এনেছে হরি! ৩১

"সানন্দ-কাকলি সারস-কূজন
করি পুষ্ট-তর মধুরতায়,
ঊষার প্রফুল্ল কমল-কানন
পরিমল মাখি সুরভি-কায়,
রমণীর তনু জড়ায়ে আদরে,
সুখ শিপ্রাবাত খেলিছে যথা,—
যেন প্রিয়তম সোহাগের ভরে!—
জুড়ায়ে রজনী-বিলাস ব্যথা! ৩২

"বাতায়ন-শ্রুত কেশ-সংস্কার—
ধূমে পুষ্ট করি কুশিত দেহে,
হরষ-নর্ত্তন,—সাদরোপহার—
পোষা ময়ূরের গ্রহিয়া স্নেহে,
শ্রম-দূর-তরে গৃহ-চূড়ে পশে,'
ফুলবাসে ভরা নেহার ঘরে
রাঙ্গা দাগ চারু-চরণ-পরশে,—
দেখ কি সৌভাগ্য উজ্জীন ধরে! ৩৩

"দেব চণ্ডীশ্বর পবিত্র মন্দির
যাও তার পর হরষ-মন,
হর কণ্ঠনীল তোমার শরীর
হেরিবে সাদরে প্রমথ-গণ,
যেথা, কেলিরত গন্ধবতী জলে
যুবতী অঙ্গের সৌরভ হরি,
বহে বায়ু লুটি পদ্ম-পরিমলে,
উদ্যান-লতায় কাঁপায়ে ধীরি। ৩৪

"যাবত না ভানু ছাড়ায়ে নয়ন
অস্তগিরি পাশে লুকায়ে যায়,
সে কাল অবধি রহিত, হে ঘন,
মহাকালধামে, কহি তোমায়;
সন্ধ্যাপূজাকালে দেব পিনাকীর,
সুমন্দ্র মন্দ্রনে দামামা-ধ্বনি
করি, ধন্য করো গর্জ্জন গভীর,
কৃতকৃতার্থ আপনা গণি। ৩৫

"লীলারাগরঙ্গে চরণ-ক্ষেপণে
নিতম্বে শিঞ্জিত রসনা-ভার,
মণিময়দণ্ড চামর চালনে
উপজিত শ্রম বাহুলতার,—
বারনারিগণ শ্রম খেদহারী
নব জলকণা তোমার পেয়ে,
ভ্রমরের শ্রেণী কটাক্ষে বিথারি,
হানিবে অপাঙ্গ তোমায় চেয়ে। ৩৬

"উচ্চ শাখাতরু কানন ছাইয়ে,
মণ্ডল-আকারে ছড়ায়ে কায়,
সান্ধ্য নবজবাকিরণ মাখিয়ে
রুধিরার্দ্র গজ-অজিন-প্রায়
ভাতিলে, জলদ, বিরাট নটনে
গণিবেন শূলী ভ্রমেতে তোমা
গজাসুরচর্ম্ম;—প্রসন্ন নয়নে
দেখিবেন তব ভকতি উমা। ৩৭

"নিশিতে যখন প্রেম-উন্মাদিনী
যেতেছে রমণী প্রিয়ের পাশে,—
ধরণীর মুখ ঢেকেছে যামিনী
সূচিভেদ্য ঘোর তিমির-বাসে,—
নিকষে কনক-রেখার মতন
মৃদু দামিনীতে দেখায়ো ধরা,
ঢেলোনাক বারি, করোনা গর্জ্জন,—
তারা যে অবলা, ভয়ে কাতরা! ৩৮

"ভবন-শিখরে, ঘুমায় যেথায়
কপোত কপোতী মুখেতে মুখে,
যাপিও যামিনী, বিলাস-খেলায়
ক্ষীণ ক্ষণপ্রভা ধরিয়ে বুকে;
প্রভাত-গগনে উদিলে তপন,
শেষ পথটুকু গমন কর,—
নাহি অবহেলে, বিলম্বে কখন
সুহৃদের কাছে সুহৃদবর।" ৩৯

"প্রণয়ী তখন নয়নের বারি
মুছে খণ্ডিতার আদরে কত,
বলিতেছি, তাই, সাবধান করি,
ছেড়ে দিও ত্বরা রবির পথ;—
এসেছে মুছাতে নলিনী-নয়নে
নীহারাশ্রুভার—প্রেমের দায়!—
কনক আঙুলে পরশি যতনে;—
রুষিবে প্রচণ্ড রোধিলে তায়।" ৪০

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

"রামনাম সত্যহয়।"

"যব দম্ গুজরা দুনিয়া গুজরি
কহো হাল্ ইয়ে দম্ পরি কেয়া গুজরা।
ওয়াজদালি সাহ।"

মোটামুটী সাধারণ সাংসারিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, এই জরামরণ-সঙ্কুল দেহ ভিন্ন আমাদের নিজের বলিবার খাস কোন সম্পত্তি এ পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সম্পত্তি এই জড়তনুর দশা "কখন্ আছি, কখন্ যেতে হয় মা তারা।" তবে কি এত কাণ্ডকারখানা এই নশ্বর শরীরেরই জন্য? আমি বলিতে কি এই শরীর ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না? কৈ তা'ত নয়। যদিও একপক্ষে আমার ঘর, আমার বাড়ী, আমার ধন, আমার দৌলত, বলিতে যে "আমি" বুঝায়, তাহা জড় ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না, কারণ জড়-বিভব কেবলমাত্র জড়েরই অধিকারে থাকা সম্ভব, অপরপক্ষে আমার প্রেম, আমার পুণ্য, আমার প্রীতি প্রভৃতি জড়াতীত সম্পত্তি প্রকাশ করিবার সময় আমাকেও জড়াতীত বলিয়া স্থির করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক হিসাবে দেখিতে গেলেও বেশ টের পাওয়া যায়, বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার "আমি" ও এখনকার "আমি" একই "আমি" অথচ সাত বৎসর পূর্ব্বের জড়দেহের উপকরণ সামগ্রীর মধ্যে একতিলও বর্ত্তমান শরীরে খুজিয়া পাওয়া যায় না। এইরূপ নানা অখণ্ডনীয় প্রমাণ দ্বারা ধ্রুব-নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, চর্ম্মচক্ষুতে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, "আমি" দুইটী ভিন্ন জিনিস। শেষোক্ত অবর্ণনীয় 'আমি' আসল ও প্রথমোক্ত সাধের ধন, সোহাগের তনুময় 'আমি' নকল, ছায়া, ভোজের বাজী মাত্র। যখন অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বারে ভেল্কি ছুটিবে, মোহান্ধকার ঘুচিবে, যে মহাদিনে ভবের বাজী ফুরাইয়া বাজীভোর হইবে, সেদিন এ যত্নের দেহ, আদরের ছবি, সখের পুতুল বায়ুতে মিশাইবার পথে অতিদ্রুত-বেগে ধাবমান হইবে—যেন বিশ্বের গায়ে শীঘ্র লুকাইতে পারিলে লজ্জা রক্ষা হয়;—আর প্রকৃত 'আমি' অজড় ভগবতী তনু চৈতন্যময় রাজ্যে চিরবিহার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিবে।

এখন দেখা যাইতেছে, মরণশীল শরীরের "আমি" অসার 'হাম্' কিছুই নয়; প্রকৃত আমির কিছুদিনের জন্য বাসামাত্র—গৃহস্থ ভিন্ন গৃহের কোনই মর্য্যাদা নাই। আসল "আমি" ইহ পরলোকে ভাবময় ভাগবতী সামগ্রী; জড়দেহান্তে শুদ্ধ ভাবই থাকিবে। শরীর ধ্বংসের সঙ্গে এ দুনিয়ার শেষ; তখন কেবল এইমাত্র জিজ্ঞাস্য বিষয় হইবে, "যতদিন জড়শরীরের অধিবাসী ছিলে, কি কি ভাব দ্বারা আপনাকে পুষ্ট করিয়াছ?" রাজা প্রজা, দুঃখী ধনী, মূর্খ জ্ঞানী আমাদের সকলেই এই হাল বাত্‌লাইতে হইবে, এই কৈফিয়ত যাহাতে সন্তোষজনকরূপে দিতে পারা যায়, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টাই সমীচীন। যাহা কিছু শরীরসম্বন্ধীয়, তাহা সাময়িক মর্ত্ত্য, এবং যাহা কিছু আধ্যাত্মিক, তাহা অবিনশ্বর ঐশী, জানিয়া প্রত্যে-কের উপযোগিতানুসারে উভয়ের প্রতি

যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়াই চতুরের কাজ।

আর একদিকে সমগ্র জগৎ হরিময় দেখিতে শিখিলে সকল গোল মিটিয়া যায়। হরিনামই সত্য, আর সব পরিবর্ত্তনশীল, এখন আছে তখন নাই, সুতরাং নাশাধীন। মোহাতীত দৃষ্টিতে বেশ দেখা যায়, সমগ্র বিশ্ব হরি লীলাময়, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার তাঁহার এক এক সময়ের খেলা মাত্র। আমাদের আচার্য্য গাইয়াছেন।

"হরিরেব জগৎ, জগদেব হরিঃ।
হরিতো জগৎ নহি ভিন্ন তনু॥
ইতি যস্যমতিঃ পরমার্থ গতিঃ।
সো নরঃ ভবসাগরমুত্তরতি॥"

ইউরোপীয় দার্শনিকও বলেন ;—

"If God is present in all His works, and interested in them, is it reasonable to suppose that He is inactive in the midst of them? Are all His other perfections to be exercised, and His omnipotence to have no room for exertion? As far as we can reason on a theme which is so transcendental in its nature, it seems highly improbable that God should have so constituted everything as to leave no room for his own continued action. As He fills universal space, and can never cease to love His own work, it is reasonable to think that He pervades the universe as an active agent. It may be difficult to determine the precise nature of His action; but with no experience of a world without an indwelling God, we are inclined to regard his indwelling in the actual world as essential to its continued existence and operation."

McCosh.

পূর্ব্ব পশ্চিমের একমত, কাহারও আপত্তির কোন কারণ নাই। কিন্তু শুধু কলমে লিখিলে, মুখে বলিলে বা কাণে শুনিলে চলিবে না ; বাস্তবিক প্রেমের সহিত হৃদ্গত করিতে হইবে। যীশুশিষ্য প্রেমিক ভক্ত পল্ বলিয়াছেন ;—

"Though I speak with the tongues of men and angels and have not Love, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal." *Cor. XIII.*

প্রেম বলহীন শুষ্কবাক্য কেবল মাত্র কাঁসর ঘণ্টার শব্দের ন্যায়। অতএব প্রেমে পাগল হইয়া গগন মেদিনী কাঁপাইয়া উচ্চৈস্বরে।

একবার হরি হরি হরি বল্ মন বদন ভ'রে।
হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে ভবসংসারে॥
একবার হরি হরি হরি বল্ মন হৃদয় ভ'রে॥॥

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

জগৎবিভাগ

(Schiller এর Division of Earth এর অনুবাদ।)

একদা বৈকুণ্ঠে বসি কহিলেন হরি,
"মানব সন্তানগণ দিতেছি জগৎ ;
"ভাই ভাই সবেমিলে লও ভাগ করি,
"থাক সুখে চিরদিন লভিয়ে সম্পদ্"
লভিতে যে যার অংশ, আজ্ঞা অনুসরি,
বালবৃদ্ধ সকলেই হইল তৎপর।
নিল ভূমি, বন, খনি, ব্যোম আদি করি,
সাগর পর্ব্বত নিল, নদ নদী সরঃ ;
নিল সব, জগতের ভাগ হল শেষ।
যে যথায় আধিপত্য করিল বিস্তার।
হেনকালে কবি সেথা করিয়া প্রবেশ,
দেখিল কিছুই নাই অবশিষ্ট আর।
"আমি সর্ব্বাধিক প্রিয় জগতে তোমার,
আমারে ভুলিলে হরি ?" কহি মনে মনে,

ফিরিয়া বৈকুণ্ঠে কবি দিল সমাচার,
"বঞ্চিত হয়েছি আমি জগতের ধনে!"
"তুমি কবি, স্বপ্নরাজ্যে কর বিচরণ;
ভুলেছিলে ধন-রত্ন কি করিব আমি?"
বলিয়া উত্তর হরি করিলা তখন।
কবি কহে, "শুন, শুন, হে জগত স্বামি,
"আমিতো তোমারি পাশে ছিনু দাঁড়াইয়া,
"চক্ষু মোর বদ্ধছিল ওরূপ দর্শনে;
"স্বর্গের সঙ্গীতে কর্ণ গেছিল মোহিয়া,
"তাইতো হারায়ে কাল, হারাইনু ধনে।"
"ওহে কবি, কি করিব?" কহিলেন হরি,
"জগৎ বিভাগ করি লয়েছে তো সবে।
"হেরি স্বর্গ যদি পৃথ্বী গেছিলে বিস্মরি,
"বৈকুণ্ঠে করিয়া বাস দেখ মোরে তবে।
"অন্য ধন রত্ন মোর আর কিছু নাই"
কবি কহে, "তাই ভাল, ঘুচিল বালাই!"

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ফুলরেণু।

কে বড়?

যে অঙ্গে যেখানে চাই সরলা তোমার,
কি জানি কি লাবণ্যের শুভ সুপ্রভাত!
কি জানি কি মোহ মূর্চ্ছা কি জানি কি আর,
আনন্দে আবেশে কারে করি প্রণিপাত!
চেতনা থাকেনা দেহে তবু থাকে জ্ঞান,
তন্ময় হইয়ে শুধু বুঝিতে না পারি,
আছে ও সৌন্দর্য্যে যেই শক্তি বিদ্যমান,
পুষ্পিত যৌবনে জ্যোতি তোমারি কি তারি!
মহত্ত্ব সৌন্দর্য্য আর সারল্য বিনয়,
একত্রে করিছে কিবা স্পর্দ্ধা মনোহর,
কার অই স্নেহ দয়া মমতা প্রণয়,
ঢেলে দেয় নীলনেত্র রক্ত ওষ্ঠাধর?
রূপে গুণে এত মুগ্ধ করিয়াছ নারি,
তুমি কি ঈশ্বর বড় বুঝিতে না পারি!

রমণী।

লাবণ্যের পূর্ণচন্দ্র, বিলাসের খনি,
নব রসে পরিপূর্ণ বসন্তের ফুল,
কামনা কালিন্দী জলে কাঞ্চন তরণী,
যৌবন বসন্ত বায়ু বহে অনুকূল!
তুমি কি পাপের মূর্ত্তি কহলো রমণি,
পরাণে পরশে পাপ চাহিলে তোমায়?
ছি, ছি, ছি! তুমি লো নাকি বিষধর ফণী,
কিসে বলে পোড়া লোকে বুঝা নাহি যায়!
কমল নয়নে তব কমল অধরে,
অপূর্ব্ব আনন্দ জ্যোতি সদা ঝরে তাঁর,
তাঁহারি মহিমা তব স্ফীত বক্ষোপরে,
রহিয়াছে পুঞ্জীকৃত পর্ব্বত আকার!
তাঁহারি পবিত্ররূপে তুমি রূপবতী,
যারা দেখে অপবিত্র তারা পাপমতি!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

মথুরায়।

(কালা) ঐ বাঁশরী বাজায়,
তোরা যদি যাস গো সখি(ত্বরা করে)আয় আয়;
বাজছে বাঁশী নাম ধরে,
কেমন করে রই গো ঘরে,
তোরা যে যাবি গো যাবি পরে,
রাধা এখন একা যায়।
প্রেমের ঝুলি কাঁদে করে,
ফিরছে কালা ঘরে ঘরে,
কেউ বুঝি নেই এ সংসারে,
এক বার তাহার মুখে চায়!
কুসুম ফুটে বনে বনে,
পাখী গায় পাখীর মনে,
ভ্রমরেরা মধু পানে,
মত্ত শুধু মদের নেশায়।

কেউ চাহেনা তাহার পানে,
কেউ না তারে ডেকে আনে,
তাই বুঝি গো ভাঙ্গা প্রাণে,
কেঁদে কালা ফিরে যায়!

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

আর কেন ?

এতকাল পরে আজি কেন সে পুরাণ ভাষ ?
নির্ব্বাণ প্রদীপ জ্বালা শুধু যে বাড়াতে আশ!
বাড়ায়ে প্রাণের আশ, অন্ধকূপে নিরাশার
নিক্ষেপি চলিয়া যাবে, ফিরেত চাবেনা আর!
প্রাণের দগধ-জালা জুড়াইব বলে ভাই,
তোদের শীতল ছায় বসিয়াছিলাম তাই।
কইসে শীতল হল ? অদৃষ্টের দোষে এই,
দারুণ অনল হয়ে আরো দগধিল সেই!
হৃদয় শ্মশান-পুরে অর্দ্ধদগ্ধ প্রাণলয়ে,
তোদের হইতে দূরে ভ্রমি অতি ভয়ে ভয়ে!
আমায় ডাকিলে কেহ আমি যে ডাকিনা তায়,
পাছে সেও উপেক্ষায় চরণে ঠেলিয়া যায়।
সংসারের দয়া মায়া তোমাদেরই থাক ভাই,
অনেক পেয়েছি তাহা আর তাহে সাধ নাই!
যে ক'দিন এ জীবন, সংসারের দূরে থাকি,
আপনি কাঁদিব আমি, আপনি মুছিব আঁখি!
হৃদয়ের ভাগাভাগি বড়ই যাতনা মাখা,
নিয়ে দিয়ে কিছুতেই (সে) যাতনা পড়েনা ঢাকা!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীগয়েবুল্লা।

বিগত ভাদ্রমাস হইতে একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত পত্রিকায় সম্পাদক, প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষের নাম ছিল, দেখিতেছি, হঠাৎ পৌষ সংখ্যায় সম্পাদকের নাম নাই, প্রকাশকের নামও পরিবর্ত্তিত। হঠাৎ পত্রিকার এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ সহজেই বুঝা যায়। ব্যক্তিগত ভাবে কাহাকে আক্রমণ করিতে হইলে ভীরুর যে সতর্কতার প্রয়োজন, ইহা সেই সতর্কতা। অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্য্যন্ত শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন, পৌষ সংখ্যায় তিনিই প্রকাশক হইয়াছেন। শুনিয়াছি, ইঁহার বাড়ী যশোহর, বঙ্গবাসী স্কুলের এণ্ট্রান্সক্লাসে পড়িতেন, দুই তিন বার চেষ্টা করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগৃহে প্রবেশাধিকার পান নাই। আর অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র সম্পাদক ছিলেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, এই যোগেশচন্দ্র সিটী কালেজের ফাষ্ট-ইয়ার-ক্লাসে পড়েন, ইঁহার বাড়ীও যশোহরে। এইরূপ লোকদ্বারা পত্রিকাখানি পরিচালিত।

বাঙ্গালা ভাষায় কোন নূতন পত্রিকা বাহির হইলে আমরা খুব আনন্দিত হই; ছাত্রমণ্ডলীকে সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ব্রতপরায়ণ দেখিলে সেই আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হয়। এই জন্য, আমরা এই পত্রিকার হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পৌষ মাসের পত্রিকায় "শ্রী" স্বাক্ষরিত কোন ব্যক্তি "নব্যভারত ও গোবিন্দচন্দ্র" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া অভদ্রোচিত ভাষায় গোবিন্দচন্দ্র ও আমাদিগকে গালাগালি দিয়াছেন এবং চাবুক মারিতে চাহিয়াছেন। এই প্রবন্ধ লইয়া ব্রাহ্ম-চেলামহলে কিছু আনন্দ-স্রোত চলিয়াছে। পত্রিকার পশ্চাতে কয়েকজন খ্যাতনামা

এবং অনেকগুলি অ-নামা বিনামা লেখকের নাম সংলগ্ন আছে,- তাহার মধ্যে অনেক ব্রাহ্মের নাম দেখা যায়। কোন ব্রাহ্ম-চেলা এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদের অনুমান। কেননা, এদেশে অন্য কোথাও মানুষকে"চাবুক মারার প্রথা" দেখা যায় না; "সভ্যতা বা সুরুচির এত আস্ফালন" অন্য কোথাও নাই; যাহার যে কথা বলা উচিত নয়, তাহা বলিয়া বাহাদুরী দেখানের ভাব অন্যত্র কদাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহাই হউক, লেখক যিনিই হউন, তাঁহাকে আমরা কাপুরুষ মনে করি; তিনি অজ্ঞাত সম্পাদকের মস্তকে অজ্ঞাত ভাবে উঠিয়া যে তীব্র খেউড় গাইয়াছেন, তাহার কোন মূল্য নাই। কেননা, অন্ধকারে ইষ্টক নিক্ষেপের ন্যায় গোপনে থাকিয়া যে অন্যকে অভদ্রোচিত ভাষায় আক্রমণ করে, যে অন্যকে চাবুক মারিতে চায়, সে ভীত কাপুরুষকে জগৎ দয়ার চক্ষে দেখে। গালাগালির বিরুদ্ধে গালাগালি যোজনা করা কিছুই কঠিন নয়। "নীচ যদি উচ্চভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"-- গালাগালি সম্বন্ধে আমাদের এই কথা। যতদিন তিনি নাম অপ্রকাশিত রাখিবেন, ততদিন তাঁহার অন্যান্য কথার উত্তর দেওয়াও অনাবশ্যক। জগৎ তাহার বিচার করিবে।

পত্রিকায় সম্পাদকের নাম নাই এবং এই প্রবন্ধ-লেখকেরও নাম নাই, ইহা গালাগালি দেওয়ার একটা জমাট সুবিধা বটে। সাহিত্যের বাজারটা এইরূপ গালাগালি-পরায়ণ হাম-বড়া জ্ঞানী, বিজ্ঞ, পণ্ডিত ও সুসভ্য (?) ব্যক্তিগণের লীলাস্থল হইয়া উঠিতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। এটা সাহিত্যের না হউক, "বিজ্ঞানের" উৎকৃষ্ট পরিচয় বটে! যাহার গালাগালি দিতে ইচ্ছা, আজকাল দেখি, সে-ই একখানি পত্রিকা বাহির করে। এরূপ পত্রিকা যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, সে সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, প্রতি বৎসর জলবুদ্বুদের ন্যায় "বহুপত্রিকা" এই রূপ উদয় হইয়া বৎসরের মধ্যেই লোপ পায়।

কি কারণে এই পাণ্ডিত্যাভিমানী "শ্রীগয়েবুল্লা" মহাশয় আমাদের প্রতি বিরক্ত, জানি না; তাঁহার কোন পুস্তক নব্যভারতে তীব্রভাবে সমালোচিত হইয়াছিল কি না, বুঝিবার উপায় নাই; পৌষ সংখ্যার অজ্ঞাত সম্পাদক ও "শ্রী" মহাশয় একব্যক্তি কিনা, তাহাও জানি না। আমরা ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, ইহাতে অনেক ব্রাহ্মই বিরক্ত। ইহা সেই বিরক্তির অভিব্যক্তি কি না, জানি না। আমরা আর কি কুকার্য্য করিয়াছি, বুঝিতে পারিতেছি না। গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা প্রকাশ করাই যদি এই কুকার্য্য হয়, তবে বলিতে পারি, এই কুকার্য্য করিতে সাধারণী ও নবজীবন-সম্পাদক, জন্মভূমি-সম্পাদক এবং সাহিত্য-সম্পাদক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ লালায়িত। এমন কি, এই পত্রিকার পূর্ব্ব-প্রকাশিত সম্পাদকও এই কুকার্য্যের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। এস্থলে, সম্পাদক মহাশয় কবি গোবিন্দচন্দ্রের নিকট যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"মান্যবরেষু— কলিকাতা, ২রা ডিসেম্বর।

" * * * " নামক একখানি মাসিক পত্র আপনাকে একখানা প্রেরিত হইল। এপর্য্যন্ত যাঁহারা ইহার লেখক হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম

শেষপৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। আপনি বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগী জানিয়া প্রার্থনা আপনার নামটী আমাদের লেখকশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু লিখিয়া উৎসাহিত করিবেন।

বশম্বদ—শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র,—সম্পাদক।"

গোবিন্দচন্দ্র নির্ব্বোধ, তাই এই পত্রের তিনি উত্তর দেন নাই এবং আপনার সহিত এই "মূর্খ" ও "অসভ্য"কে নব-সহযাগীর বিষনয়নে ফেলিয়াছেন।

উপরোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পর আমরা অনেক সহৃদয় ব্যক্তির পত্র এবং তিনটী প্রতিবাদ-প্রবন্ধ পাইয়াছি। প্রথম প্রবন্ধের নাম "নব্যভারত ও গোবিন্দচন্দ্র দাস ৮.৪. শ্রীমতী সুরুচি দেবী," লেখকের নাম শ্রীকালিদাস শর্ম্মা। দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম "নব্যভারত ও গোবিন্দচন্দ্র," লেখকের নাম শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী; এবং তৃতীয় প্রবন্ধের নাম "নব্যভারত ও গোবিন্দচন্দ্র"—লেখকের নাম শ্রীকিশোরী মোহন রায়। আমরা বন্ধুবর্গকে এবং এই সহৃদয় চিন্তাশীল লেখকগণকে বিনীত ভাবে জানাইতেছি, এরূপ অজ্ঞাত লেখকের কথার উত্তর দেওয়া অবিধেয়। নিজ নিজ মহলে গোপনে বসিয়া আমরা কত লাট মারি, কত লাট গড়ি, এমন কি,ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে উড়াইয়া দি, আর দিবা-রজনী কত লোকের যে নিন্দা করি, সংখ্যা নাই। এ হিংসার তীব্র উত্তেজনাময় প্রকৃতি সংশোধন করিতে স্বয়ং বিধাতা অক্ষম,আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,আমরাকোন্ ছার!! সাহিত্য-বাজারে এই গয়েবুল্লার এই নগণ্য পত্রিকার যে কয়দিন অন্নজল আছে, গ্রহণ করিতে দাও। অন্যকে যুক্তি-তর্ক-হীন ভাষায় যাহাদের গালাগালি দেওয়া ব্রত, তাহাদের সহিত কোন কথা সাজে কি?

এই প্রবন্ধ লেখা শেষ হওয়ার পর দেখিলাম, ৫ই মাঘের "চারুবার্ত্তা" এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের "জোনাকী" এই অনামা সম্পাদকের বিনামা লেখকের উচিত উত্তর দিয়াছেন। ইহা নিরপেক্ষ বিজ্ঞ সহযোগীদের একান্ত যোগ্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

নব্যভারত সম্পাদক।

প্রেমানন্দের কবিতাবলী।

বিশ্বরূপ—প্রেমরূপ। (৬)

প্রেমময় হে যেদিন তুমি,
প্রাণে দিলে দরশন,
জ্ঞানের চোকে আপন হাতে
মেখে দিলে প্রেমাঞ্জন,

সেদিন থেকে যেথানে যাই,
যথায় থাকি দিবানিশি,
জগন্ময় তোমায় দেখি,
রূপের সাগরে ভাসি;

কি অপরূপ রূপ যে তোমার
নয়ন মনে লেগেই আছে,
ব্রহ্মাণ্ডময় রূপের ছটা—
দশদিকেতে—আগে পাছে!

মুদে আঁখি যখন থাকি
দেখি সে ঘোর অন্ধকারে,

গভীর তোমার রূপের সাগর
আছে বিশ্ব গ্রাস করে!
আকাশে তোমার রূপ
অনন্ত নীলিমাময়,
নক্ষত্রে বিকীর্ণ আছে
রূপ তব জ্যোতির্ম্ময়;
কাননে তোমার রূপ
লতা পুষ্পে সুকোমল,
প্রান্তরে তোমার রূপ
ঢেকে আছে ধরাতল;
অনলে তোমার রূপ
দীপ্তিময় সমুজ্জ্বল,
সলিলে তোমার রূপ
শান্তিময় সুশীতল;
উৎসবে আনন্দালয়ে
রূপ তব জগন্মাত,
শ্মশানে সূতিকাগারে
রূপ তব জগদ্ধাত্রী;
সুস্বর শ্রবণে কিবা
সুগন্ধ নাসায় লাগে,
তোমার মধুর রূপ
অমনি অন্তরে জাগে;
তোমারি রূপের ছটা
শিশুর সরল হাসি,
তোমারি রূপের ছটা
যৌবনের রূপরাশি;
তোমারি রূপের ছটা
প্রবীণের বুদ্ধি জ্ঞান,
তব প্রেমে মুগ্ধ হয়ে
বিশ্ব করে প্রেম গান;
বিমোহিত মন আঁখি
হেরিরূপ অবিরাম,
প্রাণ রাজ্যে আছ তুমি
হয়ে মম প্রাণারাম;
বিশ্বরূপ প্রেমরূপ
তব রূপ সদাই দেখি,
প্রেমময় বলে ডাকি
প্রেমসাগরে ডুবে থাকি।

আগমনী। (৭)

আসন পেতেছি আমি
যতনে প্রাণের ঘরে,
প্রেমময়ী ষড়ভূজা
আসিবেন দয়া করে;
সুখের শরৎকালে
আমার হৃদয়াকাশে,
আশার নক্ষত্র মালা
মৃদু মৃদু মৃদু হাসে;
ফুটেছে কমল জলে
আর সেফালিকা বনে,
আগমনী প্রেমগীত
জাগিতেছে প্রাণে প্রাণে;
প্রেমময়ী ষড়ভূজা,
কি সুন্দর এ মূরতি
বদনে নয়নে খেলে
কিবা অনুপম প্রীতি!
জ্ঞানের দুখানি হাত
প্রেমের দুখানি,
ইচ্ছার দুখানি তেঁই
ষড়ভূজা সুররাণী;
কামরূপ ছাগবলি
দিব আমি রাঙাপায়,
ক্রোধ মহিষের সঙ্গে
এ মহা প্রেমপূজায়;
অহঙ্কার অসুরের
সমূলে হবে নিধন,
প্রাণরাজ্য হবে মম
সুখ শান্তি নিকেতন।

জ্ঞানভক্তি কর্ম্মশীলা,
এই ত্রিগুণ-ধারিণী,
অধমে তরাতে আহা
আসিবেন ত্রিনয়নী ;
তুনয়নে প্রেমপাশে
মোরে করিয়া বন্ধন,
ঊর্দ্ধ নয়নেতে করি
স্বর্গ পথ প্রদর্শন,

উন্নত পবিত্র লোকে
নিবেন দেবী আমায়,
পুণ্য স্রোত প্রবাহিত
নিয়ত আছে যথায় ;
এস এস প্রেমময়ী
আমার এই প্রাণাসনে,
তোমার পবিত্ররূপ
হেরি আমি প্রাণে প্রাণে।

দোকানদারী।

কে তুমি? প্রেমিক? দূরে যাও; এখানে তোমার স্থান হইবে না। তুমি এখনও ব্যবসায় শিখ নাই, বিজ্ঞাপনের উপর বিজ্ঞাপন লাগাইয়া ঝুটা জিনিষের উপর শতকরা নিরানব্বই লাভ করিতে শিখ নাই, সংসারে তোমার স্থান কোথায়? এখানে তোমার "কি জানি কি"র মূল্য নাই, তোমার ও দীর্ঘশ্বাসের মূল্য নাই, তোমার ও আকাশ পানে চেয়ে থাকার মূল্য নাই, তোমার ও প্রতি কথায় অশ্রু-জলের মূল্য নাই। তোমার ও আত্মহারা বিসর্জ্জন, অসহ্য প্রেম আরও কত কি ছাই— ঐ গুলি যদি জাহ্নবী সলিলে ডুবাইয়া আসিতে পার, তবে একটু স্থান হইতে পারে। কিন্তু সাবধান, শুধু তাহাতেই হইবে না; আরও কিছু চাই :—কয়েকটা প্যাটেণ্ট মার্ক চাই, আর কিছু দুন্দুভিধ্বনি চাই। আর যদি না পার, তবে যাও, তোমার ও নীরব মাধুরী লইয়া ধরার অতীত কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া তোমার "কি জানি কি" সুখে সুখী হও—কেহ তোমাকে খুঁজিবে না, তুমিও সংসারকে জ্বালাইও না।

বাস্তবিক এ সংসার পণ্যশালা। প্যাটেণ্ট করিতে না পারিলে, সত্য হউক মিথ্যা হউক, প্রশংসা পত্রের উপর প্রশংসা পত্র না চড়াইতে পারিলে তোমার জিনিষ বিকাইবে না। তোমার ঘরে ভাল জিনিষ আছে, লোকে আসিয়া খুঁজিয়া লইবে না। সংসারে গলাবাজী চাই। সাবধান না হলে তোমার এ ব্যবসায়ে লোকসান হইবে!

কাননে কি আর সুকণ্ঠ পাখী গাহে না? তবে কোকিল অত বড় কেন? তুমি যাহাই কেন বলনা, আমি বলিব, কোকিল বড়—গলা বাজীতে। কাননে ফুল আপনি ফুটিল, আপনি ঝড়িয়া গেল, গন্ধটুকু বাতাসে মিলাইল—কই কেহ ত খুঁজিল না, এ সুবাস কোথা হইতে আসিল!

এ সংসারে সূর্য্যমুখীর আদর সকলের কাছেই আছে, কিন্তু "কুন্দ কুসুম শুকাইল।" কুন্দ গলাবাজী শিখে নাই, কুন্দ কবিতা লিখিয়া উপহার দিবার প্রথা জানিত না, কুন্দ প্রেম-প্লাবিত কটাক্ষে চাহিতে পারে না, আদর করিয়া চাহিলে কিম্বা আদরে দুটা কথা বলিলে যে সে

কাঁদে। ঐ ক্ষুদ্র হৃদয় খানির ভিতরে কি লুকানো ছিল, সংসারে তাহা কেহ দেখিল না, সংসারের চক্ষে কুন্দ ভালবাসে না—কুন্দ মরিল!,,"গনেরিল" "রে গান" রাজ্য পাইল—আর অবাক্‌পটু "কর্ডেলিয়ার" জীবনের পরিসমাপ্তি মৃত "লিয়র" বক্ষে! "ওফেলিয়া" নীরব মাধুরীর প্রতিমূর্ত্তি, প্রেমের ভারও সহিতে পারে না; হায় বিধাত! এ নিষ্ঠুর সংসারে ও শিরিষ-কুসুম কেন সৃজিয়াছিলে? ওফেলিয়া শতমুখে আপনার মর্ম্মভেদী প্রণয়ের অভিব্যক্তি করিতে পারে নাই; তাহার প্রেমোন্মাদ জীবনের শেষ অভিনয় তটিনী শয্যায়! "নিডিয়া" অন্ধ, সে আবার ভালবাসিতে জানে? সংসারে অন্ধের রূপোন্মাদ কে বুঝিবে? নিডিয়ার আত্মঘাতী প্রণয়ের পুরস্কার সাগরবক্ষে সলিল-শয্যা।

তুমি কবি, শত সহস্র গাঁথায় নীরব মাধুরীর মধুরতা বর্ণনা কর, শত কণ্ঠে লজ্জাবতী লতিকার মহিমা কীর্ত্তন কর, কিন্তু এ ভাষাময়ী, এ শব্দময়ী, এ দৃষ্টিময়ী পৃথিবীতে উহার আদর নাই! তাই বলিতে-ছিলাম, এ পৃথিবীতে দোকানদারী চাই, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর চাই! এ সংসারের বর্ণমালাতে অন্তস্থ বর্ণ অপেক্ষা স্পর্শ বর্ণেরই অধিক প্রাদুর্ভাব! যাহা নয়ন পরশের অতীত, সেই অন্তঃস্থ কথার মূল্য নাই—যাহা শত কথায় বুঝাইতে পার না, যাহার অভিব্যক্তি ভাষাতে নাই, সে জিনিষ কে চাহিবে? যে সুর শুধু আত্মায় আত্মায় প্রতিধ্বনিত হয়—কিন্তু কই এ স্থূল শ্রবণে ত শুনা যায় না, তবে সংসার বুঝিবে কেন?

পৃথিবীতে সাদারই আদর; হাল্কা সংসারে হাল্কা জিনিষ চাহে!—গভীরতা বড় কালো; তোমার গভীরতা লইয়া তুমি থাক—সংসার কাল চাহে না! তোমার ও গভীরতার নিম্নে কি উজ্জ্বল রত্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে, পৃথিবী তাহা খুঁজিবে না—ও যে বড় কাল! তুমি রাঙা অক্ষরে লিখিয়া বিজ্ঞাপন দিতে পার ভালই, না হলে তোমার দোকান পাট তুলিয়া বিদায় হও।

বলি বলি করিয়া বলা হইল না। নিত্য আসি নিত্য ফিরিয়া যাই—কই সেই কথাটী বলা হইল না; আবার আসি আবার তাই, আমি যে তাহাকে দেখিয়া ভুলিয়া যাই।—আঃ ছি কাঁদিয়া ফিরিয়া আসি, এ পোড়া চোকে জল আসে কেন, জানিনা—কিন্তু বলা হইল না! মুখ ফুটিয়া বলা হইল না, তাই বুঝিল না, তাই সে অমন করিয়া আঁখি ফিরাইয়া চলিয়া গেল, পশ্চাতে অন্ধকার ছড়াইয়া গেল—আমি ,ডুবিলাম। হায়, এ শব্দময়ী পৃথিবীতে মূক হইয়া কেন জন্মিয়াছিলাম? একটা কথার জন্য সব গেল? তাই ত ঠিক! এ সংসারে কথার জন্য সব যায়। আমার সব গেল, সে মুখ ফিরাইল, একবার মাত্র এক ফোঁটা চোকের জল দেখিয়া চকিতের মত চাহিয়া মুখ ফিরাইল,—আমার আশা জন্ম শোধ ঘুচিল,—আমার এ নীরব গীত ধ্বনি বাতাসের সঙ্গে মিলাইল—আমি দোকানদারী শিখি নাই।

আমার এ ব্যবসায়ে লোকসান হইল, ক্ষতি নাই; আমি এ বিশাল জনস্রোতের মধ্যে কে? আমার আবার অস্তিত্ব কি? কিন্তু, কি বলিব—কিন্তু ঐ যে সরল হৃদয় খানি—হা বিধাতঃ! অত সরল করিয়া কেন গড়িয়াছিলে? কেন তাহাকে বুঝিতে দিলে না? দুন্দুভিধ্বনি প্রেম নহে, ভাষা

আত্ম বিসর্জ্জন নহে,—ঐ হৃদয়খানি সেই ডন্দুভিধ্বনিতে মজিল, সংসারে দশ জনে যাহা করে, তাহাই করিল। ভাষা প্রবঞ্চক, সমাজ প্রবঞ্চক, সংসার প্রবঞ্চক! প্যাটেণ্টে ভুলিয়া, অমূল্য রত্নের বিনিময়ে স্ফটিক কিনিল! স্ফটিক,—স্ফটিক! পরীক্ষায় দাঁড়াবে কেন! পৃথিবীর কঠিন ভূমিতে পড়িয়া স্ফটিক ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তাহার সংসার জ্ঞান হইল, তখন বুঝিল—কিন্তু সে বুঝা মৃত্যুর উপকূলে!

সে বুঝিল—সে মরিল, কিন্তু পৃথিবী বুঝে কই! পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নাম কই?

আবার ওকে?—উনি দেশহিতৈষী, সম্মুখে, পথপার্শ্বে দুর্দ্দকে দেখিয়াও ফিরিয়া চাহেন না, কিন্তু গলাবাজী করিয়া দেশ মাতাইতে পারেন, উহাঁকে ইতিহাসে উজ্জ্বল চিত্রে চিত্রিত কর। আর ঐ যে আপনা দেখাইতে জানে না, নীরবে নিভৃতে, যেখানে কে যেন উত্তপ্ত ধরায় পড়িয়া, ধূলা মাখিয়া জল জল বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল, সেইখানে যাইয়া নীরবে, নিভৃতে ধূলা ঝাড়িয়া তাহাকে কোলে লইল, নিজগৃহে লইয়া আসিল, তাঁহার দুঃখে অলক্ষ্যে গণ্ড বহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল, হায়, আজি তাঁর নামটা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ইতিহাসে খুঁজিয়া তাহার নামটা পাইলাম না—আছে শুধু দু চারিটী ভগ্ন প্রাণে! আর অই যে শত শত নরহত্যা করিল, আপন বিলাস শয্যা শুভ্র হইতে শুভ্রতর, কোমল হইতে কোমলতর করিবার জন্য অন্যদেশে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিল, অই দেখ তাহারই প্রস্তরমূর্ত্তি খোদিত হইয়া ঘরে বাহিরে স্থাপিত হইয়াছে।—তুমি দুন্দুভি বাজাইতে জান—তুমি বড়লোক! তোমার অই যে সুরঞ্জিত, বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত শকটবাহী অশ্ব পদতলে পড়িয়া কার মস্তক বিচূর্ণিত হইল, তুমি ফিরিয়াও চাহিলে না, (কেন চাহিবে? সে সামান্য, তুমি বড়) তুমি লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলে বক্তৃতা করিতে পার, তোমার সাতখুন মাপ, তুমি একজন বড়লোক! তুমি বিলাস শয্যায় শুইয়া, ইতিহাসে স্থান পাইবার জন্য দেশের গরীব লোকের সর্ব্বনাশ করিতেও কুন্ঠিত নও—তুমি বড়লোক—তোমার গলা আছে, তোমার জাঁক আছে। হায়, অন্তর্দৃষ্টিহীন পৃথিবী বুঝিল না, এ বড়লোকত্বের ভিত্তি কোথায়? অই যে শ্রমক্লিষ্ট শ্রমজীবীর প্রতি ধর্ম্মবিন্দু ধূলায় পড়িয়া শুখাইয়া গেল, নিষ্ঠুর সংসার তাহা দেখিল না!

বিশাল হ্রদ দেখিয়া মানুষ মুগ্ধ হয়, কবির চিত্রে তাহা অমর হইল। কিন্তু ওযে উত্তাপে এতদিন শুকাইয়া যাইত। অই যে পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসগুলি উহাতে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে— সে কাহিনী ত কেহ বুঝিবে না। এখানে দোকানদারীর আদর—নীরবধ্যান ব্যভিচার মাত্র!

তাই বলিতেছিলাম, সকল কার্য্যেই একটু দোকানদারী চাই, বেশভূষা চাই, গলাবাজী চাই। অপরাজিতার কোমল মাধুরীর আদর পৃথিবীতে নাই। অপরাজিতা কালো। জাঁকাল বেশ করিতে না পার, তবে তোমার জন্য পারস্যের রাজভোজে, কবিবর সাদীর ন্যায়, অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা সুলভ হইবে।

মুখ লুকাইয়া থাকিও না। ক্ষুদ্র মুখ

লুকাইয়াছিল, কুন্দ মরিল। ভ্রমর গভীর ছিল—কিন্তু বড় কালো, ভ্রমর মরিল। (কালো পাঠকদিগকে আমি Pears Soap এর ব্যবস্থা দিই!!) ইহারা মরিল কি বাঁচিল, জানি না, তবে সংসারের চক্ষে মরিয়াছে বই কি?

আর এক পদ—তুমি দোকানদারী শিখ নাই, তুমি ধার্ম্মিক নও। হায় সংসারের বিচিত্র লীলা—ধর্ম্মজগতেও দোকানদারী চাই। তুমি নীরবে আইস, নীরবে যাও, তুমি ধর্ম্মের কথা শুনিলে নীরবে শুনিয়া চলিয়া যাও—সংসারে তুমি ধার্ম্মিক নও। গৈরিক বসন পরিধান কর, প্রতি কথায় চক্ষু উল্টাইয়া "তাঁহার ইচ্ছা" প্রভৃতি কতকগুলি আবাহমানকাল-প্রচলিত কথায় তোমার ভাষাকে ভারাক্রান্ত কর, দেখিবে, শত শত লোক তোমারই পদপ্রান্তে!

বুঝিয়াছি, সংসারে দোকানদারী চাই, ভাষা চাই, বেশভূষা চাই, দুন্দুভিধ্বনি চাই;—এখানে নীরব ভালবাসা ও অন্ধের রূপোন্মাদ একই কথা! বুঝিলাম—কিন্তু দোকানদারী শিখিতে পারিলাম কই! আমার প্রাণের কথাগুলি কি করিয়া বুঝাইব? ভাষায় ত ভার সহিবে না! আর অই কৃত্রিম আবরণে আমার এ প্রাণটাকে সাজাইয়া দিব! তাহা হইবে না। সংসার বুঝিল না, ক্ষতি নাই। যেদিন ভাষা ফুরাইবে, বেশ ফুরাইবে, বসন ফুরাইবে, ভূষণ ফুরাইবে, আত্মার এ তুচ্ছ আচরণটা ফুরাইবে—সেই দিন—সেই দিন কি আসিবে না? সেই দিন অই নীরব মাধুরী পরিপূর্ণ, কৌমুদী-উদ্ভাসিত নৈশগগনে অই নক্ষত্রগুলিকে সাক্ষী করিয়া আত্মময় স্বরে আমার এ গীতি গাহিব; ঐ গ্রহে উপগ্রহে আমার এ নীরব গীতি প্রতিধ্বনিত হইবে। সেই দিন আমার এ প্রেমোন্মাদ জীবনে প্রণয়ের প্রথম চুম্বন মিলিবে! আমি দোকানদারী শিখিলাম না, তাই আজ সংসার হইতে বিদায়!

শ্রীঅনঙ্গমোহন ঘোষ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ইয়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি, প্রথম খণ্ড—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রবাবু বিলাতি সমাজের সঙ্গে বঙ্গসমাজের তুলনা করিয়া এই ডায়ারি লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখা চিরদিনই সরস, তবে চিত্রগুলি একপেশে রকমের হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বঙ্গ-রমণী সর্ব্বাংশে সুখী, একথা কি সম্পূর্ণ সত্য? আর তা হ'লেও অজ্ঞ ও কুসংস্কার-পূর্ণ বাঙ্গালীর মেয়ের ও একজন জ্ঞানা-লোক-প্রাপ্ত ইউরোপীয় মহিলার সুখের মধ্যে কি তারতম্য নাই? অসভ্য হটেণ্টট্ ও সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির স্ত্রীলোকেরাও কি আপন আপন পরিবারে সুখী নয়? তবে জ্ঞানের সঙ্গে সুখের মিলনে যাহা হয়, অজ্ঞানতার অবস্থায় তাহা হইতে পারে না। চিত্রগুলিতে যেন একটু বেশি মাত্রায় 'আর্য্যামি' প্রকাশ পাইয়াছে।

2. Cojugation made easy, by Kali Kumar Roy B.A., price 3 Annas—ইংরাজী ক্রিয়াপদ ও shall and willএর প্রয়োগ ভাল করিয়া

বুঝাইবার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এ প্রকার গ্রন্থে বালকদের উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।

৩। ন্যায়ভাষা—শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ ন্যায়রত্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে ন্যায়দর্শনের কতিপয় পদার্থ ও অন্যান্য বিষয় বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বড় কম। অনুবাদগুলিও পরিষ্কার হয় নাই।

৪। কাব্যপ্রবেশ—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত। বাঙ্গালা কাব্যের অলঙ্কার পরিচয়ের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মূল সূত্রগুলি বেশ পরিষ্কার ভাষায় লেখা হইয়াছে। উদাহরণগুলিও তদুপযোগী। এ পুস্তক স্কুলের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত।

৫। সহজপরিমিতি এবং পরিমিতি ও জরিপ।—এই দুইখানি পুস্তক গৌহাটীর সর্ভে মাষ্টার শ্রীযুত বাবু প্রভাতচন্দ্র সরস্বতী প্রণীত। উভয় পুস্তকই অল্পের মধ্যে বেশ্ হইয়াছে। শুভঙ্করীর সঙ্গে ইংরাজী জরিপ, জমাবন্দী ও কালীকরার প্রণালী মিলাইয়া লিখিত হওয়ায় বিষয়গুলি আরও সহজবোধ্য ও উপকারী হইয়াছে। প্রথম খানিতে কেবল পরিমিতি (Mensuration) ও দ্বিতীয়খানিতে জরিপ ও পরিমিতি একত্র বর্ণিত হইয়াছে। উভয় পুস্তকই স্কুলে অধীত হইবার যোগ্য।

৬। ভগবচ্ছতকম্—শ্রীমহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি-প্রণীতম্। একশত সংস্কৃত কবিতায় ভগবদ্বন্দনা। নবদ্বীপস্থ খ্যাতনামা কতিপয় পণ্ডিত কবিতাগুলির প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা ইহার অধিকাংশ কবিতা পাঠ করিয়াছি। অন্যাংশে উত্তম হইলেও স্থানে স্থানে ভাবশুদ্ধি হয় নাই, ইহা আমাদের প্রতীতি হইল।

৭। প্রভাত-কুসুম—শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত। মূল্য ৷৷৹ আনা। কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। স্থানে স্থানে উচ্চ ভাবের যোজনা হইয়াছে।

৮। বিদ্যাধর্ম্মদীপিকা—হিন্দিভাষায় সম্পাদিত মাসিকপত্রিকা। চম্পারণ জেলার অন্তর্গত রামনগরের রাজার সহায়তায় প্রকাশিত। ভাষা প্রাঞ্জল, লেখা ভাল। বিষয়গুলিও মন্দ নয়। তবে স্থানে স্থানে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ হইয়াছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এ দোষ সংশোধিত হইবে।

৯। নবগ্রাম—উপন্যাস।—লেখিকার নাম নাই। যদি বাস্তবিকই ইহা কোন বঙ্গসুন্দরীর লেখনী প্রসূত হয়, তবে শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই। আজগুবি অলৌকিক ঘটনার অবতারণা না থাকিলেও গ্রন্থখানি যে ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সমাজের সুচিত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্যোতিরিন্দ্র ও ইন্দিরার চরিত্র সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুরুচি, সুভাব ও সুকথায় পূর্ণ। লেখিকার এরূপ লেখা আমরা আরও দেখিতে ইচ্ছা করি। বঙ্গ-সমাজ ও সাহিত্য এরূপ গ্রন্থ দ্বারা প্রভূত উপকৃত হইবে। স্থানে স্থানে ভাষা প্রয়োগের দোষ হইয়াছে। আশা করি, ক্রমে সংশুদ্ধ হইবে।

১০। বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেডালিষ্ট, এল,এঁইচ,এম, এস্ প্রণীত। অল্পের মধ্যে বহুমূত্র রোগের লক্ষণ, কারণ, হোমিওপেথি চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য নির্ণয় আছে। লেখা মন্দ নহে।

১১। নীতিকুসুম, প্রথমভাগ—তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। কতকগুলি নীতিপূর্ণ গল্পে বইখানি পূর্ণ। গল্পগুলি বেশ শিক্ষাপ্রদ, ভাষাও ভাল।

১২। মেঘদূত—অর্থাৎ মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত মেঘদূত কাব্যের বঙ্গানুবাদ পদ্যানুবৃত্তি—পূর্ব্ব ও উত্তর মেঘ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মেঘদূতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ আরও দুই একখানি ইতিপূর্ব্বে বাহির হইয়াছে। আমাদের মতে কোনটীতেই মূলের কবিত্ব রক্ষা হয় নাই। উপস্থিত গ্রন্থের কবিতাংশও তত সরস নহে।

১৩। সাগর শোকোচ্ছ্বাস—মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিউসন শ্যামপুকুর শাখার ছাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণে ভারত কাঁদিয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছাত্রেরা কাঁদিবেনা কেন? বালকদিগের সরল হৃদয়ের শোকময় গাঁথাগুলি যে মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে জানা যায়।

১৪। সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস—শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য ৷৷৵০ আনা। পশ্চিমবাঙ্গালায় তাম্রলিপ্ত এবং পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুবর্ণগ্রাম, এই দুইটি বাঙ্গালার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বন্দর। ইহাদের প্রাচীন গৌরব কাহিনী স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। সুবিখ্যাত হণ্টার সাহেব বলিয়াছেন যে, "তাম্রলিপ্তির ভগ্নাবশেষগুলি, বাঙ্গালী জাতি এককালে কিরূপ সমুদ্রগামী ছিল, তাহা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়, বৌদ্ধ প্রাধান্যকালে ইহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরে রণতরী প্রেরণ করিয়া ভারত সাগরের প্লবমান দ্বীপপুঞ্জসমূহে বিজয়ী পতাকা সংরোপিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন ও পৌরাণিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় দ্বারা এই উদ্যমশীল জাতির প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই জাতি যেরূপ ছিল, সেইরূপ হইতে আরও অনেক সময় লাগিবে।" সুবর্ণগ্রাম সম্বন্ধেও হণ্টার সাহেবের এই মন্তব্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্বরূপ বাবু বিশেষ পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া সেই সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস লিখিয়াছেন, ইহা বাঙ্গালি মাত্রেরই আদরের বস্তু। আধুনিক, ইতিহাস কিম্বা পুরাতত্ব লেখকগণ যেরূপ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের অকারণ কুৎসা রটনা করিয়া বাহাদুরী প্রকাশের চেষ্টা করেন, স্বরূপ বাবু সেই পন্থা অবলম্বন করেন নাই দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু একটী বিষয় আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত উল্লেখ না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না, তাহা এই যে, স্বরূপ বাবু সুবর্ণগ্রামের প্রাচীন শিল্প, বাণিজ্যের বর্ণনা করিতে যাইয়া নিতান্ত কৃপণতা প্রকাশ করিয়াছেন। যে কার্পাস বস্ত্রের দ্বারা বঙ্গীয় তন্তুবায়গণ জগতে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, যে কার্পাস বস্ত্রের রপ্তানী দর্শনে ফরাসী ভ্রমণকারী বর্নিয়ার "অবাক্" হইয়াছিলেন, সেই কার্পাস বস্ত্রের শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে স্বরূপ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না।

ত্রিপুরা পর্ব্বতের পাদমূল হইতে একটি প্রাচীন পথ সুবর্ণগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাজমার্গের কোন কোন অংশ যদিচ এক্ষণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি অভগ্ন স্থান-

গুলি দর্শন করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কোন্ মহাপুরুষ যে কত অর্থব্যয় করিয়া এই পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন। দেশবাসীগণ ইহাকে "পোড়ারাজার জাঙ্গাল" বলে। এই পোড়ারাজা যে কে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু স্বরূপ বাবু বলেন যে, বঙ্গেশ্বর দ্বিতীয় বল্লাল সেন অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া মরিয়াছিলেন বলিয়া তিনি "পোড়ারাজা নামে অভিহিত হইয়া রহিয়াছেন।" যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি যে কেন ত্রিপুরারাজ্য মধ্যে এই প্রকাণ্ড মার্গ নির্ম্মাণ করিতে গিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। স্বরূপ বাবুর এই বাক্যে [illegible]ত আমাদের সন্দেহ রহিয়া গেল।

১৫। কিরণময়ী।—রহোন্যাস—শ্রীনীলমাধব শেট কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ২॥০ টাকা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারত, তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম ও সিংহল প্রভৃতি দেশ অনুসন্ধান করিয়া আর্য্যদিগের অমূল্য রত্নস্বরূপ সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ ও তাহার অনুবাদ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিতেছেন। মেক্সমূলারের সেক্রেড্ বুকস অফ্‌দি ইষ্ট ও ট্রবনার কোম্পানির তালিকা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়। আর বাঙ্গালী লেখকগণ বিলাতী সাহিত্যের জঘন্য অংশ অর্থাৎ "মিষ্ট্রীস"গুলি অনুবাদ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতেছেন। হরিদাসের গুপ্তকথা লেখক ইহার পথপ্রদর্শক। তদনন্তর অনেক মহাত্মাই এই পথে বিচরণ করিয়াছেন! কিরণময়ী কোন বিলাতী মিষ্ট্রীসের অবিকল অনুবাদ নহে। মিষ্ট্রীসের ছায়া অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের নিজসম্পত্তিও প্রচুর পরিমাণে আছে। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। সেই সকল অংশে গ্রন্থকারের লিপি-চাতুর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থকারের আর একটী প্রশংসার বিষয় আছে, তিনি হিন্দু, কিন্তু ধর্ম্মধ্বজী সম্প্রদায়ের হিন্দু নহেন। যাহা হউক, বঙ্গীয় পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা গল্প পড়িতে ভালবাসেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুখী হইবেন, ইহা আমরা বলিতে পারি।

১৬। গৌড়ীয়গীতা—গীতামূল ও ভাষ্য ; প্রথমখণ্ড, মূল্য ॥০ আনা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল শ্লোকগুলি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া নিম্নে গদ্য অনুবাদ বা ভাষ্য দেওয়া হইয়াছে। ভাষ্য বা গদ্য অনুবাদ মন্দ হয় নাই। কিন্তু পদ্যানুবাদগুলি নিতান্ত কদর্য্য হইয়াছে। ভগবদ্গীতার অনেকগুলি সংস্করণ বাহির হইয়াছে। কিন্তু অনুগীতা, অষ্টাবক্রগীতা, উত্তরগীতা, রামগীতা ও গুরুগীতা প্রভৃতি আ[র] অনেকগুলি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশের বা[কী] রহিয়াছে। বাঙ্গালীগণ নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাকে পাপ মনে করেন, অন্যের পদানুসরণ করা আমাদের জাতীয় স্বভাব। শ্রীমতী মহিষন্নী কৃষ্ণপদ দাসী কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত, নামটি পাঠ করিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। কালীকৃষ্ণ নামক কোন ব্যক্তির স্ত্রী কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত কি না, তাহাও বলিতে পারি না।

১৭। নবীনা জননী। 'উপন্যাস'—শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। আমরা এ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার

একজন নবীন লেখক, এজন্য সামান্য সামান্য ত্রুটি লক্ষিত হয়। আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থকার গ্রন্থের নাম নির্ব্বাচনে ভুল করিয়াছেন। যাহাহউক, এই সকল ত্রুটি থাকা স্বত্বেও ইহা একখানি ভাল উপন্যাস বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই গ্রন্থে আমরা চারিটি রমণীর দর্শন পাইয়াছি। তন্মধ্যে মলিনা স্বর্গের দেবী। গ্রন্থকার গ্রন্থ শেষে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "মলিনাকে আমরা ইহজীবনে সুখী দেখিতে পাইলাম না।" সমালোচক বলিতেছেন, স্বর্গে তাহাকে রাজরাজেশ্বরী রূপে দেখিতে পাইবেন; শতসহস্র আয়েসা তাহাকে চামর ব্যজন করিতেছেন।

ঊষা, প্রতিভা ও পদ্ম এই তিনটী রমণীরত্ন। ঊষার স্বামী হেমন্তকুমার একজন মহাত্মা। ললিত, প্রতিভার উপযুক্ত স্বামী। গ্রন্থকার ললিতের চরিত্র চিত্রিত করিতে যাইয়া স্বীয় ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। পদ্মের স্বামী সুরেশ, সুরসিক ও মহাশয় লোক।

ললিত ও প্রতিভার পিতা হরিদাস ঘোষকে আমরা প্রথমতঃ একটি নরকের সয়তান বলিয়া ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহার চরিত্র অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

একস্থানে গ্রন্থকার পশ্চিম বাঙ্গালার স্ত্রীসমাজের উপর খুব একচোট ঝাড়িয়াছেন, সে বাসর ঘরে প্রেতিনীদিগের কথা। স্নানের ঘাটে এক রমণী আর এক রমণীর সহিত কলহ করিয়া বলিতেছেন "সেদিন উমোর বিয়ের রেতে বাসরঘরে জামাইয়ের সাক্ষাতে ঝুমুর গাইলেন, খেম্‌টাওয়ালীর মত নাচ্‌লেন, নানা অঙ্গভঙ্গী কল্লেন, বিদ্যাসুন্দর আওড়ালেন, ছড়াকাটলেন, তাতে কিছু লজ্জার হানি নাই।" এই কুকাণ্ড পূর্ব্ব বাঙ্গালায় নাই, কিন্তু গর্ভাধান অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের সময়, শ্রীহট্ট প্রদেশের রমণীগণ যেরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার করিয়া থাকেন, বাঙ্গালার অন্য কোন স্থানে আমরা সেইরূপ দেখি নাই। আমরা কলিকাতা কিম্বা শ্রীহট্ট বুঝি না। এই সকল কুব্যবহার উঠাইয়া দিলে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গহানি হইবে না। বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সকলের প্রতি একটু দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন, ইহা আমাদের করজোড়ে নিবেদন। যাহাদিগকে দেবী বলিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে, বাসরগৃহে প্রবেশ করিলেই তাঁহারা সয়তান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকেন, ইহা স্মরণ করিলেও আমাদের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হয়। আমাদের জনৈক বন্ধু বলিয়াছেন, তিনি বাসর গৃহে তাহার যুবতী খুড়িশ্বাশুড়ী কর্ত্তৃক ভয়ঙ্কর রূপে আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে দুইচারিটি কথা শুনাইয়াছিলেন, এমন সময় আর একটী স্ত্রীলোক বলিল, 'ওকি কর, ইনি যে তোমার শ্বাশুড়ী।' এই কথা শ্রবণে বন্ধুটী যারপর নাই লজ্জিত হইলেন এবং রমণীও বিদ্যুতের ন্যায় পলায়ন করিলেন। ইহা অপেক্ষা জঘন্য ব্যবহার আর কি হইতে পারে? যাহা হউক, এইসকল কথা পরিত্যাগ করা যাউক। পাঠকগণ নবীনা জননী পাঠ করিলে প্রীতিলাভ করিবেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

১৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—টীকা, বঙ্গানুবাদ, শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও শ্রীধর স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সহ। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত; দ্বিতীয় সংস্করণ, বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত,

মূল্য ৪৲। ধর্ম্মপ্রধান পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে গীতা সর্ব্বত্র আদৃত। পূর্ব্বে গীতা বড়ই দুষ্প্রাপ্য ছিল; কৈলাস বাবু গীতার সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশের সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। কৈলাস বাবুর উদ্যমের পর আরো অনেকে গীতা প্রচারে চেষ্টা করিয়াছেন। এ মহামূল্য গ্রন্থ যত প্রচারিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। দেখিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম, অল্প দিনের মধ্যেই গীতার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, পূর্ব্ববারের ন্যায়, এবারও গীতার এই উৎকৃষ্ট সংস্করণ সর্ব্বত্র আদৃত হইবে।

১৯। নির্ঝর।—শ্রীবিনয়কুমারী বসু প্রণীত। মূল্য ॥০। নব্যভারতের পাঠকগণের নিকট বিনয় কুমারী সুপরিচিতা। নির্ঝরের অনেক কবিতা নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, ভাল মন্দ পাঠকগণ অবশ্যই বিচার করিয়াছেন। বিনয়কুমারীর চিন্তা মার্জ্জিত, লেখা প্রাঞ্জল, ভাব মধুর, একথা যদি আমরা বলি, বোধ করি, সকলেই তাহাতে সায় দিবেন। আমরা এস্থলে কেবল একটী কবিতা তুলিয়া দিলাম;—ইহা কবির কবিত্বশক্তির উজ্জ্বল আভাস।

কবিতা।

কবিতা লো,
অরুণ কিরণ মাথা প্রভাত মেঘের থরে,
দেখেছি হাসিতে তোরে কত না পুলক ভরে!
উষার কুসুম বনে আধ ফোটা ফুলদলে,
দেখেছি ঘুমাতে তোরে ললিত পল্লব তলে!
দাঁড়ায়ে মুগধচিতে সাঁঝের কনক বেলা,
দেখেছি সুনীলাকাশে কবিতা, করেছ খেলা!
গভীর নিশীথ রাতে ঘুমাইলে ধরাখানি;
শুনেছি মৃদুল বাতে, তোর স্বপ্নময় বাণী;
অতৃপ্ত প্রেমেতে ভগ্ন বিধবার অশ্রু জলে,
দেখেছি ঝরিতে তোরে, করুণ ভাবেতে গলে!
নেহারি মাধুরী তোর তরুণ হৃদয় মোর,
আপনা ভুলিয়া আজ আকুল বাসনা ভরে
হ'য়েছে অধীর সখি, তোর প্রেম-সুধা-তরে!
আয় তবে আর বালা, পরিয়া ভাবের মালা,
হাসি অশ্রু বিরচিত সাধের আসনে মোর;
ভুলে যাই দুঃখ জ্বালা পুজিয়া চরণ তোর!

২০। সাধনা।—মাসিক পত্র, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, বার্ষিক মূল্য ২৲, মাশুল ৶০। তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তিন সংখ্যাই পাইয়াছি। উৎকৃষ্ট কাগজ, উৎকৃষ্ট ছাপা, এরূপ পরিপাটী পত্রিকা এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই। আমরা যত ভাবি, ততই বুঝি, মহর্ষির বাড়ীর সকলই মধুর, সকলই সুন্দর। বঙ্গের আর কোন পরিবারে এতগুলি বাঙ্গালা ভাষার সাধক দেখিতে পাওয়া যায় না। মাতৃসেবার জন্য এবাড়ীর সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে লালায়িত। যাঁহার যেরূপ শক্তি, তিনি সেইরূপ কৃতিত্ব লাভ করিতেছেন। সাধনার লেখার পারিপাট্য দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। আশা করি, পত্রিকাখানি মহর্ষির পরিবারের গৌরব আরো উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবে।

২১। সাহিত্য।—মাসিক পত্রিকা, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত। এ পত্রিকাখানির বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। "সাহিত্যের" এই দ্বিতীয় বৎসর। সুরেশ বাবুর চেষ্টা ও শক্তিকে শত শত ধন্যবাদ। বহুলেখক এই পত্রিকায় লিখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সকলে যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, সাহিত্যের কলেবরে কুলাইবে না বলিয়া আশঙ্কা হয়। যাহা হউক, সাহিত্য যেরূপ দক্ষতার সহিত মাতৃসেবা করিতেছেন, আশা করি, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

২২। জমীন্দারী পঞ্চায়ত।—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৪৲। আমরা ৫ম সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। এখানি জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভার মুখপাত্র। যে মহৎ উদ্দেশ্যে জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভা প্রতিষ্ঠিত, এই পত্রিকার দ্বারা সে মহৎ উদ্দেশ্য যে সুফল-প্রসূ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। পত্রিকাখানি বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে।

২৩। বিদ্রূপ ও বিকল্প।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুম-

দার, বি, এ প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার নব্যভারত-পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যে সকল প্রবন্ধ আছে, তাহার অধিকাংশই নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, এজন্য প্রশংসার মাত্রা বাড়াইতে আমরা সঙ্কুচিত। বিজয় বাবুর লেখা যে খুব চিত্তাকর্ষক, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই।

২৩ কুঙ্কুম।—শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস প্রণীত, মূল্য ৸০। এখানি খণ্ড কবিতা গ্রন্থ। গোবিন্দ চন্দ্র দাসের ইহা দ্বিতীয় গ্রন্থ। গোবিন্দ চন্দ্রের সহিত নব্যভারতের বিশেষ সম্বন্ধ, সুতরাং নব্যভারতের পাঠকগণ গোবিন্দ চন্দ্রকে বিশেষ রূপ জানেন। গোবিন্দ চন্দ্র সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে আমরা সঙ্কুচিত; কিন্তু কয়েকটী কথা নিতান্ত বাধ্য হইয়াই বলিতে হইল।

গোবিন্দ চন্দ্রের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় এ দেশের সাহিত্যানুরাগী কাব্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ সকলেই পাইয়াছেন। গোবিন্দ চন্দ্র দরিদ্র ব্যক্তি, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গবাসী, এজন্য এক-শ্রেণীর হিংসা-পরায়ণ ব্যক্তি রুচি ধরিয়া গোবিন্দ চন্দ্রকে কাব্য-জগৎ হইতে অবসৃত করিবার চেষ্টায় আছেন। রবীন্দ্র নাথের রুচি ধরিয়া ভয়ে কেহ কথা বলিতে সাহসী হন না, কিন্তু দরিদ্র গোবিন্দ চন্দ্রকে লইয়া কেহ কেহ বড়ই মাথা ঘুরাইতেছেন। আমাদের বিবেচনায় ইহা গোবিন্দ চন্দ্রের বিশেষ সৌভাগ্য। আমাদের বিশ্বাস, এই পথ দিয়াই তাঁহারা কালে গোবিন্দ চন্দ্রের পক্ষপাতী হইবেন। প্রতিভাকে কেহ কখনও লুপ্ত করিতে পারে নাই, কেহ কখনও পারিবে না।

গোবিন্দ চন্দ্র স্বভাব-কবি। মনের ভাব সরল ভাষায় যিনি ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনিই স্বভাব-কবি। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, এ সকলের যেমন আদর, এ জগতে চিরকাল কাব্যেরও তেমনি আদর। কাব্য ভিন্ন ভাষা অসম্পূর্ণ থাকে। যাঁহারা প্রকৃত কবি, তাঁহারা কাহারও নীচে নহেন। কি জড় জগৎ, কি চেতন জগৎ, প্রকৃতি অঙ্কনের ক্ষমতা কেবল কবির। কবি, মানসপুরের অমর দেবতা। যাঁহারা মনে করেন, এ জগতে তাঁহার আসন টলিতেছে, তাঁহারা জানেন না যে, জগতে যতদিন প্রকৃতি, ততদিন কবি ও কাব্য। কাব্য—ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান-বিজড়িত। এ তিনের মিলন-ভূমি যে দিন টলিবে, সে দিন এ জগতে থাকিবে কি?

যাঁহারা নীতিবাদী, তাঁহারা মুহূর্ত্তও কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করিতে ভালবাসেন না। তাঁহারা কাব্যেও নীতি অন্বেষণ করেন। শুষ্ক, নীরস, কঠোর উপদেশ তাঁহারা সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়ান। যেখানে তাঁহারা উপদেশের অভাব দেখেন, সেখানেই তাঁহাদের ভ্রু-কুঞ্চন। প্রকৃতি বা কবিতা, তাঁহারা পছন্দ করেন না। খোলা প্রাণ, খোলা ভাব, খোলা হৃদয় তাঁহাদের অসহ্য। প্রকৃতি, তুমি নববস্ত্রে বিভূষিত হইয়া এ হেন ব্যক্তিদিগের নিকট উপস্থিত হইও, নচেৎ লাঞ্ছিত হইবে। কবিতা, সাবধান, উলঙ্গ ভাবে তুমি নীতিবাদীদের সমক্ষে যাইও না, যাইলে অপমানিত হইবে।

গোবিন্দ চন্দ্র মনের কথা লেখেন,—প্রাণ খোলা, ভাব খোলা, কোন বাধা তিনি মানেন না, উপদেশের কথা শুনেন না। এ বড় বিষম দায়। গোবিন্দ চন্দ্রকে পরামর্শ, উপদেশ দিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়াছি, গোবিন্দ চন্দ্র কিছুতেই আপন মনের কাহিনী বলিতে ছাড়িবেন না। আমরা গোবিন্দ চন্দ্রের এই স্বভাবের কিন্তু বড়ই পক্ষপাতী। যে আপন পথে আপন মনে যাইতে পারে না, সে আর যা হয় হউক, সে কখনও লেখক হইতে পারিবে না। লেখক জগৎকে চালাইবে? না জগৎ লেখককে চালাইবে? জগৎ যে লেখককে চালায়, সে লেখক জীবন থাকিতে মৃত। গোবিন্দ চন্দ্র কাহারও কথায় চলিতে চাহেন না। ফুল ফোটে, চাঁদ হাসে, পাখী যায়, সাগর গর্জ্জন করে, কাহারও কথা মানে না। কবি সেই তানে যখন তান মিলাইয়া জগতের উপরে উঠেন, তখন তিনি কেন জগতের কথা শুনিবেন? গোবিন্দ চন্দ্র স্বাধীন স্বভাব-কবি। যাঁহারা প্রতিভার স্ফুট স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাঁহারা কুঙ্কুম পড়িয়া দেখিবেন। অন্যের পক্ষে "কুঙ্কুম" পড়া বিড়ম্বনা মাত্র।

পঞ্জিকা-বিভ্রাট।

গণনার মূল (নিরয়ণ) প্রণালী এক হইলেও পঞ্জিকাকারগণ নানা মত অবলম্বনে গণনা করায় তাঁহাদের প্রকাশিত ফলে পরস্পর অনৈক্য দেখা যাইতেছে; এবং প্রত্যক্ষফল কাহারও গণনার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিতেছে না। কিছুদিন হইল, ইহার কারণ নির্দ্ধারণার্থ তত মনোযোগী না হইলেও কিরূপে ভ্রম সংশোধন হইতে পারে, তজ্জন্য বঙ্গদেশবাসী বিদ্বন্মণ্ডলী সচেষ্টিত হইয়াছেন। এই বিষয় আলোচনার্থ সভা সমিতি হইতেছে, এবং সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্রিকাতে 'পঞ্জিকাবিভ্রাট' শীর্ষক প্রবন্ধ সমূহ লিখা হইতেছে দেখিয়া পরমানন্দিত হইয়াছি। পঞ্জিকা-বিভ্রাট দূরীকরণের প্রকৃত উপায় সম্বন্ধে সভার সভ্যদের ভিন্ন ভিন্ন মত হইলেও ইহা একটী পরম সৌভাগ্যের চিহ্ন যে, বাঙ্গালীর মনে, পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে, উৎসাহ ও উদ্যম জন্মিয়াছে। এমন শুভ সময়ে, এই মহৎ বিষয়ের আলোচনা যে, 'ভারতী' এবং 'নব্যভারতের' মত প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকাতে কেন উপেক্ষিত হইতেছে, তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছিনা। বঙ্গবাসীর উৎসাহ উদ্যম অধিক দিন স্থায়ী হইবে না বলিয়া কি আপনারা নীরব রহিয়াছেন? অথবা এই আলোচনার কোন গুরুত্ব অনুভব না করিয়া নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়াছেন, কিম্বা ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক দেখিয়া ধনীগণ পশ্চাৎপদ হইবেন, এই মনে করিয়া নিষ্ফল আলোচনায় ক্ষান্ত রহিয়াছেন?

আমাদের অধ্যবসায় কত, এবং আমরা যে বাগাড়ম্বরসার, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আপনারাও হয়ত এই সব ভাবিয়াই আলোচনায় বিরত রহিয়াছেন। আলোচনায় ক্ষতি কি, বিষয়ের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলে ধনী দারিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই উৎসাহের সহিত সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। কিন্তু আমাদের আর একটী গুণও আছে যে, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ একটা কর্ম্ম করিয়া ফেলিতেও আমরা কম পটু নই। অতএব সভা সমিতির সভ্য মহাশয়দের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এই গুরুতর ব্যাপারের সহসা কোন মীমাংসা না করেন। ইহার একটা প্রকৃত মীমাংসা করিতে অন্ততঃ কয়েক বৎসর কাল আলোচনার প্রয়োজন হইবে। দক্ষযজ্ঞে সতীদেহত্যাগ যেন কেহ না ভুলেন।

এই গুরুতর বিষয়ে অদ্য আমি আর কিছু না লিখিয়া, এসম্বন্ধে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে একটী প্রবন্ধ পাইয়াছি, তাহা আগামী নব্যভারতে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইলাম।

দেরাহূন
২৩শে মাঘ, ১২৯৮ } শ্রীকালীমোহন ঘোষ।

পঞ্জিকা-বিভ্রাট।

বঙ্গদেশে পঞ্জিকা-বিভ্রাট সম্বন্ধে যে মহান্দোলন চলিতেছে, তাহার নমুনাস্বরূপ দুইটী প্রবন্ধ আমার হাতে পড়িয়াছে। তাহার একটী ২০শে অগ্রহায়ণের 'হিতবাদী' হইতে এবং অপরটী ২৭ শে অগ্রহায়ণের 'প্রকৃতি' হইতে উদ্ধৃত। সকল আন্দোলনেরই দুইটী

পক্ষ আছে, কাজেই পঞ্জিকা-বিভ্রাট বিষয়ক আন্দোলন প্রকৃতির নিয়তি ছাড়াইতে পারে নাই। "হিতবাদী" পঞ্জিকার ভ্রম দর্শাইয়া তাহার বিদূরণার্থ যত্ন করিতেছে এবং "প্রকৃতি" ঐ ভ্রম অস্বীকার করিতেছে; অতএব ঐ দুইটী বিরুদ্ধ মতাবলম্বী প্রবন্ধ হইতে আন্দোলনের মোটামুটী ভাব পাওয়া যায়। প্রকৃতির প্রবন্ধে সমালোচনার যোগ্য কিছুই নাই, কারণ পঞ্জিকাতে যে ভ্রম নাই, তাহা প্রকৃতির প্রবন্ধে প্রদর্শিত হয় নাই, তাহাতে কেবল ব্যক্তি বিশেষের মতামতের উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে এবং পঞ্জিকা যেমন আছে, তেমনই থাকা উচিত, এই মত ব্যক্ত করিয়াছে। পঞ্জিকা-বিভ্রাট যে ঘটিয়াছে, তাহা ঘড়ি হাতে করিয়া আকাশের দিকে তাকাইলে নেত্রবান লোক মাত্রেরই দৃষ্টিগোচর হইবে। কি কারণে এবং কি পরিমাণে ঐ বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তাহার সমালোচনার পূর্ব্বে উক্ত প্রবন্ধোক্ত ব্যক্তিগত মত সমূহের ২-১টী কথার উত্তর দিতে ইচ্ছা করি।

শোভাবাজারের রাজবাটীতে যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে উক্ত সভার সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, প্রতিবৎসর রাশি রাশি পদার্থ উল্কাপিণ্ডাকারে পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হওয়াতে পৃথিবীর আকার ও গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তদনুসারে পৃথিবীর গতিরও ভেদ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ঐ গতিভেদ গণনা সাপেক্ষ নহে, কারণ ধরাপৃষ্ঠে যে সকল উল্কাপাত হয়, তাহাদের আয়তন পৃথিবীর সঙ্গে তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে একটী মনুষ্য মস্তকের সহিত বালুকা কণার তুলনাও বৃহৎ প্রতিপন্ন হইবে। সহস্র সহস্র বালুকাকণা আমাদের মস্তকোপরি পতিত হইলেও আমরা যেমন তাহার গুরুত্বানুভব করি না, সেইরূপ উল্কাপাতেও পৃথিবীর গুরুত্বের তারতম্য আমাদের গণনার যোগ্য হয় না; কাজেই তজ্জনিত গতিভেদও আমরা গণনা করিতে অক্ষম। পৃথিবীর আপাতদৃশ্য গতিভেদ যে কোন বাহ্য কারণ বশতঃ ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে, তাহার একটী বিশেষ কারণ আমাদের গণনপ্রণালীর অপরিপক্কতা। আমরা মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি, আমাদের কার্য্য যে ভ্রম-প্রমাদশূন্য হইতে পারে, ইহা যাঁহাদের মনুষ্যত্ব বোধ আছে, তাঁহারা কেহই বিশ্বাস করিবেন না। আমাদের চক্ষে পৃথিবীর গতি দুই প্রকার, (১) পৃথিবীর স্বকীয় গতি, যাহা আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞানদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি; (২) জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের সূত্রমতে গণনাদ্বারা যে গতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই গতি। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানসূত্র মনুষ্য-রচিত বলিয়া তাহাতে যে ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে; এবং যখন আমাদের গণিত গতির সহিত পৃথিবীর প্রত্যক্ষজাত গতির অনৈক্য দেখিতে পাই, তখন পৃথিবীর গতি পরিবর্ত্তনের আপাততঃ কোন কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে আমরা সহজেই অনুমান করি যে, আমাদের গণনপ্রণালীতে ভুল রহিয়াছে। প্রত্যক্ষফল ও গণিতফল মিলাইয়া দেখিয়া ঐ ভুল প্রতিপন্ন হইলেও যিনি স্বীকার না করেন, তাহাকে সহজ মানবভাবাতে অন্ধ বলা যায়। মনে করুন, যদি কোন গ্রহের গতিতে এক কলা প্রমাণ ভুল থাকে, তবে ৬০ বৎসরে তাহার পরিমাণ এক অংশ হইয়া দাঁড়ায় এবং ৬০০ বৎসরে তাহা ১০ অংশে পরিণত হয়; যে

গ্রহগতিতে এককলা মাত্র ভুল থাকে, তাহার গতি ৬০০ বৎসরে ১০ অংশ ব্যতিক্রম হইয়া যায়। আমাদের গণন-প্রণালী এত প্রাচীন যে, তাহাতে এক কলার অতি ক্ষুদ্রাংশ ভুল থাকিলেও বহুশতাব্দীতে কোন গ্রহগতি অর্দ্ধদিন ব্যতিক্রম হইলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ দেখি না। যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে, গ্রহগতিরই বৈষম্য ঘটিয়াছে, তথাপি যে পর্য্যন্ত সেই গতি-বৈষম্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হই, সে পর্য্যন্ত আমাদিগকে গণনার উপরেই নির্ভর করিতে হইবে এবং ঐ বৈষম্য গণনাতে আরোপ করিতে হইবে। ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানেও তাহা করা হইতেছে, ক্রান্তিপাত গতি, ভূ-বিকুম্পন (nutation), আলোকাপসরণ (aberration,) লম্বন (parallax) ইত্যাদি যে কোন কারণে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আপাতদৃশ্য স্থিতিতে বৈলক্ষণ্য ঘটে, তাহা সমস্তই ঐ স্থিতিতেই আরোপ করা হয়। যেমন পৃথিবীর গতি সূর্য্যে আরোপ করিয়া সৌররাশিচক্র পরিভ্রমণ কালকে আমরা বৎসর বলিয়া গণনা করি, এস্থলেও দৃষ্ট পদার্থের স্থিতি নির্ব্বাচন করিতে হইলে আমাদের গতি-বৈষম্য অগোচর থাকাতে উক্ত পদার্থে যে স্থিতি-বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহা আমাদের গণিত স্থিতি ফলেতেই আরোপ করিতে হইবে।

"প্রকৃতি" বলিতেছেন যে, হিন্দুগণ চন্দ্র সূর্য্যের গতি ধরিয়া পঞ্জিকাগণনা করিয়াছেন, অতএব এস্থলে পৃথিবীর গতির কথা উত্থাপনই অপ্রাসঙ্গিক। আমিও তাহা স্বীকার করিয়া লইতেছি এবং চন্দ্র সূর্য্যের গণিত গতিফলের সহিত যে তাহাদের প্রত্যক্ষ ফলের বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে, তাহা বিদূরণ জন্যই যত্ন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় উক্ত সভাস্থলে যাহা বলিয়াছেন, "প্রকৃতি" তাহার সারমর্ম্ম দিয়াছেন, তাহাতে পঞ্জিকা-সংস্কারের আবশ্যকতার দুইটী কারণ দর্শান হইয়াছে, (১) প্রচলিত গণনানুসারে গ্রহণ গণনা প্রায়ই মিলে না; এবং (২) তিথি ইত্যাদির পরিমাণও, অনেক স্থলে অনৈক্য দেখা যায়। যদি গ্রহণ গণনা এত শতাব্দী ধরিয়া সর্ব্বদা মিলিয়া আসিত, তবে আমি একান্তই আশ্চর্য্য হইতাম এবং প্রকৃতি বিরুদ্ধ-কার্য্য হইতেছে বলিতাম। তিথি গণনাও যে সর্ব্বস্থলে অনৈক্য হয় না, তাহাই একান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা না হইবার কারণ আছে। হিন্দু জ্যোতিষ-মতে চন্দ্রের গতি এত ঠিক যে, ইয়ুরোপের এত চন্দ্রতন্ত্র ব্যবহার দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে যে গতিকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার সহিত বহুশতাব্দী পূর্ব্বে গণিত হিন্দুজ্যোতিষের গতিকালের এক সেকেণ্ড সময়ের পঞ্চাশাংশের একাংশ মাত্র অন্তর দৃষ্ট হয়। তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, বৎসরে প্রায় দুই সেকেণ্ড এবং ৩০ বৎসরে এক মিনিটকাল ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে; এই হারে এক ঘণ্টা সময়ের ব্যতিক্রম ঘটিতে প্রায় ১৮০০ বৎসর লাগিবে, অর্থাৎ যদি ইয়ুরোপীয় গণনাকে ঠিক ধরা যায়, তবে হিন্দুগণনা ও ইয়ুরোপীয় গণনা একত্রে মিলাইয়া আরম্ভ করিলে ১৮০০ বৎসর পরে তাহাদের একঘণ্টা অন্তর দৃষ্ট হইবে। কাজেই আমরা যদি এখন গ্রহণকালেতে কয়েক ঘণ্টার ব্যতিক্রম দেখি, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ

নাই। ইয়ুরোপীয় গণনাও যে একবারে ঠিক, তাহা কেহই বলিতেছে না, তবে প্রতিবর্ষে প্রত্যক্ষ ফলের সহিত গণিত ফলের ঐক্য করিয়া লওয়া হইতেছে বলিয়া এত ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইতেছে না। নতুবা যদি এখন হইতে সমস্ত ইয়ুরোপীয় মানমন্দির সকল বন্ধ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র গণনার উপর তাহাদের পঞ্জিকাকে নির্ভর করিতে হয়, তবে প্রত্যক্ষ ফলের সহিত সামঞ্জস্য করার অভাবে কয়েক শতাব্দীর পর তাহাদেরও গণনা প্রত্যক্ষ ফলের সহিত মিলিবে না। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মেন জ্যোতিষী বেশেল (Bessel) যে গণন প্রথা প্রচলিত করিয়া যান, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রুশ্ জ্যোতিষী ষ্ট্রুভ্ (Struve) কর্ত্তৃক তাহা সমস্তই সংশোধিত হইয়াছিল। এক শতাব্দীতেই যখন এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, আমাদের বহুশতাব্দী ধরিয়া গণনাতে যে দিনমানের প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে না, ইহার জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

আমার প্রবন্ধ ক্রমে দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত লেখা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, অতএব এখন 'প্রকৃতি'কে ছাড়িয়া 'হিতবাদী'র প্রবন্ধের কয়েকটী কথার উত্তর দেওয়া যাউক। হিতবাদীর সহিত আমি একমত হইতেছি যে, বঙ্গদেশে পঞ্জিকা-বিভ্রাট ঘটিয়াছে এবং তাহা দূর করা প্রয়োজন; কিন্তু আমি হিতবাদীর প্রদর্শিত দুইটী উপায়ের কোনটাই সমর্থন করিতে পারিতেছি না। 'প্রকৃতি' ত সৎকার্য্যেরই বিরোধী, কিন্তু 'হিতবাদী' সৎকার্য্যের পক্ষপাতী হইয়াও তৎশোধনার্থ অসদুপায় অবলম্বনে পরামর্শ দিতেছেন। হিতবাদী সায়ন ও নিরয়ণ গণনা প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নিরয়ণ হইতে সায়ন গণনাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ; এবং তাহার অনেকগুলি হেতু দর্শাইয়া সায়ন মতে পঞ্জিকা গণনার আবশ্যকতা বুঝাইতে যত্ন করিয়াছেন।

অগ্রে আমাদিগকে এইটী বুঝিয়া লইতে হইবে যে রাশিচক্র এবং ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) হিন্দুমতে এক নহে এবং পাশ্চাত্য মতে তাহারা উভয়ই এক। হিন্দুমতে রাশিচক্র স্থির নক্ষত্রের অবস্থিতি দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় এবং ঐ সকল নক্ষত্রের স্থিতি অনুক্রমে রাশি সমূহ গণনা হয়। ইয়ুরোপীয় মতে ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবদ্বৃত্তের সম্পাত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রান্তিবৃত্তকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া রাশি সমূহ গণনা করা হয়; এবং ক্রান্তিবৃত্ত চলনশীল হওয়াতে তাহার রাশি বিভাগের সহিত ঐ সকল রাশির নামীয় নক্ষত্র সকলের স্থিতির কোন সামঞ্জস্য নাই। উপরোক্ত সম্পাতবিন্দু চলনশীল হওয়াতে, বর্ত্তমান সময়ে সূর্য্য যখন মেষরাশির আদি বিন্দুতে উপনীত হয়, তখন তাহা বাসন্তিক বিষুবদ্বিন্দু হইতে প্রায় এক বিংশতি দিনকাল অন্তরে থাকে। কিন্তু সূর্য্যের মেষরাশিতে প্রবেশকাল হইতে আমাদের বৎসর গণনা আরম্ভ হয়; অতএব আমরা যাহাকে মহাবিষুব সংক্রান্তি বলি, তাহা প্রকৃত পক্ষে মেষ সংক্রান্তি। সেইরূপ আমরা যাহাকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলি, তাহা প্রকৃত পক্ষে মকর সংক্রান্তি। এক্ষণে কথা এই, সংক্রান্তি শব্দদ্বারা আমাদিগকে সূর্য্যের রাশি সংক্রমণ বুঝিতে হইবে, কিম্বা

সূর্য্যের আপাতদৃশ্য কক্ষ পরিক্রমণ সংক্রান্তি বুঝিতে হইবে?

যে কালে হিন্দুজাতি হইতে আরবে ও আরব হইতে মিশরে জ্যোতির্ব্বিদ্যার শিক্ষা বিস্তার হয়, তখন মেষরাশির আদি বিন্দু ও বাসন্তিক বিষুবদ্বিন্দু এক সমসূত্রস্থ ছিল; কাজেই ভাষান্তর বশতঃ ভাব প্রকাশের ব্যতিক্রমে মিশর জাতি বিষুবদ্দিবসকেই সূর্য্যের মেষরাশিতে প্রবেশ দিবস বলিয়া গ্রহণ করিয়া লয়। কিছুকাল পরে যখন হিপার্কাস্ দেখিতে পাইলেন যে, বিষুবদ্বিন্দু মেষরাশির আদি বিন্দুর সহিত সমসূত্রস্থ নাই, তখন তিনি প্রচার করিলেন যে, ক্রান্তিপাত চলনশীল, এইহেতু ইউরোপে হিপার্কসই ক্রান্তি-পাত-গতির প্রথম আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া খ্যাত। তাঁহার নক্ষত্রজ্ঞান তত প্রখর না থাকাতে তিনি মেষরাশির আদি বিন্দু ছাড়িয়া দিয়া ক্রান্তিপাত হইতেই গণনা আরম্ভ করিলেন এবং তাহাকেই মেষরাশির আদিবিন্দু (First point of Aries) বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন; সেই হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইয়ুরোপে মেষরাশির আদি বিন্দু ও বাসন্তিক বিষুবদ্বিন্দু একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুগণ বহির্জ্জগতে কি হইতেছে, তাহার খবর না লইয়া নিজেদের মধ্যে গণনা ঠিক রাখিয়াছেন এবং উপরোক্ত বিন্দুদ্বয়কে পৃথক রাখিয়া বৎসর বৎসর তাহাদের অন্তর গণনা করিয়া আসিয়াছেন। ইয়ুরোপীয়গণ প্রকৃত রাশিচক্র হারাইয়া ক্রান্তিবৃত্তকেই রাশিচক্র মনে করিয়া তাহাতে রাশিবিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। ইয়ুরোপীয় জ্যোতিষে ইহা স্বীকার করা হইয়া থাকে যে, তাহাদের রাশির সহিত রাশির নামীয় নক্ষত্রের কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব ঐ রাশি কেবল বৃত্তবিভাগ ছাড়া তাহার অপর কোন অর্থ নাই। কিন্তু হিন্দুজ্যোতিষে রাশি নক্ষত্র দ্বারা গণনা হয় এবং তাহার উদয়াস্ত দ্বারা লগ্ন নিরূপণ হয়, অতএব তাহাদের কাছে রাশি কেবল বৃত্তবিভাগ নহে। তদ্ভিন্ন হিন্দুজ্যোতিষে চন্দ্রের গতি রাশি ও নক্ষত্রদ্বারা গণনা হয় এবং তিথ্যাদি সকল কাল গণনা নক্ষত্রভোগদ্বারা সম্পন্ন হয়। যাহারা সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে পঞ্জিকাগণনা করেন, তাঁহারা বার্ষিক ৫৪ বিকলা ক্রান্তিপাত গতি ধরিয়া পঞ্জিকা গণনা করেন, এবং প্রতি বৎসরের আরম্ভে ও শেষে মেষরাশির আদিবিন্দু ও বিষুবদ্বিন্দুর অন্তর ভাগকে অয়নাংশ নাম দিয়া পঞ্জিকাতে নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। ("বিশুদ্ধ পঞ্জিকা" নামে একটী পঞ্জিকাতে অয়নাংশ নামে পদার্থটীর একবারে লোপ দৃষ্ট হয়; বোধ হয়, পঞ্জিকাকার সংখ্যাটীর শুদ্ধত্ববিষয়ে সন্দেহ করেন, কিন্তু অশুদ্ধি সংশোধনের পরিবর্ত্তে তাহার একেবারে লোপ করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না)। এই অয়নাংশ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, পঞ্জিকা নিরয়ণ মতে গণনা করা হয়, অতএব যাঁহারা সায়ন ফল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা অনায়াসে সূর্য্য সিদ্ধান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের বিধিমতে অয়নাংশ প্রয়োগ পূর্ব্বক সায়ন ফল সাধন করিতে সক্ষম হইবেন। হিতবাদী যে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, নিরয়ণ ছাড়িয়া সায়ন গণনা করা বিধেয়, তাঁহার এইটী জানা উচিত যে, নিরয়ণের সাহায্য ভিন্ন সায়ন গণনা একরূপ অসম্ভব। যাঁহারা ইয়ুরোপীয় জ্যোতিষ জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাও ইহার সত্যতা উপলব্ধি

করিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও অগ্রে নিরয়ণ ফল সাধন করিয়া তৎপরে তাহাতে ক্রান্তিপাত গতি, ভূর্বিকম্পন, আলোকাপসরণ, লম্বনাদি বীজ প্রয়োগ পূর্ব্বক গণিত ফলকে প্রত্যক্ষ ফলের সহিত ঐক্য করা হয়। আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি যে, হিন্দুগণ সায়ন গণনা জ্ঞাত না থাকাতে, কিম্বা তাহার অভাবে আমাদের কাল গণনাতে যে বৈষম্য ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা তাঁহাদের বোধগম্য না হওয়াতে নিরয়ণ গণনা প্রচলিত করিয়া যান নাই। তাঁহারা আমাদিগকে সায়ন নিরয়ণ উভয়বিধ গণনা প্রণালী দিয়া গিয়াছেন এবং এক হইতে অপরের সাধন প্রণালীও দেখাইয়াছেন; তবে যে নিরয়ণের প্রাধান্য দেখাইয়া গিয়াছেন এবং নিরয়ণ প্রথাই প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, বিশিষ্টরূপ যন্ত্রাভাবে তাঁহারা একমাত্র স্থির নক্ষত্র ভিন্ন গ্রহগতি তুলনা করিবার অপর কোন সুযোগ পান নাই, তাই আমাদের রাশিচক্র নক্ষত্রাবস্থানদ্বারা গণনা হয় এবং আমাদের সংক্রান্তিও নক্ষত্র রাশি পরিক্রমণদ্বারা গণনা হয়। তবে এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সংক্রান্তি সকলের নাম মহাবিষুব, জলবিষুব, উত্তরায়ণ ইত্যাদি হইবার কারণ কি? তাহাতে আমি আমার অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি এবং হিন্দু সমাজ যদি ঐ কারণে সংক্রান্তি শব্দের অর্থ বিষুবৎ পরিক্রমণ ইত্যাদি করিতে ইচ্ছা করেন, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, সায়ন ও নিরয়ণ গণনার পার্থক্য যদি পঞ্জিকা বিভ্রাটের কারণ না হইল, তবে পঞ্জিকা-বিভ্রাট ঘটিল কিসে? আমাদের গণিতফলের সহিত প্রত্যক্ষফলের ঐক্য হয় না কেন? তাহার আমি দুইটী কারণ দেখিতে পাই, (১) অয়ণাংশ যথাবিধি ব্যবহার করা হয় না, কারণ তাহার ব্যবহার করিবার প্রণালী পঞ্জিকাতে ব্যক্ত করা হয় না; (২) প্রত্যক্ষফল লাভাভাবে প্রাচীন গণনামতে বহুকাল ধরিয়া গণনা করিয়া আসাতে তৎকালে গণিত সংখ্যা সমূহে যে অতি সামান্য ভুল ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সমষ্টীকৃত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে এই বৈষম্য উৎপাদন করিয়াছে। নতুবা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারামতে চলিতেছিনা বলিয়া যে আমরা নরকে যাইতেছি, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। ইয়ুরোপেও আমাদের মতনই বৎসরারম্ভের বহুপূর্ব্বে পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় এবং সম্বৎসর কাল ধরিয়া প্রতিনিয়ত মানমন্দির সমূহে প্রত্যক্ষফল সাধন করা হয়। তদনন্তর বৎসরান্তে ঐ প্রত্যক্ষফল পূর্ব্বগণিত ফলের সহিত ঐক্য করা হয়। যদি উভয়ফলে বিশেষ অন্তর দৃষ্ট হয়, তবে গণিতাঙ্কে তাহা বিশোধিত করিয়া লওয়া হয়। এইরূপ প্রতিবৎসর গণিতফল এবং প্রত্যক্ষফলের সামঞ্জস্য সাধন করা হইতেছে বলিয়া ইয়ুরোপীয় পঞ্জিকা এত ঠিক চলিতেছে; নতুবা গণনা যেরূপই হউক না কেন, দৃষ্টফলের সহিত সর্ব্বদা মিল না রাখিলে সকল গণনাই কালবশে ভ্রমাত্মক-ফল প্রদান করিবে।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় যে একটী উপায়ে পঞ্জিকাবিভ্রাট বিদূরণ করিতে মত প্রকাশ করিতেছেন, হিতবাদীর মতের সহিত তাহার ঐক্য হইতেছে।

তাহা এই যে, ইংরাজী পঞ্জিকা যে নিয়মে প্রস্তুত হয়, আমাদের পঞ্জিকাও সেই নিয়মে হইবে। আমি ইংরাজী পঞ্জিকা প্রণয়ণের কয়েকটী নিয়ম গ্রহণ করিতে অনুমোদন করি ; যথা,—মানমন্দির স্থাপন করিয়া রীতিমত যন্ত্রব্যবহারপূর্ব্বক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ ফলসাধন ; গণিতফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলের ঐক্যতাসাধন ; আমাদের গণনাপ্রণালীতে যে সকল ভ্রম আছে, তাহা সংশোধন। কিন্তু আমাদের প্রণালী একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ তাঁহাদের প্রণালী অনুকরণ করিতে মত দিতে আমি রাজি নই। যে গণনাপ্রণালী বেইলী (Bailly), কেশিনি (Cassini), লাপ্লাস (La Place), লাগ্রাঞ্জ (Lagrange) প্রভৃতি জ্যোতির্বিদবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা না বুঝিতে পারিয়া কিম্বা তাহা ব্যবহারে অসমর্থ হইয়া পরিত্যাগ করিতে যাওয়া যেন মর্কটের মুক্তাহারে অনাদরের মতন বোধ হয়। আমাদিগকে পঞ্জিকাবিভ্রাট বিদূরণ করিতে হইলে দুইটী কার্য্য করিতে হইবে ; (১) অয়ণাংশের ব্যবহারশিক্ষা ও তাহার প্রচলন করিতে হইবে এবং তদনুষঙ্গিক অপরাপর সংশোধন। বীজ সমূহ, যাহা আমাদের জ্যোতিষে পাওয়া যায় না, তাহা ইয়ুরোপীয় প্রণালী হইতে গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু আমাদের পঞ্জিকা গণনার প্রণালী সর্ব্বদা নিরয়ণ রাখিতে হইবে। কেবল প্রত্যক্ষ ফলের সহিত ঐক্য করিবার কালেই ঐ সকল বীজের প্রয়োজন হইবে। (২) প্রত্যক্ষ ফলসাধন জন্য মানমন্দির স্থাপন করিতে হইবে। ইহা না হইলে সায়ন মতেই গণনা করি, আর নিরয়ণ মতেই গণনা করি, হিন্দুমতেই গণনা করি, আর ইয়ুরোপীয় মতই মান্য করি, আমাদের পঞ্জিকাবিভ্রাট কখনও চিরকালের জন্য ঘুচিবে না।

বঙ্গদেশে মানমন্দির হওয়া আমি কিছুই অসম্ভব মনে করি না। হিন্দুধনীবর্গ যদি মনোযোগ করেন এবং অন্ততঃ বর্ষে নৃত্য-গীতাদিতে যত অর্থ ব্যয় হয়, তাহার কিয়দংশ করিয়া যদি জাতির গৌরব ও সম্মানরক্ষার্থ এবং সমাজের উপকারার্থ মানমন্দির স্থাপনে ব্যয় করেন, তবে একটী কেন, অচিরে বঙ্গদেশে অনেক মানমন্দিরের ধ্বজা উড়িতে পারে। ইয়ুরোপে কত দরিদ্র প্রাণপণ করিয়া এবং কত ধনী আমোদপ্রয়াসী হইয়া স্বীয় স্বীয় আবাসে মানমন্দির স্থাপন করিতেছেন। যাঁহাদের কাছে জ্যোতিষ খেলার বা আমোদের জিনিষ, তাঁহারা যখন এত করিতেছেন, তখন যে জাতির ধর্ম্মকর্ম্ম জ্যোতিষের উপর নির্ভর করে, তাঁহাদের ঐ বিদ্যার উন্নতির জন্য কত আয়াস ও অর্থব্যয় করা উচিত! আমার বোধ হয়, সকল হিন্দুমাত্রেই বিশ্বাস করিবেন যে, ধর্ম্মোৎসবে নাচগান অপেক্ষা উৎসবের কালজ্ঞানশুদ্ধিতে অধিক ফললাভ হয়।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়,
১লা মাঘ, ১২৯৮। } শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

পলাসী।

লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন কাঁটোয়া হইতে জল-পথে যাত্রা করিলাম। পলাসী ক্ষেত্র দেখিতে মনে বহুদিনের সাধ ছিল। ভাগিরথীর লহরীমালা নৌকাবক্ষে মৃদু আঘাত করিতে লাগিল, উজান বহিয়া উত্তরদিকে চলিলাম। হৃদয়ে চিন্তার ঢেউ বিবিধ ভঙ্গে প্রতিহত হইতে লাগিল।

কণ্টকনগরী যেমন প্রাচীন, তেমনই তীর্থ-ক্ষেত্র। প্রাচীন ধরণের সৌধ-মালা, রাজ-পথ, মুসলমান সময়ের গড়খাই ও দেবমন্দির প্রভৃতি ইহার প্রাচীনতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ হইতে কাঁটোয়ায় আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে স্থানে মস্তক মুণ্ডন হইয়াছিল, তদুপরি একটী তুলসী বেদিকা বিরাজ করিতেছে। কেশব-ভারতী এবং মধুনাপিতের "সমাজ" অর্থাৎ সমাধি আমাদের প্রাণে এক সুদূর প্রাচীন স্বপ্ন জাগ্রত করিয়াছিল। সেই নবোদিত ভানুর মত তরুণ সন্ন্যাসী নবগোরা মহাভাবে মাতোয়ারা হইয়া যেন প্রাণের ভিতরে জাগিতেছিলেন—মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সেই চারিশত বৎসর পূর্ব্বের চিত্র সকল ভাসিতেছিল। কখনও শচীমাতার ক্রন্দন-ধ্বনি সুদূর হইতে নৈশান্ধকার ভেদ করিয়া মর্ম্মে প্রতিধ্বনি তুলিতেছিল, মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা বিষ্ণুপ্রিয়ার দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণ কাঁদিতেছিল; কখনও শ্রীবাসের অঙ্গনে ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে গৃহী গোরার মধুর কীর্ত্তন, নর্ত্তন, কখনও বা রাঢ়ের জঙ্গলে অবধূত নিতাই সঙ্গে ভাবোন্মত্ত গৌরাঙ্গের ভ্রমণ স্মৃতিকে আলোড়িত করিতেছিল। কখনও বা বঙ্গপ্লাবী হরিধ্বনি কর্ণে আসিয়া গাত্র কণ্টকিত করিতেছিল। হৃদয়ে, নয়নে, শ্রবণে এই ভাব বহিয়া জাহ্নবীবক্ষে ভাসিয়া চলিলাম।

কেতকীনগরীর উত্তর পার্শ্ব দিয়া অজয়-নদী প্রবাহিত। অজয় ঐতিহাসিক নদী। সওদাগর শ্রীমন্তের ডিঙ্গা এই অজয় বহিয়া সিংহলে যাত্রা করিয়াছিল। সরলা লহনার বিরহগানে এক দিন এই অজয়তীর মৃদু মধুরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। শ্রীমন্ত এবং লহনা মুকুন্দরামের মানস-পুত্র কন্যা, অথবা বাস্তবিক সত্বাধারী নরনারী, তাহা ইতিহাস-লেখকেরা ঠিক করুন। সাক্ষাৎ হইবামাত্র অজয় কিন্তু আমাদের কাণে কাণে তাহাদের কাহিনী বলিল—বলিল, "এই বক্ষে শ্রীমন্তের ডিঙ্গা ভাসিয়াছিল, একদিন লহনা এই তীরে বসিয়া কাঁদিয়াছিল—দেখ, এ হৃদয়ের তলে আজও সেই ডিঙ্গার ছায়া মিলাইয়া আছে, লহনার চক্ষু-জলের দাগ আছে, আর গান লেখা আছে। যতদিন কবিকঙ্কনের স্মৃতি এবং চণ্ডীর সঙ্গীত থাকিবে, ততদিন ইহা অন্তর্হিত করে, এমন সাধ্য কাহার?" অজয়ের কথা আমাদের প্রাণ সত্য বলিয়া মানিয়া লইল।

অজয়তীরে জয়দেবের জন্মক্ষেত্র কেন্দ্র-বিল্ব বা কেঁদুলীগ্রাম। আমাদের মনে হইল যেন অজয় আজও জয়দেবের মধুর গানে অনুপ্রাণিত—যেন অজয়ের গৈরিক জল-প্রবাহ খরস্রোতে দ্রুত ধাইয়া একবারে লম্ফদিয়া "দেহিপদপল্লব মুদারম্" গাইতে গাইতে জাহ্নবীর উচ্ছ্বসিত বক্ষে ঝম্প প্রদান করিয়াছে। জাহ্নবী পদ-পল্লব না

দিয়া সসত্ত্বকে আপনা দান করিয়াছেন, আপনার কালরূপ ত্যাগ করিয়া অজয়ের গৈরিকরূপে আত্ম বিলীন করিয়াছেন—কাঁটোয়ার নিম্ন হইতে গঙ্গার বর্ষাকালের সমল জল গেরিমাটির মত লাল হইয়া যায়।

আবার মানস-চক্ষে দেখিলাম, সেই লোহিতাভ গৈরিক জলরাশি যেন নবঘন শ্যামরূপে পরিণত—অজয় নয়, কালিন্দী মৃদু কলনাদে তটভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া দ্রুত মনোরম গমনে প্রধাবিত, যেন পুলকমদভরে গাইতেছে, "চল সখি কুঞ্জং" ইত্যাদি। দেখিলাম, তটে কুঞ্জকুটীর—মধুকর নিকরকরম্বিত, কোকিলকূজিত। ললিত নবঙ্গলতা পরিশীলন মলয়-হিল্লোলে অপূর্ব্ব বাঁশরী সঙ্গীত, ক্রীড়া করিতেছে। নিকুঞ্জকুটীরে [illegible] নীরদবরণ বাঁকা নবশ্যাম, শিখিপুচ্ছ শোভিত চূড়া বামে হেলান, বিম্বাধরে সেই মোহনমুরলী বাজিতেছে। বুঝিলাম, বাঁশীর গানে পাগল-পারা হইয়া, কালিন্দী ছুটিয়াছে। ওকে আবার! মেঘের বিজলী ভূতলে কেন? রাকার সুষমা ঘনীভূত কেন? চাঁচরাবলী পৃষ্ঠে দোলাইয়া, পাগলিনী রাই ধাইছে ছুটিয়া। আঁচল পড়িছে ভূতলে লুটি, কমল ফুটিছে কঙ্কর উপরে—রাতুল রক্তিম চরণ দু'খানি। কনকপ্রভায় কানন উজলি, থরে থরে সাজি লাখ লাখ চাঁদ ভূতলে কেন যাইছে ছুটি। দাঁড়া, পাগলিনি। শুনে না কথা। কমলনয়ন মুদিত সদা। জাহ্নবী চাঁদে চাহিছে উছলি—রক্তিম কপোলে কেন গো ধারা? দাঁড়া পাগলিনি, দাঁড়া। শুনে না কথা। বুঝিলাম, বাঁশীর গানে কমলিনী পাগল-পারা। চাঁদের আসরে শতেক তারা। বুঝিলাম, ললিতা বিশখাদি গোপিনী তারা। তারাও অবাক্, তারাও আপনা হারা; তারাও পাগল-পারা, নয়নে বহিছে যুগল ধারা। বাঁশি, তোমার গানে কত শক্তি? গানের টানে একটা সৌর-জগৎ ভূতলে নামিয়া ছুটিয়া চলেছে! একবার থাম। না—ইচ্ছা হয় না। শত শত বর্ষ বাজিয়াছ, লাখ লাখ বৎসর বাজিবে, তারপরেও বাজিও। তুমি থামিলে বিশ্ব মরিবে, জগৎ মরু হইবে, তুমি থামিও না।

স্বপ্ন ভাঙ্গিল। অজয় বহুদিনের বৈষ্ণব—চৈতন্যের বহুপূর্ব্বের বৈষ্ণব, জয়দেবের নিকট দীক্ষিত। বৈরাগী অজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, বৈষ্ণবভাবের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, বৈষ্ণব কল্পনায় ডুবিয়াছিলাম। কল্পনা, তুমি বাঁচিয়া থাক। এমন মধুর কল্পনা সুধা যে হৃদয়-সমুদ্র মন্থনে সমুদ্ভূত, সে হৃদয় ধন্য—সে হৃদয়ধারী ধন্য।

কাঁটোয়ার নিকটে, অজয়ের পরপারে এক আম্রস্তূপে ক্লাইবের ছাউনী পড়িয়াছিল। সে স্থানে এখন একটা আমের বাগান আছে। তাহা দেখিয়া, দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বের বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, তাহার নিকটে সেই ঐতিহাসিক আম্রকানন ছিল। ক্লাইব সসৈন্যে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া, এই ছাউনীতে তিনদিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। পাঠক, তখনকার দেশের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখুন। কলিকাতা হইতে কাঁটোয়ার দূরত্ব, বর্দ্ধমান হইয়া, একশত মাইল। বোধ হয়, ক্লাইব এই পথেই গিয়া থাকিবেন। গঙ্গার ধারে ধারে গেলেও, কাঁটোয়া, কলিকাতা হইতে একশত মাইলের বড় কম দূরে হইবে না।

বিদেশী ইংরেজ সওদাগরের অত্যল্প সংখ্যক সৈন্য ক্লাইবের তত্ত্বাবধানে পদব্রজে এই দূরপথ অতিক্রম করিয়া কাঁটোয়ায় পৌঁছিল। পথে কোন বাধা নাই। যেন বর-যাত্রীর দল বিবাহ বাড়ীতে উৎসব করিতে যাইতেছে। দেশের লোকেরা একবার ভাবিলও না, ইহারা সাজ সজ্জা করিয়া কোথায় যাইতেছে! পথে যদি প্রতিগ্রাম হইতে কয়েকটা করিয়া ঢিল বা হাঁড়ীর কানা, খোলাকুচিও ইংরেজ সৈন্যের উপরে বর্ষিত হইত, তাহা হইলেও, আজ একটু গৌরব করিয়া দুইটী কথা বলা যাইত। তাহার কিছুই হইল না। বরং সকলে ভয়ে ভয়ে গোরাদের রসদ যোগাড় করিয়া দিয়া অনুগৃহীত হইল। নবাবের ফৌজদার, কাজি, হাওলদার, তহসীলদার সকলে যেন নাসারন্ধ্রে সর্ষপ তৈল প্রদান করিয়া সুখ-নিদ্রায় নিমগ্ন। এই সৈন্যদল রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে পঁচিশ ত্রিশ মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী কাঁটোয়াতে তিন-দিবস নিরাপদে বিশ্রাম করিল, অনায়াস-লব্ধ রসদে উদরপূর্ত্তি করিল, বিপক্ষে একটা টুন্‌টুনী শব্দ করিল না, একটা পিপীলিকা দংশন করিল না। শুনা যায়, মীর জাফরালী খাঁ সসৈন্যে কাঁটোয়ায় আসিয়া ক্লাইবের সঙ্গে মিলিত হইবেন, এইরূপ কথাবার্ত্তা ছিল। ক্লাইব তাঁহার অপেক্ষায়ই কাঁটো-য়ায় ছাউনী ফেলিয়াছিলেন। বিশ্বাস-ঘাতক এবং তস্করের সাহসবীর্য্যের পরিচয় অদ্যাবধি পৃথিবীতে কোথাও পাওয়া যায় নাই। ধূর্ত্তাধম ভীরু জাফরের প্রতিজ্ঞার অসারতা প্রমাণিত হইল, ক্লাইব তাহা বুঝিলেন। আরো শুনা যায়, ছাউনীতে যে যুদ্ধসমিতি বসিয়াছিল, তাহার সকল সভ্যই ক্লাইবকে প্রত্যাবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু ক্লাইব সমস্ত রাত্রির চিন্তার পরে তাঁহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া, ইংরেজ সৈন্যকে কাঁটোয়ার ঘাটে গঙ্গাপার হইতে আদেশ করিলেন—সৈন্যদল পলাশীর অভিমুখে অভিযান করিল।

ক্লাইব বুদ্ধির কাজ করিলেন। দেশের এই ভাবগতিক দেখিয়া, রাজ্যলক্ষ্মীর এই-রূপ শীথিলতা দেখিয়াও, যদি তিনি প্রতি-নিবৃত্ত হইতেন, তবে বিধাতা তাঁহার উপরে নিতান্তই প্রকোপান্বিত ছিলেন বলিয়া মনে করিতাম। এমন সুযোগ কে ছাড়ে? যুদ্ধসমিতির সভ্যগণ সত্য সত্যই ইংরেজ-কুল-কলঙ্ক ছিলেন। নতুবা এমন হাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিতে অসম্মত হইবেন কেন? এমন নিশ্চেষ্টতা, এমন বর্ব্বরতা, এমন ভীরুতা, এমন বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্ম-দ্রোহিতার সমাবেশ কি লোক-জগতে সহজে ঘটে? একদল বিদেশী দোকান-দার, বিশেষত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত দোকানদারতো অতি শক্তিশালী, তাহাদের কথা তো অতি বড় কথা। এমন মূর্খের রাজ্যে, এমন ভীরুর দেশে, এমন শুদ্ধ শ্মশানক্ষেত্রে, একটা বড় ভেক যদি এক দল বেঙাচি লইয়া উত্থান করে এবং বলে যে রাজ্য কাড়িয়া লইব, তাহাও যে শোভা পায়! এমন যাচিত প্রভুত্ব এবং বীরত্ব যে হাত পাতিয়া না লয়, তাহার মত নির্ব্বোধ কে?

কথিত আছে, দেশের বড়লোকেরা কোম্পানির অধিনায়ক ক্লাইবকে নবাবের বিরুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। দেশময় গুপ্তচক্রান্ত চলিতেছিল। এই চক্রান্তের প্রধান পরিচালক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণ-

চক্র দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া দেশের প্রধান লোকদিগকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। বঙ্গাধিকারী রায় রাম-দুর্ল্লভ, রাজবল্লভ, উমীচাঁদ, তৎকালীন জগৎশেঠ এবং সৈন্যাধ্যক্ষ মীর জাফর-আলী খাঁ প্রভৃতি এই গুপ্ত চক্রান্তে সংসৃষ্ট ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা কর্ত্তৃক অত্যাচারিত বা স্বার্থ-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। অন্যায্য রাজ্য-লোভ ব্যতীত জাফরের উত্তেজনার অন্যতর কারণ দেখা যায় না। কিম্বদন্তীতে জানা-যায়, রায় দুর্ল্লভের বাটীর পার্শ্বে নবাবের এক প্রমোদভবন ছিল। ভবনে সিরাজ মধ্যে ২ আগমন করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। বঙ্গাধিকারী রায় দুর্ল্লভ রায়ের এক যুবতী [illegible] রূপবতী বিধবা দুহিতা ছিল। নানাবিধ ঘটনায় বঙ্গাধিকারীর মনে সন্দেহ হইল, কালে কন্যা নবাব-কবলে পতিত হইতে পারে। সুতরাং তিনি তরুণ বয়স্ক নবাবকে তাঁহার বাটীর নিকট হইতে প্রমোদ ভবন স্থানান্তরিত করিতে প্রাণপণে অনুরোধ করিলেন। নবাব তাহাতে কর্ণ-পাত না করাতে দুর্ল্লভ রায় সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। জগৎশেঠেরও ক্রোধের বিবিধ কারণ শুনাযায়। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী মৃত্যু সময় শেঠ মহাশয়ের হস্তে অনেক অর্থ ন্যস্ত করিয়া যান। তরুণ বয়স্ক সিরাজ তাহা অপব্যয় করিতে না পারে, এইরূপ নিষে-ধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। সিংহাসনারূঢ় হইবার পরে চপলমতি বালক সিরাজের মনে এক অদ্ভুত খেয়াল উপস্থিত হয়। তিনি গঙ্গার ভাঙ্গন নিবারণ জন্য ছাবঘাটির মোহনা হইতে ভাগিরথীর দুই তটে পোস্তা-বন্দি (embankment) করিতে উদ্যোগী হন। এই কার্য্যে বৃদ্ধ জগৎশেঠ অর্থদানে অসম্মত হওয়ায় উভয়ে মনোবাদ ঘটে। শুনা যায়, নবাবের পাপ-পিপাসার পূতি-গন্ধময় স্রোত শেঠের অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। বঙ্গাধিকারী এবং জগৎশেঠ মূলত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নবা-বের অধীনস্থ ছিলেন না। ইঁহারা উভয়ই নবাবের মত দিল্লির সম্রাটের নিয়োজিত লোক ছিলেন। বঙ্গাধিকারী কানুনগো (Settlement officer) এবং জগৎশেঠ ধনাধ্যক্ষ (Banker) ছিলেন। ইঁহাদের উভয়েরই বাটীর ভগ্নাবশেষ মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে কালের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। জগৎশেঠের কীর্ত্তি এখন গঙ্গার করাল কবলে পতিত। বোধ হয়, কিছুদিন পরে আর চিহ্নও থাকিবে না।

প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী এই সময়ে বঙ্গের প্রধান জমিদার ছিলেন। ইঁহার হস্তে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। ইঁহার প্রচুর ধনবল ও সৈন্যবল ছিল। প্রজা-দিগকে প্রাণদণ্ডাদি সর্ব্ববিধ দণ্ড দানের অধিকার ছিল। রাণী এই সময়ে আজিমগঞ্জের নিকটস্থ তাঁহার প্রকাণ্ড ভবনে, বিধবা দুহিতা তারা দেবীর সহিত গঙ্গাবাস করিতেছিলেন। তারা অপূর্ব্ব সুন্দরী—তৎকালীন বঙ্গীয় রূপসীমণ্ডলে আদর্শরূপবতী ছিলেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে তারার বিবাহ হয়, বিবাহের সাত দিবস পরে তিনি বিধবা হন। এখন তারা পূর্ণ-যৌবনা। একদিন প্রাসাদ-শিখরে দাঁড়াইয়া সিক্ত কেশের রাশি শুষ্ক করিতেছিলেন, এমন সময়ে নবাবের বজরা সেই ভবনের নিম্নস্থ জাহ্নবী বক্ষে ধীর গতিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। তরল-মতি নবাব শ্যেনপক্ষীর

মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই রূপ রাশি দেখিয়া মোহিত হইলেন। তাঁহার তরুণ প্রাণে তারার রূপের যে ছাপ বসিয়াছিল, তাহা তিনি কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। অবশেষে উন্মাদগ্রস্তের মত রাণীর নিকট তারা-প্রাপ্তির প্রস্তাব করিলেন। রাণী রোষে, ঘৃণায়, অপমানে সংক্ষুব্ধ হইয়া সেই পাপ-প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদান করিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কৌশলে পরাজিত হইয়া বল অবলম্বন করিলেন। ভবানী ভয় পাইলেন না, তাঁহার সাহস টুটিল না। এই সুপ্রাচীন ভবনের ভগ্নাবশেষ দেখিতে যখন গিয়াছিলাম, তখন বাটীর বর্ত্তমান অধিকারী উমেশ বাবুর সহিত বাঙ্গালার প্রাচীন ঐতিহাসিকতত্ব সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইয়াছিল। আলাপে বুঝিলাম, উমেশবাবু বিজ্ঞ, বহুদর্শী এবং অনুসন্ধিৎসু। তিনি বলিলেন, নবাব তারাদেবীকে হরণ করিতে যে সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত রাণীর পুরীরক্ষকদের একটী ক্ষুদ্র সংগ্রাম হয়। যুদ্ধে নবাবের সৈন্যদল পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছিল।

রাজবল্লভ ঢাকার নবাব মৃত নিবাইস অহম্মদের বিধবা পত্নীর সংসারে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। রাজবল্লভের বিরুদ্ধে দুইটী গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হয়। প্রথম অভিযোগ, তিনি ঢাকার কোষাগারের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছেন, দ্বিতীয় অভিযোগ, নবাব-পত্নীর সহিত তাঁহার অবৈধ সংস্রব আছে। নবাব-পত্নী সিরাজের মাতৃস্বসা ছিলেন। নবাব অভিযুক্ত রাজবল্লভকে মুর্শীদাবাদে তলব করিয়া কৌশলে বন্দী করিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বস্বাপহরণ জন্য ঢাকায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসের বুদ্ধি কৌশলে সম্পত্তি নবাবের হস্ত বহির্ভূত হইল। কিন্তু রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী রহিলেন। কৃষ্ণদাসকে লইয়াই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত নবাবের মনোবাদের প্রথম সূত্রপাত হয়।

চক্রান্তের প্রধান অধিনায়ক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাকী খাজানার জন্য অভিযুক্ত হন। তিনিও মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী ছিলেন এবং নবাবকর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইবার ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন।

এই সকল কিম্বদন্তী বা ইতিহাস হইতে জানা যায়, তখনকার দেশের প্রধান লোকেরা, তরুণবয়স্ক সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে নানাবিধ বৈধ এবং অবৈধ কারণে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। শুষ্ক ইন্ধন এবং অগ্নির বিদ্যমানতা সত্বেও যেমন শুধু সংযোগের অভাবে, অনেক সময়ে, অগ্নিকাণ্ড ঘটে না, তেমনই কিছুদিন সিরাজের বিরুদ্ধপক্ষের উত্থান নিরুদ্ধ ছিল। যেরূপ শুনা যায়, তাহাই অনুমান হয়, কৃষ্ণচন্দ্র এই অগ্নি-ইন্ধনের সংযোগকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তৎকালীন দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই বুঝাযায়, সিরাজের বালকত্ব এবং সৈন্যাধ্যক্ষ্য মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা, এই অগ্নি খণ্ডের অনুকূল বায়ুস্বরূপ হইয়াছিল। সিরাজের বিরুদ্ধে গর্ভিনীর গর্ভবিদারণাদি যে সকল ঘোর নৃশংসতার কথা কোন কোন ইতিহাসাদিতে পাঠ করা যায় এবং লোকমুখে শুনা যায়, অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তির মতে তাহা বিপক্ষপক্ষের মিথ্যা কুৎসারটনা সম্ভূত মাত্র। সিরাজ মুসলমানধর্ম্মে গাঢ় বিশ্বাসী

ছিলেন। মুর্শীদাবাদের বর্ত্তমান নবাব প্রাসাদের (Palace) সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে যে একটী প্রাচীন 'মস্‌জিদ" আছে, তাহা সিরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। নবাব এই মস্‌জিদে দৈনিক উপাসনা করিতেন। যখন মস্‌জিদ নির্ম্মাণ হয়, তখন নবাব প্রত্যহ প্রভাতে স্বয়ং মস্তকে করিয়া এক ঝুড়ি ইষ্টক বহন করিতেন। এই কাজকে তিনি পরম পুণ্য কার্য্য মনে করিতেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সম্বন্ধে আর একটী সুন্দর লোক-প্রবাদ আছে। একদিন ক্ষুদ্র তরণী বক্ষে ভক্ত রামপ্রসাদ মালসী গাইতে গাইতে যাইতেছিলেন। এই সময়ে নবাবের বজরা গঙ্গা বক্ষে ভাসিয়া যাইতেছিল। নবাব ভক্তের ভক্তিরসপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইলেন। ক্ষুদ্রতরি যখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, তখন সিরাজ অনুচরগণকে তরণী বক্ষস্থিত গায়ককে তাহার বজরার সন্নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন। অমনি "পরেন্দা" নামক দ্রুতগামী তরি বিশেষ বাজপক্ষীর মত ছুটিয়া গেল। একখানির পশ্চাতে দশখানি ধাইল। অগৌণে তরণীসহ রামপ্রসাদ নবাবের বজরার পার্শ্বে আনীত হইলেন। নবাব আদেশ করিলেন, গান গাও। রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর সুললিত ছিল না, তাহাতে মালসী ছাড়া অপর গান তিনি ভাল গাইতে পারিতেন না। তবু ভয়ে ভয়ে নবাবের মনস্তুষ্টির জন্য একটী হিন্দি গান ধরিলেন। নবাব শুনিয়া বলিলেন যে, অপর গান শুনিতে চাহি না, যে গান গাইতে গাইতে নৌকাবক্ষে যাইতেছিলে, সেই গান গাও। রাম প্রসাদ মালসী ধরিলেন। নবাব বহুক্ষণ বিমোহিতচিত্তে সেই সঙ্গীত শুনিয়া, গায়ককে প্রচুর খেলাত দিলেন।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘোর যুদ্ধের পর কলিকাতার দুর্গ অধিকৃত হইলে, নবাব গুরুতর অপরাধী কৃষ্ণদাসকে বুদ্ধিকৌশল ও সৎসাহসিকতার জন্য ক্ষমা করিয়া পুরস্কৃত করিলেন, পরাজিত ইংরেজদিগকে বন্দী করিলেন, বর্ত্তমান মণিপুরীদের মত বধ করিতে আদেশ করিলেন না। অন্ধকূপ হত্যা নবাবের সম্পূর্ণ অনবগতিতে এবং অনভিমতিতে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ডে নবাব দুঃখিত হইয়াছিলেন, ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট জীবিতেরা প্রাণদান পাইয়াছিল। কোন ইতিহাসলেখকই ইহা অস্বীকার করেন নাই। নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সপক্ষে এইরূপ অনেক গল্প আছে, অনেক কথা বলিবার আছে, অনেক সত্য ঘটনা আছে। সে সকল কথা বলিয়া প্রবন্ধকলেবর আরো সুদীর্ঘ করিব না। পাঠক, এই কথা কয়টী হইতেই বোধ হয় বুঝিয়াছেন, সিরাজ ধর্ম্মবিশ্বাসী এবং হৃদয়বান ছিলেন। এইরূপ ধর্ম্মবিশ্বাসী এবং হৃদয়বানের বিরুদ্ধে যে সকল অমানুষিক নৃশংসতার কথা প্রচারিত আছে, তাহা যে শত্রু-কপোলকল্পিত নয়, ইহা বোধ হয় এখন আর কেহই অসন্দিগ্ধচিত্তে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না।

পূর্ণিয়ার অকর্ম্মণ্য পানাসক্ত নবাব সকতজঙ, ঢাকার দুশ্চরিত্রা নবাবপত্নী এবং রাজবল্লভ প্রভৃতিকে দমন করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজারের কুঠি ও কলিকাতার দুর্গ অধিকার করিয়া ছয় মাস কালের রাজত্বমধ্যে অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক বালক সিরাজ কম সাহসিকতার পরিচয়

দেন নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মত প্রতাপশালী ভূম্যধিকারীকে বাকী খাজানার জন্য নজরবন্দী করিয়া রাজকার্য্যসম্বন্ধে অভিনিবেশেরও পরিচয় দিয়াছেন। সিরাজের সময়ে মুর্শিদাবাদের নিকটে কাশিমবাজার প্রভৃতি বেষ্টন করিয়া গঙ্গার একটী ভয়ানক বাঁক ছিল। এই বাঁকটী ঘুরিতে অনেক সময় ব্যয় হইত। অথচ বাঁকের দুইটী মুখের ব্যবধান অতি সামান্য। নবাব এই ব্যবধান ভূমি কাটিয়া পথ সুগম করিতে বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এখন এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়া সুখ্যাতিভাজন হইয়াছেন। কিন্তু শত্রুপক্ষীয়েরা নবাবের এই কল্পনাকে বিষম খামখেয়ালি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা বলি, সাধারণ হিতকরকার্য্যে যে নবাবের মতি ছিল, এই ঘটনা তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

বিলাসপরায়ণতা মুসলমানজাতির প্রায় সাধারণ চরিত্রগত দোষ। ভারতের অল্পসংখ্যক মুসলমান সম্রাট বা নবাব এই দোষ বর্জ্জিত ছিলেন। খ্যাতনামা আকবর সাহের মত সর্ব্বজনপ্রিয় সম্রাটকেও "নৌরোজা" ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সিরাজের এই চরিত্রদোষ প্রবল ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অপরাধে যদি সিরাজ সিংহাসনের অনুপযুক্ত ছিলেন, মনে করিতে হয়, তবে ভারতের অল্পসংখ্যক সম্রাট বা নবাবই রাজদণ্ড পরিচালনের অধিকারী সাব্যস্ত হইতে পারেন। পাঠক মনে রাখিবেন, সম্রাট সের সাহ ভীমসিংহের ধর্ম্মপত্নী পদ্মিনীকে হরণ করিতে গিয়া চিতোর ধ্বংস করিয়াছিলেন, বাদসাহ জাহাঙ্গীর সের খাঁর বৈধপত্নী মেহেরউন্নিসাকে হরণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। এইরূপ ঘটনা আর কত বলিব? কিন্তু ইঁহারা কি অপ্রতিহত প্রভাবে এই ভারতের রাজদণ্ড পরিচালন করেন নাই? স্থূলকথা, আমরা চিরদিনই শক্তের ভক্ত, নরমের যম। সিরাজ অপরিণত বয়স্ক বালক, তাঁহার কর্ম্মচারীগণ তক্ষক ও বিশ্বাসঘাতক, প্রবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিপক্ষ, দেশের প্রধান লোকেরা কেহ স্বার্থহানিতে, কেহ পাপের সমুচিত দণ্ডপ্রাপ্তিতে, কেহ বা অপমানে উত্তেজিত। তাঁহারা এবার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার সুন্দর সুযোগ পাইলেন। শুধু প্রতিহিংসা নহে, আরো কিছু ছিল। বুদ্ধিমান্, তেজস্বী সিরাজকে একবার কলে কৌশলে সরাইয়া গোবরগণেষ জাফর খাঁকে সিংহাসনে বসাইতে পারিলে, আমরাই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইব, নবাবসংসার লুটপাটের বিশেষ সুবিধা হইবে; জগৎশেঠ আলিবর্দ্দির ন্যস্ত ধন নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবেন, কৃষ্ণচন্দ্র বিনাকরে রাজত্ব করিবেন, রাজবল্লভ ঢাকায় অবাধে প্রভুত্ব করিবেন; প্রতিপক্ষের মনে এ সকল কুভাবের অভাব ছিল না! কিন্তু সিংহের মুখের সম্মুখে কে যাবে, মেও কে ধরিবে? জাফর, মীরমর্দ্দান, ক্লাইব। একজন সাহস করিলেন— শুধু একটী প্রাণী বলিলেন, নিজবাহুবলে সিংহকে পরাজিত কর। তিনি পুরুষ নহেন, স্ত্রীলোক,—রমণীকুলের শিরোমণি, তেজ, সাহস, বীরত্ব এবং মনুষ্যত্বের পুণ্যময় জন্মভূমি। তিনি কি বঙ্গরমণী? সাত রাজার ধন মাণিক চিতাভস্মে লুকান? উচ্ছ্বসিত মন্দাকিনী মরুভূমে প্রবাহিত? অথবা তিনি শাপভ্রষ্টা দেবী—সুরবীর-

বাঞ্ছিতপদ মূর্ত্তিমতী শক্তিদেবী শ্মশানে কেন? দেবীপুত্রগণ পিশাচ কেন? এমন বীরমাতার সন্তান ভীরু ফেরুপাল কেন? তিনি পুণ্যকীর্ত্তি রাণী ভবানী। ভবানী মহিষাসুরমর্দ্দিনী—তিনি যে সিংহকে মার্জ্জার জ্ঞানে বাহন করিয়াছেন। বাঙ্গালী চিরপ্রসিদ্ধ ভবানীর উপাসক, অথচ এমন অবিশ্বাসী জগতে নাই, কোন দিনই উপাস্যদেবীর আদেশ, মাতৃ-বাণী শুনিয়া চলে না। মা বলিলেন—বাঙ্গালীর আদর্শমাতা বলিলেন, তোমরা নিজবাহুবলে সিংহকে চাপিয়া মার, নতুবা আমি তোমাদের সঙ্গিনী হইব না। প্রাতঃস্মরণীয়া ভবানী চক্রান্তকারী ভীরুর দলে যোগ দিলেন না। ধিক্ কৃষ্ণচন্দ্র, ধিক জগৎশেঠ, ধিক্ রাজবল্লভ, ধিক্ বঙ্গবিচারী। তোমরা এখন পরলোকস্থ। নতুবা বলিতাম, এই রমণীর পদধূলি লেহন করিয়া জীবন সার্থক কর। স্ত্রীবুদ্ধি, স্ত্রীজনোচিত সাহসবীর্য্যও কি তোমাদের ছিল না? ধিক্, ধিক্, ধিক্। যে প্রতিহিংসা এবং ভীরুতা বা স্বাবলম্বনহীনতা ভারতে মুসলমানকে রাজসিংহাসন দিয়াছিল, আজ সেই ভীরুতা, সেই প্রতিহিংসা, সেই শৃগাল-ধূর্ত্ততা, ইংরেজরাজত্বের পত্তনভূমি নির্ম্মাণ করিয়া নির্ব্বাপিত হইল। ইহাকে উত্থান বলে না, ইহারই নাম পতন। এক দিন ইটালী, হঙ্গারী, নব পৃথিবীর যুক্তরাজ্য উত্থান করিয়াছিল। ম্যাট্‌সিনি এবং গ্যারিবল্ডি, কশুথ ও ওয়াসিংটন, মহাযজ্ঞের হোতা এবং পুরোহিত ছিলেন। গত বৎসর ব্রাজিল এবং চিলী উত্থান করিয়াছিল, আয়রলণ্ড ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিতেছে। অত্যাচারীর একচ্ছত্রতা কিরূপে ফুৎকারে উড়াইতে হয়, শিখিয়া লও। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্থান করিয়াছিল, ফরাসীজাতি। পদভরে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিল, গ্রহ কক্ষভ্রষ্ট হইল, সূর্য্য বিপথে ধাইল, নক্ষত্র খসিয়া পড়িল, নদী উজান বহিল, সমুদ্রের তরঙ্গ দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিল, পবনরাজ সচকিতে চমকিলেন, এক যুগ ভবিষ্যতের সহস্র যুগ টানিয়া আনিল, মানবের কেশাকর্ষণে চিরবিজয়ী কাল পদানত হইয়া আজও নরজাতির সেবা করিতেছে। উঠিতে হয় এমন করিয়া, বঙ্গের অবস্থা তখন তেমন ছিল না।

আমাদের ক্ষুদ্র তরণী পালবক্ষ-বিস্তারপূর্ব্বক গঙ্গাবক্ষ বিদারণ করিয়া ছুটিল। কাঁটোয়ার যে ঘাটে ক্লাইবের সৈন্যদল পার হইয়াছিল, তাহা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। দেশীয়দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা ধরিয়া উদয়োন্মুখ সূর্য্যালোকে আলোহিতাভ কান্তি, লোহিতবেশধারী গোরার দল ধীরসমীরে জাহ্নবীবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে কাঁটোয়ার ঘাট পার হইয়াছিল। বঙ্গের একজন প্রধান কবি, গঙ্গাবক্ষে ভাসমান গোরার দলকে, তদীয় কাব্যে জবাকুসুমের মালার সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই দিন স্নানের যোগ ছিল। ঘাটে বহুসংখ্যক লোক গঙ্গাস্নান করিতেছিল। তাহারা বুঝিল, গোরারা কাশিমবাজারের কুঠিতে কোন প্রয়োজনে যাইতেছে। কেহ কেহ বলিল, গোরাদিগকে নবাব তলপ দিয়াছেন, তাই তাহারা নবাব নাজিমকে সেলাম করিতে মুর্শিদাবাদে যাইতেছে। হায়! তখনো তাহারা বুঝিল না, ব্রিটিস-পুরোহিত ক্লাইব কল্য প্রভাতে কোম্পানীর হিতের জন্য— ব্রিটনের মঙ্গলার্থ মহাশক্তির পূজা করিবেন, ভারতবাসীর রুধিরে তাঁহার প্রীতিসাধন

করিবেন, তাই এই জবাফুলরাশি তুলিয়া, মালা গাঁথিয়া, জাহ্নবীনীরে ধৌত করিয়া মহাশ্মশান পলাশীতে যাত্রা করিয়াছেন।

আজ জাহ্নবীর দুই তট মুখরিত হইয়া আমাদিগকে অনেক কথা বলিল। কখনো দেখিলাম, গৌড় ও নবদ্বীপের হিন্দু সেনা বৈজয়ন্তী তুলিয়া বীরপদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া ধাবমান, পদশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। অপরাহ্ণ, ঊষায় পরিণত হইল। দেখিলাম, প্রাতঃস্নান-পূত ব্রাহ্মণগণ গঙ্গাজলে পূজা, সন্ধ্যা ও তর্পণাদি সমাপনান্তে বেদগান করিতেছেন, ঊষা সমীর-সঙ্গীত বক্ষে বহিয়া দিগন্ত মুখরিত করিয়াছে, পবিত্র সামগানে শ্রবণ সুশীতল হইল। কখনো বা দেখিলাম, সবলকায় পাঠান-সেনা যেন মদমত্ত হস্তিযূথের ন্যায় তটস্থ প্রান্তর ছাইয়া চলিয়াছে, কখনো বা হিন্দু সেনা-মিশ্রিত মোগল সেনা-বাহিনী তরঙ্গায়িত নদীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। আবার সহসা যেন ঘন ঘন অশ্বপদধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। দূরস্থ ধূলি-ধ্বজ দেখিয়া অশ্বক্ষুরাঙ্কিত ধূলিরাশি মনে করিতে লাগিলাম। বর্গীগণ অশ্বারোহণে বাঙ্গালা লুঠ করিতেছে। হিন্দু মোগল-সেনা-বাহিনী মধ্যে ও কে? বীর গৌরবে ললাট প্রদীপ্ত, শুভ্রশ্মশ্রুমণ্ডলে মুখ-মহিমা সুশোভিত, বর্ম্ম ও পঞ্চাস্ত্রে সজ্জিত, প্রকাণ্ড আরবীয় অশ্বে আরূঢ় নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মহারাষ্ট্রগণের পশ্চাতে বিদ্যুদ্বেগে প্রধাবিত হইয়াছেন। ভয়ে কৃষক-তাড়িত পঙ্গপালের ন্যায় পরাজিত মহারাষ্ট্রীয়গণ বাঙ্গালা ছাড়িয়া পলাইতেছে। ঐ দেখ, অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত লোহিত বৈজয়ন্তী বায়ুমণ্ডলে জয় ঘোষণা করিতেছে। মুহূর্ত্তে সকলই স্বপ্নে মিশ্রিত হইল। দেখিলাম, ক্লাইব-পরিচালিত গোরারদল সঙ্গীন-শোভিত বন্দুক স্কন্ধে পলাশীতে যাইতেছে। কাল ভারতরাজলক্ষ্মী ব্রিটন রাজার অঙ্কশায়িনী হইবেন। ঘন ঘন পাদুকা-শব্দ শঙ্খ কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। এইরূপ কল্পনায় যখন মগ্ন ছিলাম, তখন আমাদের ক্ষুদ্র তরী ধীরে ধীরে পলাশীর নিকটস্থ কালীগঞ্জের ঘাটে লাগিল। যদিও আমাদের এবারকার নৌকাযাত্রার এই শেষ সীমা, তথাপি সেরাত্রি সেই নৌকাতেই যাপন করিতে বাধ্য হইলাম।

দূরে শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢক্কা বাজিতেছিল। দগ্ধীকৃত ধূপ ধূনার সুগন্ধ, সৌকতবাহী বায়ু নাসারন্ধ্রকে ঘন ঘন উপহার দিতে লাগিল। সহযাত্রীবন্ধু অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া নদী-স্রোত-বিষয়ে একটা সুদীর্ঘ উপদেশ দিতেছিলেন, আমাকে কি মাঝীকে, তাহা আমি নিশ্চিত বলিতে পারিলাম না। বোধ হয়, মাঝীকে উপলক্ষ করিয়া আমাকে। উপদেষ্টারা স্বতই পার্শ্বস্থ লোকদিগকে অনভিজ্ঞ এবং মূর্খ মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং তখন তিনিও আমাকে এবং কৃষ্ণমাঝীকে নদী-স্রোত বিষয়ক জ্ঞানে নিতান্ত অন্ধ মনে করিতেছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য। কৃষ্ণমাঝী কি মনে করিল, জানি না, কিন্তু বক্তৃতান্তে আমি তাঁহাকে নদীস্রোতবিষয়ে সাতিশয় সঙ্কীর্ণ জ্ঞানী না ভাবিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার অভিমান-সর্পের মস্তকে বারম্বার লগুরাঘাত পড়িতেছিল, কিন্তু সেদিন কিছুতেই সে ফণা ধরিল না। ঝগড়া বিষয়ে আমি একজন উচ্চপদস্থ লোক। আমার উপাধি তর্ক-বহ্নি। কিন্তু সেদিন কেন জানি বহ্নি নিস্তেজ ভাব ধারণ করিয়া-

ছিল। সুতরাং এই উপলক্ষে যে একটী ক্ষুদ্র গজকচ্ছপী ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা ছিল; ভাগ্যে ভাগ্যে তাহা আর ঘটিল না। বন্ধু এখন নীরবে ভাবসাগরে নিমগ্ন। পরিচিত লোকদিগের মধ্যে অনেকে আমার বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির অপেক্ষা ভাবুকতা অতি প্রবল। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার ভাব সমুদ্রের মত প্রসারিত, হিমাদ্রি শৃঙ্গের মত উচ্চ। তাঁহার হৃদয় যখন গলিয়া যায়, তখন যেন বিশ্বপ্লাবিত করিতে চায়। ভাবে মুখশ্রী দিব্য শোভায় সুরঞ্জিত হয়, রোমাবলী এবং মস্তকের কেশ সকল ঊর্দ্ধমুখী হয়। তখন আর আমি মনে মনে তাঁহাকে বন্ধু বলি না, বলি, দেব—দেব তোমার পাদপ্রান্তে এ অধম কাঙ্গালকে স্থান দিয়া কৃতার্থ করিয়াছ। তাঁহার ভাব-গঙ্গাজলে হৃদয়ের বিরুদ্ধ-ভাব-পঙ্করাশি-ধৌত হইয়া সুদূরে প্রক্ষিপ্ত হয়, প্রাণ অমিয়াময় হয়, চিত্ত প্রশান্ততা লাভ করে। এই ভাবের রাজা এখন ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন।

লক্ষীর পূজা, আরতি করিয়া গ্রামবাসীরা নীরব হইল, অথবা সৈকত হইতে আর তাহাদের সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছিল না। নিশারাণী জাহ্নবীবক্ষে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। পদতলে অযুত হীরক-কমল প্রস্ফুটিত, মস্তকে পূর্ণচন্দ্র কিরীট, দিগন্তে জ্যোৎস্না-বাহু প্রসারিত। দেবীর আগমনে ভুবন মাতোয়ারা। জাহ্নবী যেন গাইতেছিলেন,—রাধিকামোহন কই, শ্যাম-বিলাসিনী সই, এ মধু যামিনী কো আব ভুঞ্জে? চন্দ্রমা বরখে সুধা, আবহি শ্মশানে সুধা, আবসে মুরলী বাজেনা কুঞ্জে। ইত্যাদি। কুলু কুলু, কল কল, তর তর রবে গঙ্গাজল বহিতে লাগিল, সৈকত হইতে চিতার পোড়া কাঠ, শেফালিকা ফুলের রাশ, শুষ্ক তৃণপুঞ্জ, ছিন্নমূল স্নিগ্ধবল্লরী সমভাবে বহন করিতে লাগিল। সম্মুখে পলাশীর শ্মশান। কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। শুধু মনে ধরিল, জাহ্নবীর সেই গানটী। সমস্ত রাম ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্নে শুনিলাম, "চন্দ্রমা বরখে সুধা, আবহি শ্মশানে সুধা, আবসে মুরলী বাজেনা কুঞ্জে।"

শেষরাত্রিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একটী বাহকসহ বন্ধু এবং আমি পলাশী-ক্ষেত্রাভিমুখে চলিলাম। আমার দিগ্‌ভ্রম ঘটিয়াছিল। পথ হাঁটিতে হাঁটিতে মনে হইল, চন্দ্রদেব ম্লান মুখে পূর্ব্বে অস্তগমন করিতেছেন, পশ্চিমদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া উদীয়মান সূর্য্যের লোহিত প্রভা বিকশিত হইয়াছে। প্রাণে অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হইল। মনে হইতে লাগিল, চন্দ্ররূপী নবাব সিরাজ পলাশীর যুদ্ধে হারিয়া ঐ পলাইতেছেন, লালমুখ ইংরেজ ভারতদখলে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একদিন বঙ্গের সিংহাসনে বসিয়া বহুদর্শী নবাব আলিবর্দ্দী ইংরেজের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "টুপীওয়ালারাই মুলুক দখল করিবে।" পঞ্জাব-কেশরী রণজিত পঞ্জাবের সিংহাসনে বসিয়া ভারতের মানচিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "সব লালহো যায় গা।" উভয়েই মহাপুরুষ, উভয়ের বাক্য আজ সফলতা লাভ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সব লাল হইয়া গেল, তরুলতা সোণার টুপী মাথায় পরিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল, পক্ষিকুল কলরব করিয়া বলিল "টুপীওয়ালার জয়!" পূর্ব্বের শুভ্র ভাগ্যশ্রী মলিন মুখে অস্তগমন করিল; পশ্চিমের লোহিত জয়শ্রী বিশ্বগ্রাস করিল।

পূর্ব্বের শান্তিপ্রদ শুভ্র সভ্যতা নিষ্প্রভ হইল, পশ্চিমের সভ্যতা প্রখর লোহিত আভা বিস্তার করিয়া জগৎ আবৃত করিল। তত্ত্বজ্ঞানের শ্বেত-পট্টবাস-পরিহিতা, শ্বেতবর্ণাভা, শ্বেত-পদ্ম-সমাসীনা পূর্ব্বীয় বীণাপানি শুভ্র মুখ-চন্দ্র আবৃত করিলেন, পাশ্চত্য বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ সমাকীর্ণা সরস্বতী লোহিত চেল বস্ত্র পরিধান করিয়া ধরায় অবতীর্ণ হইলেন। অথবা বারুণীর রুধির উদ্‌গীরণ দেখিয়া শুভ্র প্রশান্ত পূর্ব্বদিগঙ্গনা লাজ ভয়ে আত্ম সম্বরণ করিলেন।

"ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা, তার নাম মহা উষা," এই মহা উষায় আমরা একটী ক্ষুদ্র কল্লোলিনী পার হইয়া, তুত-ক্ষেত্র-শোভিত ক্ষুদ্র পলাশীগ্রামের সম্মুখীন হইলাম। কৃষক-সমাজ জন-সমাজের স্তন্যদাত্রী ধাত্রী। একজন ইংরেজ-লেখক বলিয়াছেন, "রমণীজাতি জনসাধারণের মাতা ও গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা। যে সমাজে রমণী হতাদৃতা এবং দাসীস্থানীয়া, সে সমাজের উন্নতির দ্বার চিরতরে অর্গলনিবদ্ধ।" যে সমাজে কৃষক অনুন্নত এবং দরিদ্র, সে সমাজ সৌভাগ্যের প্রথম সোপান হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। অস্থিচর্ম্মসার রুগ্ন ধাত্রী যেমন প্রচুর দুগ্ধদানে শিশুর শরীরের বল ও স্বাস্থ্য বিধান করিতে অসমর্থ, অন্নাভাবে, ক্ষীণদেহ দরিদ্র কৃষকও সমাজ-শিশুর দেহ-রক্ষায় তদ্রূপ অক্ষম। দুর্ভাগ্যবশত, ভারতের মাতা এবং ধাত্রী উভয়ই একরূপ দুর্দ্দশান্বিত। যাহাদের বিন্দু বিন্দু রুধির দ্বারা জমিদারের উন্নত সৌধচূড়া গঠিত, যাঁহাদের রুধির বিন্দুতে বড়লাট, ছোট লাটের টেবিলের দেবভোগ্য ভোজ্য দ্রব্য সকল বিরচিত, যাহাদের বুকের রক্ত, ইংরেজবণিক জাহাজে বহিয়া, ব্রিটেনিয়ার সমৃদ্ধিকে জগতে অতুলনীয়া করিতেছে, যাহাদের রক্তমাংস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থের অভিমানী রক্তমাংসের নিত্যোপাদান, সেই কৃষকের কটিতে কৌপীন যোটে না, পেটের অন্ন সংঘটন হয় না, রাজা জমিদারের অত্যাচারে চক্ষের জল শুকায় না। ভারতের জেনেরেল বুথ কবে জন্মিবেন? ভারতের যে প্রদেশে যাও, সেখানেই রমণী ও কৃষকের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া কাতর হইবে। পলাশীগ্রাম কৃষক-পল্লী। সকাল বেলায় মলিন ছিন্ন কৌপীন-ধারী কৃষকগণ স্থানে স্থানে পথের ধারে দাঁড়াইয়া ধূম পান ও আলাপাদি করিতেছিল। তাহাদের মলিনমুখে দুঃখ, দুর্দ্দশা এবং দারিদ্র্যের দীর্ঘলিপি পাঠ করিতে করিতে চলিলাম। একস্থানে একটী তুতক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, তুত-তত্ত্ব কিঞ্চিৎ অবগত হইলাম, একস্থানে পটলগাছ রোপণ করিতে দেখিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইলাম। পল্লীতে আসিয়া কৃষকদিগের নিকট গুটি ও গুটিপোকার অনেক তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম। গুটিপোকা দেখিতে চাহিলে, একজন সরল কৃষক অতিযত্নে তাহা দেখাইল। গুটিপোকা রক্ষা করিবার ডালাও দেখিলাম। প্রজাপতির অনেক জীবনবৃত্তান্ত সরল কৃষকমুখে শুনিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধ-কাহিনী কিছুতেই আজ মনকে ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করিল না। যাহাকে সম্মুখে দেখিলাম, তাহাকেই সেই খবরটা আগে শুধাইলাম। সে কাহিনী আজ সকলের নিকটেই প্রাচীন ইতিহাসে পরিণত। উত্তরে নানা জনে নানা কিম্বদন্তী বলিল।

ক্রমে পলাশী-ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। সম্মুখে এক প্রস্তর-স্তম্ভে ইংরেজিতে লিখিত আছে, "পলাশী, ১৮৮৩খ্রীঃ অব্দে স্থাপিত।" গাত্র কণ্টকিত হইল, দেহস্থ রুধির-প্রবাহের গতি ফিরিল, হৃদ্‌কোষ তরঙ্গায়িত হইল। যে সম্মুখে আসিল, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যুদ্ধ হইয়াছিল, জান কি?" কেহ বলিল, "এই স্থানে।" কেহ বলিল, "সম্মুখে যাও।" একজন, বিশ্বাস-ঘাতক মীর মর্দ্দানের সমাধি দেখাইল। তখন আর তাহা দেখিতে প্রবৃত্তি হইল না। ফিরিবার সময় দেখিব, ভাবিয়া পূর্ব্বদিকে ছুটিলাম,—আমার মতে পশ্চিমদিকে। একজন আমাদের কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, একটী কামানের গোলাবিদ্ধ প্রাচীন আম্রবৃক্ষের অধিষ্ঠান-ভূমি মাত্র দেখাইল। বলিল, "আমগাছটী ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সাহেবেরা কাটিয়াকুটিয়া সমূলে বিলাতে লইয়া গিয়াছে।" মনে মনে তাড়াতাড়ি ইংরেজের গৌরব-স্পৃহাকে দুই একবার ধন্যবাদ দিয়া, একটী ক্ষুদ্র কৃষকপল্লী পার হইয়া, পূর্ব্বদিকস্থ প্রান্তর সীমায় উপস্থিত হইলাম। যুদ্ধের সমকালে প্রান্তরে লোকের বসতি ছিল না, শুধু লক্ষাধিক আমের গাছ ছিল। কৃষক-জনপদটী অধুনা স্থাপিত হইয়াছে,—প্রান্তরের পশ্চিমসীমায় স্থাপিত। যে স্থানে ক্লাইব সাহেব ছাউনী রক্ষার্থ মাটীর কেল্লা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আমরা এখন সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইলাম। কেল্লার সুদীর্ঘ ধ্বংশাবশেষের উপরে একটী প্রাচীন বিল্ববৃক্ষ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন জঙ্গল বিরাজ করিতেছে। সম্মুখে বিস্তীর্ণ পলাশী-ক্ষেত্র। প্রান্তরের পূর্ব্ব, উত্তর, দক্ষিণসীমা নয়নপথবর্ত্তী হইল না। এইদিন অল্প অল্প কুয়াসাও হইয়াছিল। একদিন বঙ্গোপসাগরের তীরে দাঁড়াইয়া, যেমন স্তম্ভিত হইয়াছিলাম, আজ পলাশী ক্ষেত্রের বিস্তৃতি দেখিয়াও তদ্রূপ স্তম্ভিত হইলাম। প্রান্তরের পূর্ব্বসীমায় নবাবের ছাউনী পড়িয়াছিল। ক্লাইবের ছাউনীতে সপ্তশত গোরা ও অল্পসংখ্যক দেশীয় সৈন্য, নবাবের পঞ্চাশত সহস্রাধিক সৈন্য। ক্লাইব ভাগিরথীর তীরবর্ত্তী অতিসুন্দরস্থান মনোনীত করিয়াছিলেন। এই স্থান মনোনয়নে তাঁহার যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। নদী নিকটে থাকাতে, যেমন পলায়নের সুবিধা ছিল, তেমনই পানীয়াদি সংগ্রহের অত্যন্ত সুযোগ ঘটিয়াছিল।

এখন আর আমাদের চিন্তার সুশৃঙ্খলা নাই। বক্ষের প্রবল ঝড় ক্রমেই প্রবল হইতেছিল। দুইটী ক্ষীণজিবী বাঙ্গালী, দুইটী বহুদিনের পরাধীন দুর্ব্বলপ্রাণী, নির্নিমেষ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া, শুধু সেই মহাশ্মশানের পানে তাকাইয়া রহিলাম। শ্মশান-সমুদ্রের বক্ষে স্থানে স্থানে সমুচ্চ, সবুজ জনারার ক্ষেত্র দ্বীপাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে, সবুজ তৃণ ও শস্যক্ষেত্র মৃদু বায়ুর হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইতেছে, পূর্ব্ব প্রান্তে অরুণদেব সহস্র কিরণ বিস্তার করিয়া সেই উদাস-ময় বিশাল প্রকৃতির দর্শনকে আলোহিতাভায় রঞ্জিত করিতেছেন। আর উপরে নীল আকাশ নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হইয়া আছে। প্রাণে আপনা হইতে কত ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত হইল, আবার মুছিয়া গেল। সেই জাগ্রত স্বপ্নে কামানের শব্দ শুনিলাম। জ্বলন্ত, লোহিত লৌহ-গোলক রাজি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে, পূর্ব্ব

হইতে পশ্চিমে ছুটিয়া যাইতেছে, দেখিলাম। বন্দুকের গুলি, পক্ক ধান্যক্ষেত্র হইতে কৃষক-তাড়িত বাবুইয়ের ঝাঁকের মত, উভয় দিক্ হইতে উভয়দিকে ছুটিয়া পড়িতেছে, দর্শন করিলাম। দেখিলাম, মীরমর্দ্দান আধখানা প্রাণ—আধখানা হৃদয় লইয়া, যুদ্ধ—করিতে করিতে গোলাহত হইল, কোন্ পক্ষের গোলা কেহ বলিতে পারে না। "আমি ক্ষত্রিয় সন্তান," মোহনলাল গর্জ্জিয়া উঠিল। মোহনলাল, আলিবর্দ্দির শ্বশুর, পক্কশ্মশ্রু বৃদ্ধ, কিন্তু বীরদর্পে সিংহ। সে সিংহ গর্জ্জনে হিন্দু ফিরিল, মুসলমান ফিরিল। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের ন্যায় সেই সমরানলে আজ ক্লাইব সাহেব সসৈন্যে ভস্মীভূত হইবেন। এমন ভাগ্য কি দুর্ভাগ্য ভারতের হইবে? ঐ দেখ, মায়াবী মহীরাবণের মত মীর জাফর কি যেন মোহনী মায়া বিস্তার করিল। ঐ দেখ, সিরাজের রাজমুকুট বিশ্বাসঘাতকের পাদপ্রান্ত হইতে উঠিয়া, চিরতরে ভূপতিত হইল—হিন্দুরক্তে, মুসলমান-রক্তে পলাশীর মাটী ভাসিয়া যাইতেছে। দুর্ভাগ্য ভারত-সন্তানের সেই রক্ত-সমুদ্রে ভারতের সৌভাগ্য রবি চিরদিনের মত অস্তমিত হইল। সন্ধ্যা-তিমিরে গগন আবৃত হইল। কবির সহিত একপ্রাণ হইয়া, জোড়করে বলিলাম,

"কোথা যাও, ফিরে যাও, সহস্রকিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি,
তুমি অস্তাচলে দেব, করিলে গমন,
ভারতে আসিবে চির বিষাদ রজনী।"

ইংরেজ তুমি দেবতা আজ। পলাশীক্ষেত্রের পাপ-কালিমায় যখন তোমার ছবি অঙ্কিত হয়, তখন তুমি পিশাচ। তখন দেখি, তুমি রাজদ্রোহী, প্রভুদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতকের সহায়, অধম দস্যুর আদর্শ। অষ্টাদশ বৎসরের বালক বঙ্গেশ্বরের রাক্ষসিক বধে সাহায্য করিয়া তুমি কোন্ ন্যায়-বিচারের পরিচয় দিয়েছ? পলাশী ক্ষেত্রে তোমার ধূর্ত্ততা এবং দুরাচারিতা ভিন্ন এক বিন্দুও বীরত্বের পরিচয় পাইলাম না। তুমি আজ রাজাকেও রাজদ্রোহী বলিয়া দণ্ড বিধান করিতেছ। কিন্তু বিধাতা পলাশীর অপকার্য্যের জন্য যদি শাস্তি বিধান করেন, তবে কি তোমার ব্রিটেনিয়ার ক্ষুদ্র বক্ষ তাহা ধারণ করিতে পারিবে?

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

জীবন ও কাব্য।

প্রাচীন ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ লেখক সার ফিলিপ্ সিড্নী গ্রন্থকারগণকে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেরই মূল-নীতি বলিয়া পরিগণিত;—"Look into thine own heart, and write." জগতের সমস্ত প্রতিভাশালী কবিগণ আপনাদের হৃদয় দেখিয়াই লিখিয়াছেন। সেক্ষপিয়রের নাটক সমুদয় "are documents written all over with facts about Shakespere." মিল্টন সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য। আর আমাদের সর্ব্বপ্রধান সমালোচক, সংস্কৃত সাহিত্যের শিরোভূষণ অভিজ্ঞান-শকুন্তলকে কালীদাসের সাংখ্যমতের অভিব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল মহারথীদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে, নিম্নতর সোপানেও আমরা এই সত্য প্রমাণিত দেখিতে পাই।

বায়রণ, সেলী, ডিকেন্স, জর্জ্জ ইলিয়ট, শার্লট ব্রণ্টী—কত নাম করিব? ইহারা সকলেই এক পথানুসরণ করিয়াছেন। সকলেই নিজ নিজ হৃদয়সমুদ্রে অবতরণ করিয়া অমূল্য রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়াছেন। যেন হৃদয়ের শোণিত-সংযোগে আপনাদের বক্তব্যগুলি লিখিয়া গিয়াছেন। কাব্যে ও জীবনে সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ; যিনি কাব্যে কবি, তিনি জীবনেও কবি। যাঁহার জীবনের বৈচিত্র্য নাই, হৃদয়ের উত্থান-পতন নাই, তিনি কবি নহেন।

কবিদিগের হৃদয়-রাজ্যের কোন নিভৃত-স্থলে মধুরনিনাদী সঙ্গীতের এক সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম তন্ত্রী অনুভূত হইয়া থাকে। তাহা এই বিশ্বযন্ত্রের সহিত সংশ্লিলিত। তাহাতে আঘাত করিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হইতে এক স্বর্গীয় সুর সমুদ্ভূত হয়। বিশ্বযন্ত্রের অনন্ত তার একেবারে সমস্বরে বাজিয়া উঠে। কবির হৃদয়ে সেই মহান্ গীতির যে মহান্ প্রতিধ্বনি সমুত্থিত হয়, তাহাই তিনি এই জড় জগতের ভাষায় প্রকাশিত করেন মাত্র। বিশ্ব-সঙ্গীতের সেই মহান্ প্রতিধ্বনি আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে নিজ নিজ হৃদয়মধ্যে শুনিতে পাইয়া থাকি। কিন্তু জীবগণের জীবনে যাহা নিত্য ঘটনা, তাহা আমাদের ন্যায় সামান্য জনের জীবনে কদাচিৎ অতি বিশেষ শুভ মুহূর্ত্তে সংঘটিত হয়। আমরা তাই স্মরণ করিয়া এই অধম সাধারণ মনুষ্যজন্মকে ধন্য বলিয়া মানিয়া লই। হৃদয়মধ্যস্থিত এই গীতরন্ধ্রে যিনি প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই, তিনি কবি নহেন, তিনি কপটী, ছদ্মবেশী। তাঁহার কবিতার ভাব আমরা নিঃসন্দেহ-চিত্তে, সরলমনে গ্রহণ করিতে পারি না; তাঁহার ভাষাও আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা কবি বলিয়া পরিচিত হইতে ব্যাকুল। কিন্তু হায়, আমাদের সে হৃদয় কই? যে হৃদয় স্পর্শ করিলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাস অনুভূত হয়, যাহার মহত্ত্বরূপ দেবমন্দিরের দ্বারে শত শত নরনারীর মস্তক আপনিই অবনত হইয়া যায়, সে হৃদয় কই?—আমাদের জীবনেই—বাঙ্গালীর জীবনেই—মহত্ত্ব নাই। হৃদয়ের মহত্ত্ব কেবল দুরাশামাত্র।

আমরা যে হৃদয়-নিহিত মহত্ত্বের বর্ণনা করিলাম, তাহাই প্রতিভা। সংসারের কোন পদার্থই দোষসম্পর্কশূন্য নহে। প্রতিভারও দোষ আছে। বরন্স্, হীন, বায়রন্, কাউপার, এড্গার পো প্রভৃতির জীবনে আমরা তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। কি ইয়ুরোপে, কি আমেরিকায় বর্ত্তমান যুগে প্রতিভা এক প্রকার রোগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাত্রভেদে অশান্তি, অতৃপ্তি, উন্মত্ততা, অত্যাচার, পীড়া, চিররুগ্নতা, অবশেষে অকালমৃত্যু,—উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভার ইহাই পরিণাম। প্রতিভার স্বর্গীয় তেজঃ বুকে লইয়া আজ কাল অতি অল্প লোককেই সুস্থির থাকিতে দেখা যায়। পূর্ব্বকার মনীষিগণের অপেক্ষা এক্ষণকার কবিগণকে আমরা এ বিষয়ে বিলক্ষণ শক্তিহীন দেখিতে পাই। ক্ষীণমস্তিষ্ক লোকদিগকে যেমন ভূতে পায়, প্রতিভা যেন সেইরূপ ভাবেই অনেকের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়াছেন। ফলাফল জ্ঞান নাই, ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ নাই, অগ্নিগর্ভ বোমার ন্যায় আপনার তেজে আপনারাই ফাটিয়া পড়িতেছেন। হায়, স্বর্গীয় প্রতিভার এই কি পরিণাম!—কিন্তু এদিকে যাঁহারা কবিতারাজ্যের

দেবতাস্বরূপ, তাঁহাদের জীবনের পানে চাহিয়া দেখ। দেখ সেক্ষপীয়র—কি কঠোর সংযম-রশ্মিদ্বারা আপনার মানস-হৃদয়কে নিয়মিত করিয়াছিলেন। কেমন ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে আপনার জীবনগত প্রধান কার্য্যের সমাধান করিয়া, অবশেষে স্বদেশে, স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়া সামান্য গৃহস্থ হইয়া বসিলেন। আমরা আপাতদৃষ্টিতে হঠাৎ চিনিতে পারি না। এই কি ম্যাক্‌বেথ, লিয়র, হ্যামলেটের গ্রন্থকর্ত্তা? এই কি সেই অধীর, অশান্ত, উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়-সনেটের রচয়িতা?—আবার দেখ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কেমন প্রশান্ত; জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অশীতিবর্ষ পরিমিত সুদীর্ঘ জীবন কেমন সুনিয়মে, সদ্‌যুক্তিতে পরিচালিত; স্বকীয় হৃদয়োপরি, সাংসারিক ঘটনারাশির উপরি, কেমন অপূর্ব্ব আধিপত্য; কেমন সু-সম্বদ্ধ কার্য্যপরম্পরা,—উচ্ছৃঙ্খলতার লেশমাত্র নাই।

কোনও বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থকার বলিয়াছেন, কাব্যরচনাকারীদিগের অপেক্ষা যাঁহারা কাব্যাত্মক জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক প্রশংসার্হ। এ কথা নীতিবাদিগণের শিরোধার্য্য। আর, যাঁহারা মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য-বশতঃ অনেক সময়ে নীতির গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও জ্বলন্ত ভাষায় এই বাক্যেরই সমর্থন করিয়াছেন। স্কট্‌লণ্ডের প্রসিদ্ধ কৃষক-কবি রবার্ট বরণস্ অনেক গীতি-কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট নীতি-বাক্যেরও অভাব নাই। "কবির মৃত্যু-গীতি" অভিধেয় কবিতা যে তাঁহার নিজেরই জীবনকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত, সে কথা কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বারণ্‌সের চরিতাখ্যায়ক-মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিলেন—

But thoughtless follies laid him low,
And stain'd his name.

আর শিখাইলেন—

Know, prudent, cautious self-control,
Is wisdom's root.

স্বকীয় অবিমৃষ্যকারিতা-সম্ভূত অত্যাচার-পরম্পরা হইতে যে তাঁহার জীবনের গ্রন্থি সকল দিন দিন শিথিল হইয়া আসিতেছিল, এই দুর্লভ মানব-লীলা যে তাঁহাকে অতি সত্বরেই সংবরণ করিতে হইবে, তাহা কবি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই লিখিয়া রাখিলেন—নিজের মূর্খতা-বশতঃই আমি এই অতৃপ্তযৌবনে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে যাইতেছি। হায়, কি গভীর আক্ষেপোক্তি! যিনি নিজের জীবনে যুবজনসুলভ অত্যাচারের শোচনীয় পরিণাম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারই লেখনীমুখে এই সত্য কি হৃদয়-গ্রাহী! কবি নীতি বুঝিতেন, অবহেলার অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণাও জানিতেন; কিন্তু নিজ জীবনে এই মহান্ সত্য পরিপালন করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। তাঁহার কবিহৃদয় কুসুমাপেক্ষাও কোমল; পাপ পৃথিবীর প্রবলতম প্রলোভনের বায়ু-বলে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কবিগণ কথায় যাহা বলেন, তাহা জ্ঞানিজনদুর্লভ, আর কার্য্যে যাহা করেন, তাহা নিতান্ত মূর্খোচিত,—গোল্‌ডস্মিথের এই বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া তিনি ইহ জগৎ হইতে চলিয়া গেলেন।

সাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত বড়ই সুলভ। হীন, সেলী, বায়রণ, মুসেট্

ইত্যাদি আরও অনেকের নাম করা যাইতে পারে। ইহাঁদেরই দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থের করুণহৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—

Mighty poets in their misery dead.

জানি না, জগতের কবিকুলের মস্তকে ইহা কোন্ দেবতার অভিশাপ! প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই কি অশেষবিধ যন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইতে হইবে!

জর্জ্জ ইলিয়টের মৃত্যুর পর তাঁহার কোনও সমালোচক লিখিয়াছিলেন যে, এই সকল প্রতিভাশালী লেখক নিজ নিজ জীবনে যে সমুদায় অপকার্য্য করেন, তাহা তাঁহাদিগের পুস্তক-প্রদত্ত রাশি রাশি নীতি-শিক্ষার সহিত তুলনা করিলেও অতীব গুরুতর। তাহাদের গ্রন্থ পাঠ করিয়া দুই চারি জন লোকে নীতিপরায়ণ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাসে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন, তাহা চিরদিন ধরিয়া এই পৃথিবীমধ্যে বিষময় ফলরাশি সমুৎপাদিত করিতে থাকিবে। এ কথা কত দূর সত্য কি মিথ্যা, তাহা বলিতে পারি না; তাহা আমাদের আজিকার আলোচ্য বিষয়ও নহে। আমরা এক জন দুর্নীতিপরায়ণ প্রতিভার অধিকারীকে যে প্রকার আদর করিয়া থাকি, এক জন সৎকর্ম্মশালী, নীতির মর্য্যাদারক্ষাকারী পল্লীবাসী কৃষককে তদপেক্ষাও ভক্তি করিতে সর্ব্বথা প্রস্তুত; কিন্তু এ কথাও অবশ্য স্বীকার করিব যে, জগতে কবি না জন্মিলে, প্রতিভাপ্রসূত সদ্‌গ্রন্থ না থাকিলে, মানবজীবনের অর্দ্ধেক সুখ ও গৌরব বিনষ্ট হইয়া যাইত।

যাঁহারা প্রতিভার অধিকারী হইয়া তাহাকে গন্তব্যপথে প্রযোজিত করিতে পারেন না, প্রত্যুত তদ্দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত হন, আমরা তাঁহাদের স্বর্গীয় শক্তির প্রশংসা করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু নৈতিক মহত্ত্বের প্রশংসা করিতে পারি না। কবিই হউন, আর অকবিই হউন, মানবজীবন লাভ করিয়া যিনি ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া গেলেন, তাঁহার আবার গৌরব কি? তবে তাঁহাদিগের স্বপক্ষে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, তাঁহারা ভণ্ড বা কপটী নহেন; দুর্নীতিপরায়ণই হউক, আর উচ্ছৃঙ্খলই হউক, তাঁহাদের জীবনকে প্রকৃত জীবন বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। প্রতিভার সহিত যদি তাঁহারা সংযম-শক্তির সংযোগ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের জীবনে বাস্তবিকই মণিকাঞ্চনের মিলন হইত।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে যেমন বহুবিষয়ে কপটাচার লক্ষিত হইয়া থাকে, তেমনই কাব্য-রাজ্যেও একপ্রকার কাপট্য প্রবেশ করিয়াছে। অসংখ্য ছদ্মবেশী সামান্য মনুষ্য কবিজনোচিত একটা সভ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বঙ্গীয় সমাজের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন। প্রতারিত সমাজ তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে পারিতেছে না। যাহার হৃদয়ে দেশহিতৈষিতার চিহ্নমাত্রও নাই, মাতৃপূজার অর্থমাত্রও যে কখন বুঝিয়াছে কি না সন্দেহ, তাহাকেই বিশ্বপ্রেমিক সাজিয়া দেশোদ্ধার কাব্যরচনা করিতে দেখিতে পাইতেছি। আর গর্দ্দভপ্রবর সমালোচক তাহাকে তাই বলিয়াই উচ্চতম প্রশংসার পতাকা আকাশমার্গে উড়াইয়া দিতেছেন। যিনি আপন গৃহদ্বারে ভিক্ষুক আসিলে কখন মুষ্টিভিক্ষা

দিয়াও আপ্যায়িত করেন নাই, তিনিই আবার উৎসবের সময় গৃহস্থের কুটীরাভিমুখে ভিখারিণী দাঁড় করাইয়া আতিথ্যধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। আর প্রতারিত, অথবা তোষামোদ-প্রিয় পাঠক কবির স্নেহবাস সুকোমল হৃদয়ের সুখ্যাতি করিয়া আনন্দে বিগলিত হইতেছেন!

এখনকার সমালোচনা দেখিয়া বিচার করিলে, মুদ্রাযন্ত্র হইতে যে সকল রাশি রাশি পুস্তক প্রতিনিয়ত প্রসূত হইতেছে, তাহা সকলই শ্রেষ্ঠ প্রতিভাসঞ্জাত বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে গদ্যই হউক, আর পদ্যই হউক, নূতন কোনও গ্রন্থ উদ্ঘাটন করিলেই আমরা তন্মধ্যে কাপট্য ও ছদ্মবেশের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব দেখিতে পাই। মনে হয়, কঠোর পালিশবিহীন প্রস্তরখণ্ডের উপর কে যেন মৃদুস্পর্শ মখমল জড়াইয়া রাখিয়াছে। বহিরাবরণ উন্মোচন করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে বিন্দুমাত্র কাব্য খুঁজিয়া পাই না; উচ্চতর, মহত্তর, বিশ্বজনীন কোনও ভাবের কণিকামাত্রও সেখানে দৃষ্টিগোচর হয় না; কিন্তু এ দিকে চাহিয়া দেখ, পুস্তকের ভাষায়, বাহ্যিক পারিপাট্যে তাহার কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। আমরা সহজেই বলিয়া উঠি,—ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, হে কবিবর! তুমি মুখে যাহা বলিতেছ, আমি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, তোমার ভিতরে তাহার লেশমাত্রও নাই। কেবল অপরের গ্রন্থ হইতে দুই চারিটা কথা সংগ্রহ করিয়াছ মাত্র। কবিতা বালকের খেলা নহে; তোমার হৃদয়াভ্যন্তরে জগতের অধিবাসিগণকে বলিবার উপযোগী কোনও কথাই নাই; তবে বৃথা এ বিড়ম্বনা কেন? বাঙ্গালী যুবক, নিরীহ ভাল মানুষের মত চাকরী কর, খাও দাও, আর নিদ্রা যাও;—কবিত্বের কঠোর ধর্ম্মক্ষেত্রে তোমার অধিকার কি?

আজকালকার কবিনামলিপ্সু অনেক লেখকের ভাষাও বিলক্ষণ কাপট্যে পরিপূর্ণ। ভাবের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। যখন ভিতরে বাস্তবিক কোনও পদার্থই বিদ্যমান নাই, বাহিরে আর কি প্রতিফলিত হইবে? সুতরাং কলম্বস্ যেমন বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ভাষাকেও সেইরূপ খুজিয়া বাহির করিতে হয়। বর্ত্তমান কালের কবিরা নাকি প্রেম লইয়া বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা সেই প্রেমের কথাই বলি। কোনও কবি লোক-সাধারণকে দেখাইতে চান যে, তিনি তাঁহার প্রণয়নীর প্রতি সাতিশয় প্রেমবান্। সেজন্য কখনও তাঁহাকে শত শত চুম্বন করিতেছেন, কখনও তাহার অভিমানের অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতেছেন, কখনও বা বায়ুর নিম্নস্তরের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া ছাদের বিমুক্ত-পবন-পথে গিয়া উভয়ে দাঁড়াইতেছেন, আর সহস্র সনেট্ প্রসব করিতেছেন—

"ছাদের উপরে দেখ বহিছে তটিনী।"

"হেমময়ী ভরসায় সস্নেহে জড়ায়ে।"

তটিনী ছাদের উপর দিয়াই বহে বটে!—না না, কবিতা-লেখক, ইহাতে চলিবে না। যে প্রেম কবিতায় স্থান পাইবার অধিকারী, ইহাতে তাহা প্রদর্শিত হইল না। বাঙ্গালীর জীবনে তাহা কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেখানে

প্রকৃত প্রেম, সেখানে তাহার পরিচয়ও অনুরূপ। আমরা অন্যত্র তাহা শুনিয়াছি—

She was a phantom of delight,
When first she gleam'd into my sight.

অথবা—

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্‌গে এ বসুমতী যার খুসি তার!

হে কবিভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা সকলে কিছুদিনের জন্য কবিতা-রচনা ছাড়িয়া দিয়া একবার এই নগণ্য বাঙ্গালীর জীবনের দিকে মন দাও দেখি। আমাদের জীবনে সে তেজ কোথায়? হৃদয়ের সে মহত্ত্ব কোথায়? এই কর্ম্মভূমিতে নিজেরই কর্ত্তব্য যখন খুঁজিয়া পাইলাম না, তখন অপরকে আর বলিবই বা কি, শিখাইবই বা কি? হৃদয়ের ভিতর চাহিয়া দেখিলে সেখানে সেই জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গের দীপ্তি ত দেখিতে পাই না। সেখানে কেবল স্বার্থপরতা, কেবল প্রশংসার্জ্জনস্পৃহা, কেবল প্রতারণা। হা ভগবন্! আমরা কি প্রতারণা করিতে আসিয়াছি?—কবে আমরা কবিতারচনার পূর্ব্বে কাব্যময় জীবন অতিবাহিত করিতে শিখিব?

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

প্রাচীন-বংশ-বিবরণ। (৬)

কুবের।

বাৎস্যায়ন গোত্রে যে কুবেরের জন্ম হয়, তিনি যক্ষপতি নহেন, কেন না তাঁহার তিন পদ ও অষ্ট দশন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্রবাঃ। বিশ্রবাঃ পুলস্ত্যের নন্দন। পুলস্ত্য যে সপ্তর্ষির অন্যতম, তাহা পাঠকগণের স্মৃতিপথ হইতে বোধ হয় অন্তর্হিত হয় নাই। বাণভট্টের পুত্র ভূষণবাণ কর্ত্তৃক "কাদম্বরী" নামক গদ্য কাব্যে তাঁহার ও তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ-পরম্পরার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। বংশ-তালিকাও তাহাতে অবগত হওয়া যায়। হর্ষচরিত ও কাদম্বরীর ঐক্য করিয়া এস্থলে বংশাবলি প্রদান করিলাম। এই প্রবন্ধে কবিতার অবিকল অনুবাদ না দিয়া তাৎপর্য্য বা ব্যাখ্যা লিখিত হইল। স্থলে স্থলে ভাষান্তরিত করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও স্বাধীন ভাবেই সমাহিত করা গিয়াছে।

বাৎস্যায়ন
:
কুবের
|
পাশুপত
|
অর্থপতি
|
চিত্রভানু
(রাজদেবী)
|
বাণভট্ট
(ময়ূরভট্ট-কন্যা)
|
ভূষণবাণ

যে নামের নিম্নে বিন্দু বা রেখা আছে, তাহাতে কি বুঝাইবে? বিন্দু বিন্দু থাকিলে, তদ্বংশীয় বুঝাইবে। রেখা থাকিলে পুত্র বুঝিতে হইবে। নামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে যে নাম লেখা গেল, তাহা পত্নীর নাম।

বভূব বাৎস্যায়ন-বংশ-সম্ভবো দ্বিজো
জগদ্গীত-গুণোঽগ্রণীঃ সতাম্।
অনেক-ভূপার্জিত-পাদ-পঙ্কজঃ
কুবের-নামাংশ ইব স্বয়ম্ভুবঃ॥

বাৎস্যায়ন গোত্রোৎপন্ন বিপ্র কুবের, সজ্জনগণের অগ্রণী। ভূমণ্ডলে তাবৎ লোকে তদীয় গুণগান করিয়া থাকে। ভূপতিগণ, তদীয় চরণ-কমল অর্চ্চনা করিতেন। তিনি ব্রহ্মার অংশ-স্বরূপ ছিলেন।

উবাস যস্য শ্রুতি-শান্ত-কল্মষে
সদা পুরোভাস-পবিত্রিতাধরে।
সরস্বতী সোম-কষায়িতোদরে
সমস্ত-শাস্ত্র-স্মৃতি-বন্ধুরে মুখে॥

বাগ্‌দেবী, তাঁহার মুখমণ্ডলে নিয়ত সুশোভিত ছিলেন। শ্রুতি-শাস্ত্রানুশীলনে তদীয় বদনের সমস্ত তমঃ ধ্বংস পাইয়াছিল। তাঁহার ওষ্ঠাধর, পুরোভাস (অর্থাৎ যজ্ঞীয় পিষ্টক, হুতশেষ) দ্বারা পূত হইত। তদীয় উদর, সোমরসপানে কষায়িত হইয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রসমূহ স্মরণ করায়, তাঁহার বদন মনোমোহন হইয়া উঠিয়াছিল।

জগুর্গৃহে ত্রস্ত-সমস্ত-বাঙ্ময়ৈঃ
সসারিকৈঃ পঞ্জর-বর্ত্তিভিঃ শুকৈঃ।
নিগৃহ্যমাণা বটবঃ পদে পদে
যজূংষি সামানি চ যস্য শঙ্কিতাঃ॥

পিঞ্জর-স্থিত শুক ও সারিকা, তদীয় আলয়ে যেন যাবতীয় বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল। তাঁহার প্রতিপালিত শুক-সারিকা যজুর্ব্বেদের ও সামবেদের এমন মনোহর অথচ বিশুদ্ধ আবৃত্তি শিখিয়াছিল যে, তাহাদের ভয়ে শঙ্কিত থাকিয়া, কুবের মহোদয়ের শিষ্যসমূহকে ঐ দুই বেদ শাস্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত। কেন না, ছাত্রেরা কোন অংশ আবৃত্তি করিতে ভুলিয়া গেলে, অথবা কোন স্থান অসংলগ্ন উচ্চারণ করিলে, শ্রুতিধর শুকসারিকা, তাহা ধরিয়া দিত।

এই বর্ণনা অত্যুক্তিদোষে পরিপ্লুত বলিয়া যদি কাহারও মনে অবিশ্বাসের অঙ্কুরোৎপত্তি হয়, সেই কারণে বলিতেছি, পক্ষিজাতির অদ্ভুত অনুকরণ সামর্থ্য যাঁহাদের গোচর আছে, তাঁহারা ঐ উক্তি, বাহুল্য বর্ণনে কলঙ্কিত ভাবিয়া হাস্য-সংবরণে ব্যাকুল হইবেন না।

কুবের মহোদয়, গুরুপক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বৈনতেয় তুল্য তেজস্বী ও মনস্বী। কুবের মহাশয়ের পোষিত বিহঙ্গমগণ পর্য্যন্ত যখন বেদজ্ঞ, তখন তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা কিরূপ শ্রুতি বিদ্যায় নিপুণ হইতেন, অনুমান করা দুরূহ ব্যাপার নয়।

পাশুপত।

কুবেরের চারি পুত্র। অচ্যুত, ঈশান, হর ও পাশুপত। তিনি চতুঃসমুদ্রবৎ গম্ভীর —যেন অচলকুলের রক্ষক। কাদম্বরীতে পাশুপত প্রভৃতির প্রসঙ্গের বিন্দুমাত্রও অবলোকিত হয় না। বাণভট্ট-প্রণীত হর্ষচরিতে তাঁহার ও তাঁহার সহোদর-ত্রয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি। পাশুপতের এক সন্তান। তাঁহার নাম অর্থপতি।

অর্থপতি।

অর্থপতির বিবরণ কাদম্বরীতে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই,—

হিরণ্যগর্ভো ভুবনাণ্ডকাদিব।
ক্ষপাকরঃ ক্ষীরমহার্ণবাদিব।
অভূৎ সুপর্ণো বিনতোদরাদিব
দ্বিজন্মনামর্থপতিঃ পতিস্ততঃ॥

ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মার যেমন উদ্ভব ঘটিয়াছিল, ক্ষীরসমুদ্র হইতে যেরূপ ইন্দু সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, বিনতার জঠর হইতে যাদৃশ গরুড়ের জন্ম হইয়াছিল, কুবের হইতে সেই প্রকার অর্থপতির উৎপত্তি ঘটে।

পাঠকেরা এখানে পাশুপত হইতে অর্থপতির উৎপত্তি দেখিতে না পাইয়া, কুবেরকে অর্থপতির পিতা মনে করিতে পারেন; অথবা তৎসম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াও অসম্ভব নয়। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে জন্মদাতাই কেবল পিতা নন; পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতিও পিতৃ-পদ-বাচ্য। সেই কারণেই তাঁহারা পিতৃলোকের অন্তর্গত। ঐ নিয়মানুসারে সন্তান শব্দ, পুত্র-পৌত্রাদিতে বর্ত্তে। তদ্ভিন্ন এক কথা হইতেছে। কুবের হইতে অর্থপতির উৎপত্তি বলা হইয়াছে। সুতরাং কুবের যে, অর্থপতির জনক, ইহা সূচিত হইতেছে না। অর্থপতির পিতা পাশুপত বিশেষ-বিখ্যাত ছিলেন না বলিয়াই, বোধ হয়, কাদম্বরীতে তাঁহার প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হয় নাই। [illegible] তাঁহার নাম উল্লিখিত না হইয়া পিতামহ প্রসিদ্ধ কুবেরের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হর্ষচরিত হইতে পাশুপতের নাম গ্রহণ করিলাম।

> বিবৃন্বতো যস্য বিসারি বাঙ্ময়ং
> দিনে দিনে শিষ্যগণা নবা নবাঃ।
> উষস্সু লগ্নাঃ শ্রবণেহধিকাং শ্রিয়ং
> প্রচক্রিরে চন্দন-পল্লবা ইব॥

তিনি শব্দ-রূপ সাগর বশীভূত করিয়াছিলেন। উষাসময়ে চন্দন বৃক্ষের নবীন পল্লব গুলি, মনুষ্যের শ্রুতি-যুগলে সংস্থিত হইলে, তাহা দ্বারা কি অপরূপ সুষমাই প্রকটিত হয়! তাঁহার নব নব শিষ্যগণের অধ্যয়ন-রব, তদীয় শ্রবণমূলে সংলগ্ন হইয়া কেমন মনোহর ভাব ধারণ করিত!

> বিধান সম্পাদিত-দান-শোভিতৈঃ
> স্ফুরন্মহাবীর-সনাথ-মূর্ত্তিভিঃ।
> মখৈরসংখ্যৈরজয়ৎ সুরালয়ং
> সুখেন যো যূপকরৈর্গজৈরিব॥

অর্থপতি, বিধানানুসারে কত শত যজ্ঞই সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন দিক্-হস্তীর সাহায্যে মানুষে ইন্দ্রালয় পরাজিত করিতে সমর্থ হয়, সেই প্রকার তিনি এত অসংখ্যেয় যাগ করিয়াছিলেন যে, তন্নিমিত্ত ভূরি ভূরি যূপ-দারু, মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিতে হইয়াছিল। তৎসমুদায় যজ্ঞ, যেন প্রদীপ্ত অথচ প্রত্যক্ষ শূর শ্রেষ্ঠ মদমত্ত প্রকাণ্ড দিগ্মাতঙ্গ তুল্য বোধ হইত। উহাতেই যেন ইন্দ্রপুরী জয় করিয়াছিলেন!

তাঁহার একাদশ সন্তান জন্মিয়াছিল। যথা—ভৃগু, হংস, শুচি, কবি, মহীদত্ত, ধর্ম্ম, জাতবেদাঃ, চিত্রভানু, ত্র্যক্ষ, অহিদত্ত ও বিশ্বরূপ। ইহারা প্রতাপে, বিদ্যাবুদ্ধিতে ও বিবিধ গুণে একাদশ রুদ্রতুল্য। এই ভৃগু ও গোত্রকর্ত্তা ভৃগু, দুই পৃথক্ পুরুষ। চতুর্থ পুত্র কবি, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য নহেন, পাঠকগণকে বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে। ষষ্ঠ ধর্ম্ম, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম না হইলেও, অনেক বিষয়েই পুণ্যকীর্ত্তি রক্ষা করিতেন। সপ্তম জাতবেদাঃ, বাস্তবিক অগ্নি না হউন, তেজে বহ্নিপ্রতিম ছিলেন। অষ্টম চিত্রভানুর বৃত্তান্ত স্বতন্ত্রভাবে বলিতেছি। একাদশ বিশ্বরূপ, শ্রীচৈতন্যদেবের অগ্রজাত বিশ্বরূপেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, পাঠকগণের স্মরণার্থ লিখিতে হইল। দ্বিতীয় হংস, তৃতীয় শুচি, পঞ্চম মহীদত্ত, নবম ত্র্যক্ষ, দশম অহিদত্ত, প্রতিপত্তি-সম্পন্ন ছিলেন না, এমন নয়। তবে তাঁহাদের সদ্গুণ কীর্ত্তন আমাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই, এই মাত্র ক্ষোভের বিষয়। তাঁহারা সকলেই মহাত্মা ও বেদবিদ্যাপারদর্শী।

চিত্রভানু।

এই বার আমরা চিত্রভানুর গুণ-বর্ণনে মন দিলাম।

স চিত্রভানুং তনয়ং মহাত্মনাং
সুতোত্তমানাং শ্রুতিশাস্ত্র-শালিনাং।
অবাপ মধ্যে স্ফটিকোপলামলং
ক্রমেণ কৈলাসমিব ক্ষমাভৃতাং॥

পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে কৈলাসগিরি অত্যুত্তম। কেন না, উহা বিমল-স্ফাটিক-পর্ব্বত-সদৃশ সুতরাং মনোহর। পবিত্রতায় কৈলাস, যেমন হিমাদ্রি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ,—নৈসর্গিক দৃশ্যেও উহা তদনুরূপ চিত্তহর। সেইরূপ চিত্রভানু, স্বীয় অপর দশ সহোদর অপেক্ষাও অত্যুৎকৃষ্ট গুণবান্।

মহাত্মনো যস্য সুদূর-নির্গতাঃ
কলঙ্ক মুক্তেন্দু কলা-মল ত্বিষঃ।
দ্বিষন্মনঃ প্রাবিবিশুঃ কৃতান্তরা
গুণা নৃসিংহস্য নখাঙ্কুশা ইব॥

নৃসিংহ অবতার, যখন আপন অরাতি হিরণ্যকশিপুর শরীরে নখগুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তখন সেই নখ-সমুদয়ের নির্ম্মল শুক্ল জ্যোতিঃ, যেরূপ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছিল, সেইরূপ চিত্রভানুর শ্বেত সুতরাং নিষ্কলঙ্ক যশোরাশিও সুদূরব্যাপী হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার বিপক্ষের হৃদয় আন্দোলিত হইত।

দিশামলীকালক-ভঙ্গতাং গতঃ
ত্রয়ী-বধূ-কর্ণতমাল-পল্লবঃ।
চকার যস্যাধ্বর-ধূম-সঞ্চয়ো
মলীমসঃ শুক্লতরং নিজং যশঃ।

সকল বস্তুই ধূমে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। চিত্রভানু, অসংখ্য যজ্ঞ করিলেও, সেই যজ্ঞীয় ধূমে তাঁহার কোন পদার্থই ক্লিষ্ট হয় নাই; বরং তদীয় নির্ম্মল যশঃ, উক্ত ধূমে অধিকতর বিমল ও সিতবর্ণ হইতে লাগিল। যজ্ঞ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার যে সুখ্যাতি ছিল, তাহা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ প্রভায় প্রভান্বিত হইতেছিল। তাঁহা কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত যজ্ঞীয় ধূমে দিক্ দেবীর অলক-দাম বরং তিমিরতর বোধ হইতে লাগিল; উহা, ত্রয়ী-বধূর কর্ণের তমাল-পল্লব-তুল্য প্রতীত হইয়াছিল। তিনি যে অসাধারণ যজ্ঞকুশল ছিলেন, ঐ রূপক বর্ণনে তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে।

চিত্রভানুর প্রণয়িনীর নাম রাজদেবী। এই পরিচয় ভিন্ন তাঁহার পারিবারিক অন্য পরিচয় অদ্যাপি আমাদের অপরিজ্ঞাত অবস্থায় রহিয়াছে। এই গৃহিণী অধিক দিন জীবিত থাকিয়া চিত্রভানুর চিত্তাকাশের সুখবদ্ধন করিতে পারেন নাই।

সরস্বতী-পাণি-সরোজ সম্পুটৈঃ
প্রমৃষ্ট-হোমে শ্রম শীকরাম্ভসঃ।
যশোংশু-শুক্লীকৃত সপ্ত-বিষ্টপাৎ
ততঃ সুভোবাণ ইতি ব্যজায়ত॥

মূর্ত্তিমতী বাগ্দেবী, স্বীয় পাণিপুটে হোমকার্য্য নিষ্পাদন করেন; চিত্রভানু সেইরূপ হোমকর্ম্মে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার যশঃকিরণে ভূ, ভুব, স্বঃ, জন, তপ, মহ, সত্য এই সপ্তভুবন ধবলিত হইত। এই চিত্রভানু হইতে স্বনামখ্যাত বাণভট্ট উৎপন্ন হন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

বহুকাল হইতে এদেশে সাকার ও নিরাকার উপাসনা বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। অতি প্রাচীনকালেও যে উক্তরূপ মত-দ্বৈধ ছিল, প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র সকলে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধুনাতন কালে, রাজা রামমোহন রায়ের

সময় হইতে,—কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী কাল হইতে এই মত-বিরোধ প্রবলতর হইয়া আসিতেছে। চারিপাঁচ বৎসর হইতে সাকার ও নিরাকারবাদ লইয়া একটী বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। দেশের একসীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত যেখানে কেন গমন কর না, দেখিবে, লোকে সাকার ও নিরাকারবাদ বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ উপস্থিত করিতেছে! নিরাকার উপাসনা বিষয়ে লোকে বলিতেছে;—নিরাকারের উপাসনা কেমন করিয়া হইবে? নিরাকার কেমন করিয়া ভাবিব? নিরাকার ধ্যান কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

নিরাকার পদার্থ আছে কি না?

সাকার ও নিরাকার উপাসনা বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এই প্রথম প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক,—নিরাকার পদার্থ আছে কি না? নিরাকার উপাসনা হইতে পারে কিনা, নিরাকারের ধ্যান সম্ভব কি না, এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের পূর্ব্বে জানা উচিত, আদৌ নিরাকার পদার্থ কিছু আছে কি না?

শক্তি নিরাকার।

নিরাকার পদার্থ আছে কি না, শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিলে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দের মূল কি? শক্তি। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে? শক্তি হইতে। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র যেরূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় দৃষ্ট হইতেছে—তাহার মূলে কি? মূলে শক্তি। রূপ রসাদির উৎপত্তি শক্তি হইতে; কিন্তু শক্তি রূপ রসাদি গুণবিবর্জ্জিত। শক্তি নিরাকার। কার্য্য কারণ-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে শক্তিতত্ত্ব বুঝা আবশ্যক। রূপ রসাদির উৎপত্তি, বা প্রকাশের কারণ শক্তি। সুতরাং শক্তি রূপ, রসাদি বিবর্জ্জিত। শক্তি নিরাকার।

তোমার হস্তে শক্তি আছে। সেই শক্তিদ্বারা তুমি নানা প্রকার কার্য্য করিতেছ। তোমার হস্ত সাকার, কিন্তু শক্তি নিরাকার। তোমার পদে শক্তি আছে। সেই শক্তিদ্বারা সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছ। সেই শক্তির সাহায্যে পদাঘাতে ঐ কলসটীকে এখনি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পার। তোমার পদ সাকার, কিন্তু শক্তি নিরাকার। ঐ জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে। উহাতে যাহা কিছু পড়িতেছে, তাহাই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ জলরাশির সম্মুখে কিছুই স্থির হইয়া তিষ্ঠিতে পারে না। ঐ জলরাশির আকার দেখিতেছি। কিন্তু উহাতে যে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহা নিরাকার। প্রত্যেক জলকণিকা সাকার; কিন্তু তাহাতে অধিষ্ঠিত শক্তি নিরাকার। ঐ বাষ্পরাশি কেমন সূক্ষ্ম ও তরল। জল অপেক্ষা কতগুণে অধিকতর তরল; কিন্তু উহাতে যে শক্তি অধিষ্ঠিত, তাহা অতি প্রকাণ্ড অর্ণবপোতকে অর্ণববক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেশদেশান্তরে লইয়া যাইতেছে;—সুদীর্ঘ বাষ্পীয় শকটশ্রেণীকে এক মাসের পথ এক দিনে পৌঁছিয়া দিতেছে। এই যে বায়ুরাশি প্রবাহিত হইতেছে, উহা অদৃশ্য হইলেও সাকার। উহাতে যে শক্তি স্থিতি করিতেছে, তদ্দ্বারা পদার্থ সকল আন্দোলিত, বিতাড়িত ও বিচূর্ণ হইয়া যায়। বায়ু অদৃশ্য

হইলেও সাকার; উহা স্পর্শ দ্বারা অনুভূত। কিন্তু উহাতে যে শক্তি অধিষ্ঠিত, তাহা নিরাকার। তাড়িত এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ;—সূক্ষ্ম জড়। কিন্তু তাড়িতে যে শক্তি রহিয়াছে, তাহাতে পর্ব্বত বিকম্পিত হয়;—এই সুগঠিত সুদৃঢ় অট্টালিকা চূর্ণ হইয়া যায়। তাড়িত সূক্ষ্ম জড়, কিন্তু উহাতে যে শক্তি স্থিতি করিতেছে, তাহা অজড়, নিরাকার।

মন ও মানসিক অবস্থা সকল নিরাকার কি না?

নিরাকার পদার্থ আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে এই একটী সহজ কথা বলি যে, মানুষের মন এবং মনের অবস্থা সকল, অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, দয়া, প্রেম ইত্যাদি নিরাকার।

এমন লোক আছেন, যাঁহারা একথায় সন্তুষ্ট হন না। তাঁহারা বলেন, মনের আকার আছে। মনের যে আকার আছে, তাহার প্রমাণ কি? একটী প্রমাণ শুনা গিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, মার্কিন দেশীয় প্রেততত্ত্ববাদীরা (Spiritualists) পরলোকগত আত্মার ছবি দিতে পারেন। জীবিতকালে যে ব্যক্তির যে প্রকার মূর্ত্তি ছিল, তাহার সহিত উক্তরূপ ছবির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আত্মা বা মন নিরাকার পদার্থ হইলে উক্তপ্রকার ছবির উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে। *

যাঁহারা এই তর্কটী উপস্থিত করেন, তাঁহারা প্রেততত্ত্ববাদীদিগের মত কিছুই জানেন না। প্রেততত্ত্ববাদীরা সূক্ষ্ম দেহে বিশ্বাস করেন। পরলোকগত আত্মা সূক্ষ্মদেহী। মৃত্যুর সময় স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া আত্মা কেবল সূক্ষ্মদেহে অধিবাস করে। প্রেততত্ত্ববাদীরা বলেন যে, তাঁহারা যে ছবি দিয়া থাকেন, তাহা মনের বা আত্মার ছবি নহে, ঐ সূক্ষ্ম দেহের ছবি। সুতরাং উক্তরূপ ছবির উৎপত্তি, আত্মা বা মনের সাকারত্ব প্রতিপন্ন করে না।

মন সাকার কি নিরাকার? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচটী গুণের কোনটাই মনের গুণ নহে। উহার মধ্যে কোনটীই মনে দৃষ্ট হয় না। যদি বল মন সাকার, তাহা হইলে সহজেই এই প্রশ্ন আসে যে, কি আকার? দীর্ঘ, কি চতুষ্কোণ, কি ত্রিকোণ; কি আকার? মনের আকার কেহ কখন দেখে নাই, দেখা সম্ভব নহে।

লক্ষণদ্বারা পদার্থ নির্ণয় হয়। এক পদার্থের বিশেষ লক্ষণ অন্য পদার্থে লক্ষিত হয় না। বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থ বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। বৃক্ষের যাহা বিশেষ লক্ষণ, তাহা লতায় নাই; লতার যাহা বিশেষ লক্ষণ তাহা বৃক্ষে নাই; পর্ব্বতের যাহা বিশেষ লক্ষণ, তাহা নদীতে নাই। নদীর যাহা বিশেষ লক্ষণ, তাহা পর্ব্বতে নাই। গো, অশ্ব, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি প্রত্যেক জীব, বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। গরুর বিশেষ লক্ষণ অশ্বে নাই,—অর্থাৎ গরুতে যাহা বিশেষ কিছু দেখিয়া গরুকে গরু বলিয়া মনে করি, তাহা অশ্বে নাই। আবার অশ্বে যাহা কিছু বিশেষ আছে, অর্থাৎ যাহাতে অশ্বকে অশ্ব বলিয়া মনে করি, তাহা গরুতে নাই। পক্ষীর যাহা বিশেষ গুণ, তাহা মনুষ্যে নাই, এবং মনুষ্যের যাহা বিশেষ

* পুনরুত্থানকারী দলের একজন প্রধাননেতা আত্ম-পক্ষ সমর্থন জন্য এই যুক্তিটী ব্যবহার করিয়াছেন।

গুণ, তাহা পক্ষাতে নাই। পদার্থ সকলের বিশেষ লক্ষণদ্বারাই, পদার্থের বিভিন্নতার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জগতের সকল পদার্থ যে একই পদার্থ নয়, তাহা কেবল বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন লক্ষণদ্বারা আমাদের প্রতীতি হয়। জল মৃত্তিকা নয়, মৃত্তিকা জল নয়। জল ও মৃত্তিকার গুণভেদের জন্যই এই বোধ সম্ভব হয়।

মন ও জড় সম্বন্ধেও সেইরূপ। মনের যাহা বিশেষ লক্ষণ, তাহা জড়পদার্থে নাই, জড়ের যাহা বিশেষ লক্ষণ, তাহা মনের লক্ষণ নহে। মনের বিশেষ লক্ষণ জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা; জড়ের বিশেষ লক্ষণ আকৃতি, বিস্তৃতি, বেধ ইত্যাদি। মনের যাহা গুণ, তাহা জড়ে দেখিতে পাই না, এবং জড়ের যাহা গুণ, তাহা মনে দেখিতে পাই না। জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, জড় পদার্থে দেখিতে পাই না; আকৃতি, বিস্তৃতি বেধ, মনে দেখিতে পাই না। জ্ঞান, ভাব প্রভৃতি গুণ জড়ে নাই; আকৃতি প্রভৃতি গুণ মনে নাই। সুতরাং মনকে সাকার পদার্থের মধ্যে পরিগণিত করা যে কতদূর অযুক্ত ও হাস্যকর, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

যদি মনকে সাকার বল, তাহা হইলে এই গৃহটি, ঐ বৃক্ষটি, ঐ নদীটিকে নিরাকার বল না কেন? মনকে যদি সাকার বলিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে এই গৃহটিকেও নিরাকার বলিবার অধিকার থাকিবে না কেন? ইহাও যেমন যুক্তিযুক্ত, উহাও তেমনি। মনের আকার আছে, ইহা হাস্যের কথা। একজন আপনার চঞ্চল মনের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "মনটার যদি আকার থাকিত, আমি তাহার গালে তিন চড় লাগাইতাম।"

সাকার আগে না নিরাকার আগে?

এস্থলে অনেকে বলিবেন যে, নিরাকার পদার্থের সত্ত্বা স্বীকার করিলেও, ইহা বলিতেই হইবে যে সাকার ব্যতীত নিরাকারের জ্ঞান লাভ হয় না। সাকারের দ্বারা আমরা নিরাকারকে ধরিতে পারি। ইহা কি যুক্তিযুক্ত কথা?

পূর্ব্ববর্ত্তী কে? নিরাকার না সাকার? আমার যে জ্ঞান আছে, তাহা কে বলিয়া দেয়? জ্ঞান আপনাকে আপনি প্রদর্শন করে। জ্ঞান আপনার সাক্ষী আপনি। জ্ঞানদ্বারাই বুঝিতে পারি যে জ্ঞান রহিয়াছে। সূর্য্য যেমন আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত, জ্ঞানও সেইরূপ আত্মজ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত। জড় আছে, সাকার পদার্থ আছে, কে বলিয়া দেয়? কেমন করিয়া জানিতে পারি যে, এই অসংখ্য, অগণ্য সাকার পদার্থ রহিয়াছে? জ্ঞানদ্বারা। জ্ঞান নিজের সত্ত্বা, নিজে প্রদর্শন করে, এবং এই সুবিশাল বহির্জ্জগতের সংবাদ আনিয়া দেয়। আমার যে জ্ঞান আছে, তাহা জ্ঞানই বলিয়া দিতেছে; আর ঐ যে সম্মুখে বৃক্ষটি রহিয়াছে, উহার সম্বাদ কে দিতেছে? জ্ঞানই উহার কথা বলিয়া দিতেছে। জ্ঞান বলিয়া দেয়, সেই জন্য আমরা এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দবিশিষ্ট বহির্জ্জগতের খবর পাই।

এখন দেখ, আগে কি, আর পরে কি? নিরাকার আগে, না, সাকার আগে? নিরাকার জ্ঞান সাকারের কথা বলিয়া দেয়, তবে আমরা সাকারের বিষয় জানিতে পারি। নিরাকার আগে, সাকার পরে। নিরাকার জ্ঞানের উপরে সাকার প্রতিষ্ঠিত। নিরাকার ভিন্ন সাকারের সত্ত্বা বৃথা। নিরা-

কার ভিত্তিমূলে সাকার প্রতিষ্ঠিত। আমরা নিরাকার দ্বারা সাকারকে জানি। সাকার জড় জগৎ,—এই সাকার দেহ,—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের সত্ত্বা কে দেখাইয়া দেয়? ঐ নিরাকার জ্ঞান। নিরাকার না থাকিলে সাকার কোথায় পাইতে? তবে কেমন করিয়া বল যে, সাকার ব্যতীত নিরাকারকে জানা যায় না? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, উহার বিপরীত যাহা, তাহাই সত্য;—নিরাকার ব্যতীত সাকারকে জানা যায় না।

সাকারবাদ ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

যাঁহারা বলেন, রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না, তাঁহাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় ক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, উক্ত কথাটি যুক্তিযুক্ত কি না? প্রতিমাপূজা করিতে হইলে প্রতিমার 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' একান্ত আবশ্যক। প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রতিমা পূজা হয় না। কুম্ভকার যখন প্রতিমা নির্ম্মাণ করিল, তখন উহা পূজার পদার্থ নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পুরোহিত আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা পূজার যোগ্য হয় না। লোকে বিশ্বাস করে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠারূপ বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, ততক্ষণ, উহাতে দেবতার আবির্ভাব হয় না। আবার পূজা শেষ হইয়া গেলে, উহাতে দেবতার আবির্ভাব থাকে না। দেবতা তখন চলিয়া যান। ঐ প্রতিমা তখন আর পূজার যোগ্য থাকে না।

এখন জিজ্ঞাসা করি যে, প্রতিমাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে যাহা থাকে না, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবামাত্র যাহা আসে,—আবার নিয়মিত পূজার কাল অতীত হইলে বিসর্জ্জনের পর যাহা থাকে না,—সেই পদার্থ,—সেই দেবতাকে, হে ভাই! সাকারবাদি! তুমি কি দেখিয়াছ?

দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কি প্রত্যক্ষ করি? প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যাহা, প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর পূজার সময়েও তাহাই, আবার বিসর্জ্জনের পরও তাহাই। এই তিন অবস্থাতেই একই প্রকার দর্শন। অবস্থাভেদে কেহ কিছু বিশেষ দেখিতে পান না। যখন ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন কি কেহ প্রত্যক্ষ করেন যে, দেবতা ঐ মূর্ত্তির মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন? আবার যখন বিসর্জ্জনক্রিয়া হয়, তখন কি কেহ প্রত্যক্ষ করেন যে, দেবতা ঐ মূর্ত্তি হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন? কেহ কখন দেখিতে পান না। আদি, মধ্য, অন্ত তিন অবস্থাতেই সকলে সমানরূপ দর্শন করেন। প্রতিমাতে দেবতা আবির্ভূত হইলেন, দেবতা পূজা গ্রহণ করিলেন, পূজান্তে দেবতা চলিয়া গেলেন, এই তিনটী ঘটনা কাহারও দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। দেবতা কখন্ আসিলেন, কখন্ থাকিলেন, কখন্ প্রস্থান করিলেন, কেহ কখন দেখিতে পায় না।

এখন সাকারবাদীকে জিজ্ঞাসা করি যে, রূপদর্শন ভিন্ন যদি পূজা না হয়, তাহা হইলে প্রতিমাপূজা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বা পাষাণ নির্ম্মিত যে মূর্ত্তি, তাহারই কি পূজা তুমি করিতেছ? তুমি কি জড়োপাসক? তুমি কি পুত্ত-

লিকার পূজা করিয়া থাক ? এ প্রকার প্রশ্নে বুদ্ধিমান্ সাকারবাদী অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি বলেন, আমরা জড়ের উপাসনা করি না, পুত্তলিকার উপাসনা করি না, আমরা মূর্ত্তিপূজক নহি, মূর্ত্তির মধ্যে আবির্ভূত দেবতার পূজা করি।

ইহাই যদি সত্য হয়, তবে রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না, সে কথা কোথায় থাকিল ? তুমি কুম্ভকার নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দেখ ;— প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পরে, বিসর্জ্জনের পরে, কেবল সেই প্রতিমূর্ত্তিই দেখ। তাহাতে যে দেবতার আবির্ভাব হয়, তাহা দেখিতে পাও না। আবির্ভাব তিরোভাব কিছুই দেখিতে পাও না। তবে কেন বল যে, রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না ? তুমি আপনি বলিতেছ যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় ঐ মূর্ত্তি তোমার পূজার বিষয় নহে। উহাতে যাহা আবির্ভূত হয়, তাহাই তোমার পূজার বিষয়। কিন্তু যাহা আবির্ভূত হয়, তাহা কি তোমার প্রত্যক্ষের বিষয় ? তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইলে জড়-নির্ম্মিত মূর্ত্তির প্রয়োজন থাকিত না। তবে কেন বল যে, রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না ? তোমার চক্ষু যাহা দেখিতেছে, তাহার পূজা করিতেছ না ; কখন যাহা দেখিতে পাও না, তাহারই পূজা কর, তবে কেন বল যে, রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না ?

এ কথায় সাকারবাদী বলিবেন, যে, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইনা বটে, কিন্তু বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি যে, ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিলে প্রতিমায় উপাস্য দেবতার আবির্ভাব হয় ; বিশ্বাস করি যে, দেবতা পূজার্ সময় প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত থাকেন ; বিশ্বাস করি যে, উপযুক্ত সময়ে দেবতার তিরোভাব হয়। এ সকলই আমার বিশ্বাসের বিষয়।

এস্থলে আবার জিজ্ঞাসা করি, হে ভাই সাকারবাদি ! উহা যদি তোমার বিশ্বাসের বিষয় হয়, তবে রূপদর্শন সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে নিরাকারবাদীর অধিক কি প্রভেদ রহিল ? তোমারও বিশ্বাস, তাহারও বিশ্বাস। রূপদর্শন সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে অধিক কি প্রভেদ রহিল ?

নিরাকারবাদীর অবলম্বন কি ?

এস্থলে সাকারবাদী বলিতে পারেন যে, যদিও আমি আমার উপাস্য দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না, তথাচ আমার অবলম্বন আছে। প্রতিমা আমার অবলম্বন। প্রতিমাতে দেবতার অবির্ভাব আমি বিশ্বাস করি। প্রতিমা আমার অবলম্বন। আমরা প্রতিমূর্ত্তির পূজা করি না। পূজার অবলম্বন হইবে বলিয়া প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি। নিরাকারবাদীর অবলম্বন কোথায় ? বিনা অবলম্বনে কি উপাসনা হয় ? শূন্যের উপরে কি উপাসনা হয় ? নিরাকারবাদীর অবলম্বন কোথায় ?

নিরাকারবাদীর অবলম্বন নাই ? একথা কে বলে ? সাকারবাদীর অবলম্বন ক্ষুদ্র একটী প্রতিমূর্ত্তি, নিরাকার বাদীর অবলম্বন অখিল ব্রহ্মাণ্ড ;—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ। উর্দ্ধে অসীম গগনে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকল,—অত্যাশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড নিচয়, ব্রহ্মপূজার অবলম্বন। নিম্নে সসাগরা ধরণী,—ক্ষুদ্র তৃণকণা হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে প্রকাণ্ডকায় মাতঙ্গ পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্রতম বালুকণা

হইতে অত্যুচ্চ হিমালয় পর্য্যন্ত, সামান্য গোষ্পদ হইতে অকূল মহাসাগর পর্য্যন্ত, সকল জগৎ ব্রহ্মপূজার অবলম্বন! সমস্ত প্রাণীর সুন্দর সুকৌশলময় দেহ ব্রহ্মপূজার অবলম্বন! সকলের উপর মনুষ্যের সুন্দর মনোহর মূর্ত্তি ব্রহ্মপূজার কেমন সুন্দর অবলম্বন! মনুষ্যের মধ্যে পরমেশ্বরের প্রকাশ যে দেখে নাই, দেখিয়া অবনত মস্তকে কখন প্রণাম করে নাই, সে কিছুই দেখে নাই। শিশুর সরলতায়, নিরুপম মাতৃ-স্নেহে, সাধ্বী সতীর পবিত্র প্রেমে ভক্ত-জনের ভক্তিরঞ্জিত মুখশ্রীতে, সাধু মহাত্মার নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতা দেখে নাই, সে কিছুই দেখে নাই! সকলই তাঁহার পূজার আয়োজন!

এস্থলে সাকারবাদী বলিতে পারেন যে, যদি অবলম্বন স্বীকার করিলে, তবে প্রতিমায় আপত্তি কেন? প্রতিমাপূজা দেশকাল-বদ্ধ কল্পিত দেবতার পূজা, সেই জন্যই আপত্তি।

অসীম ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম-পূজার অবলম্বন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড-পতি প্রকাশিত। তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, মঙ্গল ভাব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছে;—তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিপদার্থে অধিষ্টিত ও প্রকাশিত। সাধক বিশ্বাস-নয়নে তাঁহাকে এই জড়-জগতে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।

এই জগতে কি জগদীশ্বরকে দেখা যায়? ইহাও কি সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্যকে কি দেখিতে পাওয়া যায়? মনুষ্য কি চক্ষুগোচর হয়? মনুষ্যের কি দেখিতে পাও? তাহার হস্ত, পদ, মুখ, নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ সকল;—তাহার অস্থি, মাংস, শিরা প্রভৃতি দৈহিক উপাদান ব্যতীত আর কি দেখিতে পাও? কিন্তু হস্ত, পদ, মুখ, নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ বা অস্থি, মাংস, শিরা প্রভৃতি শারীরিক উপাদন কি মনুষ্য? এ সকল কি জড় পদার্থ নহে? ঐ সকল যদি জড়পদার্থ হয়, তবে মনুষ্য কি ঐ সকল জড়? মনুষ্য কি হস্ত পদাদি অঙ্গ অথবা অস্থি, মাংস শিরাদি দৈহিক উপাদান? নিশ্চয়ই না। যদি নিশ্চয়ই তাহা না হইল, তবে মনুষ্য কি?

তোমার পূজনীয়া জননীর কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া বিদেশ হইতে গৃহে আসিলে। আসিয়া দেখিলে তোমার জননীর মৃতদেহ গৃহ-প্রাঙ্গনে শয়ান। তুমি ক্রন্দন করিয়া উঠিলে; বলিলে, "হায়!" মার সঙ্গে দেখা হইল না!! *

এস্থলে জিজ্ঞাসা করি, কাহার সঙ্গে দেখা হইল না? কি দেখা হইল না? কেন, তুমি পূর্ব্বেও, যাহা দেখিতে, এখনও ত তাহাই দেখিতেছ? পূর্ব্বে যে হস্ত, পদ, মুখ, নাসিকাদি অঙ্গ নিচয় দেখিতে, যে জড়দেহ দেখিতে, এখনও ত তাহাই দেখিতেছ? পূর্ব্বে এমন কি দেখিতে পাইতে, যাহা এখন দেখিতে পাইতেছ না? যে শরীর পূর্ব্বে দেখিতে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেও ত সেই শরীর দেখিতেছ? তবে বল, পূর্ব্বে এমন কি দেখিতে, যাহা এখন দেখিতেছ না?

জড়দেহ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। পূর্ব্বে তুমি তাহা দেখিতে পাইতে, এখনও তাহা দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু পূর্ব্বে সেই দেহে যে চৈতন্যপদার্থের আবির্ভাব ছিল, সেই জীবাত্মা এখন আর নাই।

* ধর্ম্মজিজ্ঞাসা দেখ।

সেইজন্যই তুমি বলিতেছ, "হায়! দেখা হইল না।"

তোমার মাতৃদেহে যে জীবাত্মার অধিবাস ছিল, তাহা কি তুমি কখন দেখিয়াছ? জীবাত্মা কি তোমার চক্ষুগোচর হইত? কখনই না। তুমি পূর্ব্বেও তাহা দেখ নাই, এখনও দেখিতে পাইতেছ না। তবে কেন বলিতেছ, "হায়! দেখা হইল না?"

'দেখা' অর্থ কি? যদি কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর হওয়ার নামই দেখা হয়, তাহা হইলে তুমি পূর্ব্বে মাতৃশরীর মাত্র দেখিয়াছ, এখনও তাহাই দেখিতেছ; আত্মাকে পূর্ব্বেও দেখ নাই, এখনও দেখিতেছ না। আর যদি 'দেখা' শব্দের অন্য কোন অর্থ থাকে, অর্থাৎ যদি চক্ষুদ্বারা দেখা ব্যতীত অন্যরূপ দেখা থাকে, তাহা হইলে এরূপ হইতে পারে যে, পূর্ব্বে তুমি এমন কিছু দেখিতে, যাহা এখন দেখিতে পাইতেছ না।

যখন তুমি বলিলে "হায়! দেখা হইল না!" তখন দেখা শব্দ কিরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়াছ? চর্ম্মচক্ষে দেখা অর্থে নিশ্চয়ই না। কেন না চর্ম্মচক্ষে যাহা দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বেও যেমন দেখিতে, এখনও সেইরূপ দেখিতেছ। জ্ঞানচক্ষু-দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভূতির নাম যদি দেখা হয়, বিশ্বাস-নয়নে চৈতন্য-পদার্থকে গ্রহণ করার নাম যদি দেখা হয়, তাহা হইলে, তুমি পূর্ব্বে সেই মাতৃদেহে যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে, তাহাই এখন দেখিতে পাইতেছ না।

এখন দেখ, চক্ষে দেখাই যদি কেবল একমাত্র দেখা হয়, তাহা হইলে আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয় স্বজন কাহাকেও দেখিতে পাই না, কেননা চক্ষু কেবল জড়-দেহ দেখে! আমাদের পিতা মাতা প্রভৃতি কেবল জড়-দেহ নহেন।' মৃত্যু হইলে কেবল জড়-দেহ থাকে। সেই মৃত জড়-দেহ দেখিলে তাঁহাদিগকে দেখা হয় না। দেহাধিবাসী জীবাত্মাকে না দেখিলে তাঁহাদিগকে দেখা হয় না। আমরা কেবল চর্ম্মচক্ষে কোন মনুষ্য,—কোন জীবকেই দেখিতে পাই না।

আমার চর্ম্মচক্ষু দ্বারা কেবল জড় দেহ দেখি। আর আত্মা ও মনদ্বারা সেই দেহাধিষ্ঠাত আত্মা ও মনকে দেখি। সেই জন্যই মৃত আত্মীয়ের দেহ দেখিয়া লোক বলে 'দেখা হইল না।' কি দেখা হইল না? চর্ম্মচক্ষে যাহা দেখা যায় না, সেই দেহাধিষ্ঠিত আত্মাকে দেখা হইল না।

এখন সেই পূর্ব্ব প্রশ্ন আবার আসিতেছে,—পরমেশ্বরকে কি দেখা যায়? যেমন মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয় স্বজনকে দেখা যায়, পরমেশ্বরকে সেই রূপ দেখা যায়।

মাতা, পিতা প্রভৃতি সকলকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না, পরম মাতা পরম পিতাকেও চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, মাতা, পিতা প্রভৃতিকে তাঁহাদের স্থূল দেহের সাহায্যে তাঁহাদের স্থূল দেহ অবলম্বনে দেখিতে পাই। পরমেশ্বরকে কি অবলম্বনে দেখিব?

এই অত্যদ্ভুত, সুকৌশলময়, পরম-সুন্দর বিশ্ব ও ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সেই পরম দেবতাকে দর্শন করিবে। পিতৃ মাতৃদেহে যেমন জীবাত্মা অবস্থিত, সেইরূপ এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডে সেই পরম পিতা, পরম মাতা অবস্থিত। জীবাত্মা যেমন দেহে

অবস্থিত, পরমাত্মা সেইরূপ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ করিয়া, ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থের অন্তর বাহিরে স্থিতি করেন। জীবাত্মা যেমন দেহকে পরিচালিত করিতেছেন, পরমাত্মা সেইরূপ এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিনিয়তঃ কার্য্য করিতেছেন। জীবাত্মার স্থিতিনিবন্ধন যেরূপ জীবদেহের জীবন, সেইরূপ পরমাত্মার অধিষ্ঠানে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীবন। দেহের মধ্য দিয়া যেমন জীবাত্মার জ্ঞান, ভাব, ও ইচ্ছা প্রকাশ হয়, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যদিয়াও সেইরূপ পরমাত্মার জ্ঞান, প্রেম, ও শক্তি প্রকাশ পায়। জীবিত মনুষ্যের দেহ দেখিলে যেমন একভাবে তাহার আত্মাকে দেখা হয়, প্রকৃতরূপে দেখিতে জানিলে, এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াও একভাবে ব্রহ্মাণ্ডপতিকে দেখা হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কোন পদার্থের অবলম্বনে সেই পরম পুরুষের পূজা হয়।

এখন কেহ বলিতে পারেন যে, যদি ঈশ্বর-পূজার জন্য অবলম্বন প্রয়োজন হইল, তাহা হইলে প্রতিমায় দোষ কি? তোমারও অবলম্বন, আমারও অবলম্বন, তবে প্রতিমা অবলম্বনে আপত্তি কেন?

আপত্তি এই জন্য যে, প্রতিমা মিথ্যা, কল্পিত, আমি সত্য চাই। সত্যই গম্যস্থান, সত্যই পথ। তবে মিথ্যা কল্পনা অবলম্বন করিব কেন?

পরমেশ্বরের কি প্রতিমা আছে? তাঁহার কি প্রতিরূপ সম্ভব? যাহার রূপ আছে, তাহার প্রতিরূপ সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যিনি অরূপ, চিন্ময়, তাঁহার প্রতিরূপ তেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? আদৌ যখন তাঁহার মূর্ত্তি নাই, তখন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি কেমন করিয়া প্রস্তুত করিবে?

এস্থলে সাকারবাদী বলিবেন "কেমন করিয়া জানিলে যে তাঁহার মূর্ত্তি নাই?" এই সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, তিনি অনন্ত; মূর্ত্তি বলিলেই পরিমিত বুঝায়; সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

জ্ঞান-গঙ্গা।

"হরিবোল হরি"——অতর্কিত ভাবে কাণের ভিতর এই শব্দ প্রবেশ করিয়া একেবারে চম্‌কাইয়া দেয়। এমনি একটী ভয়ানক গান, মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।

মরিতে হইবে সবাই জানে, মরিবার কথাটা ভুলিযাও থাকে সকলে। অথচ মরিতে হইবে মনে হইলেই সকলের একটা ভয় হয়। যে বাড়ীতে দশ বৎসর বাস করিয়াছি, যে সহরে কিছুকাল কাটিয়াছি, কার্য্যান্তরে সে বাড়ী সে সহর ছাড়িতে হইলে চোখে জল আসে। আর যাহাদিগকে এত ভালবাসি, সেই পুত্র কন্যা ছাড়িয়া, জন্মের মত ছাড়িয়া যাইতে হইবে, স্মরণ হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। যাহাদিগকে দু দিন ছাড়িয়া যাইতে হইলে কত ভাবনা মনে উঠে, যদি আমার অনুপস্থিতি কালে তাহাদের কোন অসুখ হয়, কোন বিপদ ঘটে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া চিরদিনের মত বিদায় লইতে হইবে,

তাহারা বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে থাকিবে, একটা আশার কথা বলিতে পারিব না, চখের জল মুছাইতে পারিব না, মনের ভাব মনে লুকাইয়া চাহিয়া থাকিতে হইবে, ইহা স্মরণ করিতে, চিন্তা করিতে, মরণ যাতনা উপস্থিত হয়। এই জন্য লোকে মরিতে এত ভয় পায়। মরণের চিন্তা সাধ্যমত ভুলিয়া যায়।

বস্তুতঃ মরণ কালে এ সকল চিন্তা আসে না। মরণ কালে পরকাল বা ঈশ্বর চিন্তায় লোকে মগ্ন হয়, মায়া কাটাইয়া ফেলে, এ সকল কথা বলিতেছি না—সে সব অসত্য কথা—বা হইলে লক্ষে এক জনে হয়। মা যেমন আদর করিয়া ছোট ছেলের অস্ফুট কথার অর্থ নির্ণয় করে—হাত পা নাড়িলে ইঙ্গিত বুঝিয়া লয়—কবি কল্পনার সাহায্যে আকাশে প্রাসাদ রচনা করে, সাধু জনের মৃত্যুকালের অসম্বদ্ধ প্রলাপেও ভক্তগণ এইরূপ অসম্বদ্ধ কথার সম্বদ্ধ অর্থ টানিয়া লইয়া থাকেন। মৃতের বিকৃত মুখের চর্ম্ম মাংস টানাটানি করিয়া যাহারা হাস্যময় মুখ রচনা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই উন্মাদ ভক্তদিদের অর্থ টানা টানির সীমা কত দূর যাইতে পারে, তাহা আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারি।

মানসিক বেগ কখন কখনও শারীরিক ক্ষমতা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেও সাধারণতঃ প্রথমটী দ্বিতীয়ের অধীন। যখন শরীরের ক্ষয় হইতে থাকে, তখন মানসিক ক্ষমতারও ক্ষয় হয়। ঈশ্বর চিন্তা ও মায়া অতিক্রম করিতে যে সময় আবশ্যক করে, মৃত্যুকালে সাধারণতঃ সে ক্ষমতা থাকে না।

পীড়িতদিগের যাঁহারা সুশ্রুষা করেন, তাঁহারা জানেন, পীড়িতের হিতাহিত শক্তির হ্রাস হয়। মনুষ্য ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল বৃত্তির শেষে লাভ করে। পশুবৃত্তি লইয়া শিশু জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করে। শারীরিক উন্নতির সহিত তাহার মানসিক উন্নতি হইতে থাকে—যাহাদের শারীরিক ব্যাবৃত্তি যথেষ্ট হয় না, তাহাদের মানসিক উন্নতি ঘটে না। পশুর মত হাত পা যাহাদের থাকিয়া যায়, তাহাদের মনও পশুর মত থাকে। অপরাধীগণ অব্যাহত মনুষ্য বা মানব পশু, মনুষ্য-স্রাব বলিলে হয়ত বুঝা যাইতে পারে। তাহাদের বুদ্ধির ন্যূনাতিরেক থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম প্রবৃত্তির ব্যাবৃত্তি একেবারেই হয় না। ধর্ম্ম প্রবৃত্তি মানব উদ্যানের সুকুমার কুসুম অনেক আয়াসে উদ্ভূত হয়, এবং অতি সামান্য কারণে শুকাইয়া যায়। পীড়া ও বার্দ্ধক্য, এইরূপ কারণ। পীড়ায় ও বার্দ্ধক্যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির হ্রাস হয়। নিঃস্বার্থপর সাধু লোক পীড়া কালে স্বার্থপর হইয়া উঠে। দয়ালু নির্দ্দয় হয়, বিনীত অহঙ্কারী হয়, ধর্ম্মনিষ্ঠার হ্রাস হইয়া পড়ে। সুতরাং সাধারণতঃ মৃত্যু-কালে স্নেহ বাৎসল্য মমতার আশা করা যায় না। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির কথা দূরে থাকুক, মৃত্যুকালে কোন প্রকার মনোবৃত্তিই থাকে না। মৃত্যুকালে মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়, মৃত্যু-পূর্ব্ব সজীব বার্দ্ধক্য অবস্থার মনোবৃত্তির পরীক্ষা করিলে অনেক পরি-মাণে জানিতে পারা যায়। মনোবৃত্তি জন্মের পরে ফুটিতে আরম্ভ করে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বেই শুখাইয়া যায়। দীপশিখার মত নিবিবার পূর্ব্বে দু একবার বর্ত্তিকা ছাড়িয়া উপরে উঠে। শেষে একেবারে

আঁধার করিয়া অন্তর্দ্ধান করে। যাহাদের হঠাৎ মৃত্যু হয়, তাহাদের এ দশা ঘটেনা।

বার্দ্ধক্যের প্রথম লক্ষণ স্মৃতির হ্রাস। একটী কাজ করিয়া খানিক পরে মনে হয়, সেটা করা হয় নাই—একটা কথা একবার জিজ্ঞাসা করিয়া খানিক পরে আবার সেইটা জিজ্ঞাসা করিতে হয়। যখন সে কথাটার উত্তর দেওয়া হয়, বোধ হয় যেন কথাটা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল। খানিক পরে দেখা যায়, মনের উপর দিয়া কথাটা চলিয়া গিয়াছে। পদ্মপাতে জলের মত একটু চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই। এই সময়ে স্মৃতির আর একটী ভাব দেখা যায়। খুব প্রাচীন কথা, প্রথম বয়সের কথা বেশ মনে পড়ে, কিন্তু আধুনিক কথা তেমন স্মরণ হয় না। বৃদ্ধেরা এজন্য বাল্য যৌবনের সটীক বিবরণ দিতে পারেন। কিন্তু প্রৌঢ়াবস্থার কথা তেমন বলিতে পারেন না। কাজে কাজেই অতীত তাঁহাদের মনোরম হইয়া উঠে—সত্যযুগ অতীতে স্থাপিত হয়, পুরাতন যাহা, তাঁহারা তাহারই প্রিয় হন। বার্দ্ধক্যে মনের স্থিতিস্থাপকতা চলিয়া যায়। বর্ত্তমান ঘটনা তাহাদের মনের উপর ছাপ বসাইতে পারে না। নূতন কিছুর সম্যক ধারণা বৃদ্ধের পক্ষে অসম্ভব। নূতন মুখ সুন্দর লাগে না, কাজেই বৃদ্ধ বয়সে নূতন বন্ধু ঘটে না। বৃদ্ধ বৃদ্ধের সহবাসে দিনাতিপাত করেন। নূতন নিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া বৃদ্ধের অনুমান হয়—কাজেই বৃদ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই প্রাচীন প্রথার পক্ষপাতী হন। নূতনকে প্রলয়ঙ্কর বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করেন। অতীত পুরাতন পন্থার সৌন্দর্য্যে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া পড়েন। প্রাচীন-পরায়ণতা বৃদ্ধের স্বভাব-সিদ্ধ—যুক্তি গণিত নহে।

রোগে এই প্রাচীন-পরায়ণতার নিদর্শন পাওয়া যায়। রোগী স্বপ্নে বা প্রলাপে বহু প্রাচীন কথার উল্লেখ করে। যাহাদের মুখ অনেক দিন লোপ হইয়াছে, মনে হইত, যাঁহাদের কথা বিস্মৃতি-কবরে নিহত হইয়াছে, রোগী তাহাদিগকে দেখে, তাহাদের সঙ্গে কথা বলে, তাহাদের কথা গান করে। বাল্যকালে যে ভাষা শিখিয়াছিল, যাহার আলোচনা আর হয় নাই, রোগী সেই ভাষায় কথা বলে। যাহারা সে ভাষা শুনে নাই, সেদিনকার ইতিহাস জানে না, তাহার এমন ছেলে মেয়ে বন্ধু বান্ধব সকলে রোগীর সে সকল কথা শুনিয়া প্রেত-গ্রাস কল্পনা করে।

নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্ন ভাঙ্গাইলেও সে যেমন সহজ ভাবে কথা বলিলেও তাহার মনের ভাব তখন প্রকৃতিস্থ না হওয়াতে প্রাতে উঠিয়া তখনকার ঘটনা সে আর কিছুতে স্মরণ করিতে পারে না, রোগীও তেমনি একটী কথার উত্তর পাইয়া আবার সেইটী জিজ্ঞাসা করে, মার কোলে শুইয়া মাকে হারায়, মা মা করিয়া চীৎকার করে, অজ্ঞ মানুষ এ সকল কথা না বুঝিয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভের ব্যাখ্যা করেন।

স্মৃতি ও ধারণা শক্তির হ্রাস হইলে কল্পনা শক্তির সহজেই হ্রাস হয়। বৃদ্ধ নূতন ও পুরাতন মিশাইতে পারে না। পুরাতনকে নূতন ছাঁচে ঢালিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই—নূতনে পুরাতনের সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে তিনি অসমর্থ। আপনাকে অন্যের অবস্থায় কল্পনা করিতে না পারিলে সহানুভূতি ঘটে না। এজন্য বৃদ্ধদিগের সহানুভূতির এত অল্পতা দেখা যায়। অন্যের দুঃখ বিপদে যুবকের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া

উঠে, বৃদ্ধ দূরদর্শিতার ভাণ করিয়া আপন নির্ব্বিকারতার প্রকৃষ্টতা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী হন। অন্যের অভাবের পরিমাণ ধারণা করিতে না পারিয়া আপন অভাবের আধিক্য বুঝিয়া লন। কাজেই একটু স্বার্থপর, লোভী ও নির্লজ্জ হইয়া পড়েন। একদিন একটী বৃদ্ধের সঙ্গে আহার করিতে বসিয়াছিলাম। সেখানে তাঁহার শিশুগণ উপস্থিত ছিল। বৃদ্ধ শিশুদিগের আগ্রহ উপেক্ষা করিয়া সকলই গলাধঃকরণ করিলেন। আমাকে বুঝাইলেন যে, শিশুদিগের খাইবার অনেক দিন আছে।

মিলটন প্রভৃতি মনিষীগণের বৃদ্ধ বয়সে এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাঁহাদের মত মনিষীদিগকে অন্য লোকে ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য। রোগীগণও পীড়ার সময় যে লঘু-[illegible] হইয়া পড়ে, তাহারও কারণ এই সহানুভূতি শক্তির হ্রাস। বৃদ্ধকে পুত্রের মৃত্যুতে অবিচলিত দেখিয়া যুবকগণ চমকিত হয়, এবং বৃদ্ধে অমানুষী দেবোপম সহিষ্ণুতার আরোপ করেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের অনুভাবকতা শক্তির হ্রাস হওয়াতেই এরূপ ঘটে। শিশু যেমন আপন ক্ষতির পরিমাণ বুঝে না—কখনও সামান্য কারণে অধিক কাঁদে, কখন বিশেষ কারণে মোটেই কাঁদেনা, বৃদ্ধ ও রোগীর তাহাই ঘটে। বার্দ্ধক্য দ্বিতীয় শৈশবাবস্থা বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহা কবি-কল্পনা নহে, বিজ্ঞান-সিদ্ধ।

স্মৃতি, কল্পনা, ধারণা ও সহানুভূতি শক্তি, বৃদ্ধ ও শিশুর সমান। সহানুভূতি শিশুর নাই। লোভের স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতায় শিশু পরিপূর্ণ। যাঁহারা শিশুকে নিষ্পাপ বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহারা পাপ কাহাকে বলে, জানেন না বা শিশু প্রকৃতি অধ্যয়ন করেন নাই। শিশু ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-শূন্য। শিশুকে শিক্ষা ও সংসর্গে তাহার জন্মগত কুপ্রবৃত্তি উন্মূলিত করিয়া সৎপ্রবৃত্তি ফুটাইতে হয়। রোগী, বৃদ্ধ ও অপরাধী শিশুর মত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিহীন।

শিশুর সহিত আবার অসভ্যের তুলনা হয়। অসভ্য সমাজের শিশু। শারিরীক ও মানসিক ব্যাবৃতির পরিমাণ তাহার অতি সামান্য। তাহার স্মৃতি ও ধারণা, কল্পনা ও বিচারশক্তি সামান্য। তাহার সহানুভূতি পশুবৎ অস্ফুট। নিষ্ঠুরতা, নির্লজ্জতা ও স্বার্থ-পরতার অসভ্য চূড়ান্ত নিদর্শন। শিশুর মত, জন্ম মৃত্যু ব্যাপার কি অসভ্য বুঝেই না। কিসে লাভ, কিসে লোকসান, তাহার জ্ঞান নাই। যাঁহারা শিশুকে দেবতা বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহারাই অসভ্যকে নিষ্পাপ বলিয়া উল্লিখিত করেন। চৌর্য্য, ব্যভিচার, মিথ্যাবাদীতা, তাঁহারা অসভ্য সমাজে দেখিতে পান না। আর একটু অগ্রসর হইলে, পশুপক্ষীকে তাঁহারা ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য করিতে পারিতেন।

বস্তুতঃ সত্যযুগ অতীত হয় নাই, ভবিষ্যতে আসিতেছে। শরীরের ন্যায় মনও ব্যাবৃতি-সম্পন্ন। পরিস্ফুট না হইলে কুসুমে সুগন্ধ সঞ্চার হয় না। আবার শরীর ব্যাবৃত না হইলে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সুকুমার কুসুম ফুটে না। শরীর পীড়িত হইলে মনের শক্তির হ্রাস হয়। শরীর ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে মনের বিনাশ হয়। মৃত্যুকালে মনুষ্যের সুখ দুঃখ বোধ মোটেই থাকে না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

হিতবাদী ও বুদ্ধদেব।

মান্যবর শ্রীযুক্ত নব্যভারত সম্পাদক মহাশয়—

গত ৩০শে জানুয়ারী হিতবাদী পত্রিকায়, ৺রামদাস সেন প্রণীত বুদ্ধদেব গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে সমালোচক মহাশয় নব্যভারতে উক্ত গ্রন্থের আমি যে সমালোচনা করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমার মত সমর্থন করিবার জন্য নিম্নলিখিত পত্রে আমি হিতবাদী সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আমার পত্রখানি প্রকাশ করেন নাই। সম্প্রতি ২৩শে ফাল্গুনের হিতবাদীতে লিখিয়াছেন—"বুদ্ধদেব সংক্রান্ত আলোচনা অতীব প্রীতিকর, প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে।" তথাচ আমার পত্রখানি প্রকাশ করেন নাই। নব্যভারতের পাঠকদিগকে আমি আমার সমালোচনায় যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, তাহা যে অসত্য নহে, ইহা আমি প্রমাণ করিতে বাধ্য। কেবল সেই জন্য ও সত্য নির্ণয়ের জন্য আমি পত্রখানি লিখি। মাননীয় হিতবাদী সম্পাদক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলাম। আত্মগৌরব বৃদ্ধি করিতে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া পত্রখানি লিখি নাই। যাহাই হউক, যখন আচার্য্যমহাশয় আমার পত্রখানি প্রকাশ করেন নাই, তখন নব্যভারতের পাঠকদিগের নিকট আমি উহা উপস্থিত করিলাম। তাঁহারা যদি পত্র লিখিত প্রশ্নগুলির আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, আমি তাঁহাদের আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত আছি। এখানে একথা বলাও আবশ্যক, ইহার কয়েকটী প্রশ্ন প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে নব্যভারতে আলোচনা করিয়াছিলাম। প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড নব্যভারত দেখিলে একথার প্রমাণ হইবে।

যদি পুনরালোচনা আপনার ও আপনার পাঠকবর্গের অভিহিত হয়, তবে হিতবাদীর সমালোচনাটীও নব্যভারতে প্রকাশ করিলে পাঠকগণের পড়িবার সুবিধা হইবে। এখানে একথাও বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্বে নব্যভারতে বুদ্ধের জীবনী বিস্তৃতভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম কি? হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? ইত্যাদি বিষয়গুলির সমালোচনা প্রার্থনীয়, কিন্তু আপনার পাঠকগণের রুচিকর হইবে কি না, জানি না। বিশেষতঃ সম্মাননীয় জগদীশ্বর বাবু সম্প্রতি বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তৃত আলোচনা করিতেছেন এবং আমার বন্ধু বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ইতিপূর্ব্বেই ত্রৈলোক্য বাবুকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। এখন পূজ্যপাদ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সহিত সদৃশ ক্ষুদ্রজনের বিতর্ক প্রীতিকর না হইতে পারে।

ছাপরা
১৫।২।৯২

বশম্বদ,
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

মান্যবর শ্রীযুক্ত হিতবাদী সম্পাদক মহাশয়—

বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ঐতিহাসিক সত্যের প্রায় আলোচনা হয় না। হিতবাদীতে সে অভাব মোচনের সম্ভাবনা হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

নব্যভারতে আমি রামদাস সেনের প্রণীত বুদ্ধদেব-চরিতের সমালোচনা করিয়াছিলাম। গত সপ্তাহে ঐ গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে আপনি আমার সেই সমালোচনার বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়াছিলেন।

একদিন আপনার চরণতলে বসিয়া আমি শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, এখনও যদি কিছু শিখিতে পারি, সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিব। যখন সমালোচনাটী সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে, তখন উহা আপনার লিখিত বা অনুমোদিত বলিয়া আমি অনুমান করিতে পারি।

আমি নব্যভারতে কি লিখিয়াছিলাম, হিতবাদীর সকল পাঠকেরা তাহা জানা না থাকিতে পারে। এজন্য প্রার্থনা করি, নব্যভারতের প্রবন্ধটী হিতবাদীতে প্রকাশিত করিবেন।

বুদ্ধদেব-রচয়িতা বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মৌলিকতা অস্বীকার করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ করা গিয়াছিল। সে যাহা হউক, এখন এই কয়েকটী কথার আলোচনা বিধেয়।

১। ললিত বিস্তর ও মহাবস্তু অবদান প্রামাণ্য গ্রন্থ কি না?

২। বুদ্ধ জাতিভেদ, দেবদেবী ও বেদপ্রোক্ত যাগযজ্ঞ মানিতেন কি না?

৩। জৈমিনি বুদ্ধের পূর্ব্বতন কি না?

৪। মীমাংসা দর্শনে যাগ-যজ্ঞের বিরুদ্ধে বৌদ্ধমত খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে কি না?

আপনার সমালোচক বলিয়াছেন, ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু প্রামাণ্য গ্রন্থ। "বুদ্ধ জাতিভেদ মানিতেন না, দেবদেবী মানিতেন না এবং বেদপ্রোক্ত যাগ-যজ্ঞের বিষম বিদ্বেষী ছিলেন" আমার এই মতটী তিনি ভুল বলিয়াছেন। এবং লিখিয়াছেন, জৈমিনি প্রণীত মীমাংসা দর্শন বুদ্ধের বহু-পূর্ব্বে রচিত। সুতরাং এ কয়টী কথা প্রমাণের ভার তাঁহার উপর। চতুর্থ কথাটী প্রমাণ করিবার ভার আমার উপর। এবং আমাকে ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে, ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু প্রামাণ্য নহে এবং বুদ্ধ জাতিভেদ, দেবদেবী ও যাগ-যজ্ঞ মানিতেন না।

গত সপ্তাহের সমালোচনায় প্রথম দুটী কথা সম্বন্ধে বিসম্বাদী মত একই মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। এজন্য কি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, তাহা প্রথমে নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

বিসম্বাদী কথা এইগুলি;—"ললিতবিস্তর, মহাবস্তু অবদান ও মহাবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয়।" "এই কয়েকখানি গ্রন্থে কবি-কল্পনার প্রাচুর্য্য দেখা যায়।" "কবি কল্পনার কুজ্ঝটিকায় প্রকৃত বুদ্ধমত আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।"

"তিনি কখনও ঘুণাক্ষরে বেদনিন্দা করেন নাই"—"তিনি ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করিতেন কি না, তাহা এখন স্থির বলা যায় না।" "হিংসা ঘটিত বৈদিক-ক্রিয়া কলাপ (যাগ-যজ্ঞ) তাঁহার মত বহির্ভূত" "তিনি হিংসা-ঘটিত ও কামনা-ঘটিত বৈদিক কর্ম্ম করেন নাই। এবং করিতে অন্যকেও নিষেধ করিতেন।"

বুদ্ধ জাতিভেদ মানিতেন কি না, এতৎ সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে কোনও বিসম্বাদীমত প্রকাশিত হয় নাই।

আশা করি, এ সম্বন্ধে আলোচনা আপনার গ্রাহকগণের অপ্রীতিকর হইবে না।

বশম্বদ,
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

মেঘদূত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গম্ভীরার সনে মিলনে বিমুখ ?—
সে যে বাসে ভাল, দেখনা চেয়ে,
তব নীলছবি ভরা তার বুক,—
শান্ত-স্বচ্ছ-হৃদি সরলা মেয়ে !
সরমে শফরী-চঞ্চল-নয়নে
সঘন কটাক্ষে তোমায় দেখে,
ধৈরজ ধরিবে বলনা কেমনে
কোন্ প্রাণে তার ছলিবে, সখে ! ৪১
তাহার সুনীল সলিল-অম্বরে
হরিয়ে, উলঙ্গি জঘন-তটে,—
(সামালে সে তীর-বেতসের করে,
রমণীর লাজ এমনি বটে !)—
রসভরে ভোর, কেমনে গমন
করিবে, মনেতে এ ভয় বাসি ;—
ত্যজে সে কেমনে, মজেছে যে জন,
বিজনে নগন রূপের রাশি ? ৪২
নবজলসিক্ত ধরার আঘ্রাণে
শীতল অনিল সৌরভ-মাখা
দেবগিরি পথে তোমার প্রয়াণে
মৃদুল ব্যজনে করিবে পাখা ;—
নাসা ভরি পিয়ে যে বায়ু হরষে
নিনাদে কুঞ্জর ঘন গভীর,
উডুম্বর বন যে বায়ু পরশে
পরিণত ফলে নমিতশির। ৪৩
স্কন্দের নিবাস দেবগিরি শিরে ;—
ধরিয়া সুচারু কুসুম-কায়,
আর্দ্র প্রসূন মন্দাকিনী-নীরে
বরষিয়া স্নান করায়ো তাঁয় ;
প্রতাপ তাঁহার জিনিয়া তপন,
মহাদেব-তেজে জনম তাঁর
বহ্নির মুখেতে, ইন্দ্র সেনাগণ
রক্ষিতে হরিতে অসুর-ভার। ৪৪
জ্যোতিঃ-থর-চারু পাখন যাহার
খসিলে, জননী-স্নেহেতে তুলি,
করেন ভবানী কাণে অলঙ্কার,
কুবলয়-দল-দুলেরে ভুলি ;
আরো শুক্লতর সাদা আঁখি যার
হরশিরশশী কিরণ মালে,
নগ-প্রতিহত গরজে তোমার,
সে কুমার-শিখী নাচিবে ভালে। ৪৫
সিদ্ধ-দম্পতি এসেছিল যারা
বীণার বাদনে পূজিতে দেবে,
তন্ত্রী ভেজে পাছে বলিয়া তাহারা
ছাড়ি তব পথ চলিয়া যাবে ;—
অর্চ্চি তাঁরে, যাও, যথা চর্ম্মণ্বতী,
যজ্ঞধেনু লোহে জনমি, রাজে,
রন্তিদেব-কীর্ত্তি যেন মূর্ত্তিমতী
প্রবাহিনী-রূপে, অবনী মাঝে। ৪৬
তদুপরি, বারি-গ্রহণ-কারণে,
শ্যাম-নীলতনু, রাজিবে যবে,
দূর-ব্যোম-চর অমর নয়নে
মরি কিবা শোভা বিথার হবে !
দূরতায় কৃশ বিশাল তটিনী,
যেন এক নর মুকুতামালা,
মাঝে গাঁথা স্থূল ইন্দ্র-নীল-মণি,
ধরণীর বুক করে উজালা। ৪৭
করহ গমন, অতিক্রমি তায়,
দশপুর-ধামে হরষ ভরে,
পুর-যুবতীরা হেরিবে তোমায়
মোহন নয়ান সোহাগ করে ;—

কিবা ভ্রু-বিলাস, পক্ষ্মরাজি ঘন,
　　ডাগর আঁখিতে কি কাল তারা,
উপরে চাহিতে ঢল ঢল, যেন
　　সচঞ্চল কুন্দে ভ্রমর-পারা! ৪৮
পশি ছায়া-রূপে ভক্তিপূত মনে
　　ব্রহ্মাবর্ত্তে, পরে যাইও তুমি
খ্যাত কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গনে,
　　সহস্র বীরের শ্মশান-ভূমি;
যথা পার্থ ধরি গাণ্ডীব ভীষণ
　　ছড়াইলা ঘন বরষি শরে
শত রাজমুণ্ড; তুমি, গো, যেমন
　　লুটাও কমলে শ্রাবণ-ধারে। ৪৯
পক্ষপাত ভয়ে না পশি সমরে,
　　পানসহচরী ছাড়িয়া প্রিয়া,
ছাড়ি স্বাদু সুরা যাহার ভিতরে
　　রেব[illegible]লোচন ছায়',
সেই হলধর গেলেন যথায়,
　　সেই স্বরস্বতী পানীয় পিয়ে,—
বাহিরেতে কাল, কি দোষ তাহায়,
　　কর পূত-শুভ্র ভিতর হিয়ে। ৫০
"পরে যেও, যথা কনখল স্থানে
　　নাবেন জাহ্নবী নগেন্দ্র হতে,
আগমন যাঁর, যেন বা সোপানে
　　স্বরগে লইতে সগর-সুতে;
গৌরীর অসূয়া-ভ্রুকুটি কুঞ্চিত
　　তুচ্ছ করি, হাসি ফেনার হাসি,
ঊর্ম্মি-করে যিনি চন্দ্র-উদ্ভাসিত
　　শম্ভু-জটা দাপে গ্রহিলা আসি। ৫১
"সুর-গজ-প্রায় পি'তে সেই বারি
　　গগনে পশ্চাত ছড়ায়ে কায়,
রহিবে যখন, শ্বেত জলোপরি
　　পড়ি তব ছায়া কেমন ভায়!—
কাল সাদা স্রোত মিশি বুকে তাঁর
　　বহিবে অপূর্ব্ব মহিমা ধরি,
যেন অন্য স্থানে গঙ্গা যমুনার
　　মিলনের শোভা প্রকাশ করি। ৫২
"মৃগনাভি গন্ধে সুরভি-কন্দর,
　　পুণ্য জাহ্নবীর জনম যায়,
তুষার-ধবল হিমাদ্রি ভূধর,
　　আরোহিবে, সখে, যখন তায়,
শ্রম-বিনোদনে ধবল শিখরে
　　বসিলে, সুন্দর হইবে শোভা,
মহেশ-বৃষের শ্বেত শৃঙ্গোপরে
　　পঙ্কের মলিন যেমন আভা! ৫৩
"বায়ু-বিতাড়িত দেবদারুদ্রুমে
　　কর্কশ ঘর্ষণে যদিবা উঠে
দাবাগ্নি ভীষণ হিমালয়-ভূমে,
　　দগ্ধ-কেশভার চমরী ছুটে,
শত বারিধারা বরষি তাহায়
　　নিবায়ো বিকট অনল-শিখে,
বিপদে আর্ত্তের হইতে সহায়
　　সাধুর সম্পদ, জানিও, সখে। ৫৪
"বৃথা কোপে মাতি সবেগ লম্ফনে
　　শরভ গরবে যদি বা চায়
লঙ্ঘিতে তোমায় উপর গগনে,
　　উচিত বিধান করিও তায়;
বরষি তুমুল শিলাবৃষ্টি ধার
　　ছিন্ন ভিন্ন করো তাদের দল,
মিছে আড়ম্বর অকর্ম্মা জনার
　　অপমান ছাড়া কি আছে, বল।" ৫৫
"শিলায় অঙ্কিত ধূর্জ্জটি-চরণ,
　　যোগী আনে পূজা সতত যার,
করো প্রদক্ষিণ, ভক্তি নম্র মন,
　　ঘুচিয়া যাইবে কলুষ-ভার;
ভকত জনের, দরশনে তার,
　　পাপ তাপ দূরে পলায়ে যায়,
দেহান্তে ধরিয়া সুন্দর আকার,
　　শিব-সহচর-পদবী পায়।" ৫৬

"কীচকের রন্ধ্রে অনিল প্রবেশি
বাজিতেছে বেণু-মধুর রবে,
কিন্নর-যুবতী দলে দলে মিশি
ত্রিপুর-বিজয় গাইছে সবে,
তুমি যদি কর যোগদান তায়
মুরজ-গরজে করিয়া ধ্বনি
কন্দর মাঝারে, শঙ্কর পূজায়
সম্পূর্ণ সংগীত হইবে, গণি।" ৫৭
"উত্তরে যাইতে, ছাড়ি গিরিবরে,
হতে হবে সেই বিবর পার
ক্রৌঞ্চ নাম যার; ভৃগুপতি শরে
খনিত,—(তাঁহার যশের দ্বার) ;—
মানস-হংসের যাহে আনাগোনা ;
দীর্ঘ-তনু হয়ে পশিতে তথা,
শোভিবে, করিতে বলিরে ছলনা
দীর্ঘকাল বিষ্ণু-চরণ যথা।" ৫৮
ঊর্দ্ধে উঠি, দেখ স্ফটিক কৈলাস,—
(নাড়িল রাবণ, তাহাতে শ্লথ
সানু-সন্ধি তার),—উজল বিভাস,
অমর-নারীর আরশি মত ;
রজত-তরঙ্গে জুড়িয়ে আকাশ
শৃঙ্গ শৃঙ্গোপরে উঠেছে তায়,
যেন রাশিকৃত হর-অট্টহাস
জমাট বাঁধিয়ে প্রকাশ পায়। ৫৯
"নূতন-কর্ত্তিত গজদন্তপ্রায়
অতিশুভ্র সেই গিরির কোলে,
উজল কাজল যিনি তব কায়
লগন হইয়া যখন দোলে,
ভাবি মনে, হবে অপূর্ব্ব সুষমা,
নেহারিবে লোক স্তিমিত চোকে,
শ্যাম উত্তরীয় ধরিবে উপমা
যেন বলদেব ধবল-বুকে। ৬০
"ভুজঙ্গ-বলয় ত্যজিয়ে শঙ্কর
গৌরীহাতে হাত বেড়ান যদি
সেই ক্রীড়া-শৈলে, যাইয়া সত্বর
করো তাঁহাদের সেবার বিধি ;
অন্তর্বাষ্পরাশি ঘনীভূত করে,
পেতে দিও তনু সোপান-প্রায়
সুথরে বিথারি, মনিতট'পরে
উঠিবেন তাঁরা মাতায়ে তায়। ৬১
"তব অঙ্গে কোটি কঙ্কন-ঘাতন
করিয়ে অমর-যুবতী-দল
করাবে তোমায় বারি উদ্গীরণ,
যন্ত্র-ধারে যথা সুরভি জল ;
অঙ্গনারা যদি,—ক্রীড়ারঙ্গে ভোর,—
না ছাড়ে নিদাঘে তোমায় পেয়ে,
শ্রবণ-বিদার গরজন ঘোর
করে কাঁপাইও তাদের হিয়ে। ৬২
"করি তথা পান মানসের নীর
সোণার কমল যাহাতে ভাসে,
ঢাকিয়া কৌতুকে ঐরাবত শির,
বস্ত্রে যেন, সেথা যদি সে আসে,
কাঁপায়ে পল্লব কল্পতরুজাত
অতিসূক্ষ্ম চারু বসন যথা,
করি নানা হেন খেলা মনোমত
কৈলাস-ভূধরে, বিহর তথা। ৬৩
"অলকা বিরাজে কোলেতে তাহারি,
গঙ্গা নীচে লুটে, বসন-প্রায়,
প্রিয়-কোলে যেন মুক্তবাস নারী,—
দেখিলেই, সখে, চিনিবে তায় ;
বরষায়, তার উচ্চ সৌধশিখে
উড়ে মেঘমালা, কভু বা ঝরে
উজল ফোঁটাতে, যেন নারীমুখে
অলক গ্রথিত মুকুতা-নরে। ৬৪

পূর্ব্বমেঘ সমাপ্ত।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

ঢাকার পুরাতন কাহিনী। (৯)

(সেনরাজগণ।)

মাধব সেন অতি অল্পকাল রাজত্ব করিয়া গতাসু হইলে, তাঁহার পুত্রাদি না থাকাতে মাধবের কনিষ্ঠভ্রাতা কেশব সেন বিক্রমপুরের রাজসিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার নামাঙ্কিত শাসনপত্রে 'পরমসৌর' শব্দ দৃষ্টে কেশব সেন সূর্য্যোপাসক ছিলেন বলিয়া কৈলাস বাবু অনুমান করেন। কেশব সেনের সময়ে উড়িষ্যার গঙ্গা বংশীয় নরপতিগণ পর্য্যন্ত বঙ্গেশ্বরের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হন বলিয়া তাঁহার শাসনপত্র দৃষ্টে অনুমান হয়। যে কবি অতিরঞ্জিত বর্ণনা অনুসারে ... সেনের আধিপত্য পশ্চিমে প্রয়াগ হইতে দক্ষিণে পুরীপর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, সেই কবির পক্ষে কেশব সেনের স্বল্পকালস্থায়ী শাসন প্রভাব উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তার করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মাধব সেনের রাজত্বকাল এত অল্পস্থায়ী হইয়াছিল যে, তিনি ইদিলপুরের শাসনপত্রখানি লিখিত হইতে না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা কেশব সেন জ্যেষ্ঠভ্রাতার নামের পরিবর্ত্তে আপনার নাম লিপিবদ্ধ করাইয়া সেই দান-কার্য্য সম্পন্ন করেন। অনুমান ১১৩১ খ্রীঃ হইতে ১১৩৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মাধব ও কেশব সেন এই উভয় ভ্রাতা বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কেশব সেনের মৃত্যুর পর হইতে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসন আরোহণের সময় পর্য্যন্তও বঙ্গদেশে সেনবংশীয় কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে আজপর্য্যন্তও স্থিরীকৃত হয় নাই। এ সম্বন্ধে ডাক্তার মিত্রের আনুমানিক নির্দ্ধারণ অপেক্ষা কৈলাস বাবুর অনুমানই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমরা তাহা গ্রহণ করিলাম। কৈলাস বাবু স্বীয় অনুমানের পরিপোষক যাবতীয় যুক্তি ও প্রমাণ বিস্তারিতরূপে প্রদর্শন করিলে, তাহার সারবত্তা বিশিষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইতে পারিত। পুণ্যভূমি উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের সুবিখ্যাত শিবমন্দিরের নিকটবর্ত্তী অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের দ্বারদেশস্থ প্রস্তরলিপির বিবরণ দৃষ্টে কৈলাস বাবু অনুমান করেন যে, ৩২ লক্ষ্মণাব্দে (১১৩৯ খ্রীঃ) হরিব্রহ্ম সেন দেব বাঙ্গালার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। সাবর্ণগোত্রজ ভবদেব ভট্ট তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। এই ভবদেবের পিতামহ আদিদেব মহারাজ বল্লাল সেনের মন্ত্রী এবং তাঁহার পিতা বাবর গোবর্দ্ধন বল্লালের পুত্র রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ পঞ্চ পণ্ডিত-রত্নের অন্যতম ছিলেন। প্রস্তরলিপির হরিব্রহ্ম দেবকে কুলজীকারগণ ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী' কেশবসেনের পরবর্ত্তী নয়জন রাজার অন্যতম হরিসেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রস্তরলিপির মূল বা অনুবাদ আপনার অনুমানের প্রমাণস্থলে প্রদর্শন করিয়া, হরিব্রহ্ম দেবের নামে 'সেন' উপাধিযুক্ত না থাকার আপত্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিভিন্নবংশীয় নৃপতিবর্গের

কতকগুলি উপাধি সংগ্রহপূর্ব্বক তাহা খণ্ডন করিয়া অসঙ্গত ব্যস্ততার সহিত কৈলাস বাবু আপনার বক্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। এই হরিব্রহ্ম দেবের সহিত কেশব সেন কি অশোকচন্দ্রের কি সম্বন্ধ ছিল, তৎসম্পর্কে অনুমানের সাহায্যেও কোন কথা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা কৈলাসবাবু আবশ্যক বোধ করেন নাই। হরিব্রহ্ম দেব কেশব সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হওয়া বিচিত্র নহে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী অশোকচন্দ্র হরিব্রহ্মের পুত্র হওয়া অসম্ভব নহে। অনুমান ভিন্ন এ সম্বন্ধে কোনও কথা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই।

হরিব্রহ্ম দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র (?) অশোকচন্দ্র দেব বাঙ্গালার রাজাসনে আসীন হইয়া ৫৩ লক্ষ্মণাব্দে (১১৫৯ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করিতে থাকেন। অশোকচন্দ্রকে ডাক্তর মিত্র সমগ্র বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজা লাক্ষ্মণের হইতে অভিন্ন অনুমান করিয়া, ১১৪২—১২০৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৬৩ বৎসরকাল তাঁহার রাজত্বকাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বৌদ্ধগয়ার প্রস্তরলিপির শেষভাগে লিখিত সুবিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ সাহেব ও ডাক্তার মিত্রের পঠিত ৭৪ লক্ষ্মণাব্দকে ৫৩ বলিয়া অনুমান করিয়া কৈলাস বাবু আপনার মত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। মূলের প্রতিলিপির অভাবে আমরা তাঁহার মতের সারবত্তা নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না। অশোকচন্দ্র ও দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে। (১) স্বপঠিত অঙ্ক (৭৩ কি ৭৪) সম্বন্ধে প্রিন্সেপ সাহেবের নিজেরই বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল বলিয়া সত্যবাদী প্রিন্সেপ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (২) ডাক্তর মিত্র প্রিন্সেপ সাহেবের লিখিত অব্দকে লক্ষ্মণাব্দ নির্ণয়ের বিবরণ প্রসঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যে বিশেষ বিবেচনার সহিত প্রিন্সেপের পঠিত অব্দ মূলের প্রতিলিপির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার লিখা দৃষ্টে এমত বোধ হয় না। (৩) লাক্ষ্মণেয়ের কোন জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, এমন কোন প্রমাণ কুত্রাপি পাওয়া যায় না। তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর লাক্ষ্মণেয় ভূমিষ্ঠ হন এবং তাঁহার জন্মের অনতিবিলম্বে গর্ভ-যন্ত্রণায় মাতার মৃত্যু ঘটে বলিয়া তাঁহার নাম অশোক (পিতা মাতার বিয়োগজ-শোক-রহিত) রাখা হয় বলিয়া ডাক্তর মিত্র অনুমান করেন। (৪) প্রস্তরলিপিতে অশোকচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দশরথের নাম উল্লিখিত রহিয়াছে। (৫) দুই জন লক্ষ্মণ সেন সেনবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ডাক্তর বুকানন পূর্ণিয়ার বিবরণে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মন্ত্রী ও ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নামক স্বরচিত স্মৃতি গ্রন্থে এবং সভাসদ ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা শ্রীধর দাস সংগৃহীত ও প্রণীত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' পুস্তকে ইহাকে অশোকচন্দ্র না বলিয়া লক্ষ্মণ নামেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৬) মিনহাজ উদ্দিন বাঙ্গলা বিজয়ের ৫০।৬০ বৎসরের পরে ১২৬০ খ্রীঃ স্বরচিত ইতিহাসে শেষ হিন্দু রাজার নাম লছমনিয়া ভিন্ন অশোক লিখেন নাই।

বৌদ্ধ গয়ার প্রস্তরলিপি দৃষ্টে বোধ হয় যে, দশরথ নামে অশোকচন্দ্র দেবের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। রাজা অশোকচন্দ্রের শাসন-প্রভাব বিহার প্রদেশের পূর্ব্ব

দক্ষিণ ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত না থাকিলে, তাঁহার নামাঙ্কিত প্রস্তরলিপি বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধমন্দিরের দ্বারদেশে সন্নিবিষ্ট থাকার অন্য কারণ দেখা যায় না। হয়ত অশোকের ভ্রাতা দশরথ বৌদ্ধগয়া পর্য্যন্ত বিহার প্রদেশ বঙ্গেশ্বরের শাসনাধীনে আনয়ন করিয়া বৌদ্ধ পালরাজগণের ক্ষমতা রাজধানী বিহারের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। কেবল অনুমান ভিন্ন এই সম্বন্ধে অন্য কোনও দৃঢ়তর প্রমাণ নাই, অথবা দশরথের কোষাধ্যক্ষ সহস্রপাদ ভট্টাচার্য্য তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে বৌদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার আগমন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই লিপি খোদিত করাইয়া মন্দিরের দ্বারদেশ সংলগ্ন করিয়া থাকিবেন।

অশোকচন্দ্র দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন পৈতৃকপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালাদেশ দীর্ঘকাল শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার সময়েই বোধ হয় বাঙ্গালার রাজধানী বিক্রমপুর (রামপাল) হইতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী নবদ্বীপে সংস্থাপিত হয়। অথবা হয়ত প্রৌঢ় বয়সে লক্ষ্মণ সেন পৈতৃক প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে গঙ্গাতীরে বাস করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে গমনপূর্ব্বক তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বতন কোনও গ্রন্থে বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সেনরাজগণের শাসন পত্রাদিতে নবদ্বীপের উল্লেখ দেখা যায় না। রাজকৃষ্ণ বাবুর সুপ্রচলিত বাঙ্গালার ইতিহাসে সুবর্ণগ্রাম, গৌড় ও নবদ্বীপ এই তিন স্থানেই বল্লাল সেনের সময় হইতেই সেনরাজগণের সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপিত হয় বলিয়া লিখিত রহিয়াছে। রমেশ বাবু বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে স্বরচিত সুপ্রসিদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে পদে পদে রাজকৃষ্ণ বাবুর অনুসরণ করিয়াছেন। বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের মতে সেন রাজগণের সময়ে গৌড় ও বিক্রমপুর উভয় স্থলেই বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপিত হয়। লেথব্রিজসাহেবের মতে রামপন্থ (রামপাল ?) ও লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) এই উভয় স্থলেই বল্লাল সেন আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে পাঠকগণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতব্দী হইতে রাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের কিয়দংশ পর্য্যন্ত (আদিশূরের সময়ের শত বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত) সমতট (রামপাল) বা বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের সময় হইতে রামপাল সমগ্র বঙ্গ দেশের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) ও নবদ্বীপের সেই সময়ে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কল্পিত হইয়াছিল কি না, সন্দেহ স্থল। মিথিলা বিজয়ের পর মহারাজ লক্ষ্মণ সেন লক্ষ্মণাবতী নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আপনার এক পুত্রকে (ডাক্তার বুকাননের মতে সুষেণ) তথায় স্থাপিত করিয়া তাঁহার প্রতি পশ্চিম বঙ্গ ও মিথিলা (উত্তর বিহার) শাসনের ভার সমর্পণ করেন। লক্ষ্মণ সেনের দুইখানি শাসনপত্রেই রাজ্যের নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও রাজধানীর নাম বিক্রমপুর (রামপাল) বলিয়া লিখিত রহিয়াছে। বল্লাল সেনের

সময়ে সম্ভবতঃ রাজধানী রামপাল (সমতট) বিক্রমপুর নামে পরিচিত হইতে থাকে। লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেনের শাসন পত্র হইতেও সেনরাজগণের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (বাঙ্গালা) রাজ্যের রাজধানী বিক্রমপুরেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই তিন শাসনপত্রের কুত্রাপি গৌড়, নবদ্বীপ কি সুবর্ণগ্রাম, গৌড়েশ্বর সেনরাজগণের বাঙ্গালার রাজধানী বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। এতদ্বারা পূর্ব্বোক্ত মাননীয় ইতিহাস-লেখকদিগের বাঙ্গালার রাজধানী সম্পর্কে উক্তি নিঃসন্দিগ্ধরূপে ভ্রান্ত, অমূলক ও কাল্পনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে এবং রাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণই যে সর্ব্বপ্রথম নবদ্বীপে সমগ্র বঙ্গদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক নবদ্বীপ অধিকারের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন তথায় অবস্থিতি করেন। তিনিই সমগ্র বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন হিন্দু নরপতি। তাঁহারই সময়ে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ মুসলমানদিগের হস্তগত হইলে, তিনি সপরিবারে পৈতৃক প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুরে পলায়ন পূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

কথিত আছে যে, দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর ভূমিষ্ট হন এবং জন্মের অনতিবিলম্বেই নিদারুণ প্রসব-যাতনায় মাতৃবিয়োগ সংঘটিত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণেই সিংহাসনে তাহাকে উপবিষ্ট করান হয়। তিনি দীর্ঘকাল সমগ্র বাঙ্গালার শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়া মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক নবদ্বীপ হইতে দূরীভূত হন। মুসলমান ইতিহাসলেখক মিনহাজউদ্দিনের মতে এই শেষ হিন্দুরাজা লছমনিয়া (দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন) শৈশবাবস্থা ৮০ বৎসরকাল দয়া, বদান্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত বাঙ্গালা শাসন করিয়া মুসলমান সেনাপতির দ্বারা পরাজিত ও দূরীভূত হন। মিনহাজউদ্দিনের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু ও তাঁহার অনুবর্ত্তী রমেশবাবু এবং লেথব্রিজ সাহেব ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২০৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের (লাক্ষ্মণেয়ের) রাজত্বকাল অবধারণ করিয়াছেন। সেনরাজগণ সম্পর্কে তাঁহারা প্রতি কথায় যে ডাক্তার মিত্রের মত নিরাপত্তিতে অনুসরণ করিয়াছেন, সেই বিখ্যাত পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতবর মাত্র ৬৩ বৎসর (১১৪২—১২০৫ খ্রীঃ) কাল লাক্ষ্মণেয় বা অশোকচন্দ্রের রাজত্ব সময় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কৈলাসবাবুর মতে বঙ্গেশ্বর অশোকচন্দ্র দেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১১৬০ হইতে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৫ বৎসরকাল দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন সমগ্র বঙ্গদেশের একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধগয়ার স্বপঠিত লক্ষ্মণাব্দকে অশোকচন্দ্রের রাজত্বের শেষ বৎসর অনুমান করিয়া ৫৩ লক্ষ্মণাব্দের (১১৫৯) পর বৎসর দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসন আরোহণের কাল বলিয়া তিনি অবধারণ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের পিতা বলিয়া অশোকচন্দ্র দেবকে নির্দ্দেশ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার লিখনভঙ্গী দৃষ্টে লক্ষ্মণকে অশোকের পুত্র বলিয়াই বোধ হয়। এই কথা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিলে, কিছু ক্ষতি ছিল না। যাহা হউক, আমরা দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনকে অশোকের পুত্র বলিয়া অনুমান করি। ইহা নিতান্ত অসম্ভব ও অযৌক্তিক

অনুমান নহে। এই লক্ষ্মণ সেনের হলায়ুধ নামে জনৈক ব্রাহ্মণজাতীয় সভাসদ ও কর্ম্মচারী ছিলেন। এই হলায়ুধ একজন অতি বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার। তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'বঙ্গে সংস্কৃতচর্চ্চা' প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। কোলব্রুক সাহেবের মত অনুসারে ডাক্তার মিত্র হলায়ুধকে প্রথম লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণবাবু ডাক্তার মিত্রের মত নিবাপত্তিতে গ্রহণ করিয়া স্বরচিত বাঙ্গালার ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রথম লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ জয়দেবাদি পঞ্চ কবিরত্নের মধ্যে হলায়ুধের নামোল্লেখ না থাকাতে, আমরা কৈলাসবাবুর মতই সম্ভবপর ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। ডাক্তার মিত্র হলায়ুধকে শাণ্ডিল্য-গোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশধর লিখিয়াছেন, কৈলাসবাবু তাঁহাকে বাৎস্যগোত্রজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হলায়ুধ স্বরচিত "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" গ্রন্থের আরম্ভে আপনার পরিচয় প্রদান স্থলে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা বাৎস্য-গোত্রজ ধনঞ্জয় গোমেদ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার পত্নী উজ্জ্বলা দেবীর গর্ভে ঈশান, হলায়ুধ ও পশুপতি নামে ধনঞ্জয়ের তিন পুত্র জন্মে। ঈশান ব্রাহ্মণের প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় কার্য্য সম্বন্ধে 'আহ্নিক পদ্ধতি,' পশুপতি শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য সম্পর্কে 'পশুপতিপদ্ধতি,' যজুর্ব্বেদীয় দশকর্ম্মদীপিকা এবং হলায়ুধ 'সর্ব্বস্ব' নামে কতকগুলি স্মৃতিগ্রন্থ ও রত্নমালা নামে একখানি শব্দকোষ (অভিধান) রচনা করেন। রাজা লক্ষ্মণসেন দেব কর্তৃক তিনি বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনে মন্ত্রী ও প্রৌঢ় বয়সে ধর্ম্মাধিকারীর পদে বৃত হইয়াছিলেন *। হলায়ুধের এই নির্দ্দেশ রাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের অন্যতর উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

মিনহাজের লিখিত ইতিহাস অবলম্বন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ষ্টুয়ার্ট সাহেব বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজা লছমনিয়া (দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন) সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ স্বরচিত বাঙ্গালার ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ১২৫৯-৬০ খ্রীঃ (৬৫৮ হিজরী) আবুওমর মিনহাজ স্থানীয় প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়া ও ৬৪১ হিজরী সনে কিয়ৎকাল লক্ষ্ণৌতী নগরে অবস্থান করিয়া শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের বিবরণ সংগৃহীত করেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখক বাঙ্গালা বিজয়ের অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক (৫৮ বৎসর) পরে যে ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, জাতীয় পক্ষপাতে অন্ধ হইয়া, সত্যকে অতিরঞ্জিত করিয়া, সেই ঘটনা বর্ণনা করা, তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। তজ্জন্য মিনহাজের উক্তিকে একবারে অলীক বলিয়া বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য বিবেচনা করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ তিনি বর্ণিত ঘটনার প্রায় সমসাময়িক হইতেছেন। মিনহাজের পূর্ব্বে আর কোনও মুসলমান ইতিহাস-লেখক বঙ্গদেশের সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। যে সময়ে লাক্ষ্মণেয় সেনের পিতৃবিয়োগ হয়, সেই সময়ে তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। পতির মৃত্যুর পর

* বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ, শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
ছত্রোৎসিক্ত-মহামহত্ত্বামুপদং দত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যং অখিলক্ষ্মাপালপরায়ণঃ,
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব নৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ ॥
(ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বঃ ১।১২)।

অন্তঃস্বত্বা রাজমহিষী রাজসিংহাসনে উপ'বেশন করিয়া রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের অনুরোধ রক্ষা দ্বারা তাহাদের সন্তোষবিধান করেন। ভাবী রাজকুমারের অভিষেক সূচনার্থ তাঁহার উদরের উপরি রাজমুকুট সংস্থাপিত হয়। পতিহীনা মহিষীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, বিচক্ষণ লগ্নাচার্য্য ও সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজবাটীতে আহুত হইয়া শুভলগ্নের গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। জ্যোতির্ব্বিৎগণ গণনা করিয়া রাজ্ঞীকে জানাইলেন যে, বর্ত্তমান অশুভক্ষণে রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইলে নিতান্ত দুর্ভাগ্যবান হইয়া রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং ইহার দুই ঘণ্টা পরে ভূমিষ্ঠ হইলে অশীতিবর্ষকাল রাজদণ্ড ধারণ করিবেন। শুভ লগ্নের উপস্থিতি পর্য্যন্ত প্রসব বেদনা সহ্য করিতে সঙ্কল্প করিয়া, রাজমহিষী অনুচরগণের প্রতি আদেশ দিলেন যে, জ্যোতির্ব্বেত্তাগণের নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত যেন তাঁহাকে অধোমুখী করিয়া ঊর্দ্ধদিকে তাঁহার পদদ্বয় বন্ধন করিয়া রাখা হয়। অবিলম্বে পুত্রবৎসলা মাতার অতি নিষ্ঠুর আদেশ প্রতিপালিত হইল। শুভলগ্নের আরম্ভেই রাজমাতার বন্ধন উন্মোচিত হইল। রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনতিবিলম্বেই রাজমাতার জীবলীলা সমাপ্ত হইল। অমাত্যগণ এই গভীর শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে রাজকুমারকে পৈতৃক সিংহাসনে স্থাপিত ও পিতৃপদে অভিষিক্ত করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। রাজকুমার এইরূপে নবদ্বীপের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ৮০ বৎসর কাল বঙ্গদেশ শাসন করিতে থাকেন।

১২০১ খ্রীঃ (৫৯৯ হিজরী সনে) মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক দক্ষিণ বিহার প্রদেশ অধিকৃত হয় এবং বাঙ্গলার পশ্চিম সীমান্তভাগে মুসলমান অশ্বারোহী সেনার আক্রমণ ও অত্যাচার তাহার অনতিবিলম্বেই আরম্ভ হয়। রাজধানীর অনেক জ্ঞানী, গুণী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাজার অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সংবাদ রাজা লছমনিয়াকে জ্ঞাপন করিলেন, এবং ধন জনাদির সহিত প্রজাবর্গের হিত কামনায় সপরিবারে রাজধানী নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী ও নিরাপদ পূর্ব্বাঞ্চলে যাইতে পরামর্শ দিলেন। মুসলমানদিগের আক্রমণ ভয়ে তাঁহারা এতদূর ভীত হইয়াছিলেন যে, জরাগ্রস্ত ভয়াতুর রাজাকে আতঙ্কিত করিবার নিমিত্ত তুরকীগণ কর্ত্তৃক এই সময়ে বাঙ্গালা অধিকারের বিবরণ ও বিহার বিজেতা দীর্ঘকায় বীরবর বক্তিয়ার খিলজীর কুৎসিত রূপ পর্য্যন্ত হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বর্ণিত আছে বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দ্বারা প্রকাশ করিলেন। অবিলম্বে ছদ্মবেশে মুসলমান সেনাপতিকে দর্শন করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত রাজাদেশে বিহারে দূত প্রেরিত হইল। দূত প্রত্যাগত হইয়া রাজার সমীপে বক্তিয়ার খিলজীর যে রূপ বর্ণনা করেন, তাহার সহিত কল্পিত শাস্ত্রে উল্লিখিত বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইল। কিছুতেই অদৃষ্টবাদী রাজা শত্রুগণের আগমনের পূর্ব্বে নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি মুসলমানদিগের গতিরোধের কি আক্রমণ নিবারণের কোনও চেষ্টা করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। রাজার মন্ত্রী ও কর্ম্ম-

চারী অন্যান্য যাবতীয় নগরবাসী বিহার-বিজেতা মুসলমানদিগের নাম মাত্র শুনিয়া এতই মন্ত্রমুগ্ধ ও ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, এই ভাবী অনিষ্টপাতের প্রতিবিধানার্থ রাজাকে যথোচিত সাহায্য কি উপদেশ প্রদান করিতে তাহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রাজভক্তি তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে অবিলম্বে অন্তর্হিত হইল। ভয় ও মোহ তাহার স্থান অধিকার করিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাকে দূরীভূত করিল। নগরের অধিকাংশ অধিবাসী নবদ্বীপ হইতে উর্দ্ধশ্বাসে দূরবর্ত্তী পূর্ব্ববঙ্গ, কামরূপ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়া চিরকালের জন্য পরিত্রাণ লাভ করিল। রাজা অন্তঃপুরে সপরিবারে সশঙ্কিত অবস্থায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুচর ও কতিপয় দ্বাররক্ষক ভিন্ন রাজবাটীতে কি নগরে কোন সৈন্যাদি রহিল না। লোকাকীর্ণ রাজধানী ক্রমে ক্রমে জন মানববিহীন হইয়া জীবন্ত শ্মশানে পরিণত হইতে লাগিল। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থান নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইল।

সুপণ্ডিত মিল ও মেকলে ভিন্ন কোনও ইতিহাস-লেখক বিজাতীয় হিন্দু রাজা ও বিধর্ম্মী হিন্দু প্রজাগণের ইহা অপেক্ষা অসত্য ও অদ্ভুত বর্ণনা দ্বারা অতীতসাক্ষী পবিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠা চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করিয়া আপনার পক্ষপাতান্ধ ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন কি না, জানি না। লক্ষ্মণসেনকে একান্ত কাপুরুষ ও হিন্দুদিগকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পশু বলিয়া বর্ণনা করিয়া বিজেতা মুসলমানদিগের মাহাত্ম্য প্রচার যদি পূর্ব্বোক্ত অতিরঞ্জিত চিত্রের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে এবং মিনহাজ এতদ্দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ইংরাজ রাজত্বের কলঙ্ক। *

"তোমরা বৃটিশ জাতি, পবিত্র উৎসাহে মাতি
ধরার দাসত্ব প্রথা করিলে বারণ,
তোমাদেরি ছায়াতলে, তোমাদেরি করতলে,
ভারত দাসত্বে আজ হ'ল নিমগন!"

শুভক্ষণে ভারতে ইংরাজাধিকার বিস্তৃত হইয়াছে, শুভক্ষণে অত্যাচার-প্লাবিত দেশে সাম্যের বিজয় ভেরী বাজিয়াছে। যাঁহারা দুই দশ দিনের জন্যও ভারতের কোন স্বাধীন দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা অম্লানচিত্তে স্বীকার করিবেন যে, দেশীয় শাসনাধীনে যে সকল রাজ্য আছে, তাহা সদা অত্যাচার-পীড়িত, সদা ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছা-বিতাড়িত; সে সকল স্থানে স্বাধীন ভাবে দুটা কথা বলিবার যো নাই, সে সকল স্থানে রূপযৌবন, ধন, জন, বিদ্যা—কিছুই নিরাপদ নহে। সে সকল স্থানে স্ত্রীলোকের

---

* আমরা এই প্রবন্ধটী "প্রকৃতি"তে দিয়াছিলাম, তাহাতে রূপান্তরিত আকারে ছাপা হইয়াছিল বলিয়া আবার বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ করিলাম।

সতীত্ব, পুরুষের বীর্য্য বা প্রতিভা—ব্যক্তি-বিশেষের অনুগ্রহ-প্রতিপালিত। বৈষম্যের লীলা, স্বেচ্ছার কেলী, পরাধীনতার ক্রীড়া দেখিতে চাও, গবর্ণমেণ্টের রাজ্য ছাড়িয়া ক্ষণকাল দেশীয় স্বাধীন বা করদ রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া এস। ভাল মন্দ বিচার ক্ষমতা যত দিন মানুষের আছে, তত দিন এ কথা অম্লান চিত্তে বলিবই বলিব, অত্যাচার-অন্ধকার-প্লাবিত ভারত, ইংরাজ-সূর্য্যোদয়ে আলোকিত, পুলকিত, নবীভূত, জীবন-প্রাপ্ত।

চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, পদ্মের মৃণালেও কণ্টক আছে। এমন যে ইংরাজ-রাজত্ব, এক মুখে যাহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না, ইহারও কলঙ্ক আছে। থিয়োডোর পার্কার নবোত্থিত আমেরিকার দাস প্রথা উন্মোচনে যত্নবান, আমেরিকার চতুর্দ্দিকে তাঁহার শত্রু। ইংরাজ দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইলে পৃথিবীর এক বিভাগ এখনও অত্যাচারের কুক্ষিগত থাকিত। ম্যাট্‌সিনি অষ্ট্রিয়ার তাড়নায় যখন নির্ব্বাসিত, ইংলণ্ড তখন কোল পাতিয়া মানব-দেব-শিশুকে গ্রহণ করিলেন। ম্যাট্‌সিনি সে কথা জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। গ্যারিবল্ডি ক্লান্ত কলেবরে, অবসন্নশরীরে, যুদ্ধাহত হইয়া যখন মৃত্যু শয্যায় শয়ান, ইংলণ্ড তখন স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন; ইংলণ্ড তখন স্বাধীন বীরের শয্যার পার্শ্বে শুশ্রূষার কোমল হস্ত লইয়া দণ্ডায়মান। এমন স্বাধীনতার বন্ধু, পরাধীনতা ও বৈষম্যের মহা শত্রু, প্রতিভার চিরসহায় এ পৃথিবীতে ইংলণ্ডের মত আর কে? আমাদের গৌরব যে আমরা এমন রাজার অধীন হইয়াছি। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা এমন পরদুঃখকাতর রাজার স্নেহ-ছায়ায় প্রতিপালিত হইতেছি। ধন বল, জন বল, সকলই নিরাপদ। এই দস্যুর দেশে এখন দিন দিন স্ত্রীজাতির সম্মান বৃদ্ধি পাইতেছে, লুণ্ঠন, অপহরণ তিরোহিত হইতেছে, মানুষ এখন রাত্রে সুখে শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছে। সত্যযুগের কথা জানি না, সুতরাং ঠিক বলিতে পারি না :—এমন সুখ শান্তি ভারতের ভাগ্যে বুঝি বা আর কখনও ঘটে নাই। কিন্তু এমন যে রাজত্ব, ইহারও কলঙ্ক আছে। সে কলঙ্ক কি, সংক্ষেপে লিখিতেছি।

গতপূর্ব্ব অধিবেশনের সময়, গবর্ণমেণ্ট, জাতীয় সভাসমিতির একটু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, সকলেই জ্ঞাত আছেন। কলিকাতায় এমন যে ধুমধাম পূর্ণ আয়োজন হইতেছিল, নিমেষের মধ্যে, গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত মাত্র, সে সকল যেন কেমন মলিন, উৎসাহহীন হইয়া উঠিল! অনেক বড় বড় লোক সমিতির কাজে যোগ দিলেন না, বহু প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত হইলেন না, অনেক রাজা রায়বাহাদুর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"আমরা জাতীয় সমিতিতে নই!" এটী একটী সামান্য ঘটনা, কিন্তু এ ঘটনায় বুঝিলাম, ইংরাজ ভারতকে মায়াবলে ঘোর অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছেন, বুদ্ধি বা প্রতিভা, তেজ বা সাহস—সব এখন ইংরাজ-কর-কবলে; বুঝিলাম, যাহাকে জাতীয়তা বলে, ভারতে তাহা ত বহু দূরে, স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভরও এদেশে নাই। আমি ন্যায় ও ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বুঝি, তাহাও করিতে পারিব না, তাহার জন্যও অন্যের দিকে তাকাইব?

ইহা যদি হইল, তবে আর মনুষ্যের রহিল কি? জাতীয় মহাসমিতি ইটালীর ক্যাভাগনারির ন্যায় গুপ্ত সম্প্রদায় নহে যে, ইহাতে যোগ দিলে দোষ বা পাপ হয়। নানা উপায়ে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই পতিত জাতির উদ্ধার করা গবর্ণমেণ্টের কাজ, জাতীয় মহাসমিতিরও কাজ। সুতরাং কেহ কাহারও বিরোধী নহে। জাতীয় মহাসমিতির ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা যে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী সভা নহে, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। "তবে কেন ইহাতে যোগ দিব না? গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধ হইলেন, তাতে আমার কি?"—স্বভাবতঃ স্বাবলম্বী জীবের এইরূপ ভাবই হওয়া উচিত। কিন্তু দেখিয়া দুঃখে অবসন্ন হইলাম যে, আমাদের দেশে সেরূপ জীব বড়ই দুর্লভ। ভারত পর হাতে সমর্পিত, পর পদে বিক্রীত। জাতি, মান, কুল, কর্ত্তব্য, আচার প্রণালী, ধর্ম্ম—সবই যেন এখন ইংলণ্ডের হস্তে! দেখিলাম, এবং ভাবিলাম, ভাবিয়া বুঝিলাম, ইংলণ্ড ভারতের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বাবলম্বনের ভাবকে, আত্মনির্ভরের শক্তিকে, অতি সুকৌশলে, চিরকালের জন্য বিনষ্ট করিয়াছেন। ইহাই ইংরাজ রাজত্বের কলঙ্ক।

গৃহস্থের ঘরে একটী পাখী। পাখীকে গৃহস্থ এমন ভাল ভাল জিনিস খাওয়ায়, পাখী আরণ্য জীবনে যাহা চক্ষেও দেখিত না। পাখী খায়, নাচে, আর আনন্দে গায়। পূর্ব্বে একবার একবার গৃহস্থের মায়া-শৃঙ্খল কাটিয়া উড়িতে চাহিত, তখন গৃহস্থ মনে করিত, এত ভালবাসি, তবুও পলাইতে সাধ? থাক্ দেখি, কি হয়! ক্রমে ক্রমে বহুদিন পর ভালবাসায় মজাইয়া পাখীকে গৃহস্থ এমন করিয়া ভুলাইল যে, আর ছাড়িলেও পাখী উড়িয়া পালায় না। যদি একটু যায়, আবার পরক্ষণেই ফিরিয়া আইসে। তখন পাখীকে গৃহস্থ তিরস্কার করে, আর বলে, "কেমন, আর কখনও বনে যাইতে সাধ করিবি?"

পাখীর সুখ আর আমাদের সুখ, দুই-ই তুল্য। পিঞ্জরে বসিয়া একটু নাচিলে বা একটু গাইলেই অমনি সুমিষ্ট আহার উপস্থিত। আফিসে ৩০ দিন আসা যাওয়া করিয়া, একটু কলম চালাইয়া, একটু তোষামোদ করিলেই মাসান্তে টাকা হাজির! সহজে, সুলভে আহার হাজির! কেমন সুকৌশলে ইংরাজ আমাদিগকে বশ করিয়াছেন!

সাহিত্য-বাজার, স্বাধীনতার লীলাস্থল; কিন্তু এ স্থলও এখন ব্যবসাদারী ও তোষামোদ নামক অধীনতার হস্তে বিক্রীত। ভাবোন্মত্ত লেখক লিখিবে,—জগৎ-নিরপেক্ষ হইয়া, আদর অনাদর-নিরপেক্ষ হইয়া, লেখক জগতের অতীত স্থানে বসিয়া মঙ্গল-তান ধরিবে, তাহা না হইয়া এখন লোকের প্রশংসা, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-প্রত্যাশী হইয়া লেখকগণ কলম ধরিতেছেন! টেক্সট্ বুক কমিটী নামক একটা তোষামোদে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট দস্যুকে এই স্বাধীনতার বাজারে ছাড়িয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে সকলকে অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিতেছেন, এবং বহু অর্থ প্রকারান্তরে পুরস্কার দিতেছেন। ছাই ভস্মের বিনিময়ে নিরক্ষর ব্যক্তিরাও বহু টাকা পাইতেছে দেখিয়া ক্রমে বড় বড় স্বাধীন লেখকগণও অধীনতায় বিনীত হইয়া, লেখনীকে সংযত করিয়া, অর্থ প্রত্যাশারূপ নরককে বুকে পুষিতেছেন।

চাকুরী করিতে করিতে, অর্থ প্রত্যাশা।

ধরিতে ধরিতে, আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদে, কথাবার্ত্তায় ভারতবাসী এখন স্বাবলম্বনহীন, আত্মনির্ভরহীন। ধর্ম্ম বড়, না চাকুরী বড়? জাতীয়ত্ব বড় না টাকা বড়? সাহিত্য বড় বা অর্থ বড়? অনেকেই বলিবেন, চাকুরি বড়, টাকা বড়। সাহিত্য বা ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া, জাতীয়ত্বের খাতিরে কে আজকাল চাকুরি বা টাকার মমতা পরিত্যাগ করিতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয় ইয়ংসাহেবের মতে অম্লানচিত্তে সায় দিতে না পারিয়া, আত্মসম্মানের খাতিরে, গবর্ণমেণ্টের বহু বেতনের চাকুরি ইস্তফা দিয়া মনুষ্যত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। এদেশে কিন্তু বিদ্যাসাগরের ন্যায় তেজিয়ান, স্বাবলম্বী বীর আর বড় বেশী নাই। চতুর্দ্দিকে একই মধুর রব, চাকুরী, চাকুরী, টাকা টাকা টাকা! যে এমে পাশ করিয়াছে, সেও ইহারই জন্য লালায়িত, যার ঘরে অর্থ রাশিকৃত, স্তুপাকৃত, সেও, কি জন্য কে জানে, গবর্ণমেণ্টের পদানত! মনুষ্যেরঅভাব বৃদ্ধিকে অর্থ-লালসার কারণ বলিয়া ধরিলে, তাহারও মূল ইংরাজ-রাজত্ব। কেবল টাকা, কেবল অভাব! দেখিতেছি, ইংলণ্ডের শিক্ষায়, জাতি, ধর্ম্ম, কুল মান ভুলিয়া মানুষ কেবল অর্থের দিকে ছুটিয়াছে। সাম্যের অর্থ এখন—কেবল অর্থোপার্জ্জন, কেবল চাকুরী। ভেদাভেদ নাই, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক কর্ম্মে নিয়োজিত! ইহাতে জাতিভেদ উঠিতেছে বলিয়া আমরা অবশ্য আনন্দিত, কিন্তু এই সাম্যে (?) মনুষ্যত্ব, স্বাবলম্বন, আত্ম-সম্মান তিরোহিত হইতেছে দেখিয়া আর চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। চাকুরী ছাড়িয়া কে তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিবে, কে পরোপকার ব্রত ধরিবে, কে দেশের সেবা করিবে? দারিদ্র্যের ঘোর নিপীড়নে ক্লিষ্ট হইয়া কে তোমার সাহিত্যকে উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত করিবে? শিল্প ও কৃষির উন্নতি রুদ্ধ হইল, স্বাধীন বাণিজ্য লোপ পাইল, সুকুমার সাহিত্য টেক্সটবুক-কমিটীর এক-টানা সুরে সাধা হইল—এখন চতুর্দ্দিকে কেবল আচার-ভ্রষ্ট, পর-পদানত, অর্থ-প্রত্যাশীর দল পরিশোভিত! এমন দিগন্তব্যাপী দাসত্ব-প্রথা যে দেশের রাজা হাতে ধরিয়া শিক্ষা দিতেছেন, সে রাজাকে, পাখীর উপকারী বন্ধু গৃহস্তের সহিত তুলনা করিতে ভয় কি? ইংলণ্ড পৃথিবীর যে উপকার করিয়াছেন, এমন আর কোন জাতি করে নাই, মুক্তকণ্ঠে আজীবন একথা স্বীকার করিব। ইংলণ্ড ভারতেরও অশেষ গৌরবের শিক্ষার স্থল, সন্দেহ নাই, কিন্তু দাসত্ব-প্রথায় ভারতের অস্থি মজ্জা আজ গ্রাসিত। উঠিতে চাহিলে উঠার সাধ্য নাই, যাইতে চাহিলে যাওয়ার সাধ্য নাই। ইহারও মূল ইংরাজ-রাজত্ব। মাসান্তে বা বৎসরান্তে যে টাকা আসিবে, তাহার মায়ায় ভুলাইয়া, এই প্রতিভান্বিত, আর্য্যবংশধর জাতিকে চিরদাসত্ব-কলঙ্কে নিমজ্জিত করা গবর্ণমেণ্টের কতদূর সঙ্গত হইতেছে, ধীরভাবে একবার চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা জানি, ইংলণ্ড মনে করিলে, ছোট ছেলেকে পিতামাতা যেরূপ মানুষ করেন, দশ বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের শিশু জাতিকে, প্রতিভায়, স্বাধীন বাণিজ্যে, শিল্পে, কৃষিতে ও ভাষাতে শিক্ষিত বা দীক্ষিত করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য মহিমান্বিত জাতির সমকক্ষ করিতে পারেন। ইংরাজি শিক্ষার আলোকে কুসংস্কারের অন্ধকার হইতে উত্তোলন

করিয়া এই জাতিকে চিরদাসত্বে নিমজ্জিত করা বিধেয় নহে। হাত—ইংলণ্ডের। শিশু ভারতবর্ষকে যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ গড়িতে পারেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের একান্ত পক্ষপাতী। ভারতের মঙ্গলের জন্য, বিধাতার ইচ্ছায় ভারতে ইংরাজের আগমন, বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি, এদেশে ইংরাজের একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের চরণে এই বিনীত অনুরোধ, এ জাতি যেন দাসত্ব-গঠিত ক্রীড়া-পুত্তলিকা বিশেষ না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি করুন। গড়িয়া পিটিয়া ইংলণ্ড আমাদিগকে কর্ত্তব্যপরায়ণতা, আত্ম-নির্ভর, স্বাবলম্বন শিক্ষা দিয়া স্বদেশের মুখ উজ্জল করুন; এবং পৃথিবীকে যশোরাশিতে পূর্ণ করুন। নচেৎ এখন যেমন দাসত্বের লীলা বিস্তৃত হইতে দেখিতেছি, ইহাকে ইংলণ্ডের কলঙ্ক বলিয়া অভিহিত করিবই করিব। ভারতবাসীকে দাসত্বে না ডুবাইয়া ইংলণ্ড প্রকৃত মনুষ্যত্বে উত্থিত করুন, ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

প্রেমানন্দের কবিতাবলী।

পোড়া পাপিয়া! (৮)

অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে
　কে রে কাঁদে এমনি করে?
এ কান্না যে শুনতে নারি,
　প্রাণ যে আমার কেমন করে!
কেরে তুমি, কোন্‌দেশে ঘর,
　বল্‌ছো ভাষা কেমন কেমন?
মধুরস্বরে আকাশ ভরা,
　মানবের স্বর নয়তো এমন।
স্বর্গবাসী কেউ কি তুমি,
　হারায়েছ শান্তি ধাম,
আকাশ-পথে তাই নিশীথে
　কেঁদে বেড়াও অবিরাম?
কি ধন হারায়েছ তুমি,
　কেন এত প্রাণে ব্যথা?
লুকাইয়া কেন কাঁদ,
　কও না খুলে মনের কথা?
"চোক গেল!" হায় একি কথা,
　চোকে তোমার হয়েছে কি?
এস আমার কাছে এস,
　চক্ষু চেয়ে দেখাও দেখি।

বুঝেছি রে ও পাপিয়া,
　তুই সে পাখী পোড়ার মুখ;
শোকের ভরে কেঁদে কেঁদে,
　ভেঙেচুরে গেছে বুক!
হতভাগা পাখী ওরে
　কেন ভালবেসেছিলি?
সরলপ্রাণে গরল নিতে
　কেন ধরায় এসেছিলি!
কেঁদে কেঁদে চক্ষু গেল,
　তবু ঝরে আঁখি জল।
যা হবার তা হয়ে গেছে,
　কেঁদে কি আর হবে বল?
না না ওরে অবোধ পাখী,
　মনের সাধে কাঁদ তুমি;
নিরাশ প্রেমের কি যে জ্বালা,
　তুই জানিস আর জানি আমি!
সেই যে ভালবাসি যারে,
　সেতো আমার হ'ল নারে;
কেঁদে কেঁদে চক্ষু গেছে,
　পড়ে আছি অন্ধকারে!
এখনো তোর চক্ষু আছে,
　"চোক্ গেল" তুই বলিস্ তাই;

কণ্ঠরুদ্ধ, অন্ধ আমি,
কাঁদিবারও শক্তি নাই!
প্রাণের আগুন প্রাণেই আছে,
ভস্ম কল্লে নীরবে;
পাপিয়ারে, মর্ম্মব্যথা
কেউ বুঝে না এ ভবে!
লোকের কাছে বল্লে পরে
করবে লোকে উপহাস;
প্রাণের আগুন প্রাণে নিয়ে
কর গিয়ে তুই বনবাস।
কিম্বা পাখি, উড়তে জানিস,
দূর গগনে উড়ে যা;
প্রেম-বিহীন এ ধরাতলে
লোকালয়ে আসিস্ না।
যা ইচ্ছা তাই বলে কাঁদিস্,
প্রাণ যখন তোর মান্‌বে না;
কেন কাঁদিস, সে কথা আর
ধরায় কেহ জান্‌বে না।
যে দেশেতে প্রেম আছে, আর
নাই রে এমন নিরাশা;
সেথায় গিয়ে কাঁদলে পরে
মিট্‌বে প্রাণের পিপাসা।
আসিস্‌নে আর এদেশে তুই,
ভাসিস্‌নে আর নয়ন জলে;
তোর এ কান্না শুন্‌লে আমার
প্রাণের আগুন দ্বিগুণ জলে!
নীরবেতে কাঁদবো আমি,
তুই গিয়ে কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে;
পাপ ধরাতে পড়ে আমি,
উড়ে যা তুই স্বর্গদ্বারে।
পাখিরে তুই আমার কাণে
এ কান্না আর তুলিস্ নে;
কিন্তু পাখি কাঁদবি যখন,
আমার কথা ভুলিস নে!

বিষাদে। (৯)

কেন আজি দশদিক
হেরি অন্ধকার ময়;
বিলুপ্ত জগতে যেন
সুখ শোভা সমুদয়?
সবুজ পাতার কোলে
হাসিছে কুসুমদল,
হেসে হেসে নীলাকাশে
তারা করে ঝলমল;
ভ্রমর গুঞ্জন কিবা
দূর বনে ঝিল্লিরব,
আমার নিকটে আজ
নিরেট কঠোর সব;
দক্ষিণ মলয়ানিল
শীতল করে না প্রাণ,
নীরস কোকিল আর
পাপিয়ার প্রেম-গান;
মালতী মল্লিকা আর
শিউলির হেরি ফুল,
আগেকার মত আজি
নাহি হয় প্রাণাকুল;
প্রণয়ীর প্রেম মাখা
নিটোল চোকের পানে,
চেয়ে আছে প্রণয়িনী
এক ভাবে এক প্রাণে;
নাচিছে শিশুর দল
করতালি দিয়া দিয়া,
এসব দেখিলে হতো
পুলকে পূর্ণিত হিয়া;
আজিকে আমার কেন
সেই সুখ হয় না,
আনন্দের সমীরণ
প্রাণে কেন বয় না?

বুঝেছি বুঝেছি এই—
গভীর দুঃখের হেতু,
ভাঙ্গিয়াছে জীবনের
আজিকে সুখের সেতু ;
সেই যে দেখেছি আমি
তোমার মলিন মুখ,
গভীর বিষাদ রাশি
ঢাকিয়া রেখেছে বুক ;
যা দেখি তাতেই সেই
বিষাদের ছায়া পড়ে,
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যত
ঢেকে ফেলে একেবারে !
তোমার প্রসন্ন মুখ
সঞ্জীবনী সুধাক্ষরে,
মৃতপ্রাণে দেয় প্রাণ
জগৎ সুন্দর করে ;
তাই বলি প্রেমময়ি
দেখাও প্রসন্ন মুখ,
নহিলে বিষাদ ভরে
ভেঙে গেল পোড়া বুক !
প্রেমানুপ্রাণিত হয়ে
তব মুখে চেয়ে থাকি,
প্রেমানন্দ সুধা পানে
দিবা নিশি মগ্ন থাকি।

বিচ্ছেদে। (১০)

একটী ঘণ্টাও হায়
যায় যায় যায় না,
একটী মিনিটো যেন
সহজে ফুরায় না ;
যুগ যুগান্তর সম
তোমা ছাড়া এক দিন,
আশায় জীবিত প্রাণ
বিচ্ছেদে হতেছে ক্ষীণ !

এত মাস এত দিন
কি করিয়া গত হবে,
শীত গ্রীষ্ম বরষার
ক্রমে অবসান হবে ;
গাছের ঝরিবে পাতা
আবার হবে নূতন,
ঢাকিবে গগন পুনঃ
চলে যাবে মেঘগণ ;
কোকিল পাপিয়া আর
বধূসখী গাবে গান,
ক্রমে ক্রমে এসে তারা
ক্রমে হবে অন্তর্ধান ;
ফুটিবে অনেক ফুল
আর তারা ফুটিবে না,
অনন্তকালেও হায়
এইকাল কাটিবে না ;
কেমনে বাঁচিব সদা
আই ঢাঁই করে প্রাণ !
প্রেমময়ি প্রেমাধীনে
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ।
হৃদয়ের পটে আছে
তোমার যে মুখখানি
নয়নেতে লেগে আছে
নয়নের যে চাহনি,
অমিয়া মাখান হাতে
দিয়েছ যে স্পর্শসুখ,
এখনো স্মরিতে যাহা
ফুলে ফুলে উঠে বুক,
সেই মুখ সে চাহনি
সে পরশ করি ধ্যান,
শুষ্ক তরু সম আছি,
হারাইয়া বাহ্যজ্ঞান ;
নাহি জানি শোকানলে
কখন্ বেড়বে প্রাণ !
প্রেমময়ি প্রেমাধীনে
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ।

শ্রীহর্ষের নৈষধ কাব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বরাগের অবস্থায় অন্যান্য কবিরা নায়িকাকে কেমনভাবে গঠন করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে, যথা ;—

ইতি প্রবিশ্যাভিহিতা দ্বিজন্মনা
মনোগতং সা ন শশাক বেদিতুং।
অথোবয়স্যাং পরিপার্শ্ববর্ত্তিনীং
বিবর্ত্তিতাঞ্জননেত্র মৈক্ষত ॥ ৫১ ॥
(কুমারসম্ভব, ৫ম সর্গ।)

আগন্তুক তপস্বীকর্ত্তৃক উক্ত হইয়া পার্ব্বতী (লজ্জায়] মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না, অনন্তর পার্শ্ববর্ত্তিনী বয়স্যাকে নেত্রভঙ্গী দ্বারা বলিতে আদেশ করিলেন। এখানে একজন বিশ্বস্ত বন্ধুবৎ তাপসের নিকট পর্য্যন্ত গৌরী নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিলেন না। মহাকবি কালিদাস গৌরীর বয়স্যামুখে শিবের প্রতি কামনা ব্যক্ত করিয়া যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা লিখিতে পারা যায় না, ইহাই ললনাকুলের নৈসর্গিক মাধুর্য্য। এখানেই কবির লিপি-নৈপুণ্য প্রকটিত হইয়াছে।

মহাভারতের নলোপাখ্যানে দময়ন্তীর পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে নলের আর যে বিবাহ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ নাই, কিন্তু নৈষধের কবি লিখিতেছেন ;—

অবারিত দ্বারতয়াতিরশ্চা
মন্তঃপুরে তস্য নিবিশ্যরাজ্ঞঃ।
গতেষু রম্যেষধিকং বিশেষ
মধ্যাপয়ামঃ পরমাণুমধ্যা ॥ ৪১ ॥
পীযূষধারা নধরাভিরন্ত
স্তাসাং রসোদন্বতি মজ্জয়ামঃ।
রম্ভাদি সৌভাগ্যরহঃ কথাভিঃ
কাব্যেন কাব্যং সৃজতাদৃতাভিঃ ॥ ৪২ ॥
(নৈষধ, ৩য় সর্গ।)

হে দময়ন্তি, তির্য্যগ্‌জাতির কুত্রাপি গমনে প্রতিবন্ধক নাই, সুতরাং আমরা (হংসেরা) নলরাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের রমণীয় গমন শিক্ষা দিয়া থাকি। আর আমরা কাব্যকার শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রশংসিত বাক্যে রম্ভাদি অপরাদিগের সৌভাগ্য আখ্যানদ্বারা সেই রমণীদিগের রস-সাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকি। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে, নলের অন্তঃপুর প্রমদা পূর্ণ ছিল। নলরাজ বিবাহ বা যে কোন উপায়ে সেই সকল রমণীরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কবির এরূপ বর্ণনাদ্বারা নায়কের উৎকর্ষের পরিবর্ত্তে নিকৃষ্টতাই সূচিত হইয়াছে। 'আঘ্রাত কুসুম অপেক্ষা অনাঘ্রাত কুসুমেরই সমধিক আদর দৃষ্ট হয়। অপরিণীত নবযৌবন-সম্পন্ন পুরুষের প্রতি কুমারীদের যাদৃশ অনুরাগ সম্ভব, আর বহুপত্নীক নির্ম্মাল্য পুষ্প সদৃশ প্রবীণবয়স্ক নায়কের উপর কি ততদূর সম্ভব হইতে পারে ?

অনেকের মত যে, নৈষধের পদ-লালিত্য অতি সুন্দর। অতএব উক্ত গুণবিশিষ্ট দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে।

অথ কলে কলয়শ্বসিতি স্ফুটং
চলতি পক্ষ্ম চলে পরিভাবয়।
অধর কম্পন মুন্নয় মেনকে
কিমপি জলাতি কল্পলতে শৃণু ॥ ১১৩ ॥
রচয় চারুমতি স্তনয়োর্বৃ্ত্তিং
কলয় কেশিনি কৈশ্যমসংযতং।
অবগৃহাণ তরঙ্গিণি নেত্রয়ো
র্জলঝরানিতি শুশ্রুবিরেগিরঃ ॥ ১১৪ ॥
(নৈষধ, ৪র্থ সর্গ।)

এরূপ প্রসাদ গুণবিশিষ্ট শ্লোকও

নৈষধে বড় অধিক নাই—অধিকাংশ শ্লোকই দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ। বিশেষ যে যে স্থলে শ্লেষালঙ্কার গ্রথিত বর্ণনা, সে সেস্থান সমধিক জটিল। নৈষধকারের সংস্কৃত কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ প্রভৃতির ন্যায় সুপরিপক্ক নহে—কিন্তু নৈষধ-কারের এই একটী গুণ যে তিনি অন্যের অনুকরণ তত করেন নাই, নিজ মস্তিষ্কে যে ভাব উদিত হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনার আধিক্য একটী প্রধান দোষ। কলিদাসের আকালিক বসন্ত প্রবৃত্তি, রতিবিলাপ, অথবা ভবভূতির জনস্থান, দণ্ডকারণ্য, পঞ্চবটী প্রভৃতির বর্ণনা যেমন পরিমিত, নৈষধে তেমন নহে। নৈষধ-কার যাহার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাকে সহজে ছাড়েন নাই—প্রথমসর্গের শেষে এক তড়াগের বর্ণনা করিতে গিয়া তাহাতে সমুদ্রের সমুদয় গুণের আরোপ করিয়াছেন। যে সকল স্থলে স্বাম্য সংঘটন হয় নাই—সে স্থানগুলি কেমন এক প্রকার বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের দময়ন্তীর রূপবর্ণনা ও চতুর্থ সর্গের বিরহ বর্ণনার বেলাও ঠিক ঐরূপ। এমন মিষ্ট বিরহ ভ্রমর-গুঞ্জন, কর্ণামোদী কোকিল-ধ্বনি, নয়নোৎসব চন্দ্র সমুদয়ই যেন বর্ণনার আতিশর্য্যবশতঃ অরুচিকর হইয়াছে। নৈষধের আর একটী দোষ অতিশয়োক্তি-প্রিয়তা, এরূপ অতিশয়োক্তি-প্রিয় কবি আর কেহ আছেন কিনা, সন্দেহ। দৃষ্টান্তের জন্য দুইটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

যদস্য যাত্রাসু বলোদ্ধতং রজঃ
স্ফুরৎ প্রতাপানলধূম মঞ্জিম।
তদেব গত্বা পতিতং সুধাম্বুধৌ
দধাতি পঙ্কীভবদঙ্কতাংবিধৌ॥ ৮॥

প্রয়াতুমস্মাক মিয়ং কিয়ৎপদং
ধরা তদম্ভোধিরপি স্থলায়তাং।
ইতীব বাহৈর্নিজবেগদর্পিতৈঃ
পয়োধিরোধক্ষমমুদ্ধৃতং রজঃ॥ ৬৯॥
(নৈষধ, ১ম সর্গ)

যুদ্ধ-যাত্রাকালে নলনৃপতির প্রতাপাগ্নির ধূমদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ সৈন্যগণের যে পদধূলি, তাহাই উড়িয়া গিয়া ক্ষীরসমুদ্রের পঙ্করূপে পরিণত হয়, তজ্জন্যই বিধুতে কলঙ্ক দৃষ্ট হইয়া থাকে।* আমাদের গমনের জন্য এই পৃথিবী কতটুকু স্থান, অতএব সমুদ্র ও স্থল হউক, ইহাই যেন মনে করিয়া নলের অশ্বগণ নিজ বেগদর্পে সমুদ্র পূর্ণ করিবার উপযুক্ত ধূলি উড়াইয়াছিল। এই সকল বর্ণনা পাঠ করিয়া হয়ত আধুনিক শিক্ষিত বৃন্দ বলিতে পারেন যে, কবির চন্দ্র সম্বন্ধে যেরূপ জ্ঞান, পৃথিবীর পরিমাণ সম্বন্ধেও ততোঽধিক, কিন্তু আমরা বলি, কবির ইহাতে কোন দোষ নাই, কারণ পৌরাণিক জনশ্রুতি বিজ্ঞানবিদ্ মহাকবি কালিদাস প্রভৃতিও স্ব স্ব কাব্যে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তবে তাঁহার অত্যুৎকট অতিশয়োক্তি দোষাবহ বটে, কিন্তু তিনি যে সময়ের লোক, সে সময় অতিশয়োক্তি-প্রিয়তাই অধিক ছিল। ইহা ভিন্ন এই গ্রন্থে অলঙ্কার দোষ বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এখানে একটীমাত্র উল্লিখিত হইতেছে।

স্মরোপতপ্তোঽপি ভৃশং নসপ্রভুঃ
বিদর্ভরাজং তনয়া ময়াচত।
ত্যজন্ত্যসূন্ শর্ম্মচ মানিনোবরং
ত্যজন্তি নত্বেক ময়াচিত ব্রতং॥ ৫০॥
(নৈষধ, ১ম সর্গ।)

নলরাজ একান্ত স্মরোপতপ্ত হইলেও

* চন্দ্র ক্ষীর সমুদ্র হইতে সমুদ্র মন্থনকালে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই কিম্বদন্তী পুরাণে আছে। সংস্কৃত মহাভারত দ্রষ্টব্য।

বিদর্ভরাজের নিকট দময়ন্তীকে প্রার্থনা করেন নাই, যেহেতু অভিমানী ব্যক্তিরা বরং জীবন এবং সুখ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু অযাচিত ব্রত পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এখানে সুখ অপেক্ষা জীবনেরই মূল্য অধিক, সুতরাং সুখ এবং জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন, এইরূপ লেখা উচিত ছিল। কবি তাহা না লেখায় ভুগ্নক্রমতা দোষ ঘটিয়াছে। এই প্রকারের দোষ নৈষধে অনেক আছে। এ সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতিও আছে, যথা,—নৈষধকার প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মট ভট্টের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি নৈষধচরিত রচনা করিয়া মাতুলকে দেখাইলে উক্ত ভট্ট বলিয়াছিলেন, বাপু, কিছুদিন পূর্ব্বে এই পুস্তকখানি পাইলে আমার বড় উপকার হইত, কেননা কাব্যপ্রকাশে দোষ পরিচ্ছেদ লিখিবার কালে আমাকে বিস্তর কাব্য অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি হস্তগত হইলে এক গ্রন্থ হইতে সমুদয় উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। নৈষধচরিত আদিরস প্রধান মহাকাব্য, আদ্যোপান্তই প্রায় ইহার আদিরসে অভিষিক্ত, তবে কবির করুণরস বর্ণনেরও বিলক্ষণ শক্তি ছিল। তিনি প্রথম সর্গের শেষে হংসের যে বিলাপ বর্ণন করিয়াছেন, উহা বেশ মনোহর ও স্বভাবসঙ্গত। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই মহাকাব্যের যথাযথ আলোচনা করা সম্ভবপর নহে, তবে স্থূল স্থূল বিষয়গুলিমাত্র বলা হইল। এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রত্যেক সর্গে ন্যূনাধিক ১৫০টী করিয়া শ্লোক আছে। এই গ্রন্থ ভট্টী, মাঘ, ভারবি, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ প্রভৃতি সমুদয় মহাকাব্যের মধ্যে বৃহত্তম।

সংপ্রতি আমরা নৈষধকাব্য-প্রণেতা শ্রীহর্ষের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, মহোদয় কৃত "বাঙ্গালার ইতিহাসে" দেখিতে পাওয়া যায়, কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় নামে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হন। তাঁহাদেরই অন্যতম শ্রীহর্ষ নৈষধকাব্য রচনা করিয়াছেন। নদিয়ার রাজার দেওয়ান ৺ কার্ত্তিকচন্দ্র রায় কৃত ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে আছে, নবনবতিশকে (৯৯৯ শকাব্দে) উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন। অস্মদ্দেশীয় প্রাচীনেরাও গল্প করেন, বঙ্গদেশে আদিশূর নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ক্ষত্রবংশ সম্ভূত। তাহার গৃহোপরি গৃধ্র পতিত হয়। তিনি অনঙ্গলের শান্তির নিমিত্ত শকুন-সত্র যজ্ঞ করিবার সংকল্প করেন। সে সময় বঙ্গদেশে বিদ্যাচর্চ্চা না থাকায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মহিষীর পরামর্শে তাঁহার শ্বশুর কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট পত্র লেখেন, তিনি পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কতদিনের এ ঘটনা, পূর্ব্ববঙ্গ কি পশ্চিমবঙ্গে তাঁহারা আগমন করেন, তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। ইহাদেরই বংশে, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র, কিন্তু রাঢ়ী বারেন্দ্রের ভেদের বিষয় তত কিছু তাঁহারা বলিতে পারেন না। তবে যজ্ঞ সমাপনান্তে উক্ত ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জে প্রত্যাগত হইলে সে দেশের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবেরা পতিত বলিয়া গ্রহণ না করায় তাঁহারা পুনরায় বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। ইহা তাঁহারা জানেন, কিন্তু এই

পাঁচজনের নামও তাঁহারা কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না—তাহা প্রাচীনেরা কিছুই বলিতে পারেন না। রাঢ়ী শ্রেণীর এক কুলীন বলেন যে,তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণেরা যখন রাজধানীতে উপনীত হন, তখন তাঁহাদের দীর্ঘশ্মশ্রু ছিল, জুতা পায়ে দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আসার কথা শুনিয়া রাজা প্রণাম করেন না। তাহাতে তাঁহারা ফিরিয়া যান, দরজার একখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের উপর আশীর্ব্বাদ করেন, তৎক্ষণাৎ সেই কাষ্ঠখণ্ড শাখাপত্রে বিভূষিত হয়, তাঁহার বাস বিক্রমপুরে, তিনি অদ্যাপি সেই আশীর্ব্বাদে জীবিত বৃক্ষটী দেখিয়া থাকেন। এ সকল কথায় অনেকে হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। বারেন্দ্র শ্রেণীর একটী কুলজ্ঞের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ইনি রাজসাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় খুব পরিচিত। গল্পপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, শ্রীহর্ষনামা কোন ব্যক্তি কান্যকুব্জ হইতে আগমন করেন না। ইনি ঘটক ব্যবসায়ী, কুলজীগ্রন্থ সঙ্গেই ছিল, তাহাতে দেখা গেল শ্রীহর্ষের নামগন্ধও নাই। নব্যভারতের লেখক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহোদয় ঢাকার পুরাবৃত্তের মধ্যে রাঢ়ী শ্রেণীর ঘটক দেবীবরের যে মত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে, ক্ষিতাশ, সুধানিধি, বীতরাগ, তিথিমেধা ও সৌভরি এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে সমাগত হন। তিথিমেধার পুত্র শ্রীহর্ষ নৈষধকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি অবশ্য নৈষধকাব্য অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথচ কেমন করিয়া তিথিমেধার পুত্র শ্রীহর্ষকে নৈষধকাব্য প্রণেতা বলিলেন, বুঝা যায় না। নৈষধ-কাব্যের প্রত্যেক সর্গের শেষে কবির পরিচায়ক একটী করিয়া শ্লোক আছে। তাহাতে কবি নিজের বিষয় অনেক উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার পিতামাতার নামও আছে—উদাহরণার্থে একটী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

শ্রীহর্ষং কবিরাজ রাজি মুকুটালঙ্কার হীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবীচয়ং।
তচ্চিন্তামণিমন্ত্র চিন্তন ফলে শৃঙ্গার ভঙ্গ্যা মহা
কাব্যে চারুণি নৈষধীয় চরিতে সর্গোঽয়মাদির্গতঃ॥১৪৫
(নৈষধ, ১ম সর্গ।)

কবিগণের মুকুটালঙ্কারে হীরকস্বরূপ শ্রীহীর কবির ঔরসে মা মল্লদেবীর গর্ভে এই জিতেন্দ্রিয় শ্রীহর্ষ কবি জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি চিন্তামণি নামক সারস্বত একাক্ষর মন্ত্র বিশেষের জপের ফলে কবিত্ব লাভ করিয়া শৃঙ্গাররস প্রধান নৈষধচরিত রচনা করেন, তাহার এই প্রথমসর্গ সমাপ্ত হইল। আর একটী সর্গের শেষে ইনি লিখিয়াছেন, ক্ষণভঙ্গবাদ নিরাকরণ করিয়া ইনি যে দার্শনিক গ্রন্থ লেখেন, "নৈষধ-চরিত" তাহার ভ্রাতা। আরও একটী সর্গের শেষে লিখিয়াছেন, ইনি কবিত্ব-গুণে কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট হইতে সম্মান-জনক গুয়াপান পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। রাঢ়ী বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলজীর গোলযোগ দেখিয়া বিশেষ বিদ্যাসাগর মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীতে তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতায় ভট্টনারায়ণকে পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম বলিয়াছেন, অথচ শ্রীহর্ষের নাম উল্লেখ করেন নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া কেহ বলেন যে, ইনি কান্যকুব্জেশ্বরের সভাস্থ একজন পণ্ডিত, তদ্ভিন্ন পঞ্চব্রাহ্মণ বা তাঁহাদের পুত্রের মধ্যে কেহ নহে!

ইনি বঙ্গদেশের অদূরে সমুদ্র দর্শনের বিষয় লিখিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্য কি? অদ্যাপি সুদূর পঞ্চনদ সিন্ধু, গুর্জ্জর প্রভৃতি প্রদেশ হইতে অনেক পণ্ডিত সাধু সন্ন্যাসী চন্দ্রনাথ-তীর্থসন্দর্শন উপলক্ষে বঙ্গদেশের শেষসীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন, আর কবি নৈষধের মধ্যে নিজের সামান্য কথাগুলি উল্লেখ করিলেন, বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি করার এই প্রধান ঘটনাটা উল্লেখ করিতে পারিলেন না, ইহার কারণ কি? আর পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতমের পুত্র হইলে কান্যকুব্জে-শ্বরের নিকট গুয়াপান আনিতে যাইবেন কি জন্য? কবি দময়ন্তীর পরিধানে এমন সূক্ষ্ম বসনের বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহাতে লজ্জা রক্ষা হয় না, ইহা দেখিয়া অনেকে বলেন, এ কাপড় ঢাকার তন্তুবায়ের নির্ম্মিত ভিন্ন অন্যের বুনান্ নহে—অতএব কবি বঙ্গদেশে আসিয়া কাব্য লিখিয়াছেন। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, ঢাকা ভিন্ন কি ভারতের কোথাও সূক্ষ্ম বসন প্রস্তুত হয় না? আর না হইলেও সেকালের কবিরা যে নায়িকাকে সূক্ষ্ম বসন পরাইয়া একটু আমোদ অনুভব করিতেন, ইহা সংস্কৃত কাব্য পাঠকদিগের অবিদিত নাই—মাঘভট্টকে আর কেহ বাঙ্গালী কবি বলিতে পারিবেন না, কিন্তু তিনি দ্বারকাপতি কৃষ্ণের অন্তঃপুর মহিলাদিগের বসনের বর্ণন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন।

আকাশ সাম্যং দধুরম্বরাণি
ননামতঃ কেবলমর্থতোঽপি ॥ ৫৯ ॥ (মাঘ ৩য় সর্গ।)

দময়ন্তীর বিবাহান্তে বাসরঘরে যাইবার সময় হুলুধ্বনির বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকে বলেন, এ বাঙ্গালিরীতি; কিন্তু অনেকে বলেন, হিন্দুস্থানেরও কোন স্থানে এ পদ্ধতি না আছে, এমন নহে। যাহা হউক, নৈষধকার কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের কেহ অথবা বাঙ্গালায় পর্য্যটন-শীল কোন কবি হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মাঘ-ভট্টের অনেক দিন পরে এবং গীতগোবিন্দের পূর্ব্বে অনুমান ৬০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন।

শকাব্দ।

ডাক্তার ওল্‌ডেনবর্গের মতানুসরণ করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, শকরাজ কনিষ্ক দ্বারা প্রচলিত অব্দই শকাব্দ নামে প্রচলিত রহিয়াছে। * বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য রমেশ বাবুর গ্রন্থ দৃষ্টে এইমত অনুমোদন করিয়াছেন। গত শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় এই জন্য ত্রৈলোক্য বাবুর প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল গবেষণার

* The inscriptions are dated according to the era of Kaniska king of Kashmir, *i. e.*, the Saka Era, 78 A. D.

Ancient India. Vo. II. p. 318.

We have already said before that the era known as the Sakabda was established from Kaniska's reign. Dr. Oldenberg maintains that the Saka Era is reckoned from the date of Kaniska's coronation, and not from his death, and this conclusion seems to be well founded. *Ancient India. Vol. III. p. 4*

পর আমরাও উল্লিখিত মত গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্যই এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

শকাব্দ, শালিবাহন প্রচলিত অব্দ; ইহা নিতান্ত নব-নির্ম্মিত মত বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে। কারণ মুসলমান শাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থে কিম্বা ক্ষোদিত লিপিতে শকাব্দের সহিত শালিবাহনের নাম সংযুক্ত দেখিতে পাইতেছি না।

খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমান পণ্ডিত আলবেরুনী ভারতে আগমন করেন, তিনি তাঁহার "ভারত বৃত্তান্ত" নামক উপাদেয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ভারতবাসীগণ. সচরাচর শ্রীহর্ষাব্দ, বিক্রমাদিত্য অব্দ, শককাল (শকাব্দ), গুপ্তকাল (গুপ্তাব্দ) ও বল্লভী অব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। * প্রাচীন গ্রন্থকার ও জন্মপত্রিকা লেখকগণ "শকেন্দ্রকাল", "শক নৃপ সময়", বা "শক নৃপতিরতীতাব্দ" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শকজাতীয় কোন নরপতি দ্বারা "শকাব্দ" প্রচলিত হইয়াছে।

যদিচ শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে দেউস্কর মহাশয় শকাব্দ, শালিবাহন প্রচলিত অব্দ নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে তাঁহার সেই মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে; ৩৪১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে, "শালিবাহন বা বিক্রমাদিত্য শক জাতির সংহার করিয়া যে অব্দ প্রচলিত করেন, তাহা শকাব্দ নহে; প্রকৃত পক্ষে শকজাতীয় নৃপতিগণ যে অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাই শকাব্দ।"

সুবিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিয়ন সাঙের মতানুসারে * শক কুলতিলক মহারাজ কনিষ্ক সুবিখ্যাত মৌর্য্য সম্রাট অশোকের তিন শত বৎসরের কনিষ্ঠ হইতেছেন।

পণ্ডিতপ্রবর জেনারল কনিংহাম বুদ্ধের নির্ব্বাণ হইতে অশোকের মৃত্যু পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। † ইহাতে

---

* Alberuni's Indica. By Sachan. Vol. II. p. 5.

* Beal's Si-yu-ki. Vol. I. p. 56.

† ৪৭৮ খ্রীঃপূঃ বুদ্ধের নির্ব্বাণ।
৩১৬ ... চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক। (২৪ বৎসর)
২৯২ ... বিন্দুসারের অভিষেক। (২৮ বৎসর)
২৭৭ অশোকের উজ্জয়িনীর শাসনকর্তৃত্বে নিয়োগ।
২৭৪ ... মহেন্দ্রের জন্ম।
২৬৪ ... বিন্দুসারের পুত্রগণের কলহ।
২৬০ ... অশোকের অভিষেক।
২৫৭ ... ... বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ।
২৫৬ ... ... অন্তিওকাসের সহিত সন্ধি।
২৫৫ ... ... মহেন্দ্রের দীক্ষা।
২৫১ ... ... প্রথম ক্ষোদিত আজ্ঞা।
২৪৯ ... ... দ্বিতীয় " "
২৪৮ ... ... পার্থিয়ায় খবক্কানের বিদ্রোহ।
২৪৬ ... ... বক্ট্রিয়ায় ডিওডোটসের বিদ্রোহ।
২৪৪ ... ... তৃতীয় মহাশঙ্খ।
২৪৩ ... ... মহেন্দ্রের সিংহল যাত্রা।
২৪২ ... ... বরাবর গুহলিপি।
২৩৪ ... ... স্তম্ভলিপি।
২৩১ ... ... রাজ্ঞী অসন্ধিমত্যার মৃত্যু।
২২৮ ... ... দ্বিতীয়রাণীর বিবাহ।
২২৬ ... ... দ্বিতীয় রাণীর দ্বারা বুদ্ধিদ্রোমের বিনাশ চেষ্টা।
২২৫ ... ... অশোকের সিংহাসন পরিত্যাগ।
২২৪ ... ... রূপনাথের ক্ষোদিত আজ্ঞা।
১২৩ ... ... অশোকের মৃত্যু।

দৃষ্ট হইবে যে ২৯২ পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দে অশোকের পিতা বিন্দুসার সিংহাসন অবস্থান করেন। ইহার ৩২ বৎসর অন্তে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২২৩ পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। উক্ত তালিকা অনুসারে গণনা করিয়া অশোকের (২২২ + ৭৮ = ৩০০) ঠিক তিনশত বৎসর পর কনিষ্কের অভিষেক নির্ণীত হইতেছে।

শক জাতীয় যে সকল নরপতি ভারতে রাজত্ব করিয়াছেন, তন্মধ্যে কনিষ্ক সর্ব্ব প্রধান। তাঁহার শাসন কালে বৌদ্ধদিগের চতুর্থ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হইয়াছিল। তিনি মগধ রাজ্য জয় করিয়া বৈশালী হইতে বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র পুরুষপুরে (পেসওয়ারে) লইয়া গিয়াছিলেন। মধ্য আসিয়া ও চীনদেশীয় নরপতিগণও তাঁহাকে কর প্রদান করিয়াছিলেন। শককুলেন্দ্র এ হেন কনিষ্কের অব্দ যে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

কেবল ওলডেনবর্গ কেন, পণ্ডিতপ্রবর ভুলার * ও ফারগুসনও † এই মত প্রচার করিয়াছেন। আমরা ইহা অগ্রাহ্য করিবার জন্য কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। দেউস্কর মহাশয় অকারণ গুপ্তাব্দ লইয়া গণ্ডগোল করিয়াছেন। ইহার সহিত কনিষ্কের কোন রূপ সংস্রব নাই।

ইহা নিতান্ত দুঃখের সহিত আমাদিগকে উল্লেখ করিতে হইতেছে যে, ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ রাজাদিগের কীর্ত্তি বিলোপের জন্য বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ অশেষ গুণালঙ্কৃত সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের কথা উল্লেখ করিতে পারি। যদি আমরা বিখ্যাত পরিব্রাজক হিয়ান-সাঙকে বিশ্বাস করিতে পারি, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণেরা হর্ষবর্দ্ধনকে বধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদি আমরা চীন পরিব্রাজক ইৎসিং এবং হর্ষবর্দ্ধনের শাসনপত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণগণ হর্ষবর্দ্ধনের কীর্ত্তি বিলোপ করিবার জন্য তৎপ্রণীত রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ অন্যের প্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন যে এক জন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন, তাঁহার শাসনপত্রে তাঁহার স্বরচিত কবিতাই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পরিব্রাজক ইৎসিংএর মতানুসরণ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, হর্ষবর্দ্ধন যে কেবল এক জন সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন, এমত নহে, তিনি এক জন উৎকৃষ্ট অভিনেতাও ছিলেন। ইৎসিং বলেন, নাগানন্দ অভিনয় কালে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং জীমূতবাহনের অংশ গ্রহণ করিয়া এরূপ অভিনয় করেন যে, তদ্দর্শনে দর্শকমণ্ডলী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ কবি ও পণ্ডিতগণ যদি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াও থাকেন (এরূপ অনুমান অসম্ভব নহে) তাহা হইলেও রত্নাবলী ও নাগানন্দ প্রভৃতি নাটক নাটিকাগুলি যে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রচিত, তৎপ্রতি কোন সন্দেহের কারণ দেখা যাইতেছে না। এ হেন অশেষ গুণালঙ্কৃত পরম সৌগত মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের কীর্ত্তি বিলোপ ও জীবন বিনাশের জন্য যে সম্প্রদায়ের লোকেরা চেষ্টা করিয়া-

* Ind. Ant. Vol. VI. p. 149. ff. and Vol. VII. pp. 141. ff.

† J. R. A. S. (N. S.) Vol. XII. pp. 261. ff.

ছেন, তাঁহারা পরমসৌগত সম্রাট কনিক্ষের কীর্ত্তি বিলোপের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। এজন্যই আমরা বলিতেছিলাম যে, বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ শককুলেন্দ্র কনিক্ষের প্রবর্ত্তিত অব্দ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী শালিবাহনের প্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই মত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের কল্পনা-প্রসূত। পণ্ডিতপ্রবর ভাণ্ডারকার দেশীয় গৌরব রক্ষার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিত ভাণ্ডারকার বলেন, "কনিক্ষের শাসন প্রভাব যে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এরূপ কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত যায় না। কিন্তু শকাব্দ বা শককাল অতি প্রাচীন কালেও দাক্ষিণাত্যে বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র দেশে ব্যবহৃত হইত।" *

গুর্জ্জর ও মহারাষ্ট্রদেশে মহারাজ কনিক্ষের বিজয়পতাকা উড্ডীন হওয়া অসম্ভব নহে। গুর্জ্জরদেশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কনিক্ষের রাজদণ্ডের অধীন ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত ত্রিপুরা পর্ব্বতে কনিক্ষের বিজয় পতাকা সংরোপিত হওয়ার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। অথচ মুসলমান শাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিপুরেশ্বরদিগের তাম্রশাসনেও শকাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দেউস্কর মহাশয় ইহার উত্তরে কি বলিবেন!

মথুরা হইতে কনিক্ষের নাম সংযুক্ত জৈনদিগের যে সকল প্রাচীন প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মহারাজ কনিক্ষ অবশ্যই খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

গুপ্ত সম্রাট্দিগের সমস্ত ক্ষোদিত লিপি সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতপ্রবর ফ্লিট যে প্রকাণ্ড গ্রন্থ * রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আলবেরুণী, টমাস, কনিংহাম্ প্রভৃতি পণ্ডিতসমূহের প্রচারিত গুপ্ত নরপতিদিগের সময় সম্বন্ধীয় মতের সমালোচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি গুপ্তদিগের রাজ্যারম্ভকাল ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু মহারাজ বুধগুপ্তের নাম সংযুক্ত মন্দসরের শাসনলিপি পৃথক করিয়া লইলে ফ্লিট সাহেবের সমস্ত যুক্তি প্রমাণ দুর্ব্বল হইয়া উঠে। ফ্লিট সাহেবের উক্ত উপাদেয় প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার পর গুপ্ত সম্রাটদিগের নামাঙ্কিত একটী মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে দুইজন বুধ গুপ্তের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্দসরের শাসনলিপিতে দ্বিতীয় বুধ গুপ্তের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে, বলিলে, ফ্লিট সাহেব যে কিরূপ তাহার মত স্থির রাখিবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। টমাস সাহেব তাঁহার Imperial Gupta Dynasty নামক উপাদেয় গ্রন্থে ও কনিংহাম সাহেব তাঁহার আর্কিওলোজিক্যাল সর্ব্বে রিপোর্টে গুপ্তসম্রাটদিগের যেরূপ সময়াবধারণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, শকরাজাদিগের অধঃপতনের অল্পকাল পরেই গুপ্তবংশের অভ্যুদয়, সুতরাং এতদুভয় বংশের সমসাময়িক ক্ষোদিত লিপির অক্ষরে কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য থাকা বিচিত্র নহে। এবং এরূপ সাদৃশ্য দুই তিন শতাব্দীতেও বিলুপ্ত

* নব্যভারত, ১২৯৮। শ্রাবণ সংখ্যা, ২১২ পৃষ্ঠা।

* Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III.

হইতে পারে না, সুতরাং দেউস্কর মহাশয় শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে পণ্ডিতপ্রবর ভাণ্ডারকারের আর যে কয়েকটী মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তর্কস্থলে সেগুলি বিশেষ ফলদায়ক বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে না।

এক্ষণ তর্কস্থলে স্বীকার করা হউক যে, ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তদিগের শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মথুরা হইতে মহারাজ কনিষ্কের নাম সংযুক্ত যে সমস্ত জৈন প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎ সমস্তের ক্ষোদিত অক্ষরের সহিত প্রয়াগনগরীস্থিত মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের লাট প্রস্তর লিপির অক্ষর তুলনা করিলে নিতান্ত বালকবুদ্ধিতেও ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে, এই সকল কখনই এক সময়ের অক্ষর নহে। সুতরাং ভাণ্ডারকারের ন্যায় জনৈক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শকাব্দ সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি ও তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, সেই সকল তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

আহ্বান।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল তেওট।

১

প্রাণসখা আমার রহিলে কোথায়
এমন বিষম সঙ্কটের সময়?
অপরাধ বিনা হে দেখ দণ্ড দেয়!
তোষামোদ করিনে বলিয়ে তাড়ায়!

২

থাকিয়ে তোমার হে নিরত পূজায়,
কেমনে করি বল যাহায় তাহায়
স্তবস্তুতি মিনতি, পদ-লালসায়!
তাহাতে অক্ষম আমার প্রকৃতি যে হয়!

৩

যাই যাব, তাহাতে ক্ষতি কি আমার?
কিন্তু দোষ সকলে দিবেহে তোমায়!
যদিও স্থানান্তর—সামান্য বিষয়,
তথাপি তব নিন্দা ভক্তের না সয়।

৪

করিবে যাহা তুমি, লইব মাথায়,
বনে জঙ্গলে দেশবিদেশে যথায়—
পাঠাবে আমারে হে প্রাণেশ! তথায়
যাইব আমি, যেন না করি বিচার।

৫

অনন্ত জলনিধি-পারে যদি যেতে হয়,
তাও যাব প্রাণেশ, প্রাণও যদি যায়।
একমাত্র ভিক্ষা নাথ! নিকটে তোমার
অন্তিমেতে পাই যেন ডাকিলে তোমায়!

৬

জানি আমি, তুমি বিদ্যমান যথায় তথায়,
জেনেও তথাপি কেন আমার হয় মনে ভয়?
বুঝেছি, রুধির মাংসেতে হে গঠিত শরীর,
তা'হতে উৎপন্ন মন—উদে তাই ভয়!

৭

অভয়দাতা তুমি, মোরে দেও হে অভয়!
আমি তব চরণের রেণু লইয়ে মাথায়—
নির্ভয় অন্তরে হে নাথ, যাইব তথায়,
পাঠাইবে তুমি যেখানে আমায়।

৮

অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উদয়—
হইতে পারে যদি তুমি থাক হে সহায়;
দৃঢ় এ বিশ্বাস মনেতে আমার, তোমার কৃপায়
ভক্তের মনোবাঞ্ছা নাথ, সদা পূর্ণ হয়।

৯

করযোড়ে প্রার্থনা করি গো, তোমার কৃপায়—
বঞ্চিত কখন করোনা প্রাণেশ আমায়!
তব কৃপা থাকিলে নাথ, বিপদ্ আমায়
ভয় দেখায়ে তখনি সরে যাইবে নিশ্চয়।

১০

থাকিলে তবকৃপা নাথ, নাহি থাকে যম-ভয়
তখন তুচ্ছ তাহার কাছে, বিপদের ভয়?
তাই আজ ডাকিতেছি আমি, তোমায়।
এই সঙ্কটের দিনে দেহ মোরে পদাশ্রয়।

১১

হে ভবভয় ভঞ্জন, পতিতপাবন ঈশ্বর!
পাপ তাপ হর করুণাকর, ডাকিছে তোমায়!
আজ দয়া ক'রে এস হে এ পতিত ধরায়,
তোমার উৎপীড়িত ভক্তগণে দেওহে অভয়।

১২

'এসে দেখ তব সনাতনধর্ম্ম যায় যায়!
এখন ধার্ম্মিকজন হয়েছে নির্যাতনের বিষয়!
তুমি না আসিলে পতিত ধরার কি হবে উপায়?
ধর্ম্ম রক্ষা করহে ত্বরিত আসিয়া হেথায়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

বেদান্ত* ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

অনেকে আজ কাল বলিয়া থাকেন যে, বেদান্তই ব্রাহ্মধর্ম্ম। উহা না বলিলে যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্মান রক্ষা পায় না। কি করিয়া যে বলেন—বলিতে সাহস করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবের দরুণ বেদান্তের সময় অপেক্ষা দেশ যে কি বিশেষরূপ উপকার লাভ করিয়াছে, তাহা তাঁহারা মোটেই দেখিবেন না। দেখিলেও তেমন গ্রাহ্য করিবেন না। কথায় কথায় তাঁহারা বেদান্ত ফলাইবার চেষ্টা করিবেন—ব্রাহ্মধর্ম্মকে উল্টাইয়া বৈদান্তিকত্বে পরিণত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। ঠিক বুঝিয়া দেখিলে, বেদান্ত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে মহা ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়। বেদান্ত উদাসীন। তাহার মধ্যে প্রলয়ের গানই ধ্বনিত হয়। বেদান্ত শূন্য শূন্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, শেষে হতাশ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ব্রহ্মের সঙ্গে আপনার সমকক্ষতা প্রতিপন্ন করিতে ওঠে, 'অহং ব্রহ্ম' বলিয়া আহঙ্কারিক হলাহল চতুর্দ্দিকে ত্যাগ করে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সে শূন্যতা নাই। তাঁহার গৃহ আছে, সুতরাং উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয় না। তিনি স্বীয় গৃহে বাস করিয়া ধীরে ধীরে সমুদয় জগত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার একটা দাঁড়াইবার স্থান আছে, একটা ধরিবার কেন্দ্র আছে। সেই কেন্দ্রকে ধরিয়া যেথায় ইচ্ছা ঘোরেন, পতনের ভয় নাই, বিশৃঙ্খলতার আশঙ্কা নাই। তিনি নিজ অস্তিত্ব দেখিয়া অস্তিত্বের কারণটুকুকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দ লাভ করেন। বেদান্ত নিজের অস্তিত্বটুকু বিনাশ করিয়া ফেলে মাত্র। অস্তিত্বের কারণ যাহা, তাহা যেমন আছে তেমনই থাকিল, কার্য্যটুকু গেল মাত্র। বেদান্ত পূর্ণাঙ্গ নয়, অঙ্গহীন। বেদান্তে সন্ধ্যার মাধুরী নাই। ইহাকে আমরা ঘোর অন্ধকার অথবা ঘোর আলোক কহিতে পারি। ঘোর অন্ধকার, ঘোর আলোক, দুইই সমান। দুয়েতেই অদর্শন ঘটে।† ব্রাহ্মধর্ম্ম ওরূপ নয়। ইহা দুয়ের সন্ধিস্থান। মধ্যবিন্দুকে আশ্রয়

* এখানে বেদান্ত, বেদান্তদর্শনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। প্রকৃত বেদান্ত যাহা, তাহা উপনিষদই, তাহার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বেশী ভাগই মিল, তবে যদি তাহার মধ্যে কিছু অমিল থাকে, অথবা যদি কোন কুতার্কিক বল পূর্ব্বক অমিল ঘটাইয়া দেন, তাহা এত যৎসামান্য যে, ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

† যদি ছবির চিত্রিত অংশগুলির বর্ণ এবং পটের বর্ণ সমস্তই একই প্রকারের বর্ণ হয়, কোন বর্ণের সহিত কোন বর্ণের তিলার্দ্ধও প্রভেদ না থাকে, তবে সেই ছবির বিচিত্র অংশগুলি যেমন একেবারেই অদৃশ্য হইয়া দাঁড়ায়, অথবা আকাশের বর্ণ এবং আকাশ-স্থিত পৃথিবীস্থিত সমস্ত বস্তুরই বস্তু যদি একই অভিন্ন বর্ণ হয়, তবে কোন বস্তুই যেমন দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না, সেইরূপ।

করিয়া আছে, সেইজন্য ইহাতেই প্রকৃত শান্তিলাভ করা যায়।

বেদান্ত মরুভূমি। ব্রাহ্মধর্ম্ম উর্ব্বর, শ্যামল, সুন্দর। যাঁহারা বেদান্তের পক্ষপাতী, তাহাদের স্বীকার করিতে হইবে, হৃদয় মরু হইয়া গিয়াছে। ঠিক বিচার করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, বৈদান্তিক ধর্ম্মে প্রেমের রাজত্ব নাই। ইহাতে অনেকে হয় তো হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিবেন, "কি বেদান্তের উপর এইরূপ পরিবাদ!" কিন্তু যাহা সত্য, তাহা বলিতে ভয় নাই। সত্যের বলে সাহসী হইয়া বলিতেছি, বেদান্তে প্রেম বাস্তবিক লুপ্ত। বেদান্ত অতি প্রেম করিতে গিয়া অপ্রেম করিয়া বসিয়াছেন। যদি আমার অস্তিত্বের কণামাত্র রহিল না, তবে আমি আবার প্রেম করিব কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন একটা অতি কিছু করিতে যান না। যাহা বিধিমত যোগ্য, তাহাই করিতে যত্নবান হন। সেই হেতু তাঁহার নিয়মে সকলি সুশৃঙ্খল থাকে। তিনি ক্রমের প্রার্থী, সেইজন্য তাহাতে বিক্রম আছে। তাঁহার ক্রমিকই অগ্রসর হইবার ভাব, দিন দিন উন্নত হইবার ভাব। তিনি অসীমতার ভক্ত। কিন্তু বেদান্ত একটা আস্ত সীমাভক্ত। ইনি মহা-আলোক দেখিয়া একেবারে উন্মুক্ত হইতে গিয়া অগ্নিতে পতঙ্গবৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। ইনি চিরদিন মহা-আলোকের নিকটে থাকিয়া তাঁহার সহবাস ভোগ করিব, ইহা চাহেন না। একেবারে উঠিতে যান্, উঠিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সোপানে সোপানে উঠিয়া চিরদিন জীবনই লাভ করিতে চাহেন; সে জীবনের শেষ নাই। তবে এমন ধীর উদার ব্রাহ্মধর্ম্মকে ছাড়িয়া বেদান্তের পথ অনুসরণ করা কি শ্রেয়ের কাজ? যাঁহারা অনুসরণ করিবেন, তাঁহারা, যে অগ্নি সহসা মহাকার ধারণ করে, মুহূর্ত্তমধ্যে নির্ব্বাণই যেমন তাহার পরিণতি, সেইরূপ, বৈদান্তিক নির্ব্বাণত্বকে প্রাপ্ত হইবেন। অতএব বলিতেছি, যদি তাঁহারা নির্ব্বাণলাভার্থে আকুল না হইয়া, কায়মনোবাক্যে—যথার্থরূপে ব্রহ্মসহবাস লাভপূর্ব্বক উন্নতির পথে চিরদিন অগ্রসর হইতে চাহেন, তাহা হইলে সত্বর ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করুন, কথায় কথায় বেদান্তের দোহাই যেন না দেন, ব্রাহ্মধর্ম্মকে বেদান্ত যেন না বলেন।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতি-কবিতা।

১

ক্ষুদ্র বন-ফুল-বাসে
সারাটা বসন্ত ভাসে;
ক্ষুদ্র উর্ম্মি-মূলে বুলে প্রলয়-প্লাবন;
ক্ষুদ্র শুক-তারা কাছে,
চির-উষা জেগে আছে;
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন।

২

ক্ষুদ্র বৃষ্টি-কণা-বলে
সপ্ত-পারাবার চলে;
ক্ষুদ্র বালুকায় গড়ে নিত্য নব দেশ;
ক্ষুদ্র বিহগের সুরে
ষড়-ঋতু-চক্র ঘুরে;
ক্ষুদ্র বালিকার চুম্বে স্বরগ-আবেশ।

৩

ক্ষুদ্র মণি-কণা-ছায়
খনির তমান্ধ ভায় ;
ক্ষুদ্র মুকুতার গায় সাগর-মাধুরী ;
পল-অনুপল পরে
মহাকাল ক্রীড়া করে ;
অণু-পরমাণু-স্তরে ব্রহ্মার চাতুরী।

৪

হৃদয়টা ভেঙে-টুটে
তবে বিন্দু অশ্রু ফুটে ;
ক্ষুদ্র এক নাভি-শ্বাসে সারা প্রাণ ভরা ;
ক্ষুদ্র কুশ-কাশ-মূলে
অতল-অনল দুলে ;
ক্ষুদ্র নীহারিকা-কোলে শত শত ধরা।

৫

রবির ব্রহ্মাণ্ড-রাগে
সহস্র কলঙ্ক জাগে,
কিন্তু নিষ্কলঙ্ক-রূপা চকিতা হ্লাদিনী,
নর-কণ্ঠে বিষ ঝরে,
অমৃত শিশুর স্বরে ;
নিটোল শিশির কণা, বন্ধুরা মেদিনী।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সুখাবতী
বা
বৌদ্ধ-স্বর্গ।

কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, সকলেই স্ব স্ব পুণ্যফলে স্বর্গলাভে অভিলাষী। সকলেই ইহা বিশ্বাস করেন যে, পুণ্যফলের পরিণাম-স্বরূপ স্বর্গসুখ লাভ করা যায়। তবে ধর্ম্মভেদে স্বর্গসুখের প্রকার ভেদ মাত্র আছে। হিন্দুগণের স্বর্গে নন্দন কানন আছে, তথায় পুণ্যাত্মা স্বর্গবাসীগণ পরম সুখে বিহার করেন। সেই কাননসম্ভূত পারিজাত পুষ্পের সৌরভে তাঁহাদিগের মনপ্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে। এই পারিজাতের তুল্য সুগন্ধ পুষ্প অবনীমণ্ডলে অপ্রাপ্য। এই কুসুমের হৃদয়োন্মাদিনী শক্তি কবিগণও কল্পনাবলে বর্ণনা করিতে অক্ষম। স্বর্গবাসী দেবগণকে ক্ষুধাতৃষ্ণাজনিত ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না, তাঁহারা অমৃতপান করিয়া মর্ত্ত্যবাসীগণের আহারান্বেষণরূপ প্রধান চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতেছেন। বিদ্যাধরী ও কিন্নর কিন্নরীদিগের মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের কর্ণকুহর সদা পরিতৃপ্ত।

দিব্যাঙ্গনা ভোগ যে তাঁহাদের স্বর্গসুখের একটী প্রধান বস্তু, একথা একেবারে অস্বীকার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। হিন্দুর বিশ্বাস যে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর জলে স্থলে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে সশরীরে স্বর্গলাভ হয়। যে মুহূর্ত্তে পতিতপাবনী গঙ্গা দেবীর তীরে তাঁহার মৃত্যু হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। স্বর্গগমনের পথেই একটী দিব্যাঙ্গনা আসিয়া তাঁহার সেবার্থে উপস্থিত হইল। ভক্ত লিখিতেছেন :—

দিব্য স্ত্রীকর চারু চামর মরুৎ সংবীজ্যমানঃ কদা।
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ভগবতি ভাগীরথি-স্বংবপুঃ॥

এই ত গেল হিন্দু স্বর্গের একটী মোটামুটি প্রতিকৃতি। শুনা যায়, মুসলমানদিগের স্বর্গেও দিব্যাঙ্গনা ভোগ একটী প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এখন দেখা যাউক, খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গ কিরূপ। খ্রীষ্টধর্ম্মে কথিত আছে যে, যতদিন পর্য্যন্ত না জগতের শেষ বিচারের দিন উপস্থিত হয়, ততদিন কি পুণ্যাত্মা সাধুগণ, কি মহাপাপী নারকীগণ সকলকেই প্রেতযোনির ন্যায় বিচরণ করিতে হইবে। স্বকৃত পুণ্য অথবা পাপের কোন ফলভোগ করিতে হইবে না। আবার সেই বিচার দিন কখন্ যে আসিবে, তাহার নির্ণয় নাই। এতাবৎকাল ধার্ম্মিকগণকে অযথা কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। পাপীগণ স্বকৃত পাপ ভোগ না করিয়া ধার্ম্মিকগণের সহিত বিহার করিয়া কাল যাপন করিবে। যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের শেষ বিচারের দিন উপস্থিত না হইবে, খ্রীষ্টানগণ নিরুপায়। কারণ তাঁহাদের দয়াল যীশু তাঁহাদিগকে দর্শন দিবেন না, হোলী গোষ্ট তাঁহাদিগের নেত্রপথের পথিক হইয়া মধুমাখা উপদেশ প্রদান করিবেন না।

আবার শুনিতে পাওয়া যায়, যে সময় সেই শেষ বিচারের দিন উপস্থিত হইবে, তখন সমস্ত জগতের মানব সৃষ্টির শেষ হইবে। শেষ বিচার হইয়া গেলে পর পুণ্যাত্মাগণ অনন্তকাল সুখে স্বর্গ ভোগ করিবেন, পাপীগণ স্বকৃত পাপের ফল স্বরূপ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবেন। সুতরাং খ্রীষ্টানগণের মতে সাধুগণ অযথা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া মানব সৃষ্টির লোপ প্রাপ্তি হইলে স্বর্গলাভ করিবেন। একথাটীতে আমাদের কিন্তু মন উঠে না, আমরা ইহা ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

বৌদ্ধদিগের স্বর্গ কিন্তু অন্যরূপ। সাধারণতঃ আজি কালিকার লোকের এরূপ ধারণা আছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম অত্যন্ত নীরস। নির্ব্বাণ লাভই সেই ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু নির্ব্বাণ জিনিষটা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সেদিকে লোকের মনও আকৃষ্ট হয় না। নির্ব্বাণ যে কি জিনিষ, তাহা বুঝান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং তাহা হইতে বিরত হইলাম। বাস্তবিক শিক্ষিত হিন্দুগণ যেরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভের প্রয়াসী, সেইরূপ বৌদ্ধগণও দুঃখ বহুল সংসারে ক্লেশপরম্পরা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নির্ব্বাণ প্রয়াসী। কিন্তু হিন্দুগণ যেরূপ পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করেন, কর্ম্মফলে কখন বা স্বর্গ, কখন বা নরক ভোগ বিশ্বাস করেন, বৌদ্ধগণেরও সেইরূপ বিশ্বাস আছে। যত দিন পুণ্যফল থাকিবে, ততদিন তাঁহারা স্বর্গে বাস করিতে পারিবেন, হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহাদের এই ধারণা।

হিন্দুদিগের যেরূপ ব্রহ্মলোক, শিবলোক, গোলোক প্রভৃতি নানারূপ স্বর্গ আছে; বৌদ্ধদিগের তুষিত সুখাবতী প্রভৃতি নানা লোক আছে। হিন্দুদিগের স্বর্গে যেরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণ অবস্থিত, বৌদ্ধগণেরও সেইরূপ সুখাবতী লোকে দেবাধিদেব ভগবান্ অমিতাভ-দেব বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, ও বজ্রপাণি পদ্মাসনে অবস্থিত। এই অমিতাভদেবের বিমল আভা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সুখাবতীস্থিত স্বভাববিরোধী পশুপক্ষীগণকেও স্ব স্ব হিংসা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে, তথায় তাহারা একত্রে সুখে বিচরণ করে এবং পরস্পর পরস্পরের উপকার ও সুখবর্দ্ধনে নিযুক্ত। তবে হিন্দুর স্বর্গভোগের সহিত বৌদ্ধের এই প্রভেদ যে, হিন্দুর স্বর্গবাসী দেবগণ অমৃত পান করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা বিবর্জ্জিত—কিন্তু বোধিসত্ত্বগণ এই দেবদুর্লভ

অমৃতকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাঁহারা ইহা পান করিতে চাহেন না—পরোপকার ধ্যানই তাঁহাদের একমাত্র খাদ্য বস্তু; কারণ সুখাবতী—লোক কষ্ট-শূন্য হইলেও সেই স্থান উপভোগের জন্য নহে। সেখানকার লোক কেবল স্বীয় অপরিমিত দান বিনয় সহিষ্ণুতা বীর্য্য জ্ঞান ও ধ্যান বলে কিসে "পরের উপকার করিব" এই চিন্তাতেই নিমগ্ন। তাঁহাদের এই মূলমন্ত্র যে জগতে যাহা কিছু সুখ আছে, সমস্তই পরের উপকার করিব, এই বাসনা করিলেই লাভ করা যায়। স্বার্থ চিন্তাতে কেবল অনবচ্ছিন্ন দুঃখরাশিই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কল্পবৃক্ষগণেরও ফলপ্রদান সময়ে স্বভাবতঃই শরীর কম্পিত হইয়া থাকে, অপরিসীম ক্ষীর-সমুদ্রও অমৃতাভিলাষী দেবতাগণ কর্ত্তৃক মথিত হইয়া কম্পিত হন, কিন্তু এই সুখাবতীবাসী বোধিসত্ত্বগণ পরার্থে শত শতবার শরীর দানে নিষ্কম্পভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ। সে সময়ে তাঁহাদের দেহ আনন্দে পুলোকোৎকর বহন করে, কষ্ট বা ভয়ের লেশ-মাত্র অনুভব করে না। এই সত্ত্ব-মহোদধি শুদ্ধাত্মাগণ পরার্থে মহান্ উৎসাহশালী। তাঁহারা পরের জন্য করিতে না পারেন, এমন কিছুই নাই—বস্তুতঃ পরোপকারের বিষয়ে তাঁহাদের অসাধারণ শক্তি আমাদের বোধগম্য নহে। এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করি, বৌদ্ধধর্ম্ম কি নীরস? করুণ রস কি রস শ্রেষ্ঠ নহে? এই রসের আস্বাদন করিলে আদি প্রভৃতি অন্যান্য রসকে কি তুচ্ছ জ্ঞান হয় না? নিজে উপভোগ করা অপেক্ষা পরোপকারই যে জগতের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, ইহা কি উচ্চ কল্পনা নহে? তবে বলিতে পারি না, সকলে আমার সহিত ঐক্য না হইতে পারেন; কারণ জগতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। এই বোধিসত্ত্বগণের চিত্ত স্ফটিকের ন্যায় বিমল, কাম ক্রোধাদি রিপুর রাগ প্রতিফলিত হয় না, সুতরাং এই সুখাবতী স্বর্গে দিব্যাঙ্গনাগণের আবির্ভাব নিষ্ফল। বাস্তবিকই এই স্বর্গে সংসারসখী নারীগণের সংস্পর্শ নাই; সুতরাং হিন্দুর স্বর্গের সহিত এই স্থলে প্রধান পার্থক্য। এখানে জন্মগ্রহণ করিতে হইলে দশমাস দশদিন গর্ভবাসরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না, ভগবান অমিতাভদেবের প্রভাবে এখানে সকলেই পদ্ম হইতে উৎপন্ন অথবা পদ্মযোনি বা নির্ম্মলযোনি। অশেষ শক্তি-শালী মারদেব যিনি দেবাদিদেব মহাদেবকেও স্বীয় পুষ্পবাণের দ্বারা জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাব এখানে কিছুই লক্ষিত হয় না। এই লোক তাঁহার প্রধান-শক্তি বামলোচনা বিরহিত। এস্থানে তাঁহাদের অধিকার নাই। কারণ সুখাবতী কামলোকের বহির্ভাগে অবস্থিত। অতএব যদিও বৌদ্ধস্বর্গে নন্দনকানন নাই, কল্পবৃক্ষ নাই, বিদ্যাধরী অপ্সরা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনা নাই—ক্ষুধাতৃষ্ণাপহারী অমৃত নাই, তথাপি পরোপকার রত বোধিসত্ত্ব মহোদয়গণের বাসভূমি বলিয়া ইহা যে অন্যান্য স্বর্গাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এখানে বিদ্যাধরী ও কিন্নর কিন্নরীগণের হাবভাব সমন্বিত নৃত্যগীতাদি না থাকিলেও কলকণ্ঠ বিহগগণ ভগবান অমিতাভদেবের কিরণ প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া একতানে এই গান করিতেছে যে, সকলে পরোপকার ধ্যান কর।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস।

শ্রীরূপসনাতনোৎসব।

সুবুদ্ধি রায়ের সঠিক পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব গ্রন্থে এইমাত্র বর্ণিত আছে যে, তিনি কোন সময়ে গৌড় নগরে বিপুল ভূম্যধিকারী ছিলেন ও তৎকালে গৌড়ের ভাবী রাজা সৈয়দ হুসেন সাহা তাঁহার অধীনে সামান্য চাকুরী করিতেন। সুবুদ্ধি রায় একটী দীঘী কাটাইবার ভার সৈয়দ হুসেনের উপর দিয়াছিলেন এবং ঐ কার্য্যে দোষ পাইয়া তাঁহাকে চাবুকের দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন। কালের বিচিত্র গতি; সংসারে চিরদিন কাহারও সমান যায় না। ভাগ্যলক্ষ্মী সৈয়দ হুসেনের প্রতি প্রসন্ন হইল। তিনি গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকার বলেন যে, সৈয়দ হুসেন সাহা অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। সুবুদ্ধি রায় যে তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া রায়কে খুব বাড়াইলেন এবং ধন সম্মানে বিভূষিত করিলেন। সৈয়দের রাণীর চিত্ত কিন্তু অন্যরূপ। স্বামীর নির্য্যাতন স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল, তিনি রায়কে মারিয়া ফেলিবার জন্য গৌড়াধিপকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সৈয়দ কহিলেন, রায় আমার অন্ন-দাতা প্রতিপালক, তাঁহাকে কেমন করিয়া মারিয়া ফেলিব। রাণী বলিলেন, তবে উহার জাতি নাশ কর। রাজা উত্তর করিলেন, তাহা হইলে সে বাঁচিবে না। রাণী নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলে রাজা অগত্যা স্বীকার করিলেন এবং কারোয়ার জল খাওয়াইয়া সুবুদ্ধি রায়ের হিন্দুয়ানি নষ্ট করিয়া দিলেন। রায় লজ্জায়, অপমানে ও ধর্ম্ম-নাশ-জনিত নির্ব্বেদে ম্রিয়মাণ হইয়া বিষয় বিভব, স্ত্রী পুত্র ফেলিয়া পাগলের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে বারাণসীধামে আগমন করিলেন। পণ্ডিতদিগকে প্রায়শ্চিত্ত বিধি জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, এ সামান্য পাপ নহে, তপ্ত ঘৃত গলাধঃকরণ করিয়া জীবনান্ত ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। রায় সে কথা শুনিলেন না; তাঁহার হৃদয়ে এ ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের বিধি স্থান পাইল না। তিনি পাগলের ন্যায় কাশীর রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্রীচৈতন্য কাশীতে আসিয়া হরিনামের মহিমা প্রচার করিলেন। সুবুদ্ধি রায় গৌরের শরণাপন্ন হইলেন এবং নিজ বৃত্তান্ত বলিয়া উপদেশ চাহিলেন। গৌর বলিলেন, বৃন্দাবনে গিয়া নিভৃতে বসিয়া হরিনাম জপ কর, এক নামে সব পাপ যাইবে, দ্বিতীয় নামে প্রেমভক্তির উদয় হইবে। এই তোমার পক্ষে উচিত প্রায়শ্চিত্ত। রায়ের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তিনি চৈতন্য চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বৃন্দাবনে গমনোদ্দেশে অযোধ্যা প্রয়াগ হইয়া কিছুদিন নৈমিষারণ্যে বসতি করিতে লাগিলেন এবং মথুরা আসিয়া শুনিলেন যে, গৌরচন্দ্র বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে চলিয়া গিয়াছেন। গৌরের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় রায় বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। এখানে তিনি এক অদ্ভুত সাধন আরম্ভ করিয়া দিলেন। বন হইতে

কাষ্ঠ আনিয়া নগরে বেচিতে লাগিলেন এবং দিনান্তে এক পয়সার চানা খাইয়া বাকী পয়সায় দীন দুঃখী দরিদ্র পথিকদিগের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং সারা নিশা হরিনাম সাধন করিতে লাগিলেন। অচিরে সুবুদ্ধি রায় পরম ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িলেন। বারাণসীর পণ্ডিত-দিগের ব্যবস্থায় যাঁহার প্রাণান্ত হইতেছিল, চৈতন্য-কৃপায় তিনি আজ পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রূপ গোস্বামী অনুপমের সঙ্গে প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যের কৃপা-উপদেশ লাভ করিয়া মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং সুবুদ্ধি রায়ের সহিত মিলিত হইয়া দ্বাদশ [illegible] ভ্রমণ করিলেন। সনাতনের কারামোচন ও বারাণসী আগমন সংবাদ শুনিতে পাইয়া একমাসমাত্র বৃন্দাবন বাসের পর রূপ ও অনুপম গঙ্গাতীরের পথে জ্যেষ্ঠের অনুসন্ধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ওদিকে সনাতন গোস্বামী কাশীতে শ্রীচৈতন্যের নিকট উপদিষ্ট হইয়া শ্রীরূপের মিলনাশায় প্রয়াগে আসিলেন এবং তথা হইতে রাজ-পথ ধরিয়া অতি ত্রস্তভাবে মথুরায় চলিয়া গেলেন। রূপ ও অনুপম প্রয়াগে আসিয়া শুনিলেন, সনাতন রাজসরান দিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছেন; সুতরাং ভাই ভাই সাক্ষাৎ হইল না। মথুরায় আসিয়া সনাতন সুবুদ্ধি রায়ের সহিত মিলিত হইলেন, সুবুদ্ধি তাঁহাকে অনেক স্নেহ মমতা করিতে লাগিলেন। সনাতন তাহাতে বৈরাগ্যের ব্যাঘাৎ হইবে মনে করিয়া বনমধ্যে চলিয়া গেলেন এবং মথুরা-মাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বনে বনে বেড়াইয়া বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সকল উদ্ধার করিতে লাগিলেন ও মহা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কনিষ্ঠ অনুপমকে সঙ্গে লইয়া রূপ গোঁসাই বারাণসীতে আসিয়া তপন-মিশ্র, চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং তাহাদের মুখে সনা-তনের প্রতি প্রভুর কৃপা, উপদেশ ও পরম হংসদিগের মধ্যে হরিনাম প্রচারের বিবরণ শুনিয়া সুখী হইলেন। প্রভুর নীলাচলে যাত্রার সংবাদ গৌড়দেশে পাঠাইয়া এবং দিনদশ কাশীতে বাস করিয়া দুই ভাই বঙ্গদেশে চলিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থিতি কালে কৃষ্ণ লীলার নাটক রচনা করিবার জন্য রূপের মনে ইচ্ছা হইয়াছিল এবং সেইখানেই গ্রন্থের সূচনা করিয়া তাহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক লিখিয়াছিলেন। এক্ষণে পথে যাইতে যাইতে তিনি নাটকের ঘটনা ভাবিতে লাগিলেন ও দিবাভাগে যে কিছু রচনা হইত, সন্ধ্যাকালে প্রবাসাশ্রমে বসিয়া কড়চা করিয়া তাহা লিখিয়া রাখিতে লাগি-লেন। গৌড়দেশে আসিয়া হঠাৎ জ্বর বিকারে অনুপমের গঙ্গালাভ হইল। তাঁহার চিকিৎসা, সেবা ও অন্ত্যেষ্টি আদি করিতে শ্রীরূপের নবদ্বীপে আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। সুতরাং তিনি নবদ্বীপে পৌছিয়া দেখিলেন, গৌড়ের ভক্তবৃন্দ মহা-প্রভুর নীলাচলে আগমন সংবাদ পাইয়া ইতিপূর্ব্বে যাত্রা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইল না। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া একাকী উৎকল-দেশে যাত্রা করিলেন।

এদিকে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্ত-গণ দল বাঁধিয়া নীলাচলে যাইতেছেন, শিবানন্দ সেন তাঁহাদের তত্ত্বাবধায়ক,

ঘাট পার করা ও পথে প্রতিপালন করার ভার তাঁহার উপর। তাঁহার সঙ্গে একটী কুকুর যাইতেছিল। সকলে নিদ্রা গেলে কুকুর প্রহরীর কার্য্য করিত। শিবানন্দ তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। নীলাচলের নিকটে এক রাত্রিতে তিনি পাচক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,কুকুর ভাত পাইয়াছে তো?' এ অনুসন্ধান তিনি প্রতি রজনীতেই করিতেন। ভৃত্য বলিল "না, তাহাকে আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।' শিবানন্দ কহিলেন, সে কি? সে রাত্রি ও পরদিন প্রাতে অনেক অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কুকুরকে আর পাওয়া গেল না। যাহা হউক, সকলে ত্রস্তভাবে নীলাচলে আসিলেন, মহাপ্রভু সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বাসা দেওয়াইলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে পাইয়া মহানন্দিত হইলেন। পরদিন প্রাতে শিবানন্দ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের বাসায় যাইয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, তাঁহাদের সেই কুকুর প্রভুর অগ্রে বসিয়া প্রভুপ্রদত্ত নারিকেলশস্য খাইতেছে ও আনন্দে লেজ নাড়িতেছে। শ্রীচৈতন্য তাহাকে বলিতেছেন—'বল,রাম,কৃষ্ণ,হরি।' কথিত আছে, কুকুর দুই দিন পরে কুকুর দেহ ছাড়িয়া দিব্য দেহে বৈকুণ্ঠে গিয়াছিল।

রূপ গোঁসাই আজ সত্যভামাপুরে আসিয়া পথশ্রমে নিদ্রিত। স্বপ্নে দেখিতেছেন যে, এক দিব্যাঙ্গনা রমণী মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া যেন বলিতেছেন, 'আমার নাটক তুমি পৃথক্‌রূপে রচনা কর; আমার বরে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে।' নিদ্রাভঙ্গে রূপ ভাবিলেন,দেবী সত্যভামা আমাকে দ্বারিকা-লীলার নাটক পৃথক করিয়া লিখিতে বলিতেছেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্র বর্ণন করিব। তাহা হইল না, দুই প্রস্তাবনা, দুই নান্দী, দুই ঘটনা ও দুই নাটক করিতে হইবে। দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য। এই ভাবিতে ভাবিতে রূপ গোস্বামী প্রভাত হইলে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং অচিরে নীলাচলে পৌঁছিয়া অনুসন্ধান করিয়া হরিদাসের বাসায় আসিয়া উপনীত হইলেন। হরিদাসের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও, উভয়ে উভয়কে বিশেষ রূপ জানিতেন। অতএব হরিদাস রূপকে পাইয়া যে খুব সুখী হইলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? শ্রীচৈতন্যের নিয়ম ছিল, প্রতিদিন জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া হরিদাসকে দেখিতে আসিতেন। এ দিন আসিলে হরিদাস ও রূপ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভু প্রথমত রূপকে তত লক্ষ্য করেন নাই। হরিদাসকে আলিঙ্গন করিতে গেলে হরিদাস বলিলেন, রূপ প্রণাম করিছেন? মহাপ্রভু যুগপৎ রূপের নাম শুনিয়া ও তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে মগ্ন হইলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কাছে বসাইয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, সনাতন কোথায়? রূপ উত্তর করিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; আমি গঙ্গাতীর পথে আসিতেছি, প্রয়াগে আসিয়া শুনিলাম, তিনি রাজপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য। অনুপম?

রূপ। আসিতে আসিতে গৌড়দেশে তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন; অনেক কথা বার্ত্তার পর রূপ গোঁসাইকে হরিদাসের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া মহাপ্রভু বিদায় হইয়া গেলেন। পরদিনে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর, রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতিকে সঙ্গে আনিয়া, শ্রীচৈতন্য রূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন এবং সকলকে বলিলেন, তোমরা রূপকে কৃপা কর, যেন ইনি রসশাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশে সমর্থ হন্। রূপের বিনয় ও সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। রূপ সকল ভক্তের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

রূপ গোস্বামী হরিদাসসঙ্গে নিভৃতে পরম সুখে বাস করিতেছেন। চৈতন্যদেব প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে প্রীতি-আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা করিয়া যান; ক্রমে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী হইল। পূর্ব্বের ন্যায় গুণ্ডিচা মার্জ্জন, বন্য ভোজন, রথাগ্রে

নৃত্যকীর্ত্তন সকলই হইল। রূপ দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ হইলেন। রথের সময় চৈতন্য দেব ভাবে বিভোর হইয়া সামান্য একটী আদিরসের শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যে স্বরূপ ব্যতীত কেহই সেই শ্লোকের সঙ্গে প্রভুর মনের ভাব কি, বুঝিতে সমর্থ হইল না। সকলই মুখ চাওয়া-চাহি করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, প্রভু এরূপ শ্লোক কেন আবৃত্তি করিতেছেন। সে শ্লোকটী এইঃ—

"যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বর স্তাএব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃকদম্বানিলাঃ
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপার লীলা বিধৌ
রেবা রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে"

কোন নায়িকা বলিতেছে, সখি! যিনি কৌমার কালে আমার মন হরণ করিয়া ছিলেন, এখনও তিনিই আমার কান্ত, সেই সকল যামিনীও বর্ত্তমান, তথনকার মত বিকশিত মালতী সুরভি সম্পৃক্ত পরম সুখদ বসন্তানিলও প্রবাহিত হইতেছে, এবং সেই আমিও রহিয়াছি, তথাচ লীলাস্থান রেবাতীরের সেই বেতসীকানন মনে করিয়া আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

রথ ভাঙ্গিয়া গেল, ভক্তগণ যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলেন, রূপ গোস্বামী বাসায় আসিয়া চৈতন্যের মনের ভাবানুযায়ী সেই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া চালে গুঁজিয়া রাখিয়া দিলেন। রূপ-রচিত শ্লোক এইঃ—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি"।

কুরুক্ষেত্রে মিলিতা হইয়া শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন, হে সখি! সেই বৃন্দাবন-বিহারী প্রাণবল্লভ হরি এখানে উপস্থিত, আমিও সেই রাধা মিলিতা হইয়াছি, আমাদের মিলনজনিত সুখও সেইরূপ, তথাপি শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ কাননোত্থিত মধুর মুরলীধ্বনি, যাহা যমুনা পুলিন আন্দোলিত করিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত, মনে ভাবিয়া আমার মন উদ্বিগ্ন হইতেছে। (ক্রমশঃ।)

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ভরতমিলন।—শ্রীশ্রীনাথচন্দ্র প্রণীত, মূল্য ॥০। রামায়ণ এ দেশের অপূর্ব্ব সামগ্রী। নানাজনে নানা প্রকার ছন্দে রামায়ণ কীর্ত্তন করিয়াছে, কিন্তু আজও ইহার নূতনত্ব ঘুচে নাই। এমন অপূর্ব্ব উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ জগতে বিরল। শ্রীনাথ বাবু ছাত্রদের উপযোগী করিয়া এই রামায়ণের কতক অংশ প্রকাশ করিয়াছেন। নীতি শিক্ষার দিকে এখন সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে, এই সময়ে এ গ্রন্থ যে সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, খুব আশা করা যায়। ভরতমিলন সর্ব্বভাবেই স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইল। ভাষা আর একটু মধুর, সরল, দুরূহ-সমাস-বিবর্জ্জিত হইলে ভাল হইত বলিয়া বোধ হয়। আশা করি, শ্রীনাথবাবু দ্বিতীয় সংস্করণে এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ দৃষ্টি করিবেন। ছাপা পরিষ্কার ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট।

২। ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী।—বানর্জি যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারে এবং অর্থকরী ইংরাজি শিক্ষার বহুল প্রচলনে আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজি না শিখিলে পয়সা আসে না;—ইংরাজ-সংসর্গ, ইংরাজি কায়দা, ইংলিস পোষাক লোকে অধিক আদর করে,—ইত্যাদি কারণে এদেশে এক ভয়ানক পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়াছে। এই স্রোতে পড়িয়া কুসংস্কারাদির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গৌরবাদিও

বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, তাই প্রাচীন দেবভাষা সংস্কৃত এখন মৃত-কল্প এবং ইহার সেবকেরা মনুষ্যত্ব-বিহীন অর্দ্ধসভ্য নিকৃষ্ট জীব বলিয়া উপেক্ষিত। আর একটী কারণ এই যে এখনকার পণ্ডিতদিগের ব্যুৎপত্তিগত বিদ্যা এখন কেবল মাত্র টোল এবং ব্যবস্থাপত্রেই আবদ্ধ থাকে; সাধারণের নিকট তাঁহারা অপরিচিতই থাকিয়া যান; সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে যে মিল, কোমৎ, এডিসন বা জনসনের জন্ম হইতে পারে—নব্য-বঙ্গ তাহা সহসা বিশ্বাস করিতে নারাজ। ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ একজন মনীষি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই জীবনীলেখক তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর এবং নিজেও মহৎ ব্যক্তি। উপযুক্ত লেখকের গুণে পুস্তকখানি যারপর নাই আদরের সামগ্রী হইয়াছে। ভাষা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, কাগজ, ছাপা প্রভৃতি ভাল। পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।

৩। নীতিগ্রন্থ।—(হেয়ার ইতিবৃত্ত-মূলক) ডাক্তার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ প্রণীত ও "কলিকাতা প্রিন্টিংওয়ার্কস্" যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য।/০। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে এই নীতিগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সহস্র মৌখিক উপদেশ অপেক্ষা একটী নীতি-পরায়ণ সাধুর চরিত্রাখ্যায়িকা এবং শত শত আখ্যায়িকা অপেক্ষা একটী মহাপুরুষের সংসর্গ নীতিশিক্ষা বিষয়ে অধিকতর কার্য্য-করী, আমাদের ধারণা। সুতরাং এই নীতিগ্রন্থ যে অন্যান্য অনেক সন্নীতির আলোচনাপূর্ণ পুস্তক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা বিদ্যালয়ে অধীত হইবার উপযুক্ত।

৪ ও ৫। "নিশীথের অশ্রুধারা", ও "উপদেশ কথা"।—[illegible]পুর তত্ত্ব প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীবৈকুণ্ঠ[illegible] রায় দ্বারা প্রকাশিত। পুস্তক দুইখানি [illegible]রের রাজা শ্রীযুক্ত শশি শেখরেশ্বর রায় প্রণীত। আমাদের দেশে লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ, বঙ্গসাহিত্য সেবায় রাজা বাহাদুরের ঐকান্তিক অনুরাগ দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। "অশ্রু-ধারা"তে ভাবের উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু ভাষা তদুপযোগী নহে। "উপদেশকথা"র উপদেশগুলি মূল্যবান। ভাষাটা আর একটু মাজিয়া ঘসিয়া দিলে ভাল হইত।

৬। বীণা ও বংশী।—শ্রীসুন্দর রঞ্জন খাঁ প্রণীত; আর্টিষ্ট প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ৵০।

প্রাচীন বঙ্গে চতুর্দ্দশপদী কবিতা ছিলনা; মাইকেল ইংলণ্ড হইতে ইংরাজী সনেটের অনুকরণে প্রথমতঃ চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়া এই শ্রেণীর কবিতা রচনার পথ প্রদর্শন করেন। সেকস্‌পিয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রভৃতির কৃপায় ইংরাজী ভাষার সনেট বড় আদরের সামগ্রী হইয়াছে। আমাদের দেশে ইহার সৌন্দর্য্য এখনও সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয় নাই। বীণা ও বংশী রচয়িতার এই চেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও ফল বড় হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

৭। দুইটি প্রবন্ধ।—"প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী" প্রণীত, ব্যানার্জি যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৵১০।

"প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী" বঙ্গীয় পাঠকের নিকট সুপরিচিতা। "দুইটী প্রবন্ধ" তাঁহার পূর্ব্ব কীর্ত্তিকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছে। "বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য" এবং "সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য" এই দুইটী প্রবন্ধই যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভা কর্ত্তৃক সর্ব্বোৎকৃষ্টবোধে পুরস্কৃত হয়। ইহা দুইটী রত্ন বিশেষ। যেমন ভাষা, তেমনি ভাব। এই মহিলা বঙ্গের অলঙ্কার স্বরূপা।

৮। পতিব্রতা-ধর্ম্ম।—প্রথম ভাগ; বরাট প্রেসে মুদ্রিত; শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য।৵০। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের মহামূল্য গ্রন্থাদি হইতে পতিব্রতা-ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ-গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ধর্ম্মই সুখের মূল এবং নারীজাতির পতিসেবাই ধর্ম্ম, শাস্ত্রোক্তি সাহায্যে এ কথার প্রামাণ্যতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গরমণীদিগের জন্য বোধ হয় পুস্তকখানি সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং সংস্কৃত বচনগুলি উদ্ধৃত করার সার্থকতা [illegible] কম। ইহার মতামতের সহিত অনেক স্থানে আমাদের সহানুভূতি নাই।